ঈশ্বর বিভ্রম

রিচার্ড ডকিন্স

The God Delusion

Richard Dawkins

Translated by:
Kazi Mahboob Hassan

ঈশ্বর বিভ্রম

রিচার্ড ডকিন্স

অনুবাদ
কাজী মাহবুব হাসান

সুপ্রজ্ঞা অনুবাদ উদ্যোগ, ২০২৪

সুপ্রজ্ঞা
অনুবাদ উদ্যোগ

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি
অনুবাদকের ভূমিকা
পেপারব্যাক সংস্করণের ভূমিকা
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

১ গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী
২ ঈশ্বর হাইপোথিসিস
৩ ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রস্তাবিত কিছু যুক্তি
৪ কেন প্রায়ই নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই
৫ ধর্মের শিকড়
৬ নৈতিকতার শিকড়: কেন আমরা ভালো?
৭ ‘পবিত্র’গ্রন্থ্ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইস্ট
৮ ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র ?
৯ শৈশব, নিপীড়ন এবং ধর্ম থেকে মুক্তি
১০ একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শূন্যস্থান?

সংযুক্তি
তথ্যসূত্র

মূল লেখকের উৎসর্গ:

ডগলাস অ্যাডামস
(১৯৫২ - ২০০১)

এর স্মৃতির প্রতি নিবেদিত

“বাগানটা যে সুন্দর, শুধু এটা দেখাই কি যথেষ্ট না, সেখানে গাছের নীচে পরীরা বাস করে, তা কেন বিশ্বাস করতেই হবে”?

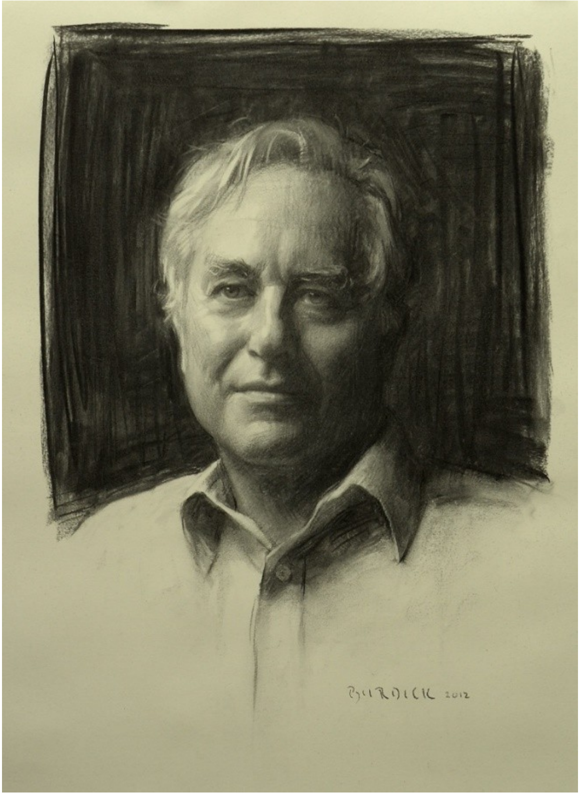

ক্লিন্টন রিচার্ড ডকিন্স (জন্ম: মার্চ ২৬, ১৯৪১)

(শিল্পী স্কট বুরডিকের আঁকা রিচার্ড ডকিন্স-এর প্রতিকৃতি, কাগজে চারকোল, ২০১২)

লেখক পরিচিতি: রিচার্ড ডকিন্স

ক্লিনটন রিচার্ড ডকিন্স রিচার্ড ডকিন্স নামেই সুপরিচিত। তার প্রশিক্ষণ আর পেশাগত ক্ষেত্র প্রাণিবিজ্ঞান, বিশেষ করে ইথোলজী (প্রাণিবিজ্ঞানের যে শাখায় বিজ্ঞানীরা বৈজ্ঞানিক ও নৈর্ব্যাক্তিকভাবে প্রাণীদের আচরণ নিয়ে গবেষণা করে থাকেন) এবং বিবর্তন জীববিজ্ঞান। ব্রিটিশ সরকারের কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা বাবার কাজের সুবাদে তার জন্ম এবং শৈশব কেটেছিল আফ্রিকায়। বাবা এবং মা, দুজনেরই আগ্রহ ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে, আর পারিবারিক সেই আগ্রহটিও সঞ্চারিত হয়েছিল শিশু ডকিন্সের মনে। জীবজগতের দৃশ্যমান নানা রূপ আর বৈচিত্র্যময়তার একটি বিকল্প ব্যাখ্যা হিসাবে মধ্য কৈশোরেই চার্লস ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তন তত্ত্বটি তাঁকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল; উচ্চশিক্ষার বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন জীববিজ্ঞান। অক্সফোর্ডের ব্যালিওল কলেজে প্রাণিবিজ্ঞানে ১৯৬২ সালে স্নাতক এবং বিশ্বসেরা ইথোলজিষ্ট ও জীববিজ্ঞানী নিকোলাস টিনবার্গেনের (১) তত্ত্বাবধানে তিনি পিএইচডি শেষ করেন ১৯৬৬ সালে।

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলিতে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ডকিন্স তার পেশাগত জীবন শুরু করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষক ‘নিকো’ টিনবার্গেন তার প্রিয় মেধাবী ছাত্রটিকে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে অক্সফোর্ডে ফিরিয়ে আনেন। ১৯৭০ সালে অক্সফোর্ডে প্রাণিবিজ্ঞানের প্রভাষক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি, পরবর্তীতে এই বিভাগের রিডারও (২) হয়েছিলেন তিনি। ১৯৯৫ সালে বিখ্যাত সফটওয়্যার প্রকৌশলী চার্লস সিমোনী (৩) বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য আর জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে অক্সফোর্ডে রিচার্ড ডকিন্সের জন্য একটি বিশেষ অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করেন, Simonyi Professorship for the Public Understanding of Science (৪), এই পদ থেকে ২০০৮ সালে তিনি অবসর গ্রহন করেন।

পেশাগত জীবনের শুরুতেই তিনি অনুভব করেছিলেন যে, চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিবর্তন বিষয়টি নিয়ে বহু জীববিজ্ঞানীর মধ্যেই কিছু মৌলিক ভ্রান্ত ধারণার অস্তিত্ব আছে। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কয়েকজন তাত্ত্বিক বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, জর্জ ক্রিস্টোফার উইলিয়ামস (৫), জন মেনার্ড স্মিথ (৬), ডাবলিউ. ডি. হ্যামিলটন (৭) ও রবার্ট ট্রিভার্সের (৮) কিন সিলেকশন, অ্যালট্রুইজম বা পরার্থবাদীতা, পারস্পরিক পরার্থবাদীতা, সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার বিনিয়োগ সংক্রান্ত গাণিতিক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলো বিষয়গুলি নিয়ে একটি সহজবোধ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার জন্য। ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুত সরবাহ ঘাটতির সময় যখন তার ঝিঁঝি পোকা (ক্রিকেট) নিয়ে গবেষণার কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না, সেই অবসরে ধারণাগুলো তিনি লিখে ফেলেছিলেন একটি

বহনযোগ্য ছোটো টাইপরাইটারে, ১৯৭৬ সালে সেই ভাবনাগুলো তার প্রথম বই ‘দ্য সেলফিশ জিন (The Selfish Gene)’ রুপে প্রকাশিত হয়েছিল।

‘দ্য সেলফিশ জিন’ খ্যাতি এনে দিয়েছিল তাঁকে।এখানেই প্রথমবারের তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপের শক্তি যে ইউনিট বা এককের উপর তার প্রভাব ফেলে ক্রম বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়, সেই জিন-কেন্দ্রিক বিবর্তনের ধারণাটি সুপরিচিত করার প্রচেষ্টা করেছিলেন, একই সাথে তিনি সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একক হিসাবে মিম (Meme) ধারণাটিও প্রস্তাব করেছিলেন। তার এই বইটির নামকরণ নিয়ে ভিত্তিহীন বিতর্ক চলেছে বহুদিন, তারই প্রত্যুত্তরে ১৯৮২ সালে বিবর্তন জীববিজ্ঞানে তিনি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রস্তাবনা করেন, ‘দি এক্সটেন্ডেড ফেনোটাইপ’ বইয়ে, জিনের ফিনোটাইপিক (পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এমন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য) প্রভাব শুধু সেই জিন বাহকের শরীরেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি সম্প্রসারিত হতে পারে প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং এমনকি অন্য কোন জীবের শরীরেও। অতিপ্রাকৃত কোন পরিকল্পক, সৃষ্টিকারী সত্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ডকিন্স ব্রিটিশ হিউম্যানিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের (৯) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ব্রাইটস মুভমেন্টের (১০) সমর্থক। তিনি সুপরিচিত ধর্মভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্ববাদ আর এর ছদ্মরুপে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মতবাদের বিরুদ্ধে তার সুদৃঢ় অবস্থানের জন্য। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত তার ‘দ্য ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার’ বইটিতে তিনি উইলিয়াম পেইলির (১১) ‘ওয়াচমেকার’ বা ঘড়ি নির্মাতা রূপকটির বিপক্ষে তার যুক্তি উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা করেন, জীবজগতে দৃশ্যমান সব গঠনগত জটিলতা ব্যাখ্যা করার করার জন্য কোনো অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন নেই। তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি প্রাকৃতিক নির্বাচনকেই চিহ্নিত করেন ‘অন্ধ’ ওয়াচমেকার হিসাবে।

বিবর্তন জীববিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন, ধর্ম আর বিজ্ঞানের মধ্যে টানাপোড়েন ইত্যাদি নানা বিষয় বোধগম্য করার লকেব তিনি আরো বেশ কিছু বই লিখেছেন, যেমন, River Out of Eden: A Darwinian View of Life (১৯৯৫), Climbing Mount Improbable (১৯৯৬), Unweaving the Rainbow (১৯৯৭), A Devil‘s Chaplain (২০০৩), The Ancestor‘s Tale (২০০৪)। ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয় তার ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ (The God Delusion) বইটি। যেখানে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, অতিপ্রাকৃত কোনো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নেই এবং ধর্মীয় বিশ্বাস একটি ডিল্যুশন বা বিভ্রান্তি বা স্থির ভ্রান্ত একটি বিশ্বাস মাত্র। ২০১০ সালের মধ্যেই বইটির বিক্রি দুই মিলিয়ন কপি ছাড়িয়ে যায় এবং তাকে বিশ্বব্যাপী বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

ডারউইন জন্মদ্বিশতবার্ষিকীতে বিবর্তনের সপক্ষে গবেষণালব্ধ প্রমাণগুলো হালনাগাদ করে তিনি প্রকাশ করেন The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution (২০০৯); ২০১১ সালে কিশোরদের উপযোগী করে লেখেন The Magic

of Reality: How We Know What's Really True; তার আত্মজীবনীর প্রথম পর্ব An Appetite for Wonder: The Making of a Scientist প্রকাশিত হয়েছে ২০১৩ সালে, যার দ্বিতীয় পর্ব Brief Candle in the Dark: My Life in Science প্রকাশিত হয়েছে ২০১৫ সালের শেষে । তার সর্বশেষ বই Science in the Soul: Selected Writings of a Passionate Rationalist প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ সালে।

রেডিও ও টেলিভিশনের নানা অনুষ্ঠান ও বিতর্কে তার উপস্থিতি একসময় ছিল বেশ নিয়মিত, এছাড়াও লিখেছেন বহু প্রবন্ধ। বহু পুরস্কারে সম্মানিত রিচার্ড ডকিন্স বিবর্তন জীববিজ্ঞান, বিজ্ঞানমনস্কতা, ছদ্মবিজ্ঞান, ধর্মীয় ও অন্যান্য নানা কুসংস্কার নিয়ে তার আজীবন যুদ্ধের অংশ হিসাবে তৈরি করেছেন বেশ কিছু প্রামাণ্য চিত্র, যার সাম্প্রতিকতমটি হচ্ছে ২০১৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত The Unbeleivers। তার প্রায় প্রত্যেকটি বই বিশ্বের সব প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিজ্ঞানমনষ্কতা আর মুক্ত চিন্তার প্রসারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাওয়া ডকিন্স প্রতিষ্ঠা করেছেন তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড রিজন (Richard Dawkins Foundation for Reason and Science) । ফাউন্ডেশনটি ২০১৬ সালে সেন্টার ফর ইনকোয়্যারির (Center for Inquiry) সাথে একীভুত হয়েছে।

অনুবাদক: কাজী মাহবুব হাসান

পেশাগত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র চিকিৎসা বিজ্ঞান, চিকিৎসা অণুজীববিজ্ঞান, রোগতত্ত্ব ও জনস্বাস্থ্য। অনুবাদক, আগ্রহের ক্ষেত্র জীববিজ্ঞান, বিজ্ঞানের ও শিল্পকলার ইতিহাস, সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মিথস্ক্রিয়া। ব্যক্তিগত ব্লগ, 'জীবনের বিজ্ঞান' (kmhb.wordpress.com)

টীকা:

(১) নিকোলাস 'নিকো' টিনবার্গেন, ডাচ জীববিজ্ঞানী (১৯০৭-১৯৮৮), কার্ল ভন ফ্রিশ, কনরাড লরেন্জ-এর সাথে ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরষ্কার জিতেছিলেন।
(২) যুক্তরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রিডার' পদটি নির্দিষ্ট কোন উর্ধ্বতন গবেষকের জন্য, যার গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি আছে।
(৩) চার্লস সিমোনী, হাঙ্গেরীয় আমেরিকান এই প্রকৌশলী মাইক্রোসফট-এর সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন বিভাগের প্রধান ছিলেন, এবং তার তত্ত্বাবধানে মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যারটির জন্ম হয়েছিল।
(৪) এই পদে বর্তমানে আসীন গণিতজ্ঞ মার্কাস পিটার ফ্রান্সিস দ্যু সোতয়।
(৫) জর্জ ক্রিস্টোফার উইলিয়ামস (১৯২৬-২০১০) আমেরিকার বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক অ্যাট স্টোনি ব্রুক এর অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সুপরিচিত ছিলেন গ্রুপ সিলেকশন ধারণাটির ঘোরতর বিরোধী হিসাবে। তার গবেষণা ৬০ এর দশকে জিন-কেন্দ্রিক বিবর্তনের ধারণাটিকে সংগঠিত হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।
(৬) জন মেনার্ড স্মিথ (১৯২০-২০০৪) ব্রিটিশ তাত্ত্বিক বিবর্তন জীববিজ্ঞানী এবং জিনতাত্ত্বিক। মূলত তিনি অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও সময়, পরে জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হলডেনের

অধীনে জিনতত্ত্ব নিয়ে পড়েন। তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বিবর্তনের তাত্ত্বিক ধারণায় গেম থিওরীর প্রয়োগ, এবং তিনি লিঙ্গ বিবর্তন ও সিগনালিং তত্ত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাবও করেন।

(৭) উইলিয়াম 'বিল' ডোনাল্ড হ্যামিলটন (১৯৩৬-২০০০) ব্রিটিশ বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা বিবর্তন তাত্ত্বিক হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা হয়। হ্যামিলটনের সবচেয়ে বড় অবদান প্রকৃতিতে দৃশ্যমান কিন সিলেকশন (একই জিন বহনকারীদের মধ্যে পারস্পরিক পরার্থবাদ) এবং অ্যালট্রুইজিম বা পরার্থবাদের জিন ভিত্তিটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা। এবং এই অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিটি পরবর্তীতে জিন-কেন্দ্রিক বিবর্তনীয় ধারণাটি সুসংগঠিত করেছিল। তাকে সোসিওবায়োজলজীর অগ্রদূত হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়, যে ধারণাটি পরে ই. ও. উইলসন জনপ্রিয় করেছিলেন। হ্যামিলটন লিঙ্গ অনুপাত এবং বিবর্তন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৮৪ থেকে তার মৃত্যু অবধি তিনি অক্সফার্ডের রয়্যাল সোসাইটি রিসার্চ অধ্যাপক ছিলেন।

(৮) রবার্ট লুডলো 'বব' ট্রিভার্স (জন্ম ১৯৪৩) আমেরিকার বিবর্তন জীববিজ্ঞানী ও সোসিওবায়োলজিষ্ট, রুটগার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লেখক। ৭০ এর দশকের শুরুতে ট্রিভার্স রেসিপ্রোকাল অ্যালট্রুইজম (পারস্পরিক পরার্থবাদ) ও প্যারেন্টাল ইনভেষ্টমেন্ট (সন্তান প্রতিপালনে পিতামাতার বিনিয়োগ), প্যারেন্ট-অফস্প্রিং কনফ্লিক্ট (পিতামাতা ও সন্তানের দ্বন্দ্ব), ফ্যাকালটেটিভ সেক্স রেশিও ডিটারমিনেশন (প্রয়োজানুসারে লিঙ্গ অনুপাত নির্ধারণ) নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি সেলফ ডিপেশন বা আত্মপ্রবঞ্চনাকে একটি অভিযোজনীয় কৌশল চিহ্নিত করে বেশ কিছু তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাও করেছেন।

(৯) British Humanist Association

(১০) ব্রাইট মুভমেন্টস, প্রকৃতিবাদী বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন মানুষদের একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন (http://www.the-brights.net/ movement/) ।

(১১) উইলিয়াম পেইলি, ১৭৪৩-১৮০৫, ইংলিশ যাজক, দার্শনিক, তিনি সুপরিচিত তার প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব বা ন্যাচারাল থিওলজির জন্য। তিনি তার Natural Theology or Evidences of the Existence and Attributes of the Deity বইটিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য টেলিওলজিকাল বা পরমকারণ যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, যেখানে আমরা তার সুপরিচিত "ওয়াচমেকার" বা ঘড়ি নির্মাতার উদাহরণটি পাই।

(১২) https://richarddawkins.net/

(১৩) http://kmhb.wordpress.com/

অনুবাদকের ভূমিকা:

বহু ভাষায় অনূদিত হওয়া রিচার্ড ডকিন্সের ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ (১) বইটির এটি প্রথম বাংলা অনুবাদ প্রচেষ্টা। নিজস্ব ব্লগের জন্য বইটির অনুবাদটি শুরু করেছিলাম ২০০৯ এর কোন এক সময় ও পরে ধারাবাহিকভাবে ২০১১ সাল থেকে। যারা আমার ব্লগে (জীবনের বিজ্ঞান) এসেছেন, তারা ইতোমধ্যেই অনুবাদটির সাথে কিছুটা পরিচিত, এই বইটি সেই ধারাবাহিক অনুবাদের পূর্ণাঙ্গ সম্পাদিত রূপ। মূলত এটি একজন পাঠকের অনুবাদ, যার সূচনা হয়েছিল বেশ কয়েক বছর আগেই। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ রিচার্ড ডকিন্সের প্রতি বইটি বাংলা অনুবাদ করতে আমাকে সদয় অনুমতি দেবার জন্য।

চার্লস ডারউইনের প্রস্তাবিত বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে কিছুটা পরিচিতি থাকলেও সত্যিকারভাবে ধারণাটির সাথে আমার পরিচয় ঘটে রিচার্ড ডকিন্সের লেখার মাধ্যমে। ঢাকা মেডিকেল কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে থাকাকালীন তার ‘দ্য সেলফিশ জিন’ (২) বইটির প্রথম সংস্করণের একটি কপি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেই সময় আমার জন্য খুব সহজবোধ্য ছিল না বইটি, তবে বইটি বহু প্রশ্নের উত্তর যেমন দিয়েছিল, তার চেয়েও আরো বেশি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল মনে, আর পাঠকের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পারার মধ্যেই থাকে যে কোনো বইয়ের সত্যিকারের সার্থকতা।

নব্বই দশকের শুরুতে বিজ্ঞানীদের নিজেদের লেখা এই ধরনের জনপ্রিয় বিজ্ঞানের বই - যেখানে বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করাও হয়েছে, এবং একই সাথে অতিসরলীকৃতও করা হয়নি - খুব সহজলভ্য ছিল না দেশে। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে সেই সময় বহু বই থাকলেও রিচার্ড ডকিন্সের অনুপস্থিতি আমাকে বিস্মিত করেছিল, অবশ্য ২০০০ এর পরে আমার অভিজ্ঞতা সেখানে ছিল ভিন্ন। ঢাকা মেডিকেল কলেজে মাইক্রোবায়োলজী বিভাগে প্রভাষক থাকাকালীন যখন ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমাকে ভারত ভ্রমণে সাথী হতে হয়েছিল ২০০১ এ, তখন কলকাতার কফি হাউসের উপর তলার একটি বইয়ের দোকান থেকে সেই অবধি প্রকাশিত রিচার্ড ডকিন্সের সব বইগুলো একসাথে সংগ্রহ করার সুযোগ হয়েছিল।

রিচার্ড ডকিন্সের কোনো বইই কৌতূহল জাগানোর প্রচেষ্টায় কখনো ব্যর্থ হয়নি। তার হাত ধরেই আরো অনেক বই পড়ার তাড়না অনুভব করেছি । বাংলাদেশের সেরা কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়েও আমি যে সত্যিকারের শিক্ষকের অভাব অনুভব করেছিলাম, আমার জন্য সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করেছিলেন যে দুইজন বিজ্ঞান লেখক, রিচার্ড ডকিন্স ছিলেন তাদের একজন (অন্য জন অবশ্যই কার্ল সেগান)। যে-কোনো শিক্ষকের একটি প্রবণতা থাকে তার আগ্রহের বিষয়গুলো কারো না কারো মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য, আর কিছুটা সময় শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা থাকার কারণে সেই প্রবণতা থেকে আমিও

মুক্ত নই। তাই ডকিন্সের সবগুলো বই বাংলায় অনুবাদ করার পরিকল্পনাটি প্রায় এক যুগের বেশি পুরোনো। কিন্তু অনুবাদের কাজগুলো বিক্ষিপ্তভাবে শুরু করলেও নিয়মিতভাবে করা শুরু করেছিলাম ২০১১ র প্রথম দিকে, আর 'দ্য গড ডিল্যুশন' তাদের মধ্যে একটি। এছাড়া অনুবাদ করার অন্য একটি উদ্দেশ্য, আমি যেমন জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই ধরনের কোনো বই পড়ার সুযোগ পাইনি, ভবিষ্যতে 'আমার মত' কেউ যেন অন্তত জানেন তার মাতৃভাষায় এই ধরনের বইয়ের অস্তিত্ব আছে।

রিচার্ড ডকিন্সের পাণ্ডিত্য, শিক্ষকসুলভ পরিমিত সরলতায় বিবর্তনের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারার ঈর্ষণীয় দক্ষতা এবং বিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার সুদৃঢ়, যৌক্তিক অবস্থানের কারণে বিবর্তন বিরোধী ধর্মীয় ধারণাপুষ্ট সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা (৩) সবসময়ই তাকে নিয়ে শঙ্কিত। ১৯৯৭ সালে একবার অক্সফোর্ডে তার বাসায় সাক্ষাৎকার নিতে এসেছিল অস্ট্রেলিয়ার একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক ও কর্মীরা, এই সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই সাক্ষাৎকার গ্রহনকারীরা আসলে বিবর্তন-বিরোধী, সৃষ্টিতত্ত্ববাদ সমর্থনকারীদের একটি দল, যারা তাঁকে ফাদে ফেলতে এসেছে। বিষয়টি বুঝতে পেরে তিনি ইতস্তত করছিলেন, এই দলটিকে কি তার বাসা থেকে বের করে দেবেন, নাকি তাদের ভ্রান্ত ধারণাগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিস্তারিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করবেন। পবরর্তীতে এই টিভি টীমটি খুবই কৌশলে অসৎভাবে ডকিন্সের এই ইতস্ততাগুলোকেই কেবল সম্পাদনা করে প্রামাণ্য চিত্রটি প্রকাশ করেছিলেন, তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে বৌদ্ধিক স্তরে তিনি যে এখনো সন্দিহান, সেটি উপস্থাপন করা।

এভাবেই বিবর্তন জীববিজ্ঞান নিয়ে তার দীর্ঘদিনের সংগ্রামের কারণে তাঁকে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী ও ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের নানা ধরনের আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে বহুবার। অন্তত তাঁরা ঠিকই অনুধাবন করতে পেরেছিল, তাদের ভিত্তিহীন বিশ্বাস আর অবৈজ্ঞানিক অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে রিচার্ড ডকিন্স আসলেই সমীহ জাগানো এক অনন্য প্রতিপক্ষ। 'দ্য গড ডিল্যুশন' এর আগেই বিবর্তন জীববিজ্ঞান নিয়ে প্রকাশিত অন্য বইগুলোয় তিনি অসাধারণ মেধা আর স্বচ্ছ লেখনী ইতোমধ্যেই সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের যুক্তিগুলোকে ধ্বংস করেছিলেন। সেই যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে তাদের যুক্তি 'আর্গুমেন্টাম অ্যাড হোমিনেমে' রূপ নিয়েছে, অর্থাৎ আক্রমণের লক্ষ্য ব্যক্তি রিচার্ড ডকিন্স।

স্পষ্টতই ডকিন্সকে দমিয়ে রাখতে পারেননি তারা, আর তিনি তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বিপক্ষ হয়েই আবির্ভূত হয়েছেন তার দ্য গড ডিল্যুশন বইটিতে। আবারো তার প্রাণবন্ত লেখনী, আবেগময় যুক্তিতর্কের উপস্থাপন এই বইয়ের যে-কোনো ধরনের

বিশ্বাসধারী মনোযোগী পাঠককে আন্দোলিত করতে বাধ্য। আর বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদীতার বিস্ময়কর উত্থানের এই সময়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় উৎসাহী যে কোন পাঠকের কাছে বইটি এখন আরো বেশি প্রাসঙ্গিক। কোনো ধরনের অস্পষ্টতা তিনি রাখেননি নিজস্ব অবস্থানের বিষয়ে, তার নিজের ভাষায়, 'আমার আগের কোনো বইয়েরই এমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না যে, বইটি কারো মন পরিবর্তন করবে, তবে এই বইটির উদ্দেশ্য সেটি'। এখানেই তিনি সুস্পষ্টভাবে তার নিরীশ্বরবাদী অবস্থানের কথা বলেছেন, আর বইটি হচ্ছে তার সেই অবস্থানে পৌছানোর একটি সাক্ষ্যপ্রমাণ।

২০০৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দ্য গড ডিল্যুশন'; একজন জীববিজ্ঞানীর পক্ষে এ ধরনের কোনো বিষয় নিয়ে লেখা অনেককে বিস্মিত করলেও এই বইয়ের যে-কোনো মনোযোগী পাঠকরা ঠিকই অনুধাবন করতে পারবেন একজন বিজ্ঞানীর পক্ষে এ ধরনের একটি বই লেখাই সম্ভব। কোনো সন্দেহ নেই যে, বইটি ব্যাপকভাবে আলোচিত ও সমালোচিত, এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ বই, এবং অসংখ্য মন্তব্য প্রতিবেদন। বইটির ভিত্তিতে আছে তার মূল প্রস্তাবটি, অবশ্যই কোনো অতিপ্রাকৃত স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই, এবং কোনো একটি ব্যক্তিগত 'ঈশ্বর' ধারণার প্রতি সব প্রমাণ বিরুদ্ধে বিশ্বাস ধরে রাখাঁটি একটি ডিল্যুশন বা বিভ্রান্তি হিসাবে চিহ্নিত হবার দাবী রাখে, এবং নৈতিকতার জন্য ধর্মের কোনো প্রয়োজন নেই, এবং ধর্ম এবং নৈতিকতার উৎস আমরা ধর্মীয় চিন্তাধারার বাইরে থেকেই ব্যাখ্যা করতে পারি।

জীবনের ব্যাখ্যায় ধর্মীয় ধারণাপুষ্ট সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বা ক্রিয়েশনিষ্ট অথবা ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন (৪) প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ডকিন্স বিবর্তন নিয়ে লেখা তার সবগুলো বইতেই যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত 'দ্য ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার' (৫) বইয়ে তিনি প্রমাণসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছিলেন, কেন এবং কিভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন প্রক্রিয়াটি প্রকৃতিতে আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান 'পরিকল্পনা' বা 'ডিজাইন' এর উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম । আর ২০০৬ এর দ্য গড ডিল্যুশন বইটিতে তিনি আরো বিস্তারিত করেন তার সেই ক্রমশ সুদৃঢ় হতে থাকা যুক্তিতর্কের বলয়টি, যেখানে অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তার উপস্থিতির পক্ষে বিপক্ষে সবগুলো প্রস্তাবনাকে তিনি ব্যবচ্ছেদ করেছেন বিস্তারিত আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এবং স্বভাবসুলভ ব্রিটিশ হাস্যরসের পরিমিত ব্যবহারে।

ধর্মকে সমালোচনা করে বই এর আগেই লিখতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু প্রকাশকদের উপদেশ দীর্ঘায়িত করেছিলো প্রক্রিয়াটি। বিংশ শতাব্দীর শেষাংশেই স্নায়ুবিজ্ঞান, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ববিদ্যা, সামাজিক-জীববিজ্ঞান, দর্শনের কিছু শাখায় ক্রমশ মানব আচরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার বলয়ে 'বিষয়' হিসাবে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াটি দ্রুততর হতে থাকে, এবং ২০০০ সাল নাগাদ

বেশ কিছু বই ধর্ম, নৈতিকতার বিষয়টিকে নতুন করে পাঠকদের আলোচনায় নিয়ে আসে, যেমন, পাসকাল বয়েরের (৬) 'রেলিজিয়ন এক্সপ্লেইন্ড' (৭), ড্যানিয়েল ডেনেটের (৮) 'ব্রেকিং দ্য স্পেল রেলিজিয়ন অ্যাস ন্যাচরাল ফেনোমেনা'(৯) , স্টিভেন পিংকারের (১০) 'দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্লেট: মডার্ন ডিনায়েল অব হিউম্যান নেচার' (১১), মার্ক হাউসারের (১২) 'দ্য মোরাল মাইন্ডস: হাউ নেচার ডিজাইন আওয়ার ইউনিভার্সাল সেন্স অফ রাইট অ্যাণ্ড রঙ' (১৩), স্কট অ্যাটরানের (১৪) 'ইন গডস উই ট্রাষ্ট: ইভোল্যুশনারী ল্যান্ডস্কেপ অব রেলিজিয়নস'(১৫) ইত্যাদি। বইগুলো মানব সংস্কৃতিতে ধর্মবিশ্বাসের সর্বজনীন উপস্থিতি এবং তাদের স্থায়ীত্ব, নৈতিকতার সাথে যোগসূত্রতা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নির্ভর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছিল। আরো সরাসরি ধর্মের সমালোচনা করে পরে প্রকাশিত হয় স্যাম হ্যারিসের (১৬) 'দি এন্ড অফ ফেইথ: রেলিজিয়ন টেরর অ্যান্ড ফিউচার অব রিজন' (১৭) । বিজ্ঞান ও ধর্মের ক্রমবর্ধিষ্ণু সাংঘর্ষিক অবস্থান নিয়ে আগেই সতর্ক করেছিলেন ডকিন্স তার দ্য ডেভিল'স চ্যাপলিন (১৮) বইটিতে এবং এই ধারাবাহিকতায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ক্রমাগতভাবে স্বঅবস্থানে দৃঢ় হতে থাকা ধর্মীয় অযৌক্তিকতা, সন্ত্রাসের চালিকা শক্তি হিসাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপক ব্যবহার ডকিন্সকে বিষয়টি সব দিক থেকে পর্যালোচনা করে একটি স্বতন্ত্র বই লেখার জন্য প্ররোচিত করেছিল - তার সেই যুক্তিগুলো তিনি উপস্থাপন করেছেন তার 'দ্য গড ডিল্যুশন' বইটিতে। এর পরের বছরই প্রকাশিত হয়েছিল ক্রিস্টোফার হিচেন্সের (১৯) 'গড ইজ নট গ্রেট: হাও রেলিজিয়ন পয়জনস এভরিথিং'(২০)। প্রকাশিত হবার পর 'দ্য গড ডিল্যুশন', নিউ ইয়র্ক টাইমসের বহু বিক্রিত বইয়ের তালিকায় ছিল দীর্ঘদিন ধরে, ২০১০ সালেই বইটির বিক্রি দুই মিলিয়ন কপি অতিক্রম করে। দ্য গড ডিল্যুশন তিনি উৎসর্গ করেছেন ব্রিটিশ লেখক, নাট্যকার এবং হিউমরিষ্ট ডগল্যাস অ্যাডামসকে , যাকে রিচার্ড ডকিন্স তার একমাত্র কনভার্ট (ডগলাস অ্যাডামস এর নিজের ভাষ্য অনুযায়ী রিচার্ড ডকিন্সের বই তাঁকে অতিপ্রাকৃত কোন সত্তার অস্তিত্ব নেই এমন একটি যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল) হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন।

দ্য গড ডিল্যুশন বইটির প্রথম অংশে আমরা দেখি রিচার্ড ডকিন্স ক্রমান্বয়ে সেই যুক্তিগুলো উপস্থাপন করেছেন যা দাবী করে কেন অবশ্যই কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, এবং পরবর্তী অংশে আলোচনার মূল বিষয়, ধর্ম আর নৈতিকতা, এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল রূপ। ভূমিকায় তিনি আশা করেছেন, তার এই বইটি চারটি বিশেষ ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে: প্রথমত, যারা নিরীশ্বরবাদী, তারাও সুখী, ভারসাম্যপূর্ণ, নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন (যদিও সমাজ ভেদে সেই অবস্থাটি অর্জন করা কঠিন হতে পারে), দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন এবং সমরূপী বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং তত্ত্বগুলো একটি কাল্পনিক ঈশ্বর ধারণা কিংবা গড হাইপোথিসিস (২২) বা অনুকল্প থেকে শ্রেষ্ঠতর, যে হাইপোথিসিসটি জীবজগত ও

মহাবিশ্ব বা কসমসে বৈচিত্র্যময়তা, আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইনের মোহনীয় বিভ্রমকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি অতিপ্রাকৃত সত্তার উপস্থিতিকে আবশ্যক মনে করে। তৃতীয়ত, শিশুদের অবশ্যই কখনো তাদের পিতামাতার অনুসৃত ধর্ম দ্বারা চিহ্নিত করা উচিত নয়, যেমন, 'মুসলিম' শিশু বা 'ক্যাথলিক' শিশু , ঠিক যেমন করে আমরা কখনো বলিনা 'মার্ক্সবাদী' শিশু, 'রক্ষণশীল' শিশু। এই শব্দগুলো যেন যে কোন সভ্য মানুষকে এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করে। চতুর্থত, নিরীশ্বরবাদীদের গর্বিত হওয়া উচিত তাদের অবস্থানে, কোন কারণই নেই তাদের ক্ষমা প্রার্থনা করার, কারণ নিরীশ্বরবাদীতা সুস্থ আর স্বাধীন মনের পরিচায়ক।

'আইনস্টাইনীয় ধর্ম' আর 'অতিপ্রাকৃত ধর্মের' মধ্যকার পার্থক্যটি উপস্থাপন করে তিনি সূচনা করেন এই বইটির প্রথম অধ্যায়: গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী। শুরুতেই বইটিতে ব্যবহৃত 'ঈশ্বরের' সংজ্ঞা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেখানে ঈশ্বর হচ্ছেন বহুবিধ নামে ডাকা হয় এমন একজন অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিকর্তা, যিনি উপাসনাযোগ্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা, যেমন, আইনস্টাইন (২৩) এবং হকিং (২৪) তাদের লেখায় 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এক ধরনের প্রায়-অতীন্দ্রিয়, সর্বেশ্বরবাদের ধারণায় সম্পৃক্ত কোন প্রাকৃতিক সত্তাকে ইঙ্গিত করতে, কিন্তু এই ধরনের ধার্মিকতার সাথে ঈশ্বরবাদী ধর্মের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে, যা আমরা বর্তমানে সংগঠিত সব ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে দেখি। যেখানে ঈশ্বর তার সৃষ্টির সব কিছুর মধ্যেই হস্তক্ষেপ করে থাকেন, এই ধরনের কোন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের দাবী ডকিন্স প্রস্তাব করেন 'গড হাইপোথিসিস' হিসাবে। কারণ মহাবিশ্বে হস্তক্ষেপকারী কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই, সেই বিষয়টি অবশ্যই বৈজ্ঞানিক, কারণ হস্তক্ষেপকারী কোন ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলে, সেই মহাবিশ্বের প্রকৃতি অবশ্যই ভিন্ন হবে ঈশ্বরহীন কোন মহাবিশ্ব থেকে। সুতরাং তার অস্তিত্বের ব্যপারটি নীরিক্ষাযোগ্য একটি প্রশ্ন, যা প্রমাণের দাবী রাখে এবং তাত্ত্বিকভাবে এটি আবিষ্কারযোগ্য, যদিও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্ভব নাও হতে পারে। ঈশ্বররে সপক্ষে সব এ যাবৎ প্রস্তাবিত ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক যুক্তিগুলোকে তিনি ব্যবচ্ছেদ করেন পরবর্তী অধ্যায়গুলোয়, টমাস অ্যাকোয়াইনাসের (২৫) ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রস্তাবিত পাঁচটি প্রমাণ থেকে শুরু করে, পাসকাল (২৬) এর ওয়েজার বা বাজি এমন কি স্টিফেন আনউইনের (২৭) বায়েসীয় (২৮) তত্ত্ব ব্যবহার করে ঈশ্বরের সম্ভাবনা প্রমাণের প্রচেষ্টাটিও তিনি আলোচনা করেন। এখানে ডকিন্স স্টিফেন জে. গুল্ড (২৯) এর 'নন অভারল্যাপিং ম্যাজিস্টেরিয়া' বা 'নোমা' প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। 'নোমা'র এই প্রস্তাবটি দাবী করে: বিজ্ঞান আর ধর্মের প্রভাবের বলয়টি পৃথক, কেউ কারো কর্তৃত্বে অনুপ্রবেশ করে না। এবং বিজ্ঞান 'কিভাবে' প্রশ্নটির উত্তর দেয়, আর ধর্ম উত্তর দেয় 'কেন' প্রশ্নটির। খুব পরিচিত বিজ্ঞান আর ধর্মের পারস্পরিক হস্তক্ষেপ না করার এই যুক্তিটি ধর্মবাদীরা একটি কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে আসছেন বহু দিন ধরে।

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রস্তাবিত দার্শনিক যুক্তিগুলোর মধ্যে বিশেষ একটি যুক্তি তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন পূর্ণাঙ্গ একটি অধ্যায়ে: 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন', যে যুক্তিটি দাবী করে জীবজগতের বিস্ময়কর সাংগঠনিক জটিলতা আবশ্যিকভাবে কোনো ডিজাইন বা পরিকল্পনা তথা একজন ডিজাইনার সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ইঙ্গিত করে, আপাতগ্রাহ্য এই মোহনীয় যুক্তিটিকে প্রত্যাখ্যান করে ডকিন্স ব্যাখ্যা করেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন প্রকৃতিতে আপাতদৃশ্যমান এই ডিজাইনকে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করতে পারে। দ্য সেলফিশ জিনের সূচনা বাক্যটিকে তিনি পুনরায় মনে করিয়ে দেন যে, মানব জাতির বুদ্ধিমত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি ছিল ব্যাখ্যা করা যে, কিভাবে মহাবিশ্বে জটিল আর অসম্ভাব্য পরিকল্পনার উদ্ভব হতে পারে।

ডকিন্স এখানে প্রস্তাব করেন, বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য এখন আমাদের কাছে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্ব আছে: প্রথমত, একটি হাইপোথিসিস যেখানে একজন ডিজাইনার বা পরিকল্পক আছেন, যিনি, আমরা জীবজগতে যে জটিলতা বহু রূপ দেখি, সেটির অস্তিত্বের কারণ জটিল একটি অতিপ্রাকৃত সত্তা। দ্বিতীয় হাইপোথিসিসটি হচ্ছে, সেই হাইপোথিসিসটি যার সপক্ষে তাত্ত্বিক এবং বাস্তব প্রমাণ আছে, যা ব্যাখ্যা করতে পারে কিভাবে খুব সাধারণ একটি সূচনা ও মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে খুব জটিলতর কোনো কিছুর উদ্ভব হতে পারে। এভাবেই তিনি তার মূল যুক্তিগুলো উপস্থাপন করে, এবং সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের দখল করে নেয়া ও ভুল প্রসঙ্গে ব্যবহার করা ফ্রেড হয়েল (৩০) এর 'বোয়িং ৭৪৭' (৩১) যুক্তিটাকেই ব্যবহার করে প্রমাণ করেন যে, প্রথম যুক্তি প্রচেষ্টাটি নিজেই নিজেকে খণ্ডন করে, কারণ দৃশ্যমান এই জটিলতাকে সৃষ্টি করতে সক্ষম কোনো সত্তাকে তার সৃষ্টি অপেক্ষা স্পষ্টতই আরো জটিলতর হতে হবে, আর সেই জটিলতা ব্যাখ্যা করা সম্ভব না, কারণ যে পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে ঈশ্বরের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে সেই ঈশ্বর ততোধিকই অসম্ভাব্য। সুতরাং ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টায় সফল হবার সম্ভাবনা আছে কেবল দ্বিতীয় হাইপোথিসিসটির।

চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে সব যুক্তি তর্ক শেষে তিনি প্রস্তাব করেন প্রকৃতিতে দৃশ্যমান সব ডিজাইনগুলোকে সত্যিকারের ডিজাইন হিসাবে মনে করার প্রলোভন একটি বিভ্রম এবং ভ্রান্ত, কারণ কোনো ডিজাইনার হাইপোথিসিস আরো একটি বড় প্রশ্নের জন্ম দেয় সেটি হচ্ছে কে তাহলে সেই ডিজাইনারকে ডিজাইন করেছে। ফ্রেড হয়েল এর 'বোয়িং ৭৪৭' প্রস্তাবটির মাধ্যমে 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ইমপ্রবাবিলিটি' বা অসম্ভাব্যতা থেকে যুক্তি প্রস্তাব করা হয়েছে, আর ডিজাইনারের উপস্থিতি যে অসম্ভাব্যতার সমাধান হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে, সেই সমাধানটি আরো বেশি অসম্ভাব্যতার দিকে ইঙ্গিত করে।

এছাড়াও ডকিন্স এখানে বিবর্তন সংক্রান্ত সর্বব্যাপী ভ্রান্ত একটি ধারণাকে প্রকাশ করেন, সেটি হচ্ছে বিবর্তন প্রক্রিয়াটি - যেমনটি সাধারণত মনে করা হয়, আদৌ চান্স নির্ভর

কোন প্রক্রিয়া নয়, কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে প্রদর্শন করা সম্ভব যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন বা ন্যাচারাল সিলেকশন প্রক্রিয়াটি একটি ‘নন-র‍্যানডোম’ (অর্থাৎ লক্ষ্যহীন এলোমেলো নয়) প্রক্রিয়া, এখানে ‘চান্সের’ (৩২) (যে প্রক্রিয়াটিকে সাধারণত এর ইংরেজী শব্দার্থ ব্যবহার করে বোঝার চেষ্টা করা হয়ে থাকে) অবকাশ নেই এবং এটি তথাকথিত ডিজাইনার হাইপোথিসিসের বিকল্প। এখানে তিনি ‘ওকাহামস রেজর’ (৩৩) ব্যবহার করেই প্রস্তাব করেন, সরলতর ব্যাখ্যা শ্রেয়তর, কারণ একজন সর্বশক্তিমান আর সর্বজ্ঞ ঈশ্বর অবশ্যই অসম্ভাব্য পরিমাণ জটিল একটি প্রস্তাব, কারণ একই সাথে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান কোনো সত্তা অসম্ভব, আর এখানেই তিনি দাবী করেন, ঈশ্বরবিহীন কোনো মহাবিশ্বের তত্ত্ব অবশ্যই ঈশ্বরসহ মহাবিশ্বের হাইপোথিসিস থেকে শ্রেয়তর এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্ধত্বে আক্রান্ত মানুষের মন এই যৌক্তিক ব্যাখ্যাটি বুঝতে অক্ষম, আর এই ধর্মীয় বিশ্বাসের উৎসের সন্ধান করেন তিনি দ্য গড ডিল্যুশনের দ্বিতীয়ার্ধে।

সব মানব সংস্কৃতিতে কেন আমরা ধর্মের উপস্থিতি লক্ষ করি? এখানে ডকিন্স নানা প্রতিদ্বন্দ্বী তত্ত্বের মধ্যে তার সমর্থিত যুক্তিটি ব্যাখ্যা করেন, সেটি হচ্ছে ধর্ম সম্ভবত কোনো একটি প্রয়োজনীয় ও উপযোগী অভিযোজনীয় প্রক্রিয়ার ভ্রান্তি বা দূর্ঘটনাবশত সৃষ্ট একটি উপজাত বা বাইপ্রোডাক্ট। অর্থাৎ এখানে তিনি ধর্মকে প্রস্তাব করেন টিকে থাকার জন্য উপযোগী কোনো একটি প্রক্রিয়ার ভুল বা দূর্ঘটনাবশত সৃষ্ট একটি ফলাফল, যা প্রক্রিয়াটির মূল উদ্দেশ্যের কোন অংশ ছিল না। আগুনের উন্মুক্ত শিখার প্রতি মথদের আকর্ষণ ও আপাতদৃষ্টিতে আত্মাহুতির উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি ধর্মকে খুবই ভিন্ন কোনো পরিস্থিতিতে এখনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি এমন টিকে থাকার কোনো প্রক্রিয়ার সক্রিয় ওঠা হিসাবে চিহ্নিত করেন। দ্য গড ডিল্যুশন বইটিতে রিচার্ড ডকিন্স আরো একটি মৌলিক প্রস্তাব করেন, কেন ধর্ম এত সফলভাবে মানব সংস্কৃতিতে টিকে আছে সেই প্রশ্নটিতে, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে এবং সারা বিশ্বব্যাপী এটি আরো তীব্র হয়ে ফিরে আসার প্রেক্ষাপটে। ডকিন্স এখানে ১৯৭৬ সালে তার প্রস্তাবিত সামাজিক ধারণার বিবর্তনের একক হিসেবে “মিম” ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন; মিম হচ্ছে জিনের অনুরূপ একটি একক, তবে সেখানে সেখানে বংশগতির তথ্য নয়, বরং সামাজিক কোনো ধারণা প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়। একজন ডারউইনবাদী হিসাবে তিনি প্রশ্ন করেন, টিকে থাকার ক্ষেত্রে ধর্মের উপকারিতাটি আসলে কি? ধর্মীয় মিমগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হবার মানবিক দুর্বলতাকে তিনি বহু সমাজে মনের ‘ভাইরাস’ সংক্রমণের মত ধর্মীয় ধারণাগুলো বিস্তারের কারণ হিসেবে দাবী করেন।

এর পর ডকিন্স তার আলোচনার নিয়ে আসেন নৈতিকতা আর নৈতিক আচরণ করার জন্য ধর্মের আবশ্যিকতার প্রসঙ্গটি; ধর্মবাদীদের অন্যতম প্রিয় যুক্তিটি, যদি ঈশ্বর না থাকে তাহলে মানুষ কেন ভালো আচরণ করবে? এর প্রত্যুত্তরে তিনি পাল্টা প্রশ্ন করেন :

আপনি যদি জানেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তাহলে কি আপনি হত্যা, ধর্ষণ কিংবা অন্য কোনো অনৈতিক কাজ করবেন? খুব কম মানুষই এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলবেন। কারণ শুধু ঈশ্বরকে খুশী করার কারণটি, ভালো কাজ করার কারণ হিসাবে খুবই অদ্ভুত একটি যুক্তি, এটি মানবতারই অপমান। যা সুস্পষ্টভাবে নৈতিক আচরণ করার জন্য ধর্মের আবশ্যিকতা আছে এই দাবীটাকে দুর্বল করে দেয়।

তার যুক্তির কেন্দ্রেই আছে, আমাদের নৈতিক আচরণ বা ভালো কাজের জন্য ধর্মের কোনো আবশ্যিকতা নেই, কারণ আমাদের নৈতিকতার ডারউইনীয় ব্যাখ্যা আছে, পরার্থবাদী জিন, বিবর্তনের প্রক্রিয়া নির্বাচিত হবার মাধ্যমে মানুষের ভিতর প্রাকৃতিকভাবে সহমর্মিতার জন্ম দেয়। তার এই যুক্তির সপক্ষে তিনি নৈতিকতার ইতিহাসের একটি পর্যালোচনা করেন, এবং যুক্তি দেন সমাজে একটি নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম ক্রমবিবর্তিত হচ্ছে, যা ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্তবাদী নৈতিকতা থেকে উদারনৈতিকতার দিকে এবং ক্রমশ অগ্রসরমান এই নৈতিক ঐক্যমত কিভাবে ধর্মীয় নেতাদের তাদের তথাকথিত অপরিবর্তনযোগ্য পবিত্র গ্রন্থ ব্যাখ্যা করার জন্য প্রভাবিত করেছে। এভাবে ডকিন্স তার পাঠকদের সামনে উন্মোচন করেন, যা কিছু আমরা মানবিক এবং নৈতিক মনে করি তার উৎস বাইবেল নয়, বরং আমাদের নৈতিক অগ্রগতি আধুনিক ধর্মবিশ্বাসীদের ইঙ্গিত করেছে বাইবেলের এর কোন অংশটি আমরা গ্রহন করবো আর কোন অংশটি বর্জন করবো।

ওল্ড টেস্টামেন্টে (৩৪) বর্ণিত ঈশ্বরের প্রতিহিংসা পরায়ন রূপটি দেখিয়ে তিনি দাবী করেন, এটি কোনো নৈতিকতা শিক্ষা দেবার গ্রন্থ হতে পারেনা, এছাড়া যে ধর্মীয় আবহের সাথে তিনি সবচেয়ে সুপরিচিত, সেই খ্রিস্ট ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থটি মূলত পরস্পরের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিছিন্ন কিছু ডকুমেন্ট বা দলিলের সমষ্টি হিসাবে চিহ্নিত করেন। শিক্ষিত ধর্মবিশ্বাসীদের দাবী - তারা প্রকৃতার্থে জেনেসিসে বর্ণিত কাহিনী আক্ষরিকার্থে বিশ্বাস করেন না - উল্লেখ করে বলেন, বিশ্বাসীরা যেমন অবিশ্বাসীদের অভিযুক্ত করেন তারা মিশ্র একটি দর্শনের বিশ্বাসী, যেখানে তারা বেছে নেন, মানবতা, যুগের সাথে মানানসই যৌক্তিক সমাধানগুলো, এখানে তারাও ঠিক একই কাজ করছেন, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা অনুযায়ী তারাও সুনির্দিষ্টভাবে নৈতিকতার সাথে মানানসই অংশগুলো বেছে নেন। এখানে ডকিন্স তার সূতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণটি প্রকাশ করেন; তিনি বলেন, এটি ধর্মবাদীদের একটি কপটতা আর বৌদ্ধিক অসততা, যারা এভাবে ধর্মীয় অসারতাগুলো টিকিয়ে রাখছেন। হয়তো তারা নিজেদের মত ধর্মগ্রন্থ থেকে বাছবিচার করে তাদের জীবনের দর্শন ঠিক করছেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মগ্রন্থটি অপরিবর্তনযোগ্য এবং একটি ঐশী প্রত্যাদেশ এবং সংশোধনযোগ্য নয় এমন একটি ধারণা তারা দ্বিধাহীনভাবে তাদের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন, সুতরাং একটি পর্যায়ে তারা মধ্যপন্থী হয়েও কিছু ক্ষেত্রে মৌলবাদী। এভাবে

তথাকথিত মৃদুপন্থীরা ধর্মীয় মৌলবাদীতাকে লালন করে যাচ্ছেন পরোক্ষভাবে। তবে সুশিক্ষিত, মৃদুপন্থীরা যাই দাবী করুন না কেন, ধর্মগ্রন্থ তারা আসলেই অর্থ সহকারে পড়েছেন কিনা সেই সন্দেহের অবকাশ রেখেও, এখনো বিশ্বব্যাপী ভীতিকর একটি পরিসংখ্যান হলো, বহু মানুষই তাদের ধর্মগ্রন্থকে প্রশ্নাতীতভাবে, আক্ষরিক অর্থে বিশ্বাস করেন। আর সারা বিশ্বের নিরাপত্তা এখন তাদের একাংশের কারণেই আজ হুমকির সম্মুখীন।

স্পষ্টতই শুধুমাত্র নিরীশ্বরবাদীতার সমর্থনের মধ্যে তিনি তার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি, ডকিন্স সরাসরি ধর্মকে আক্রমণ করেছেন, ধর্মকে তিনি চিহ্নিত করেছেন, কিভাবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে বাঁধাগ্রস্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, কিভাবে মৌলবাদীতাকে ধর্ম অন্ধের মত সমর্থন করছে, সমকামীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাময় ঘৃণাকে উৎসাহিত করছে। স্কুলে ধর্ম শিক্ষা দেবার প্রথাটিকে ডকিন্স তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছেন, যাকে তিনি মন্ত্র দীক্ষা দেবার একটি পক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন। পিতামাতা ও শিক্ষকদের ধর্ম দীক্ষা দেবার প্রক্রিয়াটিকে তিনি উল্লেখ করেছেন এক ধরনের মানসিক নিপীড়ন হিসাবে। মুসলিম কিংবা খ্রিস্টান হিসাবে শিশুকে চিহ্নিত করাকে তিনি শিশুদের ‘বামপন্থী’ শিশু বা ‘ডানপন্থী’ শিশু হিসাবে চিহ্নিত করার মত একটি বিষয় হিসাবে সচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ কোনো অবস্থাতেই শিশুদের মানসিক স্তর যথেষ্ট পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্ক নয় যে, তারা মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বে তাদের অবস্থান সংক্রান্ত কোন দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার ক্ষমতা রাখতে পারে।

তার বিরুদ্ধে আনা একটি পরিচিত অভিযোগ - তিনি একজন মৌলবাদীর মতোই মৌলবাদী নিরীশ্বরবাদী - প্রত্যাখ্যান করেন, এবং একজন সত্যিকারের মৌলবাদীর সাথে তিনি তার নিজের পার্থক্যটি সুস্পষ্ট করেন, তিনি বলেন তার অবস্থানের বিরুদ্ধে যদি সত্যিকারের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তিনি সাথে সাথে তার অবস্থান পরিবর্তন করতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু একজন সত্যিকারের মৌলবাদী তার অবস্থানেই সারাক্ষণই অনঢ় থাকেন, তার অবস্থানের বিরুদ্ধে যতই যৌক্তিক এবং বাস্তব প্রমাণ থাকুক না কেন। এছাড়াও দীর্ঘসময় ধরে গণতান্ত্রিক সহনশীল পরিবেশে আমরা এই ধরনের বহু অপ্রমাণিত বিশ্বাসকে বহুসাংস্কৃতিকতাবাদ কিংবা বৈচিত্র্যময়তার অজুহাতে বিস্তৃত হবার সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু তাসত্ত্বেও আমাদের সব কিছু ধর্মনিরেপেক্ষতার মূলমন্ত্রকে আগ্রাসন করবে না, এমন ধরনের একটি বিশ্বাস এখন হুমকির মুখে। সহিষ্ণু সমাজের ভিতর শিকড় বিস্তার করছে ধর্মীয় অহসিষ্ণুতার বিষবৃক্ষ। এখন এটি একটি রাজনৈতিক বিষয়। সারা পৃথিবী জুড়েই সমাজগুলো তাদের চিহ্নিত করতে ব্যস্ত ধর্মীয় পরিচয়ে, যেখানে তাদের মতাদর্শগত বৈষম্য পারস্পরিক সহাবস্থানকে ক্রমশ কঠিনতর করে তুলছে। রিচার্ড ডকিন্স দ্য গড ডিল্যুশনে এই ধর্মনিরপেক্ষ উদারগণতান্ত্রিকতা, সহিষ্ণু সমাজে ক্রমশ শক্তিশালী ও মৌলবাদী হয়ে ওঠা ধর্মীয় প্রভাবের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি প্রতি

গুরুত্ব দেবার আহবান জানিয়েছেন। বইটির শেষাংশে ডকিন্স আলোচনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেন, কেন ধর্ম, তার সংশ্লিষ্ট নানা সমস্যাসহ, মানুষের জীবনের একটি প্রয়োজনীয় শূন্যস্থান পূরণ করার দাবী রাখে ? যাদের প্রয়োজনে এটি সান্ত্বনা কিংবা অনুপ্রেরণা দেয়। ডকিন্স প্রস্তাব করেন এই সব শূন্যস্থানই ধর্মীয় নয়, এমন অন্য প্রক্রিয়াতেও পূরণ করা সম্ভব, যেখানে দর্শন এবং বিজ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি প্রস্তাব করেন নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে যেভাবে পরিপূর্ণ করে, জীবনের রহস্যকে সত্যিকারভাবে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম, ধর্ম সেটি করতে পারে না, কখনোই পারে না।

প্রত্যাশিতভাবেই বইটি প্রকাশের সাথে সাথেই তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ধর্মীয় বিশ্বাসের সমর্থক এবং নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদীরা প্রধান যে দাবীটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ গবেষণা করেননি, এবং যথারীতি তিনি যে ধর্মের কথা বলেছেন, সেটি তাদের পরিচিত ধর্ম নয়, এইসব সমালোচনার জবাব তিনি দিয়েছেন, ২০০৮ এ প্রকাশিত তার পেপারব্যাক সংস্করণের দীর্ঘ ভূমিকায়, যা এখানে অনুবাদ করা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে তার বিরুদ্ধে সমালোচনাগুলোর একটি মূল সূত্র যা পরবর্তীতে উন্মোচিত হয় সেটি আসলেই প্রমাণ করে বইটির মূল বক্তব্যটি অনেকেই ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন, বইটি আসলেই বর্তমান ধর্মকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছে আর্থসামাজিকরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিশ্বব্যাপী সমস্যার অপ্রয়োজনীয় একটি অংশ হিসাবে।

দ্য গড ডিল্যুশন প্ররোচিত টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আসা ধর্ম আর বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিতর্কে ডকিন্স দাবী করেন, ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্প, স্টিভেন জে. গুল্ডের মত যে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান আর ধর্মকে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃত্বের বলয়ে সীমাবদ্ধ রাখতে চান, সেটি আসলে একটি রাজনৈতিক কৌশল যা ধর্মীয় মধ্যপন্থীদের সন্তুষ্ট করার প্রচেষ্টার অংশ। কিন্তু এই ধারণাটি ভিত্তিহীন,বহু ক্ষেত্রে ধর্ম প্রভাবিত করছে বিজ্ঞানকে, যে কোন অলৌকিকতা শুধুমাত্র বাস্তব তথ্য নির্ভর বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ, ঠিক তেমনি এটি বিজ্ঞানের মূল মন্ত্রের পরিপন্থী। যে সমস্ত দার্শনিকরা দাবী করে, বিজ্ঞানের এখতিয়ারের বাইরে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা শুধু ধর্ম কিংবা দার্শনিক বা ধর্মতাত্ত্বিকদেরই আছে, ডকিন্স তাদের পাল্টা যুক্তি দেন, মহাজাগতিক বা কসমোলজিক্যাল প্রশ্নের উত্তরে ধর্মতাত্ত্বিকরা কি এমন বিশেষ জ্ঞান প্রদর্শন করতে পারেন, যা বিজ্ঞানীরা পারেন না। ডকিন্স তার সমালোচনার একটি উত্তরে লিখেছিলেন, ‘যে বিশ্বাস প্রমাণ ও যুক্তি ব্যবহার করে তার অবস্থান সমর্থন করতে প্রস্তুত, সেই বিশ্বাসটি শুধু ঐতিহ্য,কর্তৃত্ব আর ঐশী প্রত্যাদেশের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিশ্বাসের চেয়ে অনেক বেশি ভিন্ন।’

আমি পাঠকদের আমন্ত্রণ জানাই এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি পাঠ করার জন্য; আমি নিশ্চিৎ যে, অস্তিত্বের একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন নিয়ে রিচার্ড ডকিন্সের যুক্তি, তর্ক আর আলোচনা অবশ্যই পাঠকের মনে কৌতূহলের জন্ম দেবে, সুযোগ করে দেবে আরো বেশি প্রশ্ন করার। পেশাগত ব্যস্ততা আর সম্পাদনা করার সময়ের সমন্বয়ের প্রায় সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা অনুবাদে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ভ্রান্তির কারণ হতে পারে, আমি পাঠকদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আশা করছি ত্রুটিগুলো সংশোধন করার সুযোগ দেবার মত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনাটা বাস্তব রূপ পাবে। এই বইটি আমি আমার একটি সামান্য প্রচেষ্টা হিসাবে উৎসর্গ করছি বাংলাদেশে মুক্ত চিন্তার প্রসারে নিরন্তর সংগ্রাম করে যাওয়া সেই সব মানুষগুলোকে, যারা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার স্তরে দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন, নির্ভীক, কৌতূহলী মনগুলোকে বিশ্বব্যাপী মুক্তমনাদের সম্মিলিত উদ্যোগে একটি মানবিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

কাজী মাহবুব হাসান
সেপ্টেম্বর ২০১৮

টীকা:

(১) এই অনুবাদে আমি অনুসরণ করেছি দ্য গড ডিল্যুশন বইটির উত্তর আমেরিকায় ২০০৮ সালে প্রকাশিত সংস্করণটি: The God Delusion, Richard Dawkins, Houghton Mifflin Harcourt, January 16, 2008
(২) Richard Dawkins (1976). The Selfish Gene. Oxford University Press.
(৩) ক্রিয়েশনিজম বা সৃষ্টিতত্ত্ববাদ হচ্ছে একটি মতবাদ যা দাবী করে, এই মহাবিশ্ব এবং সকল জীবের সৃষ্টি হয়েছে স্বর্গীয় স্রষ্টার দ্বারা বিশেষভাবে সৃষ্টি হবার মাধ্যমে। এদের মধ্যে যারা ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিষ্ট, তারা আক্ষরিক অর্থে বাইবেলের (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বুক অফ জেনেসিস এ বর্ণিত সৃষ্টিকাহিনী বিশ্বাস করেন এবং তারা বিবর্তন সংক্রান্ত ধারণা বিরোধী। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বৈজ্ঞানিক ধারণা বেশ খানিকটা অগ্রসর হয়েছিল, তখন বিভিন্ন একেশ্বরবাদী (আব্রাহামিক) ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত সৃষ্টি কাহিনীগুলোর মধ্যে একটি সমন্বয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়। যারা বিশ্বাস করতেন যে প্রজাতিদের পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের সাধারণত বলা হতো 'অ্যাডভোকেটস অফ ক্রিয়েশন' বা খুব সাধারণ ভাবে ক্রিয়েশনিষ্ট বা সৃষ্টিতত্ত্ববাদী। ক্রিয়েশনিষ্ট ও বিবর্তনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা মূলত পরিচিতি পায় বিবর্তন বিরোধী বা অ্যান্টি-ইভ্যোলুশনিষ্ট হিসাবে। ১৯২৯ এ যুক্তরাষ্ট্রে ক্রিয়েশনিষ্ট শব্দটি প্রথম সংশ্লিষ্ট হয় খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের সাথে, বিশেষ করে যখন তারা মানব বিবর্তনের ধারণাটি প্রত্যাখ্যান ও পৃথিবীর বয়স জেনেসিসে বর্ণিত সময়ের সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাস করে তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করে। যদিও শব্দটি নিয়ে আপত্তি আছে যা ওল্ড আর্থ সৃষ্টিতত্ত্ববাদী এবং যারা বিবর্তনবাদী সৃষ্টিতত্ত্ববাদী, তাদের মধ্যে, যারা সৃষ্টি সম্বন্ধে ভিন্ন মতে বিশ্বাস করেন, যেমন পৃথিবীর বয়স এবং বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত বিবর্তনের ধারণা।
(৪) ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন (আইডি) একটি ছদ্মবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি যা দাবী করে, মহাবিশ্বের ও জীবজগতের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যদি বলা হয় তাদের সৃষ্টি করেছে কোনো বুদ্ধিমান সত্তা, এবং বিবর্তনের নৈর্ব্যাক্তিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার চেয়ে। তাদের কাছে এই ব্যাখ্যাটি বেশি গ্রহনযোগ্য সৃষ্টির কারণ হিসাবে। বৈজ্ঞানিক সমাজ, দার্শনিকরা এবং শিক্ষাবিদরা সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছেন যে, আইডি হচ্ছে মূলত ধর্মীয় যুক্তি, সৃষ্টিতত্ত্ববাদেরই একটি রূপ, যার কোনো

পর্যবেক্ষণ মূলক প্রমাণ বা পরীক্ষাযোগ্য কোনো অনুকল্প নেই। যদিও তারা দাবী করেন আইডি সৃষ্টিতত্ত্ববাদ নয় এবং পরিকল্পিতভাবে তারা তাদের ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারকে কোনো বিশেষ সত্তা দ্বারা চিহ্নিত করা থেকে বিরত থাকেন, যদি এই তত্ত্বের প্রস্তাবক অনেকেই তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করেন এই বলে যে এই ডিজাইনার হচ্ছেন খ্রিস্টীয় ঈশ্বর।

(৫) Richard Dawkins (1986). The Blind Watchmaker. New York: W. W. Norton

(৬) প্যাসকাল বয়ের, ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ, বর্তমানে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেইন্ট ল্যুইসের অধ্যাপক। তিনি প্রস্তাব করেন যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ইনট্যুইটিভ থিওরী অফ মাইন্ড এর ভিত্তি যা আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিকতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতাকে পরিচালিত করে। বয়ের প্রস্তাব করেন যে এই সব জন্মগত মানসিক পদ্ধতি মানুষকে বিশেষ কিছু সাংস্কৃতিক বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হবার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, যেমন অতিপ্রাকৃত কোন সত্তার প্রতি বিশ্বাস।

(৭) Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought (2002) Basic Books.

(৮) ড্যানিয়েল ক্লেমেন্ট ডেনেট (তৃতীয়) (জন্ম: ১৯৪২) আমেরিকার দার্শনিক, লেখক এবং কগনিটিভ বিজ্ঞানী, যার গবেষণার বিষয়, ফিলোসফি অফ মাইন্ড, ফিলোসফি অব সায়েন্স এবং ফিলোসফি অফ বায়োলজী, বিশেষ করে সেই ক্ষেত্রগুলো যেখানে বিবর্তন জীববিজ্ঞান ও কগনিটিভ বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট।

(৯) Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (Penguin Group 2006)

(১০) স্টিভেন আর্থার পিংকার (জন্ম ১৯৫৪) কানাডায় জন্মগ্রহনকারী যুক্তরাষ্ট্রের এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিষ্ট, কগনিটিভ সায়েন্টিষ্ট,ভাষাতত্ত্ববিদ এবং লেখক। বিবর্তন মনোবিজ্ঞান এবং কম্পিউটেশনাল থিওরী অব মাইন্ড এর সমর্থক। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক।

(১১) The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature (2002)

(১২) মার্ক ডি. হাউসার (জন্ম ১৯৫৯) আমেরিকার বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, প্রাইমেট আচরণ এবং অ্যানিমেল কগনিশনের গবেষক।

(১৩) Moral Minds: How Nature Designed a Universal Sense of Right and Wrong (Harper Collins/Ecco, NY 2006).

(১৪) স্কট অ্যাটরান (জন্ম ১৯৫২) যুক্তরাষ্ট্র-ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ, প্যারিসের Centre National de la Recherche Scientifique এর পরিচালক।

(১৫) In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion Oxford University Press, 2002

(১৬) স্যামুয়েল (স্যাম) বি. হ্যারিস (জন্ম ১৯৬৭) আমেরিকার লেখক, দার্শনিক, এবং নিউরোসায়েন্টিষ্ট। প্রোজেক্ট রিজনের সহ প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী।

(১৭) The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004). W. W. Norton

(১৮) Richard Dawkins (2003). A Devil's Chaplain. Boston: Houghton Mifflin

(১৯) ক্রিস্টোফার এরিক হিচেন্স (১৯৪৯-২০১১) ব্রিটিশ-আমেরিকান লেখক, দার্শনিক, বিতার্কিক এবং সাংবাদিক।

(২০) God is not great: How Religion Poisons Everything, Twelve/Hachette Book Group USA/Warner Books

(২১) ডগলাস নোয়েল অ্যাডামস (১৯৫২-২০০১) ইংরেজ লেখক, হিউমরিষ্ট, নাট্যকার।

(২২) হাইপোথিসিস (hypothesis, বহুবচনে hypotheses) হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব কোনো ঘটনার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা। এবং কোন হাইপোথিসিসকে বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস হতে হলে সেটিকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষাযোগ্য হতে হবে। বিজ্ঞানীরা সাধারণত তাদের হাইপোথিসিস প্রস্তাব

করেন পূর্বে গবেষণালব্ধ উপাত্ত ও উপসংহার কিংবা পর্যবেক্ষণ থেকে, যার গ্রহনযোগ্যতা তারা পরীক্ষা করে দেখেন।

(২৩) আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক।

(২৪) স্টিফেন উইলিয়াম হকিং (জন্ম ১৯৪২) ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী এবং কসমোলজিষ্ট।

(২৫) টমাস অ্যাকোয়াইনাস (১২২৫-১২৭৪) ডমিনিকান ফ্রায়ার এবং ক্যাথলিক যাজক, ধর্মতাত্ত্বিক।

(২৬) ব্লেইস পাসকাল (১৬২৩-১৬৬২) ফরাসী গণিতজ্ঞ. খ্রিস্টীয় দার্শনিক, লেখক।

(২৭) স্টিফেন ডি আনউইন, ব্রিটিশ পদার্থবিদ।

(২৮) টমাস বেইস (১৭০১-১৭৬১) (একজন ইংরেজ পরিসংখ্যানবিদ, গণিতজ্ঞ, দার্শনিক) এর প্রস্তাবিত একটি তত্ত্ব। বায়েসিয় তত্ত্বটি প্রমাণ নির্ভর সম্ভাবনার পরিমাণ নির্ণয় করার একটি পদ্ধতি, যেখানে বায়েনিয় কোনো সম্ভাবনাবিদ পূর্বেই কিছু সম্ভাবনা সুনির্দিষ্ট করেন, এবং বর্তমান প্রমাণের উপর ভিত্তি করে সেই সম্ভাবনাটিকে হালনাগাদ করা হয়।

(২৯) স্টিফেন জে. গুল্ড (১৯৪১-২০০২) আমেরিকার জীবাশ্মবিদ, জীববিজ্ঞানী, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক।

(৩০) ফ্রেড হয়েল (১৯১৫-২০০১) ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নক্ষত্রের কেন্দ্রে নিউক্লিওসিনথেসিস ব্যাখ্যা করার জন্য সুপরিচিত। প্রায়শই তিনি বিতর্কের কেন্দ্রে এসেছেন, যেমন তিনি ‘বিগ ব্যাং’ তত্ত্বটি বিশ্বাস করতেন না, এবং বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যপারে তার বিতর্কিত অবস্থান ছিল। এছাড়াও তিনি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক ছিলেন।

(৩১) বোয়িং ৭৪৭ এর যুক্তিটি ফ্রেড হয়েল প্রস্তাব করেছিলেন বলে মনে করা হয়, তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা কোনো একটি লোহা লক্কড়ের পরিত্যক্ত স্তূপের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেলে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যুক্ত হয়ে নিজে নিজেই একটি বোয়িং ৭৪৭ উড়োজাহাজ তৈরি হবার মত অসম্ভাব্য। ফ্রেড হয়েল প্যানস্পার্মিয়ার সমর্থক ছিলেন। যা দাবী করে মহাবিশ্বে প্রাণ ছড়িয়ে আছে এবং ধূমকেতু, উল্কাপিণ্ড ইত্যাদির মাধ্যমে এটি মহাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, অণুজীবরুপে।

(৩২) বিবর্তন জীববিজ্ঞানে কোন একটি ‘চান্স’ ঘটনা হচ্ছে শুধুমাত্র এমন কোনো ঘটনা যার কারণ সেই জীব নিজে নয় এবং প্রারম্ভিক যে পরিস্থিতি ছিল, এবং সেই সমন্ধে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান যতটুকু আছে সেই ঘটনাটি আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব না, যা সেই জীবের টিকে থাকার উপর প্রভাব ফেলে (যেমন, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ) অথবা এর জিনগত তথ্য (যেমন, কোন মিউটেশন); আর বিবর্তনে কিংবা যে-কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে চান্স হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা সম্বন্ধে আংশিক পরিমাপ করা সম্ভব এমন একটি প্রস্তাব - প্রারম্ভিক পরিস্থিতিগুলো সম্বন্ধে আমাদের সঠিক জ্ঞানের অভাব বা কিভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট শেষ পরিস্থিতিটি নির্বাচিত হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমাদের বোঝার ঘাটতি। চান্স অবশ্যই বিবর্তনে একটি ভূমিকা পালন করে তবে এখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও মনে রাখতে হবে। নির্বাচন চান্সের বিপরীত। চান্স, মিউটেশনের মাধ্যমে জিনগত বৈচিত্র্যময়তা আর প্রকরণ সৃষ্টি করে, আর সেটাই হচ্ছে কাঁচা মাল যার উপর প্রাকৃতিক নির্বাচন তার কাজ করে। এই সব জিনের বৈচিত্র্যময় ভিন্ন রূপ থেকে নির্বাচন বাছাই করে সেই প্রকরণগুলো যা এর বাহকে টিকে থাকতে ও প্রজনন সফল হতে সহায়তা করে।

(৩৩) ওকহাম’স রেজর (ল্যাটিন লেক্স পারসিমোনি (Occam's razor/lex parsimoniae) হচ্ছে সমস্যা সমাধানের একটি মূলনীতি যা প্রস্তাব করেছিলেন উইলিয়াম অফ ওকহাম (১২৪৭-১৩৪৭), যিনি ইংরেজ ধর্মযাজক ও ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক ছিলেন। এই মূলনীতিতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, কোন কিছুকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হাইপোথিসিসগুলোর মধ্যে যেটি সবচেয়ে সরল, যেখানে সবচেয়ে কম প্রাক-ধারণার প্রয়োজন আছে সেটাকেই নির্বাচন করা উচিত। অন্যার্থে, অপেক্ষাকৃত জটিল সমাধানগুলো হয়তো সঠিক বলে প্রমাণিত হতে পারে- তবে যত কম প্রাক-ধারণা করা যায়,ততই উত্তম।

(৩৪) খ্রিস্টীয় বাইবেল এর প্রথমাংশ, এর ভিত্তি হিব্রু বাইবেল।

পেপারব্যাক সংস্করণের ভূমিকা

দ্য গড ডিল্যুশন বইটির শক্ত-বাঁধাই সংস্করণটিকে বেশ ব্যাপকভাবেই ২০০৬ সালে অপ্রত্যাশিত আর বিস্ময়করভাবেই বহু বিক্রিত হওয়া একটি বই হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা আর উৎসাহের সাথে বইটিকে গ্রহন করেছিলেন অধিকাংশ পাঠক, যাদের অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত পর্যালোচনা আর মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন আমাজন (১) ওয়েবসাইটে (এই লেখাঁটি লেখার সময় সেই সব মন্তব্যের সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করেছে); তবে সে ধরনের উদাত্ত কোনো সমর্থন অবশ্য পাওয়া যায়নি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর পর্যালোচনায়। একজন নৈরাশ্যবাদী হয়তো ব্যপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারেন এই সব পত্রিকাগুলোর পুস্তক পর্যালোচনা সমালোচকদের কল্পনাশক্তিহীনতা জনিত একটি সহজাত প্রতিক্রিয়ার ফলফল হিসাবে : এর শিরোনামে যেহেতু “গড” শব্দটি আছে, সুতরাং কোনো পরিচিত ধর্মবাদী সমালোচকের কাছে এটিকে পর্যালোচনা করার জন্য পাঠানোই উত্তম হবে। কিন্তু ব্যপারটা সেভাবে ভাবা হয়তো আসলেই একটু বেশি মাত্রায় নৈরাশ্যবাদ হবে। তবে বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা যা শুরু হয়েছে, সেই বিখ্যাত বাক্যটি দিয়ে, বহুদিন আগেই যে বাক্যটিকে সাধারণত ভয়ঙ্কর অশুভ বার্তাবাহী বলে মনে করতেই আমি শিখেছি : ‘আমি একজন নিরীশ্বরবাদী, ‘কিন্তু’ .., যেভাবে ড্যান ডেনেট (২) তার ‘ব্রেকিং দ্য স্পেল’ বইটিতে বলেছিলেন, ‘হতবাক করে দেবার মত বহু সংখ্যক বুদ্ধিজীবি আসলেই ‘বিশ্বাসে বিশ্বাস’ করেন; যদিও তাদের নিজেদের কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, কিন্তু এই সব ‘অন্য কারো অনুভূতি কল্পনা করে’ অনুভব করা দ্বিতীয় পর্যায়ের ধর্মবিশ্বাসীরা প্রায়শই মূল ধর্মবিশ্বাসীদের চেয়ে অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে থাকেন, আর তাদের এই উৎসাহ বহুগুণে বেড়ে যায় অনুগ্রহভাজন হবার নিমিত্তে তাদের প্রদর্শিত উদার মানসিকতায়: ‘হায়!, আমি যদিও আপনার মত ধর্মে বিশ্বাসী নই, তবে আমি তা ‘শ্রদ্ধা’ করি ও তার প্রতি আমি সহানুভূতিশীল’।

’আমি একজন নিরীশ্বরবাদী ‘কিন্তু’ .....,’ এই বাক্যের পরবর্তী অংশ আসলে কখনোই কোনো আলোচনায় উপকারে আসে না, বরং সবসময়ই নাস্তিবাদী (৩) বা আরো মন্দ; বাক্যটি পূর্ণ একধরনের অতি আনন্দময় নেতিবাচকতায়। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ করুন, একই ঘরানার আরো একটি জনপ্রিয় মন্তব্য থেকে এর পার্থক্য: ‘আমি এক সময় নিরীশ্বরবাদী ছিলাম, কিন্তু...,’ এটিও খুবই পুরাতন একটি কৌশল, যা ব্যবহার করেছেন লেখক সি. এস. লিউইস (৪) থেকে শুরু করে এমনকি আজকের ধর্মবাদীরাও। এটি এক ধরনের জনপ্রিয় মতামত প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, আর বিস্ময়কর ব্যপারটা হলো বহু ক্ষেত্রে এটি কাজেও দেয়; এই ধরনের কৌশলের প্রতি সে কারণে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আমি রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটটির জন্য একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম, ‘আই অ্যাম অ্যান অ্যাথেইস্ট, বাট....’ (আমি একজন নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু...) শিরোনামে, এবং সেখান থেকেই আমি ধার করেছি এখানে পরবর্তীতে বর্ণিত সমালোচনামূলক তবে নেতিবাচক উল্লেখযোগ্য কিছু আলোচনার বিষয়বস্তু, যেগুলো শক্ত-বাঁধাই হিসেবে প্রকাশিত ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ এর বিভিন্ন প্রকাশিত সমালোচনা আর পর্যালোচনা থেকে আমি সংগ্রহ করেছিলাম । সেই ওয়েবসাইটি - যা পরিচালনা করছেন অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ জশ টিমোনেন - ইতোমধ্যে অসংখ্য পাঠকের মতামত আকৃষ্ট করেছে, সব মতামতোই সুস্পষ্টভাবে এইসব সমালোচনাগুলো ব্যবচ্ছেদ করেছে - যেগুলো আমার বা আমার প্রাতিষ্ঠানিক সহকর্মীরা যেমন, এ. সি. গ্রেলিঙ (৫), ড্যান ডেনেট (২), পল কার্টজ (৬), স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (৭) এবং অন্যান্যরা যারা ছাপার অক্ষরে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন - তাদের সবার চেয়েই আরো অনেক বেশি খোলামেলা আর সুস্পষ্ট।

ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানগর্ভ বইগুলোর চুলচেরা বিশ্লেষণ না করে আপনি কিছুতেই ধর্মের সমালোচনা করতে পারেন না :

‘অবাক করে দেয়ার মত বহু বিক্রিত একটি বই?’ একজন অতি আত্মসচেতন বুদ্ধিজীবি সমালোচক যেমন মন্তব্য করেছিলেন, আমি যদি অ্যাকোয়াইনাস (৮) ও ডানস স্কোটাস (৯) লেখার মধ্যে এপিসটেমিওলজিকাল অর্থাৎ জ্ঞানতাত্ত্বিক উৎসের পার্থক্য বোঝার জন্য আরো বেশি প্রচেষ্টা করতাম; কিংবা আমি যদি সাবজেক্টিভিটি বা আত্মগত ধারণা বোধ বিষয়ক এরিজানা’র (১০) লেখা, গ্রেইস বা করুণা, দয়া কিংবা অনুগ্রহ বিষয়ে রাহনার(১১) বা আশার উপর মোল্টম্যানের (১২) ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনাগুলো বোঝার জন্য সত্যিকারভাবে চেষ্টা করতাম (যেমনটি তিনি অনর্থক আশা করেছিলেন, কাজটি আমি করবো), তাহলে বইটি শুধু ‘অপ্রত্যাশিত বা অবাক করা’ সর্বাধিক বিক্রিত বইই হতো না, বহু-বিক্রিত হওয়া অলৌকিক একটি বইও হত। কিন্তু প্রসঙ্গটা আসলে ভিন্ন। স্টিফেন হকিং (১৩) এর ব্যতিক্রম (যিনি বইতে প্রতিটি প্রকাশিত ফরমুলা বা গাণিতিক সূত্র তার বই বিক্রয়ের পরিমাণ অর্ধেক কমিয়ে দেবে এমন পরামর্শ গ্রহন করেছিলেন) আমি খুব আনন্দের সাথে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের খেতাব প্রত্যাখ্যান করতে পারবো, যদি সামান্যতমও আশা থাকতো, ড্যান স্কোটাস, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা, আমার এই মৌলিক প্রশ্নটির বিষয়ে কোনো আলোকপাত করতে পারতেন। ধর্মতাত্ত্বিক রচনাগুলোর একটি বিশাল অংশ প্রথমত আগে থেকেই ধরেই নেয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এবং সেখান থেকেই তারা তাদের আলোচনা শুরু করে। সুতরাং আমার প্রয়োজনে আমি শুধু সেই সব ধর্মতাত্ত্বিকদের বিবেচনা করার দরকার মনে করেছি যারা গুরুত্বের সাথে এর বিপরীত সম্ভাবনাটিকে গ্রহন করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার

চেষ্টা করেছেন এর বিপরীতটি, আমি মনে করি এই বইটির অধ্যায় ৩ সেই কাজটি করেছে, যথেষ্ট পরিমাণ উন্মুক্ত মানসিকতা আর বোধগম্য ব্যাখ্যা এবং অবশ্যই নির্মল রসিকতার সাথে।

আর যখন নির্মল হাস্যরসের উল্লেখ করতে হয়,তখন পি. জে. মায়ার্স (১৪) এর ফ্যারিঙ্গুলা (১৫) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তার Courtier's reply (বা উজিরের জবাব) এর চেয়ে আরো ভালো কিছু আমি লিখতে পারবো না:

> আমি জনাব ডকিন্সের প্রতি আনীত অসম্মানজনক অভিযোগগুলো এ বিষয়ে তার জ্ঞানের গভীরতার ঘাটতি দেখে তীব্র হতাশাসহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি। তিনি আপাতদৃষ্টিতে সম্রাটের জুতার চামড়ার চমৎকার আর অসাধারণত্ব বিষয়ে কাউন্ট রডরিগো দ্য সেভিইয়া'র বিস্তারিত কোনো আলোচনাই পড়েননি। এমনকি তিনি এক মুহূর্ত সময় দেননি বেলিনির অন্যতম শ্রেষ্ঠ On the luminescence of emperor`s feathered hat গ্রন্থটিকে ; বেশ কিছু নিবেদিত প্রাণ লেখক আমাদের মধ্যে আছেন, যারা সম্রাটের পরিচ্ছদের সৌন্দর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সমৃদ্ধ বই লিখেছেন এবং প্রতিটি প্রধান সংবাদপত্র একটি বিশেষ অংশ পুরোপুরি নিবেদন করেছেন সম্রাটের ফ্যাশন সংক্রান্ত বিদগ্ধ আলোচনায়.....। ডকিন্স অত্যন্ত অহংকারের সাথে এই গভীর দার্শনিক আলোচনাকে অস্বীকার করেছেন ও স্থুলভাবে সম্রাটকে তার নগ্নতার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। যতক্ষণ না পর্যন্ত ডকিন্স প্যারিস আর মিলানের কোনো দর্জির দোকানে প্রশিক্ষিত না হবেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি ফোলানো আর কুচি দেয়া প্যান্টের মধ্যে পার্থক্য করা শিখতে না পারবেন, আমাদের সবার এমন ভান করা উচিত যে, তিনি সম্রাটের নগ্নতা ও তার রুচি নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। জীববিজ্ঞানে তার প্রশিক্ষণ হয়তো তাকে সম্রাটের ঝুলে থাকা যৌনাঙ্গ শনাক্ত করার যোগ্যতা দিয়েছে যখন তিনি তা চাক্ষুষ দেখতে পেরেছিলেন, কিন্তু কিভাবে কাল্পনিক কাপড় সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হয় সেই প্রশিক্ষণ তিনি অবশ্যই সেখান থেকে পাননি (১৬) ।

এই প্রসঙ্গটাকে খানিকটা সম্প্রসারিত যদি করি, আমরা কিন্তু সবাই মোটামুটি ফেয়ারী বা বাগানের পরী, জ্যোতিষবিদ্যা, উড়ন্ত স্প্যাগেটি দানবের অস্তিত্ব আনন্দের সাথে অস্বীকার করি, আমাদের কিন্তু সেই সংক্রান্ত কোনো বই -যেমন ধরুন পাসতাফারিয়ার ধর্মতত্ত্ব (১৭) ইত্যাদি - গভীরভাবে অধ্যয়ন করার প্রয়োজন পড়ে না।

এর পরের সমালোচনাটিও প্রায় একই রকম: সেই বিখ্যাত ‘স্ট্র ম্যান’ (১৮) যুক্তি নির্ভর আক্রমণ।

আপনি সব সময় ভালো বিষয়গুলো এড়িয়ে ধর্মের খারাপ বিষয়গুলোকে সমালোচনা করেন:

‘আপনি সবসময় ঐসব স্থুল, চিৎকার করে গলা ফাটানো সুযোগসন্ধানী ধর্মব্যবসায়ী যেমন, টেড হ্যাগার্ড (১৯), জেরী ফলওয়েল (২০) আর প্যাট রবার্টসনদের (২১) মত মানুষদের সমালোচনা করেন, শিক্ষিত, সভ্য ধর্মতাত্ত্বিক যেমন টিলিখ(২২) বা বনহোয়েফারের (২৩) মত মানুষদের বাদ দিয়ে, তারা যে ধর্ম শেখান, আমি তো সেই ধর্মে বিশ্বাস করি।’

কিন্তু হায়! শুধু যদি এই ধরনের সংবেদনশীল আর মৃদুপন্থী ধর্মের প্রাধান্য থাকতো এই পৃথিবীতে, কোনো সন্দেহ নেই পৃথিবী অপেক্ষাকৃত আরো সুন্দর হতো এবং আমিও অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বই লিখতাম। অত্যন্ত দুঃখজনক একটি সত্য হচ্ছে এই ধরনের আদৌ উগ্র নয়, সুশীল, সংশোধনবাদী ধর্ম সংখ্যায় অতি নগণ্য। বিশ্বব্যাপী একটি বিশাল সংখ্যক বিশ্বাসীদের কাছে ধর্ম হচ্ছে যা আপনারা হ্যাগার্ড, ফলওয়েল, রবার্টসনের, ওসামা বিন লাদেন বা আয়াতোল্লাহ খোমেনির মত মানুষদের মুখে শুনে থাকেন। এরা কোনো মামুলী কাকতাড়ুয়া নয়, তাদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এবং আধুনিক বিশ্বে সবাইকে এই ধরনের লোকদের সাথে বোঝাপড়া করতে হচ্ছে সবসময়।

আমি একজন নিরীশ্বরবাদী, তবে আপনার মত তীক্ষ্মস্বরের কর্কশ, অসহিষ্ণু, নিয়ন্ত্রণহীন, ভৎসনাপূর্ণ ভাষা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চাই:

আসলেই আপনি যদি ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ বইটিরর ভাষা লক্ষ করেন, সাধারণত যেধরনের ভাষার মুখোমুখি আমরা হয়ে থাকি তার চেয়ে এটি বরং অনেক কম কর্কশ কিংবা লাগাম ছাড়া, যেমন ভাষা আমরা হরহামেশাই দেখি কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষকের ভাষায় বা থিয়েটার, শিল্পকলা কিংবা বই সমালোচকদের ভাষায়। আমি নীচে সাম্প্রতিক কিছু সংবাদপত্র থেকে বাছাই করে কয়েকটি রেষ্টুরেন্ট সমালোচনার ভাষার উদাহরণ দিচ্ছি ব্যপারাটিকে বোধগম্য করার জন্য:

> ‘খুবই কঠিন, যদিও একেবারে অসম্ভব না, কারো পক্ষে এমন একটি রেস্টুরেন্ট কল্পনা করা, এমন কি ঘুমের মধ্যেও, যার বিশেষত্বহীন খাদ্য প্রায় অখাদ্যের পর্যায়ে পড়ে।’

‘সবকিছু বিবেচনা করার পর অনায়াসে বলা যায় এটি লন্ডনের সবচেয়ে খারাপ রেস্টুরেন্ট, হয়তো সারা বিশ্বে ..যেখানে জঘন্যতম খাবার পরিবেশন করা হয় প্রতিহিংসার সাথে এমন একটা কক্ষে, যা ১৯৭৬ সালের ইতালীয় কোন ওয়েটারের রুচিবোধের কাছেও মিউজিয়ামের মত মনে হতে পারে।’

‘আমার জীবনে এর চেয়ে খারাপ খাওয়ার সুযোগ হয়নি । খুব সামান্য মাপে না, আমি আসলেই বোঝাতে চাইছি, সবচেয়ে খারাপ, নিঃসন্দেহে সবচেয়ে জঘন্য।’

‘(যা) দেখতে ক্ষুদ্রাকার কোনো সামুদ্রিক খনি, আমার জীবনে স্বাদ নেয়া সবচেয়ে জঘন্য জিনিস, যা আমার শৈশবে কেঁচো খাওয়ার স্বাদকেও হার মানায়।’

এই ধরনের ভাষার তুলনায় ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ বইয়ে ব্যবহৃত সবচেয়ে কর্কশতম ভাষাও আসলেই অনেক পোষ মানানো, মৃদুভাবাপন্ন, যদি সেটাকেও কারো অসহিষ্ণু মনে হয়, তাহলে সেজন্য দায়ী, প্রায় বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত (ডগলাস অ্যাডামসের এ বিষয়ে উদ্ধৃতিটি লক্ষ করুন প্রথম অধ্যায়ে) যে, ধর্মীয় বিশ্বাসকে সবসময়ই বিশেষ মর্যাদার আসনে আসীন রাখতে হবে, যা কিনা যে কোন ধরনের সমালোচনার উর্ধে। ঈশ্বরকে অপমান করার তুলনায় কোনো একটা রেষ্টুরেন্টকে অপমান করা আসলেই অতি তুচ্ছ মনে করা হয়। কিন্তু রেষ্টুরেন্ট বা সেখানে কর্মরত শেফদের কিন্তু বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং তাদের অনুভূতি আছে, যেখানে আঘাত লাগতে পারে। অন্যদিকে ব্লাসফেমী বা ধর্মনিন্দা হচ্ছে, একটি বুদ্ধিদীপ্ত বাম্পার স্টিকার যেমন বলে, ‘ভিক্টিম বা শিকারহীন একটি অপরাধ’।

১৯১৫ সালে ব্রিটিশ সংসদ সদস্য হোরেশিও বটোমলি যেমন প্রস্তাব করেছিলেন, ‘যুদ্ধের পর (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ), কোনোদিন আপনি যদি লক্ষ করেন, রেষ্টুরেন্টে আপনার খাবার পরিবেশন করছে কোনো জার্মান পরিবেশক, আপনি তার কুৎসিত মুখের দিকে স্যুপ ছুড়ে মারবেন। আপনি যদি লক্ষ করেন কোনো জার্মান কেরানীর পাশে আপনি বসে আছেন, আপনি তার কুৎসিত মাথার উপর কালির পট উল্টো করে ঢেলে দেবেন।’... বেশ এটাই হচ্ছে কর্কশ আর অসহিষ্ণুতার ভাষা (এবং আমার ভাবা উচিত ছিল, এমন কি তার সেই সময়ে এই কথাগুলো হাস্যকরও ছিল, কোন কাজে আসেনি); এর সাথে অধ্যায় ২ এর শুরুর পংক্তিটার বৈপরিত্যটা খেয়াল করুন। যে অনুচ্ছেদটিকে তীব্র হিংসাত্মক, কঠোর আর তীব্র অপমানজনক হিসাবে প্রায়ই উদাহরণ দেয়া হচ্ছে। আমার পক্ষে বলা ঠিক না যে তীক্ষ্ণ তীব্রতার সাথে কোনো বাক্যবান ছোড়ার বদলে, বরং পাকাপোক্ত ভাষায় আর হাস্যকৌতুকের সাথে আমার মূল বক্তব্যটাকে তুলে

ধরবার প্রয়াসে আমি কতটুকু সফল হয়েছি। কোনো উন্মুক্ত সভায় জনসাধারণের জন্য ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ থেকে পাঠ করার সময় অবধারিত ভাবে এই অনুচ্ছেদটি শ্রোতাদের হাস্যরসের কারণ হয়। সে কারণে আমি এবং আমার স্ত্রী এই অনুচ্ছেদটা ব্যবহার করি নতুন শ্রোতাদের সাথে প্রাথমিক শীতলতা কাটাতে। আমি যদি ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করি কেন এই হাস্যরস কাজ করে, আমার মনে হয় এটি মানানসই একটি সম্পর্কর কারণে, এর মূল বিষয়টি, যা তীব্র সমালোচনা পূর্ণ কর্কশ ভাষায় আরো কুৎসিতভাবে প্রকাশ করা যেত অথচ সেখানে সত্যিকারভাবে ছদ্মবিজ্ঞতার ল্যাটিন নানা শব্দ ব্যবহার করে এই দীর্ঘ তালিকা তৈরি করা হয়েছে (যেমন, Filicidial, Megalomaniacal, Pestilential); এখানে আমার মডেল হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম সেরা রসিক লেখক ইভলীন ওয়াহ (২৪), কেউই যাকে কর্কশ আর তীব্রভাষা ব্যবহারের অপবাদ দিতে পারবে না (আমি এমনকি তার নামও প্রকাশ করে দিয়েছি এর পরের অনুচ্ছেদে একটি ঘটনার বিবরণ দেবার সময়ে)।

কোনো বই কিংবা থিয়েটার সমালোচকরা খুবই ব্যঙ্গাত্মকভাবে নেতিবাচক হতে পারেন এবং তাদের সেই সব ব্যবচ্ছেদ করা সমালোচনার জন্য তাদের বেশ প্রশংসাও জোটে। কিন্তু যখনই ধর্মের সমালোচনা করা হয়, তখন সেখানে এমনকি সুস্পষ্ট যৌক্তিকতা ও স্বচ্ছতা কোনো ভালো গুণ হিসাবে বিবেচ্য হয়না এবং আক্রমণাত্মক আর শত্রুভাবাপন্ন বিদ্বেষপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। একজন রাজনীতিবিদ তার প্রতিপক্ষকে নির্দয়ভাবে সমালোচনা করতে পারেন আক্রমণাত্মক ভাবে সংসদে দাড়িয়ে এবং তার এই দৃঢ় আক্রমণ আর হিংস্র ভাষার জন্য তিনি তার সহকর্মীদের স্বশব্দ সমর্থন আর উৎসাহ পান। কিন্তু কোন ভদ্র যৌক্তিক ধর্মের সমালোচককে সেই কথাগুলো বলতে দিন, যা কিনা অন্য কোনো প্রসঙ্গে বিবেচিত হতো শুধু সরাসরি কিংবা স্পষ্টবাদী হিসাবে, সেটাই এ ক্ষেত্রে বর্ণিত হবে আক্রমণাত্মক অসহিষ্ণু ভাষা হিসাবে। ভদ্র সমাজ ছি ছি করবে আর তাদের মাথা ঝাকাবে; এমনকি ভদ্র, সেক্যুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ তারাও, বিশেষ করে সেক্যুলার সমাজের সেই অংশ যারা কিনা ভালোবাসেন বলতে.. ‘আমি নিরীশ্বরবাদী.. কিন্তু...।’

আপনি কেবল সমমনা মানুষেদের কাছে তাদের জানা কথাই প্রচার করছেন, এর কি কোন অর্থ আছে ?

শুধুমাত্র RichardDawkins.net এর convert's corner, এই দাবীটিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। কিন্তু যদি প্রশ্নটি কেবল প্রশ্নের স্বার্থে গ্রহন করা হয়, সেক্ষেত্রে এর উত্তরে বেশ কিছু বলার আছে। একটি হচ্ছে ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের সংখ্যা কিন্তু অনেক বিশাল, অনেকেই সাধারণত যা মনে করে থাকেন, তার চেয়েও অনেক বেশি। বিশেষ করে

যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু আবারো, বিশেষ করে, এই যুক্তরাষ্ট্রে এই অবিশ্বাসীরা হচ্ছে মূলত লুকিয়ে থাকা অবিশ্বাসী, এবং তাদের বের করে আনার জন্য খানিকটা উৎসাহর একান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে বই স্বাক্ষর দেবার অনুষ্ঠান নিয়ে উত্তর আমেরিকা ভ্রমণের সময় নানা জায়গা থেকে পাওয়া ধন্যবাদের পরিমাণ দেখে তা সহজে অনুমেয়। স্যাম হ্যারিস (২৫), ড্যান ডেনেট (২), ক্রিষ্টোফার হিচেন্স (২৭) এবং আমি এই ধরনের মানুষগুলোকে যেভাবে উৎসাহ যোগানোর সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতাও পেয়েছি প্রচুর।

সমমনা মানুষদের গ্রুপের কাছে এই কথা প্রচার করার আরো একটি সূক্ষ্ম কারণ হচ্ছে, তাদের সচেতনতার স্তরটি বাড়ানোর প্রয়োজন। যখন নারীবাদীরা আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন লিঙ্গবৈষম্যমূলক সব সর্বনামগুলো ব্যবহারের ব্যপারে, তারাও তখন তাদের প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষদের কাছে তাদের মতামত প্রকাশ করেছিল গুরুত্বপূর্ণ কিছু নারী অধিকার, এবং তাদের প্রতি বৈষম্যের কুফলগুলো তুলে ধরার মাধ্যমে, কিন্তু সেই সুশীল সমাজের সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন ছিল তাদের দৈনন্দিন ভাষায়। অধিকার আর বৈষম্য বিষয়ে নৈতিক অবস্থানে আমরা যতই দৃঢ়সংকল্প হই না কেন, তারপরও আমরা ভাষার শব্দগত ব্যবহারে সেই বৃত্তেই বন্দী থাকি, যেখানে মানব জাতির অর্ধেক অংশ অনুভব করেছিল তারা বঞ্চিত।

পুরুষবাদী সর্বনাম ছাড়া আরো ভাষাগত অন্যান্য কিছু প্রচলিত ব্যবহার আছে এবং সেখানে নিরীশ্বরবাদীরাও বাদ পড়েন না। আমাদের সবারই প্রয়োজন আছে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য। নিরীশ্বরবাদী এবং বিশ্বাসীরা উভয়ই অবচেতনভাবেই সমাজের প্রচলিত ধারাকে অনুসরণ করেন, যার ফলে নম্র আর শ্রদ্ধার সাথে আমরা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আচরণ করে থাকি। এবং আমি কখনোই ক্লান্ত হবো না সেই বিশেষ ক্ষেত্রে, যেখানে সমাজের নীরব সম্মতি, যা শিশুদের তাদের পিতা-মাতার ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে চিহ্নিত করে। আর অবিশ্বাসীদের এই অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠতে হবে: ধর্মীয় মতামত হচ্ছে পিতামাতার এক ধরনের মতামত - প্রায় সর্বজনীনভাবে যা স্বীকৃত - যা কিনা শিশুদের উপর চাপিয়ে দেয়া যায়, যারা সত্যিকারভাবেই বয়সে এত ছোটো যে তাদের নিজের মতামত কি সেটাই তারা জানে না, বা বোঝে না। খ্রিস্টান শিশু বলে কিছু নেই: আছে শুধু খ্রিস্টান বাবা ও মায়ের সন্তান। যখনই সুযোগ পান, বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করুন।

আপনি যাদের সমালোচনা করছেন, আপনি কিন্তু ঠিক তাদের মতোই মৌলবাদী:

মোটেও না, দয়া করে এমন তুলনা করবেন না, কোনো বিষয়ের প্রতি সত্যিকারের তীব্র আবেগময় আগ্রহ যা কিনা পরিবর্তন হতে পারে, তার সাথে মৌলবাদের তুলনা করে খুব

সহজে ভুল করা হয়, যা কখনোই তার মত বদলায় না। গোঁড়া মৌলবাদী খ্রিস্টানরা বিবর্তনের ধারণাটির ঘোর বিরোধী, আমি যেমন এর ঘোর সমর্থক। আমাদের এই ক্ষেত্রে প্রায় একই অবস্থান, এবং সেটাই অনেকের মতে আমরা সমানভাবে মৌলবাদী এমন একটি ধারণার জন্ম দেয়। কিন্তু একটি প্রবাদ বাক্য দিয়ে যদি বিষয়টি বোঝাতে চাই (যদিও প্রবাদ বাক্যটির মূল উৎস আমি শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছি), তা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দুটি মতের দৃষ্টিভঙ্গি যখন একই দৃঢ়তার সাথে প্রকাশ করা হয়, তখন সত্যকে এর মাঝামাঝি কোন অবস্থানে থাকতে হবে এমন কোন আবশ্যিকতা নেই। খুব সম্ভবত এর কোনো একটি ভুল, আর এটি অন্যপক্ষের তীব্র আবেগময় অবস্থানের যথার্থতার জন্য যথেষ্ট।

মৌলবাদীরা জানেন তারা কি বিশ্বাস করেন এবং তারা এটাও জানেন কোনো কিছুই তাদের মন পরিবর্তন করতে পারবে না। এই বইয়ে উল্লেখিত কার্ট ওয়াইজ (২৭) এর একটি উদ্ধৃতি সব বলে দিচ্ছে : ‘সারা মহাবিশ্বের সকল প্রমাণ যদি ক্রিয়েশনিজম বা সৃষ্টিতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধেও থাকে, আমি প্রথম তা স্বীকার করবো, কিন্তু তারপরও আমি সৃষ্টিতত্ত্ববাদী থাকবো, কারণ ঈশ্বরের নিজের কথা সেটাই ইঙ্গিত করছে, এটাই আমার অবস্থান।’ বাইবেল নির্ভর মৌলবাদের সাথে একই রকম বিজ্ঞানীদের প্রমাণের জন্য আবেগময় অবস্থানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যটি চিহ্নিত করার বিষয়টি উপর গুরুত্ব আরোপ করা অত্যন্ত প্রয়োজন, আর এর প্রয়োজনীয়তা কখনোই হ্রাস পায় না। মৌলবাদী কার্ট ওয়াইজ দাবী করছেন, মহাবিশ্বের কোনো প্রমাণই পারবে না তার মন পরিবর্তন করাতে। একজন সত্যিকারের বিজ্ঞানী, তিনি যতই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করুন না কেন বিবর্তন প্রক্রিয়ার সত্যতার উপর, তিনি খুব ভালো করেই জানেন তার মন পরিবর্তনের জন্য কোন জিনিসটা জরুরী: সেটা হচ্ছে প্রমাণ। যেমন, জে. বি. এস. হলডেন (২৮) বলেছিলেন, তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বিবর্তনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ কি হতে পারে? ‘প্রি-ক্যামব্রিয়ান (২৯) পর্বের শিলাস্তরে খরগোশের জীবাশ্ম’। কার্ট ওয়াইজের বিপরীত আমাকে আমার মত করে একটি ম্যানিফেস্টো তৈরি করতে দিন : যদি মহাবিশ্বের সব প্রমাণ সৃষ্টিতত্ত্ববাদের সপক্ষে প্রমাণিত হয়, তা স্বীকার করার জন্য আমি হবো প্রথম ব্যক্তি, এবং আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার মন পরিবর্তন করবো। তবে বর্তমানে যে তথ্য আমাদের হাতে আছে, যে প্রমাণ জড়ো করা হয়েছে (এবং তার পরিমাণ বিশাল) সেগুলো বিবর্তনের সপক্ষে । এবং এই কারণে, শুধু এই কারণে আমি বিবর্তনের সপক্ষে এত আবেগের সাথে তর্ক করি, সেই আবেগ যারা এর বিপক্ষে তর্ক করেন তাদের কাছে তীব্র আবেগের মত মনে হয়। আমার এই অবস্থান প্রমাণের উপর ভিত্তি করে, আর তাদেরটা প্রমাণের মুখে খুড় কুটোর মতোই উড়ে যায়, সেকারণেই তা সত্যিকারের মৌলবাদী অবস্থান।

আমি নিজে একজন নিরীশ্বরবাদী, তবে ধর্ম কোনদিনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না; সুতরাং এটা মেনে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করুন :

'আপনি ধর্মকে উপড়ে ফেলতে চান, বেশ চেষ্টা করুন, আপনি ভাবছেন আপনি ধর্মকে উচ্ছেদ করতে পারবেন? কোন গ্রহে আপনি বাস করেন? ধর্ম এর একটি স্থায়ী অংশ, ব্যপারটা মেনে নেবার চেষ্টা করুন।' আমি এই সব নেতিবাচক কথা হয়তো সত্যিই হজম করতে পারতাম, যদি কিনা সেগুলো উচ্চারণ করা হতো নিদেনপক্ষে কিছুটা অনুশোচনা বা চিন্তিত স্বরে বরং এই কণ্ঠস্বরগুলো মাঝে মাঝেই উল্লাসময়তায় পরিপূর্ণ । আমি মনে করি না এটি মর্ষকামী। খুব সম্ভবত আমরা আবার একে সেই বিশ্বাসে বিশ্বাস করার ধারণার ছাঁচে ফেলতে পারি। এই মানুষগুলো নিজেরা ধর্ম না মানলেও, তারা অন্য মানুষরা যে ধর্ম মানে এই বিষয়টি ভালোবাসেন। এরপর আমি শেষ ধরনের বিরুদ্ধবাদীদের কথায় আসি।

আমি নিজে নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু মানুষের ধর্মের প্রয়োজন আছে :

ধর্মের জায়গায় আপনি তাহলে কি বসাবেন, আপনি কিভাবে শোকাহত মানুষকে সান্ত্বনা দেবেন? আপনি তাদের সেই প্রয়োজন কি দিয়ে পূর্ণ করবেন?'

বাহ! নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবার কি অহংবোধ। আমি এবং আপনি অবশ্যই, যথেষ্ট বুদ্ধিমান, যথেষ্ট শিক্ষিত যাদের ধর্মের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষ, সংখ্যাগরিষ্ঠ 'আম জনতা', সেই অরওয়েলিয় প্রোলরা (৩০), হাক্সলি'র ডেল্টা (৩১), এপসিলন (৩২) আধা মুর্খদের শুধু ধর্মের প্রয়োজন আছে । বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের একটি বক্তৃতার কথা আমার মনে পড়ছে এবং যেখানে আমি তীব্রভাবে বিজ্ঞানকে অতিসরলীকরণ বা বোধগম্য করার প্রচেষ্টার (বা ডাম্বিং ডাউন) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মন্তব্য করেছিলাম। এবং শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বের সময়ে উপস্থিত দর্শকশ্রোতাদের সারিতে একজন উঠে দাড়িয়ে প্রস্তাব করেন যে, নারী ও সংখ্যালঘুদের বিজ্ঞানে স্বাগতম জানানোর জন্য এই ধরনের সরলীকরণের প্রয়োজন আছে। তার কণ্ঠস্বর স্পষ্টভাবেই বলে দিচ্ছিল, তিনি আন্তরিকভাবে নিজেকে আসলেই উদারপন্থী আর প্রগতিশীল বলেই ভাবছেন । আমি শুধু কল্পনা করতে পারি দর্শকের সারিতে থাকা নারী ও সংখ্যালঘুরা এই মন্তব্য শুনে তার সম্বন্ধে কি ভাবতে পারেন।

মানব জাতির সান্ত্বনার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটাতে ফিরে আসি, অবশ্যই এটা সত্যি, কিন্তু মহাবিশ্ব আমাদের সান্ত্বনা দিতে বাধ্য এমন কোনো কিছু ভাবার ব্যপারটা কি খুব ছেলেমানুষী মনে হয় না? আর অধিকার, আইজাক আজিমভ (৩৩) অপবিজ্ঞানের এই

ধরনের শিশুসুলভ মানসিকতা সংক্রান্ত মন্তব্যটি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য: ‘অপবিজ্ঞানের প্রতিটি অংশ ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন এবং আপনি সেখানে নিরাপত্তার একটা চাদর দেখতে পাবেন, পাবেন চোষার উপযোগী একটি বৃদ্ধাঙ্গুল, বা ধরার জন্য কোনো মায়ের আচলের প্রান্ত।’ উপরন্তু আরো যে বিষয়টি বিস্ময়কর, সেটি হচ্ছে কত অগণিত মানুষ বুঝতে পারেন না যে, ‘ক’ মনে শান্তি দেয়, সান্ত্বনা দেয়’ ঠিক আছে, তবে এর মানে ‘ক’ সত্য তা কিন্তু নয়।

একই ধরনের একটি আবদার দাবী করে জীবনের একটি ‘উদ্দেশ্য’ বা লক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর। কানাডার এক সমালোচকের মন্তব্যকে উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ‘ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যপারে নিরীশ্বরবাদীরা হয়তো সঠিক হতে পারেন, কে বলতে পারে তা? কিন্তু ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক, এটা তো স্পষ্ট যে মানুষের আত্মার প্রয়োজন আছে এমন একটি বিশ্বাসের, যে আমাদের জীবনের একটি অর্থ আছে যা বস্তুবাদী বাস্তব জগতকেও অতীন্দ্রিয় একটি অনুভূতিতে স্পর্শ করে। যে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, আপনার-চেয়ে-যুক্তবাদী প্রক্রিয়াটিরই অভিজ্ঞতাবাদী, যেমন ডকিন্স হয়তো মানব চরিত্রের এই অপরিবর্তনযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি বুঝতে পারবেন... আসলেই কী ডকিন্স মনে করেন যে এই পৃথিবী আরো বেশি মানবিক স্থান হবে যদি আমরা সবাই বাইবেলের পরিবর্তে সত্য, সান্ত্বনা আর শান্তির জন্য ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ বইটির প্রতি দৃষ্টি দেই ।’

আসলেই হ্যাঁ, যেহেতু আপনি ‘মানবিক’ কথাটা উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ, আমি তাই মনে করি, কিন্তু আমি আবারো বলছি, আরো একবার, কোনো একটি বিশ্বাসের সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা কিন্তু এটির সত্য হবার গুণাবলী বৃদ্ধি করে না। অবশ্যই আমি অস্বীকার করছি না যে, মানসিক সান্ত্বনার কোনো প্রয়োজন নেই। এবং আমি দাবী করতে পারি না, যে বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি আমি এই বইটিতে প্রকাশ করেছি তা হয়তো কোনো শোকার্তকে মাঝারী মাত্রার চেয়ে বেশি সান্ত্বনা দিতে পারবে। কিন্তু ধর্ম যে সান্ত্বনার বাণী দিচ্ছে তা যদি হয় স্নায়ুবৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব কোনো একটি প্রস্তাব, যেমন, আমাদের মস্তিষ্কের মৃত্যু হলেও আমরা আসলে বেঁচে থাকি, সেটা কী আপনি আসলেই আমাকে সমর্থন করতে বলছেন? যাই হোক, আমার মনে হয়না কোনো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে এমন কারো সাথে আমার কখনো দেখা হয়েছে যিনি স্বীকার করেননি মূল প্রার্থনার চেয়ে ধর্মীয় নয় এমন অংশগুলো যেমন, স্মৃতিচারণ, স্তুতিবাক্য পাঠ বা মৃত ব্যক্তির প্রিয় কবিতা পাঠ বা সঙ্গীত বাজানো, অনেক বেশি আবেগময় আর হৃদয়স্পর্শী।

‘দ্য গড ডিল্যুশন’ পড়ার পর, ডেভিড অ্যাশটন, একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক, ২০০৬ এর বড় দিনে তার সতেরো বছরের ছেলে ল্যুকের আকস্মিক মৃত্যুর বিষয়ে আমাকে একটি

চিঠি লিখেছিলেন। ল্যুকের মৃত্যুর কিছুদিন আগে তারা দুজনে যুক্তি এবং বিজ্ঞানকে উৎসাহ দেবার জন্য আমার শুরু করা দাতব্য প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে প্রশংসাসূচক আলোচনা করেছিলেন। আইলে অব মানে (৩৪) ল্যুকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে, তার বাবা উপস্থিত সবাইকে প্রস্তাব করেছিলেন, যদি তারা কেউ কোনোভাবে ল্যুকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কিছু দান করতে চান, তারা যেন সেটি রিচার্ড ডকিন্সের ফাউন্ডেশনে অনুদান হিসাবে পাঠিয়ে দেন, যা ল্যুক নিজেও চাইতো। প্রায় দুই হাজার পাউন্ডের প্রায় ত্রিশটি চেক আমি পেয়েছিলাম, যার মধ্যে ৬০০ পাউন্ডের একটি চেক ছিল স্থানীয় পানশালায় তোলা একটি চাঁদারও। কোনো সন্দেহ নেই ছেলেটিকে সবাই ভালোবাসতো। যখন আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ধারাবিবরণী পড়েছি, আক্ষরিক অর্থেই আমি কেঁদেছিলাম (যদিও ল্যুকের সাথে আমার কখনো দেখা হয়নি) এবং আমি সেটিকে richarddawkins.net সাইটে প্রকাশ করার জন্যে অনুমতি চেয়েছিলাম। একজন বংশীবাদক তার বাঁশীতে বাজাচ্ছেন ম্যাঙ্গস (৩৫) দুঃখ প্রলাপ, এলেন ভানিনের (৩৬) সুর, যার আবহে দুই বন্ধু পাঠ করছে স্তুতি কাব্য, ডাঃ অ্যাশটন নিজেও আবৃত্তি করেছেন ডিল্যান টমাসের (৩৭) সুন্দর কবিতা 'ফার্ন হিল' (Now as I was young and easy, under the apple boughs - অসময়ে হারিয়ে যাওয়া তারুণ্যের প্রতি হৃদয়স্পর্শী শব্দমালা) এবং তারপর আমার আবেগে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে বলতে যে, তিনি আমার 'আনউইভিং দি রেইনবো' (৩৮) বইটির শুরুর অনুচ্ছেদটি পাঠ করেছিলেন, যে পংক্তিগুলোকে আমি আমার নিজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পাঠ করা হবে বলে চিহ্নিত করে রেখেছি।

অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে, তবে আমার সন্দেহ অনেক মানুষের এভাবে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকার কারণ কিন্তু ধর্মের সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতার জন্য না বরং আসলেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা তাদের বঞ্চিত করেছে, এবং তাদের কোনো ধারণাই নেই যে, অবিশ্বাস করাটাও একটি উপায় হতে পারে। এটি অবশ্যই সত্যি বহু মানুষের জন্য, যারা মনে করেন তারা আসলেই সৃষ্টিতত্ত্ববাদী। তাদেরকে আসলেই কোনোদিনও ভালোভাবে ডারউইনের দুর্দান্ত বিস্ময়কর বিকল্পটি শেখানোই হয়নি। সম্ভবত সেই অপমানজনক পূরাণটির ক্ষেত্রেও এটি একইভাবে সত্য, যা দাবী করে মানুষের ধর্ম 'প্রয়োজন'। ২০০৬ সালে একটি সম্মেলনে একজন নৃতত্ত্ববিদ (একটি আমি নিজে নিরীশ্বরবাদী, কিন্তু..... এর চমৎকার নমুনা), গোল্ডা মেয়ারের (৩৯) একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছিলেন, একবার যখন গোল্ডা মেয়ারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'আমি ইহুদী জনগণকে ভালোবাসি, আর ইহুদী জনগণ ঈশ্বরকে ভালোবাসে”। এরপর আমাদের সেই নৃতত্ত্ববিদ সেখানে তার নিজের সংস্করণ তৈরি করে বলেন: 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, আর মানুষ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে'। আর আমি যা বলতে চাইবো তা হলো, 'আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, এবং প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা আর উৎসাহ দিয়ে, তাদের যদি নিজেদের মাথা খাঁটিয়ে চিন্তা

করার মত প্রয়োজনীয় তথ্য যা বর্তমানে আমাদের কাছে আছে তা দিতে পারি, প্রায়শই আমরা দেখবো তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেই পরিপূর্ণ আর সন্তুষ্টির জীবন কাটাচ্ছে, যা - আসলেই - 'মুক্ত' একটি জীবন।

এই নতুন পেপারব্যাক সংস্করণে আমি কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও কিছু ভুল সংশোধন করার সুযোগ নিয়েছি যেগুলোর প্রতি আগের শক্ত বাঁধাই সংস্করণের পাঠকেরা অনুগ্রহ করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

টীকা:

(১) http://www.amazon.co.uk/

(২) ড্যানিয়েল ক্লেমেন্ট ডেনেট (৩য়) (জন্ম মার্চ ২৮,১৯৪২) যুক্তরাষ্ট্রের একজন দার্শনিক, লেখক এবং কগনিটিভ বিজ্ঞানী। ড্যান ডেনেট এর গবেষণার ক্ষেত্র মনোজগতের দর্শন, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানের দর্শন।

(৩) নাস্তিবাদী বা নিহিলিজম হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রচলিত,ধ্যান ধারণা, নৈতিকতা, বিশ্বাস সবকিছুকে অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়।

(৪) ক্লাইভ স্টেপলস লিউইস (১৮৯৮-১৯৬৩), যিনি পরিচিত সি. এস. লিউইস নামে; উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেলফাস্টে জন্ম নেয়া কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্য সমালোচক, প্রাবন্ধিক, সখের ধর্মতাত্ত্বিক এবং খ্রিস্ট ধর্ম সমর্থনবাদী।

(৫) অ্যানথনি ক্লিফোর্ড (এ সি) গ্রেলিঙ (জন্ম ১৯৪৯) ব্রিটিশ দার্শনিক ও লেখক।

(৬) পল কার্টজ (১৯২৫-২০১২), দার্শনিক, আমেরিকার সুপরিচিত সন্দেহবাদী বা স্কেপটিকস ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী। তাকে সেক্যুলার হিউমানিজম এর জনক হিসাবে আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে।

(৭) স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (জন্ম ১৯৩৩) আমেরিকার তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক। আব্দুস সালাম ও শেলডন গ্ল্যাশো'র সাথে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৯ সালে।

(৮) টমাস অ্যাকোয়াইনাস (১২২৫-১২৭৪), ক্যাথলিক যাজক, অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক।

(৯) জন ডানস স্টোটাস (১২৬৬-১৩০৮) উত্তর মধ্যযুগের অন্যতম প্রভাবশালী ধর্মতত্ত্বের দার্শনিক।

(১০) ইয়োহানেস স্কোটাস ইরিজানা (৮১৫ - ৮৭৭) আইরিশ ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক।

(১১) কার্ল রাহনার, জার্মান জেসুইট যাজক এবং ধর্মতাত্ত্বিক, যাকে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্মতাত্ত্বিক মনে করা হয়।

(১২) হুরগেন মোল্টমান (জন্ম ১৯২৬) জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক, আধুনিক ধর্মতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

(১৩) স্টিফেন উইলিয়াম হকিং (জন্ম ১৯৪২) ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, কসমোলজিষ্ট।

(১৪) পল যাকারী (পি যি) মায়ারস (জন্ম ১৯৫৭), জীববিজ্ঞানী এবং ফ্যারিঙ্গুলা বিজ্ঞান ব্লগের প্রতিষ্ঠা।

(১৫) http://freethoughtblogs.com/pharyngula/

(১৬)http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/12/24/the-courtiers-reply/

(১৭) ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার বা উড়ন্ত স্প্যাগেটি দানব হচ্ছে চার্চ অফ দি ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার বা পাসটাফারিয়ানিজম ধর্মের মূল দেবতা। এই আন্দোলনটি মূলত পাবলিক স্কুলে সৃষ্টিতত্ত্ববাদ বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন (বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করেছে কোনো বুদ্ধিমান সত্তা এমন মতবাদ) পড়ানোর বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন যা ধর্মকে উপহাস করে, যদিও এই ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের সত্যিকারের ধর্ম মনে করেন, কিন্তু গণমাধ্যমে এটি দেখা হয় মূলত একটি প্যারোডী ধর্ম হিসাবে। ২০০5 সালে ক্যানসাস স্কুল বোর্ডের কাছে লেখা ববি হেনডারসনের লেখা প্রহসন মূলক চিঠিতে প্রথম ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনষ্টারের বিষয়টি প্রথম উল্লেখিত হয়েছিল।

(১৮) একটি স্ট্র ম্যান বা straw man বা straw person কিংবা যুক্তরাজ্যে Aunt Sally যুক্তি হচ্ছে বিতর্কে ব্যবহৃত হয় এমন এক ধরনের যুক্তি এবং এক ধরনের ভ্রান্ত যুক্তি যা প্রতিপক্ষের অবস্থানকে প্রথমে ভুল ভাবে উপস্থাপন করে, এবং যখন বলা হয় to attack a straw man সেটা হচ্ছে আসলে একটি প্রস্তাব বা যুক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে বলে এমন একটি বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়। যেখানে মূল যুক্তিটির অনুরূপ কোনো যুক্তি যা মূল যুক্তির মত মনে হলেও সমতূল্য না (যেমন straw man, আসল মানুষের বদলে) এমন কোনো যুক্তি দিয়ে তা প্রথমে প্রতিস্থাপিত করা হয় এবং পরে সেই যুক্তিটিকেই খণ্ডন করা হয়, মূল যুক্তিটিকে পাশ কাটিয়ে; সাধারণত প্রকাশ্য গণবিতর্কে প্রায়ই স্ট্র ম্যান যুক্তির আবির্ভাব লক্ষ করা যায়। যেমন: একটি কাল্পনিক মাদক বিরোধী বিতর্ক দেখা যাক: (ক) আমাদের বিয়ার পানের ওপর আরোপিত আইনগুলো শিথিল করা উচিত।(খ) না, যে সমাজে মদ জাতীয় তরলের ব্যবহার করার উপর নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে কোনো কাজের নীতি বলে কিছু থাকে না, সেই সমাজে সাময়িক তৃপ্তি নিবারণ ছাড়া আর কিছু থাকে না। এখানে মূল প্রস্তাবটি হচ্ছে বিয়ার পানের উপর আইন শিথিল করা, কিন্তু 'খ' এই প্রস্তাবটি যা না তার চেয়ে বেশি বাড়িয়ে এমন একটি পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, সেখানে এই প্রস্তাবটি সমর্থন দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে, যেমন: অবাধে মদ্য জাতীয় তরল পানের সুযোগ। এটাই যৌক্তিক ভ্রান্তি, কারণ 'ক' কিন্তু কখনোই এই দাবী করেনি।

(১৯) টেড আর্থার হ্যাগার্ড (জন্ম ১৯৫৬), আমেরিকার একজন ইভানজেলিকাল যাজক, নিউ লাইফ চার্চ, কলোরাডো, ডেনভার এর প্রতিষ্ঠাতা।

(২০) জন লেমন ফলওয়োল সিনিয়র (১৯৩৩-২০০৭) আমেরিকার ইভানজেলিকাল যাজক, টমাস রোড ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠাতা যাজক।

(২১) মারিওন গর্ডন 'প্যাট' রবার্টসন (জন্ম ১৯৩০) আমেরিকার মিডিয়া মোগল, যাজক, ক্রিশ্চিয়ান ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্কের এর চেয়ারম্যান।

(২২) পল ইয়োহানেস টিলিখ (১৮৮৬-১৯৬৫) জার্মান আমেরিকান খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী ধর্মতাত্ত্বিক।

(২৩) ডিয়েট্রিখ বোনহয়েফার (১৯০৬-১৯৪৫) জার্মান যাজক, ধর্মতাত্ত্বিক, যিনি নাৎসিবাদের বিরোধী ছিলেন, কনফেশন চার্চের প্রতিষ্ঠাতা। তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে হত্যা করে নাৎসীরা।

(২৪) আর্থার ইভলিন সেইন্ট জন ওয়াহ (১৯০৩-১৯৬৬), পরিচিত ইভলিন ওয়াহ হিসাবে, ইংরেজ লেখক, সাংবাদিক ও সমালোচক।

(২৫) স্যামুয়েল বি.'স্যাম' হ্যারিস (জন্ম ১৯৬৭) আমেরিকার দার্শনিক, লেখক, স্নায়ুবিজ্ঞানী। সুপরিচিত পডকাস্ট ওয়েকিং আপ এর প্রতিষ্ঠাতা।

(২৬) ক্রিষ্টোফার এরিক হিচেন্স (১৯৪৯-২০১১) ব্রিটিশ আমেরিকান লেখক, সাংবাদিক, বিতার্কিক।

(২৭) কার্ট প্যাট্রিক ওয়াইজ, হার্ভার্ড প্রশিক্ষিত ভুতাত্ত্বিক যিনি ইয়ং আর্থ ক্রিয়েশনিষ্ট (যারা পৃথিবীর বয়স বাইবেলে জেনেসিসে বর্ণিত বয়সের সমান হিসাবে বিশ্বাস করেন (৫৭০০-১০,০০০ বছর)।

(২৮) জন বার্টন স্যান্ডারসন হলডেন (১৮৯২-১৯৬৪) ব্রিটিশ জিন বিজ্ঞানী (পরে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহন করেছিলেন), জিনতত্ত্ব, বিবর্তন জীববিজ্ঞানে তার বিশেষ অবদান আছে।

(২৯) প্রিক্যামব্রিয়ান (অথবা প্রি-ক্যামব্রিয়ান) পৃথিবী ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাসের দীর্ঘতম পর্ব। এটি বিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি, প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে থেকে ৫৪১ মিলিয়ন বছর আগের ক্যামব্রিয়ান পর্বের সূচনা পর্যন্ত, যে পর্বে শক্ত খোলশযুক্ত প্রাণীদের প্রথম ব্যাপক হারে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। প্রিক্যামব্রিয়ান পর্ব বলা হয় কারণ এটি ক্যামব্রিয়ান পর্বের আগে, প্রি-ক্যামব্রিয়ান পর্ব মোট ভূ-তাত্ত্বিক সময়ের ৮৮ শতাংশ। এই পর্বে কোনো স্তন্যপায়ীর প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

(৩০) ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েল (এরিক আর্থার ব্লেয়ার, ১৯০৩-১৯৫০) এর 'নাইনটিন এইটি ফোর' উপন্যাসে বর্ণিত কাল্পনিক দেশ ওসিয়ানিয়ার শ্রমিক শ্রেণী।

(৩১) অ্যালডস লিওনার্ড হাক্সলির (১৮৯৪-১৯৬৩) ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড উপন্যাসে বর্ণিত নিম্ন বর্ণের শ্রেণী।

(৩২) হাক্সলির ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড উপন্যাসে বর্ণিত আরো একটি নিম্ন বর্ণ, যারা শুধু মাত্র কায়িক পরিশ্রমের উপযুক্ত।
(৩৩) আইজাক আজিমভ, ১৯২০-১৯৯২, আমেরিকার জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক এবং বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়নের অধ্যাপক। তিনি প্রায় ৫০০ র বেশি বই লিখেছিলেন।
(৩৪) গ্রেট ব্রিটেইন ও আয়ারল্যান্ডের মধ্যবর্তী আইরিশ সাগরে একটি স্বায়ত্বশাসিত দ্বীপ (স্থানীয় ভাবে পরিচিত এলান ভানিন নামে)।
(৩৫) আইলে অব ম্যান এর স্থানীয় ভাষা।
(৩৬) এলেন ভানিন মাঙ্গস ভাষায় এর অর্থ আইল্যান্ড অফ ম্যান, এটি একটি কবিতার শিরোনাম, ১৮৫৪ সালে যেটি লিখেছিলেন Eliza Cravcer Green এবং পরে এর সুর দিয়েছিলেন সম্ভবত J. Townsen বা F. H. Townend
(৩৭) ডিল্যান টমাস (১৯১৪-১৯৫৩), ওয়েলশ কবি।
(৩৮) Richard Dawkins (1998). Unweaving the Rainbow: Houghton Mifflin.
(৩৯) গোল্ডা মেয়ার (১৮৯৮-১৯৭৮) ইসরায়েল এর চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী।

ভূমিকা

শৈশবে, আমার স্ত্রী তার স্কুল ঘৃণা করতেন এবং সবসময় চাইতেন যদি স্কুল ছেড়ে দেয়া সম্ভব হতো। বহু বছর পর, যখন তার বয়স বিশের কোঠায়, তিনি তার জীবনের এই অসুখী অধ্যায়টির কথা তার বাবা মাকে বলেছিলেন, এবং তার মা রীতিমত হতবাক হয়েছিলেন: ‘কিন্তু, মা, তুমি কেন আমাদেরকে সেটা আগে বলোনি?’ আর লালা’র উত্তর ছিল, আমার আজকের লেখার বিষয়, ‘কিন্তু আমার তো জানা ছিল না যে, আমি সেটা করতে পারি’।

‘আমার তো জানা ছিল না, আমি সেটা করতে পারি।’

আমি সন্দেহ করছি - নাহ, বরং আমি বেশ নিশ্চিৎভাবেই বলছি, অনেক মানুষ আছেন যারা কোনো না কোনো একটি ধর্মীয় আবহে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং সেই বিশ্বাসের আবহে তারা সুখী নন, হয়তো বিশ্বাসই করেন না বা ভাবেন তাদের সেই ধর্মের নামে কত অশুভ হিংস্রাত্মক কর্মকাণ্ড করা হয়েছে। সেই মানুষগুলো তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করার জন্যে হালকা একটি আকাঙ্ক্ষা অনুভব করেন এবং ইচ্ছা পোষণ করেন যদি তারা সেটি করতে পারতেন, কিন্তু তারা শুধু একটা জিনিস অনুধাবন করতে পারেন না তা হলো, তাদের সেই ধর্ম পরিত্যাগ করা কিন্তু একটি উপায় হতে পারে। আর আপনি যদি তাদের কেউ হন, তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই সচেতনতার স্তরটিকে উন্নীত করা; সচেতনতার স্তরটিকে এমনভাবে উন্নীত করা যেন কারো পক্ষে অবিশ্বাসী হওয়াটা একটি বাস্তবসম্মত ইচ্ছা হতে পারে, একটি সাহসী আর চমৎকার ইচ্ছা। আপনি একজন নিরীশ্বরবাদী হতে পারেন, যে কিনা সুখী, ভারসাম্যময়, নৈতিক এবং বৌদ্ধিকভাবে সৎ ও পরিপূর্ণ। এটি হচ্ছে সচেতনা বাড়ানোর লক্ষ্যে আমার প্রস্তাবিত বার্তাগুলোর প্রথমটি। আমি সচেতনতা বাড়াতে চাই আরো তিনটি উপায়ে, যে বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করছি ।

জানুয়ারী ২০০৬ এ আমি দুই পর্বের একটি প্রামাণ্য চিত্র উপস্থাপনা করেছিলাম ব্রিটিশ টেলিভিশনের (চ্যানেল ফোর) জন্যে, যার শিরোনাম ছিল Root of All Evil?, একেবারে শুরু থেকেই শিরোনামটি আমার পছন্দের ছিল না। ধর্ম একাই অশুভ সবকিছুর মূল কারণ না, কোনো একটি জিনিস একাই কোনো কিছুর একমাত্র কারণ হতে পারে না। কিন্তু জাতীয় পত্রিকাগুলোয় চ্যানেল ফোরের সেই অনুষ্ঠানটির বিজ্ঞাপন দেখে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। সেখানে নিউইয়র্কের ম্যানহাটন স্কাইলাইনের একটি ছবি ছিল, যার নীচে উপ-শিরোনামে লেখা ছিল, Imagine a world without religion; কিন্তু কি সংযোগ এ দুটির মধ্যে? ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার দুটোই ছবিতে স্পষ্টভাবেই উপস্থিত ছিল।

জন লেননের (১) সাথে কল্পনা (Imagine) (২) করুন ধর্ম ছাড়া এমন একটি পৃথিবী। কল্পনা করুন কোনো আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী ছাড়া একটি পৃথিবী, কোনো ৯/১১ (৩) বা ৭/৭ (৪) ছাড়া একটি পৃথিবী, কোনো ধর্মযুদ্ধ নেই, কোনো উইচ হান্ট বা ডাইনী আখ্যা দিয়ে নিরীহ মানুষ শিকার বা অবিশ্বাসীদের নিপীড়ন নেই, কোনো গোলবারুদের ষড়যন্ত্র নেই, কোনো ভারত পাকিস্তান ভাগাভাগি নেই, কোনো সার্ব/ক্রোয়াট/মুসলিম গণহত্যা নেই, যীশুর হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে কোনো ইহুদী নিপীড়ন নেই, কোনো উত্তর আয়ারল্যান্ড সমস্যা নেই, পারিবারিক সম্মান রক্ষার্থে কোনো হত্যাকাণ্ড বা অনার কিলিং নেই, কোনো চকচকে কোট পরা মাথায় ফোলানো চুলসহ টেলিভিশনের উন্মত্ত ধর্মযাজকের দল নেই, যারা বিশ্বাসপ্রবণ মানুষের মন সহজে ভুলিয়ে তাদের অর্থ শুষে নিচ্ছেন (তারা বলেন ঈশ্বর নাকি সবাইকে দিতে বলেছে

তাদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে)। কল্পনা করুন অতি প্রাচীন কোনো বৌদ্ধ মুর্তি বোমা মেরে গুড়িয়ে দেয়া তালিবানরা নেই, ধর্মনিন্দার অভিযোগে জনসমক্ষে শিরোচ্ছেদ করা হবে না কারো, নারীর চামড়ায় বেত্রাঘাত হবে না, সেই চামড়ার সামান্য কিছু অংশ প্রদর্শনের অভিযোগে। ঘটনাচক্রে আমার সহকর্মী ডেসমন্ড মরিস (৫) আমাকে জানিয়ে ছিলেন যে, জন লেননের এই অসাধারণ গানটি মাঝে মাঝে যুক্তরাষ্ট্রে গাওয়া হয় এর "অ্যান্ড নো রেলিজিয়ন টু" বাক্যটিকে বাদ দিয়ে। একটি সংস্করণ এমনকি এই পংক্তিটিকে বদলে "অ্যান্ড ওয়ান রেলিজিয়ন টু" করারও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করেছে ।

হয়তো আপনি মনে করেন অ্যাগনস্টিজম বা অজ্ঞেয়বাদ হচ্ছে সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত অবস্থান আর সেই নাস্তিক্যবাদ তো ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই আরো একটি গোঁড়া মতবাদ? তাই যদি হয়, তাহলে এই বইটির দ্বিতীয় অধ্যায় আপনার মন পরিবর্তন করতে সহায়তা করবে, আপনাকে বোঝানোর জন্য চেষ্টা করবে যে ঈশ্বর হাইপোথিসিস একটি বৈজ্ঞানিক অনুকল্প যা এই মহাজগত সংশ্লিষ্ট, যার বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে একই সন্দেহবাদীতার সাথে, যা আমরা অন্য অনেক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে মনে করি। হয়তো আপনি ভাবছেন বা আপনাকে শেখানো হয়েছে, দার্শনিক এবং ধর্মতাত্ত্বিকরা ঈশ্বরের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করার সপক্ষে বহু জোরালো যুক্তি প্রদান করেছেন। আপনিও যদি তা ভেবে থাকেন, হয়তো তৃতীয় অধ্যায়টি আপনি উপভোগ করবেন, সেখানে দেখবেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রস্তাবিত যুক্তিগুলো আসলেই চূড়ান্তভাবে দুর্বল যুক্তি। হয়তো আপনি ভাবছেন এটা অবশ্যম্ভাবী যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, তা না হলে এই পৃথিবী আর সব কিছুই বা আসলো কোথা থেকে? তাছাড়া কিভাবেই বা উৎপত্তি হলো জীবনের.. এর সব সমৃদ্ধতা, বৈচিত্র্যময়তাসহ, যেখানে প্রতিটি প্রজাতিকে দেখলে বিলক্ষণ মনে হয় যে, তাদের বিশেষভাবে পরিকল্পনা বা ডিজাইন করে বানানো হয়েছে? যদি আপনার চিন্তা এই ধরনের হয়ে থাকে, আমি আশা করি আপনি চতুর্থ অধ্যায় থেকে বেশ কিছু শিক্ষণীয় বিষয় জানতে পারবেন, যে অধ্যায়ের বিষয়, কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব কোনো ঈশ্বর নেই। একজন স্বর্গীয় পরিকল্পকের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ তো দূরের কথা, আরো অনেক কার্যকরী উপায়ে ও বিস্ময়কর সৌন্দর্যের সাথে জীবজগতে ডিজাইনের বিভ্রমকে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আর যখন জীব-জগতের বৈচিত্র্যকে ব্যাখ্যা করতে প্রাকৃতিক নির্বাচন নিজে সীমাবদ্ধ, এটি আমাদের সচেতনাতার স্তরকে উন্নীত করে সমরূপ ব্যাখ্যার সেই 'ক্রেইনের'(৭) স্তরে, যা মহাজগতকে বুঝতে আমাদের সহায়তা করে। এই রূপক 'ক্রেইনের' শক্তি, যেমন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, হচ্ছে আমার চারটি সচেতনতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার দ্বিতীয়টি।

হয়তো আপনি মনে করেন অবশ্যই ঈশ্বর বা ঈশ্বরদের প্রয়োজন আছে কারণ নৃতাত্ত্বিক আর ইতিহাসবিদরা তাদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, ঈশ্বর বিশ্বাসীরা সব মানব সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আপনি যদি তা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তাহলে পঞ্চম অধ্যায়টি পড়ুন, ধর্মের মূল বা শিকড়, এর উৎপত্তি সংক্রান্ত যে অধ্যায়টি ব্যাখ্যা করেছে কেন ধর্ম বিশ্বাসের উপস্থিতি সর্বব্যাপী। বা আপনি কি মনে করেন কোনো যুক্তিযুক্ত নৈতিকতাবোধ থাকার জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পূর্বশর্ত? আমাদের কি ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই, ভালো হবার জন্য? তাহলে দয়া করে অধ্যায় ৬ ও ৭ পড়ে দেখুন, কেন বিষয়টি যে তা নয় সেটি বোঝার জন্য। আপনার কি এখনো কিছুটা দুর্বলতা আছে, আপনি কি ভাবেন ধর্ম পৃথিবীর জন্য ভালো, এমন কি আপনি নিজে এর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। অধ্যায় ৮ আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে এমনভাবে চিন্তা করতে যে, যেখানে ধর্ম আদৌ এই পৃথিবীর জন্য ভালো কিছু নয়। আপনি যদি আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের মধ্যে নিজেকে আটক বলে অনুভব করেন, আমার মনে হয় আপনার নিজেকে প্রশ্ন করার একটি প্রয়োজনীয়তা আছে, কেমন করে বিষয়টি ঘটলো। এর উত্তর হলো এটি শৈশবে দীক্ষা নেবার মত একটি ব্যপার। আপনি যদি ধার্মিক হন আদৌ, প্রবলতম সম্ভাবনা আছে যে, আপনার ধর্ম আর আপনার বাবা-মার ধর্ম একই। আপনি যদি যুক্তরাষ্ট্রের আরকানসাসে জন্ম নেন এবং মনে করেন খ্রিস্ট ধর্ম সত্যি আর ইসলাম মিথ্যা এবং আপনার খুব ভালোভাবেই জানা আছে আপনি ঠিক এর বিপরীতটাই ভাবতেন যদি আফগানিস্থানে আপনার জন্ম হতো। আপনি শৈশবে ধর্ম দীক্ষার শিকার, বিপরীতমুখী চিন্তার জন্য শুধু যা পরিবর্তন করা প্রয়োজন, সেটি হলো, আপনি কোথায় কোন পরিবেশে জন্ম নিয়েছেন।

শৈশবে ধর্মের দীক্ষা দেবার পুরো ব্যপারটাই অধ্যায় ৯ এর মূল বিষয়, যা আমার তৃতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার উপাদান। ঠিক যেভাবে নারীবাদীরা নড়ে চড়ে বসেন যখন তারা He শোনেন 'He অথবা She' একসাথে শোনার বদলে বা Human এর বদলে শুধু men। আমি আশা করি সবাই যেন ঠিক একই ভাবে বিব্রত বোধ করেন যখনই আমরা এমন কোনো বাক্য শুনি যেমন 'ক্যাথলিক; শিশু বা 'মুসলিম' শিশু বরং আপনি চাইলে বলতে পারেন, 'ক্যাথলিক' পিতা-মাতার সন্তান। কিন্তু যদি আপনি কখনো শোনেন যে কেউ কোনো 'ক্যাথলিক' শিশুর কথা বলছেন, বিনয়ের সাথে তাকে বাঁধা দিন এবং বলুন শিশুদের কারোরই বোঝার মত এমন কোনো বয়স হয়নি যে, তারা এ বিষয়ে মতামত দিতে পারে, ঠিক যেমন করে অর্থনীতি বা রাজনীতির কোনো বিষয়ে তাদের পক্ষে মতামত দেয়া সম্ভব না। এবং সুনির্দিষ্টভাবে যেহেতু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে সচেতনতার স্তরকে উন্নীত করা আমি তাই বিষয়টি ভূমিকাতে উল্লেখ করার জন্য আদৌ ক্ষমাপ্রার্থনা করবো না, এবং অবশ্যই নবম অধ্যায়ে তো বটেই। বিষয়টি বার বার বললেও কম হয়, আমি আবার বলতে চাই। যে-কোনো 'মুসলিম' শিশু নয়, বরং 'মুসলিম' পিতা-মাতার সন্তান। সে কি মুসলিম বা অন্য কিছু - তার ধর্ম বোঝার জন্য

শিশুটির বয়সে নিঃসন্দেহে অপরিপক্ক । মুসলিম শিশু বলে যেমন কিছু নেই তেমনি খ্রিস্টান শিশু বলেও কিছু নেই।

অধ্যায় ১ ও ১০, এই বইয়ের শুরু আর শেষে ব্যাখ্যা আছে, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, কিভাবে অসাধারণ এই বাস্তব পৃথিবী সম্বন্ধে প্রকৃত বোধটি পারে - কখনো ধর্মে রূপান্তরিত না হয়ে - অনুপ্রেরণার সেই শূন্যস্থানটি পূর্ণ করার দ্বায়িত্ব পালন করতে যা ঐতিহাসিক আর অপ্রতূলভাবে ধর্ম পালন আত্মসাৎ করে এসেছে।

চতুর্থ সচেতনতা বাড়ানোর প্রচেষ্টাটি হচ্ছে 'অ্যাথিষ্ট প্রাইড' বা নিরীশ্বরবাদীদের গর্ব। অবিশ্বাসী হবার কারণে জবাবদিহি বা ক্ষমা চাইবার কোনো কারণ নেই, বরং এর বিপরীত, বিষয়টি নিয়ে গর্ব করা উচিত, বহু দূরের প্রশস্ত দিগন্তের দিকে তাকিয়ে ঋজু হয়ে দাড়ানোর মত, কারণ নাস্তিক্যবাদ বা নিরীশ্বরবাদ, প্রায় সবসময়ই মনের একটি স্বাস্থ্যকর স্বাধীনতা এবং আসলেই একটি সুস্থ মনের উপস্থিতি ইঙ্গিত করে। অনেক মানুষই আছেন যারা জানেন যে, তাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে তারা আসলে অবিশ্বাসী, কিন্তু তারা তাদের পরিবারের কাছে তা স্বীকার করতে সাহস পান না, এমন কি নিজেদের কাছেও না। কারণ 'নাস্তিক' শব্দটাকেই ধীরে ধীরে খুবই চেষ্টার সাথে ভয়ঙ্কর এবং ভীতিকর একটি শনাক্তকারী চিহ্ন বা লেবেল হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে। অধ্যায় ৯ এ যুক্তরাষ্ট্রের সুপরিচিত কমেডিয়ান জুলিয়া সুইনির বাবা- মায়ের খবরে কাগজের মাধ্যমে তাদের কন্যার অবিশ্বাসী হয়ে যাবার সেই ট্রাজিকমিক কাহিনীটি আমি উল্লেখ করেছি: 'ঈশ্বরের বিশ্বাস করে না বিষয়টি তারা কোনো মতে হজম করতে পারলেও... কিন্তু তাই বলে একজন 'নাস্তিক'.. (তার মায়ের গলার আওয়াজ আরো উঁচু পর্দায় উঠেছিল)'?

আমেরিকার পাঠকদের আমার কিছু বলা প্রয়োজন বিশেষ করে এই মূহূর্তে, কারণ আমেরিকার ধর্মপ্রীতি আসলেই চোখে পড়ার মতোই বিস্ময়কর। আইনজীবী ওয়েন্ডি কামিন খুব সামান্যই বাড়িয়ে বলেছিলেন যখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ধর্ম নিয়ে উপহাস করাটা আমেরিকার লিজিয়ন (প্রাক্তন সৈন্যদের সংগঠন) হলে আমেরিকার পতাকা পোড়ানোর মতোই ঝুঁকিপূর্ণ একটি কাজ'। আজ থেকে ৫০ বছর আগে সমকামিদের যে অবস্থা ছিল, আমেরিকায় নিরীশ্বরবাদীদের অবস্থা এখন তেমনি। আমেরিকার 'গে প্রাইড' আন্দোলনের পর, এখন এটি সম্ভব, যদিও এখনো খুব সহজ নয় কাজটি, তারপরও কোনো সমকামি, সরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধি হতে পারেন। ১৯৯৯ সালে একটি গ্যালপ পোল (জনমত জরিপ) আমেরিকাবাসীদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা এমন কোনো প্রার্থীকে ভোট দেবেন কিনা, যারা কিনা অন্য সবক্ষেত্রেই যোগ্য প্রার্থী, তবে তিনি একজন: নারী (৯৫ শতাংশ), রোমান ক্যাথলিক

(৯৪ শতাংশ), ইহুদী (৯২ শতাংশ), কৃষ্ণাঙ্গ (৯২ শতাংশ), মর্মন (৭৯ শতাংশ), সমকামী (৭৯ শতাংশ) এবং নিরীশ্বরবাদী (৪৯ শতাংশ)।

স্পষ্টতই আমাদের, নিরীশ্বরবাদীদের আরো দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু নিরীশ্বরবাদীরা আসলে সংখ্যায় অনেক বেশি, বিশেষ করে শিক্ষিত এলিটদের মধ্যে, সাধারণত যা মনে করা হয় তার চেয়েও বহু বেশি। আর উনবিংশ শতাব্দীতেও তাই ছিল, যখন জন স্টুয়ার্ট মিল (৮) বলতে পেরেছিলেন: 'এই পৃথিবী অবাক হয়ে যেত, যদি জানতো এর সবচে উজ্জ্বল রত্নগুলো, তাদের মেধা আর গুণে যারা সবচেয়ে বিখ্যাত, এমন কি সাধারণ মানুষের অনুমানেও, তাদের বিশাল একটি অংশ ধর্ম নিয়ে পুরোপুরি সন্দিহান'। আর বর্তমানে এমনকি এটি আরো বেশি সত্যি এবং আসলেই তার প্রমাণও দিয়েছি তৃতীয় অধ্যায়ে, একমাত্র যে কারণ, মানুষ নাস্তিকদের লক্ষ করছে না, সেটি হচ্ছে নিরীশ্বরবাদীরা সাধারণত সবার সামনে তাদের অবিশ্বাসের ফিরিস্তি দিতে অনিচ্ছা পোষণ করে থাকেন। আমার স্বপ্ন হলো এই বইটি তাদের সেই উৎকণ্ঠা কাটাতে সাহায্য করবে, তারা প্রকাশ্যে তাদের অবিশ্বাসের কথা বলবেন। ঠিক যেমনটা হয়েছিল, সমকামিতা আন্দোলনে, যত মানুষ তাদের অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ্যে বলবে ততই তাদের সাথে আরো বহু মানুষের যুক্ত হওয়া সহজ হবে, আর সেই 'চেইন রিঅ্যাকশনটি' শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় 'ক্রিটিকাল মাস' হয়তো আছে।

আমেরিকার জনজরিপ ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, অবিশ্বাসী এবং অজ্ঞেয়বাদীদের সংখ্যা ধর্মপালনকারী ইহুদী কিংবা আরো কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণীর ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে অনেক বেশি। ইহুদীদের ব্যতিক্রম, যারা কিনা খুবই বিশেষভাবে সুপরিচিত যুক্তরাষ্ট্রে তাদের অত্যন্ত কার্যকরী রাজনৈতিক লবীর জন্য কিংবা ইভানজেলিকাল খ্রিস্টানদের থেকে ভিন্ন, যাদের এখন আরো অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে, অবিশ্বাসী আর অজ্ঞেয়বাদীরা কিন্তু তাদের মত সংগঠিত নয়, সেকারণে তাদের প্রভাব খাটানোর ক্ষমতাও প্রায় শূন্যের কোঠায়। আসলেই নিরীশ্বরবাদীদের একত্র করার কাজটিকে বিড়ালের পালকে এক জায়গায় রেখে পোষ মানানোর তুলনা করা হয়, কারণ মুক্তচিন্তার মানুষগুলোর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রবণতা আছে, যারা সাধারণত কোনো কর্তৃত্ব মানতে পছন্দ করেন না। তবে একটি উত্তম পদক্ষেপ হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যার সমমনার নিয়ে একটি 'ক্রিটিকাল মাস' তৈরি করা, যারা নিজেদের অবিশ্বাসী বলে পরিচয় দিয়ে রাজি হবেন, যা অন্যদের একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করবে। এমনকি যদিও তাদের একদলে আনা যাবে না ঠিক, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক বিড়াল প্রচুর আওয়াজ করতে পারে, যাদের উপেক্ষা করা কঠিন হবে।

আমার বইটির শিরোনাম "ডিল্যুশন" বা বিভ্রম শব্দটির ব্যবহার বেশ কিছু মনোচিকিৎসাবিজ্ঞানীকে খানিকটা চিন্তিত করেছে, তাদের কাছে শব্দটি মূলত কারিগরী,

চিকিৎসাবিজ্ঞানে যা একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা চিহ্নিত, যেখানে সেখানে শব্দটির অপব্যবহার করা উচিত নয়। তাদের তিন জন একটি বিশেষ কারিগরী শব্দ এই ধর্মীয় ডিল্যুশন বা বিভ্রমের বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার না করার জন্য প্রস্তাব জানিয়ে আমাকে লিখেছিলেন। তারা এটিকে "রেল্যুশন" শব্দ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে প্রস্তাব করেছিলেন, হয়তো শব্দটি একসময় প্রচলিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আপাতত আমি 'ডিল্যুশন' শব্দটাই ব্যবহার করবো। তবে আমি কেন ব্যবহার করছি সেটার যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। পেঙ্গুইন ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী 'ডিল্যুশন' বলতে বোঝায়, একটি মিথ্যা বিশ্বাস বা ধারণা। বিস্ময়করভাবে, শব্দটির উদাহরণসূচক উদ্ধৃতি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে ফিলিপ ই. জনসনের একটি মন্তব্য: 'ডারউইনবাদ হচ্ছে সেই বিভ্রম থেকে মানবতার মুক্তির গল্প, যে বিভ্রম দাবী করেছিল তাদের নিয়তি তাদের চেয়ে উচ্চতর কোনো শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত'। ইনি কি সেই একই ফিলিপ ই. জনসন হতে পারেন? যিনি আজকে যুক্তরাষ্ট্রে ডারউইনবাদের বিরুদ্ধে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন? আসলেই তাই, এবং এই উদ্ধৃতিটি আমরা যা অনুমান করতে পারি, মূল প্রসঙ্গের বাইরে ব্যবহৃত হয়েছে। আশা করি, আমি যে এতটুকু উল্লেখ করলাম বিষয়টি দৃষ্টি এড়াবে না, কারণ এই একই ধরনের ভদ্রতা আমার প্রতি দেখানো হয়নি, যখন সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা আমার অসংখ্য উদ্ধৃতি মূল প্রাসঙ্গিকতার বাইরে অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তাদের স্বার্থে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেন। জনসনের নিজের এই কথার অর্থ যা-ই হোক না কেন, তার এই বাক্য যা বলছে আমি আনন্দের সাথে সেটা সমর্থন করতে রাজি আছি। মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সরবরাহকৃত অভিধানটি 'ডিল্যুশন' শব্দটির অর্থ করেছে এমনভাবে: 'একটি দীর্ঘস্থায়ী মিথ্যা বিশ্বাস, এমন কি যখন এর বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ বিদ্যমান। বিশেষ করে মানসিক রোগের উপসর্গ হিসাবে'। প্রথম অংশটি খুব চমৎকার আর নির্ভুলভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল সুরটিকে ধরতে পেরেছে, তবে এটি কোনো মানসিক রোগের উপসর্গ কিনা, এ বিষয়ে আমি 'জেন অ্যান্ড দি আর্ট অব মটর সাইকেল মেইনটেনান্স' (৯) বইটির লেখক রবার্ট এম. পিরসিগকেই (১০) সমর্থন করবো, যখন তিনি বলেছিলেন, 'যখন একটি মাত্র মানুষ বিভ্রমে ভোগেন, তাকে বলা হয় পাগলামি, কিন্তু যখন বহু মানুষ বিভ্রান্তিতে ভোগেন, তাকে বলা হয় ধর্ম।'

আমি যেভাবে চাইছি সেভাবে যদি বইটি তার কাজ করে, সকল ধর্মবাদী পাঠক যারা কিনা পড়ার জন্য বইটি খুলবেন, তারা সবাই অবিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হবেন যখন বইটি তারা শেষ করে হাত থেকে নামিয়ে রাখবেন। কি ঔদ্ধত্বপূর্ণ একটি আশাবাদ। অবশ্যই অস্থিমজ্জায় খাঁটি বিশ্বাসীদের কোনো যুক্তিই স্পর্শ করবে না, তারা সব যুক্তি থেকে সুরক্ষিত। আর তাদের এই প্রতিরক্ষা ধীরে ধীরে, তাদের শৈশবের সেই দীক্ষা থেকে বছরের পর বছর ক্রমান্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই দীক্ষা প্রক্রিয়া বহু শতাব্দী ধরে শাণিত হয়েছে (হয় বিবর্তন কিংবা ডিজাইন এর মাধ্যমে), প্রতিরক্ষামূলক নানা পন্থার মধ্যে একটি হচ্ছে অনেক বেশি কার্যকর সতর্কবাণী, তা হচ্ছে এমন কোনো বই পড়ার জন্য

যেন কোনোভাবেই খোলা না হয়, নিশ্চিৎভাবে এই বই কোনো শয়তানের কাজ। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বহু খোলা মনের মানুষ আছেন, যাদের শৈশবের ধর্মীয় দীক্ষা এত ভয়ঙ্কর ছিল না, বা অন্য কোনো কারণে সেভাবে মনের মধ্যে গেঁথে যায়নি, বা এটিকে অতিক্রম করার মত যাদের নিজেদের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা আছে। এইসব খোলা মনের মানুষ এর শুধু একটু উৎসাহ র প্রয়োজন ধমের্র যাতাকল থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য। নিদেনপক্ষে আমি আশা করি, যে কেউই, যারা কিনা যে এই বইটি পড়েছেন, তারা যেন বলতে পারেন, আমার জানা ছিল না আমিও পারি।

এই বইটির বাস্তব রূপ দেবার জন্য আমি বহু বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি তাদের সবার নাম হয়তো উল্লেখ করতে পারবো না এই স্বল্প পরিসরে। তবে তাদের মধ্যে আছেন আমার লিটারারী এজেন্ট জন ব্রকমান, আমার সম্পাদকরা, স্যালি গামিনারা (ট্রান্সওয়ার্ল্ড এর) এবং এয়ামন ডোলান (হটন মিফলিন) , তারা দুজনেই সংবেদনশীলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত বোধগম্যতা নিয়ে আমার বইটি পড়েছেন এবং আমাকে সমালোচনা আর উপদেশের উপকারি একটি মিশ্রণ সরবরাহ করে সবসময় সহায়তা করেছেন। বইটি নিয়ে তাদের অকৃত্রিম উৎসাহ এবং বিশ্বাস আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। গিলিয়ান সমারস্কেল একজন অসাধারণ কপি এডিটর, তার গঠনমূলক সমালোচনা ও সংশোধনী বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে নানাভাবে। নানা পর্যায়ের খসড়ায় যারা গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা করেছেন, এবং যাদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ, তারা হলেন জেরি কয়েন, জে. অ্যান্ডারসন থমসন, ই. এলিজাবেথ কর্নওয়েল, উরসুলা গুডএনাফ, লতা মেনন এবং বিশেষভাবে কারেন ওয়েনস, অসাধারণ সমালোচক, প্রতিটি খসড়ায় নানা পরিবর্ধন আর পরিমার্জন সম্বন্ধে যার ধারণা প্রায় আমার মতোই বিস্তারিত। এই বইটির কিছুটা (এর বিপরীতও) ঋণ আছে “রুটস অব অল ইভিল?” শিরোনামে নির্মিত আমার একটি টেলিভিশন প্রামাণ্যচিত্রের কাছে। জানুয়ারী ২০০৬ সালে বিবিসি’র চ্যানেল ফোরে যে প্রামাণ্যচিত্রটি আমি উপস্থাপনা করেছিলাম। এই অনুষ্ঠানটির সাথে জড়িত সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যেমন, ডেবোরাহ কিড, রাসেল বার্নস, টিম ক্রাগ, অ্যাডাম পেসকোড, অ্যালান ক্লিমেন্টস ও হামিস মিকুরা। সেই প্রামাণ্যচিত্র থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে সম্মতি দেবার জন্য আমি আই ডাবলিউ সি মিডিয়া ও চ্যানেল ফোরকে ধন্যবাদ জানাই। “রুটস অব অল ইভিল?” প্রামণ্যচিত্রটি ব্রিটেনে খুবই ভালো রেটিং অর্জন করেছিল, যা অষ্ট্রেলিয়ার ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনও প্রচার করেছে। তবে এখনো দেখার বাকি আছে, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো টেলিভিশন চ্যানেলের এটি দেখানোর সাহস আছে কিনা (যদিও বেআইনী কপি যুক্তরাষ্ট্রের নানা ওয়েবসাইটগুলো থেকে প্রতিনিয়ত ডাউনলোড করা হচ্ছে। তবে আইনগতভাবে ডিভিডিটি বাজারজাত করার জন্য আলোচনা চলছে। এই বইটি প্রেসে যাবার সময় এই আলোচনা ছিল অসর্ম্পুণ - এ বিষয়ে পরর্বতীয় খবরগুলো রিচার্ড ডকিন্স ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হবে।

এই বইটির মূল সুর আমার মনে দানা বেধেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। এই সময়ে অবশ্যই বেশ কিছু ধারণা আমার নানা বক্তৃতায় নিশ্চয়ই এসেছে, যেমন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া আমার ট্যানার লেকচার, কিংবা খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিনের নানা প্রবন্ধে। ফ্রি ইনকোয়ারি পত্রিকায় আমার নিয়মিত কলামের পাঠকদের বিশেষ করে এই বইটির অনেক অনুচ্ছেদ পরিচিত মনে হতে পারে। এই অসাধারণ পত্রিকাটির সম্পাদক টম ফ্লিনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, আমাকে নিয়মিত কলাম লিখতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দেবার জন্য, যখন তিনি আমাকে দ্বায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই বই লেখার জন্য সাময়িক বিরতি শেষে আমি আশা করছি আবার আমার কলামটি লেখা শুরু করতে পারবো, এবং কোনো সন্দেহ নেই এই বই প্রকাশের পর পবরর্তী পরিস্থিতির ও প্রতিক্রিয়ার প্রত্যুত্তর দেবার জন্য কলামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বহুবিধ কারণে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, ড্যান ডেনেট, মার্ক হাউসার, মাইকেল সিরাট, স্যাম হ্যারিস, হেলেন ফিশার, মার্গারেট ডাওনি, ইবন ওয়ারাক, হারমাইওনি লী, জুলিয়া সুইনী,ড্যান বার্কার, জোসেফিন ওয়েলশ, আয়ান বেয়ার্ড এবং বিশেষভাবে জর্জ স্কেলস এর প্রতি। ইদানিং কোন বইই সম্পূর্ণ হয়না যদি না বইটি কোন একটি সচল ওয়েবসাইটের বাড়তি নানা তথ্যাবলীসহ একটি ফোরামের নিউক্লিয়াস এ পরিণত না হয়, যেখানে প্রশ্নোত্তর, আলোচনা সব কিছুই থাকবে-কে জানে ভবিষ্যতে কি হতে পারে? আমি আশা করি Richard Dawkins Foundation for Reason and Science এর ওয়েব সাইট www. richarddawkins.net সে দ্বায়িত্বটি পালন করার জন্য চেষ্টা করবে। এবং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ জশ টিমোনেনের প্রতি, যার অসাধারণ সৃজনশীলতা, পেশাদারিত্ব এবং কঠোর পরিশ্রম এই সাইটটিকে বিশেষায়িত করেছে।

সর্বোপরি আমি আমার স্ত্রী লালা ওয়ার্ডকে জানাই ধন্যবাদ, সমস্ত ইতস্ততা আর নিজের সন্দেহগুলো কাটিয়ে উঠে বইটি লেখা শুরু করার ক্ষেত্রে যার অনুপ্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। শুধু নৈতিক সমর্থন বা আরো পরিবর্ধন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশই শুধু না, লালা ওয়ার্ড পুরো বইটি আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন, এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে, যেন আমি বুঝতে পারি বইটি আমি ছাড়াও কোনো পাঠকের কেমন লাগতে পারে। আমি এই কৌশলটিকে ব্যবহার করতে অন্যান্য লেখকদেরও উপদেশ দিতে চাই, তবে আমি অবশ্যই সতর্ক করে দিতে চাই, কৌশলটির ভালো ফলাফলের জন্য এর পাঠককে অবশ্যই পেশাদার অভিনয় শিল্পী হতে হবে, ভাষার সঙ্গীতময়তার সাথে যার কণ্ঠস্বর আর শোনার সংবেদনশীলতা সুপরিচিত।

টীকা:

(১) জন উইনস্টোন লেনন (১৯৪০-১৯৮০) ইংরেজ সঙ্গীতশিল্পী, গায়ক ও গান রচয়িতা, বিশ্বখ্যাত পপ সঙ্গীত দল বিটলস (Beatles) এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

(২) ইমাজিন, জন লেননের লেখা একটি সুপরিচিত গান, এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের মে মাসে।

(৩) ৯/১১, ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদা সন্ত্রাসী হামলার বিষয়টি ইঙ্গিত করে।

(৪) ৭/৭, ২০০5 সালে ৭ জুলাই, লণ্ডনে ইসলামবাদী সন্ত্রাসীদের হামলার বিষয়টি ইঙ্গিত করে।

(৫) ডেসমন্ড জন মরিস (জন্ম ১৯২৮) ব্রিটিশ প্রাণিবিজ্ঞানী, ইথোলজিস্ট, শিল্পী।

(৬) অজ্ঞেয়বাদ, দাবী করে সুনির্দিষ্ট কিছু দাবীর সত্যতা - বিশেষ করে ধর্মীয় এবং অধিবিদ্যামূলক দাবীসমূহের - যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই, সেই স্বর্গীয় অথবা অতিপ্রাকৃত সত্তার অস্তিত্ব সংক্রান্ত - অজানা এবং হয়তো সেগুলো জানাও সম্ভবপর নয়।

(৭) ক্রেইন হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্র, যার একটি হয়েষ্ট,তার বা শিকল এবং শিভস থাকে, যার প্রধান কাজ কোন কিছু উপরে তোলা বা নীচে নামানো, কিংবা আনুভূমিকভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো। ক্রেইন-এর রূপকটি ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণ সূচনা থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পক্রিয়া ধাপে ধাপে জটিল সংগঠনের জীবের উদ্ভব ঘটার প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করার জন্য, যেমন, মাটি থেকে ভারী কোনো কিছুকে ক্রেইন যেভাবে ধীরে ধীরে উপরে উত্তোলন করে। এটি অন্য রূপক স্কাইহুক-এর বিপরীত, স্কাই হুক আপাতদৃষ্টিতে কোনো ভিত্তি বা ব্যাখ্যা ছাড়াই অবিশ্বাস্য সব জটিলতা উদ্ভব ঘটায়, যেমনটি সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা দাবী করেন। সুতরাং ডারউইরীয় বিবর্তনের ধারণাটিকে বোঝাতে ‘ক্রেইন’-এর রূপকটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটি সি. এস. লুইসের প্রস্তাবিত ভ্রান্ত মিথ্যা-বিবর্তনীয় ধারণা থেকে ডারউইনীয় বিবর্তনের ধারণাটিকে পৃথক করেছে। এই শব্দটি ডকিন্স ধার করেছেন দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেটের প্রস্তাবনা থেকে। এটি বিবর্তনের ধারণাটিকে বোঝানোর জন্য উপযোগী কারণ, বিবর্তন আর প্রাকৃতিক নির্বাচন এই দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে বিবর্তনের প্রক্রিয়া, এবং এছাড়াও এই রূপকটি বিবর্তনের কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত আরো কিছু তাত্ত্বিক প্রস্তাবকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দেয়।

(৮) জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ব্রিটিশ দার্শনিক, রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ, উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রভাবশালী এই দার্শনিকের বহু অবদান সোস্যাল থিওরি, পলিটিকাল থিওরি এবং পলিটিকাল ইকোননির ক্ষেত্রে।

(৯) Zen and the Art of Motorcycle Maintenance: An Inquiry into Values, William Morrow & Company,1974

(১০) রবার্ট মেনার্ড পিরসিগ (জন্ম ১৯২৮) যুক্তরাষ্ট্রের লেখক, দার্শনিক।

১ প্রথম অধ্যায়
গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী

‘কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে কল্পনা করার চেষ্টা আমি করি না; আমাদের অপর্যাপ্ত ইন্দ্রিয়গুলো যতটুকু বোঝার সুযোগ দেয়, তা দিয়ে এই মহাবিশ্বের গঠন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হওয়াই যথেষ্ট’। - আলবার্ট আইনস্টাইন

যে 'শ্রদ্ধা' পাওয়ার যোগ্য

হাতের উপর চিবুক রেখে, ঘাসের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটি, জট পাকানো ঘাসের কাণ্ড আর শিকড় দেখতে দেখতে হঠাৎ করেই তীব্র একটা অনুভূতিবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে : তার চোখের সামনে যেন ক্ষুদ্র কোনো পৃথিবীর এক বনভূমি। রূপান্তরিত এক জগত, যে জগত পিপড়া আর গুবরে পোকাদের এবং - এমন কি যদিও সেই সময় তার বিস্তারিত কিছু জানা ছিল না - লক্ষ কোটি ব্যাকটেরিয়ার, যারা নীরবে, সবার অগোচরে ক্ষুদ্র এই বিশ্বের অর্থনীতির গুরুদ্বায়িত্ব বহন করে যাচ্ছে। হঠাৎ করে ঘাসের ক্ষুদ্রকায় এই বনভূমি বিশালাকৃতি ধারণ করে এক হয়ে মিশে গেল মহাবিশ্ব আর ভাবনারত ছেলেটির মুদ্ধ বিমোহিত মনের সাথে। এই অভিজ্ঞতাকে সে ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে এবং পরবর্তীতে বেছে নেয় ধর্মযাজকের জীবন। অ্যাঙ্গলিকান (১)পাদ্রী হিসাবে দীক্ষা নেবার পর তিনি আমার স্কুলে চ্যাপলেইন (২) হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। তার মত কিছু ভদ্র, উদার ধর্মযাজকের জন্যে কেউ কখনো দাবী করতে পারবেন না, আমাকে জোর করে আমাকে ধর্ম শেখানো হয়েছে (৩)।

অন্য কোনো সময়ে আর স্থানে, তারা ভরা আকাশের নীচে, এই ছেলেটি হতে পারতাম আমি: ওরাইওন, ক্যাসিওপিয়া আর উরসা মেজরের (৪) চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্যে মুগ্ধ, মিল্কি ওয়েরে(৫) অশ্রুত সঙ্গীতের মূর্ছনায় আবেগে অশ্রুভরা চোখ, আফ্রিকার বাগানে ফ্রাঞ্জিপানি আর ট্রাম্পেট ফুলের রাতের গন্ধে মাতাল। কেন সেই একই আবেগ আমার চ্যাপলেইনকে নিয়ে গেছে একদিকে আর আমাকে অন্য আরেক দিকে, সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়া কিন্তু সহজ নয়। প্রকৃতির প্রতি এই ধরনের প্রায়-আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া বিজ্ঞানী কিংবা যুক্তিবাদীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। তার সাথে কিন্তু অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের কোনো যোগসূত্র নেই। অনুমান করতে পারি, অন্তত তার শৈশবে, আমার চ্যাপলেইনের (এবং আমারও না) 'দি অরিজিন অব স্পিসিস' (৬) এর শেষ পংক্তিগুলোর কথা জানা ছিল না , সেই বিখ্যাত 'এনট্যাঙ্গলড ব্যাঙ্ক' অনুচ্ছেদটি (৭): 'ঝোপের মধ্যে গান গাওয়া পাখিরা, এদিক সেদিক উড়ে চলা নানা জাতের পোকামাকড়, ভেজা মাটির মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে চলা কেঁচো' - যদি তার জানা থাকতো, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তার অভিজ্ঞতার সাথে মিল খুঁজে পেতেন, আর ধর্মযাজকের পেশায় দীক্ষিত হবার বদলে হয়তো তিনি ডারউইনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে পারতেন, কারণ এই সবকিছু - 'সৃষ্টি হয়েছে আমাদের চারপাশে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমেই':

> এইভাবে, প্রকৃতির যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ আর মুত্যুর সাথে, আমাদের পক্ষে ভাবা সম্ভব এমন সবচেয়ে মহান বস্তু, অর্থাৎ উন্নত প্রাণীদের সৃষ্টি, প্রত্যক্ষভাবেই জড়িত। জীবনকে এইভাবে দেখার মধ্যে এক ধরনের মাহাত্ম আছে । (জীবন) এর

কিছু ক্ষমতা দিয়ে মূলত কয়েকটি বা একটি রূপ সৃষ্টি করেছিল, এবং সেটাই, এই খুব সাধারণ সূচনা থেকে, এই গ্রহটি যখন মাধ্যাকর্ষণের স্থির নিয়ম মেনে মহাকাশে চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে, সবচেয়ে সুন্দর আর সবচেয়ে বিস্ময়কর অগণিত রূপে বিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

কার্ল সেগান (৮) তার 'পেল ব্লু ডট'(২) বইয়ে লিখেছিলেন:

> কেন এমন হলো যে, প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর কোনোটাই বিজ্ঞানকে অন্তত সামান্যতম হলেও একটু বোঝার চেষ্টা করেছে আর এমন কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে, 'আমরা যা ভেবেছিলাম এটাতো তার চেয়েও আরো অনেক ভালো! এই মহাবিশ্বতো আমাদের নবীরা যা বলে গেছেন তার চেয়েও অনেক বিশাল, আরো বেশি সূক্ষ্ম আর অভিজাত'; বরং তারা বলেছে, 'না, না, না! আমার ঈশ্বর হলো ছোটো ঈশ্বর আর আমরা চাই তিনি সেভাবেই থাকুন'; কোনো ধর্ম, তা নতুন কিংবা পুরাতন যা-ই হোক না কেন, যা কিনা আধুনিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে উন্মোচিত এই মহাবিশ্বের অসাধারণত্বকে গুরুত্ব দিয়েছে, হয়তো চিরাচরিত বিশ্বাস যা পারেনি, সেটি তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধার জন্ম দিতে পারতো।

কার্ল সেগানের সব বইগুলো আমাদের সর্বোচ্চ বিস্ময়ের স্নায়ুতন্তুতে সরাসরি স্পর্শ করে, যার ওপর গত শতাব্দীগুলোয় একচ্ছত্র দখল ছিল ধর্মগুলোর। আমার নিজের বইগুলো সেভাবে সবাইকে স্পর্শ করুক তা আমারও কাম্য। সম্ভবত সেই কারণে একজন গভীরভাবে ধার্মিক হিসেবে আমাকে প্রায়শই বর্ণনা করা হয় বলে আমি শুনেছি। যুক্তরাষ্ট্রের একজন ছাত্রী আমাকে লিখেছিলেন, তার এক অধ্যাপককে, আমার সম্বন্ধে তার কোনো মতামত আছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। 'অবশ্যই', তার অধ্যাপক উত্তর দিয়ে ছিলেন 'তার ইতিবাচক বিজ্ঞান ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় ঠিকই, কিন্তু, প্রকৃতি আর মহাবিশ্ব নিয়ে যেভাবে তিনি আবেগময় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন, আমার কাছে, সেটাইতো ধর্ম!'; কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য 'ধর্ম' শব্দটা কি সঠিক হতে পারে? আমি তা মনে করি না। নোবেল পুরষ্কার বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী (এবং একজন নিরীশ্বরবাদী) স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (১০) তার 'ড্রিমস অব এ ফাইনাল থিওরী' (১১) বইটিতে অনেকের মতোই এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

> ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু মানুষের ধারণা এত ব্যপক আর নমনীয়, এটা অবশ্যম্ভাবী যে, তারা যেদিকে খুঁজবেন সেখানেই ঈশ্বরকে খুঁজে পাবেন। মাঝে মাঝে শোনা যায় 'ঈশ্বরই চূড়ান্ত' অথবা 'ঈশ্বর আমাদের শ্রেষ্ঠতম অংশ' বা 'ঈশ্বরই এই মহাজগত'; অবশ্যই, অন্য যে-কোনো শব্দের মতোই ঈশ্বর শব্দটিকে আমরা আমাদের ইচ্ছামতো অর্থ দিতে পারি। আপনি যদি বলতে চান, তাহলে

বলতে পারেন, 'ঈশ্বরই শক্তি', তাহলে আপনি ঈশ্বরকে এক টুকরো কয়লার মধ্যেও পেতে পারেন।

ওয়াইনবার্গ অবশ্যই সঠিক, যদি 'ঈশ্বর' শব্দটিকে আমরা পুরোপুরি অব্যবহারযোগ্য করে ফেলতে না চাই, তাহলে একে ব্যবহার করতে হবে ঠিক সেইভাবে, যেভাবে বেশিরভাগ মানুষ সাধারণত এই শব্দটির অর্থ অনুধাবন করে থাকেন: অর্থাৎ একজন অতিপ্রাকৃত সৃষ্টিকর্তাকে বোঝাতে, যিনি 'আমাদের উপাসনার উপযুক্ত'।

অনেক দুর্ভাগ্যজনক জটিলতার সৃষ্টি হয় যখন আমরা আইনস্টাইনীয় ধর্ম আর অতিপ্রাকৃত ধর্ম, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য করতে পারি না। আইনস্টাইন (১২) মাঝে মাঝেই "গড" (ঈশ্বর) শব্দটা ব্যবহার করেছেন (আর শব্দটা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু একমাত্র নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানী ছিলেন না) এবং অতিপ্রাকৃতবাদীদের বিষয়টি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দিয়েছেন, যারা এমনিতেই এর অপব্যাখ্যা এবং এমন একজন বিখ্যাত মনিষীকে তাদের মতবাদী বলে দাবী করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। স্টিফেন হকিং (১৩) এর 'দ্য ব্রিফ হিষ্টরী অব টাইম' বইটির নাটকীয় (নাকি দুষ্টামীপূর্ণ?) শেষ বাক্য 'এবং তখনই আমরা ঈশ্বরের মনের কথা জানতে পারবো' ; উক্তিটি একই ধরনের অপব্যাখ্যার জন্য বিশেষভাবে কুখ্যাত, অনেকের মনেই এটি হকিং একজন 'ধার্মিক' মানুষ, এমন ধারণার (অবশ্যই ভুল ভাবে) জন্ম দিয়েছে (১৪)। কোষ-জীববিজ্ঞানী উরসুলা গুডইনাফের (১৫) 'দ্য স্যাকরেড ডেপথ অফ নেচার' আইনস্টাইন কিংবা হকিং এর চেয়েও আরো বেশি ধার্মিকতা সংক্রান্ত ভুল ধারণা দেয়, গীর্জা, মসজিদ আর মন্দির তার খুবই পছন্দের, তার লেখার অনেক অংশই অনায়াসে অপব্যাখ্যা করে অতিপ্রাকৃত ধর্মের পক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমন কি নিজেকে একজন 'ধার্মিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী' হিসাবে পরিচয় দিতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে তার লেখা পড়লেই বোঝা যায়, তিনি আসলে আমার মতোই একজন কট্টর নিরীশ্বরবাদী।

ন্যাচারালিষ্ট বা 'প্রকৃতিবিজ্ঞানী' শব্দটি খুবই অস্পষ্ট। আমার জন্য শব্দটি আমার শৈশবের নায়ক হিউ লফটিঙের (১৬) ডক্টর ডুলিটলের কথা মনে করিয়ে দেয় (তিনি কিন্তু কিছুটা এইচ. এম. এস. বিগল (১৭) জাহাজের সেই দার্শনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানীর মতো ছিলেন)। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকৃতিবিজ্ঞানী বলতে যা বোঝাতো, এখনো অধিকাংশ মানুষের কাছে সেটাই অপরিবর্তিত আছে : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (প্রাণিবিজ্ঞান ও উদ্ভিদবিজ্ঞান) একজন শিক্ষার্থী। সেই গিলবার্ট হোয়াইট (১৮) থেকে, প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা অধিকাংশ সময়ই পেশায় ছিলেন ধর্মযাজক। তরুণ ডারউইনেরও ধর্মযাজক হবার কথা ছিল, আশা ছিল কোনো গ্রামের প্যারিশের পারসন (১৯) বা যাজকের ঝামেলামুক্ত একটা জীবন হবে তার, পছন্দের গুবরে পোকাদের নিয়ে

গবেষণা করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু দার্শনিকরা ‘প্রকৃতিবিজ্ঞানী’ শব্দটা ব্যবহার করেন অন্য একটি অর্থে, তা অবশ্যই ‘অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞানীর’ বিপরীতার্থে। জুলিয়ান ব্যাগিনী (২০) তার ‘অ্যাথেইজম: এ ভেরি শর্ট ইন্ট্রোডাকশন’ বইয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন, ন্যাচারালিজম বা প্রকৃতিবাদের প্রতি নিরীশ্বরবাদীদের অঙ্গীকারটি আসলে কি: ‘নিরীরশ্বরবাদীরা যা বিশ্বাস করেন তা হলো, মহাবিশ্বে কেবল একটি জিনিস আছে, যা ভৌত (পদার্থ), এর থেকেই উৎপত্তি হয়েছে, মন, সৌন্দর্য্য, অনুভূতি, ন্যায়, অন্যায়, নৈতিকতাবোধ সংক্ষেপে সবকিছুই, সকল বিস্ময়কর বস্তু যা মানব জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে’।

মানুষের চিন্তাশক্তি এবং অনুভূতির ’উদ্ভব’ হয় মস্তিষ্কের ভিতরে অবস্থিত আর সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে, এমন কিছুর (নিউরোন (২১)) অতিমাত্রায় জটিল পারস্পরিক আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে। তাহলে দার্শনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী অর্থে একজন নিরীশ্বরবাদী হচ্ছেন সেই জন যিনি বিশ্বাস করেন এই প্রাকৃতিক বা ভৌত মহাবিশ্বের বাইরে আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আমাদের পর্যবেক্ষণক্ষম মহাবিশ্বের অন্তরালে অতিপ্রাকৃত সৃজনশীল, বুদ্ধিমান কোনো সৃষ্টিকর্তা লুকিয়ে নেই, শরীরের মৃত্যুর পর কোনো আত্মারই অস্তিত্ব থাকে না এবং নেই কোনো অলৌকিক ঘটনা, শুধুমাত্র তা প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা ছাড়া - যা হয়তো এখনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি। যদি এমন কিছু থাকে যা মনে হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে, তা বর্তমানে আমাদের বোঝার সীমাবদ্ধতা মাত্র। আমরা আশা করি একদিন আমরা বুঝতে পারবো এবং প্রাকৃতিক কোনো ঘটনা হিসাবে তা আমরা স্বীকার করে নেব। আমরা র‍ংধনুর রহস্য ভেদ করেছি, সেই জন্য কিন্তু র‍ংধনুর মুগ্ধ করার ক্ষমতা কমে যায়নি।

আমাদের সময়ে অনেক মহান বিজ্ঞানী, যাদের কথা শুনলে আপাতদৃষ্টিতে তাদের ধার্মিক মনে হতে পারে, কিন্তু তাদের বিশ্বাসগুলি গভীরভাবে যাচাই করে দেখলে ঠিক এর বিপরীতটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আইনস্টাইন এবং হকিঙের ক্ষেত্রে কথাটা বিশেষভাবে সত্য। বর্তমান রাজকীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি মার্টিন রিস (২২) আমাকে বলেছিলেন, তিনি চার্চে যাতায়াত করেন একজন ‘অবিশ্বাসী অ্যাঙলিকান হিসাবে স্বগোত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে’; কোনো ধরনের ঈশ্বরের উপর তার বিশ্বাস নেই, কিন্তু যে বিজ্ঞানীদের নাম আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি, তাদের মতো, তার মনেও এই মহাজগত, এক ধরনের কাব্যিক, প্রকৃতিবাদী অনুভূতির জন্ম দেয়। সম্প্রতি টেলিভিশনে একটি আলোচনা অনুষ্ঠানে আমি আমার বন্ধু রবার্ট উইনস্টোনকে, যিনি একজন প্রখ্যাত ধাত্রীবিশেষজ্ঞ ও ইহুদী সমাজের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য, চ্যালেঞ্জ করেছিলাম স্বীকার করে নিতে যে, তার ইহুদীবাদ ঠিক এই ধরনেরই এবং তিনি আদৌ অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করেন না (২৩) । প্রায় স্বীকার করতে করতে একেবারে শেষ পর্যন্ত এসে তিনি পিছিয়ে গিয়েছিলেন (মানতেই

হবে, তারই আসলে সাক্ষাৎকার নেবার কথা ছিল আমাকে, বিপরীতটা না); আমি যখন তাকে জোর করেছিলাম কিছু বলার জন্য, তিনি বলেছিলেন, ইহুদীবাদ তার জীবনকে ঠিকমত সাজাতে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা দিয়েছে। হয়তো সেটা ঠিক, কিন্তু অবশ্যই, শুধুমাত্র সেটাই, এর (ইহুদীবাদ) অতিপ্রাকৃত অবস্থানের সত্যতা দাবী করার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম কোনো ভূমিকাই রাখে না। অনেক বুদ্ধিজীবী ইহুদী আছেন যারা নিজেদের ইহুদী পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করেন এবং ধর্মীয় আচারও পালন করেন হয়তো প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে বা প্রয়াত স্বজনদের স্মরণে। কিন্তু এছাড়াও অন্য কারণটি হলো, ধর্মকে 'সর্বেশ্বরবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করে বিশেষ শ্রদ্ধার একটা অবস্থান দেয়ার জন্য আমাদের কিছু বিভ্রান্তি বা বিভ্রান্তিকর ইচ্ছা বা প্রবণতা, যা এর সবচেয়ে বিশিষ্ট সমর্থক আলবার্ট আইনস্টাইনের মত আমরা হয়তো অনেকেই অনুভব করি। তারা হয়তো তা বিশ্বাস করেন না, কিন্তু দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেটের একটা উদ্ধৃতি ব্যবহার করে বলা যায়,তারা 'একটি বিশ্বাসকে বিশ্বাস করেন' (২৪)।

অতি আগ্রহের সাথে আইনস্টাইনের যে উদ্ধৃতিটি ব্যবহৃত হয়, 'বিজ্ঞান ধর্ম ছাড়া পঙ্গু, আর ধর্ম বিজ্ঞান ছাড়া অন্ধ', কিন্তু আইনস্টাইন আরো বলেছিলেন:

> আমার ধর্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে, আপনারা যা পড়ে থাকবেন, তা অবশ্যই মিথ্যা। এই মিথ্যা বারবার একইভাবে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আমি কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না এবং আমি কখনোই এই কথাটা অস্বীকার করিনি বরং সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি । যদি আমার মধ্যে এমন কিছু থাকে যাকে বলা যেতে পারে ধর্মবোধ, সেটা নিঃসন্দেহে, বিজ্ঞান যতটুকু উন্মোচন করেছে সেই মহাবিশ্বের গঠনের প্রতি আমার অসীম মুগ্ধতা।

মনে হচ্ছে কি আইনস্টাইন তাহলে কোনো স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন? আর বিতর্কের উভয়পক্ষ পক্ষ সমর্থনের জন্য কি তার বক্তব্যকে বেছে বেছে ব্যবহার করা যেতে পারে? না। সাধারণত যে অর্থে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তিনি সেই অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করেননি কখনো। আমি যখন একদিকে অতিপ্রাকৃত ধর্ম আর অন্যদিকে আইনস্টাইনীয় ধর্মের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করছি, মনে রাখবেন, যে আমি 'অতিপ্রাকৃত' ঈশ্বর ধারণাটিকেই কেবল বিভ্রান্তিকর বলছি।

আইনস্টাইনের ধর্মের স্বরূপ বোঝাতে আমি এখানে আরো কিছু আইনস্টাইনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি:

> আমি গভীরভাবে ধার্মিক একজন অবিশ্বাসী। এটাই নতুন কোনো এক ধরনের ধর্ম।

আমি কখনো প্রকৃতির উপর কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আরোপ করি না অথবা এমন কিছু যা মানবিক গুণাবলী বলে মনে হতে পারে। আমি প্রকৃতিতে যা দেখি তা হলো এর অসাধারণ গঠন, যা আমরা খুব সামান্যই বুঝতে পারি, যে কোনো চিন্তাশীল মানুষকে যা বিনম্র হতে বাধ্য করে। এটা অবশ্যই ধর্মীয় একটা অনুভূতি কিন্তু এর মধ্যে কোন অতিপ্রাকৃত রহস্যময়তা নেই।

ব্যক্তিগত কোনো ঈশ্বরের ধারণা আমার কাছে খুবই অপরিচিত আর এমনকি মনে হয় ছেলেমানুষী।

তার মৃত্যুর পর থেকেই ক্রমশ বাড়তে থাকা ধর্মীয় পক্ষসমর্থনকারীরা বোধগম্য কারণেই আরো বেশি করে আইনস্টাইনকে তাদের নিজেদের একজন বলে দাবী করে এসেছেন। তার সমসাময়িক ধর্ম সমর্থকরা কিন্তু তাকে ভিন্নভাবে দেখেছিলেন। ‘আমি কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না’ কথাটি ব্যাখ্যা করার জন্য, ১৯৪০ সালে তিনি একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটি এবং এই ধরনের কিছু বক্তব্যের জন্য তাকে গোঁড়া ধর্ম সমর্থকদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়, সমালোচনা মুখর অসংখ্য চিঠি পান তিনি, যার অনেকগুলোতে তার ইহুদী জন্ম ইতিহাসের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। ম্যাক্স জ্যামারের (২৫) ‘আইনস্টাইন অ্যান্ড রেলিজিওন (২৬) বইটি থেকেই নিম্নে উল্লেখিত তথ্যগুলো আমরা পাই (ধর্ম সংক্রান্ত আমার ব্যবহৃত আইনস্টাইনের বিভিন্ন উদ্ধৃতির উৎসও এই বইটি) : ক্যানসাস সিটির রোমান ক্যাথলিক বিশপ মন্তব্য করেছিলেন, ‘দুঃখজনক একটা ব্যপার, একজন ব্যক্তি, যে কিনা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত জাতির সদস্য, তিনি সেই জাতির মহান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করছেন’। অন্যান্য ক্যাথলিক ধর্মযাজকরাও যোগ দিয়েছিলেন সমালোচনায়: ‘ব্যক্তিগত ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বর নেই, আইনস্টাইন নিজেই জানেন না কি বিষয়ে কথা বলছেন। পুরোটাই ভুল তিনি। কিছু মানুষ মনে করেন , কোনো এক বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান অর্জন করলেই, সব বিষয়ে তারা মত প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছেন’। অর্থাৎ ধর্ম যেন একটা বিশেষ বিষয় আর কেউ এই বিশেষ বিষয়ে নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলেও দাবী করতে পারেন, যিনি সব বিতর্কের উর্দ্ধে। ধারণা করা যেতে পারে, ঐ পাদ্রী পরীদের পাখার সঠিক আকৃতি বা রং এর বিষয়ে কোনো আত্মস্বীকৃত ‘পরী বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিতে হয়তো অপেক্ষা করেন না। তিনি এবং বিশপ দুজনই বলছেন, আইনস্টাইন যেহেতু ধর্মীয় তত্ত্বে প্রশিক্ষিত নয় সুতরাং ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে তার ধারণা ভ্রান্ত কিন্তু আইনস্টাইন খুব ভালোভাবেই জানতেন ঠিক কোন বিষয়টিকে তিনি অস্বীকার করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রোমান ক্যাথলিক আইনজীবি যিনি একটি একুমেনিকাল (২৭) কোয়ালিশনের এর পক্ষে কাজ করেন, তিনি আইনস্টাইনকে লিখেছিলেন:

> আমরা গভীরভাবে দুঃখ পেয়েছি, আপনি এই ধরনের একটি মন্তব্য করেছেন .. যেখানে আপনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণাটিকে উপহাস করেছেন। বিগত দশ বছরে আপনার এই বক্তব্যের মত আর কোনো কিছুই, মানুষকে এই চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি যে, জার্মানী থেকে ইহুদীদের বহিষ্কার করার পেছনে হিটলারের আসলেই কিছু কারণ ছিল। আপনার যে-কোনো কিছু বলার অধিকার আছে, এই কথা স্বীকার করে নিয়ে বলছি; এ ধরনের বক্তব্য আপনাকে অ্যামেরিকায় বিতর্কের অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নিউ ইয়র্কের একজন ইহুদী ধর্মযাজক বা রাবাই বলেছিলেন, ‘আইনস্টাইন নিঃসন্দেহে একজন মহান বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইহুদীবাদের একেবারে বিপরীত’।

‘কিন্তু’ ? ‘কিন্তু’ ? ‘এবং’ কেন নয়?

নিউ জার্সী হিস্টোরিকাল সোসাইটির সভাপতির লেখা চিঠিটা পড়লে তার ধর্মীয় মানসিকতার দুর্বলতার স্বরূপটা এতই স্পষ্ট হয় যে এটি দ্বিতীয় বার পড়া যেতে পারে:

> ডঃ আইনস্টাইন, আমরা আপনার শিক্ষাকে সম্মান করি। কিন্তু মনে হচ্ছে একটি বিষয় আপনার শেখা হয়নি: ঈশ্বর হচ্ছে আত্মার মত, নিরাকার সত্তা, যা কেউ টেলিস্কোপ বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজে পাবে না, যেমন মানুষের চিন্তা আর অনুভূতি, আবেগ মস্তিষ্ক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পাওয়া যায় না। সবাই জানে ধর্মের ভিত্তি হলো ‘বিশ্বাস’, কোনো যুক্তিনির্ভর জ্ঞান নয়। চিন্তাক্ষম সব মানুষই, হয়তো কোনো না কোনো এক সময় ধর্ম সংক্রান্ত সন্দেহে আক্রান্ত হন। আমার নিজের বিশ্বাসই নাড়া খেয়েছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু আমি কখনো আমার এই বিশ্বাসের সংকটের কথা কাউকে বলিনি দুটি কারণে: প্রথমত, আমার শঙ্কা ছিল এ বিষয়ে আমার সামান্যতম মন্তব্য কিছু মানুষের জীবন ও তাদের আশাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। দ্বিতীয়ত আমি সেই লেখকের সাথে একমত, যিনি বলেছিলেন ‘যারা অন্য কারো বিশ্বাসকে ধ্বংস করে তাদের চরিত্রে অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা আছে’.. আশা করি ডঃ আইনস্টাইন, আপনার বক্তব্যটিকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হয়নি এবং আপনি নিশ্চয়ই অসংখ্য অ্যামেরিকানদের উদ্দেশ্যে ভালো আর সঠিক কিছু বলবেন, যারা আপনাকে সম্মান জানাতে উদগ্রীব।

কি ভয়াবহ রকমের চারিত্রিক দুর্বলতা উন্মোচন করা একটি চিঠি, যার প্রতিটি পংক্তিতে নৈতিক আর বুদ্ধিবৃত্তিক ভীরুতা ও কাপুরুষতা ঝরে পড়ছে।

আরেকটু কম কাপুরুষোচিত কিন্তু বেশি জঘন্য চিঠিটি লিখেছিলেন, ওকলাহোমার ক্যাভার্লী ট্যাবেরন্যাকল অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা:

> অধ্যাপক আইনস্টাইন, আমি বিশ্বাস করি অ্যামেরিকার প্রত্যেকটি খ্রিস্টান আপনাকে উত্তর দেবে,'আমরা আমাদের ঈশ্বর আর তার পুত্র যীশু খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস পরিত্যাগ করবো না, কিন্তু আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, যদি আপনি এই জাতির ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেন, তাহলে যেখান থেকে আপনি এসেছেন সেখানে ফেরত চলে যান'; ইসরায়েলের ভালোর জন্য যা করা সম্ভব আমি করেছি, ধর্মকে অসম্মান করে আপনার ধর্মনিন্দাপূর্ণ জিহবা থেকে উচ্চারিত এই বক্তব্য নিয়ে আপনি বিতর্কে যোগ দিলেন। ইসরায়েলপ্রেমী খ্রিস্টান এইদেশ থেকে ইহুদী-বিদ্বেষ নির্মূল করার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, এই বক্তব্য আপনার জাতির জন্য আরো বেশি ক্ষতিকর প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা আছে। অধ্যাপক আইনস্টাইন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকটি খ্রিস্টান আপনাকে তাৎক্ষণিক উত্তর দেবে, 'আপনার এই সব বাতিকগ্রস্থ, বিবর্তনের ভুল তত্ত্ব নিয়ে জার্মানী চলে যান, যেখান থেকে আপনি এসেছেন অথবা এই দেশের মানুষদের, যারা আপনি যখন নিজের দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই দেশে স্বাগত জানিয়েছিল আপনাকে, সেই সব মানুষদের বিশ্বাসকে আঘাত করার চেষ্টা বন্ধ করুন'।

তার ঈশ্বরবাদী এবং ধর্মবিশ্বাসী সব সমালোচকরা একটা বিষয় কিন্তু সঠিক ধরতে পেরেছিলেন, আইনস্টাইন, তাদের দলের কেউ নন। বার বার তিনি ক্ষুদ্ধ হয়েছেন যখনই তাকে থেইষ্ট বা ঈশ্বরবিশ্বাসী বলা হয়েছে। তাহলে তিনি কি ডেইষ্ট বা একাত্মবাদী, ভলতেয়ার (২৮) আর দিদেরো'র (২৯) মতন? কিংবা প্যানথেইষ্ট বা সর্বেশ্বরবাদী, স্পিনোজার (৩০) মতন, যার দর্শনকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন: 'আমি স্পিনোজার ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, যিনি নিজেকে অস্তিত্ব আছে এমন সকল কিছুর মধ্যে বিদ্যমান সুশৃঙ্খল সংহতিতে উন্মোচন করেন, কিন্তু সেই ঈশ্বরে নয়, যিনি মানুষের নিয়তি আর কর্ম নিয়ে নিজেকে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত রাখেন'?

কিছু শব্দের অর্থ আমরা আবার মনে করে নেই; একজন থেইষ্ট বা ঈশ্বরবাদী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি অতিপ্রাকৃত, অতিবুদ্ধিমান কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যিনি (ঈশ্বর) তার প্রধান কাজ, প্রথমত এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করা ছাড়াও, তার সেই সৃষ্টির দেখাশোনা এবং পরবর্তীতে এর নিয়তিকে প্রভাবিত করতে যিনি এখনো সর্বশক্তিসহ বিরাজমান। ঈশ্বরবাদীদের বিশ্বাসের কাঠামোতে, মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে এই ঈশ্বর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি তাদের প্রার্থনার জবাব দেন, পাপের শাস্তি প্রদান বা ক্ষমা করেন, অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে পৃথিবীর নানা কর্মকাণ্ডে

হস্তক্ষেপ করেন, তার সৃষ্টির ভালো আর খারাপ কর্মকাণ্ড নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করেন, এবং তিনি জানেন আমরা কখন এসব করছি (অথবা অন্তর্যামী হিসাবে তিনি জানেন, এমনকি কখন আমরা এসব করার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা করছি); একজন ডেইষ্ট বা একাত্মবাদীও, অতিপ্রাকৃত, অতিবুদ্ধিমান, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, তবে তার কর্মকাণ্ড শুধু সৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্ব পরিচালনাকারী নিয়মকানুনগুলো সুনির্দিষ্ট করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এরপর একাত্মবাদীদের ঈশ্বর তার সৃষ্টিতে আর কোনো ধরনের হস্তক্ষপ করেন না, এবং অবশ্যই মানুষের কর্মকাণ্ডে তার বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই। প্যানথেইষ্টরা বা সর্বেশ্বরবাদী কোনো অতিপ্রাকৃত, অতিবুদ্ধিমান ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তবে 'ঈশ্বর' শব্দটি তারা ব্যবহার করেন একটি অলৌকিকতার ইঙ্গিতমুক্ত প্রতিশব্দ হিসাবে প্রকৃতি বা মহাজাগতিক বিবিধ কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণকারী সুশৃঙ্খলতাকে বোঝাতে। একাত্মবাদীদের ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বরবিশ্বাসী ঈশ্বরের পার্থক্য হলো, তাদের ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন না, পাপপূণ্য বা আমাদের পাপের স্বীকারোক্তি নিয়ে আদৌ মাথা ঘামান না, আমাদের মনের কথা জানার চেষ্টা করেন না, খেয়ালখুশী মত কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে আমাদের জীবনে কোনো হস্তক্ষেপ করেন না। একাত্মবাদীরা সর্বেশ্বরবাদী থেকে আলাদা, কারণ একাত্মবাদীদের কাছে তাদের 'ঈশ্বর' হচ্ছে কোনো এক ধরনের মহাজাগতিক বুদ্ধিমত্তা, সর্বেশ্বরবাদীদের মত মহাবিশ্বের সুশৃঙ্খল নিয়মকানুন এর রূপকধর্মী বা কাব্যিক কোনো প্রতিশব্দ না। সর্বেশ্বরবাদ অনেকটা আকর্ষণীয় আর গ্রহনযোগ্য নিরীশ্বরবাদ অন্যদিকে একাত্মবাদ হল দুর্বল ঈশ্বরবাদ।

অবশ্যই চিন্তা করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে, কিছু বিখ্যাত 'আইনস্টাইনবাদ' যেমন: 'ঈশ্বর সূক্ষ্ম এবং চতুর, কিন্তু তিনি কারো ক্ষতি করার মনোভাব পোষণ করেন না',অথবা 'ঈশ্বর কোন জুয়া খেলেননি' বা 'এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরের কি কোনো বিশেষ পছন্দ ছিল?' এই মন্তব্যগুলো সর্বেশ্বরবাদী, একাত্মবাদী নয়, আর অবশ্যই ঈশ্বরবাদী নয়। 'ঈশ্বর কোন জুয়া খেলেন নি' এই মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করা উচিত 'মহাজগতের সব কিছুর কেন্দ্র কিন্তু এলোমেলো লক্ষ্যহীন নয়' - এইভাবে । 'এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে কোনো ঈশ্বরের কি বিশেষ পছন্দ ছিল'? এর মানে 'মহাবিশ্ব কি আর অন্য কোনোভাবে শুরু হতে পারতো'?, আইনস্টাইন 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণভাবে রূপক বা কাব্যিক অর্থে। স্টিফেন হকিং কিন্তু সেটাই করেছেন, এছাড়াও অন্য আরো অনেক পদার্থবিজ্ঞানী আছেন, যারা প্রায়শই ধর্মীয় রূপক ব্যবহার করেছেন তাদের ভাষা । পল ডেভিসের (৩১) 'দ্য মাইন্ড অফ গড', যে বইটার জন্য তিনি টেম্পলটন পুরষ্কার পেয়েছিলেন, সেটি অবস্থান করছে আইনস্টাইনীয় সর্বেশ্বরবাদ আর অস্পষ্ট একটা একাত্মবাদের মাঝামাঝি একটা অবস্থানে (প্রতি বছর বেশ বড় অঙ্কের একটা অর্থ পুরষ্কার হিসাবে দিয়ে থাকে টেম্পলটন ফাউন্ডেশন, সাধারণত ধর্ম সম্পর্কে সুন্দর কিছু কথা বলতে রাজি আছেন এমন কোনো বিজ্ঞানীকে)।

আইনস্টাইনেরই আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি তার ধর্মভাবনা নিয়ে আলোচনা শেষ করতে চাই: 'সবকিছু যা আমরা অনুভব করতে পারি, তার পেছনে এমন কিছু আছে যা আমাদের বুদ্ধির ব্যাখ্যাতীত, যার সৌন্দর্য্য, বিশালতা আর মহিমময়তা আমাদেরকে স্পর্শ করে পরোক্ষভাবে, ক্ষীণ কোনো ভাবনা রুপে, সেটা বোঝা আর অর্থ খুঁজে বের করাটাই ধার্মিকতা; এই অর্থে আমি ধার্মিক'; আর এই অর্থে আমিও ধার্মিক, তবে একটু আপত্তি সাপেক্ষে, 'বুদ্ধির ব্যাখ্যাতীত' দাবীটির অর্থ 'চিরকালই বুদ্ধির ব্যাখ্যাতীত' হতে হবে এমনটা নয়। কিন্তু আমি নিজেকে ধার্মিক বলে পরিচয় দিতে চাই না, কারণ এর অপব্যাখ্যা হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। অপব্যাখ্যাটা ক্ষতিকর কারণ, অসংখ্য মানুষের কাছে ধর্ম আসলেই অতিপ্রাকৃত ধর্মকেই বোঝায়। কার্ল সেগান সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন: 'ঈশ্বর বলতে কেউ যদি বোঝাতে চায় এক গুচ্ছ প্রাকৃতিক নিয়ম, যা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই এরকম একজন ঈশ্বর আছেন। এই ঈশ্বর অবশ্যই আবেগীয় স্তরে সন্তুষ্টি দিতে ব্যর্থ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কাছে কিছু প্রার্থনা করা নিশ্চয়ই অর্থপূর্ণ কোনো কাজ হিসেবে অনুভূত হয় না'।

মজার ব্যপার হলো সেগানের শেষ বক্তব্যটির পূর্বাভাস কিন্তু আগেই করেছিলেন, অ্যামেরিকান ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপক, রেভারেন্ড ডঃ ফুলটন জে শিন, ১৯৪০ সালে আইনস্টাইনের ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করার ঘটনার তীব্র সমালোচনার অংশ হিসাবে। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় জানতে চেয়েছিলেন, 'এমন কি কেউ আছে, যে মিল্কি ওয়ের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন'? তিনি মনে করেছিলেন বক্তব্যটি তিনি আইনস্টাইনের পক্ষে নয় বরং তার বিপক্ষে বলছেন। তিনি আরো বলেছিলেন, ''তার এই কসমিক্যাল (Cosmica) নয় বরং কমিকাল (Comical) ধর্মে একটি মাত্র ভুল আছে, তিনি কেবল একটি বাড়তি অক্ষর ব্যবহার করেছেন শব্দটিতে, 's' হলো সেই অক্ষরটি''। আইনস্টাইনের বিশ্বাসের মধ্যে অবশ্যই কোনো 'কমিক্যাল' ব্যপার নেই, তাসত্ত্বেও, আমি আশা করি,পদার্থবিজ্ঞানীরা এভাবে বিশেষ রূপক অর্থে 'ঈশ্বর' শব্দটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবেন। পদার্থবিদদের রূপকার্থে ব্যবহৃত বা সর্বেশ্বরবাদের এই 'ঈশ্বর', বাইবেলে বর্ণিত, সবকিছুতে সরাসরি হস্তক্ষেপকারী, অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটানোয় পারদর্শী, অন্তর্যামী, পাপের শাস্তি প্রদানকারী, প্রার্থনার উত্তরদাতা, পাদ্রী, মোল্লা বা রাবাইদের বা সাধারণ ভাষায় ব্যবহৃত 'ঈশ্বর' থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে। আমার মতে, ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এই দুই পৃথক 'ঈশ্বর' এর ধারণার মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা একটি মারাত্মক বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্বাসঘাতকতা।

যে 'শ্রদ্ধা' পাওয়ার অযোগ্য

আমার এই বইটির শিরোনাম ‘দ্য গড ডিল্যুশন’ এর ‘গড’ বা ঈশ্বর, আইনস্টাইনের বা আগের অনুচ্ছেদগুলোয় উল্লেখ করা কোনো জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের ঈশ্বর নন। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পূর্বপ্রমাণিত ক্ষমতা আছে বিধায় আমি আগে ভাগেই আইনস্টাইনের ধর্ম ব্যাখ্যা করে নিলাম। এই বইয়ের বাকি অংশে আমি শুধু ‘অতিপ্রাকৃত’ ঈশ্বরদের কথাই বলবো, এদের মধ্যে, আমার অধিকাংশ পাঠক যার সাথে পরিচিত, তিনি হলেন ওল্ড টেস্টামেন্টের ঈশ্বর ‘ইয়াহয়ে’; এই বিষয়ে কথা বলার আগে এবং প্রথম অধ্যায় শেষ করার আগে পাঠকদের সাথে আরেকটা বিষয় আমার স্পষ্ট করা উচিত, নয়ত পুরো বইটি অপব্যাখ্যা করার সুযোগ থেকে যাবে। এবারের বিষয়টি ভদ্রতার। আমি যা বলতে চেয়েছি তা সম্ভবত ধর্মবিশ্বাসী অনেক পাঠকের অনুভূতিতে আঘাত করবে। মনে হতে পারে বইটিতে তাদের নিজেদের বিশ্বাসের (যদিও তাদের বিশ্বাস অন্য অনেকের কাছে মূল্যবান নাও হতে পারে) প্রতি অপর্যাপ্ত সম্মান দেখানো হয়েছে। খুবই দুঃখজনক হবে যদি সেকারণে তারা বইটি না পড়তে চান, সুতরাং শুরুতেই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দিতে চাই।

একটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধারণার অস্তিত্ব আছে, যা সমাজের প্রায় সবাই - যারা ধার্মিক না তারাও - মেনে নিয়েছেন, তা হলো, ধর্মীয় বিশ্বাস যে-কোনো ধরনের আক্রমণে খুব সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সেই জন্য শ্রদ্ধার মোটা দেয়াল দিয়ে ধর্মকে সুরক্ষিত রাখা উচিত। এই শ্রদ্ধার প্রকৃতি মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর। মৃত্যুবরণ করার কিছুদিন আগে কেমব্রিজ এ একটি উপস্থিত বক্তৃতায় ডগলাস অ্যাডামস এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য সবার সাথে ভাগ করে নেবার ব্যপারে আমি কখনো ক্লান্তিবোধ করিনা (৩২):

> ধর্ম .. এর কেন্দ্রে কিছু বিশেষ ধারণা আছে যা আমরা নাম দিয়েছি, পরম শ্রদ্ধেয় বা পবিত্র ইত্যাদি। যার সার কথা হলো, ‘এই যে এটা হচ্ছে একটি ধারণা বা অভিমত, যার বিরুদ্ধে খারাপ কিছু বলার আপনার কোনো অনুমতি নেই’; আপনি বলতে পারবেন না এটাই চূড়ান্ত। কেন না, কি কারণে? - কারণ, আপনি বলতে পারবেন না!, এটাই হলো শেষ কথা। কেউ যদি এমন কোনো দলকে ভোট দেয় যার সাথে আপনি একমত নন, আপনি কিন্তু তখন তার সাথে যত খুশি তত তর্ক করতে পারবেন; সবারই কোনো না কোনো নিজস্ব মতামত আছে, কেউই কিন্তু কোনো বিশেষ দুঃখ পায় না সেই বিতর্কে। কেউ যদি মনে করেন কর বাড়ানো বা কমানো উচিত, সে বিষয়ে যে-কোনো ধরনের যুক্তিতর্ক উপস্থাপন বা মতামত প্রকাশের অধিকার তার আছে। কিন্তু কেউ যদি বলে, ‘শনিবারে আলো জালানো জন্য সুইচটাও আমার ধরা উচিত না, আপনি বলবেন, ‘আমি সেটা শ্রদ্ধা করি’; কেনই বা এটা সম্পূর্ণভাবে ন্যায়সঙ্গত হবে? যেমন ধরুন, লেবার পার্টি কিংবা কনসারভেটিভ পার্টি,

> রিপাবলিকান কিংবা ডেমোক্র্যাট, অর্থনীতির এই মডেল বা অন্য কোনো মডেল, উইনডোজ বনাম ম্যাকিনটশকে সমর্থন করা নিয়ে বিভিন্ন জনের ভিন্ন ধরনের মতামত থাকতে পারে। কিন্তু কিভাবে মহাবিশ্বের শুরু হলো, আর কে এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলো, এই বিষয়ে কোনো মতামত প্রকাশ করা যাবে না, আর তার কারণ হচ্ছে এটি পবিত্র একটি বিষয়। সাধারণত ধর্মীয় কোনো বিষয়কে চ্যালেঞ্জ না করাটাই আমাদের নিয়ম। কিন্তু আসলেই বিষয়টা দারুণ কৌতূহলের কারণ হয়, যখন রিচার্ডের (রিচার্ড ডকিন্স) সেই কাজটি করার জন্য হৈ চৈ পড়ে যায়! প্রত্যেকেই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে ওঠেন, কারণ এই ধরনের কথা বলার কোনো অনুমতি নেই। অথচ যুক্তি মেনে বিষয়টা ভাবলে দেখা যাবে, ঐ সব বিষয়গুলো নিয়ে অন্য যে-কোনো বিষয়ের মত কেন কোনো বিতর্ক করা যাবে না, তার কিন্তু যৌক্তিক কোনো কারণ নেই। শুধুমাত্র আমরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে একমত হয়ে ঠিক করেছি যে, এটা অবশ্যই করা যাবে না।

ধর্মের প্রতি সমাজের অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা প্রদর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ দেই। যুদ্ধকালীন সময়ে সামরিক দ্বায়িত্ব পালন এড়াতে 'বিবেকজনিত কারণে বিরোধিতা' করার অবস্থান পাবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল 'ধর্মীয়' কারণ দেখানো। আপনি হতে পারেন একজন বিখ্যাত নীতিশাস্ত্রবিদ দার্শনিক, হতে পারেন যুদ্ধের ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আপনার কোনো পুরস্কার পাওয়া নিরীক্ষাধর্মী ডক্টরাল থিসিস আছে। তারপরও সেনাবাহিনীর ড্রাফট বোর্ড আপনার 'বিবেকজনিত' কারণে যুদ্ধ বিরোধিতার মূল্যায়ন করতে বেশ ঝামেলা করবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন আপনার বাবা- মা দুইজন অথবা তাদের একজন কোয়েকার (৩৩), তাহলে ব্যপারটা পানির মত সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য, সেক্ষেত্রে প্যাসিফিজম বা শান্তিবাদের তত্ত্ব বা এমনকি কোয়েকারবাদের ওপর আপনার সামান্যতম জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক তা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শান্তিবাদের আবার একেবারে বিপরীতপ্রান্তে পারস্পরিক যুদ্ধরত পক্ষগুলোর ধর্মীয় নাম ব্যবহার করার অনীহা প্রায়ই লক্ষ করা যায়, যেমন, উত্তর আয়ারল্যান্ডে, ক্যাথলিক আর প্রটেস্টান্টরা নিজেদের নামকরণ করেছে যথাক্রমে 'ন্যাশনালিষ্ট' আর 'লয়ালিষ্ট'; 'ধর্ম' শব্দটাই সুকৌশলে সেন্সরশীপের মাধ্যমে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা হচ্ছে 'সমাজ' বা 'গোত্র' শব্দের সমার্থক হিসাবে, যেমন: 'আন্তঃগোত্র যুদ্ধ; ২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসনের পর ইরাকে শিয়া এবং সুন্নি মতাবলম্বী মসুলমানদের মধ্যে যে গোত্রভিত্তিক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল সেটি সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় মতাদর্শের সংঘাত - অথচ ২০০৬ সালের ২০ মে ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকা তাদের প্রথম পাতার প্রধান শিরোনাম ও খবর, দুটোতেই গোত্রবিত্তিক গৃহযুদ্ধকে বর্ণনা করেছিল 'জাতিগত বিশোধন' হিসাবে। এক্ষেত্রে জাতিগত শব্দটি আরেক সুভাষণ বা গ্রহনযোগ্য প্রতিশব্দ

মাত্র। ইরাকে আমরা যা দেখছি, সেটা আসলে ধর্মীয় বিশোধন। ‘জাতিগত বিশোধন’ - শব্দটির মূল ব্যবহারক্ষেত্র ছিল প্রাক্তন ইয়োগোস্লাভিয়া - তর্কসাপেক্ষে যা বলা যেতে পারে অর্থডক্স সার্ব, ক্যাথলিক ক্রোয়াট, মুসলিম বসনীয় ‘ধর্মীয় বিশোধনের’ একটি সুভাষণ বা গ্রহনযোগ্য প্রতিশব্দ।

গণমাধ্যম এবং সরকারের সামাজিক নৈতিকতা বিষয়ে কোনো ধরনের সাধারণ আলোচনায় ধর্মকে যে বিশেষ সুযোগ দেয়া হয়ে থাকে, এই বিষয়টার প্রতি আমি আগেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছি (৩৪) ; যখনই যৌন বা প্রজনন বিষয়ক ব্যক্তিগত নৈতিকতা সংক্রান্ত কোনো ধরনের বিতর্ক হয়, আপনি বাজি রাখতে পারেন, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী দলকে প্রতিনিধিত্বকারী ধর্মীয় নেতাদের সবসময়ই, প্রভাবশালী কমিটিগুলোতে, রেডিও বা টেলিভিশনের প্যানেল আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখা যায়। আমি বলতে চাচ্ছি না যে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এদের মতামতগুলোকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; কিন্তু আমার প্রশ্ন, মতামতের জন্য কেন সমাজ এদের দ্বারস্থ হয়, কেনই বা আমরা ভাবি যে, কোনো নীতিশাস্ত্রীয় দার্শনিক, কিংবা পারিবারিক আইনে পারদর্শী আইনজীবি অথবা একজন চিকিৎসকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে এমন যোগ্যতা এদের আছে?

ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেবার আরেকটা অদ্ভুত উদাহরণ দেই: ২০০৬ সালে ২০ ফেব্রুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান অনুযায়ী রুল জারী করেছিল, নিউ মেক্সিকোর একটি চার্চ হ্যালুসিনোজেনিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় পড়বে না, যা বাকি সবার জন্য প্রযোজ্য ;‘সেন্ট্রো এসপিরিটা বেনেফিসিয়েন্টো উনিয়াও দো ভেজেটাল (ইউভিডি)’ চার্চের বিশ্বাসী সদস্যরা মনে করেন ঈশ্বরকে বুঝতে হলে তাদের অবশ্যই হোয়াসকা চা পান করতে হবে, যার মধ্যে বেআইনী হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ 'ডাইমিথাইল ট্রিপ্টামিন' আছে (৩৫) । লক্ষ করার বিষয় হলো, তারা যে বিশ্বাস করে এটা তাদের ঈশ্বরকে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, সেই বিশ্বাসটাই যথেষ্ট, এর জন্য আদালতে তাদের কোনো প্রমাণ দাখিল করতে হয়নি। আরেকদিকে ক্যানাবিস (গাজা), কেমোথেরাপী পাচ্ছে এমন ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের বমি বমি ভাব এবং কিছু অস্বস্তিকর উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে, তার পক্ষে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের এই সুপ্রীম কোর্টই ২০০৫ এ সংবিধান অনুযায়ী রুল জারী করেছিল, যারা চিকিৎসা হিসাবে ক্যানাবিস ব্যবহার করছে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে বিচার করা যেতে পারে (এমনকি সেই সব অঙ্গরাজ্যেও যেখানে বিশেষ ক্ষেত্রে ক্যানাবিসের ব্যবহার আইনসিদ্ধ); ধর্ম, সবসময়ের মতোই এখানেও ট্রাম্প কার্ড। কল্পনা করুন তো কি সম্ভাব্য ফলাফল হতে পারে, যদি কোন শিল্পকলা সমঝদার গ্রুপের সদস্যরা কোর্টে আবেদন করেন এমন দাবী করে যে, তারা ‘বিশ্বাস’ করেন, ইমেপ্রশনিষ্ট (৩৬) বা সুরিয়ালিষ্টদের (৩৭) শিল্পকর্ম ভালোভাবে বোঝার জন্য

অবশ্যই তাদের হ্যালুসিনোজেনিক ড্রাগ ব্যবহার করা প্রয়োজন । অথচ যখন কোনো চার্চ একই ধরনের প্রয়োজনের জন্য দাবী জানিয়েছে, দেশটির সর্বোচ্চ আদালত সেটি সমর্থন করেছে। এরকমই শক্তি ধারণ করে ধর্ম, তাবিজের মতন।

প্রায় আঠারো বছর আগে ছত্রিশ জন লেখক এবং শিল্পী দলের আমিও একজন ছিলাম, যাদের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর সমর্থনে কিছু লেখার জন্য (৩৮) ; একটি উপন্যাস লেখার জন্য তখন সালমান রুশদীর (৩৯) উপর মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া (৪০)। খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতাদের এবং বেশ কিছু ধর্ম নিরেপক্ষ মতবাদীদের, মুসলিম জনগনের ধর্মবিশ্বাসে ‘আঘাত’ আর ‘অপমান’ এর জন্য ‘সমবেদনা’ প্রকাশের ভাষা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে এরকমই তুলনা করেছিলাম:

> যদি বর্ণবাদের সমর্থকরা বুদ্ধিমান হতেন, তারা যদি দাবী করতে পারতেন - আমিও যেটা সত্যি বলে জানি - মিশ্র বর্ণের জাতিকে অনুমোদন দেয়া তাদের ধর্ম বিরুদ্ধ। সেক্ষেত্রে বর্ণবাদ বিরোধীদের বড় একটা অংশ শ্রদ্ধার সাথে নীরবে সরে যেত। এই ধরনের তুলনা করা সঠিক হবে না কারণ বর্ণবাদের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই - আমার মনে হয় এই ধরনের দাবী করাটা অর্থহীন হবে, ভিত্তিহীনতা হল ধর্মীয় বিশ্বাসেরও সারকথা, এর শক্তি এবং প্রধানতম গৌরব। আমাদের সবাইকে আমাদের সকল সংস্কার বা প্রেজুডিসের ব্যাখ্যা বা আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হয়, কিন্তু যখনই আপনি একজন ধর্মীয় ব্যক্তিকে তার বিশ্বাসের যৌক্তিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে বলবেন, তখনই আপনি তার ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন।

একবিংশ শতাব্দীতে এরকমই কিছু একটা যে ঘটবে তখন আমার জানা ছিল না। লস এঞ্জেলেস টাইমস (১০ এপ্রিল ২০০৬) রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অসংখ্য ক্যাম্পাস ভিত্তিক খ্রিস্টান সংগঠনগুলো ‘সমকামিদের হয়রানি আর নির্যাতন’ নিষিদ্ধ করে প্রণীত ‘বৈষম্যবিরোধী আইন’ প্রয়োগ শুরু করার জন্য তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে মামলা করছে। এ ধরনের আদর্শ উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে: ২০০৪ সালে ওহাইওর ১২ বছরের একজন কিশোর, জেমস নিক্সন স্কুলে ‘সমকামিতা হচ্ছে পাপ’, ‘ইসলাম হলো মিথ্যা’,‘গর্ভপাত মানে হত্যা’ এবং ‘কিছু কিছু বিষয় এমন স্পষ্ট সাদা আর কালো’- লেখা টি-শার্ট পরে স্কুলে যাবার অধিকার জিতে নিয়েছিল আদালতে (৪১) । স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে এই ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ টি-শার্ট পরে স্কুলে আসা নিষিদ্ধ করলে, তার বাবা মা স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিবেকের কাছে কিন্তু অনেক বেশি গ্রহনযোগ্য হত যদি তারা মামলা ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করতো সংবিধানের প্রথম সংশোধনী, যা স্বাধীন মতামত প্রকাশ

করার অধিকার নিশ্চিৎ করে। কিন্তু তারা তা করেননি, বরং নিক্সনের আইনজীবি আদালতে আবেদন করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের যে ধারায়, ‘ধর্ম পালনের স্বাধীনতার পূর্ণ অধিকার আছে’, সেই ধারায় সফল এই মামলাটা পরিচালনায় পৃষ্টপোষকতা করেছিলো, ‘অ্যালিয়েন্স ডিফেন্স ফান্ড অফ অ্যারিজোনা’, যাদের অন্যতম প্রধান কাজ হলো ‘ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য আইনী লড়াই চালিয়ে যাওয়া’।

রেভারেন্ড রিক স্কারবোরো, এই ধরনের অনেকগুলো খ্রিস্টান ও ধর্মীয় মদদপুষ্ট আইনী লড়াই, যা কিনা ‘সমকামি’ ও অন্যান্য গ্রুপদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করার অধিকারের আইনসম্মত যুক্তিযুক্ত কারণ হিসাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, সমর্থন করে এদেরকে চিহ্নিত করেছেন, ‘একবিংশ শতাব্দীর নাগরিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম’ হিসেবে: ‘খ্রিস্ট ধর্মানুসারীরা খ্রিস্ট হবার অধিকার আদায়ের সংগ্রামে দৃঢ় অবস্থান নেবে’। আবারো এই মানুষগুলো যদি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করার অধিকার দাবীতে তাদের অবস্থান নিতেন, হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনেকেই সমর্থন জানাতেন। কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ‘খ্রিস্টান হবার অধিকার’ এই ক্ষেত্রে ‘অন্য মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানোর অধিকার’ (৪২)। সমকামিদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের পক্ষে মামলা এখন উল্টো ব্যবহার করা হচ্ছে তথাকথিত ধর্মীয় বৈষম্যমূলক আচরণের মামলা হিসাবে! আইনেরও সায় আছে বলে মনে হচ্ছে ব্যাপারটায়। আইনের হাত থেকে আপনি রেহাই পাবেন না, যদি বলেন, ‘সমকামিদের অপমান করা থেকে আমাকে নিষেধ করার চেষ্টা করা মানে আমার সংস্কার বা ঘৃণা প্রকাশ করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা’; কিন্তু আপনি রেহাই পেতে পারেন যদি বলেন, ‘এটা আমার ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে’। যখন আপনি চিন্তা করবেন পার্থক্যটা আসলে কোথায়? এখানে আবারো, ধর্ম সবকিছুকেই ট্রাম্প করে।

একটি বিশেষ কেস স্টাডি দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করছি, যা বিশেষ করে প্রমাণ করে, ধর্মের প্রতি সাধারণ মাত্রার মানবিক শ্রদ্ধার অনেক উপরে অবস্থান করছে সমাজের মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধা। ঘটনাটি বিশাল আকার ধারণ করে বিস্ফোরিত হয়েছিল ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সালে হাস্যকর এই ঘটনায়, যা চূড়ান্ত মাত্রায় কোনো কমেডি আর ট্রাজেডির মধ্যে দিক পরিবর্তন করেছে অপ্রত্যাশিত উন্মত্ততায়; এর আগের বছর (২০০৫) সেপ্টেম্বর মাসে একটি ড্যানিশ দৈনিক, ‘জিল্যান্ডস পোস্টেন’, নবী মোহাম্মদকে নিয়ে মোট বারোটি কার্টুন প্রকাশ করেছিল। এর পরবর্তী তিন মাস ডেনমার্কে বসবাসকারী অল্প কিছু সংখ্যক মসুলমান, খুব সাবধানে ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিগতভাবে পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশগুলোতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এদের নেতৃত্ব দেন দুই ইমাম, যাদের একসময় নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছিল দেশটি (৪৩)। ২০০৫ সালে অশুভ অনিষ্ট করার মানসিকতা নিয়ে এই দুই নির্বাসিত ইমাম ডেনমার্ক থেকে মিসরে আসেন একটি ফাইল নিয়ে। সেখানে সেগুলো অনুলিপি করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে

দেয়া হয়, বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ায়। এই ফাইলে ছিল, ডেনমার্কে মসুলমানদের উপর তথাকথিত নির্যাতনের কিছু বানোয়াট বর্ণনা এবং একটি উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাচার, যা দাবী করছে 'জিল্যান্ডস পোস্টেন' একটি ডেনিশ সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা।

এছাড়াও এর সাথে সেই বারোটা কার্টুন তো ছিলই এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, ইমামরা এর সাথে তিনটি অতিরিক্ত কার্টুন যোগ করেছিলেন, যার উৎপত্তি খুবই রহস্যজনক এবং অবশ্যই ডেনমার্কের সাথে তার কোনো যোগাযোগ নেই। মূল বারো কার্টুনের চেয়ে এই তিনটি কার্টুনগুলো আরো বেশি অপমানজনক ছিল, বা হতে পারতো যদি - এই উৎসাহী প্রচারণাকারীদের অভিযোগ অনুযায়ী - সেগুলো সত্যি মোহাম্মদকে ব্যঙ্গ করে আঁকা হতো। এদের মধ্যে বিশেষ করে ক্ষতিকরটি আদৌ কোনো কার্টুন নয়; শুকরের নকল নাক ইলাস্টিক দিয়ে মুখে বাঁধা দাড়িওয়ালা মানুষের ফ্যাক্স করে পাঠানো একটি আলোকচিত্র। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল, ছবিটা আসলে অ্যাসোসিয়েট প্রেসের তোলা ফ্রান্সের একটা গ্রাম্য মেলায় পিগ স্কুইলিং প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা একজন ফরাসী ব্যক্তির ছবি (৪৫), এই ছবির সাথে মোহাম্মদের কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই, ইসলাম ধর্মেরও কোনো সম্পর্ক নেই, আর অবশ্যই ডেনমার্কের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু মুসলিম আন্দোলনকারীরা তাদের ঝামেলা পাকানো কায়রো সফরে এই ছবির সাথে এই তিনটি সম্পর্কই জোড়া লাগিয়ে দিয়েছিল, আর এর ফলাফল যা ধারণা করা হয় ঠিক তাই হয়েছিল।

মূল বারোটি কার্টুন প্রকাশের পাঁচ মাস পর খুব সাবধানে সাজানো এই 'আঘাত' এবং 'আক্রমণ' এর প্রতিক্রিয়ায় ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে সারা বিশ্বব্যপী। পাকিস্তান আর ইন্দোনেশিয়ায় বিক্ষোভকারীরা ডেনমার্কের পতাকা পোড়ায় (কার কাছ থেকে তারা জোগাড় করেছিল সেই পতাকা?); ডেনিশ সরকারের প্রতি উন্মত্ত দাবী জানানো হল, ক্ষমা চাইবার জন্য (কিসের জন্য ক্ষমা চাইবে, ডেনিশ সরকার কার্টুনগুলো আঁকেনি বা প্রকাশও করেনি। ডেনিশ নাগরিকরা এমন একটা দেশে বসবাস করে, যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, যা অনেক ইসলামী দেশের বসবাসকারীদের পক্ষে খুব সহজে বোঝা সম্ভব না)। নরওয়ে, জার্মানী, ফ্রান্স, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে (কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রিটেনে না) বেশ কিছু দৈনিক পত্রিকা জিল্যান্ডস পোষ্টেনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে কার্টুনগুলো পুনঃপ্রকাশ করলে তা বিক্ষোভের আগুন আরো উসকে দেয়। দুতাবাস ভাংচুর, ড্যানিশ পণ্য বয়কট, ডেনিশ নাগরিকদের, মূলত সকল পশ্চিমাদের শারীরিক আক্রমণের হুমকি দেয়া হয়। পাকিস্তানে খ্রিস্টানদের গীর্জা পোড়ানোর ঘটনা ঘটে, যাদের সাথে ইউরোপিয়ান বা ডেনিশদের কোনো সম্পর্কই নেই। লিবিয়ার বেনগাজীতে ইতালিয়ান কনসুলেটে দাঙ্গাকারীদের আক্রমণের সময় নয় জন প্রাণ হারান। জেরমাইন গ্রিয়ার লিখেছিলেন 'এই মানুষগুলো যা করতে পছন্দ করে, আর যেটা ভালো করতে পারে তা হলো বিশৃঙ্খলা (৪৬)'।

ডেনিশ কার্টুন-শিল্পীকে হত্যা করতে পাকিস্তানী এক ইমাম এক মিলিয়ন ডলার পুরষ্কারও ঘোষণা করেছিলেন - বোঝাই যাচ্ছে তাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে, একজন না, সেই কার্টুনগুলো বারো জন শিল্পীর আঁকা কার্টুন ছিল, আর অবশ্যই কোনো ধারণা ছিল না যে, তিনটি বিশেষভাবে আপত্তিজনক ছবি কিন্তু আদৌ ডেনমার্কে উৎপত্তি হয়নি (আর, প্রসঙ্গক্রমে, ঐ মিলিয়ন ডলার জোগাড় হলো কোথা থেকে?); নাইজেরিয়াতে ডেনিশ কার্টুনগুলোর বিরুদ্ধে মসুলমান বিক্ষোভকারীরা বেশ কিছু চার্চ ধ্বংস করেছিল এবং ম্যাশেটে (এক ধরনের ছুরি) দিয়ে রাস্তায় খ্রিস্টানদের (কালো নাইজেরীয়) আক্রমণ ও হত্যা করেছিল। একজন খ্রিস্টানকে রাবারের টায়ারের মধ্যে বেধে রেখে তার গায়ে পেট্রল ঢেলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদের ছবি সংবাদপত্রগুলোতে প্রকাশিত হলে দেখা যায়,'হত্যা করো যারা ইসলামকে অপমান করে', 'জবাই করো যারা ইসলামকে ব্যঙ্গ করে', 'ইউরোপকে এর শাস্তি পেতে হবে'; লেখা ব্যানার হাতে বিক্ষোভকারীদের ছবি। সৌভাগ্য যে, ইসলাম যে শান্তির আর দয়ার ধর্ম সেটা আমাদের মনে করিয়ে দেবার জন্য রাজনীতিবিদরা বেশ তৎপর ছিলেন।

এই সব ঘটনার পরবর্তীতে সাংবাদিক অ্যান্ড্রু মুয়েলার ব্রিটেনের নেতৃত্বস্থানীয় 'মধ্যপন্থী' বা মডারেট মুসলিম নেতা স্যার ইকবাল স্যাকরানির (৪৭) সাক্ষাৎকার নেন (৪৮) ; আজকের ইসলামের মাপকাঠিতে হয়তো তিনি 'মধ্যপন্থী' হতে পারেন, কিন্তু অ্যান্ড্রু মুয়েলারের সাক্ষাৎকার অনুযায়ী তিনি এখনো, সালমান রুশদীকে মৃত্যুদণ্ডের ফতোয়া দেয়ার সময় তার উচ্চারণ করা বহু অসহিষ্ণু মন্তব্য থেকে কিন্তু সরে আসেননি: 'মৃত্যুদণ্ড তার জন্য হয়তো অনেক সহজ শাস্তি' ; এই মন্তব্য তাকে অত্যন্ত অসন্মানের সাথে পৃথক করে দেয় তার সাহসী পূর্বসূরি প্রয়াত ডঃ জাকী বাদাওয়ী (৪৯) থেকে, যিনি তার নিজের বাসায় সালমান রুশদীকে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সাকরানী মুয়েলারকে বলেছিলেন, তিনি ডেনিশ কার্টুন নিয়ে খুবই চিন্তিত, মুয়েলার নিজেও চিন্তিত, কিন্তু ভিন্ন কারণে : 'আমি চিন্তাগ্রস্থ কারণ অখ্যাত কোনো এক স্ক্যান্ডিনিভিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এই সব আদৌ হাস্যকর নয় এমন কতগুলো কার্টুন যে ভাবে অদ্ভুত রকমের মাত্রাহীন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে তা স্পষ্ট করে দেয় ইসলাম এবং পশ্চিম আসলে মূল ভাবগতভাবেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ, স্যাকরানি অপরদিকে ব্রিটিশ গণমাধ্যমের প্রশংসা করেছেন কার্টুনগুলো পুনঃপ্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে, প্রত্যুত্তরে মুয়েলার ব্রিটেনের অধিকাংশ মানুষের সন্দেহকে কণ্ঠ দিয়ে বলেছিলেন, 'কার্টুনগুলো প্রকাশ না করার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পত্রিকাগুলোর সংযম প্রদর্শনের কারণ মুসলিমদের প্রতি সমমর্মিতা নয়, বরং কেউ তাদের জানালা ভাঙ্গুক সেটা আসলে তারা চাননি'।

স্যাকরানি ব্যাখা করেন, 'ব্যক্তি নবীকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক), সমস্ত মুসলিম জগত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে, যে ভালোবাসা কোনো শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যা তাদের পিতামাতা, প্রিয়জন, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা থেকেও বেশি। এটা তাদের

বিশ্বাসেরই অঙ্গ। এছাড়াও সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা আছে নবীর কোনো প্রতিকৃতি আঁকার ব্যপারে'। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে মুয়েলারের ভাষা:

> তাহলে এর অর্থ হচ্ছে ইসলামের মূল্যবোধ অন্য যে কারোর মূল্যবোধের উপরে অবস্থান করে - অন্য যে-কোনো ধর্মের অনুসারীরা যেমন করে বিশ্বাস করেন, তাদেরটাই একমাত্র পথ, সত্য আর আলোকময়, সেভাবে ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরাও সেটাই মনে করেন । যদি কেউ সপ্তম শতাব্দীর একজন ধর্ম প্রচারককে তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্যদের চেয়ে বেশি ভালোবাসার ইচ্ছা পোষণ করেন, সেটা শুধুমাত্র তাদের ব্যপার; বিষয়টিকে গুরুত্ব দেবার জন্য অন্য আর কেউ বাধ্য নয়।

শুধু পার্থক্য, আপনি যদি ব্যপারটা গুরুত্বের সাথে না নেন, এবং প্রয়োজনীয় সম্মান না দেখান, সেক্ষেত্রে আপনাকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি দেয়া হবে, এবং সেটা এমন এক মাত্রায় যা মধ্যযুগ পরবর্তী আর কোনো ধর্মেই আর কখনো দেখা যায়নি। তাই যে কাউকেই বিষযটা চিন্তা করতে বাধ্য করে, কেন এই ধরনের সহিংসতা প্রয়োজন, কারণ, মুয়েলারের পর্যবেক্ষণ: 'আপনাদের মত ভাড়দের কেউ যদি সত্যি হন আপনাদের ধর্মের ব্যপারে, সেক্ষেত্রে এই কার্টুনিষ্টরা তো নরকেই যাবে, সেটাই কি যথেষ্ট নয় ? আর ততক্ষণ মসুলমানদের উপর নির্যাতনের ব্যপারে যদি আপনাদের উত্তেজিত হতে একান্ত ইচ্ছাই করে, তাহলে সিরিয়া আর সৌদি আরবের উপর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টটা পড়লেই হবে'।

অনেক মানুষই বিস্মিত হয়ে লক্ষ করেছেন স্নায়ুবিকারগ্রস্তের মত 'ধর্মীয় বিশ্বাসে 'আঘাত' করার কথা বলা মসুলমান আর আরব মিডিয়ায় গৎবাঁধা ইহুদী-বিরোধী কার্টুন ছাপানোর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রদর্শনের মধ্যকার পার্থক্যটা। পাকিস্তানে ডেনিশ কার্টুনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের একটা ছবিতে দেখা যায়, কালো বোরখা পরা একজন মহিলার হাতে ব্যানার, তাতে লেখা, 'ঈশ্বর হিটলারকে আশীর্বাদ করুন'। এইসব বিশ্বব্যাপী উন্মত্ত বিশৃঙ্খলার প্রতিক্রিয়ায়, ভদ্র, উদারপন্থী দৈনিকগুলো সহিংসতাকে নিন্দা আর বাকস্বাধীনতার উপর দায়সারা মন্তব্য করে এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একই সাথে তারা মসুলমানদের এই গভীর 'আঘাত' ও 'অপমান' সহ্য করবার জন্য তাদের 'শ্রদ্ধা' আর 'সমবেদনা' প্রকাশ করেছে। মনে রাখতে হবে এই আঘাত এবং কষ্ট কিন্তু কোনো ব্যক্তিদের প্রতি নির্দেশিত না, যারা সহিংসতা সহ্য করেছে, বা কোনো ধরনের সত্যিকার যন্ত্রণা সহ্য করেছে : বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রচারণা ছাড়া ডেনমার্কের বাইরে কেউই কোনোদিন নামই শুনতো না এমন অখ্যাত এক খবরের কাগজে ছাপা কয়েক ফোটা কালি দাগ ছাড়া যা আর কিছুই ছিল না।

আমি কাউকে অপমান বা আঘাত করার খাতিরে অপমান বা আঘাত করার পক্ষপাতী নই। কিন্তু খুবই অবাক হই আর রহস্যময় মনে হয়, আমাদের এই অন্য প্রায় সব অর্থেই ধর্মনিরপেক্ষ সমাজগুলোয় ধর্মকে কেন এই মাত্রাতিরিক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়। সব রাজনীতিবিদরাই হেয় করা কার্টুনের শিকার হন, কিন্তু তাদের সমর্থনে তো কোনো দাঙ্গা হয় না। ধর্মের কি এমন যোগ্যতা আছে যে তাকে এই বিশেষ মর্যাদা দিতে হবে। যেমন, এইচ. এল. মেনকেন (৫০) বলেছিলেন, 'অন্য কারো ধর্মকে অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধা করতে হবে কিন্তু সেটা শুধুমাত্র তার স্ত্রী সুন্দরী এবং তার ছেলেমেয়েরা বেশি বুদ্ধিমান, তার নিজস্ব এই তত্ত্বটিকে যে অর্থে এবং যতটুকু আমরা শ্রদ্ধা করি, কেবল ততটুকুই'। 'ধর্মের প্রতি সমাজের এই ধরনের অতুলনীয় শ্রদ্ধা বিদ্যমান' এই পূর্বধারণার আলোকেই আমি এই বইয়ের জন্য আমার নিজস্ব দায়-দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে নিচ্ছি (৫১) । আমি কাউকে আঘাত করার জন্যে এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্যের বাইরে যেমন যাবো না, তেমনি আমি ধর্ম নিয়ে আলোচনা করার সময় আর অন্য যে-কোনো বিষয় নিয়ে যেভাবে আলোচনা করতাম তার চেয়ে হালকাভাবেও করবো না।

টীকা:

(১) চার্চ অফ ইংল্যান্ডের সার্থে সংশ্লিষ্ট।

(২) চ্যাপলেইন: সাধারণত কোন ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কোন ধর্মীয় যাজক।

(৩) আমাদের জন্য মজার একটা খেলা ছিল, ক্লাসে পড়ানোর সময় তাকে বাইবেলের আলোচনা থেকে সরিয়ে ফাইটার কম্যান্ড আর 'দ্য ফিউ' পাইলটদের (Few হচ্ছে রয়্যাল এয়ার ফোর্সের বিমান সেনারা, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্যাটল অব ব্রিটেনে অংশ নিয়েছিলেন, ফিউ নামটি এসেছে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিলের উদ্ধৃতি : never was so much owed by so many to so few উদ্ধৃতি থেকে) শিহরণ জাগানো গল্পের দিকে নিয়ে যাওয়া। কারণ যুদ্ধের সময় তিনি রয়্যাল এয়ার ফোর্সে কাজ করেছিলেন। কিছুটা পরিচিত আর স্নেহসূলভ একটি অনুভূতি দিয়ে আমি আজও চার্চ অফ ইংল্যান্ডকে মনে রেখেছি (অন্ততপক্ষে এর অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায়); আমি পরে আমি জন বেচামেন (John Betjamen - ব্রিটিশ রাজকবি, লেখক) এর কবিতায় পড়েছিলাম:

Our padre is an old sky pilot,
Severely now they've clipped his wings'
But still the flagstaff in the recotry garden
points to higher things

(৪) ওরাইওন, ক্যাসিওপিয়া ও উরসা মেজর, নক্ষত্রপূঞ্জের নাম।

(৫) মিল্কি ওয়ে হচ্ছে সেই ছায়াপথ বা গ্যালাক্সী, যেখানে আমাদের সৌরজগত অবস্থিত। মিল্কি ওয়ে নামটি ল্যাটিন ভায়া ল্যাকটিয়া শব্দটি থেকে এসেছে,যার উৎস গ্রিক শব্দ গ্যালাক্সিয়াস কিকলোস, বা মিল্কি সারর্কেল।

(৬) অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস (পুরো শিরোনাম On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life), চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) লেখা যুগান্তকারী একটি গ্রন্থ, এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালের ২৪ নভেম্বর।

(৭) Entangled bank – অন দি অরিজিন অব স্পিসিস বইটির শেষ অনুচ্ছেদ।

(৮) কার্ল এডওয়ার্ড সেগান (১৯৩৪-১৯৯৬), আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কসমোলজিষ্ট, জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী, বিজ্ঞান লেখক।

(৯) কার্ল এডওয়ার্ড সেগানের Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (1994)

(১০) স্টিভেন ওয়াইনবার্গ (জন্ম ১৯৩৩) আমেরিকার তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ও লেখক। আব্দুস সালাম ও শেলডন গ্ল্যাশোর সাথে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন ১৯৭৯ সালে।

(১১) Dreams of a Final Theory: The Scientist's Search for the Ultimate Laws of Nature (1994)

(১২) আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) জার্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, পৃথিবীর অন্যতম সেরা ও সুপরিচিত বিজ্ঞানী, তার জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সাথে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি রচনা করেছে।

(১৩) স্টিফেন উইলিয়াম হকিং (জন্ম ১৯৪২) ইংরেজ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, কসমোলজিষ্ট।

(১৪) 'তবে আমরা যদি একটি সম্পূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারি, সময়ের সাথে এটি সবার জন্য বোধগম্য হয়ে ওঠা উচিত, শুধুমাত্র গুটিকয়েক বিজ্ঞানী শুধু নয়। তারপর আমরা সবাই, দার্শনিক,বিজ্ঞানী এবং যে কোনো সাধারণ মানুষ সেই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা অংশ নেবার জন্য যোগ্য হয়ে উঠবো : কেন আমরা এবং এই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব আছে। আমরা যদি এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে পাই, সেটি হবে মানব যুক্তির চূড়ান্ত বিজয় - কারণ তখনই আমরা ঈশ্বরের মন সম্বন্ধে জানতে সক্ষম হবো। (A Brief History of Time, Stephen Hawking, p.193);

(১৫) উরসুলা ডাবলিউ. গুডএনাফ (জন্ম ১৯৪৩) সেইন্ট লুইসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক।

(১৬) হিউ জন লফটিং (১৮৮৬-১৯৪৭) একজন ব্রিটিশ সাহিত্যিক, পেশাগত জীবনে প্রকৌশলী, ডঃ ডুলিটল চরিত্রটির স্রষ্টা।

(১৭) এইচ এম এস বীগল (HMS Beagle), ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ। এটি নির্মিত হয়েছিল ১৮২০ সালের ১১ মে। ডারউইনকে নিয়ে এর দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা (২৭ ডিসেম্বর ১৮৩১ - ২ অক্টোবর ১৮৩৬) এই জাহাজটিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে ইতিহাসে।

(১৮) গিলবার্ট হোয়াইট (১৭২০-১৭৯৩), ইংরেজ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, এবং পাখি বিশেষজ্ঞ।

(১৯) পারসন, যুক্তরাজ্যের অ্যাঙলিকান চার্চের কর্মকর্তা যাজক, যিনি নির্দিষ্ট একটি এলাকা বা প্যারিশ-এর আইনগত প্রধান হতেন চার্চের আইন অনুযায়ী।

(২০) জুলিয়ান বাগিনি (জন্ম ১৯৬৮) ব্রিটিশ দার্শনিক, সাধারণ পাঠকদের জন্য রচিত বেশ কিছু দর্শন বিষয়ক বইয়ের রচয়িতা।

(২১) স্নায়ু কোষ, যারা আমাদের স্নায়ুতন্ত্র গঠন করে, যেমন মস্তিষ্ক, মেরুরজ্জু।

(২২) মার্টিন জন রীস (জন্ম ২৩ জুন, ১৯৪২) ব্রিটিশ কসমোলজিষ্ট এবং জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানী, অ্যাস্ট্রোনোমার রয়্যাল ছিলেন ১৯৯৫ অবধি, ২০০৫ থেকে ২০১০ অবধি রয়াল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন।

(২৩) টেলিভিশন ডকুমেন্টরী, ইন্টারভিউ যার একটা অংশ: Winstone R (2005). The Story of God. London. Transworld/BBC.

(২৪) ড্যানিয়েল সি ডেনেট (২০০৬) ; Breaking The Spell: Religion as Natural Phenomenon. London: Viking.

(২৫) ম্যাক্স জ্যামার (১৯১৫-২০১০) ইসরায়েলী পদার্থবিজ্ঞানী, পদার্থবিজ্ঞানের দার্শনিক। তার জন্ম হয়েছিল জার্মানীতে।

(২৬) Max Jammer: Einstein and Religion, Princeton University Press,1999

(২৭) একুমেনিকাল কোয়ালিশন, খ্রিস্টীয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য কাজ করে এমন কোন প্রতিষ্ঠান।

(২৮) ফ্রাসোয়া-মারি আরওয়ে (ভলতেয়ার নামে সুপরিচিত- ১৯৬৪-১৭৭৮) ফরাসী দার্শনিক, লেখক, ইতিহাদবিদ।
(২৯) দনি দিদেরো (১৭১৩-১৭৮৪) ফরাসী দার্শনিক, শিল্প সমালোচক এবং লেখক।
(৩০) বারুখ স্পিনোজা (বেনেদিতো দো এসপিনোসা, ১৬৩২-১৬৭৭) ডাচ দার্শনিক।
(৩১) পল চার্লস উইলিয়াম ডেভিস (জন্ম ১৯৪৬) ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী এবং লেখক।
(৩২) সম্পূর্ণ বক্তৃতাটা আছে অ্যাডামস (২০০৩) ‘কৃত্রিম ঈশ্বর বলে কেউ কি আছেন’ শিরোনামে। Adams, D. (2003). The Salmon of Doubt; London.Pan
(৩৩) Quakers (কোয়েকারস): ১৬৬০ সালে জর্জ ফক্স এর প্রতিষ্ঠা করা খ্রিস্টান ধর্মীয় গোষ্ঠী।
(৩৪) Dolly and the clothes head: : A Devil‘s Chaplain: Selected essays. London: Weidenfeld and Nickolson
(৩৫) http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2005/2005-04-1084/; ২০০৫ সালের নভেম্বরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট হোয়াসকা টি এর পক্ষে বিপক্ষে যুক্তিতর্ক শোনেন। হোয়াসকা টি (Ayahuasca) সাধারণত উচ্চারিত হয় আইয়াহুয়াসকা নামে, প্রচলিত ভাষায় ইয়াগে, এটি মূলত একটি সাইকাডেলিক বা হ্যালুসিনেশন করতে সক্ষম এমন একটি মাদক মিশ্রণ, যা তৈরি করা হয় আমাজন অঞ্চলে জন্ম নেয়া দুটি উদ্ভিদ Banisteriopsis caapi এবং Psychotria viridis এর মিশ্রণ ঘটিয়ে, উদ্ভিদ দুটিতে মূলত dimethyltryptamine (DMT) নামের হ্যালুসিনেশন সৃষ্টি করতে সক্ষম এমন একটি রাসায়নিক উপাদান থাকে। ব্রাজিল ভিত্তিক চার্চ O Centro Espirita Beneficiente Uniao do Vegetal (UDV) এর সদস্যরা তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে এই চা ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্রে এই চার্চের মাত্র ১৩০ জন সদস্য বাস করেন। সদস্যরা এই উদ্ভিদ দুটিকে পবিত্র হিসাবে গণ্য করে থাকে। ১৯৯৯ সালে মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক কর্মকর্তারা ব্রাজিল থেকে রপ্তানী করা তিন ড্রাম হোয়াসকা টি এর উপকরণ আটক করেছিলেন। এই আটককে চ্যালেঞ্জ করে নিম্ন আদালতের শুনানী শেষে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের সামনে Religious Freedom Restoration Act of 1993 এর আওতায় হোয়াসকা টি আমদানী বৈধ হিসাবে গণ্য করা যায় সংক্রান্ত আবেদনটি এসেছিল।
(৩৬) ইমপ্রেশনিজম, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পকলার প্যারিস ভিত্তিক একটি আন্দোলন; বৈশিষ্ট্যসূচক সরু, ছোটো ছোটো ব্রাশস্ট্রোক বা তুলির আঁচড়সহ ইমপ্রেশনিষ্টরা বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন আলোর সত্যিকার রূপটিকে প্রকাশ করার জন্য, বিশেষ করে সময়ের সাথে এর পরিবর্তন।
(৩৭) সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদের সূচনা ১৯২০ এর দশকে, এই শিল্প আন্দোলনে শিল্পী স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যকার পরস্পর বিরোধী প্রথাগত বিভেদটি ভেঙ্গে ফেলে, অবচেতনকে মুক্ত করে দেয় নতুন ধারণা প্রকাশের জন্য।
(৩৮) R. Dawkins, The irrationality of faith, New Statesman (London), 31 March 1989
(৩৯) সালমান রুশদী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক।
(৪০) সালমান রুশদীর উপর এই ফতোয়াটি ঘোষণা করেছিলেন ইরানের আয়াতোল্লাহ খোমেনী তার স্যাটানিক ভার্সেস উপন্যাসের জন্য। যেখানে তিনি ইসলামের নবী ও তার স্ত্রীদের নিয়ে অবমাননামূলক ব্যঙ্গ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
(৪১) Columbus Dispatch, 19 Aug. 2005
(৪৩) Los Angeles Times, 10 April 2006.
(৪৪)http://gatewaypundit.blogspot.com/2006/02/islamic-society-used-fake.html.
(৪৫) http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4686536.stm; http://www. neander news. com/? cat=6.
(৪৬) The Independent, 5 Feb, 2006.

(৪৭) ইকবাল স্যাকরানি, ব্রিটিশ মুসলিম কাউন্সিল ও মুসলিম এইড এর সাথে সংশ্লিষ্ট।
(৪৮) Andrew Mueller, 'An arugument with Sir Iqbal', Independent on SUnday, 2 April, 2006. Sunday Review Section,12-16
(৪৯) জাকি বাদাওয়ী, মিসরীয় ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক,সমাজসেবার সাথে জড়িত ছিলেন, লন্ডনে মুসলিম কলেজ এর অধ্যাপক ছিলেন।
(৫০) হেনরী লুইস (এইচ এল) মেনকেন (১৮৮৮-১৯৫৬) সেজ অব বাল্টিমোর হিসাবে পরিচিত মেনকেন ছিলেন আমেরিকার সাংবাদিক,প্রাবন্ধিক,পত্রিকা সম্পাদক, আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতির একজন সমালোচক, স্যাটায়ারিষ্ট ছিলেন।
(৫১) এই পেপারব্যাক সংস্করণটির যখন প্রুফ দেখা হচ্ছে, তখন নিউ ইয়র্ক টাইমস সমাজের এই ধরনের বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের একটা ঘটনা প্রকাশ করে। ২০০৭ এর জানুয়ারীতে, এক জার্মান মহিলা দ্রুত বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানায় আদালতে, তার অভিযোগ ছিল তার স্বামী তাদের বৈবাহিক জীবনের শুরু থেকেই তাকে প্রায় ভয়ঙ্কর রকমের শারীরিক নির্যাতন করে আসছে। এই ঘটনা মেনে নিয়েই বিচারক ক্রিষ্টা দাট-ভিন্টার কুর'আনের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তার আবেদন নাকচ করে দেন। এই ধরনের অভূতপূর্ব রায় মাধ্যমে মুসলিম প্রথা আর ইউরোপিয়ান আইনের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে প্রকাশ করে। বিচারক ক্রিষ্টা দাট-ভিন্টার বলেন এই দম্পতিরা মরোক্কোর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের, যে সংস্কৃতিতে তার মতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহার স্বাভাবিক একটি ঘটনা। তার ভাষায় কুর'আন এই ধরনের শারীরিক নির্যাতনের অনুমতি দিয়েছে (নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২৩ জানুয়ারী, ২০০৭)। এই অবিশ্বাস্য ঘটনা প্রকাশ পায় মার্চে যখন মহিলার আইনজীবি বিষয়টি প্রকাশ করেন গণমাধ্যমে। দ্রুততার সাথেই ফ্র্যাঙ্কফুর্ট কোর্ট এই বিচারককে এই কেস থেকে অপসারণ করে। তাসত্ত্বেও, নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনটি মন্তব্য করে, এই ঘটনা অন্যান্য নির্যাতনের শিকার মুসলিম মহিলাদের জন্য ব্যাপক ক্ষতি করবে: যারা অনেকেই স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে যেতে এমনিতেই ভয় পায়। সেখানে বেশ কিছু 'পারিবারিক সন্মানের জন্য হত্যার' ঘটনাও ঘটেছে, যেখানে তুর্কী পুরুষদের হাতে নিহত হয়েছে মহিলারা। বিচারক ক্রিষ্টা দাট-ভিন্টার এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা' হিসাবে, কিন্তু আরেকভাবে একে বলা যায় 'অপমানের পৃষ্ঠপোষকতা' করা । 'অবশ্যই আমরা ইউরোপিয়ানরা এই ধরনের ব্যবহার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা, কিন্তু বৌ-পেটানো 'তাদের সংস্কৃতির' একটা অংশ, 'তাদের ধর্মে' এর অনুমতি আছে, আমাদের সেটা 'শ্রদ্ধা' করা উচিত।

২ দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈশ্বর হাইপোথিসিস

‘এক যুগের ধর্ম পরবর্তী যুগের বিনোদনমূলক সাহিত্য’।
- রালফ ওয়ালদো এমারসন

সকল কাহিনীর মধ্যে ওল্ড টেস্টামেন্টের (১) ঈশ্বর হচ্ছেন তর্কসাপেক্ষে সবচেয়ে বেশি অপ্রীতিকর একটি চরিত্র: হিংসুটে এবং এর জন্য গর্বিত, সংকীর্ণমনা, অন্যায়কারী, ক্ষমা প্রদর্শন করতে অক্ষম, সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবার মানসিক দোষে দুষ্ট; প্রতিহিংসা পরায়ন, রক্তপিপাসু জাতিগত বিশোধনকারী; নারীবিদ্বেষী, সমকামিদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী (হোমোফোবিক), বর্ণবাদী, শিশুহত্যাকারী, গণহত্যাকারী, সন্তানহত্যাকারী, বিশ্রী রকমের বিরক্তকর, অতিআত্মম্মন্যতায় আক্রান্ত, ধর্ষ-মর্ষকামী; খামখেয়ালী পরশ্রীকাতর, দুর্বলের নিপীড়ক। আমরা যারা শৈশব থেকে তার কাহিনীর সাথে সুপরিচিত, এসব ভীতিকর ঘটনার প্রতি আমাদের সংবেদনশীলতা কমে যাবার সম্ভাবনা আছে। একজন ‘অবুঝ’, যে একটি নিষ্পাপ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আশীর্বাদপুষ্ট, এই বিষয়ে সে একটা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ এবং সুষ্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে সক্ষম। উইনস্টোন চার্চিলের (২) পুত্র রানডলফ (৩) সুকৌশলে বাইবেল সম্বন্ধে নিজেকে পুরোপুরি অজ্ঞাত রাখতে পেরেছিলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত ইভলিন ওয়াহ (৪) ও অন্য একজন বন্ধু সামরিক অফিসার, যারা তার সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একই জায়গায় কর্মরত ছিলেন - তারা সহযোদ্ধা রানডলফ চার্চিলকে চুপ রাখার ব্যর্থ প্রচেষ্টা হিসাবে তার সাথে বাজি রেখেছিলেন, তিনি কিছুতেই মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে বাইবেল পড়ে শেষ করতে পারবেন না: ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে যা ঘটলো, তা আমরা আশা করিনি। যেহেতু বইটি সে আগে কখনো পড়েনি এবং পড়া মাত্রই সে ভয়াবহ আনন্দিত হয়েছিল; এবং বারবার সেখান থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি জোরে জোরে আমাদের পড়ে শোনানো শুরু করেছিল, ‘আমি নিশ্চিৎ, তোমরা জানতে না যে এই কথাটা বাইবেল থেকে এসেছে’ অথবা শুধু শুধু হাসি আর তালি বাজিয়ে স্বগোতক্তি করতো: ‘ হায় ঈশ্বর! ঈশ্বর কি যাচ্ছেতাই রকমের জঘন্য, তাই না (৫)!’ টমাস জেফারসন (৬) - আরো বেশি পড়াশুনা ছিল তার, একই মতামত পোষণ করতেন, মোজেসের (৭) ঈশ্বরকে তিনি ‘নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ন, খামখেয়ালী, অন্যায়পরায়ন, ভয়ঙ্কর এক চরিত্র’ হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

এই রকম সহজ একটা নিশানাকে আক্রমণ করা হয়তো সঠিক হচ্ছে না। ঈশ্বর হাইপোথিসিস প্রমাণ হবে কি, হবে না, সেটি এর সবচাইতে অপ্রিয় উদাহরণ, ইয়াহয়ে (৮) বা এর নীরস বিপরীত খ্রিস্টীয় রূপ ‘ভদ্র, নম্র ও নরম স্বভাবের জিসাস (৯) বা যীশুর উপর নির্ভর করা উচিত নয়। (মানতে হবে এই নিরীহ গোবেচারা ব্যক্তিত্বের রূপটির জন্য যীশু অবশ্য তার নিজের চেয়ে বরং তার ভিক্টোরিয় অনুসারীদের কাছে বেশি ঋণী (মিসেস সি. এফ. আলেক্সান্ডারের (১০) ‘খ্রিস্টান সব শিশুদের সবাইকে অবশ্যই তার মত নম্র, অনুগত, ভালো হতে হবে’ এর চেয়ে বিরক্তিকর ভাবপ্রবণ আর কি কিছু হতে পারে?)। আমি ইয়াহয়ে বা জিসাস বা আল্লাহ, বা নির্দিষ্ট কোনো দেবতা যেমন, বা’ল (১১), জিউস (১২) বা ওটানের (১৩) বিশেষ কোনো গুণাবলীকে আঘাত করছি না। তার পরিবর্তে ঈশ্বর হাইপোথিসিসকে সংজ্ঞায়িত করবো এমনভাবে যার

পক্ষ নিয়ে আরো খানিকটা বেশি বিতর্ক করা সম্ভব: 'এমন একজন অতিমানবীয়, অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব আছে, যিনি তার ইচ্ছামত এই মহাজগত পরিকল্পনা এবং আমাদেরসহ এর মধ্যে অস্তিত্বশীল সব কিছু সৃষ্টি করেছেন'। এই বইটি এর একটি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে আলোচনা করবে। যে-কোনো সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা, যা যথেষ্ট পরিমানে জটিল এবং সব কিছু পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে, তার নিজেরই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব শুধুমাত্র একটি সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ক্রম বিবর্তনের শেষ পরিণতি হিসাবে। সৃজনশীল বুদ্ধিমত্তা একটি ক্রম বিবর্তনের উৎপাদন বিধায় মহাবিশ্বে তার আগমন ঘটবে অবশ্যই অনেক পরে, সুতরাং সে কোনোভাবেই বাকি সবকিছুর পরিকল্পনা ও সৃষ্টি করার জন্য দায়ী হতে পারে না। ঈশ্বর, যে অর্থে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে: একটি বিভ্রান্তি বা ডিল্যুশন; এবং পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো সুস্পষ্ট হবে, এটি ভয়ানক ক্ষতিকর একটি বিভ্রান্তি।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ যার ভিত্তি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণহীন, ব্যক্তিগত কোনো গুপ্ত আবিষ্কারের স্থানীয় লোকাচারে ঈশ্বর হাইপোথিসিসও নানা রুপে বিদ্যমান। ধর্মের ইতিহাসবিদরা এর বিবর্তন চিহ্নিত করেছেন, আদিম 'অ্যানিমিজম' বা সর্বপ্রাণবাদ থেকে বহুঈশ্বরবাদ, যেমন, গ্রিক, রোমান, নরওয়েজীয়রা ও তার থেকে একেশ্বরবাদ যেমন: জুডাইজম ও তার উপজাত খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম।

বহুঈশ্বরবাদ বা পলিথেইজম:

ব্যাপারটা স্পষ্ট নয়, ঠিক কেন বহুঈশ্বরবাদ থেকে একেশ্বরবাদকে একটি স্বতঃসিদ্ধ ক্রম উন্নয়ন হিসাবে ধরে নেয়া উচিত হবে। কিন্তু এরকমই একটা ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত, ইবনে ওয়ারাক (১৪) ('হোয়াই আই অ্যাম নট এ মুসলিম' বইটির লেখক) যে কারণে বুদ্ধিদীপ্ত একটি অনুমান করেছিলেন যে, একেশ্বরবাদও শেষ পর্যন্ত তার উত্তরণের পথে আরো একটি ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে নিরীশ্বরবাদে পরিণত হবার সম্ভাবনায় আক্রান্ত। ক্যাথলিক এনসাইক্লোপেডিয়া বহুঈশ্বরবাদ এবং নিরীশ্বরবাদকে নির্বিকারভাবেই একই কাতারে দাড় করিয়ে ভিত্তিহীন হিসাবে বর্ণনা করেছে : 'আনুষ্ঠানিক গোঁড়া নিরীশ্বরবাদ স্ববিরোধী এবং বাস্তবে কখনোই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারেনি, বহুঈশ্বরবাদও পারেনি একই ভাবে, যদিও সাধারণ মানুষের কল্পনাকে তা আলোড়িত করেছে, কিন্তু একজন দার্শনিকের মনকে কখনোই সন্তুষ্ট করতে পারেনি' (১৫)।

একেশ্বরবাদীদের উগ্র আত্ম-অহংকার অতি-সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চ্যারিটি বা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইনেও সুস্পষ্ট ছিল, করের আওতামুক্ত হবার মর্যাদা পাওয়ার জন্য যা বহুঈশ্বরবাদী সংগঠনগুলোর সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করে এসেছে, ফলাফলে একচেটিয়া সুযোগ পেয়েছে

একেশ্বরবাদীদের ধর্ম প্রচারণার দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলো; এমনকি তারা সুকৌশলে এড়াতেও পেরেছে সরকারের কঠিন তদারকী, যা যে-কোনো ধর্মনিরেপক্ষ সংগঠনগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক। আমার একটা বিশেষ লক্ষ্য ছিল, ব্রিটেনের সম্মানজনক হিন্দু সমাজের কোনো সদস্যকে বহুঈশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অবজ্ঞাসুলভ বৈষম্যকারী আইনের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার আইনে মামলা করতে রাজী করাবো।

অবশ্যই তার থেকে অনেক বেশি উত্তম কাজটি হবে, দাতব্য সংস্থার করের আওতামুক্ত অবস্থানের কারণ হিসাবে ধর্মীয় প্রচারণার কাজটি সম্পূর্ণরুপে পরিত্যাগ করা। এই ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ হলে অনেক উপকৃত হবে সমাজ, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র, সেখানে যে পরিমাণ করমুক্ত অর্থ চার্চগুলো শুষে নেয়, এবং সেই অর্থে এমনিতেই ধনী সব টেলিভিশন-ভিত্তিক ধর্ম প্রচারকদের সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলেছে, অনায়াসে বলা যেতে পারে এর মাত্রা অশ্লীল পর্যায়ে পৌঁছেছে। উপযুক্তভাবে নামকৃত ওরাল রবার্টস (Oral Roberts) একবার তার টেলিভিশন দর্শকদের বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর তাকে হত্যা করবেন, যদি না তারা তাকে ৮ মিলিয়ন ডলার না দেন। প্রায় অবিশ্বাস্যভাবে, তার মুখের কথায় কাজও হয়েছিল, তাও করমুক্ত ! রবার্টস এখন খুবই ভালো আছেন, তুলসা অ্যারিজোনায় ‘ওরাল রবার্টস বিশ্ববিদ্যালয়’ ভালো আছে। যার বিভিন্ন ভবনগুলো, সব মিলিয়ে যাদের মূল্য হবে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার, সরাসরি ঈশ্বরের বিশেষ নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে: ‘আমার কণ্ঠ শোনার জন্য তোমার শিক্ষার্থীদের তৈরি করো, আমার কণ্ঠ শোনার জন্য, যেখানে, আমার আলো ক্ষীণ, আমার কণ্ঠ দুর্বল, আমার আরোগ্যদানের শক্তি অজানা, পৃথিবীর সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত সেখানে যাওয়ার জন্য তাদের প্রস্তুত করো। তাদের কর্ম তোমার কর্মকেও ছাড়িয়ে যাবে এবং এতেই আমি মহাসন্তুষ্ট হবো’।

বিষয়টা নিয়ে ভাবলে দেখা যাবে, আমার কাল্পনিক হিন্দু ধর্মাবলম্বী আইনজীবী সম্ভবত ‘যদি তাদের হারাতে না পারো, তাহলে তাদের সাথে যোগ দাও’ এই যুক্তিটাকে তাদের পক্ষে কাজ করাতে উৎসাহী হবেন। তার বহুঈশ্বরবাদ প্রকৃতার্থে বহুঈশ্বরবাদ নয়, বরং ছদ্মবেশে একেশ্বরবাদ। সেখানেও কেবল একজনই ঈশ্বর - দেবতা ব্রহ্মা, যিনি সৃষ্টিকর্তা, দেবতা বিষ্ণু, যিনি রক্ষক, দেবতা শিব, যিনি ধ্বংসকারী, দেবী স্বরস্বতী, লক্ষী, পার্বতী (ব্রহ্ম, বিষ্ণু ও শিব-এর সহধর্মিনী), দেবতা গনেশ (হাতি দেবতা) এবং আরো শত শত দেবদেবী, সবাই একই ঈশ্বরের বহুরূপ বা অবতার।

খ্রিস্ট ধর্মানুসারীদের বিষয়টির প্রতি সহমর্মী হওয়া উচিত। মধ্যযুগে, রক্তপাতের কথা না হয় বাদই দিলাম, ‘ট্রিনিটি’র ‘রহস্য’ ব্যাখ্যা করতে আর সেই ব্যাখ্যার ব্যতিক্রম ভিন্নমতকে দমন পীড়ন করতে কয়েকটি নদী সমান কলমের কালি অপচয় করা হয়েছে,

যেমন, এরিয়ান হেরেসি সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় ভিন্নমত; খ্রিস্টের জন্ম পরবর্তী চতুর্থ শতাব্দীতে আলেক্সান্ড্রিয়ার এরিয়াস (১৬) একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি অস্বীকার করে ঘোষণা করেছিলেন, যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বরের 'কনসাবস্ট্যানশিয়াল' নয় (অর্থাৎ যীশু এবং ঈশ্বর একই সাবস্টান্স বা এসেন্স বা মূল উপাদান দিয়েই তৈরি নয় - টীকা দ্রষ্টব্য)। আশ্চর্য্য ! এর সম্ভাব্য কি অর্থ হতে পারে, আপনি সম্ভবত জিজ্ঞাসা করতে পারেন ? পদার্থ বা সাবস্টান্স? কি 'সাবস্টান্স'? এই মূল বা এসেন্স বলতে আপনি আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন? 'খুব সামান্য' সম্ভবত মোটামুটি একটা উত্তর হতে পারে। তারপরও এই বিতর্ক এক শতাব্দী ধরে খ্রিস্ট ধর্মকে বিভক্ত করে রেখেছিল। এবং সম্রাট কনস্টান্টিন (১৭) এরিয়াসের বইয়ের সব কপি পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মকে বিভক্ত করা এমন তুচ্ছ অযৌক্তিক বিতর্কে ধর্মতত্ত্বের নিয়ম চিরকালই এই রকমই ছিল।

আমাদের (খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী) তাহলে, তিন অংশে বিভক্ত এক ঈশ্বর আছেন নাকি একের মধ্যে তিন জন ঈশ্বর আছেন? ক্যাথলিক বিশ্বকোষ আমাদের জন্য ব্যপারটা স্পষ্ট করেছে ধর্মতত্ত্বের একটি অসাধারণ উৎকৃষ্ট আবদ্ধ যুক্তি বা 'ক্লোস রিজনিং' (১৮) মাধ্যমে:

> ঈশ্বরের একাত্মতায় তিনটি সত্তার অবস্থান, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা, তিনটি সত্তাই পরস্পর থেকে সত্যিকার অর্থেই পৃথক। এভাবেই অ্যাথানেসিয়ার ক্রিডের (১৯) ভাষ্য অনুযায়ী: 'পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিন জন ঈশ্বর নেই, একজনই ঈশ্বর।'

যেন বিষয়টি এতেই যথেষ্ট স্পষ্ট হয়নি, বিশ্বকোষে তৃতীয় শতাব্দীর ধর্মতাত্ত্বিক সেইন্ট গ্রেগরি (২০), দ্য মিরাকল ওয়ার্কারের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে:

> সুতরাং কোনো কিছুর সৃষ্টি হয়নি, 'ট্রিনিটি'র কেউ কারো পরাধীন নয়, এমন কোনো কিছু এর সাথে সন্নিবিষ্ট হয়নি, যার আগে কোনো অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু পরবর্তীতে যোগ হয়েছে: সে কারণে পিতা কখনো পুত্র ব্যতীত ছিল না, তেমনি পুত্রও কখনো পবিত্র আত্মা ছাড়া ছিল না। এবং এই ট্রিনিটি রূপান্তরিত হয় না এবং সবসময়ই অপরিবর্তনশীল।

যে অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটানোর জন্য সেইন্ট গ্রেগরি তার উপাধি অর্জন করে থাকুক না কেন, আর যা-ই হোক সেই অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্তত সত্যিকারের মানসিক সুস্থতা ছিল না। তার শব্দগুলো সুস্পষ্টভাবে ধর্মতত্ত্বের চিরাচরিত অস্পষ্টতাপ্রীতি প্রকাশ করে, যা, বিজ্ঞান কিংবা মানুষের জ্ঞানের অন্য যে কোনো শাখার মতো গত আঠারো শতাব্দী ধরে একটুও অগ্রসর হয়নি। টমাস জেফারসন (২২) প্রায়শই এই ঠিক কথাটা

বলতেন, ‘কোনো নির্বোধ ধারণার বিরুদ্ধে একমাত্র যে অস্ত্রটি ব্যবহার করা যেতে পারে তা হল ব্যঙ্গ। যুক্তি প্রয়োগের পূর্বে ধারণাটাকে অবশ্যই সুস্পষ্ট হতে হবে, এবং কোনো মানুষেরই ট্রিনিটি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই কখনোই ছিল না। এটা শুধুমাত্র ধাপ্পাবাজদের ছলচাতুরী যারা নিজেদের যীশু খ্রিস্টের পুরোহিত বলে ডাকে’।

আরেকটা বিষয় নিয়ে মন্তব্য না করে পারছি না তা হলো, ধার্মিকরা অতি সূক্ষ্মতম বিষয়ে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসের সাথে মন্তব্য করে থাকেন, যে বিষয়ে তাদের কোনো প্রমাণ নেই এবং কোনো প্রমাণই থাকতে পারে না। ধর্মতত্ত্বের মতামতের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই যা তার ভিত্তি হতে পারে, এই সত্যটাই হয়তো সামান্যতম ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে ধর্মের স্বভাবসুলভ কঠোর অসহিষ্ণুতা পোষণ করার কারণ। বিশেষ করে এটা দেখা যায় ট্রিনিটিবাদের ক্ষেত্রে।

জেফারসন এই মতবাদ নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গ করেছেন, ক্যালভানিজম (২৩) বিষয়ে সমালোচনা করার সময় মন্তব্য করেন: ‘এখানে তিন জন ঈশ্বর বিদ্যমান’; খ্রিস্ট ধর্মের রোমান ক্যাথলিক শাখা এই বহুঈশ্বরবাদের বিষয়টি নিয়ে অতি আলোচনা করে বিষয়টিকে অনেক বেশি ফাপিয়ে তুলেছে। ট্রিনিটির (দের?) সাথে যোগ দিয়েছেন মেরি, স্বর্গের রাণী’, শুধুমাত্র নাম ছাড়া পুরো অর্থে যিনি একজন দেবী, যিনি মানুষের প্রার্থনার নিশানা হিসাবে ঈশ্বরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন নিকটবর্তী দ্বিতীয় স্থানে। প্রায় দেবদেবীর এই সম্ভার আরো স্ফীত হয়েছে বহু সেইন্টের বা সাধুদের যোগদানের মাধ্যমে, যাদের আছে অন্যের পক্ষ হয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করার বিশেষ ক্ষমতা। যা তাদের অর্ধদেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যদি না করেও থাকে, তারা তাদের স্বক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভক্তদের কাছে বিশেষ মর্যাদা আদায় করে নিয়েছেন। ক্যাথলিক কমিউনিটি ফোরাম আমাদের সাহায্যকল্পে প্রায় ৫১২০ জন সেইন্টের (২৪) নাম, তাদের বিশেষ ক্ষমতার ক্ষেত্র অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করেছে; তাদের মধ্যে আছেন, নির্যাতনের শিকার মানুষদের জন্য, ক্ষুধাহীনতা, অস্ত্রব্যবসায়ী, কামার, হাড় ভাঙ্গলে, বোমার কারিগর, পেটের অসুখ ইত্যাদি, এর বেশি আপাতত আর অগ্রসর হওয়া গেল না। এছাড়া আমাদের নয়টি শ্রেণীবিন্যাসে সাজানো চার স্তরের এনজেলিক (ফেরেশতা) হোষ্টরাও আছেন: সেরাফিম, চেরুবিম, থ্রোনস, ডমিনিয়নস, ভার্চু, পাওয়ারস, প্রিন্সিপালিটিস, আর্ক এনজেলস (সবার প্রধান যারা) এবং আছে সাধারণ ফেরেশতার দল, যার মধ্যে আছে আমাদের প্রিয় বন্ধু, সদাজাগ্রত, গার্ডিয়ান এনজেলস বা অভিভাবক ফেরেশতা। ক্যাথলিকদের পুরাণ কাহিনীর যে জিনিসটা আমাকে বিস্মিত করে সেটা কিছুটা এর রুচিহীন অসারতার জন্য, কিন্তু মূলত সেই কপট নির্লিপ্ততার কারণে, যেভাবে এইসব মানুষগুলো ক্রমান্বয়ে বানোয়াট খুঁটিনাটিগুলো যোগ করেছেন। সব কিছু সেখানে অতি নির্লজ্জভাবে উদ্ভাবিত।

গত বেশ কয়েকটা শতাব্দী যোগ করলে দেখা যায়, পোপ জন পল দ্বিতীয় (২৬) একাই তার সব পূর্বসূরি পোপদের সবার চেয়ে বেশি সেইন্ট বা সাধু তৈরি করেছিলেন। কুমারী মাতা মেরির বিশেষ ভক্ত ছিলেন তিনি। বহুঈশ্বরবাদের প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণটি নাটকীয়ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, ১৯৮১ সালে রোমে, যখন তাকে এক আততায়ী হত্যা করার চেষ্টা করেছিল। মৃত্যুর হাত থেকে তার বেঁচে আসার জন্য তিনি মনে করেন, আওয়ার লেডি অফ ফাতিমার প্রত্যক্ষ অবদান ছিল (পর্তুগালের ফাতিমায় যে মা মেরির অশরীরি রূপ দেখা গিয়েছিল বলে দাবী করেছিল তিন জন স্থানীয় মেষপালক শিশু): মাতৃসুলভ হাত বুলেটটির গতিপথ পরিবর্তন করেছিল। একটি বিষয় অবশ্য না ভেবে পারা যাচ্ছে না সেটি হচ্ছে, তিনি কেন বুলেটটা পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিলেন না। কেউ কেউ ভাবতে পারেন, যে শল্যচিকিৎসকের যে দলটি তার শরীরে ছয় ঘন্টা অস্ত্রোপচার করেছে তারাও আংশিকভাবে এই কৃতিত্বের দাবীদার; কিন্তু হয়তো অস্ত্রোপচারের সময় তাদের হাতকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন কুমারী মেরির মাতৃসূলভ হাত। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যপার হলো, পোপের মতে, তিনি শুধুই 'আমাদের লেডি' কুমারী মেরি নন, যিনি এই বুলেটের গতিপথ বদলে দিয়েছিলেন বরং সুনির্দিষ্টভাবে 'আওয়ার লেডি অফ ফাতিমা'; ধরে নেয়া যাতে পারে, ' আওয়ার লেডি অফ লুর্ডস', ' আওয়ার লেডি অফ গুয়াদালুপ', 'আওয়ার লেডি অফ মেডজুগরজে', 'আওয়ার লেডি অফ জেইতুন', 'আওয়ার লেডি অফ গারাবানডাল' এবং ' আওয়ার লেডি অফ নকস' এই সময়ে অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

গ্রিক, রোমান আর ভাইকিংরা কেমন করে এই বহুঈশ্বরবাদের ধর্মতত্ত্বীয় ধাঁধার সাথে সমঝোতা করেছিল? ভেনাস কি শুধু আফ্রোদাইটির আরেকটি নাম, নাকি তারা আলাদা দুইজন প্রেমের দেবী? হাতুড়ীসহ থর কি ওটান-এরই অবতার নাকি আলাদা দেবতা? কার কি আসে যায় এতে? এক কল্পকাহিনী থেকে বহু কল্পকাহিনীর মধ্যে পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামানোর জন্য জীবনটা অনেক ছোটো। বহুঈশ্বর নিয়ে ইঙ্গিত করার পর, কোনো বিশেষ একজনকে অবজ্ঞা করার অভিযোগ এড়াতে এ বিষয়ে আমি আর বেশি কিছু বলবো না। সংক্ষিপ্ত করার স্বার্থে আমি সব দেবদেবীদের, তা সেটা বহু বা এক ঈশ্বরবাদ, যাই হোক না কেন, আমি শুধু 'ঈশ্বর' বলেই সম্বোধন করবো। আরেকটা বিষয়ে আমি সচেতন আছি, তা হলো আব্রাহামের ঈশ্বর (একটু রেখে ঢেকে বলতে গেলে), আগ্রাসী পুরুষ, আর সে কারণে সর্বনাম ব্যবহার করার অর্থে আমি ঈশ্বরকে পুংলিঙ্গ হিসাবে ধরে নেব। অনেক পরিণত আর জটিল ধর্মতাত্ত্বিকরা দাবী করেন ঈশ্বরের কোনো লিঙ্গ নেই, অপরদিকে নারীবাদী ধর্মতাত্ত্বিকরা ঐতিহাসিক অবিচারগুলো সঠিক করার লক্ষ্যে তাকে নারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু অস্তিত্বই নেই এমন কিছু নারী না পুরষ, কি এসে যায় তাতে? আমার মনে হয়, ধর্মতত্ত্ব আর নারীবাদের খামখেয়ালী বোকামীর অবাস্তব মিলনক্ষেত্রে তার বাস্তব অস্তিত্ব হয়তো তার লিঙ্গ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হতে পারে।

আমার অজানা নেই যে ধর্মের সমালোচকরা, ধর্মীয় ঐতিহ্যের আর বিশ্ব-দর্শনের উর্বর বৈচিত্র্যময়তা যাকে ধার্মিকতা বলা হয়, তার সঠিক মুল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এমন অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। নৃতত্ত্বের উল্লেখযোগ্য কাজ, স্যার জেমস ফ্রেজারের (২৭) 'গোল্ডেন বাউ' থেকে পাসকাল বয়েরের (২৮) 'রেলিজিয়ন এক্সপ্লেইনড' অথবা স্কট আটরানের (২৯) ' ইন গডস উই ট্রাষ্ট' বইটি চমৎকারভাবে লিপিবদ্ধ করেছে বহু অদ্ভুত কুসংস্কারের আর আচারের ফেনোমেনোলজি (৩০)। এই বইগুলো পড়ুন আর মানবজাতির সহজ বিশ্বাসপ্রবণতার ব্যাপকতা দেখে বিস্মিত হোন।

কিন্তু এই বইয়ের উদ্দেশ্য ভিন্ন। যে-কোনো রূপের অতিপ্রাকৃতবাদকে আমি খুবই অপছন্দ করি, কিন্তু আলোচনাকে প্রাসঙ্গিক রেখে অগ্রসর হবার সবচেয়ে কার্যকর পথ হবে, অতিপ্রাকৃত যে রূপটার সাথে আমার পাঠকদের পরিচিত হবার সম্ভাবনা বেশি, যা আমাদের সবধরনের সমাজের উপর ভয়াবহ প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, সেটার ওপরেই বেশি গুরুত্ব দেয়া। আমার বেশিরভাগ পাঠকই এসময়ের তিনটি 'মহান' একেশ্বরবাদী ধর্মের (চারটি, যদি মর্মনিজমকে(৩১) ধরা হয়) মধ্যে কোনো না কোনো একটিতে প্রতিপালিত হয়েছেন। এই ধর্ম তিনটির প্রত্যেকটি তাদের উৎসে সেই পুরাণের মহাপিতা আব্রাহামকে খুঁজে পাবে। এবং এই পারিবারিক ঐতিহ্যগুলোর ধারা মনে রাখতে পারলে এই বইটার বাকি অংশ পড়তে সুবিধা হবে।

এছাড়া এটি একটি উপযুক্ত মূহূর্ত হতে পারে একটা আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া, না হলে, দিনের পর যেমন রাত্রি আসে তেমনই আমি নিশ্চিৎ অবশ্যই কেউ না কেউ কোনো পর্যালোচনায় এই বইটার প্রতি অবশ্যম্ভাবী কিছু দ্রুত মন্তব্য করতে পারেন : 'ডকিন্স যে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না, সেই ঈশ্বরকে আমিও বিশ্বাস করি না। আকাশের মধ্যে বসবাসকারী লম্বা শ্রুশ্মমন্ডিত বৃদ্ধ কোনো মানুষকে আমিও বিশ্বাস করিনা'; ঐ বৃদ্ধ মানুষটা মূল বিষয় থেকে মনোযোগটাকে সরানোর অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করার একটি পরিচিত কৌশল, এবং তার দাড়ি যেমনই লম্বা তেমনই বিরক্তিকর। সত্যি, মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করাটা অপ্রাসঙ্গিকতা থেকে আরো অসহনীয়। এর সেই গুরুত্বহীন তুচ্ছতা সুপরিকল্পিতভাবে পাঠকের মনোযোগকে আসল যে সত্য থেকে বিক্ষিপ্ত করবে, তা হলো এই বক্তা আসলে যেটা বিশ্বাস করেন তা কিন্তু অনেক কম তুচ্ছ। আমি জানি আপনি মেঘের উপর বসে থাকা কোনো দাড়িওয়ালা বুড়োকে বিশ্বাস করেন না, সুতরাং এটি নিয়ে কোনো সময় নষ্ট করার দরকারও নেই। আমি ঈশ্বর বা ঈশ্বরদের কোনো বিশেষ একটি রূপকে আক্রমণ করছি না, আমি ঈশ্বর, সকল ঈশ্বরদের আক্রমণ করেছি, যে-কোনো কিছু এবং সব কিছু যা কিনা অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক, যেখানে বা যে সময়েই তারা ছিলেন, আছেন কিংবা ভবিষ্যতে তৈরি হবেন'।

একেশ্বরবাদ বা মনোথেইজম

‘আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্রে সবচেয়ে বড় বর্ণনাতীত ক্ষতিকারক বিষয়টি হলো একেশ্বরবাদ। বর্বর সেই ব্রোঞ্জ যুগের বই যার নাম ‘ওল্ড টেস্টামেন্ট’, এর থেকেই তিনটি মানবতা বিরোধী ধর্মের বিবর্তন হয়েছে - ইহুদীবাদ, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম। এই সবগুলোই আকাশ-দেবতার ধর্ম। প্রত্যেকটি, আক্ষরিকভাবে পিতৃতান্ত্রিক - ঈশ্বর মহান অসীম ক্ষমতাধর পিতা - আর সেকারণেই আকাশ-দেবতা ও তার পুরুষ প্রতিনিধিদের দ্বারা আক্রান্ত দেশগুলোতে গত ২০০০ বছর ধরে নারীবিদ্বেষ বিদ্যমান’। - গোর ভিডাল (৩২)

তিনটি আব্রাহামীয় ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন এবং সুস্পষ্টভাবে বাকি দুটির পূর্বসূরি হলো জুডাইজম বা ইহুদীবাদ: আদিতে মূলত একজন ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর আর হিংস্র ঈশ্বর পূজারী কাল্ট বা গোত্র, যে ঈশ্বর যৌনতা সংক্রান্ত নানাবিধ বাঁধা নিষেধ নিয়ে সর্বদা মানসিক বিকারগ্রস্থ, পোড়া মাংসের গন্ধযুক্ত যে ঈশ্বর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য সব ঈশ্বরদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে সদা তটস্থ, যিনি শুধুমাত্র একটি নির্বাচিত মরুবাসী জাতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।প্যালেষ্টাইনে রোমের শাসনামলে পল অব টারসাস (৩৩) অপেক্ষাকৃত কম নিষ্ঠুর, ইহুদীবাদের একেশ্বরবাদী একটি গোত্র হিসাবে খ্রিস্ট ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এবং এর প্রকতিতে এটি অপেক্ষাকৃতভাবে সর্বজনীন ছিল, যা ইহুদীদের এই কেন্দ্র থেকে একটি বহির্মূখী বিশ্বাস নিয়ে বাকি বিশ্বের দিকে তাকিয়েছিল। কয়েক শতাব্দী পরে মোহাম্মদ ও তার অনুসারীরা আবারও মূল ইহুদীবাদের আপোষহীন একেশ্বরবাদীতায় ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু এর নির্দিষ্ট গোত্রকেন্দ্রিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে, একটি নতুন পবিত্র গ্রন্থ, কোরান বা কুর’আনের উপর ভিত্তি করে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ধর্মবিশ্বাসের প্রসারে সামরিক শক্তি প্রয়োগের শক্তিশালী মতবাদ সংযোজিত হয়। খ্রিস্ট ধর্মও প্রচারিত হয়েছিল তলোয়ারের সাহায্যে, প্রথমত রোমানদের হাতে, যখন সম্রাট কনস্টান্টিন একে একটি অদ্ভুত গোষ্ঠির আচার থেকে উত্তীর্ণ করে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তলোয়ার হাতে ক্রুসেডাররা, এবং তাদের পর মিশনারীদের সহায়তায় স্পেনের কনকিষ্টাডোররা (৩৪), ও অন্যান্য ইউরোপীয় আগ্রাসণকারী ও বসতি স্থাপনকারীরা । আমার প্রায় সব ব্যাখার জন্য, তিনটি আব্রাহামীয় ধর্মকে একই রকম ধরে নেয়া যেতে পারে। আলাদাভাবে উল্লেখ না করলে, এখানে আমি মূলত খ্রিস্টধর্ম নিয়ে কথা বলবো, কিন্তু শুধুমাত্র এই ধর্মটির সাথে আমি একটু বেশি পরিচিত, সে কারণেই। আমার উদ্দেশ্য অনুযায়ী অমিলের চেয়ে মিলটাই বেশি জরুরী । অন্য ধর্মগুলো যেমন, বৌদ্ধধর্ম, কনফুসিয়াসবাদ নিয়ে কোনো আলোচনায় যেতে চাই না। আসলে, এই সব ধর্মগুলোকে আসলে ধর্ম হিসাবে না ভেবে, এদেরকে বরং কোনো নৈতিক বা জীবন দর্শন হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য নির্দেশাবলী জাতীয় কিছু বলা যেতে পারে।

ঈশ্বর হাইপোথিসিসের খুব সরল যে সংজ্ঞা দিয়ে আমি শুরু করেছি, সেখানে আব্রাহামীয় ঈশ্বরকে খাপ খাওয়াতে হলে আমাকে এর সাথে আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা যোগ করতে হবে। তিনি শুধু এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিই করেননি, তিনি তার মধ্যে, বা হয়তো এর বাইরে (বা বাইরে বলতে ধর্ম যা বোঝাতে চায়) ব্যক্তিগত ঈশ্বর হিসাবে বসবাস করছেন, এবং ইতোপুর্বে উল্লেখিত করা হয়েছে এমন অনেক অপছন্দনীয় মানবিক গুণাবলীও তিনি ধারণ করেন।

ব্যক্তিগত গুণাবলী, তা ভালো কিংবা খারাপ যা-ই হোক না কেন, তা ভলতেয়ার এবং টমাস পেইনের (৩৫) ডেইস্ট বা একাত্মবাদী (৩৬) ঈশ্বরের কোনো অংশ না। ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত মানসিক-বিকারগ্রস্থ দুষ্কৃতকারীর তুলনায় উনবিংশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট (৩৭) বা আলোকায়ন পর্বের একাত্মবাদীদের ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবেই আরো মহান একটি সত্তা: মহাজাগতিক সৃষ্টির সুযোগ্য সৃষ্টিকর্তা, মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপন নিয়ে যার কোনো মাথাব্যাথা নেই, আমাদের ব্যক্তিগত চিন্তা, আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন বা আমাদের নোংরা পাপ এবং অস্পষ্টভাবে নিজ মনে বিড় বিড় করে বলা অনুশোচনা নিয়ে আদৌ তিনি চিন্তিত নন। একাত্মবাদীদের ঈশ্বর একজন পদার্থবিজ্ঞানী, তার হাতেই পদার্থবিদ্যার শুরু ও শেষ, তিনি শীর্ষতম, আলফা এবং ওমেগা গণিতজ্ঞ, মহিমান্বিত পরিকল্পনাকারী এবং শিল্পী, একজন অতি দক্ষ প্রকৌশলী যিনি মহাবিশ্বের সকল আইন এবং ধ্রুব সংখ্যাগুলো সুনির্দিষ্ট করেছেন, এবং তাদের অতি অসাধারণ দক্ষতায় এমন সূক্ষ্ম মাত্রায় সাজিয়েছেন এবং প্রাকধারণা নিয়ে বিস্ফারিত করেছেন, যাকে আমরা এখন অতি উষ্ণ 'বিগ ব্যাং' বলছি। এরপর তিনি অবসর গ্রহন করেন এবং তার সৃষ্টির সাথে আর কোনো যোগাযোগই রাখেননি। যে যুগে বিশ্বাসের গোঁড়ামী ছিল সর্বজনীন সেখানে একাত্মবাদীরা নিরীশ্বরবাদীদের থেকে ভিন্ন কিছু নন বলে নিন্দনীয় ব অভিযুক্ত হয়েছিলেন। 'ফ্রি থিংকার: এ হিস্টরি অব আমেরিকাস সেকুলারিজম' বইটিতে সুজান জ্যাকোবি (৩৮) দুর্ভাগা টম পেইনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতগুলো দুর্নামের তালিকা করেছিলেন: জুডাস, সরীসৃপ, শূকর, পাগলা কুত্তা, মহা জানোয়ার, অসভ্য এবং অবশ্যই - নাস্তিক। এক সময়ের রাজনৈতিক সুহৃদরা তার অখ্রিস্টীয় মনোভাবের জন্য বিব্রত হতেন। অসহায় অবস্থায় মারা যান টম পেইন, শুধু ব্যতিক্রমী জেফারসন ছাড়া আর কেউ তার পাশে ছিলেন না। ইদানিং এত বেশি দৃশ্যপট পরিবর্তন হয়েছে যে, আগের মত আর কেউই ডেইষ্ট বা একাত্মবাদীদের নিরীশ্বরবাদী অবিশ্বাসীদের সাথে এক কাতারে দাড় করাবেন না, বরং ঈশ্বরবাদীদের সাথেই তাদের একই ভাবে দেখবেন। কারণ, সর্বোপরি তারাও তো ঈশ্বরবাদীদের মত সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তার একজন সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, যিনি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ বা সেকুলারিজম, যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতারা এবং ধর্ম

সঙ্গত কারণে সাধারণত অনুমান করা হয় আমেরিকা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতারা ছিলেন ডেইষ্ট বা একাত্মবাদী (৩৯)। সন্দেহ নেই অনেকে হয়তো সেটাই ছিলেন, যদিও বিতর্ক আছে, এদের মধ্যে সবচেয়ে মহান আর সেরা যারা ছিলেন, তারা হয়তো নিরীশ্বরবাদী ছিলেন। তাদের সমসাময়িক সময়ের প্রেক্ষাপটে ধর্ম নিয়ে তাদের লেখাগুলো পড়লে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না, তাদের অধিকাংশই আমাদের এই বর্তমান সময়ে নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক হিসাবে চিহ্নিত হতেন। কিন্তু সেই সময়ে তাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস যা-ই হোক না কেন, তারা গোষ্ঠিগতভাবে নিঃসন্দেহে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। এই অংশে আমি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। শুরু করছি ১৯৮১ সালে সিনেটর ব্যারি গোল্ডওয়াটারের হয়তো একটা চমক লাগানো উদ্ধৃতি দিয়ে, স্পষ্টতই আমেরিকার রক্ষণশীলতার এই নেতা ও প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তার বিশ্বাসে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ধর্মনিরেপেক্ষতার ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার প্রত্যয়ের উপস্থিতি:

> নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের মত মানুষের আর তেমন কোনো অনড় অবস্থান নেই। যীশু অথবা ঈশ্বর অথবা আল্লাহ অথবা যে নামেই পরিচিত হোক না কেন এই মহাশক্তিশালী সত্তা, যে-কোনো বিতর্কে এদের মত ক্ষমতাশালী আর কোনো কিছুকে মিত্র বলে কেউ দাবী করতে পারবেন না। কিন্তু অনেক শক্তিশালী অস্ত্রের মতোই ঈশ্বরের নাম নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত। আমাদের সারা দেশজুড়ে যে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো বিস্তার লাভ করছে, তারা তাদের ধর্মীয় প্রভাব খুব একটা বিচক্ষণের সাথে ব্যবহার করছেন না। তারা দেশ পরিচালনাকারী নেতাদের উপর তাদের অবস্থান শতকরা একশত ভাগ অনুসরণ করার জন্য জোর খাটাচ্ছেন। কারো যদি এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর সাথে নির্দিষ্ট কোনো নৈতিক বিষয়ে নিয়ে মতবিরোধ হয়, তারা অভিযোগ করেন; ভোট কিংবা অর্থ সাহায্য দুটোই প্রত্যাহার করে নেবার হুমকি দেন। আসলেই সারা দেশজুড়ে এইসব রাজনৈতিক ধর্মপ্রচারকদের বিষয়ে আমি আমার বিরক্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছি, যারা নাগরিক হিসাবে আমাকে বিচার করছেন, নীতিবান মানুষ হতে গেলে নাকি আমাকে অবশ্যই এ, বি, সি কিংবা ডি'কে বিশ্বাস করতে হবে। এরা আসলে নিজেদের কি মনে করেন? এবং কেমন করেই বা তারা সেটি মনে করতে পারেন, আমার উপর তাদের নৈতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে দেবার অধিকার আছে এমন দাবী তারা কিভাবেই বা করতে পারেন। একজন আইনপ্রণেতা হিসাবে আমি আরো ক্ষুদ্ধ হই যখন প্রত্যেকটি ধর্মগোষ্ঠীর হুমকি সহ্য করতে বাধ্য হই, যারা ভাবেন সিনেটের যে-কোনো অধিবেশনে আমার ভোট নিয়ন্ত্রণ করতে তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার আছে। আমি তাদের সতর্ক করে দিতে চাই আজ; আমি সর্বত্র তাদের প্রতিরোধ করবো, যদি তারা তাদের

> নৈতিক বিশ্বাস সকল আমেরিকানদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে রক্ষণশীলতার দোহাই দিয়ে (৪০)।

নিজেদের সপক্ষে ইতিহাসকে সাক্ষী করার প্রচেষ্টায় জাতির পিতাদের ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে প্রচারণা বর্তমানে আমেরিকায় দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল প্রচারণাকারীদের কাছে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক একটি বিষয়। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতটাই আসলে সত্য, খ্রিস্টানদের দেশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়নি, প্রথম তা সুস্পষ্ট উল্লেখিত হয়, ত্রিপোলি চুক্তিতে (ট্রিটি অব ত্রিপোলী (৪১)), ১৭৯৬ সালে, যা জর্জ ওয়াশিংটনের (৪২) শাসনামলে সময়ে লেখা হয়েছিল, যেখানে ১৭৯৭ সালে জন অ্যাডামস (৪৩) স্বাক্ষর করেছিলেন:

> যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কোনো অর্থেই খ্রিস্ট ধর্মের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়নি, এবং যেহেতু এর সাথে মসুলমানদের আইন, ধর্ম, শান্তির বিরুদ্ধে কোনো ধরনের শত্রুতা নেই, এবং পূর্বেই বলা হয়েছে মোহাম্মদের অনুসারী কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র কোনো সময়ই কোনো যুদ্ধ বা শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করেনি। উভয় পক্ষ ঘোষণা করছে যে, ধর্মীয় মতামতের কারণে উদ্ভুত কোনো ঘটনাই দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে কখনো কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে না।

এই উদ্ধৃতির প্রথমাংশ ওয়াশিংটনে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের মধ্যে রীতিমত শোরগোল ফেলে দিত, সন্দেহ নেই কোনো, কিন্তু এড বাকনার (৪৪) বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রমাণ করেছেন, সেই সময় এ বিষয় নিয়ে কোনো রাজনীতিবিদ কিংবা সাধারণ জনগণ, কারো মধ্যে কোনো মতবিরোধ দেখা যায়নি (৪৫); যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের আপতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী এবং বিপরীতমুখীতা প্রায়শই দেখা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই দেশটি এখন খ্রিস্ট জগতের সবচেয়ে বেশি ধর্মনির্ভর একটি রাষ্ট্র, অপরদিকে ইংল্যান্ড, যেখানে কিনা প্রতিষ্ঠিত চার্চের (অ্যাংলিকান) নেতৃত্ব দিচ্ছে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, সেটি সবচাইতে কম ধর্ম নির্ভর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি, আমি প্রায়ই প্রশ্নটা করি, কেন এমন হলো? এবং এর উত্তর আমার জানা নেই। আমার মনে হয়, সম্ভবত এই পরিস্থিতির কারণ হতে পারে : ইংল্যান্ড, তার আন্তঃবিশ্বাস এবং গোত্রগত ধর্মীয় সহিংসতার ভয়ঙ্কর ইতিহাসের কারণে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ, , যেখানে প্রটেষ্টান্ট আর ক্যাথলিকরা পালাক্রমে প্রাধান্য বিস্তার করে পরস্পরকে নৃশংসভাবে হত্যা ও নিপীড়ন করেছে। আরেকটি ব্যাখ্যার উৎপত্তি হলো একটি পর্যবেক্ষণ, আমেরিকা প্রধানত অভিবাসীদের সৃষ্টি করা একটি জাতি, এক সহকর্মী আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, অভিবাসীরা, ইউরোপে তাদের সম্প্রসারিত পরিবার, সামাজিক নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতা থেকে শিকড়চ্যুত হয়ে প্রবাসে ফেলে আসা স্বজনদের বিকল্প হিসাবে

হয়তো চার্চকেই বেশি আপন করে নিয়েছিলেন। অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক একটা ধারণা, যা আরো গবেষণার দাবীদার। কোনো সন্দেহ নেই আমেরিকায় অনেকেই তাদের চার্চকে স্থানীয় ঐক্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসাবে মনে করেন, আসলেই যার সম্প্রসারিত পরিবারের মত বেশ কিছু গুণাবলী আছে। আরো একটি হাইপোথিসিস হলো ধাঁধার মতোই আমেরিকার ধর্মীয় উদ্দীপনার উৎস দেশটির সংবিধানেরই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। যেহেতু আমেরিকা আইনগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্ম সম্পূর্ণভাবে পরিণত হয়েছে স্বাধীন একটি উদ্যোগে। প্রতিদ্বন্দ্বী চার্চগুলো তাদের আকৃতি আর সদস্য সংখ্যা বাড়াতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, বলাবাহুল্য সেই সাথে মোটা উপার্জনও কোনো অংশেই কম নয়; এই প্রতিযোগিতা চলে বাজারের আক্রমণাত্মক ক্রয় বিক্রয় বা মার্কেটিং কৌশলের মতোই। সাবানের গুড়া বিক্রি যেমন করে চলে, ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তেমন। আর এর পরিণতিতে বর্তমানে কম শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক আকারে বিস্তৃত হয়েছে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনা। অপরদিকে ইংল্যান্ডের প্রতিষ্ঠিত চার্চের অভিরক্ষণে ধর্ম সামাজিক আচারের চেয়ে খুব বেশি আর কিছু না, আদৌ একে ধর্মীয় একটি বিষয় হিসাবে সহজে চিহ্নিত করা যাবে না। গাইলস ফ্রেজার একজন অ্যাংলিক্যান ভাইকার (ধর্মযাজক) ও একই সাথে অক্সফোর্ডে দর্শনের টিউটর, এই ইংরেজ আচারের সুন্দর ব্যাখা দিয়েছিলেন গার্ডিয়ান পত্রিকায় তার একটি লেখায়, যার শিরোনাম ছিল, 'দ্য স্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য চার্চ অব ইংল্যান্ড টুক গড আউট অফ দ্য রেলিজিয়ন, বাট দেয়ার আর রিস্ক ইন মোর ভিগোরাস অ্যাপ্রোচ টু ফেথ':

> একটা সময় ছিল যখন গ্রামের পাদ্রী (ভাইকার) ইংরেজী নাটকের নিয়মিত চরিত্র ছিলেন, এই চা-পানকারী, নিরীহ, ক্ষ্যাপাটে, পালিশ করা জুতা পরা মানুষটি তার ভদ্র ব্যবহারসহ এমন একটি ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করতেন, যা দেখে আদৌ ধর্মপরায়ন না এমন ধরনের মানুষরা তেমন কোনো অস্বস্তিবোধ করতেন না। তিনি আদৌ ধর্মনাশ হচ্ছে বলে অতিরিক্ত চিন্তিত হতেন না বা আপনাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করতেন না, 'আপনি কি নরকের আগুন থেকে রক্ষা পেতে চান?' কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পক্ষে চার্চের পালপিট থেকে ধর্মযুদ্ধ শুরু করা, বা রাস্তার পাশে বোমা পেতে রাখা তো বহু দূরের কথা (৪৬)।

(জন বেচামেনের 'আওয়ার পাড্রের' ছায়া আছে এই বর্ণনায়, প্রথম অধ্যায়ের শুরুতে আমি যেখান থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলাম); ফ্রেজার আরো বলেন যে, এই ভদ্র ভাইকার আসলে প্রকৃত অর্থে বিশাল সংখ্যক ইংরেজদের জন্য খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি তার রচনাটি শেষ করেন দুঃখ প্রকাশ করে, যে ইদানিং ধর্মকে পুনরায় বেশি গুরুত্ব দেবার প্রবণতা লক্ষ করা করা যাচ্ছে এবং তার শেষ বাক্যটি ছিল সাবধানবাণী: 'চিন্তার বিষয় হল, কয়েক শতাব্দী ধরে সুপ্ত ইংরেজদের

ধর্মীয় উন্মাদনার দানবটাকে এর প্রাতিষ্ঠানিক বাক্স থেকে আমরা যেন আবার মুক্ত না করে দেই'।

বর্তমান সময়ের আমেরিকায় এই ধর্মীয় উন্মত্ত দানবের প্রতাপ সর্বত্র এবং যা অবশ্যই দেশটির জাতির পিতাদের ভীত সন্ত্রস্ত করতো যদি তারা জীবিত থাকতেন। এই বৈপরীত্যকে মেনে নেয়া এবং তাদের পরিকল্পিত জাতীয় সংবিধানকে অভিযুক্ত করা আদৌ সঠিক কিনা সেটি নির্বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতারা সন্দেহাতীতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে ছিলেন, যারা বিশ্বাস করতেন ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক রাখা উচিত, আর এই বিশ্বাসই তাদেরকে সেই মানুষগুলোর সারিতে দাড় করায়, যারা সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, যেমন, টেন কমান্ডমেন্ডের (৪৭) উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোনো প্রদর্শনীর বিরোধীতা করেন। ধারণা করতে ইচ্ছা হয়, প্রতিষ্ঠাতাদের কেউ কেউ হয়তো একাত্মবাদী বিশ্বাসকে অতিক্রম করে গিয়ে ছিলেন, হয়তো তারা ছিলেন অ্যাগনস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী অথবা এমনকি পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী? যাকে আজকের যুগে আমরা অজ্ঞেয়বাদ বলি, জেফারসনের নীচের লেখাঁটির সাথে তার কোনো পার্থক্য করা যায় না:

> নিরাবয়ব অবাস্তব কোনো কিছুর অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলাই অর্থহীন। মানুষের আত্মা, ফেরেশতা, ঈশ্বর অবয়বহীন বলা মানে এর অস্তিত্বহীনতাকে মেনে নেয়া অর্থাৎ আসলেই কোনো ঈশ্বর নেই, কোনো ফেরেশতা বা আত্মার অস্তিত্ব নেই। আর কোনোভাবেই এর পক্ষে যুক্তি দাড় করানো সম্ভব না, যদি না, স্বপ্ন আর ভৌত জগতের অতল গহবরে আমরা নিজেদের নিমজ্জিত না করি। যাদের অস্তিত্ব থাকতে পারে কিন্তু আমার কাছে যার কোনো প্রমাণ নেই, এমন কিছু নিয়ে নিজেকে যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ দেয়া ছাড়াই আমি সন্তুষ্ট আর যথেষ্ট ব্যস্ত আছি অন্য অনেক বিষয় নিয়ে।

ক্রিষ্টোফার হিচেন্স (৪৮), তার রচিত জেফারসনের জীবনী, 'টমাস জেফারসন: অথর অফ অ্যামেরিকা' বইটিতে তথ্যপুষ্ট হয়েই প্রস্তাব করেন, সম্ভবত জেফারসন নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এমনকি যখন তার সময়ে যে বিশ্বাস ধারণ করা আরো অনেক বেশি কঠিন ছিল।

> তিনি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন কি ছিলেন না, তার বিচার করতে অবশ্যই আমাদের সংযত হতে হবে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক জীবন তাঁকে যে বিচক্ষণতা এবং ভদ্রতার পরিচয় দিতে বাধ্য করেছে, সেজন্যই। কিন্তু সেই ১৭৮৭ সালে তার ভাইপো পিটার কারকে লেখা চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, কারোরই উচিত হবে না, শুধুমাত্র ফলাফলের কথা চিন্তা করে এমন কোনো প্রশ্নকে ভয় পাওয়া, 'যদি এর শেষ হয় এমন কোনো বিশ্বাসে যে ঈশ্বর নেই, তুমি অবশ্যই

উদ্দীপ্ত হবে, এই ধরনের অনুশীলনের মধ্যে সুখ আর স্বস্তি এবং অন্যদের ভালোবাসা অর্জন করার গুণাবলী অন্বেষণে।

আবারো পিটার কারকে লেখা একটি চিঠিতে জেফারসনের এই উপদেশটা আমাকে আরো বেশি নাড়া দেয়:

> ঝেড়ে ফেল সব দাসোচিত যত সংস্কারের ভীতি, যার ভারে ক্রীতদাসের মত নত হয়ে থাকে দুর্বল সব মন। যুক্তিকে দৃঢ়ভাবে তার আসনে বসাও, তার উপর বিচারের ভার ছেড়ে দাও সকল তথ্য আর প্রত্যেকটি মতামতের। সাহসের সাথে প্রশ্ন করো এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে, কারণ যদি এমন কেউ থাকে, তিনিও অন্ধ ভীতির চেয়েও যুক্তির প্রতি এই ধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শনকে অনুমোদন করবেন।

জেফারসনের কিছু মন্তব্য যেমন, 'খ্রিস্ট ধর্ম হলো মানুষের উপর চাপানো সবচেয়ে বিকৃত একটি পদ্ধতি', যেমন একাত্মবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তেমনি নিরীশ্বরবাদের সাথেও। জেমস ম্যাডিসনের (৪৯) কঠোর অ্যান্টি-ক্লারিকালিজমও (ধর্মীয় যাজকদের রাজনৈতিক ক্ষমতার বিরোধীতা) তেমন: 'প্রায় পনের শতাব্দী ধরে খ্রিস্টীয় আইনী প্রতিষ্ঠান বিচারের কাঠগড়ায়, কি সুফল তারা দিতে পেরেছে? কম বেশি সব জায়গায়, পাদ্রীদের অহংকার আর অলসতা; সাধারণ জনগনের অজ্ঞতা আর অন্ধ দাসত্ব, উভয় পক্ষের কুসংস্কার, গোঁড়ামী আর নিপীড়ন', একই কথা বলা যেতে পারে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের (৫০) 'বাতিঘরগুলোও চার্চ থেকে অনেক বেশি কার্য্যকরী' মন্তব্যটি বিচার করলে। জন অ্যাডামস সম্ভবত কঠিন ক্লারিকালিজম বিরোধী একাত্মবাদী ('এক্লেসিয়াসটিকাল কাউন্সিল ভয়ঙ্কর একটি যন্ত্র....') এবং তিনি নিজেও খ্রিস্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অনেক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছেন, বিশেষ করে : 'খ্রিস্ট ধর্ম সম্বন্ধে যতটুকু আমি বুঝি, এটি যেমন ছিল, এবং এখনো যা বলা হয় ঈশ্বরের ঐশী প্রত্যাদেশের প্রকাশ বা রিভিলেশন, কিন্তু কিভাবে লক্ষ লক্ষ উপকথা, কাহিনী, কিংবদন্তী মিশ্রিত হয়েছে ইহুদী এবং খ্রিস্ট ধর্ম দুইটির তথাকথিত ঐশী প্রত্যাদেশে, এবং তাদের এ যাবৎকালের সবচেয়ে রক্তাক্ত ধর্ম হিসাবে পরিণত করেছে?' এবং জেফারসনকে লেখা একটা চিঠিতে: 'আমি রীতিমত কেপে উঠি, শোকের অপব্যবহারে সবচেয়ে ভয়াবহ চিহ্ন, ক্রুশকে মানব জাতির ইতিহাস সুরক্ষিত করেছে। চিন্তা করে দেখুন শোকের এই যন্ত্র কত বিপর্যয়ের কারণ'!

জেফারসন এবং তার সহযোগীরা ঈশ্বরবাদী, একাত্মবাদী, অজ্ঞেয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী যা-ই হোক না কেন তারা প্রত্যেকেই প্রবলভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার সপক্ষে ছিলেন, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রপতির ধর্মবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতাদের প্রত্যেকেই যার যা ধর্মবিশ্বাস থাকুক না কেন,

তারা, জর্জ বুশ সিনিয়রকে করা একটি প্রশ্নের উত্তর সংক্রান্ত সাংবাদিক রবার্ট শেরমানের প্রতিবেদনটি পড়ে অবশ্যই বিস্মিত হতেন, যখন শেরমান জর্জ বুশ সিনিয়রকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি কি অন্য আমেরিকানদের মত নিরীশ্বরবাদীদেরও একই রকম নাগরিক অধিকার বা দেশপ্রেম আছে বলে মনে করেন কিনা? : 'না, আমি জানি না নাস্তিকদের এদেশের নাগরিক বা দেশপ্রেমিক বিবেচনা করা উচিত হবে কিনা? আমেরিকা ঈশ্বরের অধীনে একটি জাতি' (৫১)। ধরে নেই শেরমানের বিবরণ সঠিক, (দুঃখজনকভাবে তিনি টেপরেকর্ডার ব্যবহার করেননি, এবং অন্য কোনো সংবাদ পত্রিকা এ সংক্রান্ত কোনো খবরও প্রকাশ করেনি), আগের বাক্যে 'নিরীশ্বরবাদী' শব্দটি 'ইহুদী' বা 'মুসলিম' বা 'কৃষ্ণাঙ্গ' শব্দগুলো দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে একটা পরীক্ষা করা যায়। এর মাধ্যমে পরিমাপ করা সম্ভব আমেরিকার নিরীশ্বরবাদীদের কি ধরনের বৈষম্য সহ্য করতে হচ্ছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত নাটালি আনজিয়ার্স (৫২) এর 'কনফেশনস অব দ্য লোনলি অ্যাথিস্ট' প্রবন্ধটি বর্তমান আমেরিকায় একজন নিরীশ্বরবাদী হিসাবে তার বিচ্ছিন্নতার অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির বেদনাদায়ক মর্মস্পর্শী বিবরণ (৫৩)। কিন্তু আমেরিকায় নিরীশ্বরবাদীদের বিচ্ছিন্নতা একটি বিভ্রান্তি, যা অত্যন্ত পরিশ্রম করেই সৃষ্টি করেছে এর বিরুদ্ধে বিদ্যমান নানা পূর্বসংস্কার। অধিকাংশ মানুষ সাধারণত যা ধারণা করেন, আমেরিকায় নিরীশ্বরবাদীদের সংখ্যা তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। যেভাবে আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি, আমেরিকায় অবিশ্বাসীদের সংখ্যা ধার্মিক ইহুদীদের চেয়ে অনেক বেশি, তাসত্ত্বেও ওয়াশিংটনে ইহুদীদের লবি বিশেষভাবে শক্তিশালী, নানা বিষয়ে তাদের প্রভাব খাটানোর জন্য কুখ্যাতিও আছে। আমেরিকার নিরীশ্বরবাদীরা যদি নিজেদের ঠিক সেভাবে সংগঠিত করতে পারতেন, তারা কি না অর্জন করতে পারতেন (৫৪) ।

ডেভিড মিলস (৫৫) তার প্রশংসনীয় 'অ্যাথিস্ট ইউনিভার্স' বইয়ে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন, যা কোনো কল্পকাহিনী হলে আপনি অনায়াসে পুলিশের অজ্ঞতা সংক্রান্ত একটি অবাস্তব কৌতুক কাহিনী হিসাবে প্রত্যাখ্যান করতে বিলম্ব করতেন না। একজন খ্রিস্টীয় ফেইথ হিলার (বিশ্বাসের মাধ্যমে রোগ নিরাময় করেন বলে যারা দাবী করে থাকেন), যিনি 'মিরাকল ক্রুসেড' নামে একটি সংস্থা পরিচালনা করেন, বছরে একবার মিলসের শহরে আসতেন। অন্য অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এই ফেইথ হিলার বা বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে ঠগবাজি চিকিৎসা করেন, যারা ডায়াবেটিস রোগে ভুগছেন তাদের ইনসুলিন ফেলে দিতে উৎসাহ দেন, কিংবা যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত তাদের কেমোথেরাপি নেবার বদলে প্রার্থনার মাধ্যমে অলৌকিকভাবে রোগমুক্ত হবার উপদেশ দেন। যুক্তিসংঙ্গত কারণেই মিলস জনসাধারণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এর বিরুদ্ধে একটি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মিলস ভুল করে বসেন পুলিশের কাছে তার উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং ফেইথ হিলারের সমর্থকদের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে পুলিশের সুরক্ষার আবেদন করে। প্রথম যে পুলিশ অফিসারের সাথে তার কথা হয়, তার

প্রশ্ন ছিল: তুমি তার পক্ষে না বিপক্ষে সমাবেশ করবে? যখন মিলস তার উত্তরে বলেছিলেন: তার বিপক্ষে, পুলিশ অফিসার প্রত্যুত্তরে বলেছিল, সে নিজেই সেই ফেইথ হিলারের সমাবেশে যোগ দেবে এবং তিনি তার সমাবেশের সামনে দিয়ে যাবার সময় ব্যক্তিগতভাবে মিলসের মুখে থুতু মারার ইচ্ছা পোষণ করেন।

মিলস তার ভাগ্য পরীক্ষার করে দেখার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় আরেকজন পুলিশ অফিসারের কাছে যান। দ্বিতীয় জন উত্তর দেন, এই ফেইথ হিলারের সমর্থকদের কেউ যদি হিংসাত্মকভাবে মিলসকে আক্রমণ করে, সেক্ষেত্রে সে মিলসকে গ্রেফতার করবে কারণ সে ঈশ্বরের কাজে বিঘ্নতা সৃষ্টি করেছে। মিলস বাসায় ফিরে টেলিফোনের মাধ্যমে পুলিশ স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন, যদি কোনো সিনিয়র অফিসারের সহানুভূতি পাওয়া যায়। অবশেষে যখন সার্জেন্টের সাথে যোগাযোগ হয়েছিল, তার বক্তব্য ছিল: 'নরকে যাও বন্ধু, কোনো পুলিশই নাস্তিকদের রক্ষা করতে চায় না, আশা করি তোমাকে কেউ যেন ভাল মত রক্তাক্ত করতে পারে'। স্পষ্টতই এই পুলিশ স্টেশনে মানুষের স্বাভাবিক সহমর্মিতা, দয়া, কর্তব্যজ্ঞানের সাথে সাথে ক্রিয়া বিশেষণেরও সরবরাহ ঘাটতি আছে। মিলস সেদিন সাত অথবা আটজন পুলিশ অফিসারের সাথে কথা বলার বিবরণ দেন, যাদের কেউই সাহায্য করার কোনো ইচ্ছা প্রকাশ তো দূরের কথা বরং অধিকাংশই সরাসরি মিলসকে হিংসাত্মক প্রতি-আক্রমণের হুমকি দিয়েছিল।

নিরীশ্বরবাদীদের বিরুদ্ধে এই ধরনের বিদ্বেষপূর্ণ সংস্কারের ঘটনার সংখ্যা অগণিত। কিন্তু অ্যান্টি-ডিসক্রিমিনেশন সাপোর্ট নেটওয়ার্কের প্রতিষ্ঠাতা, মার্গারেট ডাওনী, ফ্রি থট সোসাইটি অব ফিলাডেলফিয়ার মাধ্যমে এই ধরনের ঘটনাগুলো পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণ করে যাচ্ছেন (৫৬); তার সংগৃহীত ঘটনাগুলোর ডাটাবেস, কমিউনিটি,স্কুল, কাজের জায়গা, গণমাধ্যম, পরিবার এবং সরকার ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত, যার মধ্যে উদাহরণ আছে হয়রানি, কর্মচ্যুতি, পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া এমনকি হত্যা (৫৭); নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি ডাওনীর লিপিবদ্ধ এই সব ঘৃণা আর অসহিষ্ণুতার প্রমাণ আমাদের বুঝতে সাহায্য করে, কেন একজন সৎ নিরীশ্বরবাদীর পক্ষে আমেরিকার কোনো নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রায় অসম্ভব একটি ব্যপার। যুক্তরাষ্ট্রে হাউস অব রিপ্রেজেন্টটেটিভসের সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৪৩৫, সিনেটে আরো ১০০ জন, ধরে নেই এই ৫৩৫ জন ব্যক্তি সমগ্র শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর (আমেরিকার) প্রতিনিধিত্ব করছে এমন একটি নমুনা, আমেরিকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানগত হিসাব অনুযায়ী, এদের প্রায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবশ্যই নিরীশ্বরবাদী। তাদের অবশ্যই মিথ্যাচার করতে হয়েছে, অথবা নির্বাচনে জেতার জন্য তাদের প্রকৃত অনুভূতিটাকে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে। কে তাদের দোষ দেবে এই মিথ্যাচারের জন্য, যখন ভোটারদের বিশ্বাস তাদের অর্জন করতে এ ছাড়া কোনো উপায় নেই? এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, নিরীশ্বরবাদী

হিসাবে নিজেকে স্বীকার করে নেয়া একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা (৫৮)।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আবহাওয়ার এই ধরনের বাস্তবতা এবং এই অবস্থা যা ইঙ্গিত করে, তা দেখলে নিঃসন্দেহে আতঙ্কিত হতেন জেফারসন, ওয়াশিংটন, ম্যাডিসন, অ্যাডামস এবং তাদের সতীর্থরা। তারা ঈশ্বরবাদী, একাত্মবাদী, সংশয়বাদী বা নিরীশ্বরবাদী যাই হোন না কেন প্রাক-একবিংশ শতাব্দীর ওয়াশিংটনের এইসব ধর্মবাদী রাজনীতিবিদদের দেখে ভয়ে পিছু হটতেন। তাঁরা হয়তো একাত্মতা বোধ করতেন উপনিবেশ পরবর্তী ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী জাতির পিতাদের সাথে, বিশেষ করে ধার্মিক গান্ধী (আমি একজন হিন্দু, আমি একজন মসুলমান,আমি একজন ইহুদী, আমি একজন খ্রিস্টান, আমি একজন বৌদ্ধ) এবং নিরীশ্বরবাদী নেহরুর (৫৯) সাথে:

> এই যে প্রদর্শনী যার নাম ধর্ম বা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে সংগঠিত ধর্ম, ভারতে কিংবা পৃথিবী যে-কোনো জায়গায়, আমাকে আতঙ্কিত করে। আমি প্রায়শই এর নিন্দা করেছি এবং একে পুরোপুরি ভাবে পরিচ্ছন্ন করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। এবং প্রায় সবসময়ই মনে হয়েছে এর ভিত্তি, অন্ধবিশ্বাস এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা, গোঁড়া মতবাদ আর সংকীর্ণতা, কুসংস্কার, শোষণ আর কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করা।

গান্ধীর স্বপ্নের ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে ব্যাখা করে নেহরুর বর্ণনা (যদি না রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে তাদের দেশটা বিভক্ত না হতো, হয়তো তা বাস্তবে পরিণত হতে পারতো) পড়ে মনে হতে পারে তা যেন জেফারসনেরই নিজের লেখা।

> আমরা ধর্মনিরপেক্ষ এক ভারতের কথা বলছি, কিছু মানুষের ধারণা এর অর্থ হলো ধর্মের বিরুদ্ধে যেন কোনো কিছু। অবশ্যই এই ধরনের ধারণা সঠিক নয়। এর অর্থ হলো ভারত এমন একটি রাষ্ট্র হবে যা সকল ধর্মবিশ্বাসকে সমান মর্যাদা আর সুযোগ দেবে। ভারতের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার ইতিহাস অনেক প্রাচীন, ভারতের মত একটি দেশে, যেখানে অনেক ধরনের ধর্ম আর বিশ্বাস বিদ্যমান, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তি ছাড়া অন্য কোনোভাবে সত্যিকারের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করা সম্ভব না (৬০)।

একাত্মবাদীদের ঈশ্বর, যা প্রায়শই যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতাদের বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়, অবশ্যই সেটি বাইবেলে বর্ণিত হিংস্র দানবীয় চরিত্রটি অপেক্ষা অনেক উন্নতি। দুঃখজনকভাবে ধারণা করা খুবই কঠিন যে তার অস্তিত্ব আছে বা কখনো ছিল। যে কোনো রুপেই ঈশ্বর হাইপোথিসিস আসলেই অপ্রয়োজনীয় (৬১)। ঈশ্বর হাইপোথিসিস

সম্ভাবনার সূত্রানুযায়ী প্রায় বাতিল হবার উপক্রম, চতুর্থ অধ্যায়ে আমি তার ব্যাখ্যা দেব, তবে তার আগে আমি তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে উপস্থাপিত কিছু তথাকথিত প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করবো। আপাতত আমি বরং অ্যাগনস্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদ এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা চিরকালই বিজ্ঞানের ধরা ছোয়ার বাইরে একটি অস্পৃশ্য প্রশ্ন, এমন ভ্রান্ত ধারণার দিকে দৃষ্টি ফেরাই।

অ্যাগনস্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদের দীনতা

আমার পুরোনো স্কুলের চ্যাপেলের পালপিট থেকে আমাদের সাথে গলাবাজি করা বলিষ্ঠ, পেশীবহুল খ্রিস্টান ব্যক্তিটি কিন্তু নিরীশ্বরবাদীদের প্রতি এক ধরনের গোপন শ্রদ্ধার কথা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কারণ অন্ততপক্ষে তাদের সৎসাহস আছে নিজেদের বিশ্বাসের উপর,তা যত ভ্রান্ত বিশ্বাসই হোক না কেন? এই ধর্মযাজক যা পছন্দ করতেন না তা হলো অজ্ঞেয়বাদীদের (৬২): দুর্বল, নরম, আগাছা, ভীতু, সিদ্ধান্তহীনতায় আক্রান্ত। তিনি কিছুটা ঠিক, তবে কিন্তু কারণটা সম্পূর্ণ ভুল। একই সুরে, কোয়েন্টিন দে লা বেদোইয়েরে একটি লেখা অনুযায়ী ক্যাথলিক ঐতিহাসিক হিউ রস উলিয়ামসন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ধার্মিক এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নিরীশ্বরবাদীদেরও। তার ঘৃণা সংরক্ষিত শুধুমাত্র দুর্বল প্রকৃতির ভীরু মেরুদণ্ডহীন সাধারণ মাপের মানুষগুলো যারা বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি অবস্থান করে (৬৩)।

অ্যাগনস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী হওয়া আদৌ দোষের না, বরং যুক্তিসঙ্গত একটি অবস্থান, যদি সে অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণের অভাব থাকে। কার্ল সেগান অজ্ঞেয়বাদী অবস্থান নিতে গর্ব বোধ করেছিলেন, যখন তাকে মহাবিশ্বে কোথাও জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা সে বিষয়ে তার মতামত জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। যখন তিনি ‘হ্যাঁ’ অথবা ‘না’ জাতীয় কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করেন, সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী যখন তাকে চাপ দিচ্ছিলেন করছিল এ বিষয়ে তার ‘গাট ফিলিংস’ কি, তিনি এর স্মরণীয় জবাব দিয়েছিলেন: ‘কিন্তু আমি তো আমার ‘গাট’ (অন্ত্রনালী) দিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করি না’; সত্যিই, প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাদের মতামত সংরক্ষণ করা যেতেই পারে (৬৪) ; মহাবিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বের প্রশ্নটি এখনো উন্মুক্ত; পক্ষে এবং বিপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে এবং যে-কোনো একটি দিকে এই সম্ভাবনাটিকে প্রভাবিত করার মত যথেষ্ট প্রমাণের অভাব আছে। এক ধরনের অজ্ঞেয়বাদ অনেক বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের ক্ষেত্রেও যুক্তিযুক্ত অবস্থান হতে পারে, যেমন পারমিয়ান যুগের শেষে ঘটা মহাবিলুপ্তির কারণ কি(৬৫) ? জীবাশ্ম ইতিহাসে সবচেয়ে যা বড় ধরনের অবলুপ্তি। বর্তমানে সংগৃহীত প্রমাণের ভিত্তিতে এর কারণ হতে পারে পৃথিবীর সাথে কোন উল্কাপিণ্ডের সংঘর্ষ, যেমনটি পরবর্তী সময়ে ডায়নোসরদেরও বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য সম্ভাব্য একক বা মিশ্র কোনো কারণও হতে পারে। এই দুই মহাবিলুপ্তির কারণ সংক্রান্ত

প্রশ্নে অ্যাগনস্টিসিজম কিন্তু অযৌক্তিক না। ঈশ্বর সংক্রান্ত প্রশ্নে তাহলে কি? তার অস্তিত্বের ব্যপারেও কি অজ্ঞেয়বাদ যুক্তিযুক্ত? অনেকেই হয়তো তা বলবেন, অবশ্যই হ্যা, প্রায়শই দৃঢ় বিশ্বাসের আদলে এই বক্তব্য অনেকটাই অতিরিক্ত প্রতিবাদের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু তারা কি সঠিক?

আমি শুরু করবো দুই ধরনের অ্যাগনস্টিসিজম বা অজ্ঞেয়বাদকে পৃথক করার মাধ্যমে। TAP (৬৬) বা 'টেম্পরারী অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস' (সাময়িক ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদ), যা যুক্তিসঙ্গত মধ্যবর্তী অবস্থান, যেখানে পক্ষে বা বিপক্ষে সত্যিই সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে, কিন্তু আপাতত প্রমাণের অভাবে সেই উত্তরে আমরা এখনো পৌঁছাতে পারিনি (অথবা প্রমাণ থাকলেও ব্যাখ্যা করা যায়নি এখনো বোঝার ঘাটতির কারণে বা যথেষ্ট সময় পাওয়া যায়নি প্রমাণগুলো বোঝার জন্য); টেম্পরারী অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস বা ট্যাপ অবশ্যই পারমিয়ান মহাবিলুপ্তির কারণ কি হতে পারে তার ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত অবস্থান হতে পারে। অবশ্যই 'পারমিয়ান' মহাবিলুপ্তির একটি কারণ আছে, যদিও এই মুহূর্তে সত্যটি আমাদের জানা নেই, কিন্তু আশা করি একদিন আমরা অবশ্যই জানতে পারবো।

এছাড়াও কিন্তু আরো এক ধরনের মধ্যবর্তী অবস্থান আছে, আমি তার নাম দেব, PAP (৬৭) বা 'পার্মানেন্ট অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস' (স্থায়ীভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদ) শব্দসংক্ষেপটি যে শব্দটি বানান করে তার সাথে আমার প্রাক্তন স্কুলের ধর্মযাজকের উচ্চারিত একটি শব্দের মিল (প্রায়) একটি দুর্ঘটনা মাত্র। প্যাপ ধরনের অ্যাগনস্টিসিজম যুক্তিযুক্ত সেই সব প্রশ্নের ক্ষেত্রে যার উত্তর কোনদিনও পাওয়া যাবেনা, যতই প্রমাণ আমরা পক্ষে বিপক্ষে যোগাড় করি না কেন, কারণ প্রমাণ এক্ষেত্রে প্রযোজ্যই হবেনা। এই প্রশ্নের অবস্থান ভিন্ন এক স্তরে অথবা ভিন্ন কোন মাত্রায়, প্রমাণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। একটা উদাহরণ হতে পারে সেই পুরোনো ফিলোসফিক্যাল 'চেষ্টনাট'টি ,আমার মত লাল কি আপনিও দেখেন (৬৮)? হয়তো বা আপনার লাল আমার কাছে সবুজ অথবা আমার পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব এমন কোন রং থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দার্শনিকরা এই প্রশ্নের উল্লেখ করেন, এমন একটা প্রশ্ন হিসাবে যার কোন উত্তর দেয়া সম্ভব না, পরবর্তীতে যতই নতুন প্রমাণ যোগাড় করা হোক না কেন। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী আর অন্যান্য চিন্তাবিদ নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে আমি মনে করি একটি বেশি উৎসাহের সাথে - ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নটি চিরকালের জন্য উত্তরহীন থেকে যাবে, এই ধরাছোঁয়ার বাইরে প্যাপ (PAP) শ্রেণীতে। এখান থেকেই, যা আমরা পরে দেখব যে তারা অযৌক্তিক একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা সংক্রান্ত হাইপথিসিস, দুটোই সঠিক হবার সমান সম্ভাবনা আছে। আর যে দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি সমর্থন করবো তা খুবই আলাদা: ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যপারে অ্যাগনস্টিসিজম নিশ্চিৎভাবে সাময়িক বা ট্যাপ (TAP) শ্রেণীভুক্ত। হয় তার অস্তিত্ব

আছে কিংবা নেই, অবশ্যই এটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন। একদিন আমরা এর উত্তর জানতে পারবো। আপতত আমরা এর সম্ভাবনা নিয়ে জোরালো যুক্তি দিতে পারি।

বিভিন্ন ধরনের মতবাদ বা ধারণার ইতিহাসে, পরে উত্তর পাওয়া গেছে এমন অনেক প্রশ্নের উদাহরণ আছে, যা কোন এক সময় ধরে নেয়া হয়েছিল চিরকালই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থেকে যাবে। ১৮৩৫ সালে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক অগুস্ত কোঁমত(৬৯) নক্ষত্র নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক না কেন, 'আমরা কোনদিনও, তাদের রাসায়নিক গঠন বা ধাতব প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে পারব না।' অথচ কোঁমত তার এই কথাগুলো কাগজে লেখার আগেই ফ্রাউনহফার (৭০) তার স্পেক্ট্রোস্কোপ ব্যবহার করে সুর্যের রাসায়নিক গঠন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন। এখন স্পেক্ট্রোস্কোপ বিশেষজ্ঞরা প্রতদিনই কোঁমত এর অজ্ঞেয়বাদকে ভুল প্রমাণ করে যাচ্ছেন, এমনকি বহু দূরের নক্ষত্রদের রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে (৭১); কোঁমত এর নভোবৈজ্ঞানিক অজ্ঞেয়বাদ এর সঠিক যে অবস্থাই থাকুক না কেন, এই সতর্কতামূলক কাহিনীর বক্তব্য হল, অন্ততপক্ষে, কোনো বিষয়ে অজ্ঞেয়বাদের চিরন্তন সত্যতার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেবার আগে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাসত্ত্বেও যখনই ঈশ্বরের বিষয় আসে, এই শব্দটির প্রথম আবিষ্কারক, টি এইচ হাক্সলি (৭২) থেকে শুরু করে, অনেক মহান দার্শনিক আর বিজ্ঞানীরা, খুবই খুশি মনে কাজটি করে থাকেন (৭৩) ।

শব্দটির উদ্ভাবনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন হাক্সলি, যখন সেটি একটি ব্যক্তিগত আক্রমণের কারণ হয়ে দাড়িয়ে ছিল। লন্ডনের কিংস কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ডঃ ওয়েইস হাক্সলির কাপুরুষোচিত অজ্ঞেয়বাদী অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন:

> তিনি হয়তো নিজেকে অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে চিহ্নিত করতে স্বস্তিবোধ করেন, কিন্তু তার প্রকৃত নাম আসলে আরো প্রাচীন, তিনি আসলে নাস্তিক, অর্থাৎ অবিশ্বাসী। অবিশ্বাসী শব্দটির সাথে হয়তো একটি অপ্রীতিকর অর্থ জড়িয়ে আছে, এটাই হওয়া হয়তো স্বাভাবিক কোনো মানুষের পক্ষে, এবং সেটা হওয়াই উচিত, যীশু খ্রিস্টকে সে বিশ্বাস করে না, এই কথাটা স্পষ্ট করে বলাটা অবশ্যই সুখকর কোনো বিষয় নয়।

হাক্সলি অবশ্য এমন মানুষ ছিলেন না, যিনি সহজে এই ধরনের উস্কানিমূলক বক্তব্য অগ্রাহ্য করবেন এবং সবাই যেমন আশা করেছিল, ১৮৮৯ সালে, তার প্রত্যুত্তর ছিল খুবই তীব্রভাবে সমালোচনামূলক (যদিও তার স্বভাবসুলভ সতর্ক নম্রতার কোনো ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে, 'ডারউইনের বুলডগ' হিসাবে তিনি ইতোমধ্যেই দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন ভিক্টোরিয় যুগের শহুরে বৈশিষ্ট্যসূচক তীর্যক বাদানুবাদে); অবশেষে, ডঃ ওয়েইসকে তার উচিত প্রাপ্য শাস্তি এবং শেষ পর্যন্ত যা ছিল তার সবটুকুর কবর দিয়ে,

হাক্সলি ফিরে আসেন ‘অ্যাগনস্টিক’ শব্দটির কাছে এবং বর্ণনা দেন কেমন করে তিনি এটি পেলেন। ‘অন্যরা’, তিনি বলেন,

> নিশ্চিৎ যে, তারা ‘নসিস (Gnosis) বা অন্তর্গত তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন, এবং কমবেশি সাফল্যের সাথে অস্তিত্বের প্রশ্নটি সমাধান করতে পেরেছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিৎ আমি পারিনি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রশ্ন সমাধানযোগ্য নয়। হিউম (৭৪) এবং কান্টকে (৭৫) আমার পাশে নিয়ে বলছি, আমি নিজেকে এই ধরনের মতামত শক্ত করে আঁকড়ে থাকার মত এত অহঙ্কারী ভাবতে পারিনা, সুতরাং আমি চিন্তা করলাম, এবং ‘অ্যাগনস্টিক’ শব্দটিকে আবিষ্কার করলাম, যা আমার মতে যথাযথ।

পরবর্তীতে তার বক্তৃতায়, হাক্সলি আরো বিষদ ব্যাখ্যা দেন, ‘অ্যাগনস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদীদের কোনো মতবাদ নেই, এমনকি নেতিবাচক কোনো কিছু তো নয়ই।

> অ্যাগনস্টিসিজম, আসলে কোনো মতবাদ না বরং একটি পদ্ধতি। যার সার কথা হলো, একটি আদর্শকে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করা। ইতিবাচকভাবে, সেই আদর্শকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, আর কোনো কিছুর কথা না ভেবে, যতটুকু পর্যন্ত সম্ভব নিজের যুক্তিকে সর্বদা অনুসরণ করা। এবং নেতিবাচকভাবে: বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে, উপসংহার যে নিশ্চিৎ এমন ভান না করা, যখন তা প্রমাণ করা যাবে না, বা প্রমাণযোগ্য নয়। আমি এটাকেই অ্যাগনস্টিক বিশ্বাস বলি, কেউ যদি পুরোটা মানেন, এবং হালকা করে না ফেলেন, পথিবীর মুখোমুখি হতে তাকে নির্লজ্জ হতে হবেনা, ভবিষ্যতে যা কিছুই ঘটুক না কেন।

একজন বিজ্ঞানীর কাছে এগুলো অনেক মহৎ একটি বক্তব্য এবং টি. এইচ. হাক্সলিকে হালকাভাবে সমালোচনা করা যায় না। কিন্তু হাক্সলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতার প্রমাণের অসম্ভাব্যতার দিকে তার মনোযোগ দেবার ফলে তিনি সম্ভাবনার বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেননি। আমাদের পক্ষে কোনো কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারা কিংবা না পারার এই সত্যটি কিন্তু সেটির অস্তিত্ব আর অস্তিত্বহীনতার বিষয়টিকে একই শ্রেণীতে ফেলে না। আমি মনে করি না যে, টি. এইচ. হাক্সলি এই ব্যপারে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন এবং সন্দেহ হয়, তিনি আপাতদৃষ্টিতে কাজটি করেছিলেন প্রচলিত জনমতকে খুশি করতে বেশি মাত্রায় উদ্যোগী হয়ে। আমরা সবাই কাজটি কোনো না কোনো এক সময় করেছি।

হাক্সলির সাথে দ্বিমত পোষণ করে আমি বলতে চাই, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নটি অবশ্যই একটি বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস, অন্য অনেক বিষয়ের মত। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে

এটি পরীক্ষা করার মত কোনো বিষয় হিসাবে কঠিন, এটির অবস্থান 'পারমিয়ান' এবং 'ক্রিটাসিয়াস' মহাবিলুপ্তি নিয়ে বিতর্কের সাথে একই TAP বা 'টেম্পরারি অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস' শ্রেণীতে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব এই মহাবিশ্ব সংক্রান্ত একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণযোগ্য, যদিও ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজ নয়। যদি ঈশ্বর সত্যিই থাকেন, এবং তিনি নিজে যদি চান, ঈশ্বর নিজেই তার অস্তিত্বের এই বিতর্ক চিরকালের মত স্বশব্দে এবং সুস্পষ্টভাবে থামিয়ে দিতে পারেন। এবং এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি নিশ্চিৎভাবে প্রমাণ বা খণ্ডানো নাও যায়, বর্তমানে প্রাপ্য সব প্রমাণ আর যুক্তি সম্ভাবনার পরিমাপের অংকটি নিয়ে গেছে শতকরা ৫০ ভাগ থেকে আরো অনেক দূরে।

তাহলে, আমরা গুরুত্বের সাথে সম্ভাবনার স্পেকট্রাম বা ধারাবাহিক একটি বিস্তৃতির ধারণাটিকে গ্রহন করি, এবং দুটি চূড়ান্ত বিপরীতমুখী নিশ্চিৎ অবস্থানের মাঝে আরোপ করি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের নানা ভাবনার ধারাক্রমকে। এই স্পেকট্রাম বা বিস্তৃতি যদিও অবিচ্ছিন্ন, তা সত্ত্বেও দুই চূড়ান্ত অবস্থানের মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বিদ্যমান:

১. পুরোপুরি ঈশ্বরবাদী: শতকরা ১০০ ভাগ সম্ভাবনা ঈশ্বরের অস্তিত্বে। সি. জি. ইয়ুঙের (৭৬) ভাষায়: 'আমি বিশ্বাস করিনা, আমি জানি।'

২. অনেক বেশি সম্ভাবনা, কিন্তু শতকরা ১০০ ভাগের নীচে। কার্যত ঈশ্বরবাদী। 'আমি নিশ্চিৎভাবে জানি না কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি এবং তার অস্তিত্ব আছে এটাকে সত্য মনে করে আমার জীবন যাপন করি।'

৩. শতকরা ৫০ ভাগের উপরে, তবে সম্ভাবনা এর খুব একটা বেশি উপরে না : কৌশলগতভাবে অজ্ঞেয়বাদী কিন্তু ঈশ্বরবাদ ঘেষা। 'আমি খুবই অনিশ্চিৎ কিন্তু আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক।'

৪. সম্ভাবনা ঠিক শতকরা ৫০ ভাগ। পুরোপুরি পক্ষপাতহীন অ্যাগনস্টিক। 'ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা দুটোই সমানভাবে সম্ভাব্য।'

৫. শতকরা ৫০ ভাগের নীচে তবে সম্ভাবনা এর খুব একটা বেশি নীচে নয়। কৌশলগতভাবে অ্যাগনস্টিক কিন্তু নিরীশ্বরবাদ ঘেষা। আমি জানিনা ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা কিন্তু আমি সংশয়বাদী হতে ইচ্ছুক ।

৬. খুবই কম সম্ভাবনা কিন্তু শূন্যের উপরে। কার্যত নিরীশ্বরবাদী। আমি নিশ্চিৎভাবে জানিনা কিন্তু আমি মনে করি ঈশ্বর খুবই অসম্ভব একটি ব্যপার এবং তার নেই এটা মনে করে আমার জীবন যাপন করি।'

৭. পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদী। যেমন, ইয়ুং তার মন্তব্যে ব্যবহার করেছিলেন 'জানেন', ঠিক তেমন বিশ্বাসের সাথে আমি জানি কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

আমি বেশ অবাকই হবো যদি বেশি মানুষকে ক্যাটেগরি ৭ এ পাওয়া যায়, তারপরও যেখানে অধিকাংশ মানুষ, সেই ক্যাটেগরি ১ এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে আমি এটি যোগ করেছি। বিশ্বাসের প্রকৃতিই হচ্ছে, ইয়ুঙের মতে, একজন বিশ্বাসী কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই তার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সক্ষম (ইয়ুং আরো বিশ্বাস করতেন, তার বইয়ের তাকে নির্দিষ্ট কিছু বই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বশব্দে বিস্ফোরিত হতে পারে); নিরীশ্বরবাদীদের কোনো অন্ধবিশ্বাস নেই, আর শুধুমাত্র যুক্তি দিয়ে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই এই ধরনের বিশ্বাসে কেউ পৌঁছাতে পারে না। সেই কারণে ক্যাটেগরি ৭ ব্যবহারিকভাবে শূন্য এর বিপরীত মেরুর ক্যাটেগরি ১ থেকে, যেখানে অনেক অনুগত মানুষের সমাবেশ। আমি নিজেকে ক্যাটেগরি ৬ এ, কিন্তু ক্যাটেগরি ৭ ঘেষা বলে মনে করি। আমি অ্যাগনস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী, তবে তা শুধুমাত্র, বাগানে গাছের নীচে পরীদের ব্যপারে আমি যেমন অজ্ঞেয়বাদী ঠিক ততটুকু।

সম্ভাবনার এই বিস্তারটি, TAP বা 'টেম্পরারি অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিসের' ক্ষেত্রে বেশ প্রযোজ্য। 'পার্মানেন্ট অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস' বা PAP (প্যাপ) এই বিস্তারটির মাঝামাঝি, ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা যেখানে শতকরা ৫০ ভাগ, সেখানে রাখার একটা হালকা প্রলোভন হতে পারে, কিন্তু সেটা সঠিক হবে না। PAP অজ্ঞেয়বাদীরা দৃঢ়তার সাথে দাবী করেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা এই প্রশ্নে আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা সম্ভব না। এই প্রশ্নটি, 'প্যাপ'বাদীদের মতে, নীতিগতভাবে সমাধানযোগ্য নয় এবং তাদের উচিত হবে এই বিস্তারের কোনো স্তরে নিজেদের শ্রেণীভুক্ত করার যে-কোনো প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা। আমার পক্ষে জানা সম্ভব না যে, আপনার লাল কি আমার সবুজের মত - এই সত্যটা কিন্তু শতকরা ৫০ ভাগ সম্ভাবনার সমান নয়। এই ধরনের প্রস্তাব এতটাই অর্থহীন যে, একে কোনো ধরনের সম্ভাবনার মর্যাদা দেয়াও সম্ভব না। তাসত্ত্বেও, এটা খুব সাধারণ একটা ভুল, যা আমরা পরবর্তীতে আবার লক্ষ করব, নীতিগতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্নটি সমাধানযোগ্য নয় এমন ধারণা থেকে, তার অস্তিত্ব এবং তার অস্তিত্বহীনতা দুটোই সমানভাবে সম্ভাব্য এমন কোনো উপসংহারে উপনীত হওয়া।

অন্য আরেকভাবে এই ভুলটি বোঝানো যেতে পারে, প্রমাণের দায়ভারের মাধ্যমে, যা বার্ট্রান্ড রাসেল (৭৭) চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন স্বর্গীয় চায়ের পাত্রের রূপকের মাধ্যমে (৭৮) ।

> অনেক গোঁড়া ধর্মামতাবলম্বীরা এমন ভাবে কথা বলেন যেন, স্বর্গীয়ভাবে বা ঐশী প্রত্যাদেশে প্রাপ্ত কোনো ধর্মকে মিথ্যা প্রমাণ করার দায়িত্ব সেই ধর্মমতাবলম্বী নয় বরং সংশয়বাদীদেরই উপরেই বর্তায়, গোঁড়া ধর্মবাদীদের সেটির সত্যতা প্রমাণ করার কোনো দ্বায়িত্ব নেই। এটি অবশ্যই ভুল। আমি যদি প্রস্তাব করি, পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহের মাঝে চীনামাটির তৈরি একটি চায়ের কেটলি আছে, যা সুর্যের চারপাশে উপবৃত্তাকার একটি কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করছে, কারো পক্ষে কিন্তু আমার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে আমি যদি একটু সতর্ক হয়ে আরো বলি যে, চায়ের সেই পাত্রটি এত ক্ষুদ্রকায়, আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়েও তা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যদি আরো বলি, আমার দাবীকে যেহেতু মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে না, অতএব একে সন্দেহ করা কোনো মানবিক যুক্তির পক্ষে অসহ্য একটি ধৃষ্টতা হবে। তবে আমি যে অর্থহীন কথা বলছি এমনটি ভাবা কারো জন্য ভুল হবে না। কিন্তু এই ধরনের একটি চায়ের কেটলির অস্তিত্ব যদি সুনিশ্চিৎভাবে ঘোষণা করা হতো প্রাচীন ধর্মীয় গ্রন্থে, প্রতি রোববারে পবিত্র উদ্ধৃতি হিসাবে তা শেখানো হতো, স্কুলে শিশুদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হতো, তাহলে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনো ধরনের দ্বিধা দ্বন্দ্ব বা ইতস্ততা হিসাবে চিহ্নিত করা হতো, বরং একটি অস্বাভাবিকতা হিসাবে, এবং এর সংশয়বাদীরা নজরে পড়তেন আধুনিক যুগে মনোচিকিৎসকদের এবং অতীতের ইনক্যুইজিটরদের (৭৯) নজরে।

এই বিষয়ে কথা বলে আমাদের সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, আমি যতটুকু জানি কেউই এরকম কোন চায়ের কেটলির উপাসনা করেন না। কিন্তু যদি জোর করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করতে দ্বিধা বোধ করবো না যে, অবশ্যই কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত এমন কোনো চায়ের পাত্রের অস্তিত্ব নেই। তারপরও মূলত নিয়মানুযায়ী আমাদের সবাইকে চা-কেটলি অ্যাগনস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে ধরে নিতে হবে: আমরা প্রমাণ করতে পারব না, সুনিশ্চিৎভাবে, যে কোনো স্বর্গীয় চা-কেটলির অস্তিত্ব নেই। ব্যবহারিক সব ক্ষেত্রে, চা-কেটলি সংক্রান্ত অজ্ঞেয়বাদ থেকে আমরা সরে আসবো চায়ের চা-কেটলি সংক্রান্ত অবিশ্বাসী মতবাদে (৮০) ।

একজন বন্ধু, যিনি প্রতিপালিত হয়েছেন ইহুদী ধর্মীয় পরিমণ্ডলে এবং নিজ ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত হয়ে এখনো সাবাথ (৮১) বা অন্যান্য ইহুদী ধর্মীয় আচার পালন করেন,

নিজেকে বর্ণনা দেন একজন ‘টুথ ফেয়ারী (৮২) অজ্ঞেয়বাদী’ হিসাবে। তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে ‘টুথ ফেয়ারীর’ অস্তিত্বের সম্ভাবনার থেকে আদৌ বেশি কিছু মনে করেন না, দুটি হাইপোথিসিসের কোনোটাই প্রমাণ করা সম্ভব না, এবং দুটোই সমানভাবে অসম্ভব। প্রায় ঠিক যতটুকু তিনি ফেয়ারী অবিশ্বাসী ততটুকু ঈশ্বর অবিশ্বাসী, এবং উভয় ক্ষেত্রে একই মাত্রায় অজ্ঞেয়বাদী।

রাসেলের এর কল্পিত চায়ের কেটলি, অবশ্যই অগণিত জিনিসের প্রতীক বা প্রতিনিধিত্ব করছে, যাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব, কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ করা অসম্ভব। আমেরিকার বিখ্যাত আইনজীবি, চার্লস ড্যারো বলেছিলেন, ‘আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি না যেমন মাদার গুজকেও (৮৩) বিশ্বাস করি না’; সাংবাদিক অ্যান্ড্রু মুয়েলার মতে নিজেকে কোনো বিশেষ একটি ধর্মবিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করার অর্থ হচ্ছে, ‘পৃথিবী রম্বস আকৃতির এবং এসমেরেল্ডা আর কিথ নামের দুইটি অতিবিশাল সবুজ লবষ্টার তাদের সাঁড়াশীর মত দুই হাতে মহাবিশ্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীটাকে বহন করে নিয়ে চলছে এমন ধরনের কোনো উদ্ভট বিশ্বাসের চেয়ে বেশি কিছু না (৮৪)। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সবচেয়ে প্রিয়, অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অশ্রবণযোগ্য ইউনিকর্ন (৮৫), যা প্রতিবছর ‘ক্যাম্প কোয়েস্টের’ শিশুরা মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করে (৮৬)। বর্তমানে ইন্টারনেটে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা যাকে সেই ইয়াহয়ে বা সমতূল্য অন্য যে-কোনটার মতোই মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব নয়, তা হল ‘ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার’, যিনি, অনেকেই দাবী করে, তাদেরকে স্পর্শ করেছে নুড়লসের মত শরীরের অংশ দিয়ে (৮৭); আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি যে, ‘গসপেল অব ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার’ ইতোমধ্যেই বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রশংসিত হয়েছে (৮৮); আমি যদিও এখনো পড়িনি কিন্ত গসপেল পড়ার কি দরকার, যদি আপনি জানেন, এটা সত্যি ? প্রসঙ্গক্রমে, যা হবার কথা ছিল, বড় মাপের মতবিভেদ ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে, ফলে তৈরি হয়েছে রিফর্মড বা সংস্কারকৃত ‘চার্চ অব দ্য ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার’ (৯০) ।

এসব বিচিত্র উদাহরণ নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্য হলো, এদের মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব না, তারপরও তাদের অস্তিত্ব আর অস্তিত্বহীনতার হাইপোথিসিস সমমানের বলে কেউ চিন্তা করে না। রাসেলের বক্তব্য হল, প্রমাণ করার দায়ভার বিশ্বাসীদের, অবিশ্বাসীদের নয়। আমার বক্তব্যও কিছুটা সেই ধরনেরর, উড়ন্ত চা-কেটলির অস্তিত্বের পক্ষে সম্ভাবনা (বা স্প্যাগেটি মনস্টার/এসমেরেল্ডা আর কিথ/ ইউনিকর্ন ইত্যাদি) কিন্তু এর বিপক্ষে সম্ভাবনার সমান নয়।

কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত কোনো ‘চা-কেটলি’ বা ‘টুথ ফেয়ারার’ অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণ করার অযোগ্য, এই বিষয়টিকে সত্য হিসাবে কোনো যুক্তিবাদী মানুষই অনুভব করেন না, কিংবা মনে করেন না যে এটি এমন কোনো বিষয় হতে পারে, যা কিনা আগ্রোহদ্দীপক

যুক্তিতর্কের মাধ্যমে মীমাংসা করা সম্ভব। উর্বর আর ছলনাময়ী কল্পনা তৈরি করতে পারে এমন লক্ষ লক্ষ অবাস্তব বিষয়গুলোকে মিথ্যা প্রমাণ করাকে আমরা কেউই নিজেদের দ্বায়িত্ব বলে মনে করি না। যখন জিজ্ঞেস করা হয় আমি নিরীশ্বরবাদী কিনা, আমার এটিকে মজার একটা কৌশল বলে মনে হয়, যে আমিও প্রশ্নকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চাই যে, জিউস (৯০), অ্যাপোলো (৯১), আমন-রা (৯২), মিথরাস (৯৩), বা'ল (৯৪), থর (৯৫), ওটান (৯৬), সোনালী বাছুর (৯৭) এবং ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টারের (৯৮) ক্ষেত্রে তিনি নিজেও একজন নিরীশ্বরবাদী, আমি কেবল আরেকটি বেশি ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করি মাত্র।

আমরা প্রায় সবাই পুরোপুরি অবিশ্বাসের কাছাকাছি এক ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করার অধিকার রাখি - শুধুমাত্র ইউনিকর্ন, টুথ ফেয়ারী, প্রাচীন গ্রিস, রোম, মিশর এবং ভাইকিংদের দেবদেবীদের ক্ষেত্রে আমাদের তেমন কোনো মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু আব্রাহামীয় ঈশ্বরের ক্ষেত্রে চিন্তার প্রয়োজন আছে, কারণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ যাদের সাথে আমরা এই পৃথিবীতে বাস করি তারা তার অস্তিত্বে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। রাসেলের চা-কেটলির উদাহরণ যা প্রদর্শন করছে, তা হলো ঈশ্বর বিশ্বাসের সর্বজনীনতা। স্বর্গীয় চা-কেটলির বিশ্বাসের সাথে তুলনা করলে, যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করার দায়ভারটা যে তাদের (ধর্মবিশ্বাসীদের), সেই বিষয়টি কিন্তু অপরিবর্তনীয় থাকে। যদিও প্রায়োগিক বাস্তব রাজনৈতিক স্তরে মনে হতে পারে যে দায়ভারের দিক পরিবর্তিত হয়ে নির্দেশিত হয়েছে অবিশ্বাসীদেরই দিকে। ঈশ্বরের অস্তিত্বহীনতা যে আমরা প্রমাণ করতে পারবো না তা গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে, এবং রূপান্তরিত হয়েছে যেন খুবই তুচ্ছ একটি ব্যপারে, এমনকি শুধুমাত্র এই অর্থে যে, আমরা কখনেই চূড়ান্তভাবে কোনকিছুর অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করতে পারবো না। আসল ব্যপারটা হলো যে, ঈশ্বরকে কি অপ্রমাণ করা যায় কিনা (তিনি অবশ্যই তা না) সেটা কিন্তু নয় বরং তার অস্তিত্ব আদৌ 'সম্ভব' কি কিনা, সেটাই। এবং সেটা ভিন্ন একটি ব্যপার। কিছু প্রমাণ অযোগ্য বিষয় যুক্তিসঙ্গতভাবেই বিচার করা হয়, অন্য আরো কিছু প্রমাণ অযোগ্য বিষয় থেকে, অনেক কম 'সম্ভাব্য' হিসেবে। কোনো কারণই নেই 'ঈশ্বরকে' সম্ভাবনার এই বিস্তারের নিরিখে পরীক্ষাযোগ্য না ভাবা। এবং অবশ্যই কোনো কারণ নেই ভাববার যে, শুধুমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা বা মিথ্যা প্রমাণ করা যাবে না বলেই তার অস্তিত্বের সম্ভাবনা শতকরা ৫০ ভাগ। বরং এর বিপরীতটাই সম্ভব, যা আমরা পরবর্তীতে দেখবো।

নোমা (NOMA)

সম্পূর্ণভাবে পক্ষপাতহীন অজ্ঞেয়বাদের প্রতি টমাস হাক্সলি যেভাবে আন্তরিকতাহীন সমর্থন জানাতে বেশি মাত্রায় সচেষ্ট হয়েছিলেন, আমার সাত স্তরের সম্ভাবনা বিস্তারের মধ্যবর্তী স্তরের ঈশ্বরবাদীরাও ঠিক একই ধরনের কিছু কারণে কাজটি অন্যদিক বরাবর

করে থাকেন। ধর্মতত্ত্ববিদ অ্যালিস্টার ম্যাকগ্রাথ (১০০) তার ‘ডকিন্সস গড: জিনস, মিমস অ্যাণ্ড দি অরিজিন অব লাইফ’ বইতে এটাকেই মূল বক্তব্য হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। সত্যি, আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটি সপ্রশংস পক্ষপাতহীন সারাংশ শেষে মনে হয়েছে, যুক্তি খণ্ডানোর লক্ষ্যে তিনি কেবলমাত্র একটি বিষয় শুধু উল্লেখ করেছেন: সেই অনস্বীকার্য এবং অসম্মানজনক দুর্বল যুক্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে কেউ মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ম্যাকগ্রাথ পড়ার সময় আমি মার্জিনে ‘চা-কেটলি’ (১০১) লিখে গেছি। টি. এইচ. হাক্সলির বক্তব্য তার সমর্থনে উল্লেখ করে তিনি বলেন: ‘চরম বিরক্ত হই যখন ঈশ্বরবাদী আর নিরীশ্বরবাদী, উভয় পক্ষই অপর্যাপ্ত পরিমাণ প্রায়োগিক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয়ে নৈরাশ্যজনকভাবে অযৌক্তিক গোঁড়া মতবাদ বা বক্তব্য প্রদান করেন, হাক্সলি ঘোষণা করেছিলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঈশ্বর প্রশ্নের কোনো সুরাহা হবে না’।

ম্যাকগ্রাথ পরে স্টিফেন জে. গুল্ডের (১০২) একটি উদ্ধৃতি দেন একই ধারাবাহিকতায়: ‘আমার সহকর্মীদের জন্যে আর বহু লক্ষবার যা বলেছি (কলেজের ঘরোয়া আলোচনা থেকে গবেষণামূলক সেমিনারে): বিজ্ঞান কোনোভাবেই (এর অন্তর্ভুক্ত কোনো স্বীকৃত বৈধ উপায়ে), প্রকৃতির উপর উপর ঈশ্বরের সম্ভাব্য তদারকীর বিষয়টি মিমাংসা করতে পারবে না। আমরা না পারবো একে সত্যাপন করতে, না পারবো অস্বীকার করতে। বিজ্ঞানী হিসাবে এই বিষয়ে আমরা মন্তব্য করতেই পারবো না’; গুল্ডের দাবীর মধ্যে প্রত্যয়ী, প্রায় জোর জবরদস্তিমূলক আওয়াজ থাকা সত্ত্বেও, আসলেই তার এই কথার যৌক্তিকতাটি কি? কেন বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারব না? আর কেনই বা রাসেলের ‘চা-কেটলি’ অথবা ‘ফ্লাইং স্প্যাগেটি মনস্টার’ সমানভাবে বৈজ্ঞানিক সন্দেহের উর্ধে থাকবে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমি যুক্তি উপস্থাপন করবো যে, সৃষ্টিকর্তার তদারকীতে চলমান একটি মহাবিশ্ব অবশ্যই সৃষ্টিকর্তাহীন কোনো মহাবিশ্ব থেকে ভিন্ন হবে। আর কেনই বা তা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে হিসাবে গ্রাহ্য করা হবে না?

খুশি করার জন্য অতিরিক্ত বিনয়ী হবার চেষ্টার শিল্পটিকে আক্ষরিক অর্থে মাটিতে প্রায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে ছিলেন গুল্ড তার অপেক্ষাকৃত কম প্রশংসিত ‘রকস অব এজেস’ বইয়ে। এখানেই তিনি উদ্ভাবন করেন নোমা (NOMA), শব্দটিকে, শব্দটি ‘নন-ওভারল্যাপিং ম্যাজিষ্টেরিয়ার (Non-Overlaping Magisteria) শব্দ সংক্ষেপ:

> বিজ্ঞানের ‘প্রভাব বা কর্তৃত্বের ক্ষেত্র’ বা ‘ম্যাজিষ্টেরিয়াম’ বিস্তৃত প্রায়োগিক জগতে: বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি দিয়ে তৈরি (বাস্তব তথ্য) এবং কেন এটি এভাবে কাজ করে (তত্ত্ব); কিন্তু ধর্মের ‘ম্যাজিষ্টেরিয়াম’ বিস্তৃত এইসব কিছুর সর্বশেষ অর্থ এবং নৈতিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত প্রশ্ন সমূহে এই দুই ম্যাজিষ্টেরিয়া একে

অপরকে অধিক্রমণ করে না, এবং তারা সকল জিজ্ঞাসাকেও ধারণ করেনা (উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, শিল্পের ম্যাজিষ্টেরিয়াম এবং সৌন্দর্য্যর অর্থ); পুরানো বহুল ব্যবহৃত কথা উল্লেখ করে বললে, বিজ্ঞান জানে কিভাবে কোনো পাথরের অতিক্রান্ত করা সময় নির্ধারণ করা যায় (age of rocks), আর ধর্ম জানে যুগযুগান্তরের বিশ্বাসের প্রতীক-রূপী পাথরকে (rock of ages); বিজ্ঞান গবেষণা করে কিভাবে স্বর্গোলক চলছে (how the heaven goes), আর ধর্মের ভাবনা হচ্ছে কেমন করে স্বর্গে যাওয়া যায় (how to go to heaven)।

বিষয়টা নিয়ে আপনি চিন্তা করার আগ পর্যন্ত শুনতে ভালোই লাগবে উপরের কথাগুলো। সেই সব চূড়ান্ত প্রশ্নাবলী আসলে কোনগুলো যার সামনে ধর্ম সম্মানিত অতিথি আর বিজ্ঞানকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে চুপিসারে সরে পড়তে হবে।

মার্টিন রিস, কেমব্রিজের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী যার কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, তিনি তার বই ‘আওয়ার কসমিক হ্যাবিট্যাট’ শুরু করেছেন দুটি সম্ভাব্য চূড়ান্ত প্রশ্ন প্রস্তাব এবং সেগুলোর নোমা-বান্ধব উত্তর দেয়ার মাধ্যমে। ‘সবচেয়ে প্রধান রহস্যটা হলো, যে-কোনো কিছুর আদৌ কেন অস্তিত্ব আছে এবং এই সমীকরণে কে বা কি জীবনের স্পর্শ দিয়ে এই মহাবিশ্বে তাদের বাস্তবতা দিয়েছে? এই ধরনের প্রশ্নগুলো বিজ্ঞানের আওতার বাইরে, কিন্তু তারা দর্শন আর ধর্মতত্ত্বের এখতিয়ারে অবস্থিত’। আমি বরং বলতাম যে, যদি সত্যি তারা বিজ্ঞানের নাগালের বাইরে অবস্থান করে থাকে, অবশ্যই ধর্মতত্ত্বের আওতার বাইরেও তাদের অবস্থান (আমার সন্দেহ আছে দার্শনিকরা তাদেরকে ধর্মতাত্ত্বিকদের সাথে এক গোত্রে ফেলার জন্য মার্টিন রিসের ওপর আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেন)। আমি আরেকটু আগ বাড়িয়ে ভাবার চেষ্টা করছি যে, কোন অর্থে বলা সম্ভব যে, ধর্মতাত্ত্বিকদের একটি পৃথক এখতিয়ার বা সীমানা আছে। আমার অক্সফোর্ড কলেজের ওয়ার্ডেনের (প্রধান) মন্তব্যটা মনে পড়লে এখনো হাসি পায়; একজন তরুণ ধর্মতত্ত্ববিদ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশীপের জন্য আবেদন করেছিল, এবং খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তার ডক্টরাল থিসিস ওয়ার্ডেনকে মন্তব্য করতে প্ররোচনা করেছিল: ‘আমার গভীর সন্দেহ আছে যে আদৌ এটা কোনো গবেষণার বিষয় হতে পারে কিনা’।

গভীর মহাজাগতিক প্রশ্নের সমাধানে ধর্মতাত্ত্বিকরা কি এমন বিশেষ দক্ষতা দেখাবেন, যা বিজ্ঞানীরা পারবেন না? আরেকটি লেখায় আমি অক্সফোর্ডের একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করেছিলাম, যখন আমি তাকে এই গভীর প্রশ্নগুলোর একটি করেছিলাম, তার উত্তর ছিল: ‘নাহ, এখন আমরা বিজ্ঞানের সীমানার বাইরে চলে যাচ্ছি, এখন এর উত্তর দেবার দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি আমাদের ভালো বন্ধু চ্যাপলেইনের (ধর্মযাজক) উপর’। আমি খুব দ্রুত এর উত্তর দিতে পারিনি, যা আমি পরে লিখেছিলাম:

‘কিন্তু কেন চ্যাপলেইন? কেন বাগানের মালী বা বাবুর্চি নয়?’ কেন বিজ্ঞানীরা কাপুরুষের মত ধর্মতত্ত্ববিদদের উচ্চাশার প্রতি ভক্তিশীল, যখন এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য তারা অবশ্যই বিজ্ঞানীদের নিজেদের থেকে বেশি যোগ্য নয়?

একটি বিরক্তিকর বহু ব্যবহৃত উক্তি (আর, অন্য অনেক বহু-ব্যবহৃত শব্দ থেকে এর পার্থক্য, এটি এমনকি সত্য না), তা হলো, বিজ্ঞান ব্যস্ত থাকে ‘কিভাবে’ (how) প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু একমাত্র ধর্মতত্ত্ব ‘কেন’ (why) প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত। এই ‘কেন’ প্রশ্নটা আসলেই বা কি? প্রত্যেকটা ইংরেজী বাক্য ‘কেন’ দিয়ে শুরু হলেই সেটা যুক্তিসঙ্গত বৈধ কোনো প্রশ্ন হয়ে যায় না: ইউনিকর্নের ভেতরটা ফাঁপা বা শূন্য কেন? কিছু প্রশ্ন কোনো উত্তর পাবারই যোগ্যতা রাখে না, যেমন ধরুন, চিন্তার রং কেমন ? আশার গন্ধ কেমন? কোনো প্রশ্ন ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ হলেই অর্থবহ বাক্য হয় না, বা তার জন্য সময় নষ্ট করাও যুক্তিযুক্ত হয় না। এমন কি প্রশ্নটা যদি বাস্তবসম্মতও হয়, বিজ্ঞান পারবে না বলে এর অর্থ এমন নয় যে, ধর্ম সেটি পারবে।

হয়তো এমন কিছু সত্যিকারের এবং গভীর প্রশ্ন আছে যা চিরকালই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে থেকে যাবে। হয়তো কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইতোমধ্যেই আমাদের বোঝার ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দরজায় কড়া নাড়ছে। কিন্তু যদি বিজ্ঞান কোনো চূড়ান্ত বা সর্বশেষ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারে, তাহলে ধর্ম পারবে এমন কথা কেমন করে ভাবা সম্ভব? আমি বিশ্বাস করি, না কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কেউই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, বিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন এমন কোনো গভীরতম প্রশ্নের উত্তর দেবার মত বিশেষ কোনো দক্ষতা ধর্মতত্ত্ববিদদের আছে। আমি সন্দেহ করছি, দুই জ্যোতির্বিজ্ঞানী, আবারো বিনয়ী হবার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করেছেন : ধর্মতাত্ত্বিকদের তো কোনো কিছু সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিছু বলার নেই, সুতরাং ঠিক আছে আমরা তাদের বরং একটু ছাড় দেই, উনারা চিন্তা করতে থাকুন এমন কতগুলো প্রশ্ন নিয়ে যা কেউ কোনোদিনও উত্তর দিতে পারবে না। আমার জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধুদের মত আমি কিন্তু মনে করিনা, আমাদের আদৌ তাদের এই ধরনের সুযোগ দেবার কোনো প্রয়োজন আছে। ধর্মতত্ত্ব (বাইবেল সংশ্লিষ্ট ইতিহাস, সাহিত্যের পরিবর্তে) আসলে একটি বিষয় হতে পারে, আমি এর সমর্থনে এখনো কোনো জোরালো কারণ দেখিনি।

বাড়িয়ে না বললেও, একইভাবে, আমরা প্রায় সবাই একমত হতে পারি যে, নৈতিক মূল্যবোধের উপর উপদেশ দেবার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অধিকারের বিষয়টি অবশ্যই আমাদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু গুল্ড কি আসলেই কোনটা ভালো আর কোনটা খারাপ সেটা নির্ধারণ করার অধিকার ধর্মের উপরেই ছেড়ে দিতে চান? মানব জ্ঞানের সম্ভারে যার নতুন আর কিছু দেবার নেই; আমাদের করণীয় সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেবার জন্য ধর্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারে এই বাস্তব সত্যটা

নিশ্চয়ই কোনো কারণ হতে পারে না। তাছাড়া, কোন ধর্ম? সেই ধর্ম, জন্ম থেকে যে ধর্মে ঘটনাচক্রে আমরা প্রতিপালিত হয়েছি? বেশ তাহলে, কোন অধ্যায়, বাইবেলের কোন বইটার পাতা আমরা উল্টাবো - কারণ কোনো বইই একমত পোষণ করে না, আর কয়েকটি যে-কোনো যুক্তিসঙ্গত মাপকাঠিতে রীতিমত কদর্য । কত জন আসলে যথেষ্ট পরিমাণ বাইবেল পড়েছেন আর জানেন যে সেখানে ব্যভিচার বা সাবাথের দিনে কাঠ কুড়ানোর মত কোনো কাজ বা পিতামাতার সাথে বেয়াদবি করার শাস্তি হিসাবে 'মত্যুদণ্ড' ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা যদি ডিউটেরোনমী (১০৩) এবং লিভিটিকাসকে (১০৪) বাদ দেই (আধুনিক সুশিক্ষিত ও আধুনিক সব মানুষই সাধারণত যেটা করে থাকেন), কোন মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করেই বা আমরা সিদ্ধান্ত নেব, ধর্মের কোন নৈতিক মূল্যবোধ আমরা 'গ্রহন' করব? নাকি আমরা সারা পৃথিবীর সব ধর্মগুলো খুঁজে বেছে দেখবো, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, এমন কোনো নৈতিক শিক্ষা আমরা খুঁজে না পাই। সেটাই যদি হয়, তাহলে আবার প্রশ্ন ওঠে, কোন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করেই আমরা তা বাছাই করবো? ধর্মীয় নৈতিকতা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যদি স্বতন্ত্র কোনো মানদণ্ড থেকেই থাকে, তাহলে কেন আমরা মধ্যসত্ত্বভোগীদের বাদ দিয়ে অর্থাৎ ধর্ম ছাড়াই সরাসরি নৈতিক মূল্যবোধগুলো বেছে নিতে পারি না? প্রশ্নগুলোতে আমি আবার সপ্তম অধ্যায়ে ফিরে আসবো।

আমি সত্যি বিশ্বাস করি না, গুল্ড তার 'রক অব এজেস' (১০৫) বইয়ে যা লিখেছেন আসলেই তিনি তা বোঝাতে চাইছেন। আমি যেমন বলেছি আগে, আমরা প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে, অযোগ্য কিন্তু শক্তিশালী প্রতিপক্ষের প্রতি নম্র হতে বা তাদের ছাড় দিতে অতিরিক্ত সচেষ্ট হবার অপরাধে অপরাধী, এবং গুল্ডের এসব করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমি শুধু এটুকুই ভাবতে পারি। কিন্তু কল্পনা করা যেতে পারে যে, তিনি তার সুস্পষ্ট শক্তিশালী বক্তব্য দিয়ে আসলেই বোঝাতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রশ্নে বিজ্ঞানের কোনো কিছু বলার নেই: 'আমরা না পারবো প্রমাণ করতে, না পারবো অস্বীকার করতে, বিজ্ঞানী হিসাবে আমরা এই বিষয়ে কোনো রকম মন্তব্যই করতে পারবো না'; বক্তব্যটা শুনতে অজ্ঞেয়বাদীদের মত শোনাচ্ছে, স্থায়ী আর অপরিবর্তনশীল, পুরোপুরি PAP বা 'পার্মানেন্ট অ্যাগনস্টিসিজম ইন প্র্যাকটিস'। এর অর্থই হচ্ছে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞান এমন কি 'সম্ভাবনা' সংক্রান্ত কোনো মন্তব্যও করতে পারবে না। এই লক্ষণীয় সর্বব্যাপী মিথ্যা ধারণাটি অনেকেই যা যপ করেন মন্ত্রের মতন, কিন্তু আমার সন্দেহ তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই বিষয়টি নিয়ে ভালোমত ভেবেছেন, আমি যাকে বলছি 'অজ্ঞেয়বাদের দীনতা'। গুল্ড কিন্তু পক্ষপাতহীন অজ্ঞেয়বাদী নন, বরং বেশ তীব্রভাবে কার্যত নিরীশ্বরবাদী। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা এ বিষয়ে আর কিছুই বলার নাই থাকে তাহলে কিসের উপর ভিত্তি করে তিনি এমন রায় দিলেন?

ঈশ্বর হাইপোথিসিসের বক্তব্য হল, যে বাস্তবে আমাদের বাস সেখানে একজন অতিপ্রাকৃত সত্তারও বসবাস, যিনি এই মহাবিশ্বের পরিকল্পক এবং সৃষ্টিকারী - নিদেনপক্ষে এই হাইপোথিসিসের বেশ কিছু সংস্করণ - তিনি রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং এমনকি অলৌকিক ঘটনা ঘটনোর মাধ্যমে সেখানে মাঝে মধ্যেই হস্তক্ষেপও করে থাকেন, যা তার নিজের তৈরি সুবিশাল চির-অপরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক সূত্রেরই সাময়িক লঙ্ঘন। রিচার্ড সুইনবার্ন (১০৬), ব্রিটেনের নেতৃস্থানীয় ধর্মতত্ত্ববিদ এ বিষয়ে স্পষ্ট তার ‘ইস দেয়ার এ গড’ বইয়ে:

> ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা দাবী করেন তা হলো, তার ছোটো কিংবা বড় কোনো কিছু সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে । এবং তিনি যে-কোনো বস্তুকে পরিচালিত করতে পারেন, অথবা এর দ্বারা যে-কোনো কিছু করাতে পারেন। তিনি গ্রহদের এমনভাবে নাড়ান যে, কেপলার আবিষ্কার করেছিলেন তারা স্থির নয়, অথবা বারুদকে বিস্ফোরিত করেন যদি তা আমরা জ্বলন্ত দিয়াশলই কাঠির সংস্পর্শে নিয়ে আসি; অথবা তিনি গ্রহদের গতিপথ নাড়াতে পারেন অন্য কোনোভাবে, এবং বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থসমুহ বিস্ফোরিত হবে কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো পরিস্থিতিতে। প্রকৃতির নিয়মকানুন দিয়ে ঈশ্বর সীমাবদ্ধ নন, তিনি তাদের তৈরি করেন, যদি ইচ্ছা পোষণ করেন, তিনি তাদের স্থগিত করতে পারেন।

যেন কত সহজ, তাই না, এটা আর যা-ই হোক না কেন, নোমা (NOMA) প্রস্তাবনা থেকে অনেক পৃথক একটি প্রস্তাব। এবং তারা যা কিছু বলুক না কেন, যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা এই ‘পৃথক ম্যাজিস্টিরিয়া বা ক্ষমতার বলয়’ তত্ত্বটির অনুগত তাদের উচিত হবে মেনে নেয়া যে, অতিপ্রাকৃত এবং বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তাসহ একটি মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক পৃথক হবে সৃষ্টিকর্তাহীন কোনো মহাবিশ্ব থেকে। এই দুটি প্রস্তাবিত মহাজগতের মধ্যে পার্থক্য নীতিগতভাবে তেমন মৌলিক না, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা পরীক্ষা করা কঠিন। এবং এটি দুর্বল করে দেয় এই আত্মতুষ্টি প্রদানকারী চিত্তাকর্ষক বাণীটিকে : বিজ্ঞানকে অবশ্যই সম্পূর্ণ নীরব থাকতে হবে ধর্মের কেন্দ্রীয় অস্তিত্ব সংশ্লিষ্ট দাবী প্রসঙ্গে। সৃজনশীল একজন অতিবুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি প্রশ্নাতীতভাবে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন এবং, যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যার আপাতত এখনো অবধি কোনো মিমাংসা হয়নি। তেমনি সকল অলৌকিক কাহিনী, যেগুলোর ওপর ধর্ম নির্ভর করে অসংখ্য বিশ্বাসীদের চমক দিতে, তাদের সত্যতা বা মিথ্যার বিষয়টিও বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন ।

যীশুর কি মানব কোনো পিতা ছিলেন, অথবা তার জন্মের সময় তার মা কি কুমারী ছিলেন? এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার মত যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ এখনো অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, এই প্রশ্নগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন, যাদের নীতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি উত্তর আছে: 'হ্যাঁ' কিংবা 'না'। যীশু কী ল্যাজারাসকে মৃত্যুশয্যা থেকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন? ক্রুশবিদ্ধ হবার তিন দিন পর তিনি কী মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছিলেন? এই ধরনের প্রত্যেকটি প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট কিছু উত্তর আছে, আমরা সেই উত্তর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুঁজে পাই কিংবা না পাই এবং এটি কঠোরভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর। যদি প্রাসঙ্গিক প্রমাণ জোগাড় হবার মত অসম্ভব ঘটনা ঘটে কোনোদিন, তবে এই বিষয়গুলো সমাধানের জন্য আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করবো তা সম্পূর্ণভাবে এবং বিশুদ্ধভাবে বিজ্ঞানভিত্তিক হবে। প্রসঙ্গটিকে একটু নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করা যাক, কল্পনা করুন, কোনো অসাধারণ ঘটনাচক্রে ফরেনসিক প্রত্নতত্ত্ববিদরা ডিএনএ প্রমাণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন, যা প্রমাণ করে, আসলে যীশুর পিতা কোনো জৈব মানুষ ছিলেন না। আপনি কি কল্পনা করতে পারবেন, ধর্মীয় আত্মপক্ষসমর্থনকারীরা পুরো ব্যপারটাকে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবে, সম্ভাব্য এমন কিছু বলে, যেমন,'কার কি আসে যায়, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নে সম্পূর্ণরুপে অপ্রাসঙ্গিক। ভুল জ্ঞানের ক্ষেত্র ! আমাদের ভাববার বিষয় হলো চূড়ান্ত প্রশ্নগুলো আর নৈতিক মূল্যবোধ। ডিএনএ কিংবা অন্য যে-কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণের এই বিষয়ে কোনোভাবে কোনো ধরনের প্রভাব থাকতে পারে না।'

এই ধারণাটাই হাস্যকর। আপনি আপনার জীবন বাজি রাখতে পারেন, এই ধরনের কিছু বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ যদি কোনোদিন পাওয়া যায়, তাহলে সেগুলো জোর করে দখল করে অনুকীর্তন করে তারা ভয়ঙ্কর মাত্রায় অতিরঞ্জিত করবেন। 'নোমা' ধারণাটির জনপ্রিয়তার কারণ শুধুমাত্র ঈশ্বর হাইপোথিসিসের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই বলে। যে মুহূর্তে ক্ষুদ্রতম কোনো প্রস্তাব বা প্রমাণ ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাইবে, ধর্মীয় আত্মপক্ষসমর্থনকারীরা 'নোমা' ধারণাটিকে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে এক মুহূর্তও দেরী করবেন না। কিছু জ্ঞানী ধর্মতাত্ত্বিকদের বাদ দিলে (এবং এমন কি তারাও সাধারণ মানুষদের অলৌকিক কাহিনী বলতে ভালোবাসেন তাদের সমাবেশের আকার স্ফীত করতে), আমার সন্দেহ , এই কথিত অলৌকিক ঘটনাগুলো অনেক বিশ্বাসীদের তাদের বিশ্বাসকে ধরে রাখার পেছনে শক্তিশালী কারণ। এবং এইসব অলৌকিক ঘটনাগুলো, সংজ্ঞানুযায়ীই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো ভঙ্গ করে।

রোমান ক্যাথলিক চার্চ একদিকে যেমন কখনো মনে হয় 'নোমা' হবার উচ্চাকাঙ্খা পোষণ করে, কিন্তু আবার অন্যদিকে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোকে 'সেইন্ট' হিসাবে স্বীকৃতি পাবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি নিয়ম হিসাবে বেঁধে দিয়েছে। গর্ভপাতের বিরুদ্ধে তার অবস্থানের জন্য বেলজিয়ানদের প্রয়াত রাজা 'সেইন্ট' হবার একজন

প্রার্থী। বর্তমানে জোর ও আন্তরিক অনুসন্ধান চলছে, তার মৃত্যুর পর তার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা কোন প্রার্থনা কোনো অলৌকিকভাবে নিরাময় লাভ করার ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যায় কিনা। আমি ঠাট্টা করছি না কিন্তু। এটাই হচ্ছে ঘটনা, সেইন্টদের কাহিনীগুলো কিন্তু এই ধরনেরই। আমার মনে হয় চার্চের মধ্যে বিজ্ঞ কারো কারো কাছে ব্যাপারটা বিব্রতকর। তবে বিজ্ঞ বলে পরিচিত কেউ চার্চের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবেনই বা কেন, সেটিও রহস্যজনক, অনেকটা ধর্মতাত্ত্বিকরা যে রহস্য উপভোগ করেন সেই রকম।

অলৌকিক ঘটনা সংক্রান্ত বিষয়ের মুখোমুখি হলে, অনুমান করা যায় স্টিফেন জে. গুল্ডের মন্তব্য হবে এই ধরনের। নোমার মূল ব্যাপারটি হল যে, এটি একটা দুমুখো দরকষাকষি। যে মুহূর্তে ধর্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পা ফেলবে এবং বাস্তব পৃথিবীতে অলৌকিক ঘটনার কারণ নিয়ে অনধিকারচর্চা করা শুরু করবে, তখন গুল্ড যে ধর্মের পক্ষে ওকালতী করছেন, ধর্মের আর সেই অর্থ থাকে না এবং এর ‘অ্যামিকাবিলিস কনকর্ডিয়া’ বা বন্ধুসুলভ মৈত্রী চুক্তিটি ভঙ্গ হয়ে যায়। লক্ষ করুন, যদিও অলৌকিক ঘটনাহীন ধর্ম, যা গুল্ড সমর্থন করছেন, তা কিন্তু বেশির ভাগই চার্চের পিউ বা পার্থনার মাদুরে বসা ধর্মপালনকারী ঈশ্বরবাদীরা আদৌ মানেন না। আসলেই এটা তাদের জন্য হবে বড় ধরনের হতাশাব্যঞ্জক। ওয়ান্ডারল্যান্ডে পড়ে যাবার আগে তার বোনের বই নিয়ে অ্যালিসের (১০৭) মন্তব্য একটু খাপ খাইয়ে নিয়ে বললে, ‘কি দরকার এমন ঈশ্বরের, যে-কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটায় না, আর প্রার্থনার জবাব দেয় না’; মনে আছে অ্যামব্রোজ বিয়ের্সের (১০৮) ‘প্রার্থনা করা’ ক্রিয়াপদটির বুদ্ধিদীপ্ত সংজ্ঞাটি: ‘শুধুমাত্র একজন আবেদনকারীর স্বার্থে – যে কিনা আত্মস্বীকৃতভাবেই অযোগ্য - মহাজগতের সমস্ত আইন বাতিল করার জন্য আবেদন’; অনেক খেলোয়াড় আছেন যারা মনে করেন জয় অর্জন করতে ঈশ্বর তাদের সাহায্য করেছেন - এমন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যাকে দেখে মনে হতেই পারে ঈশ্বরের সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে তারাও কোনো অংশে কম যোগ্য নন। অনেক গাড়ীচালক বিশ্বাস করেন ঈশ্বর তাদের জন্য গাড়ি পার্ক করার জায়গা সংরক্ষণ করেছেন, স্পষ্টতই আরেকজনকে বঞ্চিত করেই ঈশ্বরকে সেই কাজটি করতে হচ্ছে। এই ধরনের ঈশ্বরবাদ বিব্রতকরভাবে জনপ্রিয়, নোমার মত যুক্তিসঙ্গত (যদিও উপরি উপরি) কিছু তাদের মনে দাগ কাটাবে এমন সম্ভাবনা কম।

তাসত্ত্বেও চলুন আমরা গুল্ডকে অনুসরণ করে, এবং আমাদের ধর্মের স্তরীভূত আবরণগুলো ক্রমান্বয়ে অপসারিত করে একেবারে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতাহীনতার ন্যুনতম একটি পর্যায়ে নিয়ে যাই: কোনো অলৌকিক ঘটনা না, ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে উভয় দিকে কোনো ধরনের ব্যক্তিগত যোগাযোগ না, পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সূত্র নিয়ে খামখেয়ালী খেলাধুলা না, বিজ্ঞানের এলাকায় কোনো অবৈধ প্রবেশ না। বড়জোর, একটু একাত্মবাদী ঈশ্বরের মত মহাবিশ্বের জন্মলগ্নে কিছু

অবদান রাখা, যা পরবর্তীতে সময়ের সাথে ক্রমান্বয়ে নক্ষত্র, মৌলিক উপাদান, রসায়ন, গ্রহ ইত্যাদি সম্পূর্ণতা পায় এবং জীবনের উদ্ভব এবং বিবর্তন ঘটে; নিঃসন্দেহে এটা যথেষ্ট পৃথকীকরণ, নিশ্চয়ই নোমা টিকে থাকতে পারবে এই পরিমিত এবং ভনিতামুক্ত ধর্ম নিয়ে।

বেশ, আপনি হয়তো তাই ভাববেন। কিন্তু আমার প্রস্তাব হল, এমনকি একজন হস্তক্ষেপ ক্ষমতাহীন, 'নোমা' ঈশ্বর, যদিও সে আব্রাহামীয় ঈশ্বর অপেক্ষা অনেক কম হিংস্র এবং কম অমার্জিত, তাসত্ত্বেও যখন আপনি তাকে সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখবেন, দেখতে পারবেন এটি একটি বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস। আমি সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসি: যে মহাবিশ্বে আমরা নিঃসঙ্গ, শুধু ধীরে ধীরে বিবর্তিত হতে থাকা বুদ্ধিমত্তা ছাড়া আর কিছু নই, সেই মহাবিশ্ব অবশ্যই অনেক আলাদা সেই মহাজগত থেকে, যেখানে একজন মূল পথপ্রদর্শক পরিকল্পক ছিলেন, যার বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিশীলতা এর সব অস্তিত্বের জন্য দায়ী। আমি মানছি, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এমন দুটি মহাবিশ্বের মধ্যে পার্থক্য শনাক্ত করা কঠিন। তাসত্ত্বেও, সৃষ্টিকর্তার মৌলিক ডিজাইন হাইপোথিসিসে সম্পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট কিছু আছে এবং সমানভাবে বিশেষ কিছু আছে এর একমাত্র বিকল্প হাইপোথিসিসে: একটু বিশাল অর্থে যা ক্রম-বিবর্তন। দুটি হাইপোথিসিস আবার প্রায় অসমন্বয়জনকভাবে পৃথক। অন্য আর কিছু যা পারেনি, একমাত্র বিবর্তন আসলেই সক্ষম হয়েছে, কোনো কিছুর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে, যার অসম্ভাব্যতা এত বেশি যে, প্রায়োগিক দিক থেকে ভাবলে হয়তো অস্তিত্ব থাকার কথা ছিল না। এবং তর্কের উপসংহার, যা আমি ৪র্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, ঈশ্বর হাইপোথিসিস এর জন্য যা চূড়ান্তভাবেই প্রাণনাশক।

দ্য গ্রেট প্রেয়ার এক্সপেরিমেন্ট

অলৌকিক ঘটনা সংক্রান্ত কেস স্টাডির একটা কৌতুকপ্রদ, যদিও হতাশাব্যাঞ্জক, উদাহরণ হচ্ছে, বিখ্যাত 'দ্য গ্রেট প্রেয়ার এক্সপেরিমেন্ট' বা মহান ঈশ্বরে প্রতি প্রার্থনার পরীক্ষা: রোগীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলে কি, সেই প্রার্থনা তাদের রোগ নিরাময়ে সহায়তা করে? রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য আরোগ্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন উপাসনালয়ে সাধারণত প্রার্থনা করা হয়ে থাকে। ডারউইনের আত্মীয় ফ্রান্সিস গলটন (১০৯) প্রার্থনার কার্যকারিতা নিয়ে। প্রথম বৈজ্ঞানিকভাবে গবেষণা করেছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন প্রতি রোববারে ইংল্যান্ডের সকল চার্চে, সমবেত সবাই প্রকাশ্যে রাজপরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্যের জন্যে প্রার্থনা করে থাকেন। সুতরাং স্বভাবতই তাদের স্বাভাবিক যে-কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা কি বেশি স্বাস্থ্যবান থাকা উচিত না, যাদের জন্য শুধুমাত্র কাছের মানুষ ছাড়া আর কেউই প্রার্থনা করেন না? (১১০) গলটন বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছিলেন, এবং

পরিসংখ্যানগতভাবে কোনো পার্থক্য খুঁজে পেতে তিনি ব্যর্থ হন। তার উদ্দেশ্য হয়তো ছিল ব্যঙ্গাত্মক, এরপর যখন তিনি নিজে কিছু পৃথকভাবে ভাগ করা জমির জন্য আলাদা আলাদাভাবে প্রার্থনা করেন, প্রার্থনা করা জমিতে লাগানো গাছ, প্রার্থনা করা হয়নি এমন জমির গাছ থেকে দ্রুত বাড়ে কিনা তা দেখতে (অবশ্যই গাছ দ্রুত বাড়েনি)।

সাম্প্রতিক সময়ে, পদার্থবিদ রাসেল স্ট্যানার্ড (১১১) (ব্রিটেনের তিন সুপরিচিত ধার্মিক বিজ্ঞানীদের মধ্য অন্যতম) এই ধরনের একটি গবেষণার উদ্যোগে নেন অবশ্যই টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের (১১২) অর্থ সাহায্যে। অসুস্থ রোগীদের জন্য প্রার্থনা করলে তাদের শারীরিক অবস্থার উন্নতি ঘটে কিনা, এই হাইপোথিসিসটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য (১১৩)।

এই ধরনের গবেষণা নিয়মমাফিক করতে গেলে অবশ্যই ‘ডাবল ব্লাইন্ড’ (গবেষক এবং গবেষণায় অংশগ্রহনকারী দুজনেই জানেন না কাকে কোন ধরনের ‘ইন্টারভেনশন’ বা পরীক্ষাধীন চিকিৎসাটি দেয়া হচ্ছে) হতে হয়, এবং এই মানটা কঠোর ভাবে অনুসরণ করতে হয়। রোগীদের সম্পূর্ণ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কমপক্ষে দুইটি শ্রেণীতে বন্টন করা হয়, একটি পরীক্ষাধীন শ্রেণী থাকে (যারা প্রার্থনা পাবেন), এবং একটি ‘কন্ট্রোল’ বা নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী (কোনো প্রার্থনা যারা পাবেন না), রোগী, চিকিৎসক, সেবা প্রদানকারী, এমনকি গবেষক, কারোরই জানার অনুমতি থাকবে না, কোনো রোগী প্রার্থনা পাচ্ছেন আর কে পাচ্ছেন না। যারা পরীক্ষামূলকভাবে এই প্রার্থনা করবেন তাদের অবশ্যই আলাদা আলাদা করে নাম জানতে হবে, তাদের নাম ধরে প্রার্থনা করার জন্য। এছাড়া তারা কার জন্য প্রার্থনা করছেন সেটি জানার কোনো উপায় নেই। কিন্তু বিশেষ নজর রাখা হয়েছে যেন প্রার্থনাকারী যার জন্য প্রার্থনা করছেন, তার নামের শুধু প্রথম অংশ আর পদবীর আদ্যক্ষরটি শুধু জানতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে, সঠিক হাসপাতালের শয্যা শনাক্ত করার জন্য ঈশ্বরের পক্ষে এতটুকু তথ্যই যথেষ্ট।

এই ধরনের কোনো গবেষণা করার পরিকল্পনা যথেষ্ট পরিমাণ ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য আর বিদ্রুপের শিকার হওয়া স্বাভাবিক এবং যথেষ্ট পরিমানেই তা জুটেছিল এই প্রকল্পের ভাগ্যে। আমি যতদূর জানি বব নিউহার্ট (১১৪) এটা নিয়ে কোনো কৌতুক নক্সা করেননি, কিন্তু আমি তার কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি:

> কি বললে তুমি, ঈশ্বর, তুমি আমার নিরাময় করতে পারবে না কারণ আমি কন্ট্রোল গ্রুপ? ওহ, আমি বুঝেছি, আমার খালার দোয়া যথেষ্ট নয়। কিন্তু ঈশ্বর, আমার পাশের বিছানার মিঃ ইভান্স... এটা কি ঈশ্বর, মিঃ ইভান্স প্রতি দিন এক হাজার প্রার্থনা পায়, কিন্তু ঈশ্বর মিঃ ইভান্স হাজার জনকে চেনেই না। ওহ, তারা শুধু জন বলে তাকে চেনে, কিন্তু ঈশ্বর কেমন করে তুমি বুঝলে তারা আসলে জন ইলসওয়ার্থির জন্য দোয়া করছে না। ওহ ঠিক, তুমি তোমার

অসীম জ্ঞান ব্যবহার করে বের করে ফেলেছ, কোন ‘জন ই’-এর জন্য দোয়া করা হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বর ..

সাহসের সাথে সব হাসি ঠাট্টা একপাশে সরিয়ে গবেষক দল তাদের কাজ সম্পন্ন করেন, বোস্টনের কাছে অবস্থিত মাইন্ড/বডি মেডিকেল ইন্সস্টিটিউটের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ হার্বার্ট বেনসন নেতৃত্বে টেম্পলটন ফাউন্ডেশন তাদের ২.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ করে গবেষণাটিতে। টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইতোপূর্বে ডাঃ বেনসন মন্তব্য করেছিলেন: ‘তিনি বিশ্বাস করেন চিকিৎসার ক্ষেত্রে ‘ইন্টারসেসরি’ বা ‘অপরের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কার্যকারিতার উপযোগিতা ক্রমশ বাড়ছে’। এবং সেই কারণে নিশ্চিৎভাবে গবেষণার লাগাম ছিল উপযুক্ত মানুষের হাতেই, যা মূল গবেষকের সন্দেহবাদীতাদের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। ডাঃ বেনসন এবং তার গবেষক দল, ছয়টি হাসপাতালে মোট ১৮০২ জন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করেন, এদের প্রত্যেকেরই হৃৎপিণ্ডের করোনারী বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। রোগীদের মোট তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, শ্রেণী ১: যারা প্রার্থনা পায়, কিন্তু তারা তা জানতেন না, শ্রেণী ২: (কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ গ্রুপ) তারা কোনো প্রার্থনা পায় না এবং সেটা তারা জানতেন না, শ্রেণী ৩: প্রার্থনা পায় এবং তারা তা জানতেন। রোগমুক্তির প্রার্থনার কার্যকারিতা নিয়ে তুলনামূলক সমীক্ষা হয়, শ্রেণী ১ এবং ২ এর মধ্যে শ্রেণী ৩ কে পরীক্ষা করা হয় কারণ তারা জানতেন মঙ্গল কামনা করে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, এই তথ্যটি তাদের উপর ‘মনোদৈহিক’ কোনো প্রভাব ফেলেছে কিনা তা দেখবার জন্য।

প্রার্থনা করেছিলেন মোট তিনটি চার্চের সদস্যরা, যাদের একটি মিসিসিপি, একটি ম্যাসাচুসেটস, ও একটি মিসৌরি অঙ্গরাজ্য অবস্থিত, প্রত্যেকটিরই অবস্থান হাসপাতাল থেকে বহু দূরে। ইতোপূর্বে যা ব্যাখ্যা করেছি, প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে, সে যার জন্যে প্রার্থনা করবে তার নামের প্রথমাংশ, এবং পদবীর প্রথম আদ্যক্ষরটি জানানো হয়েছিল। যত দূর সম্ভব ততদূর পর্যন্ত প্রতিটি গবেষণার বিভিন্ন পরিমাপের নির্দিষ্ট কিছু মানদণ্ড থাকা উচিত, সেই কারণে প্রত্যেক প্রার্থনাকারীকে তাদের প্রার্থনায় ‘সফল সার্জারীসহ কোনো জটিলতা ছাড়াই দ্রুত আরোগ্য লাভ করুক’ বাক্যটি যোগ করে নিতে বলা হয়েছিল।

এপ্রিল ২০০৬ এ আমেরিকান হার্ট জার্নালে এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হয় এবং ফলাফল খুব সুস্পষ্ট। প্রার্থনা পেয়েছে আর পায়নি এই দুই শ্রেণীর মধ্যে কোনোপার্থক্যই পাওয়া যায়নি। অবাক হবার ব্যপার, পার্থক্য পাওয়া গেছে যারা জানতেন তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে আর যারা কোনোভাবে জানতেন না তাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে কিনা, কিন্তু প্রমাণের সন্ধান মিলেছে উল্টোদিকে। যারা

জানতেন তাদের দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তারা অনেক বেশি জটিলতায় ভুগেছে অন্য শ্রেণীগুলোর রোগীদের তুলনায়। এই রকম সম্পূর্ণ পাগলামীর পরিচায়ক একটা গবেষণা পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বর কি তার অপছন্দ জানিয়ে একটু ধাক্কা দিলেন? আরো সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে যে রোগীরা আগে থেকেই জানতেন তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তারা হয়তো এক ধরনের বাড়তি চাপ অনুভব করেছিলেন: গবেষকদের ভাষায় যা 'পারফরমেন্স' সংক্রান্ত দুশ্চিন্তা। গবেষকদের একজন, ডাঃ চার্লস বেথেয়ার ভাষায়, 'হয়তো তারা ভেবেছেন, আমি কি এতই অসুস্থ যে তাদেরকে প্রার্থনাকারীদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে।' বর্তমান মামলা প্রিয় সমাজে, এমন কিছু আশা করা কি খুব বাড়াবাড়ি কিছু মনে হবে: যে রোগীদের জটিলতা হওয়ার কারণ হচ্ছে যারা জানতেন তারা 'পরীক্ষামূলক প্রার্থনা' পাচ্ছেন, তারা টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ক্ষতিপূরণ দাবী করে মামলা করতে উদ্যোগ নেবেন।

অবাক হবার কোনো কারণ ছিল না, যখন ধর্মতাত্ত্বিকরা এই গবেষণার বিরোধিতা করেছিলেন আগেই, কারণ এই ধরনের গবেষণা ধর্মকে উপহাসের বস্তুতে পরিণত করার সম্ভাবনা ধারণ করে। অক্সফোর্ডের ধর্মতাত্ত্বিক রিচার্ড সুইনবার্ন, গবেষণার ফলাফল কাঙ্ক্ষিত না হবার পর, এর বিরোধিতা করে দাবী করেছিলেন, ঈশ্বর শধুমাত্র সেই সব প্রার্থনার জবাব দেন, যদি তা ভালো কোনো উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় (১১৫)। ডাবল ব্লাইণ্ড স্টাডির জুয়ার ছক্কার দানের মত শুধু নির্দিষ্ট কারো জন্য প্রার্থনা করা, এবং অন্যদের জন্য প্রার্থনা না করা অবশ্যই উত্তম কোনো কারণ হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। ঈশ্বর খুব ভালোই বুঝতে পারেন ব্যপারটা। আগে উল্লেখ করা বব নিউহার্টের ব্যঙ্গ রচনায় এটাই আমার বক্তব্য ছিল। সুইনবার্নও ঠিক একই কথা বলেছেন। কিন্তু তার রচনার অন্য অংশে সুইনবার্ন নিজেই চলে যান সব ব্যঙ্গের উর্ধে। যদিও এটি প্রথমবারের মত নয়, তিনি ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন:

> আমার কষ্ট আমাকে সাহস আর ধৈর্য প্রদর্শন করার সুযোগ করে দেয়। আপনাকে সমবেদনা প্রকাশ এবং আমার কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হতে সুযোগ করে দেয়, এবং কোনো সুনির্দিষ্ট সমস্যা দূর করার উপায় আবিষ্কার করতে আর্থিক বিনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা সেটি নির্ধারণ করতে সমাজকে সুযোগ করে দেয়। যদিও মহান ঈশ্বর আমাদের দুঃখ সহ্য করতে পারেন না, তার বড় চিন্তার বিষয় হল, নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকে ধৈর্য, সমবেদনা, দয়া দেখাবো, এবং এভাবেই পবিত্র চরিত্র গঠন করবো। কিছু মানুষের অবশ্যই তাদের নিজেদের স্বার্থে অসুস্থ হবার প্রয়োজন আছে, আর কিছু মানুষের আসলেই অসুস্থ হবার জন্য খুব বেশি প্রয়োজন আছে, যা অন্যদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। শুধুমাত্র এই ভাবেই কিছু

মানুষ, তারা কি ধরনের মানুষ হবার ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ধরনের মানুষ হবার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অন্যদের জন্য, অসুস্থতা হয়তো তেমন কোনো মূল্যবান বিষয় নয়।

এরকম অদ্ভুত যুক্তি, এত নিকৃষ্টভাবে ধর্মতাত্ত্বিক মনের নমুনার প্রমাণ, আমাকে মনে করিয়ে দিল আরেকটি ঘটনার, যখন আমি সুইনবার্ন, এবং অক্সফোর্ডের আমাদের আরেক সহকর্মী প্রফেসর পিটার এটকিনসের (১১৬) সাথে একটি টেলিভিশন প্যানেলে আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এক পর্যায়ে সুইনবার্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদী গণহত্যা বা হলোকষ্টের যথার্থতা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন, এই যুক্তিতে যে, হলোকস্ট নাকি ইহুদীদের সাহসী আর মহান হবার চমৎকার সুযোগ করে দিয়েছে। পিটার এটকিনস দারুণভাবে গর্জে উঠেছিলেন, 'আপনি যেন নরকে পচেন' (১১৭)।

ধর্মতাত্ত্বিক যুক্তি প্রয়োগের আরেকটি উদাহরণ দেখা যায় সুইনবার্নের লেখায় তার আগের করা মন্তব্যের খানিকটা পরেই। তিনি ঠিকই প্রস্তাব করেছেন যে, ঈশ্বর যদি তার নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ দিতে চাইতেন, পরীক্ষাধীন বনাম নিয়ন্ত্রিত শ্রেণীর হৃদরোগীদের নিরাময়ের পরিসংখ্যান সামান্য প্রভাবিত করা ছাড়া অবশ্যই আরো ভালো কোনো পথ বেছে নিতেন। যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে এবং আমাদের তা তিনি প্রমাণ করে দেখাতে চাইতেন, তাহলে তিনি 'সারা পৃথিবী ভরে দিতেন নানা অলৌকিকতায়'। কিন্তু তারপরই সুইনবার্ন তার পছন্দনীয় কথাটা বলেছিলেন, 'ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে ইতোমধ্যেই অনেক প্রমাণ আছে, অতিরিক্ত বেশি প্রমাণ আমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে'। 'অতিরিক্ত বেশি প্রমাণ আমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে', বাক্যটা আবার পড়ুন। 'অতিরিক্ত বেশি প্রমাণ আমাদের জন্য ভালো নাও হতে পারে'; রিচার্ড সুইনবার্ন ব্রিটেনের সবচেয়ে সম্মানজনক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের পদ থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন এবং ব্রিটিশ একাডেমির একজন সম্মানিত সদস্য। আপনি যদি কোনো ধর্মতাত্ত্বিক চান, তাহলে এর চেয়ে বেশ বিশিষ্ট আর কেউ হতে পারে না। হয়তো আপনি চাচ্ছেন না এমন কোন ধর্মতাত্ত্বিককে।

কিন্তু সুইনবার্ন একমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক নন যিনি এই গবেষণার আশানুরূপ ফলাফল না হবার কারণে এটি অস্বীকার করেছিলেন। রেভারেন্ড রেমন্ড জে. লরেন্সকে নিউ ইয়র্ক টাইমস বেশ অনেকটুকু জায়গা দিয়েছিল মন্তব্য প্রতিবেদনের জন্য, 'কেন দায়িত্বশীল ধর্মীয় নেতারা স্বস্তির নিঃশ্বাস' ফেলবেন, কারো জন্য বিশেষভাবে করা প্রার্থনায় তার আরোগ্য লাভের ওপর যে-কোনো প্রভাব নেই সেই কারণে (১১৮); তিনি কি অন্য সুরে কথা বলতেন, যদি ডাঃ বেনসনের গবেষণা প্রার্থনার ক্ষমতা প্রমাণে সফল হত। হয়তো না। কিন্তু আপনি নিশ্চিৎ থাকতে পারেন অনেক ধর্মতাত্ত্বিক বা যাজকরা ঠিক তাই করতেন। রেভারেন্ড রেমন্ড জে. লরেন্সের লেখাঁটি মনে রাখার মত কারণ মূলত

নিম্নলিখিত ঘটনাটি তার লেখায় প্রকাশের জন্য: ‘সম্প্রতি, আমার এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, একজন নিষ্ঠাবান, শিক্ষিত মহিলা, ডাক্তারের বিরুদ্ধে তার স্বামীর চিকিৎসায় অবহেলা করেছেন বলে অভিযুক্ত করেছেন। মহিলার দাবী, তার স্বামী মুমূর্ষ থাকাকালীন ডাক্তার তার স্বামীর জন্য প্রার্থনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন’।

অন্য ধর্মতাত্ত্বিকরাও ‘নোমা’ অনুপ্রাণিত সন্দেহবাদীদের সাথে যোগ দিয়েছেন এই বলে যে, এ ধরনের প্রার্থনার কার্যকারিতা সংক্রান্ত গবেষণা অর্থের অপচয় মাত্র, কারণ অতিপ্রাকৃত কোনো কিছুর প্রভাব এর সংজ্ঞানুযায়ীই বিজ্ঞানের এখতিয়ারের বাইরে। কিন্তু টেম্পলটন ফাউন্ডেশন যখন এই গবেষণা অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন তারা কিন্তু মেনে নেয়,কারো মঙ্গলের জন্য প্রার্থনার কথিত ক্ষমতা প্রমাণের বিষয়টা নীতিগতভাবে অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের আওতায় পড়ছে। এই বিষয়ে ‘ডাবল ব্লাইন্ড স্টাডি’ পরিকল্পনা করা হয়, গবেষণা করা হয়। তাদের গবেষণায় এর সপক্ষে ফলাফল পাওয়া যেতে পারতো। এবং যদি তাই হতো, তাহলে কল্পনা করুন, ধর্মের পক্ষ সমর্থনকারী এমন কাউকে কি খুঁজে পাওয়া যেত, যারা সেই ফলাফল প্রত্যাখ্যান করতেন কারণ ধর্মীয় ব্যপারে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কোনো সুযোগ নেই। অবশ্যই না।

বলাবাহুল্য, পরীক্ষাটির নেতিবাচক ফলাফল অবশ্যই বিশ্বাসীদের নাড়া দেবে না। বব বার্থ, মিসৌরির প্রেয়ার মিনিষ্ট্রির স্পিরিচুয়াল ডিরেক্টর, যিনি এই গবেষণায় প্রার্থনাকারীদের যোগান দিয়েছিলেন, বলেন: ‘বিশ্বাসী মানুষের কাছে এই গবেষণা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু আমরা অনেকদিন থেকেই প্রার্থনা করে আসছি এবং আমরা দেখেছি প্রার্থনা কাজ করে এবং প্রার্থনা আর আধ্যাত্মিকতা বিষয়ে গবেষণা কেবল শুরু হলো’। হ্যাঁ, ঠিক সেটাই : আমরা আমাদের ‘বিশ্বাস’ থেকেই জানি প্রার্থনা কাজ করে, যদি এর পক্ষে প্রমাণ না পাওয়া যায়, আমরা সাহসের সাথে এগিয়ে যাবো যতদিন পর্যন্ত না আমরা যে রকম ফলাফল চাই তেমনটি পাই।’

বিবর্তনবাদীদের ‘নেভিল চেম্বারলেইন’ (১১৯) তোষণবাদী গোষ্ঠী:

যে সকল বিজ্ঞানীরা যারা দাবী করেন, নোমা (NOMA), ঈশ্বর হাইপোথিসিস, বিজ্ঞান দ্বারা অনাক্রম্য একটি বিষয়, তাদের সম্ভাব্য একটি অভিসন্ধি হলো বিশেষভাবে আমেরিকার রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা বা কার্যক্রম, যা আসলে উস্কে দিয়েছে লোক-মনোরঞ্জনবাদী সৃষ্টিতত্ত্ববাদের হুমকি। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক জায়গায় সুসংগঠিত, রাজনৈতিক যোগাযোগসম্পন্ন ও সর্বোপরি অর্থ সাহায্যপুষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ দ্বারা বিজ্ঞান এখন আক্রান্ত এবং বিবর্তন শিক্ষা এই যুদ্ধের একবারে সামনের কাতারে । বিজ্ঞানীরা সহানুভূতি পেতেই পারেন, কারণ তারা ভীত, এছাড়াও বেশির ভাগ গবেষণার অর্থ যোগান দেয় মূলত সরকার এবং সেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের

জবাবদিহি করতে হয়, যেমন, তাদের ভোট দেয়া অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে, ঠিক তেমনই শিক্ষিত সুবিদিত সমাজের কাছেও।

এই ধরনের হুমকির মুখে, একটি বিবর্তনবাদ রক্ষাকারী লবিও গড়ে উঠেছে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যটির প্রতিনিধিত্ব করে 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন (NCSE); এর নেতৃত্বে আছেন ইউজেনি স্কট (১২০), বিজ্ঞানের জন্য অক্লান্ত কর্মী, যিনি সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ করেছেন, 'ইভোল্যুশন ভারসাস ক্রিয়েশনিজম'। এনসিএসই'র অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলো সুবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মীয় মতামতগুলোকে জয় এবং সংগঠিত করা । এরা হল মূলধারার চার্চে যাতায়াতকারী নারী এবং পুরুষ, বিবর্তনবাদের সাথে যাদের কোনো বিরোধ নেই, এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা বিষয়টিকে অপ্রাসঙ্গিক (অথবা কোনো অদ্ভুত উপায়ে তাদের বিশ্বাসের সহায়ক) হিসাবে মনে করেন। এই সব মূলধারার ধর্মযাজক, ধর্মতাত্ত্বিক, এবং উদার মনোভাবাপন্ন ধর্মবিশ্বাসীরা, যারা বিব্রত সৃষ্টিতত্ত্ববাদ নিয়ে, কারণ তা ধর্মের সুনাম কলুষিত করেছে, এদের কাছে বিবর্তনবাদ রক্ষাকারী লবী চেষ্টা করছে তাদের পক্ষে মতামত গড়বার। এবং সেটা করার একটা উপায় হল, তাদের তুষ্ট করার অতিরিক্ত চেষ্টায় নোমাকে পৃষ্ঠপোষকতা করা - স্বীকার করে নেয়া যে বিজ্ঞান আদৌ ক্ষতিকর কিছু না, কারণ ধর্মের দাবী থেকে বিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

এই গোষ্ঠীর, যাকে আমরা বিবর্তনবাদীদের 'নেভিল চেম্বারলীন' গোষ্ঠী বলতে পারি, আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তি হলেন দার্শনিক মাইকেল রুজ (১২১) । সৃষ্টিতত্ত্ববাদের বিপক্ষে রুজ একজন কার্যকর যোদ্ধা, ছাপার অক্ষরে এবং আদালত, উভয় ক্ষেত্রে (১২২); তিনি নিজেকে একজন নিরীশ্বরবাদী হিসাবে দাবী করেন, কিন্তু প্লে বয় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় তার মতামত প্রকাশ পায় এভাবে:

> আমরা যারা বিজ্ঞানকে ভালোবাসি তাদের অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে আমাদের শত্রুর শত্রু কিন্তু আমাদের বন্ধু। প্রায়ই বিবর্তনবাদীরা তাদের সম্ভাব্য মিত্র পক্ষকে অপমান করতে সময় নষ্ট করেন। ব্যপারটা অধিকতর সত্য ধর্মনিরেপক্ষ বিবর্তনবাদীদের ক্ষেত্রে। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের প্রতিরোধ করার চেয়ে নিরীশ্বরবাদীদের বেশি সময় কাটানো উচিত সহানুভূতিশীল খ্রিস্টানদের বোঝানোর প্রচেষ্টায়। যখন দ্বিতীয় পোপ জন পল ডারউইনবাদকে অনুমোদন করে চিঠি লিখেছিলেন, রিচার্ড ডকিন্সের প্রত্যুত্তর ছিল পোপ ভণ্ডামী করছেন এবং তিনি আসলেই বিজ্ঞানের ব্যপারে এতটা সৎ হতেই পারেন না এবং এভাবে স্পষ্ট যে ডকিন্স নিজেই বরং পছন্দ করেন একজন সৎ মৌলবাদীকে।

শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কৌশলগত দিক থেকে, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধজোট করার সাথে, রুজের অগভীর আবেদনটার তুলনাটি আমি বুঝতে পারি: উইনস্টোন চার্চিল বা

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট কেউই স্ট্যালিন বা কমিউনিজম পছন্দ করতেন না, কিন্তু তারা বুঝতে পেরেছিলেন, হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হলে তাদের সোভিয়েট ইউনিয়নের সাথে কাজ করতে হবে। সেই রকমভাবে সব ধরনের বিবর্তনবাদীদের সৃষ্টিতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু আমি সবশেষে আমার সহকর্মী শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনতত্ত্ববিদ জেরি কয়েন (১২৩) এর সাথে একমত, যিনি লিখেছিলেন রুজ,

> এই দ্বন্দ্বের মূল কারণটাই বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। এটা শুধুমাত্র বিবর্তনবাদ বনাম সৃষ্টিতত্ত্ববাদ নয়। ডকিন্স বা উইলসনের (ই. ও. উইলসন (১২৪), প্রখ্যাত হার্ভার্ড জীববিজ্ঞানী) মত বিজ্ঞানীদের কাছে, আসল যুদ্ধ হলো যুক্তিবাদ বনাম কুসংস্কারের মধ্যে। বিজ্ঞান হচ্ছে যুক্তিবাদের এক ধরনের রূপ, অপরদিকে ধর্ম হচ্ছে কুসংস্কারের সবচেয়ে পরিচিত রূপ,তারা যাকে আরো বড় শত্রু হিসাবে দেখেন : সৃষ্টিতত্ত্ববাদ হচ্ছে ধর্মের একটা উপসর্গ মাত্র । ধর্ম কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদ ছাড়াই টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদ ধর্ম ছাড়া তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে না (১২৫) ।

সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের সাথে আমার একটা মিল আছে, তারা আমার মতোই এবং ‘চেম্বারলেইন গ্রুপের’ মত নয়, নোমা কিংবা এর পৃথক ম্যাজিষ্টেরিয়া বা ক্ষমতার বলয়কে বর্জন করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র পৃথক এটা মানা তো দূরের কথা, তাদের সবচেয়ে পছন্দের কাজ এর মধ্যে নাক গলানো। তাদের যুদ্ধ কৌশলও নোংরা। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের উকিলরা আমেরিকার গ্রাম আর মফস্বল শহরগুলোয় বিভিন্ন আদালতে বেছে বেছে সেই সব বিবর্তনবাদীদের খুঁজে বের করেন যারা প্রকাশ্যে নাস্তিক। আমি জানি, যদিও বিরক্তকর, আমার নামও এভাবে ব্যবহার করা হয়। এটা বেশ কার্যকর একটা কৌশল, কারণ নির্বাচিত জুরীদের মধ্যে এমন ব্যক্তিদেরই থাকার সম্ভাবনা বেশি, যারা কিনা নাস্তিকরা যেন পুনর্জন্ম হওয়া শয়তান এমন বিশ্বাস নিয়ে প্রতিপালিত হয়েছেন, শিশুকামী বা সন্ত্রাসীদের মত তাদের অপরাধ (সালেম এর ডাইনী (১২৬) এবং ম্যাকআর্থারের কমি বা কমিউনিষ্টদের (১২৭) আধুনিক সংস্করণ); যে-কোনো সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের আইনজীবী যে আমাকে সাক্ষী হিসাবে দাড় করাবে, সাথে সাথেই সেই জুরীদের মন জয় করে নেবেন, শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করে: ‘বিবর্তন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন কি আপনাকে নাস্তিক হতে প্রভাবিত করেছে?’ আমাকে এর উত্তরে বলতে হবে, ‘হ্যাঁ’, ব্যস ঐ এক কথাতে জুরীরা আমার বিপক্ষে চলে যাবেন। কিন্তু এর বিপরীতে, ধর্মনিরপেক্ষ দিক থেকে আইনসিদ্ধ সঠিক উত্তর হবে: ‘আমার ধর্ম বিশ্বাস, বা অবিশ্বাস আমার ব্যক্তিগত ব্যপার, এটা আদালতের যেমন বিষয় না, তেমন বিজ্ঞানের সাথে কোনভাবে এর যোগসূত্র নেই।’ আমি সততার সাথে এভাবে কথাগুলো বলতে পারবো না, কারণগুলো, আমি ৪র্থ অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছি।

গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক ম্যাডেলাইন বান্টিং 'হোয়াই দি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন লবী থ্যাঙ্কস গড ফর রিচার্ড ডকিন্স' বা 'কেন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন লবী রিচার্ড ডকিন্স এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১২৮); মাইকেল রুজ ছাড়া এটি লেখার সময় তিনি আর কারো সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন নিদর্শন লেখাঁটিতে পাওয়া যায় না; মনে হতে পারে প্রবন্ধটির ছায়া লেখক মাইকেল রুজ (নিউ ইয়র্ক টাইমস এ ২২ জানুয়ারী ২০০৬ এ প্রকাশিত 'হোয়েন কসমোলজি কোলাইড' প্রবন্ধটি নিয়ে একই কথা বলা যেতে পারে; এটি লিখেছিলেন সম্মানিত (এবং ভালোভাবে যাকে এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছিল) জুডিথ শুলেভিৎজ। জেনারেল মন্টোগোমারীর যুদ্ধের প্রথম নীতি ছিল 'মস্কোর দিকে মার্চ না করা' হয়তো বিজ্ঞান জার্নালিজমের এই রকম একটা প্রথম নীতি থাকা দরকার: 'মাইকেল রুজ ছাড়া অন্ততপক্ষে আরো একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেয়া'; ড্যান ডেনেট এর জবাব দেন সঠিকভাবে আংকেল রেমুসের লোককাহিনীর চতুর সেই খরগোশের কথা উল্লেখ করে (১২৯):

> আমার কাছে মজার ব্যপার হলো, দুইজন ব্রিটেন নিবাসী, ম্যাডেলাইন বান্টিং এবং মাইকেল রুজ আমেরিকান লোকগাথার সবচেয়ে বিখ্যাত ছলচাতুরীর ফাঁদে পড়েছেন (সূত্র: কেন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন লবী রিচার্ড ডকিন্স এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেবে, মার্চ ২০০৭); যখন ব্রেয়ার খরগোশ শিয়ালের হাতে ধরা পড়েছিল, সে শিয়ালের কাছে মিনতি করে বলে, 'ওহ, দয়া করো ব্রেয়ার শিয়াল, যাই করো না কেন, আমাকে ঐ জঘন্য ব্রায়ার (এক ধরনের কাটাযুক্ত কাণ্ডের ছোটো গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ) ঝোপে ছুড়ে ফেলে দিও না', শিয়াল ঠিক সেই কাজটা করার পর, খরগোশ নিরাপদে পালিয়ে গিয়েছিল। যখন আমেরিকান প্রচারণাবিদ উইলিয়াম ডেম্বস্কি রিচার্ড ডকিন্সকে বিদ্রুপ করে লেখেন এই বলে যে, তিনি যেন ভালো কাজ করে যেতে থাকেন ইন্টিলিজেন্ট ডিজাইন পক্ষে, বান্টিং আর রুজ সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন, 'ওহ!, ব্রেয়ার শিয়াল, আপনার এই সুস্পষ্ট দাবীটা বিবর্তন সংক্রান্ত জীববিদ্যা, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে - কিন্তু ক্লাসরুমে বিজ্ঞান শিক্ষাকে হুমকির মুকে ঠেলে দেবে, কারণ এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করলে আবার চার্চ আর রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ বিষয়টিকে লঙ্ঘন করা হবে!' ঠিক, আপনাদের উচিত হবে শারীরবৃত্তীয় বিদ্যাকে একটু রেখে ঢেকে পড়াতে, কারণ এটিতো আগেই প্রমাণ করেছে কুমারী কারো পক্ষে গর্ভধারণ অসম্ভব.. (১৩০) ।

এই পুরো ব্যপারটা, এমনকি স্বতন্ত্রভাবে কাটা গাছের ঝোপে ব্রেয়ার খরগোশ বিষয়টির অবতারণা করে বিষদ আলোচনা করেছেন জীববিজ্ঞানী পি. জে. মায়ারস, সূতীক্ষ্ন প্রজ্ঞার জন্য যার ফ্যারিঙ্গুলা ব্লগ থেকে আস্থার সাথে পরামর্শ নেয়া যেতে পারে (১৩১)।

আমি কিন্তু বোঝাতে চাইছি না, তোষণকারী লবীর আমার সহকর্মীরা সবাই অবশ্যই অসৎ। তারা হয়তো আন্তরিকভাবেই নোমা ধারণায় বিশ্বাস করেন, যদিও আমি বাধ্য হই চিন্তা করতে, আসলে বিষয়টি নিয়ে তারা কতটা গভীরভাবে ভেবেছেন, এবং তারা কিভাবে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বটিকে সামাল দিতে পেরেছেন। আপাতত বিষয়টি নিয়ে আর নাই বা ভাবি, কিন্তু কেউ যদি এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিজ্ঞানীদের প্রকাশিত বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করেন, তারা এর পেছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা যেন না ভুলে যান: একটা পরাবাস্তব সাংস্কৃতিক যুদ্ধ এখন যুক্তরাষ্ট্রকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। নোমা ধরনের তোষণবাদ আবার পরের অধ্যায়গুলোতে আলোচনায় আসবে। এখানে, আমি বরং আবার অজ্ঞেয়বাদ এবং আমাদের অজ্ঞতাকে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে ফেলে এবং পরিমাপ সম্ভব এমন একটা স্তরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অস্তিত্বহীনতা সংক্রান্ত আমাদের অনিশ্চয়তাকে নিয়ে আসার সম্ভাবনায় ফিরে আসি।

ছোটো সবুজ মানুষের দল

ধরা যাক, বার্ট্রান্ড রাসেলের রূপক কাহিনীর বিষয়, মহাশূন্যে চা-কেটলি নয় বরং মহাশূন্যে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে যা কার্ল সেগানের সেই স্মরণীয় মন্তব্য ‘গাট বা অন্ত্রনালী দিয়ে চিন্তা না করা’র প্রত্যাখানের বিষয়টি। আবারো আমরা বিষয়টিকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবো না, এবং একমাত্র যৌক্তিক অবস্থান হল অজ্ঞেয়বাদ। কিন্তু এই হাইপোথিসিসটি আর কোনো হালকা বিষয় হিসাবে নেই এখন। আমরা কিন্তু সাথে সাথেই একেবারে চূড়ান্ত সব অসম্ভাব্যতার ঘ্রাণ পাই না এখন। আমরা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক একটা বিতর্ক অবতারণা করতে পারি, অসমাপ্ত, তবে এই অবধি পাওয়া নানা সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, এবং আমরা সেই প্রমাণগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারি যৌক্তিক উপায়ে যেগুলো আমাদের অনিশ্চয়তাকে কমাতে পারে। আমরা কিন্তু প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হবো, যদি আমাদের সরকার ব্যয়বহুল টেলিস্কোপের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে যার একমাত্র কাজ হবে মহাশূন্যে ‘চা-কেটলি’ সন্ধান করা। কিন্তু আমরা সেটি (SETI) বা সার্চ ফর এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে, যার মূল কাজ ভিনগ্রহবাসী বুদ্ধিমান সত্তাদের পাঠানো কোনো সংকেত খুঁজে পাওয়ার আশায় রেডিও টেলিস্কোপ দিয়ে মহাশূন্যের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ করা, অর্থ ব্যয় করার ব্যপারটাকে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করতে পারি।

ভিনগ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের ব্যপারে আনুমানিক অনুভূতি নির্ভর কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করার জন্য আমি কার্ল সেগানের প্রশংসা করি। কিন্তু যে কারো পক্ষে (এবং

সেগানও তাই করেছিলেন) এরকম একটা সম্ভাবনার পরিমাপ করার জন্য, আমাদের যা জানা দরকার, তার একটা সংযমী মুল্যায়ন সম্ভব। এটা শুরু হতে পারে আমাদের অজানা বিষয়গুলোর একটা তালিকা প্রস্তুত করার মাধ্যমে। যেমন, বিখ্যাত ড্রেক সমীকরণ (১৩২) ,যা পল ডেভিসের (১৩৩) ভাষায় সম্ভাবনা সংগ্রহ করেছিল। সমীকরণটির মূল বক্তব্য হল, এই পুরো মহাবিশ্বে স্বতন্ত্রভাবে বিবর্তিত সভ্যতার সংখ্যা পরিমাপের জন্য আমাদের অবশ্যই সাতটি সংখ্যাকে একসাথে গুণ করতে হবে। এদের মধ্যে আছে, মোট নক্ষত্রের সংখ্যা, প্রতিটি নক্ষত্রের পৃথিবীর মত গ্রহের সংখ্যা এবং এর সম্ভাবনা, এগুলো এবং এছাড়া অন্য সংখ্যাগুলো যার তালিকা উল্লেখ করার দরকার নেই কারণ আমি যা বোঝাতে চাচ্ছি তা হলো এসবই অজানা অথবা পরিমাপ করা হয়েছে অনেক বেশি অনুমানের উপর ভিত্তি করে। যখন অনেকগুলো সংখ্যা হয় সম্পূর্ণ অজানা, অথবা অনেক বড় ভ্রান্তির সম্ভাবনা রেখে পরিমাপ করা হয়, তার ফলাফল - ভিনগ্রহের সভ্যতার সম্ভাব্য সংখ্যায় - এতো বিশালাকৃতির ভুল থাকে যে, অজ্ঞেয়বাদকে মনে হয় বেশি যুক্তিযুক্ত, যদিও তা একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য অবস্থান নয়।

১৯৬১ সালে প্রথম যখন তিনি সমীকরণটি লিখেছিলেন, তখনকার তুলনায় বর্তমানে ড্রেক সমীকরণের কিছু সংখ্যা কিন্তু ইতোমধ্যে আমাদের কাছে কম অজানা সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। সেই সময় আমাদের সৌরজগতই ছিল একমাত্র জানা গ্রহমণ্ডলী যা কেন্দ্রীয় একটি নক্ষত্রের চারপাশে ঘুরছে, এছাড়া ছিল বৃহস্পতি আর শনির উপগ্রহমণ্ডল সদৃশ্য কিছু উদাহরণ। মহাবিশ্বে এই ধরনের মণ্ডলের সংখ্যা সম্বন্ধে আমাদের সবচেয়ে ভালো ধারণাটাটির ভিত্তি হল তাত্ত্বিক মডেলগুলো, যার সাথে সংযুক্ত আরেকটু বেশি অনানুষ্ঠানিক 'প্রিন্সিপাল অব মিডিওক্রিটি' বা সাধারণত্বের মূলনীতি: আমরা ঘটনাক্রমে যেখানে বসবাস করি তার বিশেষ কোনো অসাধারণত্ব নেই (এই অনুভূতিটা কোপার্নিকাস (১৩৪), হাবল (১৩৫), এবং অন্যান্যদের অস্বস্তিকর ইতিহাসের শিক্ষা থেকে জন্ম নেয়া); দুর্ভাগ্যজনক যে, প্রিন্সিপাল অব মিডিওক্রিটিকে আবার দুর্বল করে দিয়েছে অ্যানথ্রোপিক তত্ত্ব (অধ্যায় ৪ দ্রষ্টব্য) : যদি আমাদের সৌরজগত মহাবিশ্বে সত্যি একমাত্র হয়ে থাকে, তার সঠিক কারণ হলো, আমরা যারা এসব বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করি তারা সেখানে বসবাস করি। আমাদের অস্তিত্বের নিগুঢ় সত্যটাই অতীতমূখী পর্যালোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করে দেয় , আমাদের বসবাস খুবই অসাধারণ একটি স্থানে।

সৌরজগতের সর্বব্যাপিতা সম্বন্ধে বর্তমানে আমাদের পরিমাপ কিন্তু আর আগের মতন প্রিন্সিপাল অব মিডিওক্রিটির ওপর নির্ভর করে নেই; প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা এটি আরো তথ্যসমৃদ্ধ। কোঁমতের (১৩৬) পজিটিভিজমের (১৩৭) উচিত প্রতিফল, স্পেক্ট্রোস্কোপ আবারও তা প্রমাণ করেছে। আমাদের টেলিস্কোপ এখনো এতটা শক্তিশালী হয়নি যে নক্ষত্রের চারপাশে প্রদক্ষিণরত গ্রহদের এটি সরাসরি দেখতে সক্ষম। নক্ষত্রের

অবস্থানের সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয় তার চতুর্দিকে ঘুর্ণায়মান গ্রহদের মাধ্যাকর্ষণের টানে আর নক্ষত্রের আলোক বর্ণালী বিশ্লেষণে 'ডপলার ইফেক্ট' (১৩৮) শনাক্ত করে স্পেক্ট্রোস্কোপ বা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (১৩৯), অন্ততপক্ষে যেখানে মাধ্যাকর্ষণ টানের কারণ গ্রহটির আকার অনেক বড়। বেশির ভাগ সময় এভাবেই, আমার এই লেখার সময়, আমরা সৌরজগতের বাইরে ১৪৭টি নক্ষত্রের কক্ষপথে ঘুর্ণায়মান ১৭০ টি গ্রহের সন্ধান পেয়েছি (১৪০); এবং এই সংখ্যা অবশ্যই বেড়ে যাবে যখন আপনারা এই বইটা পড়বেন। আপাতত এই গ্রহগুলো সব বড় আকারের 'বৃহস্পতি' গ্রহের মত; কারণ বৃহস্পতি আকারের বড় গ্রহই কেবল পারে তাদের নক্ষত্রের আলোর বর্ণালীতে শনাক্তযোগ্য কোনো পরিবর্তন আনতে, এবং বর্তমান সময়ের কোনো বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সেটি শনাক্ত করতে সক্ষম। আমরা অন্ততপক্ষে পরিমাণগত দিক থেকে ড্রেক সমীকরণের একটি অজানা সংখ্যার কিছুটা উন্নতি করেছি। এর ফলে এই সমীকরণের শেষ ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞেয়বাদে সামান্য হলেও, গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকা নিয়ে আমরা এখনো হয়তো অজ্ঞেয়বাদী থাকতে বাধ্য - কিন্তু কিছুটা অবশ্যই কম অজ্ঞেয়বাদী, কারণ আমরা আগের চেয়ে আমাদের অজ্ঞতাকে একটু কমাতে পেরেছি। বিজ্ঞান ধীরে ধীরে অজ্ঞেয়বাদের পরিমাণকে কমিয়ে দিতে সক্ষম, যেমন করে হাক্সলি ঈশ্বরের বিশেষ অবস্থানটি অস্বীকার করেছিলেন সবাইকে তুষ্ট করার অতিরিক্ত প্রচেষ্টায়। আমার যুক্তি হলো, হাক্সলি, গুল্ড এবং অনেকের নম্র সংযম সত্ত্বেও , ঈশ্বর প্রশ্নটি নীতিগতভাবে এবং চিরকালের মত বিজ্ঞানের আওতা বহির্ভূত না। কোঁমতের ধারণার বিপরীতে যেমন নক্ষত্রের প্রকৃতি, আর তার চারপাশে কক্ষপথে জীবনের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞান পারে অজ্ঞেয়বাদের ভূখণ্ডে সম্ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটাতে।

ঈশ্বর হাইপোথিসিস সম্বন্ধে আমার সংজ্ঞায় 'অতিমানবীয়', 'অতিপ্রাকৃত' এই সব শব্দগুলো সংযুক্ত। এদের মধ্যে পার্থক্যটা স্পষ্ট করতে, কল্পনা করুন, একটি সেটি (SETI) রেডিও টেলিস্কোপ সত্যি সত্যি মহাশূন্য থেকে একটা সংকেত শনাক্ত করলো, যা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলো, মহাবিশ্বে আমরা একা নই। প্রসঙ্গক্রমে, কোনো ধরনের সংকেত পেলে কেন আমরা বিশ্বাস করবো যে, তা আসলেই কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সৃষ্টি? এটা কিন্তু তুচ্ছ প্রশ্ন নয়। একটা ভালো উপায় হচ্ছে, যদি প্রশ্নটাকে উল্টে নেই। আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কি করতে পারি, পৃথিবীর বাইরে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীদের কাছে আমাদের অস্তিত্ব প্রচার করার লক্ষ্যে? ছন্দময় পাল্‌স দিয়ে কাজটা করা সম্ভব হবে না। জোসলিন বেল বার্নেল (১৪১), রেডিও জোতির্বিজ্ঞানী, যিনি ১৯৬৭ সালে প্রথম পালসারের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, এর ঠিক ১.৩৩ সেকেন্ডের নিয়মিত পর্যায়ক্রমটি দেখে অবাক হয়ে নাম রেখেছিলেন, মজা করে, 'এলজিএম' সংকেত (LGM: little green man signal) । পরবর্তীতে মহাশূন্যের অন্য একটি জায়গায় তিনি দ্বিতীয় পালসারটি আবিষ্কার করেন, যার সংকেতের পর্যায়ক্রম ছিল ভিন্ন,

যা ভালোভাবেই 'এলজিএম' হাইপোথিসিসকে ভুল প্রমাণ করেছিল। অনেক বুদ্ধিমত্তাহীন উৎস থেকে মেট্রোনমিক বা নিয়মিত ছন্দ বা পর্যায়ক্রমের সংকেতের উৎপত্তি হতে পারে, যেমন, দোল খাওয়া গাছের ডাল, ফোটা ফোটা করে পড়া পানির বিন্দু থেকে, ঘুর্ণায়মান আর কক্ষপথে প্রদক্ষিণরত মহাজাগতিক বস্তু। আমাদের ছায়াপথে সহস্রাধিক পালসার পাওয়া গেছে, এবং এখন স্বীকৃত যে, এরা আসলে হচ্ছে ঘুর্ণাযমান নিউট্রন নক্ষত্র, যারা বাতিঘরের আলোর মত চতুর্দিকে বেতার তরঙ্গ নিঃসরণ করে। কল্পনা করতে অবাক লাগে এমন নক্ষত্রের কথা, যা কিনা সেকেন্ডের মধ্যে নিজ কক্ষে ঘুরছে (ভাবুন আমাদের দিনের দৈর্ঘ্য ২৪ ঘন্টার বদলে ১.৩৩ সেকেন্ড), নিউট্রন নক্ষত্র সম্বন্ধে আমরা যা জানি তার সবকিছু অবাক করার মত। আসল কথা হলো পালসারের ব্যপারটি সাধারণ পদার্থবিদ্যার একটি ঘটনা, কোনো বুদ্ধিমত্তার সৃষ্টি নয়।

তাই শুধু নিয়মিত ছন্দময় কিছু অপেক্ষমান মহাবিশ্বের কাছে আমাদের বুদ্ধিদ্বীপ্ত উপস্থিতির জানান দেবে না। প্রাইম সংখ্যা (১৪২) অনেক সময় পছন্দের একটা ব্যপার হয়ে আসে। কারণ শুধুমাত্র কোনো ভৌত উপায়ে এই সংখ্যা তৈরি করা সম্ভব নয়। প্রাইম সংখ্যা শনাক্ত করে হোক বা অন্য কোনো উপায়ে হোক, কল্পনা করুন 'সেটি' মহাশূন্যে বুদ্ধিমান প্রাণীর উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ পেল, এর পরে হয়তো বিশাল আকারের তথ্য এবং জ্ঞানের আদান প্রদান হলো , বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, যেমন, ফ্রেড হয়েলের (১৪৩) 'এ ফর অ্যান্ড্রোমিডা' বা কার্ল সেগানের 'কনটাক্ট' উপন্যাসটির মত। আমরা কিভাবে এর উত্তর দেব? ক্ষমার যোগ্য একটা প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমন কিছু যা অনেকটাই উপাসনার মত, যে সভ্যতার ক্ষমতা আছে এতো বিশাল দূরত্ব থেকে সংকেত পাঠানোর, সেই সভ্যতা আমাদের তুলনায় অনেক অগ্রবর্তী হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। এমন কি যদিও ঐ সভ্যতা সংকেত পাঠানোর সময় আমাদের চেয়ে খুব একটা বেশি উন্নত না হয়েও থাকে, এই অতি বিশাল দূরত্ব আমাদের হিসাব করতে বাধ্য করায়, যে সময় আমরা তাদের সংকেত শনাক্ত করছি তারা হয়তো কয়েক সহস্র বছর আমাদের থেকে এগিয়ে গেছে (যদি না অবশ্য তারা নিজেদেরকে ধ্বংস না করে ফেলে, যা কিন্তু অসম্ভব নয়)।

আমরা তাদের সম্বন্ধে কখনো জানতে পারি বা না পারি, সম্ভাবনা আছে, যে ভিনগ্রহের সভ্যতা আছে যারা অতিমানবিক, অনেক দিক থেকে দেবতুল্য, যে-কোনো ধর্মতাত্ত্বিকের কল্পনাতীত। তাদের কারিগরী অগ্রগতি আমাদের কাছে অতিপ্রাকৃত মনে হতে পারে, যেমন অন্ধকার যুগের কোনো কৃষককে যদি একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে আসা যায়, কল্পনা করুন ল্যাপটপ বা মোবাইল টেলিফোন, হাইড্রোজেন বোমা, জাম্বো জেট দেখে তার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। আর্থার সি. ক্লার্ক (১৪৪) যেমন লিখেছিলেন, তার তৃতীয় সূত্রে: 'যথেষ্ট পরিমাণ উন্নত কোনো প্রযুক্তিকে আসলে জাদু থেকে অবিভেদ্য'। আমাদের সভ্যতা যে প্রযুক্তি তৈরি করেছে, প্রাচীন মানুষের কাছে তা মোজেসের সাগর

দুই ভাগ করা বা যীশুর পানির উপর হাঁটা থেকে থেকে কোনো অংশে কম অলৌকিক মনে হবে না। আমাদের ‘সেটি’সংকেতের ভিনগ্রহবাসীরা আমাদের কাছে দেবতাদের মতোই মনে হতে পারে, যেমন করে, প্রস্তরযুগীয় সভ্যতার মানুষরা মিশনারীদের মনে করেছিলেন (এবং তারা যেভাবে তাদের অযোগ্য সম্মানকে অপব্যবহার করেছিলেন চরমভাবে), যখন তারা তাদের দেশে এসেছিল অস্ত্র, টেলিস্কোপ, দিয়াশলাই আর পরবর্তী গ্রহনের তারিখ সেকেন্ড পর্যন্ত নির্ণয় করতে সক্ষম এমন পঞ্জিকা সাথে নিয়ে।

তাহলে কোন অর্থে, অতি উন্নত ‘সেটি’ ভিনগ্রহীরা দেবতা হবে না? তাহলে কোন অর্থে তারা অতিমানবীয় হবে, তবে অতিপ্রাকৃত হবে না? খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থে, যা এই বইটির অন্তর্নিহিত বক্তব্য। দেবতা আর দেবতাতুল্য ভিনগ্রহীদের মধ্যে পার্থক্য তাদের গুণাবলীতে না, তাদের উৎপত্তিতে। যে-কোনো প্রাণী যা এত জটিল যে তার বুদ্ধিমত্তা আছে, সে একটি বিবর্তন পক্রিয়ার ফসল। যখন তাদের সাথে আমাদের দেখা হবে তখন যতই তাদের দেবতাতুল্য মনে হোক না কেন, তাদের শুরুটা কিন্তু এভাবে হয়নি। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর লেখক যেমন, ড্যানিয়েল এফ. গালোওয়ে (১৪৫), ‘কাউন্টারফিট ওয়ার্ল্ড’ বইয়ে এমনকি প্রস্তাব করেছেন (আমি চিন্তা করতে পারছি না কিভাবে তা ভুল প্রমাণ করবো) যে, আমরা কম্পিউটারের সৃষ্ট কাল্পনিক জগতে বাস করছি, যা নিয়ন্ত্রণ করছে অতি উন্নত একটি সভ্যতা। কিন্তু যারা এই জগতটা তৈরি করেছে তাদেরও কোনো এক জায়গা থেকে আসতে হবে। সম্ভাবনার নীতি অনুযায়ী সরল সাধারণ পূর্বসূরি ছাড়া তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট হবার সকল ধারণা নাকচ হয়ে যায়। তারাও সম্ভবত তাদের অস্তিত্বের জন্য এক ধরনের (হয়তো অপরিচিত এবং ভিন্ন) ডারউইনবাদের কাছের ঋণী: ড্যানিয়েল ডেনেটের শব্দ ব্যবহার করে বলা যায় ‘স্কাই হুকের’ পরিবর্তে একধরনের ক্রমবর্ধমান (একদিকে ঘুরতে পারে এমন) হুক সমৃদ্ধ দাঁতালো চাকাযুক্ত ‘ক্রেইন’ (১৪৬)। ‘স্কাইহুক’ সব দেবতাসহ শুধুমাত্র জাদুর খেলা। তারা প্রকৃতার্থে আন্তরিকভাবে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে না, এবং তাদের প্রদত্ত ব্যাখ্যার চেয়ে আরো বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা সেখানে অবশিষ্ট থেকে যায়।‘ক্রেইন’ হলো সেই ব্যাখ্যাকারী যন্ত্র, যা আসলে পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো সর্বকালের সেরা ‘ক্রেইন’, যা জীবনকে আদিমতম সরলতা থেকে ধীরে ধীরে জটিলতা, সৌন্দর্য আর সুস্পষ্টরুপে প্রতীয়মান হয় এমন নকশার সুউচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে, আজ যা আমাদের বিস্মিত করে। ‘কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে কোনো ঈশ্বর নেই’ শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়ে এটাই হবে মূল বক্তব্য। কিন্তু প্রথমে, সক্রিয়ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করার মূল কারণে প্রবেশের আগে, আমার দ্বায়িত্ব হল ঈশ্বর বিশ্বাসের সপক্ষে ঐতিহাসিক সময় থেকে প্রস্তাবিত সকল ইতিবাচক যুক্তিগুলো খণ্ডন করা।

টীকা:

(১) ওল্ড টেস্টামেন্ট হচ্ছে খ্রিস্টীয় বাইবেল এর প্রথম অংশ, এর মূল ভিত্তি হিব্রু বাইবেল, প্রাচীন ইসরায়েলাবাসীদের ধর্মীয় রচনার একটি সংকলন।

(২) স্যার উইনস্টোন লিওনার্ড স্পেন্সার-চার্চিল (১৮৭৪-১৯৬৫), ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, দুবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

(৩) রানডোলফ চার্চিল (১৯১১-১৯৬৮) উইনস্টোন চার্চিলের ছেলে, ব্রিটিশ সংসদ সদস্য।

(৪) ইভলিন ওয়াহ (১৯০৩-১৯৬৬) ব্রিটিশ লেখক।

(৫) Mitford and Waugh (2001): The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh. New York: Houghton Mifflin.

(৬) টমাস জেফারসন, যুক্তরাষ্ট্রের জাতির পিতাদের একজন, প্রেসিডেন্ট এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের একজন প্রধান লেখক।

(৭) ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত কাহিনীতে মিসরীয় এই রাজকুমার ইসরায়েলবাসীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাকে ঈশ্বর মাউন্ট সাইনাইতে দশটি কমান্ডমেন্ট দেন। ইহুদীবাদের প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলাম ধর্মে পরিচিত মুসা নামে।

(৮) ইয়াহয়ে (Yahweh), লৌহ যুগে ইসরায়েল এবং জুডাহ'র কেন্দ্রীয় ঈশ্বর।

(৯) জিসাস, (৭-২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ – ৩২/৩৩ খ্রিস্টাব্দ), জিসাস অফ নাজারেথ, যীশু খ্রিস্ট, খ্রিস্ট ধর্মের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব, ইসলামে তিনি ঈসা নামে পরিচিত, ইসলামী মতে তিনি ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা যাননি, তিনি সশরীরে স্বর্গে আহোরণ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র নন, ইহুদীরা যীশুকে তাদের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করা মেসিয়া হিসাবে মনে করে না, কারণ তিনি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর শর্ত পূরণ করেন না। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছে তিনি ত্রাতা, ঈশ্বর পুত্র, ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন এবং পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন।

(১০) মিসেস সেসিল ফ্রান্সিস আলেক্সান্ডার (১৮১৮-১৮৯৫), আইরিশ হিম বা খ্রিস্টীয় স্তব সংগীত রচয়িতা এবং কবি।

(১১) বা'ল - উত্তর পশ্চিম সেমিটিক একটি পদমর্যাদা, যার অর্থ মাস্টার। শব্দটি ব্রোঞ্জ যুগে লেভান্ত ও এশিয়া মাইনরের অনেক শহরের পৃষ্ঠপোষক দেবতাকেও ইঙ্গিত করে।

(১২) গ্রিক পূরাণের প্রধান দেবতা।

(১৩) ওটান বা ওডান, অ্যাঙলো-স্যাক্সন ও মহাদেশী জার্মানিক গোত্রগুলো বহুঈশ্বরবাদী ধর্মের প্রধান দেবতা, নর্স পুরাণের ওডিনের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(১৪) ইবন ওয়ারাক ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ লেখকের ছদ্মনাম, যিনি ইসলামের সূচনা পর্ব নিয়ে তার গবেষণা মূলক প্রবন্ধগুলো ইসলাম সম্বন্ধে প্রচলিত বিশ্বাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।

(১৫) http://www.newadvent.org/cathen/06608b.htm

(১৬) এরিয়াস (২৫০-৩৩৬) মিসরের আলেক্সজান্দ্রিয়ার ধর্মযাজক ছিলেন। Arian Heresy এর জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। এরিয়ান হেরেসি দাবী করেছিল ঈশ্বর পুত্র - যীশু আর ঈশ্বর একই এসেন্স বা মূলসার, বা পদার্থ বা প্রকৃতি দিয়ে তৈরি না, তিনি কনসাবস্টানশিয়াল নন (হোমোউসিয়স - এটি গ্রিক শব্দের একটি রোমান অনুবাদ, যার মানে পিতা ও পুত্র একই পদার্থ দিয়ে তৈরি, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই) তার পিতার সাথে, সেকারণে তার মত নন, অথবা সমমর্যাদা বা চিরন্তন বা ঈশ্বরের প্রকৃত বলয়ের মধ্যে অবস্থিত নয়। সহজ অর্থে এরিয়াস দাবী করেছিলেন পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা তিনটি ভিন্ন, পিতা পুত্রকে সৃষ্টি করেছেন পৃথক একটি সত্তা হিসেবে। আর যুক্তিটির মূল ভিত্তি ছিল মানব মায়ের গর্ভে যীশুর জন্মের ঘটনাটি।

(১৭) কনস্টান্টিন রোমের সম্রাট ছিলেন ৩০৬-৩৩৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি। প্রথম রোমান সম্রাট যিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহন করেছিলেন, তিনি দি এডিক্ট অফ মিলান ঘোষণয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, যে আদেশের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিস্টানদের সাথে সকল বৈরী আচরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় (৩১৩ খ্রিস্টাব্দ), এছাড়াও তার সময়ে (৩২৫) প্রথম নাইসিয়ান কাউন্সিল এর অধিবেশন হয়, যেখানে খ্রিস্ট ধর্মে মৌলিক 'নাইসিন ক্রিড' টি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

(১৮) ক্লোস রিজনিং এর ব্যবহার আমরা দেখি, যখন পাঠককে প্ররোচিত করাই লক্ষ থাকে, যুক্তির মাধ্যমে কোনো একটি উপসংহার পৌছাবার বদলে।

(১৯) আথানাসিয়ান ক্রিড বা কুইকানকোয়ে ভুল্ট, একটি কেন্দ্রীয় খ্রিস্টীয় মতবাদ, যা ট্রিনিটির তিনটি সত্তাকে সমান রুপে চিহ্নিত করেছে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এটি খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসের কেন্দ্রীয় রূপ।

(২১) সেইন্ট গ্রেগরী দ্য মিরাকল ওয়ার্কার (২১৩-২৭৫/২৭৬) এশিয়া মাইনরে জন্ম নেয়া ধর্মতাত্ত্বিক যাজক।

(২২) টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মূল লেখক এবং তৃতীয় প্রেসিডেন্ট।

(২৩) ক্যালভানিজম (Calvanism) খ্রিস্টান ধর্মের প্রটেষ্টানিজম এর একটি প্রধান শাখা, জন ক্যালভিন সহ অন্যান্য রিফরমেশন পর্বে ধর্মতাত্ত্বিকদের মতাদর্শ নির্ভর একটি শাখা।

(২৪) ক্যাথলিক চার্চ দাবী করে তারা কোনো সেইন্ট তৈরি করেন না, শুধু তাদের ক্যানোনাইজ বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেন। সব সেইন্ট এর অবস্থান স্বর্গে।

(২৫) http://www.catholic-forum.com/saints/indexsnt.htm?NF=I

(২৬) পোপ জন পল দ্বিতীয় (কারোল ইয়ুজেফ ভোজতিয়া (১৯২০-২০০৫), ১৯৭৮ থেকে ২০০৫ অবধি ক্যাথলিক চার্চের পোপ ছিলেন।

(২৭) স্যার জেমস জর্জ ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১) ব্রিটিশ নৃতত্ত্ববিদ, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ধ্রুপদী বই ‘দ্য গোল্ডেন বোহ’ (Golden bough) এর লেখক।

(২৮) পাসকাল বয়ের, ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি ইন সেইন্ট লুইস এর অধ্যাপক। Religion explained বইটির লেখক।

(২৯) স্কট আটরান, যুক্তরাষ্ট্রের নৃতত্ত্ববিদ।

(৩০) ফেনোমেনোলজী হচ্ছে সচেতনতা বা সজ্ঞানতার গঠন প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন, যে সচেতন সজ্ঞানতায় অভিজ্ঞতালব্ধ হয় কোন এক ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। কোনো একটি অভিজ্ঞতার কেন্দ্রীয় কাঠামোটি তৈরি করে এর উদ্দেশ্যময়তা, এটি অন্য কোন কিছুর প্রতি নির্দেশিত যেমন একটি কিছুর বা কোন কিছু সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা।

(৩১) মর্মনিজম হচ্ছে লেটার ডে সেইন্ট মুভমেন্ট এর প্রধান ধর্মীয় প্রথা। এই মুভমেন্টটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮২০ এর দশকে জোসেফ স্মিথ।

(৩২) গোর ভিদাল (ইউজিন লুইস ভিদাল) (১৯২৫-২০১২) যুক্তরাষ্ট্রের লেখক।

(৩৩) পল দি অ্যাপস্টোল (সল অফ টারসাস - ৫-৬৭) একজন অপোষ্টল বা অনুসারী শিষ্য (যদিও যীশুর ১২ জন অ্যাপোষ্টল এর একজন নয়) যিনি প্রথম শতাব্দীতে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক ছিলেন।

(৩৪) কনকিষ্টাডোর, পর্তুগীজ ও স্প্যানিশ সাম্রজ্যের সৈন্য অভিযাত্রীদের বোঝাতে এই নামটি ব্যবহার করা হতো, সাধারণ ১৫ থেকে ১৭শ শতাব্দীতে, পৃথিবী জুড়ে নতুন উপনিবেশ স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল।

(৩৫) টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯) ইংরেজ এবং আমেরিকার রাজনৈতিক দার্শনিক, তাত্ত্বিক এবং বিপ্লবী। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার বিপ্লবের শুরুতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাম্ফলেট এর রচয়িতা ছিলেন, তিনি আমেরিকার বিদ্রোহীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন ইংল্যান্ড থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্য।

(৩৬) একাত্মবাদীরা মনে করেন, ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করলেও প্রাকৃতিক জগতের কোনো বিষয়ে তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেন না, তিনি তার বেধে দেয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কিছু পরিচালিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। একাত্মবাদীদেও মতে মানুষরা শুধুমাত্র যুক্তি আর প্রকৃতির নানা প্রপঞ্চ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমেই কেবল সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারবে, কোন ঐশী প্রত্যাদেশ বা অতিপ্রাকৃত (অলৌকিক কোন ঘটনা) কোন প্রকাশের মধ্যে নয়।

(৩৭) এজ অফ এনলাইটেনমেন্ট (অথবা শুধু এনলাইটেনমেন্ট বা এজ অব রিজন) হচ্ছে সেই সময় পর্ব, যখন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল প্রথাগত চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে যুক্তি, বিশ্লেষণ আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার উপর ভিত্তি করে । এটির সূচনা করেছিলেন পশ্চিম ইউরোপের দার্শনিকরা।

(৩৮) সুজান জ্যাকোবী (জন্ম ১৯৪৫) একজন আমেরিকান লেখক।

(৩৯) ডেইজম (একাত্মবাদ), শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন ডিউস শব্দটি থেকে, যার অর্থ ঈশ্বর। সৃষ্টিকর্তা এবং প্রাকৃতিক বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট এটি একটি ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান। সপ্তদশ শতকে বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে ডেইষ্টিক এই দৃষ্টিভঙ্গি যা অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেনমেন্ট পর্বকে প্রভাবিত করেছিল। কোন ধরনের ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা ঐশী প্রত্যাদেশ ছাড়াই যুক্তি এবং পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তিকে একজন পরমসত্তা বা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস, অন্যভাবে বললে যৌক্তিক একেশ্বরবাদ। যদিও একাত্মবাদীরা নিরীশ্বরবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, প্রথাগত ঈশ্বরবিশ্বাসীরা অবশ্যই প্রায়শই তাদের চিহ্নিত করেছেন নিরীশ্বরবাদী হিসাবে। কিন্তু একাত্মবাদী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন খ্রিস্ট ধর্ম বিরোধী থেকে শুরু করে অ-খ্রিস্টীয় ঈশ্বরবাদীরাও। একাত্মবাদীরা মনে করেন, ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করলেও প্রাকৃতিক জগতের কোন বিষয়ে তিনি কোন হস্তক্ষেপ করেন না, তিনি তার বেধে দেয়া প্রাকৃতিক নিয়মেই সব কিছু পরিচালিত হবার সুযোগ করে দিয়েছেন। একাত্মবাদীদের মতে মানুষরা শুধুমাত্র যুক্তি আর প্রকৃতির নানা প্রপঞ্চ পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমেই কেবল সৃষ্টিকর্তাকে জানতে পারবে, কোন ঐশী প্রত্যাদেশ বা অতিপ্রাকৃত (অলৌকিক কোনো ঘটনা) কোন প্রকাশের মধ্যে নয়। এই বিষয়গুলো একাত্মবাদীরা মনে করেন সতর্কতার (পুরোপুরি সন্দেহবাদীতার সাথে না হলেও) সাথে যৌক্তিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা আছে।

(৪০) Congressional Record, 16 Sept. 1981.

(৪১) যুক্তরাষ্ট এবং অটোমান ত্রিপোলিতানিয়া'র মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তি।

(৪২) জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯) আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে কন্টিনেন্টাল আর্মির সর্বাধিনায়ক ছিলেন।

(৪৩) জন অ্যাডামস (১৭৩৫-১৮২৬) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের একজন, এবং দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট।

(৪৪) এডওয়ার্ড মিল্টন 'এড' বাকনার (জন্ম ১৯৪৬) আমেরিকার অ্যাথিস্ট অ্যাক্টিভিষ্ট। ২০০৮ থেকে ২০১০ সাল অবধি অ্যামেরিকান অ্যাথিস্ট-এর সভাপতি ছিলেন।

(৪৫) http://www.stephenjaygould.org/ctrl/buckner_tripoli.html.

(৪৬) Giles Fraser, 'Resurgent religion has done away with the country vicar', Guardian, 13 April 2006

(৪৭) ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত মাউন্ট সাইনাই পর্বতে মোজেসকে দেয়া ঈশ্বরের অবশ্য পালনীয় দশটি নির্দেশ।

(৪৮) ক্রিষ্টোফার এরিক হিচেন্স (১৯৪৯-২০১১) ব্রিটিশ আমেরিকান লেখক, সাংবাদিক, বিতার্কিক।

জেমস ম্যাডিসন জুনিয়র (১৭৫১-১৮৩৬) আমেরিকার চতুর্থ প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, তাকে সংবিধানের জনক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নে তার ভূমিকার জন্য, এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিল অব রাইটস-এর রচয়িতা।

(৫০) বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০) যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের অন্যতম, নানা কারণে তাকে প্রথম আমেরিকান হিসাবে মনে করা হয়, বিজ্ঞানী, রাজনিতিবিদ, লেখক, আবিষ্কারক, প্রকাশ, কুটনীতিবিদ।

(৫১) Robert I. Sherman, in Free Inquiry 8: 4, Fall 1988, 16.

(৫২) নাটালি আনজিয়ার্স (জন্ম ১৯৫৮) নিউ ইয়র্ক টাইমস এর বিজ্ঞান সংবাদদাতা এবং লেখক। (৫৩) N. Angier, Confessions of a lonely atheist, New York Times Magazine, 14 Jan. 2001

(৫৪) এই বিষয়টি নিয়ে ফ্রি এনকোয়ারী পত্রিকার সম্পাদক টম ফ্লিন জোরালো যুক্তি দিয়েছিলেন, তার 'সেকুলারিজমস ব্রেক থ্রু মোমেন্টস' শীর্ষক একটি নিবন্ধে: 'যদি নিরীশ্বরবাদীরা একাকীত্ব, বিচ্ছিন্নতা এবং বিষণ্ণতায় ভোগেন, সেটার জন্য দায়ী আমরাই (নিরীশ্বরবাদীরা); সংখ্যা বিচারে আমরা অনেক শক্তিশালী, আসুন আমাদের শক্তির প্রমাণ দেয়া শুরু করি'।

(৫৫) ডেভিড মিলস (জন্ম ১৯৫৯) যুক্তরাষ্ট্রের লেখক।

(৫৬) http://www.fsgp.org/adsn.html

(৫৭) একটি বিশেষভাবে অদ্ভুত ঘটনা, যেখানে একটি মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র নাস্তিক হবার অপরাধে। সেই ঘটনাটি বর্ণিত আছে ফ্রি থট সোসাইটি অব গ্রেটার ফিলাডেলফিয়া মার্চ/এপ্রিল ২০০৬ এর নিউজ লেটারে। http://www.fsgp.org/newsletters/newsletter_ 2006_0304.pdf এই ওয়েবসাইটে যান এবং ল্যারী হুপারের হত্যাকাণ্ডটি স্ক্রল করে পড়ুন।

(৫৮) এখানে উল্লেখ করতে হবে, মার্চ ২০০৭ এ ক্যালিফোর্নিয়ার ১৩তম ডিস্ট্রিক্ট এ কংগ্রেস ম্যান পিট স্টার্ক, জনসমক্ষে স্বীকার করে নিয়েছেন যে তার কোনো ঈশ্বরবাদী বিশ্বাস নেই; আশা করা যাক, যুক্তরাষ্ট্রের অন্য রাজনীতিবিদরাও এই সাহসী মানুষকে অনুসরণ করবেন। আসুন পানিতে ঝাপিয়ে পড়ুন, পানি ঠাণ্ডা ঠিকই তবে আপনাকে নতুন করে বাঁচতে শেখাবে। http://www. Secular.org / news/ pete_stark_070312.html)

(৫৯) জাওয়াহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, এবং আধুনিক ভারতের স্থপতি।

(৬০)http://www.hinduonnet.com/thehindu/mag/2001/ll/18/stories/2001111800070400. htm.

(৬১) 'সম্মানিত মহাশয়, আমার এই হাইপোথিসিসের প্রয়োজন নেই',এই বিখ্যাত উত্তরটি দিয়েছিলেন লাপ্লাস, নেপোলিয়ন যখন বিস্মিত হয়ে এই বিখ্যাত গণিতজ্ঞের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কেমন করে তিনি তার বই লিখতে সক্ষম হয়েছেন একবারও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ না করে।

(৬২) অ্যাগনস্টিসিজম (অজ্ঞেয়বাদ) হচ্ছে একটি দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে কিছু নির্দিষ্ট দাবীর সত্যতা - বিশেষভাবে ঈশ্বর, স্বর্গীয় বা অতিপ্রাকৃতি কোন সত্তার অস্তিত্ব আছে কিংবা নেই, এই বিষয়ে কোন অধিবিদ্যা নির্ভর এবং ধর্মীয় দাবী - হচ্ছে অজানা এবং যা জানা সম্ভব না। দার্শনিক উইলিয়াম এল. রোয়ের মতে কোন একজন অ্যাগনস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী, সাধারণ অর্থে সেই ব্যক্তি, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এমন কিছু বিশ্বাসও করেন না আবার অবিশ্বাসও করেন না (ঈশ্বরবাদীরা যেমন বিশ্বাস করেন ও নিরীশ্বরবাদীরা যেমন বিশ্বাস করেন না)। টমাস হেনরী হাক্সলি, একজন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী, ১৮৬৯ সালে এই অ্যাগনস্টিক শব্দটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন। হাক্সলির ভাষায়: অ্যাগনস্টিসিজম কোন বিশ্বাস বা ক্রীড নয় বরং একটি পদ্ধতি, যার মূল হচ্ছে একটি একক মূলনীতিতে কঠোরভাবে অনুসরণ করা, এবং ইতিবাচকভাবে এই মূলনীতিটিকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: বুদ্ধিমত্তার কোন ব্যাপারে, আপনি যুক্তিকে অনুসরণ করুন, যত দূর অবধি তা করা সম্ভবপর হয়, অন্য কোন বিবেচনাকে প্রশ্রয় না দিয়ে। এবং নেতিবাচকভাবে: বুদ্ধিমত্তার কোনো বিষয়ে এমন কোনো ভান করবেন না যে উপসংহারে আপনি পৌঁছেছেন সেটি নিশ্চিৎ, যা আপনি প্রদর্শন করে প্রমাণ করতে পারবেন না বা সেটি প্রদর্শন করা সম্ভব না। দার্শনিক রোয়ের মতে, আরো সংকীর্ণ অর্থে, অজ্ঞেয়বাদ হচ্ছে এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা দাবী করে মানুষের যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিশ্বাসের পক্ষে বা বিপক্ষে যথার্থ পরিমাণ যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম নয়। অ্যাগনস্টিক শব্দটির উৎপত্তি - (a) যার অর্থ উইথ আউট ও (gnōsis) বা নলেজ।

(৬৩) Quentin de la Bedoyere, Catholic Herald, 3 Feb. 2006

(৬৪) Carl Sagan, The burden of skepticism, Skeptical Inquirer 12, Fall.1987.

(৬৫) The Permian–Triassic (P–Tr) extinction event বা পার্মিয়ান-ট্রায়াসিক মহাবিলুপ্তি যা পরিচিত the Great Dying হিসাবে, ঘটেছিল প্রায় ২৫২.২৮ মিলিয়ন বছর আগে। যা পার্মিয়ার আর ট্রায়াসিক ভুতাত্ত্বিক মহাপর্বের ও একই সাথে প্যালিওজয়িক ও মেসোজয়িক এরার সীমারেখা তৈরি করেছে। আমাদের গ্রহের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় মাপের মহাবিলুপ্তির ঘটনা, যে সময় ৯৬% সামুদ্রিক

প্রজাতি এবং ৭০ শতাংশ স্থলবাসী মেরুদণ্ডী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছিল। এই বিশাল পরিমানে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবার কারণে অন্য যে কোনো মহাবিলুপ্তির চেয়ে পার্মিয়ান মহাবিলুপ্তির পর পৃথিবীতে পুনরায় জীব বৈচিত্র্য ফিরে আসার জন্য সময় নিয়েছিল অনেক বেশি, সম্ভবত ১০ মিলিয়ন বছর।

(৬৬) TAP: Temorary Agnostocism in Practice

(৬৭) PAP: Permanent Agnostocism in Practice

(৬৮) একটি প্রশ্ন যা কিনা বহুদিন ধরেই প্রচলিত, এবং এটি একটি প্রশ্নও যা বেশ উত্তপ্ত বিতর্কের জন্ম দিতে পারে, কারণ খুব ভালো কারণ আছে এর উল্টর দুভাবে দেবার জন্য; যেমন কোন বনভূমিতে যদি কোন একটি গাছ ভেঙ্গে পড়ে যখন সেখানে কেউ না থাকে, তখন কি কোনো শব্দ হয়। - হ্যাঁ গাছটি অবশ্যই শব্দ সৃষ্টি করবে;' না গাছটি অবশ্যই শব্দ সৃষ্টি করবে না।

(৬৯) ইসিডোর অগুস্ত মারি ফ্রাসোয়া জাভিয়ের কোঁমত (১৭৯৮-১৮৫৭) যিনি সুপরিচিত অগুস্ত কোঁমত হিসাবে, ফরাসী দার্শনিক। সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসাবে তাকে মনে করা হয়। আধুনিক অর্থে বিজ্ঞানের দার্শনিক শব্দটি যা অর্থ করে, সেই অর্থে তিনি প্রথম বিজ্ঞানের দার্শনিক।

(৭০) যোসেফ ফ্রাউনহফার (পরবর্তীতে রিটার ফন ফ্রাউনহফার (১৭৪৭-১৮২৬) জার্মান অপটিশিয়ান, সুর্যের বর্ণালীতে অ্যাবসর্পশন বা শোষণ রেখা (ফ্রাউনহফার লাইন) আবিষ্কারের জন্য পরিচিত। এছাড়াও খুবই উন্নত মানে অ্যাক্রোমাটিক লেন্স এর আবিষ্কারকও ছিলেন তিনি।

(৭১) বিষয়টি নিয়ে আলোচনা আছে, Dawkins, R. (1998). Unweaving the Rainbow. London: Penguin, বইটিতে।

(৭২) টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-১৮৯৫) ইংরেজ জীববিজ্ঞানী।

(৭৩) T. H. Huxley, Agnosticism (1889), Agnosticism : http://www. Infidels. Org/library/historical/ uxley_huxley/ uxley_wace/part_02.html.

(৭৪) ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) স্কটিশ দার্শনিক। পশ্চিমা দর্শনের উপর তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে।

(৭৫) ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) জার্মান দার্শনিক, আধুনিক দর্শনের অন্যতম কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা হয়।

(৭৬) কার্ল গুস্তাভ ইয়ুঙ (১৮৭৫-১৯৬১) সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহনকারী মনোবিজ্ঞানী, সাইকোথেরাপিষ্ট, যিনি অ্যানালিটিকাল সাইকোলজী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(৭৭) বার্ট্রান্ড আর্থার উইলিয়াম রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ব্রিটিশ দার্শনিক,গণিতজ্ঞ, লেখক ।

(৭৮) Russell, Is there a God? (1952); Why I Am Not a Christian. London: Routledge. Russell, B. (1993). The Quotable Bertrand Russell. Amherst, NY: Prometheus.

(৭৯) ইনক্যুইজিটররা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনো ভিন্ন মতাবলম্বী বা বৈধর্ম প্রচারকারীদের অনুসন্ধান ও তাদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেবার জন্য দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত যাজক।

(৮০) হয়তো আমি একটু তাড়াতাড়ি কথাটা বলে ফেললাম, ২০০৫ সালের ৫ জুন The Independent on Sunday একটি খবর প্রকাশ করে: মালায়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ বলছে, যে ধর্মীয় সেক্টটি পবিত্র চায়ের এর পট এর আকারে একটি বাড়ি বানিয়েছে, তারা গৃহনির্মাণ সংক্রান্ত নীতিমালাগুলো সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছেন। এছাড়া বিবিসি'র খবরটি দেখুন এখানে: http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4692039.stm

(৮১) সাবাথের উৎপত্তি ওল্ড টেস্টামেন্টে, ইহুদী মতাবলম্বীদের জন্য সাবাথ হচ্ছে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার দিন, ধর্মীয় প্রার্থনার পবিত্র দিবস হিসাবে। সাধারণত শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সাবাথ পালন করা হয়, খ্রিস্টানদের জন্য এই দিনটি হচ্ছে রবিবার।

(৮২) টুথ ফেয়ারি, শিশুতোষ রূপকথার একটি চরিত্র, বলা হয়ে থাকে যখন কোন শিশুর দুধ দাত পড়ে, সে যদি দাতটি তার বালিশের নীচে নিয়ে ঘমুায়, টুথ ফেয়ারী এসে সেটি সামান্য কিছু টাকা দিয়ে প্রতিস্থাপিত

করে। সম্ভবত প্রাচীন ইউরোপীয় একটি প্রথা থেকে এর উৎপত্তি, যখন শিশুদের দুধ দাত অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করা হতো।
(৮৩) মাদার গুজ, সাধারণ রূপকথা বা শিশুতোষ ছড়া সংকলনের কল্পিত লেখক।
(৮৪) Andrew Mueller, An argument with Sir Iqbal, Independent on Sunday, 2April 2006, Sunday Review section, 12-16
(৮৫) প্রাচীন কাল থেকেই বর্ণিত হয়ে আসা কাল্পনিক একটি প্রাণী, প্রায় ২৫০০ বছর আগের হরপ্পা মহেঞ্জদারো থেকে পাওয়া পাথরের সীলে এক শিং সহ ঘোড়ার মত এই প্রাণীর চিত্র প্রথম দেখা যায়।
(৮৬) ক্যাম্প কোয়েষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের সামার ক্যাম্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি ব্যতিক্রম এবং এটি সম্পূর্ণ প্রশংসনীয় একটি দিকে এই সংস্কৃতিটাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। অন্যান্য সামার ক্যাম্পগুলো যা একটি ধর্মীয় এবং স্কাউট নির্ভর মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, কেন্টাকীতে এডউইন এবং হেলেন কাগিন এর প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্প কোয়েস্ট পরিচালিত হয় ধর্মনিরেপক্ষ মানবতাবাদী নৈতিকতার উপর। শিশুদের এখানে সংশয় এবং প্রশ্নের সাথে সবকিছুকে বিচার করার জন্য প্রণোদনা দেয়া হয়, এর সাথে অন্যান্য বাইরের নানা কার্যক্রম তো আছেই (www.camp-quest.org); ক্যাম্প কোয়েস্টের মত আরো বেশ কিছু সামার ক্যাম্প গড়ে উঠেছে টেনিসি, মিনোসোটা, মিশিগান, ওহাইও এবং কানাডায়)।
(৮৭) New York Times, 29 Aug. 2005.
(৮৮) Henderson, B. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti Monster: Villard
(৮৯) http://www.lulu.com/content/267888.
(৯০) গ্রিক পুরাণের প্রধান দেবতা।
(৯১) গ্রিক পুরাণের দেবতা।
(৯২) আমন - মিসরীয় পুরাণে প্রধান দেবতা, সূর্য দেবতার রা সাথে তাকে আমন-রা বলা হয়ে থাকে।
(৯৩) রহস্যময় গ্রিক-রোমান ধর্ম, যার উৎস প্রোটো-ইন্দো-ইরানি দেবতা মিত্রা, যার গ্রিক রূপ মিথরাস (খ্রিস্ট জন্মের পর প্রথম থেকে চতুর্থ শতাব্দী)
(৯৪) ব্রোঞ্জ যুগে লেভান্ট ও এশিয়া মাইনরের প্রধান দেবতা
(৯৫) নরওয়েজীয় পুরাণের দেবতা।
(৯৬) অ্যাংলো-স্যাক্সন ও জার্মানিক গোত্রদের দেবতা
(৯৭) হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত মোজেস এর অনুপস্থিতিতে ইসরায়েলাইটদের জন্য অ্যারণ সোনালী বাছুর উপাসনার জন্য বানিয়ে দিয়েছিলেন।
(৯৮) সাম্প্রতিক সময়ের একটি প্যারোডি ধর্ম।
(১০০) অ্যালিস্টার ম্যাকগ্রাথ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক।
(১০১) বার্ট্রান্ড রাসেল এর টি পট বা চা-কেটলি যুক্তি।
(১০২) স্টিফেন জে. গুল্ড (১৯৪১-২০০২) আমেরিকার বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ।
(১০৩) দ্য বুক অব ডিউটেরোনমী (গ্রিক ডিউটেরোনোমিয়ন, 'দ্বিতীয় সূত্র') হিব্রু বাইবেল ও ইহুদী তোরাহ'র পঞ্চম বই। এই বইটিতে মূলত তিনিটি সারমন বা উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা আছে, যা মোজেস, ইসরায়েলবাসীদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন, তাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রবেশ করার কিছু সময় আগে।
(১০৪) বুক অব লিভিটিকাস (গ্রিক লিউটিকোস, যার মানে লিভাইটদের সম্পর্কিত), হিব্রু বাইবেল এর তৃতীয় বই, তোরাহ'র পাঁচটি বই এর তৃতীয়তমটি। এর বেশির ভাগ অধ্যায় মূলত মোজেস এর প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশাবলী, যা তিনি ইসরায়েলাইটদের প্রতি পুনরাবৃত্তি করতে বলেছেন।
(১০৫) Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life, New York: Ballantine Books
(১০৬) রিচার্ড জি. সুইনবার্ন (২৬ ডিসেম্বর, ১৯৩৪) ব্রিটিশ ধর্মতত্ত্বের দার্শনিক।
(১০৭) অ্যালিস এই ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড, লুইস ক্যারোল

(১০৮) অ্যামব্রোজ গিনেট বিয়ের্স (১৮৪২-১৯১৪?) আমেরিকার সাংবাদিক, লেখক, এবং ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী রচয়িতা।
(১০৯) স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন (১৮২২-১৯১১), ভিক্টোরিয় ইংল্যান্ডে নৃতত্ত্ববিদ, ইউজেনিষ্ট, অভিযাত্রী, ভূগোলবেত্তা,আবিষ্কার, আবহাওয়াবিদ, পরিসংখ্যানবিদ, মনোবিজ্ঞানী।
(১১০) যখন আমার অক্সফোর্ড কলেজ, ওয়ার্ডেন বা প্রধান হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন সেই ব্যক্তিকে, যার কথা আমি এর আগে উল্লেখ করেছি, সদস্যরা প্রকাশ্যে তার সুস্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে পান করেছিলেন পর পর তিনটি সন্ধ্যা, এই সব নৈশভোজের তৃতীয় দিনে তিনি বিনম্রভাবে এর প্রত্যুত্তর মন্তব্য করেছিলেন: ‘আমি ইতোমধ্যেই অনেক ভালো বোধ করছি।’
(১১১) রাসেল স্ট্যানার্ড (জন্ম ১৯৩১) ব্রিটিশ পদার্থবিদ।
(১১২) স্যার জন টেম্পেলটন সৃষ্ট একটি ফাউণ্ডেশন। নানা ধরনের গবেষণায় এটি অর্থ প্রদান করে, যাদের মূলনীতি ধর্মীয়, আধ্যাত্মিকার সাথে বিজ্ঞান বা অন্যান্য শাখার সমন্বয় সাধন।
(১১৩) H. Benson et al., Study of the therapeutic effects of intercessory prayer (STEP) in cardiac bypass patients, American Heart Journal:151: 4, 2006, 934-42.
(১১৪) জর্জ রবার্ট ‘বব’ নিউহার্ট (জন্ম ১৯২৯) আমেরিকার কমেডিয়ান ও অভিনেতা।
(১১৫) Richard Swinburne, in Science and Theology News, 7 April
(১১৬) পিটার উইলিয়াম অ্যাটকিন্স (জন্ম ১৯৪০) ব্রিটিশ রসায়নবিদ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের প্রাক্তন অধ্যাপক।
(১১৭) এই বাদানুবাদটি অবশ্য চূড়ান্ত সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান থেকে সম্পাদিত করা হয়েছিল। সুইনবার্ণের এই বক্তব্য তার স্বভাবসুলভ ধর্মতত্ত্বের চিহ্ন বহন করে; প্রায় একই রকম মন্তব্য তিনি হিরোশিমা নিয়ে করেছিলেন তার ‘দি এক্সিস্টেন্স অব গড’ (২০০৪) বইটিতে ২৬৪ নং পৃষ্ঠায়, ‘মনে করুন হিরোশিমার পারমানবিক বোমায় যদি একজন মানুষ কম পুড়তেন,তাহলে সেখানে সাহস এবং সমবেদনার সুযোগও খানিকটা কমে যেত’।
(১১৮) New York Times, 11 April 2006
(১১৯) আর্থার নেভিল চেম্বারলেইন (১৮৬৯-১৯৪০) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪০); চেম্বারলেইন বিশেষভাবে খ্যাত যুদ্ধ এড়ানোর জন্য হিটলারের সাথে তার তোষণবাদী মিউনিখ চুক্তির (১৯৩৮) জন্য। যখন চেকোস্লোভাকিয়ার জার্মান প্রধান সুডেটেনল্যান্ডকে জার্মানি অধিগ্রহন করেছিল।
(১২০) ইউজেনি ক্যারল স্কট (জন্ম ১৯৫৪) জৈববৈজ্ঞানিক নৃতত্ত্ববিদ, ২০১৩ অবধি ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাইন্স এডুকেশন এর পরিচালক ছিলেন।
(১২১) মাইকেল রুজ (জন্ম ১৯৪০) বিজ্ঞানের দার্শনিক।
(১২২) আদালতের বেশ কিছু কেসে এবং প্রকাশিত গ্রন্থ যেমন Ruse, M. (1982). Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies. Reading, MA: Addison-Wesley. Playboy ম্যাগাজিনে তার নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল এপ্রিল ২০০৬ সংখ্যায়।
(১২৩) জেরী অ্যালেন কয়েন (জন্ম ১৯৪৯) ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো’র জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক, লেখক।
(১২৪) এডওয়ার্ড ওসবোর্ন উইলসন (জন্ম ১৯২৯) আমেরিকার জীববিজ্ঞানী,গবেষক,তাত্ত্বিক এবং লেখক।
(১২৫) মাইকেল রুজ এর নিবন্ধটির জবাব দিয়েছিলেন জেরী কয়েন প্লে বয় ম্যাগাজিনে আগষ্ট ২০০৬ সংখ্যায়।
(১২৬) সালেম উইচ ট্রায়াল, ১৬৯২ আর ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ উপনিবেশ ম্যাসাচুসেটস ডাইনীবিদ্যার চর্চার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ২০ জনকে, যাদের মধ্যে ছিলেন ১৪ জন নারী।
(১২৭)জোসেফ (জো) ম্যাকার্থি, যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত রাজনীতিবিদ যিনি ৫০ এর দশকে কমিউনিষ্ট নাশকতা সন্দেহে বহু মানুষের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন মূলক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

(১২৮) Madeleine Bunting, Guardian, 27 March 2006
(১২৯) আংকেল রেমুস লোকপ্রিয় একটি কাহিনীর চরিত্র, মূলত তাকে আমরা দেখি মূল সূত্রধর হিসাবে আফ্রিকান আমেরিকান লোকগাথায়, যা সংকলন করেছিলেন জোলেয় শ্যান্ডলার হ্যারিস, এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮১ সালে। পেশায় সাংবাদিক হ্যারিস মোট সাতটি আঙ্কেল রেমুস এর লোকাগাথার সংকলন প্রকাশ করেছিলেন।
(১৩০) ড্যান ডেনেটের উত্তর প্রকাশিত হয়েছিল গার্ডিয়ান পত্রিকায় ২০০৬ সালের ৪ এপ্রিল।
(১৩১)http://scienceblogs.com/pharyngula/2006/03/the_dawkinsdennett_boogeyman.php;
(১৩২) ড্রেক সমীকরণ হচ্ছে একটি সম্ভাবনার প্রস্তাব যা দিয়ে মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সীতে সক্রিয়, যোগাযোগ করতে সক্ষম ভিনগ্রহের সভ্যতার সংখ্যার একটি আনুমানিক পরিমাণ করা যায়। এই সমীকরণটি লিখেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক ড্রেক (জন্ম ১০৩০) ১৯৬১ সালে, প্রথম সেটি মিটিং এ আলোচনা শুরু করার জন্য।
(১৩৩) পল ডেভিস, ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানী।
(১৩৪) নিকোলাউস কোপার্নিকাস: পোল্যান্ডের গণিতজ্ঞ এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী, যিনি মহাবিশ্বের একটি মডেল নির্মাণ করেছিলেন পৃথিবীর পরিবর্তে সূর্যকে এর কেন্দ্রে স্থাপন করে।
(১৩৫) এডউইন পাওয়েল হাবল (১৮৮৯-১৯৫৩) আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
(১৩৬) অগুস্ট কোঁমত, ফরাসী দার্শনিক।
(১৩৭) পজিটিভিজম হচ্ছে বিজ্ঞানের একটি দর্শন, সব তথ্য যার উৎপত্তি যুক্তি এবং গাণিতিক প্রক্রিয়ায় এবং যা ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত/পর্যবেক্ষিত অভিজ্ঞতাকে উপস্থাপন করে, কোনো কর্তৃত্বপূর্ণ জ্ঞানের সেটাই একমাত্র উৎস এবং সত্যিকারের প্রমাণিত জ্ঞান (সত্য) থাকে শুধুমাত্র এভাবে আহরিত জ্ঞানে। আর ইন্দ্রিয় থেকে প্রাপ্ত পরীক্ষিত উপাত্তকে বলা হয় 'এমপিরিকাল' এভিডেন্স।
(১৩৮) ডপলার ইফেক্ট বা ডপলার শিফট হচ্ছে তরঙ্গ হারের পরিবর্তন (অথবা অন্য কোন পর্যায়ক্রমিক ঘটনা) যখন কোনো পর্যবেক্ষণকারী এই তরঙ্গ উৎস থেকে তার নিজের অবস্থানের পরিবর্তন করেন। অস্ট্রিয় পদার্থবিদ ক্রিস্টিয়ান ডপলার এটি প্রস্তাব করেছিলেন।
(১৩৯) এটি যন্ত্র যার দ্বারা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম এর একটি নির্দিষ্ট অংশের আলোর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করা হয়, মূলত কোন পদার্থকে শনাক্ত করার জন্য।
(১৪০) http://vo.obspm.fr/exoplanetes/encyclo/encycl.html.
(১৪১) সুজান জোসলিন বেল বারনেল (জন্ম ১৯৪৩), উত্তর আয়ারল্যান্ডে জন্ম নেয়া ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
(১৪২) ১ অপেক্ষা বড় কোনো সংখ্য যা সেই সংখ্যাটি নিজে ও ১ ছাড়া আর কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না। যেমন ৫;
(১৪৩) ফ্রেড হয়েল (১৯১৫-২০০১) ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, স্টেলার নিউক্লিওসিনথেসিস এর জন্য যিনি সুপরিচিত।
(১৪৪) আর্থার সি. ক্লার্ক (১৯১৭-২০০৮) ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখক, বিজ্ঞান লেখক এবং ফিউচারিষ্ট, আবিষ্কারক।
(১৪৫) ড্যানিয়েল ফ্রান্সিস গ্যালওয়ে (১৯২০-১৯৭৬) , আমেরিকার কল্পবিজ্ঞান লেখক।
(১৪৬) Dennett, D. (1995). Darwins Dangerous Idea. New York: Simon & Schuster.

৩ তৃতীয় অধ্যায়
ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রস্তাবিত কিছু যুক্তি

আমাদের কোনো প্রতিষ্ঠানেই ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের কোনো পদ থাকা উচিত নয়। - টমাস জেফারসন

ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে যুক্তিগুলো বহু শতাব্দী ধরেই বিধি হিসাবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংকলন করেছেন ধর্মতত্ত্ববিদরা, পরবর্তীতে যেখানে সংযোজন করেছেন অন্যরা, এমনকি ভ্রান্ত 'সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের' ফেরীওয়ালারাও।

টমাস অ্যাকোয়াইনাসের 'প্রমাণসমূহ'

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে টমাস আকোয়াইনাস (১) (যে পাঁচটি 'প্রমাণ' উপস্থাপনের দাবী করেছেন, আসলে সেগুলো কিছুই প্রমাণ করে না, এবং খুব সহজেই - (যদিও বলতে ইতস্ততবোধ করছি, বিশেষ করে তার মতো এমন সুবিখ্যাত কারো যুক্তি) - এটিকে অন্তঃস্বারশূন্য প্রমাণ করা সম্ভব। প্রথম তিনটি মূলত একই বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বলা হয়েছে তাই এই তিনটি যুক্তি নিয়ে একসাথেই আলোচনা করা যেতে পারে। প্রত্যকটি মূলত ক্রমান্বয়ে এর পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অন্তহীন প্রক্রিয়া বা যাকে বলা হয় 'ইনফিনিট রিগ্রেস' (অসীম পশ্চাদগমন) - যেখানে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর আরেকটি পূববর্তী প্রশ্নের জন্ম দেয় - এভাবেই চলতে থাকে অন্তহীনভাবে অনন্তকাল।

১. আনমুভড মুভার বা স্থবির চালক বা চালিকা শক্তি: কোনো কিছুই সচল হতে পারে না আগে যদি কোনো চালক না থাকে। যা ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়া দিকে নিয়ে যাবে আমাদের, যার থেকে মুক্তি পাওয়ার একটাই উপায় - সেটি হচ্ছে 'ঈশ্বর'। কোনো না কোনো কিছুকে প্রথমে চালকের দ্বায়িত্ব নিতে হয়েছিল আর আমরা সেই প্রথম চালককে বলছি 'ঈশ্বর'।

২. আনকসড কস বা পূর্বকারণহীন কারণ: কোনো কিছুই নিজে নিজে ঘটে না। প্রত্যেকটি পরিণতির একটি প্রাক কার্যকারণ আছে, এবং এভাবে আবারো সেই ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়ার দিকে ঠেলে দেয়া হবে আমাদের। তাই এটাকে শেষ করতে হবে একটি প্রথম কারণ দিয়ে, যাকে আমরা বলছি 'ঈশ্বর'।

৩. কসমোলজিকাল আর্গুমেন্ট বা মহাজাগতিক যুক্তি: এমন কোনো একটা সময় অবশ্যই ছিল যখন কোনো ধরনের ভৌত পদার্থেরই অস্তিত্ব ছিল না। যেহেতু বর্তমানে ভৌত পদার্থের অস্তিত্ব আছে সেহেতু নিশ্চয়ই কোনো অভৌত কিছু ছিল যা বর্তমানে এসব কিছুর অস্তিত্বের কারণ, এবং সেই কোনো কিছুকে আমরা বলছি 'ঈশ্বর'।

এই তিনটি যুক্তিই নির্ভর করে আছে ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার ধারণা বা 'ইনফিনিট রিগ্রেসের' ওপরে এবং যেখানে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে সেই ক্রমান্বয়ে

পশ্চাদগমনকে থামানো হয়। এই যুক্তির সমর্থনকারীরা সম্পূর্ণ অনায্যভাবে যে পূর্বধারণাটি পোষণ করেন, তা হলো, তাদের প্রস্তাবিত ’ঈশ্বর’ এই পশ্চাদগমনশীল যুক্তি প্রক্রিয়ার আওতামুক্ত। এমনকি যদি আমরা কাল্পনিকভাবেও কোনো অসীম পশ্চাদগমনশীল একটি যুক্তি প্রক্রিয়ায় কাল্পনিকভাবে সৃষ্টি করা একজন সমাপ্তকারীর অস্তিত্ব সংক্রান্ত সন্দেহজনক বিলাসিতাকে শুধুমাত্র প্রয়োজনের খাতিরে প্রশ্রয় দেই, সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেই কাল্পনিক সমাপ্তকারীর উপর সেই সব গুণাবলীগুলো আরোপ করার কোনো কারণই নেই, যা আমরা সাধারণত ‘ঈশ্বর’ সত্তার উপর আরোপ করে থাকি: যেমন, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞতা, দয়াশীলতা, সৃষ্টির সৃজনশীলতা, এছাড়াও মানুষের আরোপিত ক্ষমতার ব্যপারগুলোতো আছেই যেমন, প্রার্থনা শোনা, পাপ ক্ষমা করা এবং যে কারোরই গোপন গভীরতম চিন্তা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখা। ঘটনাচক্রে যুক্তিবিদদের কিন্তু দৃষ্টি এড়ায়নি যে, সর্বশক্তিময়তা আর সর্বজ্ঞতা পরস্পর বিরুদ্ধ। যদি ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আগে থেকেই তার জানা আছে যে, তিনি কিভাবে ইতিহাসের গতিপথ পরিবর্তন করতে হস্তক্ষেপ করবেন তার অসীম শক্তি দ্বারা। কিন্তু তার মানে, তিনি তার হস্তক্ষেপ কি হবে সেই সম্বন্ধে কোনোভাবেই তার নেয়া সিদ্ধান্তগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন না, এর অর্থ দাড়ায় তিনি আসলে সর্বশক্তিমান নন। কারেন ওয়েনস এই আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধীতাকে সমপর্যায়ের বুদ্ধিদীপ্ত আকর্ষণীয় একটি কবিতায় প্রকাশ করেছেন:

> সর্বজ্ঞ ঈশ্বর কী পারেন, যিনি
> ভবিষ্যত জানেন, তার
> অসীম শক্তি দিয়ে
> তার ভবিষ্যৎ মনকে বদলাতে?

ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার অসীম প্রক্রিয়া আর কাল্পনিক ঈশ্বরকে দিয়ে সেটি শেষ করার কারণ হিসাবে ব্যবহার করার করার অসারতা প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি। বিষয়টা আরো অনেক মিতব্যয়িতার মাধ্যমে করা যায়, যদি আমরা এর বদলে অন্য কিছু কল্পনা করে নেই , যেমন, ধরুন একটি ‘বিগ ব্যাঙ্গ সিঙ্গুলারিটি’ অথবা অন্য কোনো ভৌত ধারণা যা এখনো হয়তো আমাদের অজানা। একে ঈশ্বর বলে সম্বোধন করার ক্ষেত্রে এর সবচেয়ে ভালো পরিণতি হচ্ছে এর উপযোগিতাহীনতা, এবং সবচেয়ে খারাপ পরিণতি হলো, এটি অত্যন্ত ক্ষতিকারক একটি ছলনা। এডওয়ার্ড লিয়ারের (২) ‘ক্রামববলিয়াস কাটলেট’ এর আবোল তাবোল অর্থহীন রেসিপি যেমন আমাদের আমন্ত্রণ জানায়: ‘কয়েক টুকরো গরুর মাংস যোগ করুন, এবার তাদের টুকরো টুকরো করে কাটুন, সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম আকারের টুকরো করে, এরপর এদের আরো ছোটো করে কাটার চেষ্টা করুন, আট কিংবা সম্ভব হলে আরো নয় বার’। কিছু পশ্চাদগমনশীল যুক্তি প্রক্রিয়া বা রিগ্রেস প্রাকৃতিকভাবেই একটি জায়গায় শেষ হয়। বিজ্ঞানীরা কল্পনা

করেছিলেন, কি হতে পারে, যদি আমরা কোনো কিছুকে খুবই ক্ষুদ্রতম টুকরো করে কাটতে পারি, ধরুন, এক টুকরো সোনার খণ্ডকে ভাগ করতে থাকুন, প্রথমে দুইভাগ, তারপর ক্রমাগতভাবে আরো ক্ষুদ্রতম কোনো সোনার খণ্ডাংশে। এক্ষেত্রে এই পশ্চাদগমন অবশ্যই নিঃসন্দেহে অ্যাটম বা পরমাণুতে শেষ হবে। সোনার টুকরার সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অংশ হবে এর নিউক্লিয়াস, যেখানে উনআশিটি প্রোটোন আছে এবং এর চেয়ে কিছু বেশি সংখ্যক নিউট্রন আছে, যার চারপাশে ঘুরছে উনোআশিটি ইলেক্ট্রন। কেউ যদি সোনাকে এর অ্যাটমের চেয়ে আরো ক্ষুদ্রতম অংশে কাটতে চান, সেখানে যা থাকবে, তা আর যাই হোক, সোনা নয়। পরমাণু হচ্ছে 'ক্রামববলিয়াস কাটলেট' ধরনের কোনো পশ্চাদগমনের প্রাকৃতিক শেষ বিন্দু। সুতরাং এটি আদৌ স্পষ্ট না, ঈশ্বর কিভাবে আকোয়াইনাসের প্রস্তাবিত পশ্চাদগমনের প্রাকৃতিক শেষ বিন্দু হতে পারেন, হালকাভাবে যদি বলি। আমরা পরে আরো বিস্তারিতভাবে বিষয়টি দেখবো। আপতত বরং আকোয়াইনাসের তালিকায় ফিরে যাই।

৪. ডিগ্রি বা মাত্রা থেকে যুক্তি বা আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিগ্রি: আমরা লক্ষ করি যে পৃথিবী প্রতিটি জিনিসই ভিন্ন। আমরা জানি যে একটা মাত্রা আছে সবকিছুরই, যেমন, ভালোত্ব এবং উৎকর্ষতা। কিন্তু আমরা সেই মাত্রা পরিমাপ বা বিচার করি, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সর্বোচ্চ কোনো একটি চূড়ান্ত মাত্রাকে আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে। মানুষ ভালো মন্দ দুটোই হতে পারে, সুতরাং চূড়ান্ত মাত্রার ভালোত্ব মানুষের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না; সেই কারণে নিশ্চয়ই কোনো সর্বোচ্চ কিছুর অস্তিত্ব আছে যা উৎকর্ষতার একটি চূড়ান্ত মানদণ্ড তৈরি করে, আমরা সেই চূড়ান্ত মানদণ্ডকে বলছি ঈশ্বর।

এটা কি কোনো যুক্তি হতে পারে? আপনি হয়তো বলতে পারেন, প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে তাদের গায়ের দুর্গন্ধের বিভিন্ন মাত্রা আছে, কিন্তু আমরা সেই মাত্রা মাপতে পারি, শুধু একটি নিখুঁত সর্বোচ্চ মাত্রার দুর্গন্ধের একটি মানদণ্ডের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে। সুতরাং নিশ্চয়ই এমন কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে যা তুলনাহীনভাবে দুর্গন্ধযুক্ত এবং আমরা তাকে বলছি ঈশ্বর। অথবা তুলনা করা জন্য এখানে দুর্গন্ধ বাদ দিয়ে অন্য যে কোনো বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহার করুন না কেন, আপনি একই ভাবে এই ফাঁপা নির্বোধ কোনো উপসংহারে পৌঁছাতে পারবেন।

৫. টেলিওলজিক্যাল বা পরমকারণবাদের যুক্তি বা ডিজাইন বা পরিকল্পনা থেকে যুক্তি বা আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন: এই পৃথিবীতে সবকিছু, বিশেষ করে জীবন আছে এমন সবকিছু, দেখলে দেখে মনে হয় যেন তাদেরকে কেউ না কেউ ডিজাইন বা পরিকল্পনা করে বানিয়েছে। যদি তাদের আসলেই পরিকল্পনা না করা হয়ে থাকে, এমন কোনো কিছুই কিন্তু আমাদের দেখে মনে হয় না তা পরিকল্পনা করা হয়েছে , সেই কারণে অবশ্যই কোনো ডিজাইনার বা পরিকল্পকের অস্তিত্ব আছে এবং আমরা তাকে বলি

ঈশ্বর (৩)। আকোয়াইনাস নিজেই একটি তীরের নিশানার দিকে ধাবমান হবার রূপক ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু মনে হয় আধুনিক তাপ-সন্ধানী বিমান-বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র তার উদ্দেশ্যের সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো।

'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন', তার এই একটি মাত্র যুক্তি যা আজও হরহামেশাই ব্যবহৃত হচ্ছে। এবং অনেকের কাছে এটি চূড়ান্ত 'নকডাউন' বা তর্ক-জয় করা যুক্তির মত। কেমব্রিজে আন্ডারগ্রাজুয়েট ছাত্র থাকাকালীন তরুণ চার্লস ডারউইনকেও (৪) একসময় এই যুক্তিটি আকর্ষণ করেছিল, যখন তিনি উইলিয়াম পেইলির (৫) 'ন্যাচারাল থিওলজি' বইটি পড়েছিলেন। পেইলির জন্য দুর্ভাগ্য, কারণ পরবর্তীতে পরিণত বয়সের ডারউইনই তার যুক্তিগুলোই সব বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। চার্লস ডারউইনের এই 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন' বা ডিজাইন থেকে নেয়া যুক্তিকে অযৌক্তিক প্রমাণ করে ধরাশায়ী করার উদাহরণটি ছাড়া সম্ভবত বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কোনো যুক্তি দ্বারা লোকপ্রিয় বিশ্বাসের এমন ভয়াবহ পরাজয়ের মত আর কোনো নজির নেই। খুবই অপ্রত্যাশিত ছিল ব্যাপারটা। ডারউইনের কল্যাণে, এই উক্তিটি আর সত্য নয় যে, আমরা এমন কিছু জানি না, যা ডিজাইন বা পরিকল্পনা করা হয়েছে, যদি না আসলেই তাদের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন সৃষ্টি করতে পারে অসাধারণ ডিজাইন সমতূল্য উদাহরণ, কল্পনাতীত জটিলতা আর বিস্ময়কর সূক্ষ্মতা। এবং এই সব বিখ্যাত সিউডো-ডিজাইনের (বা আপাত দৃষ্টিতে ডিজাইন মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সুপরিকল্পিত কোনো ডিজাইন নয়) তালিকায় আছে স্নায়ুতন্ত্র, যে তন্ত্রের সামান্য কিছু অর্জনের মধ্যে যেমন আছে গোল সিকিং (কোনো উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নির্ভর) আচরণ, যা এমনকি ক্ষুদ্রতম পতঙ্গের মধ্যে, মনে হতে পারে, সাধারণ লক্ষ্যকে নিশানা করে যাওয়া কোনো তীর অপেক্ষা আরো উন্নত জটিল তাপের উৎস খোজা (হিট সিকিং) ক্ষেপণাস্ত্রের মত। চতুর্থ অধ্যায়ে আমি আবারো এই আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইনে ফিরে আসবো।

অনটোলজিক্যাল (৬) যুক্তি এবং অন্যান্য এ প্রাইওরি বা পূর্ববর্তী জ্ঞান নির্ভর যুক্তিসমুহ (৭):

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত যুক্তিগুলো দুটো প্রধান ক্যাটেগরীতে ভাগ করা যায়, এ প্রাইওরি (a priori) এবং এ পোস্টেরিওরি (a posteriori) । টমাস আকোয়াইনাসের পাঁচটি যুক্তি যেমন, এ পোস্টেরিওরি (যে জ্ঞানের উৎস কোনো প্রাকধারণার উপর নয়, বরং অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষা নির্ভর) , কারণ তাদের ভিত্তি পৃথিবী নানা বিষয় সম্বন্ধে সরাসরি পর্যবেক্ষণ; এ প্রাইওরি (যা অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন, পূর্ববর্তী কোনো জ্ঞান নির্ভর) যুক্তিগুলোর মধ্যে বিখ্যাত, যেগুলো নির্ভর করে আছে আর্মচেয়ারে বসে যুক্তি প্রদান করার প্রক্রিয়ার উপর, সেটি হলো 'অনটোলজিক্যাল' আর্গুমেন্ট, যা প্রস্তাব করেছিলেন ১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে ক্যান্টারবেরীর সেইন্ট আনসেল্ম (৮), এবং তারপর এটাকেই

নানাভাবে বর্ণনা করেছেন পরবর্তীতে অগণিত দার্শনিকরা। আনসেল্মের যুক্তির একটি অদ্ভুত ব্যপার হলো, এটি মূলত মানুষের প্রতি নির্দেশিত নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি (আপনি ভাবতেই পারেন এমন কোনো একটি সত্তা যিনি কিনা প্রার্থনা শোনার ক্ষমতা রাখেন, নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাকে বিশ্বাস করানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না)।

আনসেল্ম বলেছিলেন, এমন একটি সত্তার অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব, যার চেয়ে মহান আর কোনো কিছুই ভাবা যায় না। এমনকি একজন নিরীশ্বরবাদীও এই ধরনের সর্বোচ্চ কোনো সত্তার কথা ভাবতে পারবেন, যদিও তিনি তার অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না বাস্তব পৃথিবীতে। কিন্তু যুক্তিটা এরপর এভাবে মোড় নেয়.. কোনো একটি সত্তা যার আদৌ কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই, এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে, সেটি চূড়ান্ত বা চরমতম নিখুঁত হবার গুণাবলী সম্পন্ন হতে পারেনা। সুতরাং আমরা এখানে একটি অসঙ্গতি বা পরস্পরবিরোধীতা দেখতে পাচ্ছি এবং ....এভাবে ব্যাস হয়ে গেল.. ছু মন্তর ছু - ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে!

আমি বরং এই শিশুতোষ যুক্তিটাকে উপযুক্ত ভাষায় - তা হলো শিশুদের খেলার মাঠের ভাষাতে - অনুবাদ করি:

> ‘তোমার সাথে আমি বাজি রাখছি, আমি প্রমাণ করতে পারবো যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে’।
> ‘আমিও বাজি রাখতে পারি যে, তুমি পারবে না’।
> ‘ঠিক আছে, তাহলে, এমন কিছু একটা কল্পনা করো, যা সবচেয়ে বেশি নিখুঁত,
> নিখুঁত, নিখুঁত, যতটা সম্ভব নিখুঁত কোনো কিছুকে ভাবা যেতে পারে’।
> ‘ঠিক আছে, ভাবলাম, এরপর’?
> ‘এখন বলো তো, এই যে সবচেয়ে নিখুঁত নিখুঁত নিখুঁত যে জিনিসটা তুমি ভেবেছো তা কি সত্যি? বাস্তবে কি তার কোনো অস্তিত্ব আছে’?
> ‘না, নেই, এর অস্তিত্ব আছে শুধু আমার মনে’।
> ‘কিন্তু এটা যদি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এমন কিছু হতো, তাহলে এটা আরো বেশি নিখুঁততর হতো, কারণ সত্যি সত্যি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এমন কিছুর অবশ্যই কল্পনার কোনো তুচ্ছ জিনিসের চেয়ে আরো বেশি উত্তম হতে বাধ্য । সুতরাং আমি প্রমাণ করলাম যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে। নুর নুরনী নুর নুর (শিশুতোষ অর্থহীন শব্দমালা)।সব নাস্তিকরা আসলে বোকা’।

আমার কাল্পনিক এই গল্পে শিশু পণ্ডিতটি দিয়ে আমি জেনে শুনে ‘বোকা’ শব্দটি ব্যবহার করিয়েছি। আনসেল্ম নিজেই চৌদ্দ নং খ্রিস্টীয় ‘সামজের’ প্রথম অনুচ্ছেদের

উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, ‘বোকারাই তাদের অন্তরে উচ্চারণ করেছে যে, কোনো ঈশ্বর নেই’; এবং তিনি নিরীশ্বরবাদীদেরকে নির্বোধ (ল্যাটিন ভাষায় ইনসিপিয়েন্স) বলে সম্বোধন করার সাহস দেখিয়েছিলেন:

> এভাবে এমনকি কোনো নির্বোধও বিশ্বাস করে যে, নিদেনপক্ষে এমন কোনো কিছু যা আমাদের বোধের জগতে বাস করে, অন্ততপক্ষে যার তুলনায় আরো বেশি মহান কোনো কিছুকেই ভাবা সম্ভব নয়। কারণ যখনই সে এটি শুনতে পারে, তখনই সে তা বুঝতে পারে। আর যেটা বোঝা সম্ভব হয়েছে, তা কেবল বোঝার ক্ষেত্রেই অস্তিত্বশীল। এবং নিশ্চিৎভাবে এমন কোনো কিছু, যার চেয়ে আর মহান কিছু ভাবা সম্ভব নয়, তা শুধু আমাদের বোঝার জগতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা। কারণ ধরা যাক এটি শুধু আমাদের বোধের জগতে বাস করে তাহলে বাস্তবে এর অস্তিত্ব ধারণা করা সম্ভব, যা আরো মহত্ত্বর।

এভাবে কোনো শব্দমালাকে কৌশলে ব্যবহার করে বা ‘লোগোম্যাশিষ্ট’ ছলচাতুরীর মাধ্যমে এই ধরনের বিশাল উপসংহারের দাবী কেউ করতে পারে, এই বিষয়টি আমাকে প্রথমত নান্দনিক দিক থেকে আহত করে। সুতরাং আমি অবশ্যই ’নির্বোধ’ শব্দটির অযথা ব্যবহার করা থেকে সতর্ক থাকবো। উল্লেখযোগ্যভাবে বার্ট্রান্ড রাসেল (অবশ্যই নির্বোধ নন) কিন্তু বলেছিলেন, ‘ভুলটা ঠিক কোথায় আছে সেটা খুঁজে বের করার চেয়ে এই যুক্তিটি (অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট) যে অবশ্যই ভুল এই সিদ্ধান্তে কিন্তু অপেক্ষাকৃত সহজেই পৌছানো যায়’; রাসেল নিজেই, তার তরুণ বয়সে, অল্পসময়ের জন্য এই যুক্তিটি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন:

> আমার মনে আছে সেই বিশেষ মুহূর্তটার কথা; ১৮৯৪ সালের একদিন, ট্রিনিটি লেন দিয়ে যখন হাটছিলাম আমি তখন হঠাৎ করে এক ঝলকের জন্য যেন দেখতে পেলাম (কিংবা আমার মনে হয়েছিল দেখেছিলাম) যে অনটোলজিক্যাল যুক্তি সঠিক। আমি বের হয়েছিলাম এক টিন তামাক কেনার জন্য; এবং ফেরার পথে আমি হঠাৎ করে সেটা উপরের দিকে ছুড়ে দিয়ে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম: গ্রেট স্কট...অনটোলজিক্যাল যুক্তিটিতো সঠিক।

কিন্তু আমি ভাবছি, রাসেল এমন কিছু কেন বলেননি: গ্রেট স্কট, অনটোলজিক্যাল আর্গুমেন্টটি মনে হচ্ছে সম্ভবত সঠিক হতে পারে। কিন্তু ব্যপারটা একটু বেশি সহজ হয়ে গেল না যে, মহাবিশ্ব সম্বন্ধে এমন বিশাল একটি সত্য শুধুমাত্র এই ধরনের কোনো শব্দের খেলা থেকে কি আসতে পারে ? আমি বরং এর অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করি, আপাতদৃষ্টিতে যেটা আপার্তবৈপরীত যেমন, জেনোর প্যারাডক্স (৯)। গ্রিকদের বেশ

কষ্ট হয়েছে জেনোর প্যারাডক্সে দাবী করা 'প্রমাণ', যে অ্যাকিলিস কখনোই কচ্ছপটিকে দৌড়ে ধরতে পারবে না, এই বিষয়টির আসল রহস্যটা বুঝতে। কিন্তু তাদের যথেষ্ট বোধশক্তি ছিল এর থেকে সেই উপসংহারটি না মেনে নিতে, যে অ্যাকিলিস আসলেই কচ্ছপটি ধরতে পারবে না। বরং তারা এর নাম দিয়েছিল 'প্যারাডক্স', এবং এর একটি ব্যাখ্যা দেবার জন্য তারা পরবর্তী প্রজন্মের গণিতজ্ঞদের জন্যে অপেক্ষা করেছিল। রাসেল নিজেও, অবশ্য, যে-কোনো কারো চেয়ে কোনো অংশেই কম যোগ্য ছিলেন না যে বুঝতে, কেন তামাকের টিনটি খুশিতে উপরে ছুড়ে মারা উচিত হবে না, অ্যাকিলিস কচ্ছপটি ধরতে পারবে না সেই আনন্দে? তিনি কেন সেন্ট অ্যানসেল্ম এর যুক্তির ক্ষেত্রে একই সাবধানতা অবলম্বন করেননি? আমার মনে হয়, রাসেল ছিলেন অতিমাত্রার পক্ষপাতহীন একজন নিরীশ্বরবাদী, মোহভঙ্গের জন্য অতি উৎসাহী ছিলেন, যদি তার জন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন হয়ে থাকে (১০) । অথবা হয়তো এর উত্তর আছে রাসেলের ১৯৪৬ সালে নিজের একটি লেখায় 'অনটোলজিক্যাল' যুক্তিটিকে অসার প্রমাণ করার বহুদিন পরে:

> আসল প্রশ্নটি হলো, এমন কিছু কি আছে যা আমরা চিন্তা করতে পারি, এবং সেটি, শুধুমাত্র আমরা যে সেটি চিন্তা করতে পারছি, সেই সত্যের উপর ভিত্তি করে, আমাদের চিন্তার বাইরে তার অস্তিত্ব আছে বলে দেখাতে পারি? যে-কোনো দার্শনিক হয়তো হ্যাঁ বলতে চাইবেন, কারণ দার্শনিকদের কাজ পৃথিবী সম্বন্ধে কোনো কিছু বোঝা, তার চিন্তার মাধ্যমে, কোনো কিছু পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে নয়। যদি হ্যাঁ সঠিক উত্তর হয়ে থাকে, তাহলে বিশুদ্ধ চিন্তা আর অস্তিত্ব আছে এমন কিছুর মধ্যে একটা সেতুবন্ধন আছে। যদি না, তবে কোনো যোগসূত্র নেই।

আমার নিজের অনুভূতি,কিন্তু ঠিক এর বিপরীত, স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গভীর সন্দেহ হত যে, কোনো যুক্তি কিভাবে বাস্তব পৃথিবী থেকে আহরিত সামান্যতম কোনো উপাত্ত ছাড়াই এই ধরনের একটি উপসংহারে পৌঁছাতে পারে। হয়তো এই বিষয়টি ইঙ্গিত করছে, আমি দার্শনিক না বরং একজন বিজ্ঞানী। বহু শতাব্দী ধরে দার্শনিকরা অনটোলজিক্যাল যুক্তিটিকে এর পক্ষে এবং বিপক্ষে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক জে. এল. ম্যাকি (১১) এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছিলেন তার ' দ্য মিরাকল অব থেইজম' বইটিতে। আমি প্রশংসা হিসেবে বলতে চাই, যখন আমি বলি যে আপনি কোনো একজন দার্শনিককে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে যিনি সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে কোনো কিছু উত্তর হিসেবে গ্রহন করেন না।

সবচেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে অনটোলজিক্যাল যুক্তিটিকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করার কৃতিত্ব দেয়া হয়, দুইজন দার্শনিককে : ডেভিড হিউম (১২) এবং ইমানুয়েল কান্ট (১৩); কান্ট আনসেল্মের যুক্তির চালাকির ফাঁদটি শনাক্ত করেছিলেন, অনেকটা কোনো জাদুকরের কাপড়ের ভাজে রাখা লুকিয়ে রাখা কার্ডের মতন। আনসেল্মের এই যুক্তিটির সবচেয়ে পিচ্ছিল অংশটি কান্টের মতে এর পিচ্ছিল প্রাক-ধারণাটি: যে 'অস্তিত্ব' অনস্তিত্ব অপেক্ষা বেশি 'পারফেক্ট' বা 'নিঁখুত'। যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক নরমান ম্যালকম (১৪) বিষয়টি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে: যে মতবাদ দাবী করছে অস্তিত্ব হলো ত্রুটিহীন, তা আসলেই খুব বেশি মাত্রায় অদ্ভুত, যেমন আপনি যদি বলেন, যে আমার ভবিষ্যৎ বাড়িটি অপেক্ষাকৃত বেশি ভালো হবে যদি সেটি ইনসুলেটেড বা আন্তরিত না হবার চেয়ে বরং ইনসুলেটেড হয়, এর একটি অর্থ হয় এবং বাক্যটি সত্যতাও বহন করে; কিন্তু এর কি অর্থ হতে পারে, যদি বলা হয়, এটি একটি ভালো বাসা হবে, যদি এর অস্তিত্ব থাকে, কোনো অস্তিত্ব না থাকার চেয়ে?(১৫)।অষ্ট্রেলিয়ীয় দার্শনিক ডগলাস গাসকিঙ্গ (১৬), আনসেল্মের যুক্তিটা নিয়ে প্রহসনের একটি প্যারোডি তৈরি করেছিলেন, যিনি বিষয়টি অবশ্য তার কোনো লেখায় লিপিবদ্ধ করেননি, তবে কুইন্সল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম গ্রে (১৮) সেটিকে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এভাবে (আনসেল্মের সমসাময়িক গাউনিলো (১৮) একই রকম একটি 'রিডাকটিও' বা তার যুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছিলেন):

১. এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, কল্পনাতীতভাবে অসাধারণ বিস্ময়কর একটি অর্জন।
২. আর কোনো একটি অর্জনের গুণগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (ক) এর অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং (খ) এর স্রষ্টার যোগ্যতা বা ক্ষমতার একটি যৌথ ফসল।
৩. স্রষ্টার অক্ষমতা (বা প্রতিবন্ধিতা) যত বেশি হবে, ততই আকর্ষণীয় হবে সেই অর্জন।
৪. একজন স্রষ্টার জন্য সবচেয়ে বড় অক্ষমতা (বা প্রতিবন্ধিতা) হবে তার অস্তিত্বহীনতা।
৫. সুতরাং আমরা যদি ভাবি যে এই মহাবিশ্ব একজন অস্তিত্বশীল সৃষ্টিকর্তারই সৃষ্টি, আমরা সেই ক্ষেত্রে আরো মহান একটি সত্তার কথা কল্পনা করতে পারি, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তার নিজের কোনো অস্তিত্ব না রেখেই।
৬. সুতরাং অস্তিত্ব আছে এমন কোনো স্রষ্টা অবশ্যই সবচেয়ে মহান হতে পারে না, যার চেয়ে আর মহান কিছুই ভাবা সম্ভব না কারণ আরো বেশি শক্তিশালী এবং অবিশ্বাস্য স্রষ্টা হবে সেই ঈশ্বর, যার কোনো অস্তিত্ব নেই।
অতএব...
৭. ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।

বলাবাহুল্য যে গাসকিঙ্গ কিন্তু আসলে প্রমাণ করেননি যে, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই। একই ভাবে আনসেল্মও প্রমাণ করতে পারেননি তার কোনো অস্তিত্ব আছে। পার্থক্য শুধু একটা, গাসকিঙ্গ বিষয়টি নিয়ে মজা করেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা নেই এই প্রশ্নটি যথেষ্ট বিশাল এবং শুধুমাত্র 'দ্বান্দ্বিক ছলচাতুরী' দিয়ে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে না। এবং আমি মনে করিনা ত্রুটিহীনতার সূচক হিসাবে অস্তিত্বের পিচ্ছিল ব্যবহার এই যুক্তির সবচেয়ে খারাপ অংশ। আমার ঠিক বিস্তারিত মনে নেই কিন্তু একবার ধর্মতাত্ত্বিক এবং দার্শনিকদের একটা সমাবেশে তাদের খানিকটা ঠাট্টা করেছিলাম, অনটোলজিক্যাল যুক্তি ব্যবহার করে শুকররাও উড়তে পারে তা প্রমাণ করে দেখিয়ে। তাদের মনে হয়েছিল, আমাকে ভুল প্রমাণ করতে তারা মোডাল লজিকের(১৯) আশ্রয় নিতে পারেন।

ঈশ্বরের সপক্ষে প্রস্তাবিত অন্যান্য সব এ প্রাইওরি যুক্তির মতোই, অনটোলজিক্যাল যুক্তি আমাকে আলডস হাক্সলির (২০) 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' বইয়ের এর সেই বৃদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে একটি গাণিতিক প্রমাণ আবিষ্কার করার দাবী করেছিলেন:

> আপনারা তো সেই সূত্র জানেন, শূন্যের মান যদি m হয় তাহলে তা অসীমের সমান, যেখানে m হচ্ছে যে কোনো ধনাত্মক একটি সংখ্যা। বেশ, আমরা এই সমীকরণটিকে আরেকটু সরল করি না কেন, সমীকরণের দুই পাশে শূন্য দিয়ে গুণ করে। সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন m যা অসীম এবং শূন্যের গুনফলের সমান। বা বলা যায়, একটি ধণাত্মক সংখ্যা অসীম এবং শূন্যের গুণফলের সমান। সেটা কি প্রমাণ করেনা একেবারে শূন্য থেকে কোনো অসীম শক্তিমান এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারেন? তাই কি প্রমাণ হচ্ছে না?

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, দিদোরো (২১) এনলাইটেন্টমেন্ট যুগের বিশ্বকোষ রচয়িতা এবং সুইস গণিতজ্ঞ ওয়লা (লিওনহার্ড ওয়ালার/ওয়লা) (২২) বিখ্যাত কাহিনী আদৌ ঘটেছিল কিনা সন্দেহ আছে। তবে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, রুশ সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট, তাদের দুজনের মধ্যে একটি বিতর্কের আয়োজন করেছিলেন, যেখানে ধার্মিক ওয়লা নিরীশ্বরবাদী দিদোরোকে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে তার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন এভাবে: '(a+bn)/n =x সুতরাং ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, উত্তর দিন'! এই পুরাণ বা কাহিনীর মূল বিষয়টা হলো দিদোরো যেহেতু গণিতজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং সংশয় নিয়ে তিনি এই বিতর্কে আর অগ্রসর হননি। তবে বি. এইচ. ব্রাউন অ্যামেরিক্যান ম্যাথমেটিক্যাল মান্থলি (১৯৪২) পত্রিকায় উল্লেখ করেছিলেন, দিদোরো আসলে একজন বেশ দক্ষ গণিতজ্ঞ ছিলেন, এবং ওয়লার এই ধরনের যুক্তিতে সহজে ধরাশায়ী হবার মত মানুষ তিনি ছিলেন না, ওয়লা যা করেছিলেন তা সম্ভবত বলা যায় 'ব্লাইন্ডিং

উইথ সায়েন্স' থেকে যুক্তি (এখানে গণিত) বা ভ্রান্ত কোনো যুক্তির সাথে কারিগরী কিছু শব্দ ব্যবহার করে প্রতিপক্ষকে সংশয়গ্রস্ত করা, কারণ তারা সেই কারিগরী শব্দগুলো বুঝবেন না; ডেভিড মিলস, তার 'অ্যাথিস্ট ইউনিভার্স' বইয়ে একজন ধর্মীয় সংগঠনের মুখপাত্রের সাথে তার রেডিও সাক্ষাৎকারের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন: যেখানে সেই ধর্মীয় মুখপাত্রটি ভর ও শক্তির অবিনশ্বরতার সূত্র বা 'ল অব কনজারভেশন অব মাস-এনার্জি' ব্যবহার করেছিলেন একটা অদ্ভুতভাবে অকার্যকর বিজ্ঞানের অন্ধ ধারণার যুক্তি প্রয়োগের কৌশল হিসাবে: যেহেতু আমরা সবাই বস্তু আর শক্তি দিয়ে তৈরি, এই বৈজ্ঞানিক মৌলিক নীতিটি কি অনন্ত জীবনের প্রতি বিশ্বাসকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয় না? আমি যেভাবে এর উত্তর দিতাম মিলস তার চেয়ে অনেক ভদ্র ভাবে এবং ধৈর্য সহকারে এর উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ এই সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী যা বলছিলেন, বোধগম্য ইংরেজীতে এর অনুবাদ করলে দাড়ায় যে, আমরা যখন মৃত্যুবরণ করবো, আমাদের শরীরের একটি পরমাণুও (এবং কোনো শক্তিও না) হারিয়ে যায় না। সেকারণে আমরা অমর'।

এমনকি আমিও, আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন ছেলেমানুষী খেয়ালী ভাবনার মুখোমুখি হইনি। আমি যদিও আরো বিস্ময়কর সব প্রমাণ হিসাবে দাবী করা যুক্তিগুলো দেখেছি, যা সংগৃহীত আছে 'গডলেস গিক' (২৩) নামের একটি ওয়েবসাইটে। যেখানে অত্যন্ত মজার একটি তালিকা আছে যার নাম 'তিনশোর বেশি প্রমাণ যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে'। এখানে সেই তালিকা থেকে খুবই হাস্যকর আধা ডজন প্রমাণের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উল্লেখ করা হলো, শুরু হয়েছে প্রমাণ নং ৩৬ দিয়ে:

> ৩৬. অসম্পূর্ণ ধ্বংস বা ইনকমপ্লিট ডিভাসস্টেশন থেকে যুক্তি: একটি প্লেন দুর্ঘটনা করার পর ১৪৩ জন বিমান আরোহী এবং বিমানের সব কর্মী নিহত হন, কিন্তু একটি মাত্র শিশু বেঁচে যায়, যদিও তৃতীয় ডিগ্রির পোড়া নিয়ে, সুতরাং ঈশ্বর আছেন।
>
> ৩৭. সম্ভাব্য সব পৃথিবী বা পসিবল ওয়ার্ল্ডস থেকে যুক্তি: যদি সব কিছু ভিন্ন হতো তবে সব কিছুই ভিন্ন হতো; সেটা ভালো হতো না। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।
>
> ৩৮. তীব্র ইচ্ছা শক্তি বা শিয়ার উইল থেকে যুক্তি: আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি! আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি! আমি করি, আমি করি, আমি করি। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি! সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৩৯. অবিশ্বাস থেকে যুক্তি: বিশ্বের অধিকাংশ মানুষই খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করেন না, সেটাই শয়তানের ইচ্ছা। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৪০.মৃত্যু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি: 'ক' নামক ব্যক্তি নিরীশ্বরবাদী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি তার ভুল বুঝতে পেরেছেন। সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

৪১. ইমোশনাল ব্ল্যাকমেইল থেকে যুক্তি: ঈশ্বর আপনাকে ভালবাসেন। আপনি কিভাবে তাকে বিশ্বাস করতে না পারার মত এত নির্মম হতে পারলেন? সুতরাং ঈশ্বর আছেন।

সৌন্দর্য থেকে নেয়া যুক্তি

কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করা অ্যালডস হাক্সলির উপন্যাসটিতে আরো একটি চরিত্র আছে, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে প্রমাণ দিয়েছেন গ্রামোফোনে বিটহোভেনের (২৪) স্ট্রিং কোয়ার্ট্রেট নং ১৫ ইন এ মাইনর (২৫) বাজিয়ে। শুনতে তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে না হলেও, এটি কিন্তু বেশ জনপ্রিয় একটি যুক্তি। আমি গোনা বন্ধ করে দিয়েছি যে কতবার আমি এই প্রসঙ্গে কম বেশি শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি: বেশ, কেমন করে আপনি শেক্সপিয়ারকে ব্যাখ্যা করবেন? (এই বাক্যে আপনি আপনার পছন্দ মত শুবার্ট (২৬), মাইকেলেঞ্জেলো (২৭) ইত্যাদি যে কাউকে দিয়ে শেক্সপিয়ারকে (২৮) প্রতিস্থাপিত করতে পারেন); এই যুক্তি একই রকমই থাকবে, আমার আর সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এর পেছনের মূল যুক্তিটা কখনো সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি, আপনি যত বেশি ভাববেন ততই আপনার কাছে এই যুক্তিটির অসারতা স্পষ্ট হবে। কোনো সন্দেহ নেই বিটহোভেনের শেষের কোয়ার্ট্রেটগুলো স্বর্গীয় সৌন্দর্য মণ্ডিত এবং শেকসপিয়ারের সনেটগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। ঈশ্বর থাকা বা না থাকার উপর তাদের অসাধারণ সৌন্দর্যের কোনোই হের ফের হয় না। অবশ্যই তারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে না; তারা বিটহোভেন এবং শেক্সপিয়ারের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। একজন বিখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক সম্ভবত বলেছিলেন, 'আপনি যদি শোনার জন্য মোজার্টকে পান তাহলে আপনার ঈশ্বরকে কেন প্রয়োজন? 'ডেজার্ট আইল্যান্ড ডিস্ক' নামের একটি বিবিসি রেডিও শোতে আমি একবার অতিথি হয়েছিলাম। সেখানে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যদি একাকী কখনো কোনো মরুদ্বীপে আটকা পড়ে যাই, তাহলে সেখানে নেবার জন্য আমাকে যে-কোনো আটটা রেকর্ড পছন্দ করতে হবে। আমার পছন্দের মধ্যে ছিল বাখের (২৯) 'সেইন্ট ম্যাথিউস প্যাশন' থেকে ''মাখে ডিশ মাইন হেরজে রাইন'' (হৃদয় আমার নিজেকে শুদ্ধ করো), আমার সাক্ষাৎকার গ্রহনকারী বুঝতে পারছিলেন না, আমি ধার্মিক না হয়েও কিভাবে ধর্মীয় সঙ্গীত পছন্দ করলাম। আপনি

হয়তো এই একই কথা বলতে পারেন, কেন আপনি 'উদারিং হাইটস' (৩০) পড়ে আনন্দ পাবেন, যখন কিনা ভালো করেই আপনার জানা আছে ক্যাথি কিংবা হিথক্লিফ চরিত্রগুলোর আসলেই বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই?

আমার মনে হয় আমি আরো একটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি এবং যেটা আসলে উল্লেখ করতেই হবে বিশেষ করে যখন ধর্মকে বিশেষ কোনো মহান সৃষ্টির জন্য কৃতিত্ব দেয়া হয়ে থাকে, যেমন, মাইকেলেঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেল (৩১) বা রাফায়েলের (৩২) অ্যানানসিয়েশন (৩৩)। এমন কি বড় মাপের শিল্পীদেরও জীবন বাঁচাতে আয় করতে হয়। যেখানে কাজ পাওয়া যায় সেখানেই তাদের সেই সুযোগ নিতে হয়। আমার কোনো সন্দেহ নেই মাইকেলেঞ্জেলো বা রাফায়েল দুজনেই খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী, আর তাদের সময় শুধুমাত্র এটাই হবার সুযোগই ছিল, কিন্তু সেই সত্যটা প্রায় কাকতালীয় একটা ব্যপার, কারণ সেই সময় বিপুল পরিমানে অর্থের মালিক ছিল শুধু চার্চই, তারাই তখন শিল্পের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল। যদি ইতিহাস অন্যরকম হত, তাহলে মাইকেলেঞ্জেলো বিশাল বিজ্ঞান যাদুঘরের ছাদে কাজ করার দায়িত্ব পেতেন; তিনি কি তখন তার সিস্টিন চ্যাপেলের মত অসাধারণ কাজ করতেন না সেখানে? দুঃখজনক ব্যপার আমরা কোনোদিনও বিটহোভেনের 'মেসোজোয়িক সিম্ফোনি' বা মোজার্টের (৩৪) 'দি এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স' নামে কোনো অপেরা শুনতে পারবো না। একইভাবে আমরা হাডিনের (৩৫) 'ইভোল্যুশন ওরাটোরিও' শোনা থেকেও বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু তিনি আমাদের তার 'ক্রিয়েশন' শোনা থেকে বঞ্চিত করেননি। এই যুক্তিটাকে অন্য দিক থেকে দেখলে কেমন হয়; আমার স্ত্রী যে ভয়ঙ্কর সম্ভাবনাটার কথা প্রস্তাব করেছিলেন তা হলো, যদি শেক্সপিয়ার চার্চের জন্য কাজ করতে বাধ্য হতেন ? আমরা নিঃসন্দেহে হ্যামলেট, কিং লিয়ার আর ম্যাকবেথ পেতাম না, আর এর বদলে কি পেতাম আমরা? স্বপ্ন তৈরি করতে পারে এমন কোনো কিছু, বেশ স্বপ্ন দেখে যান তাহলে।

মহান কোনো শিল্পকর্মকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত করে এমন যদি কোনো যৌক্তিক যুক্তি থাকে, সেটা কিন্তু এই যুক্তির প্রস্তাবকরা স্পষ্ট করে বলছেন না। শুধু ধরে নেয়া হয়েছে, এমনই হবার কথা বা স্বপ্রমাণিত কোনো একটি বিষয়। হয়তো এটা পরিকল্পনার থেকে নেয়া যুক্তির আরো একটি সংস্করণ হিসাবে দেখতে হবে: শুবার্টের সঙ্গীত প্রতিভার মস্তিষ্ক নিজেই একটি অসম্ভাব্যতার বিস্ময়, এমন কি মেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখের তুলনায়। অথবা আরো খারাপ অর্থে, এই যুক্তি কি তাহলে দাবী করছে, হয়তো প্রতিভাবানদের প্রতি ঈর্ষা - কি সাহস! অন্য একজন মানুষ কিভাবে এত সুন্দর সঙ্গীত/কবিতা/শিল্পকর্ম সৃষ্টি করছে, যখন আমি পারছি না? সুতরাং নিশ্চয়ই ঈশ্বরই এইসব করছেন।

ব্যক্তিগত 'অভিজ্ঞতা' থেকে নেয়া যুক্তি

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম একজন বুদ্ধিমান এবং বেশ প্রাপ্তবয়স্ক মানসিকতাসম্পন্ন সহপাঠী, যে আবার খুব ধার্মিকও, একবার স্কটল্যান্ডের কোনো একটি দ্বীপে ক্যাম্পিং করতে গিয়েছিলেন মাঝরাতে সে এবং তার বান্ধবী তাদের তাবুতে হঠাৎ করে ঘুম থেকে জেগে উঠেছিলে 'শয়তানের' কণ্ঠস্বর শুনে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী এটি ছিল একেবারে শয়তানের গলার আওয়াজ, এই বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই: সেই শব্দটি নিঃসন্দেহে ভীতিকারক কিংবা যাকে বলা যেতে ভয়ঙ্কর অশুভ; আমার এই বন্ধু কোনোদিনও ভুলতে পারেনি তার সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাটি। এবং এটাই অন্যতম একটি কারণ ছিল পরবর্তীতে তার পাদ্রী হিসাবে দীক্ষা নেবার জন্য। আমার তরুণ মনকে খুব নাড়া দিয়েছিল এই গল্পটি। পরে কোনো একসময় আমি এই গল্পটি প্রাণীবিজ্ঞানীদের একটি সমাবেশের এক পর্যায়ে, যখন তারা অক্সফোর্ডের রোজ অ্যাণ্ড ক্রাউন ইনে অবসর সময় কাটাচ্ছিলেন তখন তাদের বলেছিলাম। এদের মধ্যে দুজন ছিলেন অভিজ্ঞ পাখী বিশেষজ্ঞ, দুজনেই স্বশব্দে হেসে উঠেছিলেন কাহিনীটি শুনেই, এরপর আনন্দের সাথে তারা প্রায় একসাথে চিৎকার করে বলে উঠেন 'ম্যাঙ্কস শিয়ারওয়াটার' ! তাদের একজন আরো যোগ করেন, শয়তানের সাথে তুলনা করার মত চিৎকার এবং আওয়াজ এই প্রজাতির পাখিদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন ভাষায় এদের স্থানীয় নাম 'ডেভিল বার্ড' বা 'শয়তান পাখি'।

অনেক মানুষই ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কারণ তারা বিশ্বাস করেন তারা তার একটি ভিশন বা স্বর্গীয় দৃশ্য দেখেছেন বা কোনো ফেরেশতা বা দেবদূত বা নীল কাপড় পরা কুমারী মা মেরিকে তারা স্বচক্ষে দেখেছেন, অথবা ঈশ্বর তাদের মস্তিষ্কের মাধ্যমে তাদের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যুক্তি, তাদের শুধু কাছেই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য, যারা দাবী করেন এই ধরনের অভিজ্ঞতা তাদের আছে। কিন্তু বাকি সবার কাছে এবং যারা মনোবিজ্ঞান সমন্ধে কাজ চালানোর মত সামান্যতম জ্ঞান আছে, তাদের কাছে এই যুক্তির ভিত সঙ্গত কারণে আদৌ মজবুত নয়।

আপনি বলছেন ঈশ্বরের ব্যপারে আপনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে? বেশ, কিছু মানুষের গোলাপী হাতি দেখার অভিজ্ঞতা আছে, কিন্তু ব্যপারটা আপনার কাছে হয়তো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। পিটার সাটক্লিফ, কুখ্যাত ইয়র্কশায়ার রিপার বা সিরিয়াল খুনী, যে সুস্পষ্টভাবে দাবী করেছিল, তিনি নাকি যীশুর নির্দেশ শুনতে পেয়েছিলেন, মহিলাদের হত্যা করতে হবে, এবং এর জন্য তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। জর্জ ডাবলিউ বুশ (৩৭) দাবী করেছিলেন, ঈশ্বর তাকে ইরাক আক্রমণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন (ব্যপারটা দুঃখজনক যে, ঈশ্বর তাকে নিশ্চিৎ করে সেই দিব্যজ্ঞান দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন

যে, সেখানে তিনি তার তথাকথিত ‘উইপন অব মাস ডেস্ট্রাকশন’ খুঁজে পাবেন না)। মানসিক আশ্রমে অনেক ব্যক্তির দেখা মেলে যারা নিজেদের নেপোলিয়ন বা চার্লি চ্যাপলিন মনে করেন, কিংবা মনে করেন যে, সারা পৃথিবী তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, কিংবা তারা তাদের চিন্তা আরেক জনের মস্তিষ্কে সরাসরি সম্প্রচার করতে পারেন। আমরা তাদের কথা শুনি ঠিকই, কিন্তু গুরুত্ব সহকারে তাদের অন্তস্থল থেকে উদ্ভব হওয়া এই দাবীগুলোতে বিবেচনা করি না, কারণ এই ধরনের ধারণার সাথে খুব বেশি মানুষ সহমত পোষণ করেন না। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ব্যপারটা ভিন্ন কারণ এই ধরনের অভিজ্ঞতার দাবীদার মানুষের সংখ্যা অগণিত। সেই কারণেই বলা যায় স্যাম হ্যারিস (৩৮) মোটেও অতিমাত্রায় নিরাশাবাদী অবস্থান নেননি যখন তিনি তার “দি এন্ড অব ফেইথ” বইটিতে লিখেছিলেন:

> যারা এমন অনেক ধরনের বিশ্বাস ধারণ করেন যার কিনা কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই, সেই সব মানুষদের ডাকার জন্য আমাদের কাছে একটা নাম আছে, তাদের এই বিশ্বাস যখন খুব বেশি মাত্রায় সর্বব্যাপী প্রচলিত হয়, তখন আমরা তার নাম দেই ধর্মীয় বিশ্বাস, কিন্তু সেটি না হলে, এদের সম্ভাব্য নাম জোটে উন্মাদ, মানসিক রোগাক্রান্ত কিংবা বিভ্রান্ত, স্পষ্টতই সংখ্যার হিসাবে সাথে মানসিক সুস্থতার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট। এবং তারপরও এটি শুধু ইতিহাসের একটি দুর্ঘটনা, যে আমদের সমাজ এই বিশ্বাসটিকেই স্বাভাবিক মনে করে থাকে, যে মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আছে, যিনি আপনার সব চিন্তা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছেন। যদিও এটা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ বিশ্বাস করা, যে তিনি আপনার সাথে যোগাযোগ করছেন, আপনার শোবার ঘরের জানালার কাঁচে বৃষ্টি ফোটার সাংকেতিক মোর্স কোড (৪০) ব্যবহার করে। এবং সেই কারণে যদিও ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সাধারণত উন্মাদ নয়, তবে তাদের মূল বিশ্বাসগুলো অবশ্যই সেই লক্ষণ বহন করছে।

হ্যালুসিনেশন বা বিভ্রমের ব্যপারটায় আমি পরে অধ্যায় দশে আবার আলোচনা করবো। মানুষের মস্তিষ্ক অতি অসাধারণ সিমুলেশন বা কাল্পনিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার কোনো সফটওয়্যারের মত প্রোগ্রাম চালাতে পারদর্শী। আমাদের চোখ কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ককে কোনো বিশ্বস্ত হুবহু আলোকচিত্র দেখায় না, যা আসলে চোখের সামনে বিদ্যমান বা সঠিক সেই চলমান দৃশ্য, যা ঠিক সেই সময় ঘটছে। আমাদের মস্তিষ্ক যেটা করে তা হলো বিরামহীনভাবে সে হালনাগাদ বা আপডেটেড মডেল তৈরি করতে থাকে। অপটিক স্নায়ুপথে আসা অসংখ্য উপাত্ত আর সংকেত দিয়ে এটি হালনাগাদ হতে থাকে, তবে তা ঠিকই দৃশ্যের একটি মডেল তৈরি করে নেয়। অপটিক্যাল ইল্যুশন বা দৃষ্টি বিভ্রম আমাদের জন্য এই বিষয়টির একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত, প্রধান ধরনের দৃষ্টি বিভ্রম বা ইল্যুশন - যার একটি বিশেষ উদাহরণ হচ্ছে ‘নেকার কিউব’ - উদ্ভব হবার

কারণ ইন্দ্রিয়গুলো থেকে যে উপাত্ত আমাদের মস্তিষ্ক ক্রমাগত পাচ্ছে তা আসলে বাস্তবতার দুটি আলাদা বা সমন্বয়যোগ্য বিকল্প মডেল (৪১) । মস্তিষ্কের পক্ষে এই দুটির মধ্যে কোনো একটিকে বেছে নেবার জন্য স্বতন্ত্র কোনো ভিত্তি নেই, তাই সে পালাক্রমে এদের বেছে নেয়। আমরাও একটি অন্তস্থ মডেল থেকে অন্য মডেলের মধ্যে ধারাবাহিক পালা পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করি। যে ছবির দিকে তাকিয়ে আছি বলে মনে করি আক্ষরিক অর্থে সেটি উলটে যায় এবং সম্পূর্ণ অন্যকিছুতে রূপান্তরিত হয়।

চেহারা এবং কণ্ঠস্বর তৈরি করার সবচেয়ে বেশি দক্ষ মস্তিষ্কের সিমুলেশন সফটওয়্যার। আমার জানালার ওপরে একটা আইনস্টাইনের প্লাষ্টিক মুখোশ আছে; সামনে থেকে দেখলে, এটি একটি ঘন পূর্ণ মুখের মত মনে হয়, এটি বিস্ময়কর কিছু নয়,তবে যেটা বিস্ময়কর সেটা হল পেছন থেকে, ফাকা জায়গার দিক থেকে, তখনো এটিকে ঘন বা সলিড একটি মুখের মতো মনে হয়, এবং জিনিসটি বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের দেখার দৃষ্টিকোণ আর বোঝার অনুভূতিটিও আসলে খুব অদ্ভুত। দর্শক যখনই নড়াচড়া করছে মুখটাও যেন তা অনুসরণ করছে এবং এটি কিন্তু সেই দুর্বল, তেমন বেশি বিশ্বাসযোগ্য নয় এমন অর্থে, মোনা লিসার চোখ আপনাকে অনুসরণ করছে বিষয়টির মতোই। এই ফাঁপা মুখোশটা যেন আসলেই তাকাচ্ছে, নাড়াচাড়া করছে। যারা এই দৃষ্টিবিভ্রমটি আগে দেখেননি তারা বেশ চমকে যাবেন । আরো বিস্ময়কর, যদি মুখোশটিকে একটি ধীরে ঘূর্ণায়মান কোনো টেবিলের উপর রাখা যায়, দেখা যায় এটি ঠিক সঠিক দিকেই তাকিয়ে আছে, যখন আপনি এটি ঘন বা পূর্ণ দিক থেকে দেখছেন, কিন্তু এটা যেন বিপরীত দিকে তাকায় যখন ফাঁপা দিকটা দৃষ্টির সামনে আসে। এর ফলাফলটা হচ্ছে যখন আপনি একপাশ থেকে অন্য পাশে দেখবেন এই দিক পরিবর্তন হচ্ছে, যেদিকটা আসছে অর্থাৎ কামিং সাইডটি, যে দিকটা চলে যাচ্ছে বা গোয়িং সাইডকে মনে হচ্ছে যে গ্রাস করে ফেলছে। এটি একটি অসাধারণ দৃষ্টি বিভ্রম, একটু ঝামেলা সহ্য করে দেখার যোগ্য এমন একটি বিষয়। কখনো কখনো আপনি বিস্ময়করভাবে কাছাকাছি চলে আসতে পারেন ফাঁপা মুখের কাছে এবং তারপরও আপনি দেখতে ব্যর্থ হতে পারেন, এটা আসলেই ফাঁপা কিনা সেটি বুঝতে। যখন আপনি দেখতে পাবেন, আবার তখন আরেকটি পরিবর্তন বা মডেলটি উলটে যায়, যা আবার পরিবর্তনযোগ্য।

কেন এটা হচ্ছে? এই মুখোশ তৈরি করার মধ্যে কিন্তু কোনো কৌশল নেই। যে-কোনো ফাঁপা মুখোশই এই কাজটা করতে পারে। যে দেখবে তার মস্তিষ্কেই এই বিষয়টি ঘটে। ভিতরের সিমুলেটিং সফটওয়্যার যা উপাত্ত পায়, যা ইঙ্গিত করে হয়তো সেটি একটি মুখের অস্তিত্ব, হয়তো এক জোড়া চোখ ছাড়া আর বেশি কিছু নয়, নাক বা একটি মুখ মোটামুটি যে জায়গায় তাদের থাকার কথা সেখানে। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন কিছু ইঙ্গিত আর তথ্য পাবার পর মস্তিষ্ক বাকি কাজটা নিজেই করে নেয়। মুখের সিমুলেশন সফটওয়্যার কাজ শুরু করে এবং মুখের একটি সম্পূর্ণ সলিড বা ঘন মডেল তৈরি করে,

এমনকি যখন প্রকৃত বাস্তবতা যা চোখকে দেখাচ্ছে তা হলো মুখের ফাঁপা একটি মডেল। এই ভুল দিকে আবর্তনের বিভ্রমটা আসে কারণ (কঠিন বিষয়টি, কিন্তু আপনি যদি সতর্ক হয়ে ব্যপারটি নিয়ে চিন্তা করেন আপনি এটা নিশ্চিৎ করতে পারবেন) বিপরীতমূখী আবর্তন হচ্ছে চোখের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তগুলোর কোনো একটা বোধগম্য অর্থ করার একমাত্র উপায়, যখন ফাকা মুখোশ আবর্তনের সময় যে দেখছে তা মনে হবে ঘন (৪২)। অনেকটা ঘুর্ণায়মান রাডার ডিশের সৃষ্ট মায়ার মত, যা আপনি এয়ারপোর্টে দেখে থাকবেন, মাঝে মাঝে যতক্ষণ না মস্তিষ্কের রাডার ডিশটির সঠিক মডেল বদলে নেয়, আপনি একটি ভুল মডেলকে ঘুরতে দেখবেন ভুল দিকে তবে খুব আজব একটা বিভ্রান্তির সাথে।

আমি এটা উল্লেখ করলাম আমাদের মস্তিষ্কের শক্তিশালী সিমুলেটিং সফটওয়্যার সম্বন্ধে একটি ধারণা দেবার জন্য। এটি বিশেষভাবে দক্ষ, ভিশন (কোনো দৃশ্য) বা ভিজিটেশন বা কারো আবির্ভাব সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাসযোগ্য সত্যিকার একটি ধারণা দিতে। কোনো অশরীরি আত্মা বা ফেরেশতা বা ভার্জিন মেরির একটি কাল্পনিক উপস্থিতিকে বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে সিমুলেট করার ক্ষমতা আমাদের মস্তিষ্কের এই ধরনের কোনো উন্নত সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে ছেলে খেলা মাত্র। একই জিনিসই আবার ঘটে মাঝে মাঝে কিছু শোনার ক্ষেত্রে। আমরা যখন কিছু শুনি এটি হুবহু অবিকলভাবে আমাদের অডিটরি বা শ্রবণের স্নায়ু বহন করে না, এই স্নায়ুটি শব্দ সংকেতগুলো আমাদের মস্তিস্কে পৌঁছে দেয় না কোনো হাই-ফিডেলিটি ‘ব্যাঙ্গ অ্যান্ড ওলুফমসেনের’ সাউন্ড সিস্টেমের মত। কোনো কিছু দেখার মতোই আমাদের মস্তিষ্ক শব্দের মডেল তৈরি করে, অবিরত আসতে থাকা অডিটরি স্নায়ু সংকেতের মাধ্যমে। সেই কারণে যখন কোনো ট্রাম্পেট বাস্টের শব্দ শুনি আমরা একটি নোট হিসাবে, বিশুদ্ধ কোনো যৌগিক টোনের হারমনিকস হিসাবে নয়, যা এর সাথে একটা চাপা গর্জন যোগ করে দেয়। কোনো ক্ল্যারিনেট যদি সেই একই নোট বাজায় তাহলে শুনতে কাঠের খানিকটা ভরাট আওয়াজ এবং একটি ওবোর আওয়াজ আরো সূতীক্ষ্ম কারণ বিভিন্ন নোটদের একটি হারমোনিকসের ভারসাম্য এটা নির্ধারণ করে। আপনি যদি সতর্কতার সাথে সাউন্ড সিনথেসাইজারের প্রত্যেকটা হারমনিকস আলাদা আলাদাভাবে বাজান, আপনার মস্তিষ্ক কিছুক্ষণের জন্য এই শব্দগুলোকে বিশুদ্ধ টোনের একটি সংমিশ্রণ হিসাবে শুনতে পায়, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের মস্তিষ্কের সিমুলেশন সফটওয়্যার ব্যপারটা ‘ধরতে’ পারে এবং এরপর থেকে আমরা শুধুমাত্র একটি বিশুদ্ধ নোট, হয় ট্রাম্পেট বা ওবো, যা-ই হোক না কেন শুনতে পাই। আমাদের কথা বলার সময় উচ্চারিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে এভাবে তৈরি হয়, এবং সুতরাং অন্য একটি পর্যায়ে, আরো উচু অর্ডারের ফোনেম এবং শব্দগুলো তৈরি হয়।

শৈশবে, একবার আমি ‘ভুতের গলার আওয়াজ শুনেছিলাম: একটা পুরুষ কণ্ঠ, বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, মনে হচ্ছে কিছু পড়ছে বা প্রার্থনা করছে; আমি প্রায় পুরোটাই, যদিও সবটা না, কি বলছিল, সেই শব্দগুলো বুঝতে পারছিলাম, আমার কাছে মনে হয়েছিল যা খুব স্বতন্ত্র একটি গম্ভীর কণ্ঠস্বর পুরোনো বাড়ীর যাজকদের ঘর বা প্রিস্ট হোল সম্বন্ধে আমাকে নানা গল্প বলা হয়েছিল। এবং এ জন্য আমি কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলাম; কিন্তু তারপরও কৌতূহলবশত শব্দটার উৎস খোজার জন্য আমি বিছানা থেকে উঠেছিলাম; যতই কাছে যাচ্ছিলাম, শব্দটার তীব্রতা বাড়ছিল এবং তারপর হঠাৎ করেই আমার মাথার মধ্যে এটি উল্টে গেল, আমি শব্দের আসল উৎসটা স্পষ্টভাবে বোঝার মত একটি অবস্থানে, এর যথেষ্ট কাছাকাছি এসে দাড়ালাম; দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে বাতাস দ্রুত আসা যাওয়ার করার প্রক্রিয়ায় শব্দটি তৈরি হচ্ছিল, এবং এটি যে শব্দ তৈরি করছিল তা আমার মস্তিষ্কের সিম্যুলেশন সফটওয়্যারটি একটি মডেল তৈরি করে কোনো পুরুষের ভারট গলার কণ্ঠস্বরের কথামালায়। আমি যদি সহজে প্রভাবিত করা যায় এমন কোনো শিশু হতাম, তাহলে সম্ভবত অস্পষ্ট অবোধ্য কথা শোনার বদলে হয়তো আমি শুনতে পেতাম সুনির্দিষ্ট শব্দ এবং এমন কি বাক্যগুলো। আর একই সাথে আমি যদি সহজে প্রভাবিত হবার মত, এবং ধর্মীয়ভাবে প্রতিপালিত হতাম, আমি ভাবতাম, বাতাস কি বলছে।

অন্য আরেকটি ঘটনায়, প্রায় একই বয়স তখন আমার, আমি একটা দানবীয় আকারের মুখকে দেখেছিলাম, অবর্ণনীয় অশুভদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে, সমুদ্রের পাশে একটা সাধারণ গ্রামের খুবই সাধারণ বাসার জানালা দিয়ে। একটু ভয় নিয়ে আমি সেই মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকি, যতক্ষণ না পর্যন্ত খুব কাছাকাছি পৌঁছে বুঝতে পারি, আসলে এটি কি: কাকতলীয়ভাবে জানালার পর্দাগুলো এলোমেলোভাবে ভাজ হয়ে একটা অস্পষ্ট মুখের মত সজ্জা তৈরি করেছে। এই মুখ এবং তার অশুভ বলয়, একটি ভীত শিশুর মস্তিষ্ক কল্পনা করে তৈরি করে নিয়েছে। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সালে সন্ত্রাসী হামলায় বিধ্বস্ত টুইন টাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসা ধোয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অনেক ধার্মিকই খোদ শয়তানের চেহারা আদল দেখতে পেয়েছিলেন: এই কুসংস্কারটি, যাকে উস্কে দিয়েছে একটি আলোকচিত্র, যা ইন্টারনেটে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কোনো মডেল তৈরি করার ব্যপারে মানুষের মস্তিষ্ক অত্যন্ত দক্ষ। আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি, তখন একে বলি স্বপ্ন আর যখন জেগে থাকি, আমরা বলি কল্পনা বা যখন তারা খুবই বেশি স্পষ্ট, তখন বলি হ্যালুসিনেশন (ভ্রম); দশম অধ্যায়ে আমরা দেখবো, শিশুরা যাদের কাল্পনিক বন্ধু আছে, তারা তাদের স্পষ্টই দেখতে পায়, যেন আসলেই বাস্তব তাদের অস্তিত্ব আছে। আমরা যদি সরল বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে থাকি, আমরা হ্যালুসিনেশন বা জেগে দেখা স্বপ্ন বা লুসিড স্বপ্নগুলোকে শনাক্ত করতে পারিনা, বিষয়টা আসলে কি, বরং আমরা দাবী করি আমরা কোনো ভুত দেখলাম বা শুনলাম বা কোনো ফেরেশতা,

বা ঈশ্বর; অথবা, আমাদের বয়স যদি অল্প হয় এবং আমরা মহিলা ও ক্যাথলিক হই, সেক্ষেত্রে কুমারী মাতা মেরিকে। এই ধরনের কোনো ভিশন বা আপাত প্রকাশ অবশ্যই ভুত, ফেরেশতা, ঈশ্বর কিংবা কুমারীদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য শক্ত কোনো কারণ নয়। এর উপর আবার আছে সম্মিলিতভাবে বহু মানুষের এই সব দৃষ্টি বিভ্রম দেখার কাহিনী। পর্তুগালের ফাতিমায় ১৯১৭ সালে প্রায় সত্তর হাজার তীর্থ যাত্রী যেমন দাবী করে তারা সূর্য আকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, উপস্থিত মানুষের জমায়েত এর উপর ভেঙ্গে পড়ছে দেখেছিল, এই গণ বিভ্রমটাকে বাতিল করা স্পষ্টতই কঠিন (৪৩) । খুব সহজ না কিন্তু ব্যাখ্যা করা কেমন করে সত্তর হাজার মানুষ একই হ্যালুসিনেশন বা দৃষ্টি বিভ্রমের স্বীকার হয়েছিলেন। কিন্তু এটা যে ঘটেছে সেটা মেনে নেয়া আরো কঠিন যে ফাতিমার বাইরে সারা পৃথিবীর দৃষ্টির অগোচরে এমন কিছু আসলেই ঘটেছিল। শুধু দেখাই না, সৌরজগতের সেই ভয়াবহ ধ্বংস অনুভব করা, যার প্রবল ত্বরণ গতি যথেষ্ট সবকিছুরই মহাশূন্যে ছিটকে পড়ার জন্য। ডেভিড হিউমের (৪৪) অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার সংক্রান্ত নিরীক্ষাটির কথা মনে পড়ে যেতে বাধ্য: ‘কোনো ধরনের সাক্ষ্যপ্রমাণই একটি অলৌকিক, দৈব বা অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ট না, যদি না সেই সাক্ষ্যপ্রমাণ এমন কোনো প্রকৃতির হয়ে থাকে যে এর মিথ্যাভাষণ এটি যে সত্যকে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে তারচেয়েও আরো বেশি অতিপ্রাকৃত হয়’।

অসম্ভব মনে হতে পারে, সত্তর হাজার মানুষ একই সাথে বিভ্রান্ত হয়েছিল বা তারা একই সাথে নিজেদের মধ্যে যোগসাজশ করে এমন একটি গণমিথ্যার সৃষ্টি করতে পারে। সত্তর হাজার মানুষ সূর্যকে নাচতে দেখেছে এই বিষয়টি হয়তো ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে ভুল করেছে। অথবা তারা সবাই একই সাথে মরীচিকা দেখেছে (তাদের সবাইকে একসাথে সুর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে অনুরোধ করা হয়েছিল, চোখের জন্য বিষয়টি নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো অভিজ্ঞতা ছিল না); কিন্তু এই সব প্রায় অসম্ভব ব্যাপারগুলো অনেক বেশি সম্ভাব্য এর বিকল্প ঘটনাটি থেকে: পৃথিবী হঠাৎ করে তার কক্ষপথে একদিকে বেঁকে যাওয়া এবং সৌরজগত ধ্বংস হবার ঘটনাটি, যা ফাতিমার বাইরে কেউ লক্ষ করেনি। আমি বোঝাতে চাইছি, পর্তুগাল তো পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো দেশ নয় (৪৫)। আসলেই ঈশ্বর এবং ধর্মীয় অলৌকিক ঘটনাগুলোর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার প্রয়োজন আর নেই। আপনার যদি এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা থেকে থাকে, আপনি সম্ভবত সেটি সত্য একটি ঘটনা এমন বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারেন। কিন্তু আপনার আশা করা উচিত না যে, বাকি আমরা সবাই আপনার কথাই সত্য বলে ধরে নেব, বিশেষ করে যদি আমাদের মস্তিষ্ক এবং এর শক্তিশালী কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে সামান্যতম কিছু ধারণাও থেকে থাকে।

ধর্মগ্রন্থ থেকে নেয়া যুক্তি

এখনো বেশ কিছু মানুষ আছেন যারা ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে প্ররোচিত হন। খুব প্রচলিত যে যুক্তি, যার উৎস অনেকেই, যাদের মধ্যে অন্যতম সি. এস. লুইস (৪৬) (যদিও তার এই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত ছিল), যা দাবী করে, যেহেতু যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবী করেছেন, তিনি অবশ্যই হয় সঠিক, অথবা একজন মিথ্যাবাদী পাগল: পাগল, খারাপ লোক বা ঈশ্বর; বা খানিকটা স্থুল অনুপ্রাস, উন্মাদ, মিথ্যাবাদী বা প্রভু (লুন্যাটিক, লায়ার বা লর্ড); যীশু যে এই ধরনের কোনো স্বর্গীয় পদমর্যাদা দাবী করেছিলেন তার সপক্ষে ঐতিহাসিক প্রমাণ খুব সামান্য। কিন্তু যদি যীশু যে এমন দাবী করেছিলেন তার প্রমাণ থাকে, আর সেই প্রমাণ জোরালো হয়, তাসত্ত্বেও প্রস্তাবটি সংক্রান্ত এই ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব (তিনটি অপছন্দনীয় বক্তব্যর মধ্যে একটিকে বেছে নেবার দ্বন্দ্ব) হাস্যকরভাবে অপ্রতুল হতো। চতুর্থ সম্ভাবনা, যা এত স্পষ্ট যে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, তা হলো আসলেই যীশু ভুল করেছিলেন। সেই সাথে বহু মানুষও। যা-ই হোক না কেন আমি আগেও বলেছি, ঐতিহাসিকভাবে এমন কোনো ভালো প্রমাণ নেই যে যীশু আসলেই নিজেকে কখনো স্বর্গীয় ভেবেছিলেন।

কোনো একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে, এই বিষয়টাই সেই সব মানুষদেরকে সহজেই প্ররোচিত করার জন্য যথেষ্ট, যারা কিনা সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নের সাথে খুব একটা অভ্যস্ত না যেমন: কে লিখেছেন এটি এবং কখন? কেমন করে তারা জেনেছিলেন কি লিখতে হবে? তারা কি, তাদের সময়ে যা সত্য বোঝাতে চেয়েছেন, আর আমাদের সময়ে আমরা সেই সত্যটি নিয়ে যা ভাবছি, তারা কি আসলেই ঠিক সেটাই বলতে চেয়েছিলেন? তারা কি পক্ষপাতিত্ব মূক্ত পর্যবেক্ষক ছিলেন? বা তাদের নিজস্ব কিছু এজেণ্ডা বা উদ্দেশ্য ছিল , যা তাদের লেখার প্রকৃতি নির্ধারণ করেছিল? উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিজ্ঞ ধর্মতাত্ত্বিকরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ জড়ো করেছেন যে গসপেল আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয় সেই সময়ের প্রকৃত বাস্তবতায় ইতিহাসে আসলেই কি ঘটেছিল তার বর্ণনা হিসাবে। সবকিছু লেখা হয়েছে যীশু মারা যাবার বহুদিন পরে এবং এমনকি পলের এপিষ্টল (৪৭) রচনার পরে, যেখানে আদৌ যীশুর জীবনে ঘটা পরবর্তীতে প্রস্তাবিত তথাকথিত ঘটনাগুলোর প্রায় কোনোটাই উল্লেখ করা হয়নি। এই সবগুলোরই অনুলিপি, পুনঅনুলিপি হয়েছে বহুবার 'চাইনিজ হুইজপারস প্রজন্মের মত' (৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ভ্রমপ্রবণ অনুলিপিকারকদের মাধ্যমে, যাদের ভুল না হওয়াটাই অস্বাভাবিক, আর তাদেরও নিজেদের ধর্মীয় কর্মসূচি আর উদ্দেশ্য আছে।

ধর্মীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অতিরঞ্জনের উপযুক্ত একটি উদাহরণ হলো বেথলেহেমে যীশুর হৃদয় স্পর্শ করা জন্মকাহিনী, এরপরই নিরীহ মানুষদের উপর পরিচালিত হেরডের ভয়াবহ নৃশংস গণহত্যার কাহিনী। যখন যীশুর মৃত্যুর বহু বছর পরে গসপেলগুলো সংকলিত হয়েছিল, তার জন্ম আসলে কোথায় হয়েছে সেটি কেউই জানতেন না। কিন্তু

ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত একটি ভবিষ্যদ্বাণীর (মিখা ৫:২) উপর নির্ভর করে ইহুদী ধর্মমতাবলম্বীরা ধারণা করতেন তাদের বহু প্রতীক্ষিত মেসাইয়া বা ত্রাণকর্তার জন্ম হবে বেথলেহেমে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে, জনের (৪৮) গসপেল (৪৯) সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে, যীশুর অনুসারীরা অবাক হয়েছিলেন, তিনি বেথলেহেমে জন্ম নেননি: ‘অন্যরা বলেন, এই হচ্ছে যীশু খ্রিস্ট। কিন্তু কেউ কেউ বলেছিল, খ্রিস্টের কি গ্যালিলি থেকে আসার কথা? ধর্মগ্রন্থ কি বলেনি, ডেভিডের বীজেই খ্রিস্টের জন্ম হবে, বেথলেহেম শহরে, যেখানে ডেভিড বসবাস করতেন’।

ম্যাথিউ (৫০) এবং ল্যুক (৫১) যীশুর জন্ম সমস্যাটার সমাধান করেছিলেন ভিন্ন ভাবে, সর্বোপরি যীশুর যে অবশ্যই বেথলেহেমে জন্ম হয়েছে এই সিদ্ধান্ত নেবার মাধ্যমে; কিন্তু তারা দুজনই তাদের কাহিনীতে তাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন ভিন্ন ভিন্ন পথে। ম্যাথিউ যেমন মেরি এবং জোসেফকে বেথলেহেমের বাসিন্দা বলেই উল্লেখ করেছেন, যীশুর জন্মের পর শুধু মাত্র তারা নাজারেথে বসবাস শুরু করেছিলেন এই বলে, সেটা মিসর থেকে ফেরার পর, যেখানে তারা রাজা হেরডের নিরীহ মানুষদের গণহত্যা থেকে বাঁচার জন্য পালিয়েছিলেন। কিন্তু ল্যুক, এর ঠিক বিপরীত, অর্থাৎ যীশুর জন্মের আগেই মেরি এবং জোসেফের বসবাস ছিল নাজারেথে, সুতরাং তিনি কিভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী মেলানোর জন্য তাদের সেই বিশেষ মুহূর্তে বেথলেহেমে নিয়ে আসবেন? এজন্য ল্যুক বললেন যে, যে সময় সিরিয়ার গভর্নর ছিলেন কিরিনিয়াস, রোম সম্রাট সিজার অগাস্টাস কর আদায়ের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যব্যাপী একটি আদম শুমারি পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। তার নির্দেশ ছিল প্রত্যেককে তাদের জন্ম যে শহরে শুমারির জন্য সেখানে ফিরে যেতে হবে। জোসেফ ছিল আবার ডেভিডের বংশধারার, এবং সেই কারণে তাকে ডেভিডের সেই শহরে যেতে হবে, যার নাম বেথলেহেম। এই সমাধানটি অবশ্যই মনে হয়েছিল সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, এ. এন. উইলসন (৫২) তার ‘জিসাস’ এবং রবিন লেইন ফক্স (৫৩) তার ‘দি আনঅথোরাইজড ভার্শন’ (এছাড়া আরো অনেক সূত্রে বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছে, ডেভিড, যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে, তিনি বেঁচে ছিলেন মেরি এবং জোসেফের জীবনকালের প্রায় ১০০০ বছর আগে। এছাড়া রোমানদের কি এমন কারণ ছিল, যার জন্য জোসেফকে তার হাজার বছর আগে দূর সম্পর্কের কোনো পূর্বপুরুষের শহরে আসতে হবে, এছাড়া তারা এমনটা চাইবেই বা কেন? অনেকটা যেমন শুমারির ফর্মে আমার ক্ষেত্রে প্রয়োজন আছে নির্দিষ্ট করে বলা, অ্যাশবি-দ্য-লা-জোউখ হচ্ছে আমার জন্ম শহর, যদি আমি আমার পূর্বপুরুষের প্রাচীন ইতিহাস ঘেটে আমি সেইনোর দ্য ডাকেইন অবধি যেতে পারি, যিনি সেই শহরে উইলিয়াম দ্য কনকেররের সাথে এসেছিলেন এবং সেখানে বসতি গড়েছিলেন।

এছাড়াও ল্যুক যাচাই না করে সেই সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে সময়ের হিসাবেও গোলমাল করেছেন, যার সত্যতা ঐতিহাসিকরা স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। গর্ভনর কিরিনিয়াসের সময় সত্যি একটি শুমারি হয়েছিল - একটি স্থানীয় শুমারি, সিজার অগাষ্টাসের ডিক্রি করা সম্রাজ্যব্যাপী কোনো শুমারি ছিল না সেটি, ল্যুকের বর্ণিত সময়েও সেটি হয়নি, শুমারিটি হয়েছিল আরো অনেক পরে, ৬ খ্রিস্টাব্দে, হেরোডের মৃত্যুর বহুদিন পর। লেন ফক্স উপসংহার টানেন এই বলে যে, ল্যুকের গল্প ঐতিহাসিকভাবেই অসম্ভব এবং অন্তর্গতভাবেই অসংলগ্ন, কিন্তু তিনি ল্যুকের সমস্যা এবং ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত মিখার ভবিষ্যদ্ববাণী পূর্ণ করার ঐকান্তিক ইচ্ছার সাথে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

'ফ্রি ইনকোয়ারি' পত্রিকাটির ডিসেম্বর, ২০০৪ সংখ্যায় এই অসাধারণ প্রত্রিকাটির সম্পাদক টম ফ্লিন এই যুক্তি ও প্রতিযুক্তি এবং লোকপ্রিয় ক্রিসমাস সংক্রান্ত কাহিনীর কিছু অসংলগ্ন অংশ নিয়ে লেখা বেশ কিছু নিবন্ধ সংকলন করেছিলেন; ফ্লিন নিজেও অনেক অসঙ্গতির তালিকা করেছিলেন ম্যাথিউ এবং ল্যুকের মধ্যে, শুধুমাত্র যে দুইজন ইভানজেলিস্ট বা ধর্মপ্রচারক, যারা শুধু যীশুর জন্ম নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন (৫৪) । রবার্ট গিলুলি দেখিয়েছেন, কেমন করে যীশু কিংবদন্তীর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো (৫৫): পূর্ব দিকের নক্ষত্র, কুমারী মায়ের সন্তান প্রসব, সদ্যজাত শিশুর প্রতি রাজাবাদশাদের উপঢৌকন এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি, পুনরুত্থান বা রেজারেকশন, স্বর্গে আরোহন, একেবারে প্রত্যেকটি বিষয় ধার করা হয়েছে ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং নিকট প্রাচ্যে প্রচলিত অন্যান্য নানা ধর্ম থেকে। ফ্লিনের প্রস্তাব ছিল, ইহুদী পাঠকদের সুবিধার লক্ষ্যে মেসিয়ানিক প্রফেসি বা ঈশ্বরের দুতের আবির্ভাব সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার লক্ষ্যে ম্যাথিউর (ডেভিডের বংশধর, বেথলেহেম এ জন্ম) ইচ্ছা মুখোমুখি হয় ইহুদী নয় এমন সমাজের জন্য খ্রিস্ট ধর্মকে সংগতিপূর্ণ করে তোলার লক্ষ্যে ল্যুকের প্রচেষ্টার সাথে, সেই কারণে প্যাগান হেলেনিষ্টিক (৫৬) ধর্মগুলোর নানা পছন্দের বিষয়গুলো (কুমারী মায়ের সন্তান প্রসব, রাজাদের ভক্তি প্রদর্শন ইত্যাদি) যোগ করা হয়; পরিণতিতে অসঙ্গতিগুলো খুবই সুস্পষ্ট, কিন্তু বিশ্বাসীরা এইসব চিরন্তনভাবে উপেক্ষা করতে কখনো ভুল করেননি।

শিক্ষিত আর বোধসম্পন্ন খ্রিস্টানদের অবশ্য বিষয়টি বোঝার জন্য আইরা গ্রেসউইনের (৫৭) মত কারো প্রয়োজন নেই: 'বাইবেলে আমরা যা পড়তে বাধ্য হই/সেটা আসলে সেই করম নয়', কিন্তু বহু স্বল্প জানা খ্রিস্টানরা আছেন, যারা বাইবেলের কথা আক্ষরিকার্থেই চূড়ান্ত সত্য মনে করেন- যারা বাইবেলকে এত গুরুত্বের সাথে গ্রহন করেন যে তাদের কাছে ইতিহাসের আক্ষরিক এবং নির্ভুল দলিল হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠিত, এবং সেই কারণে এটি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি সমর্থনের মূল ভিত্তি রচনা করেছে। এই মানুষগুলো কি কখনো এই বইটা খুলে পড়েনি যা তারা আক্ষরিক

অর্থেই পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করেন? কেনই বা তারা লক্ষ করেননি এই সব চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর মত সুস্পষ্ট সব অসঙ্গতিগুলো? যারা এটিকে আক্ষরিকার্থে সত্য বলে বিশ্বাস করেন তাদের কি চিন্তা হয় না যে, ম্যাথিউ জোসেফের বংশসূত্র রাজা ডেভিডের বংশের সাথে জোড়া লাগিয়েছেন মধ্যবর্তী ২৮টি প্রজন্ম দিয়ে, যে কাজটি ল্যুক করেছেন ৪১টি প্রজন্ম দিয়ে? আরো খারাপ ব্যপার হলো, এই দুই তালিকায় নামের প্রায় কোনো পুনরাবৃত্তি নেই! কিন্তু যা-ই হোক না কেন, যদি যীশুর জন্ম আসলেই কুমারী মায়ের গর্ভে হয়, সেখানে জোসেফের বংশপরিচয়ই তো অপ্রাসঙ্গিক, এবং সেটা, যীশুর সপক্ষে, ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই ভবিষ্যদ্বাণী, ডেভিডের বংশে মেসিয়ার জন্ম হবে, সে বিষয়টি তো আর পূর্ণ করে না।

বার্ট এহরম্যান (৫৭), যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বাইবেল-বিশেষজ্ঞ, যার, 'দ্য স্টোরি বিহাইন্ড হু চেঞ্জড দি নিউ টেস্টামেন্ট অ্যান্ড হোয়াই' শিরোনামে একটি বইয়ে উন্মোচন করেছেন, কি বিশাল অনিশ্চয়তা নিউ টেস্টামেন্টের মূল বিষয়টিকে অস্পষ্ট করে রেখেছে (৫৮)। এই বইয়ের ভূমিকায় অধ্যাপক এহরম্যান আবেগের সাথে বাইবেল বিশ্বাসী মৌলবাদী থেকে চিন্তাশীল সন্দেহবাদীতে রূপান্তরিত হবার ব্যক্তিগত শিক্ষামূলক যাত্রার কথা উল্লেখ করেন। যে যাত্রা পরিচালিত হয়েছিল ধর্মগ্রন্থের সুবিশাল ভুলগুলো অনুধাবন করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি যখন আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পদমর্যাদায় ক্রমশ উপরে উঠছিলেন একেবারে তলানির মুডি বাইবেল ইন্সস্টিটিউট থেকে হুইটন কলেজের মাধ্যমে (এই তালিকার একটু উপরে, কিন্তু তারপরও বিলি গ্রাহামের (৫৯) আলমা ম্যাটার) সেখান থেকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে, দুনিয়ার সেরাদের শীর্ষে, প্রতিটা ধাপে তাকে সতর্কবাণী শুনতে হয়েছে, ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীলতার ধারায় তার গোঁড়া মৌলবাদী খ্রিস্ট ধর্মীয় মানসিকতা বজায় রাখা সহজ হবে না। এবং সেটাই সত্য প্রমাণিত হলো, এবং আমরা তার পাঠকরা এর উপকার পেলাম। বাইবেল সমালোচনায় অন্যান্য যুগান্তকারী বইয়ের মধ্যে আছে রবিন লেন ফক্সের 'দি আনঅথোরাইজড ভার্শন', যার কথা এর আগেই বলেছি। এবং জাক বার্লিনারব্লোর (৬০) 'দ্য সেকুলার বাইবেল: হোয়াই ননবিলিভারস মাস্ট টেক রেলিজিয়ন সিরিয়াসলি'।

চারটি গসপেল যাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্যানন বা স্বীকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর জন্য মূলত আনুমানিকভাবে অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়া বাছাই করা হয়েছিল বেশ অনেকগুলো, কমপক্ষে ডজনখানেক নমুনা থেকে, যেমন, গসপেল অব টমাস, পিটার, নিকোডেমাস, ফিলিপ, বার্থোলোমিউ এবং মেরি ম্যাগডালেন ইত্যাদি (৬১)। এই সব গসপেলদের কয়েকটি যেগুলো সেই সময় অ্যাপোক্রিফা হিসেবে পরিচিত ছিল (অর্থাৎ যেগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে প্রাতিষ্ঠানিক চার্চের সন্দেহ প্রকাশ করে), এই বাড়তি

গসপেলগুলোর কথাই টমাস জেফারসন উল্লেখ করেছিলেন, তার ভাইপোর কাছে লেখা একটি চিঠিতে:

> নিউ টেস্টামেন্ট বলার সময়, আমি ভুলে গেছি উল্লেখ করতে যে, খ্রিস্টের প্রত্যেকটি ইতিহাস পড়ে দেখা তোমার উচিত হবে। এমনকি সেই ইতিহাসগুলো, যেগুলো একটি কাউন্সিল অব একলেসিয়াসটিকের সদস্যরা আমাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে সিউডো-ইভানজেলিষ্ট বা মিথ্যা ধর্মপ্রচারণা হিসেবে চিহ্নিত করেছে, বাকিদের যেমন তারা চিহ্নিত করেছে ইভানজেলিস্ট হিসেবে; যেহেতু এই সব সিউডো-ইভানজেলিস্টদের গসপেল অন্য গসপেলগুলোর মত আমাদের একই মাত্রায় অনুপ্রাণিত করার দাবী জানায়, তাদের এই দাবীটি তোমার নিজস্ব যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে হবে, একলেসিয়াসটিক কাউন্সিলের সদস্যদের প্রদত্ত যুক্তি দিয়ে নয়।

ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা যে গসপেলগুলো বাতিল হয়েছে, তার কারণ সম্ভবত অন্য চারটি ক্যানোনিক্যাল বা চার্চের জন্য গ্রহনযোগ্য গসপেলের কাহিনীর তুলনায় সেখানে এমন কিছু কাহিনী আছে যা বিব্রতকরভাবে ব্যাখ্যার অযোগ্য। টমাসের গসপেলে যেমন, যীশুর শৈশবের অসংখ্য ঘটনার বিবরণ আছে, যেখানে শিশু যীশু তার জাদুকরী ক্ষমতাকে নানা দুষ্টামীতে অপব্যবহার করেছেন, যেমন, খেলার সাথীদের ছাগলে রূপান্তরিত করেছেন বা খেলাচ্ছলে কাদা মাটিকে চড়ুই পাখিতে রূপান্তরিত করেছেন, কিংবা তার বাবাকে কাঠের কাজে সাহায্য করেছে রহস্যজনকভাবে কাঠের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিয়ে (৬২)। বলা হয়েছে কেউ এই ধরনের মোটা দাগের অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করেন না, যেগুলো টমাসের গসপেলে আছে, কিন্তু চারটি ক্যানোনিক্যাল গসপেলকে বিশ্বাস করারও বিশেষ কোনো কারণ নেই। এগুলোর প্রত্যেকটির পদমর্যাদাই কিংবদন্তীর রূপকথার মত, রাজা আর্থার এবং তার রাউন্ড টেবিলের নাইটদের গল্পের মত সন্দেহজনক তথ্য দ্বারা পূর্ণ এই চারটি স্বীকৃত গসপেলের প্রত্যেকটির সিংহভাগ সংগৃহীত হয়েছে একটি সাধারণ উৎস থেকে, হয় মার্কের গসপেল বা প্রাচীন হারিয়ে যাওয়া কোনো কাজ যার সবচেয়ে আদি উত্তরসূরী ছিলেন মার্ক; কেউই জানেন না কারা ছিলেন সেই চার ধর্মপ্রচারক, তবে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কেউই যীশুর সাথে সাক্ষাৎ করেননি। অধিকাংশ বিষয় যা তারা লিখেছেন তা কোনো অর্থেই ইতিহাসের সত্যভাষণের সামান্যতম প্রচেষ্টা নয়, বরং যা শুধুমাত্র ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে ধার করে নতুন করে লেখা। কারণ গসপেল লেখকরা খুব ভক্তির সাথে বিশ্বাস করতেন যে, যীশুর জীবন যেন ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে মিলে যায়। এমন কি একটি ঐতিহাসিক কেসও তৈরি করা সম্ভব, যদিও অধিকাংশ মানুষ তা সমর্থন করবেন না, তাহলো, যীশু বলে আসলে কারো কোনো অস্তিত্ব কোনো দিন ছিল না, বেশ কয়েকজন সেটি ইতোমধ্যে প্রস্তাবও করেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম

যেমন, লন্ডন বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক জি. এ. ওয়েলস (৬৩) তার বেশ কিছু বইয়ে, যেমন ‘ডিড জিসাস এক্সিস্ট’?

যদিও যীশুর সম্ভবত অস্তিত্ব ছিল, কোনো সম্মানজনক বাইবেল বিশেষজ্ঞদের কেউই সাধারণত নিউ টেস্টামেন্ট (এবং অবশ্যই ওল্ড টেস্টামেন্ট) সংকলনটি ইতিহাসে আসলে কি ঘটেছিল তার বিশ্বাসযোগ্য কোনো রেকর্ড হিসাবে হিসাবে গ্রহন করেন না, এবং আমিও বাইবেলকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কোনো প্রমাণ হিসাবে আর আলোচনায় আনবো না। তার পূর্বসূরি জন অ্যাডামসকে লেখা চিঠিতে টমাস জেফারসনের দূরদৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য ‘একদিন আসবে যখন সর্ব শক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা কুমারী মাতার গর্ভে যীশুর রহস্যময় জন্ম কাহিনী, জুপিটারের মস্তিষ্কে মিনার্ভার সৃষ্টির মত রূপকথার সাথে একই শ্রেণীতে আলোচিত হবে’।

ড্যান ব্রাউনের (৬৪) উপন্যাস ‘দ্য ভিঞ্চি কোড’ এবং এর উপর আশ্রিত চলচ্চিত্রটি, চার্চ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে তুমূল বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের এই চলচ্চিত্রটি বয়কট করার জন্যও উৎসাহিত করা হয়েছিল, এমন কি যেখানে এটি প্রদর্শিত হয়েছিল সেখানে এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভও করা হয়েছে। পুরো ঘটনাটি, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক, বানানো, লেখকের কল্পনাপ্রসূত একটি কাহিনী। এই অর্থে, এটা ঠিক গসপেলের মতোই। দ্য ভিঞ্চি কোড এবং গসপেল এর মধ্যে পার্থক্য শুধু, গসপেলগুলো হচ্ছে প্রাচীন কাহিনী আর দ্য ভিঞ্চি কোড হচ্ছে একটি আধুনিক কাহিনী।

শ্রদ্ধেয় ধার্মিক বিজ্ঞানীদের থেকে আসা যুক্তি

‘বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে প্রখ্যাত মানুষদের বিশাল একটি অংশ খ্রিস্ট ধর্মে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু তারা বিষয়টি জনসমক্ষে লুকিয়ে রাখেন, কারণ তারা তাদের রোজগার হারাতে চান না’। - বার্ট্রান্ড রাসেল

নিউটন (৬৫) ধার্মিক ছিলেন, আপনি কে বলুন তো, নিজেকে নিউটন, গ্যালিলেও (৬৬), কেপলার (৬৭) ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদিদের চাইতেও নিজেকে কি বেশি উৎকৃষ্ট মনে করেন? যদি তাদের জন্য ঈশ্বর যথেষ্ট হতে পারে, আপনি নিজেকে ঠিক কি ভাবেন? - এমনিতেই এটি নিজেই যথেষ্ট পরিমাণ বাজে একটি যুক্তি, তেমন কোনো কিছুই আসে যায় না যদিও, তারপরও কোনো কোনো ধর্মবাদীরা এমন কি এর সাথে ডারউইনের (৬৮) নাম যুক্ত করেছেন, যার বিরুদ্ধে স্থায়ী এবং সহজে প্রমাণ করা সম্ভব এমন একটি মিথ্যা গুজব প্রচলিত আছে, মৃত্যুশয্যায় তিনি নকি ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। যখন থেকে এটি শুরু হয়েছিল তারপর থেকেই বিষয়টি বিরতিহীন ও নিয়মিতভাবেই দুর্গন্ধের মত ফিরে এসেছে (৬৯)। এই গুজবটির সূচনা হয়েছিল যখন জনৈক লেডি হোপ (৭০)

আবেগময় একটি গল্প বুনেছিলেন এভাবে: অসুস্থ ডারউইন সন্ধ্যার আলোয় বালিশে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন, নিউ টেস্টামেন্টের পাতা উল্টাচ্ছেন এবং স্বীকারোক্তি করছেন, বিবর্তন তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল। এই অংশে আমি মূলত বিজ্ঞানীদের উপর মনোযোগ দেব, যার কারণ হয়তো কল্পনা করা খুব বেশি কষ্টসাধ্য নয়, যারা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের ধর্মপ্রাণ হিসাবে জাহির করতে চান, তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীদের উদাহরণ দিতে পছন্দ করে থাকেন।

নিউটন সত্যিই নিজেকে ধার্মিক বলে দাবী করেছিলেন, আমার মনে হয়, উল্লেযোগ্যভাবে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সবাই সেটাই করেছিলেন। এর কারণ এই সময়ের পর বাধ্যতামূলকভাবে ধর্ম বিশ্বাস প্রকাশের উপর সামজিক এবং আইনগত চাপ, এর পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর তুলনায় বহুলাংশে শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং ধর্ম পরিত্যাগের সপক্ষে বৈজ্ঞানিক সমর্থনও ছিল অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। অবশ্যই এই সময়ের দুই দিকেই এর ব্যতিক্রম ছিল। এমনকি ডারউইনের আগেও, সবাই কিন্তু আস্তিক ছিলেন না, যেমন, জেমস হট (৭১) তার ‘টু থাইজ্যান্ড ইয়ারস অব ডিসবিলিফ: ফেমাস পিপল উইথ দা কারেজ টু ডাউট’ বইয়ে দেখিয়েছেন, এবং তেমনি অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডারউইনের পরেও তাদের ঈশ্বর বিশ্বাস থেকে সরে আসেননি। কারো পক্ষেই খ্রিস্টান হিসাবে মাইকেল ফ্যারাডের (৭২) ধর্মবিশ্বাসকে আন্তরিক না ভাবার কোনো অবকাশ নেই, এমনকি সেই সময়ের পরেও, যখন তিনি নিশ্চয়ই ডারউইনের কাজ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জানতেন। তিনি সান্ডেম্যানিয়ান ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন, যারা (অতীত অর্থে কারণ বর্তমানে তারা একরকম বিলুপ্ত) বাইবেলের আক্ষরিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন, এবং আচার অনুষ্ঠান করে তারা নতুন সদস্যদের পা ধুইয়ে দিতেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার জন্য লটারী করতেন। ১৮৬০ সালে ফ্যারাডে এই গোষ্ঠীর একজন গুরুজন বা এল্ডার নির্বাচিত হয়েছিলেন, যার এক বছর আগেই ‘অরিজিন অব স্পিসিস’ প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্যান্ডেম্যানিয়ান হিসাবে তিনি ১৮৬৭ সালে মারা যান। পরীক্ষক বিজ্ঞানী ফ্যারাডের তাত্ত্বিক অপর পক্ষ, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (৭৩), একই মাত্রায় নিবেদিত প্রাণ খ্রিস্টান ছিলেন। তেমনি ছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ পদার্থবিদ্যার আরেক স্তম্ভ উইলিয়াম থমসন (৭৪), লর্ড কেলভিন নামে যিনি সুপরিচিত। যিনি চেষ্টা করেছিলেন প্রমাণ করতে, যে সময়ের অভাবেই বিবর্তন সম্ভব নয়। এই মহান তাপগতিবিদ্যা বিশেষজ্ঞের পরিমিত ভুল সময়ের হিসাব অনুযায়ী, সূর্য হচ্ছে এক ধরনের আগুন, যা জ্বালানী পোড়াচ্ছে, যে জ্বালানী কয়েক শত মিলিয়ন বছরেই শেষ হয়ে যাবে, কয়েক হাজার মিলিয়ন বছর নয়। কেলভিনের পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে অবশ্যই কোনো ধারণা ছিল না। সন্তোষজনক ব্যপার হচ্ছে, ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের সভায়, সেই দ্বায়িত্ব পড়েছিল ডারউইনের দ্বিতীয় ছেলে, স্যার জর্জ ডারউইনের (৭৫) উপর, তার স্যার উপাধি না পাওয়া বাবার ধারণার সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে মাদাম কুরির রেডিয়াম আবিষ্কারের

বিষয়টি তখনো জীবিত লর্ড কেলভিনের পৃথিবীর অতিবাহিত সময় পরিমাপকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে, ক্রমশ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা, যারা নাকি ধর্ম বিশ্বাস প্রচার করেছেন, তাদের খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তারা একেবারে দুর্লভ তা কিন্তু না। আমার সন্দেহ সাম্প্রতিককালের বেশির ভাগ সে ধরনের বিজ্ঞানীরা আসলে আইনস্টাইনীয় অর্থেই কেবল ধার্মিক, যে প্রসঙ্গে আমি প্রথম অধ্যায়ে যুক্তি দিয়েছিলাম ধর্ম শব্দটির একটি অপব্যবহার হিসাবে। যাই হোক, অবশ্যই অনেক ভালো বিজ্ঞানীদের উদাহরণ আছে যারা আন্তরিকভাবেই প্রচলিত অর্থে ধার্মিক। সমসাময়িক ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনটি নাম প্রথমেই নজর কাড়ে, ডিকেন্সিয় উপন্যাসে বর্ণিত আইনজীবিদের কোনো ফার্মের উর্ধতন সহযোগীদের নামের সাথে পছন্দনীয় একটি সদৃশ্যতাসহ: পিকক (৭৬), স্ট্যানার্ড (৭৭) এবং পোলকিংহর্ন (৭৮) । এরা তিনজনই হয় টেম্পলটন পুরষ্কার জিতেছেন অথবা টেম্পলটন ফাউন্ডেশনের ট্রাষ্টি বোর্ডে আছেন। তাদের প্রত্যকের সাথে ব্যক্তিগত এবং জনসমক্ষে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা পরে আমি নিজেও বিস্মিত হয়েছি, বিস্ময়ের কারণ কিন্তু কোনো এক ধরনের মহাজাগতিক আইনপ্রণেতার উপর তাদের স্থাপিত বিশ্বাস নয়, বরং খ্রিস্ট ধর্মের নানা বিস্তারিত বিষয়গুলোর প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস পর্যবেক্ষণ করে: রেজারেকশন বা পুনরুত্থান, পাপের জন্য ক্ষমা ইত্যাদি নানা কিছু।

যুক্তরাষ্ট্রের এই ধরনের সমতূল্য কিছু উদাহরণ আছে, যেমন ফ্রান্সিস কলিন্স (৭৯), যিনি আনুষ্ঠানিক মানব জিনোম প্রকল্পের যুক্তরাষ্ট্র অংশের প্রশাসনিক প্রধান (৮০) । কিন্তু ব্রিটেনের মতোই, তারা দূর্লভ একটি ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত, এবং তারা তাদের সহকর্মী এবং অ্যাকাডেমিক সমাজে কৌতুকময় বিস্ময়ের কারণ। ১৯৯৬ সালে, কেমব্রিজে ক্লেয়ারে তার পুরোনো কলেজের বাগানে আমি আমার বন্ধু মানব জিনোম প্রকল্পের একজন প্রতিষ্ঠাতা প্রতিভা জিম ওয়াটসনের (৮১) সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম বিবিসি একটি প্রামাণ্য চিত্রের জন্য, যা আমি মূল জিনবিজ্ঞান বিষয়টির প্রতিষ্ঠাতা প্রতিভা হিসাবে চিহ্নিত গ্রেগর মেন্ডেলকে (৮১) নিয়ে নির্মাণ করেছিলাম। অবশ্যই মেন্ডেল ধার্মিক ছিলেন, অগাষ্টানিয়ান অর্ডারের একজন যাজক-সন্ন্যাসী, কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেটা উনবিংশ শতাব্দী, যখন তরুণ মেন্ডেলের জন্য তার বিজ্ঞান চর্চা অব্যাহত রাখতে ধর্মযাজক হওয়াই সহজতম উপায় ছিল। তার জন্য এটি ছিল গবেষণা অনুদান বা রিসার্চ গ্র্যান্টের সমতূল্য। আমি ওয়াটসনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কি অনেক ধর্ম বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের চেনেন কিনা? তার উত্তর ছিল: ‘প্রকৃত পক্ষে একজনও না, কদাচিৎ কারো কারো সাথে দেখা হয়েছে, আমি বিব্রত বোধ করেছি (হাসি), তুমি তো জানো, ব্যক্তিগত বা গুপ্তভাবে পাওয়া কোনো সত্যকে যারা মেনে নেয়, তাদের আমি বিশ্বাস করতে পারি না’। আনবিক জিনবিজ্ঞানে বৈপ্লবিক পরিবর্তনে ওয়াটসনের

সহপ্রতিষ্ঠাতা, ফ্রান্সিস ক্রিক (৮২) কেমব্রিজের চার্চিল কলেজে তার ফেলোশীপের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, যখন একজন দাতার অনুরোধের প্রেক্ষিতে কলেজটির কর্তৃপক্ষ একটি চ্যাপেল বানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ক্লেয়ারে ওয়াটসনের সাক্ষাৎকারের সময় আমি সচেতনভাবে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি এবং ক্রিকের থেকে ব্যাতিক্রম কিছু মানুষ কিন্তু বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে কোনো সংঘাত দেখেন না , কারণ তাদের দাবী বিজ্ঞান হচ্ছে কেমন করে কোনো কিছু কাজ করে এবং ধর্ম হচ্ছে এসব কিসের জন্য। ওয়াটসনের মন্তব্য: 'বেশ, আমি মনে করি না আমরা কোনো কিছুর জন্য সৃষ্ট, আমরা বিবর্তনের একটি ফলাফল মাত্র। আপনি বলতে পারেন, তাহলে তো আপনার জীবন নিশ্চয়ই ভীষণ হতাশার একটি বিষয়, যদি আপনার জীবনের কোনো উদ্দেশ্য না থাকে'। কিন্তু তখন আমি একটা ভালো দুপুরের খাওয়ার আশা করছিলাম। আমরা সেদিন চমৎকার একটি মধ্যাহ্ন ভোজনও করেছিলাম।

ধর্মীয় অ্যাপোলজিস্ট বা সমর্থনকারীদের সত্যিকার অর্থে একজন খাঁটি প্রখ্যাত ধার্মিক বিজ্ঞানীকে খুঁজে করে বের করার চেষ্টার মধ্যে হতাশার সুস্পষ্ট, যা আসলেই খালি কলসীর তলে হাতড়ানোর মত ফাকা আওয়াজ তৈরি করে। যে একমাত্র ওয়েবসাইট আমি খুঁজে পেয়েছি, যারা দাবী করে নোবেল জয়ী খ্রিস্টান বিজ্ঞানীদের তালিকা আছে বলে, তারা সেই তালিকায় কয়েক শত নোবেল জয়ী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছয় জনের নাম উল্লেখ করেছে। এই ছয়জনের মধ্যে আবার চারজন নোবেল পুরষ্কারই পাননি আদৌ; এবং অন্তত একজন, আমি নিশ্চিৎভাবে জানি, অবিশ্বাসী, যিনি চার্চে যান শুধুমাত্র সামাজিক কারণে। বেনজামিন বেইট-হালাহমির আরো বেশি পদ্ধতিগত গবেষণা বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী, এমন কি যারা সাহিত্যে নোবেল জিতেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমানে ধর্মবিশ্বাসহীনতার হার পদর্শন করেছিল। এবং তারা যে জনগোষ্ঠী থেকে এসেছেন যখন তার তুলনা করা হয়, প্রতীয়মান হয় যে এই অবিশ্বাসের হার সুস্পষ্টভাবেই অনেক বেশি (৮৩)। ১৯৯৮ সালে প্রথম সারির বৈজ্ঞানিক জার্নাল 'নেচারে' লারসন এবং হুইথাম তাদের একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন, যে সব আমেরিকার বিজ্ঞানীদেরকে তাদের সহকর্মীরা বিশেষভাবে প্রতিভাবান হিসাবে গণ্য করেছেন, এবং তাদের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত করেছেন (ব্রিটেনের ফেলো অব রয়্যাল সোসাইটির সমতূল্য),তাদের মধ্যে মাত্র ৭ শতাংশ বিজ্ঞানী ব্যক্তিগত ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাস করেন (৮৪)। এই বিশাল পরিমাণ নিরীশ্বরবাদীদের তুলনামূলক আধিক্যের প্রায় ঠিক বিপরীত চিত্রটা প্রকাশ পায় বৃহত্তর আমেরিকার জনগনের মধ্যে, যেখানে ৯০ শতাংশের অধিক মানুষ কোনো না কোনো একটি অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস করেন। এই সংখ্যাটি অবশ্য মাঝামাঝি, খানিকটা কম প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে, যারা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমীর সদস্য নন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের নমুনার মতোই ধর্ম বিশ্বাসীরা এখানেও সংখ্যালঘু, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম নাটকীয় পরিমাণে, প্রায় ৪০ শতাংশ। পুরোপুরিভাবে আমি যা

আশা করেছিলাম, যুক্তরাষ্টের বিজ্ঞানীরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের জনগন অপেক্ষা কম ধর্মপরায়ন। এবং সবচেয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা বাকি সবার চেয়ে কম ধার্মিক। লক্ষ করার মত বিষয় হচ্ছে, বৃহত্তর আমেরিকার জনগোষ্ঠীর ধার্মিকতার একেবারে বিপরীত অবস্থানে আছে যুক্তরাষ্টের বুদ্ধিজীবি সমাজের উপরের সারির নিরীশ্বরবাদীতা (৮৫) ।

একটা হালকা মজার ব্যপার হচ্ছে, প্রথম সারির সৃষ্টিতত্ত্ববাদী 'আনসারস ইন জেনেসিস' ওয়েবসাইটে লারসন এবং হুইথামের এই গবেষণাটি উল্লেখ করেছে, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের যে কিছু গলদ থাকতে পারে সেটা প্রমাণ করার জন্য নয়ম বরং তাদের অভ্যন্তরীণ সংগ্রামের একটি অস্ত্র হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মীয় আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের বিরুদ্ধে যারা দাবী করছেন বিবর্তন ধর্মের সাথে কোনো সংঘর্ষ সৃষ্টি করছে না। 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স পুরোপুরিভাবে ঈশ্বর অবিশ্বাসীদের দখলে' এ ধরনের একটি শিরোনামে 'আনসারস ইন জেনেসিস', বেশ তৃপ্তি সহকারে নেচার পত্রিকার সম্পাদককে লেখা লারসন এবং হুইথামের চিঠিটির শেষ অনুচ্ছেদটির উদ্ধৃতি দেয়:

> 'আমরা যখন আমাদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশের জন্য তৈরি করছি, ন্যাস (NAS বা ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্স) পাবলিক স্কুলগুলোতে বিবর্তন পড়ানোর জন্য উৎসাহ দিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে, যা দীর্ঘদিন ধরে বৈজ্ঞানিক সমাজ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কিছু রক্ষণশীল খ্রিস্টান গোষ্ঠীদের মধ্যে চলমান বিতর্কের কারণ। এই পুস্তিকাটি পাঠকদের আশ্বস্ত করে এই বলে:'ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে কিনা এই প্রশ্নের ব্যপারে বিজ্ঞানের অবস্থান নিরপেক্ষ'; ন্যাস প্রেসিডেন্ট ব্রুস অ্যালবার্ট বলেন, এই অ্যাকাডেমীর অনেক বিখ্যাত সদস্য খুবই ধার্মিক ব্যক্তি, যারা বিবর্তনে বিশ্বাস করেন, এবং তাদের অনেকেই জীববিজ্ঞানী, তবে আমাদের এই জরিপ অন্য কথা বলছে'।

যে কেউ বুঝতে পারবেন, ব্রুস অ্যালবার্ট 'নোমা' (NOMA) ধারণাটি মেনে নিয়েছেন, যে কারণে বিষয়টি আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, 'দ্য নেভিল চেম্বারলেইন স্কুল অব ইভোল্যুশনিস্ট' অংশে। 'অ্যানসারস ইন জেনেসিস' সংগঠনটির আসলে ভিন্ন কর্মপরিকল্পনা আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের সমতূল্য ব্রিটেনে (এবং কমনওয়েলথ দেশগুলোর জন্য যেমন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ভারত, পাকিস্থান এবং ইংরেজীভাষী আফ্রিকা ইত্যাদি, আছে রয়্যাল সোসাইটি। এই বইটি যখন প্রেসে আমার সহকর্মী আর এলিজাবেথ কর্নওয়েল এবং মাইকেল স্টিরাট তখন রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের ধর্মীয় মতামত নিয়ে তাদের গবেষণাপত্রটি লিখছিলেন, লেখকদের পুরো উপসংহার প্রকাশিত হবে পরে যথাসময়ে, কিন্তু তারা আন্তরিকভাবে প্রাথমিক ফলাফলটি এখানে প্রকাশ করতে আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

তারা যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছিলেন মতামত পরিমাপ করতে, তা হলো লাইকার্ট টাইপ এর সাত পর্যায়ের একটি স্কেল। ১০৭৪ জন রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের মধ্যে যাদের একটি ইমেইল আছে (অধিকাংশেরই তা ছিল) তাদের উপর জরিপটি চালানো হয়, এবং প্রায় ২৩ শতাংশ এর উত্তর দেন (এ ধরনের গবেষণায় এটি বেশ বড় একটি সংখ্যা); তাদের কাছে বেশ কয়েকটি প্রস্তাবনা প্রস্তাব করা হয়। যেমন, আমি ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, অর্থাৎ যিনি প্রতিটি একক ব্যক্তির ব্যপারে খোঁজ খবর করেন, প্রার্থনা শোনেন এবং জবাব দেন, নানা ধরনের পাপ এবং খারাপ কাজের ব্যপারে নজর রাখেন এবং বিচার করেন, এ ধরনের প্রতিটি প্রস্তাবের জন্য অংশগ্রহনকারীদের ১ (সম্পূর্ণ ভিন্নমত) থেকে ৭ (সম্পূর্ণ একমত) পর্যন্ত একটি সংখ্যাকে তাদের মতামত অনুযায়ী বেছে নিতে বলা হয়েছিল।এই গবেষণার ফলাফলটি লারসন এবং হুইথামে স্টাডিটির ফলাফলের সাথে তুলনা করা কঠিন, কারণ তারা (লারসন এবং হুইথাম) তাদের অংশগ্রহনকারীদের ৩ পয়েন্টের একটি স্কেল দিয়েছিলেন, এটির মত ৭ পয়েন্ট স্কেল নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সার্বিক প্রবণতাটা কিন্তু ছিল একই রকম। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাবিদ বিজ্ঞানীদের মতোই রয়্যাল সোসাইটির ফেলোদের মাত্র ৩.৩ শতাংশ সদস্য ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্বের পক্ষে তাদের জোরালো সমর্থনের জানিয়েছেন (অর্থাৎ তারা এই স্কেলের ৭ পছন্দ করেছেন), অন্যদিকে ৭৮.৮ শতাংশ জোরালোভাবে কোনো ব্যক্তিগত ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যপারে তাদের ভিন্নমত পোষণ করেছেন (বা তারা এই স্কেলের ১ পছন্দ করেছেন); আপনি যদি এই স্কেলে যারা ৬ এবং ৭ পছন্দ করেছে তাদের বিশ্বাসী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন এবং যারা ১ ও ২ পছন্দ করেছে তাদের অবিশ্বাসী হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন, তাহলে ২১৩ জনের একটা বড় অংশ দেখা যাচ্ছে অবিশ্বাসী আর মাত্র ১২ জনকে দেখা যাচ্ছে বিশ্বাসী হিসাবে। লারসন এবং হুইথামের মত বা বেইট হালাহমি এবং আরজাইলের গবেষণায় বা কর্নওয়েল এবং স্টিরাটের গবেষণায় যা প্রতীয়মান হয়েছে তা হলো, যদিও সামান্য কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবণতা আছে অন্যান্য শাখার বিজ্ঞানীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে নিরীশ্বরবাদীরাই সংখ্যাধিক্য প্রদর্শন করে। বিস্তারিত আরো কিছু এবং কৌতুলহদ্দীপক উপসংহার জানার জন্য তাদের গবেষণা প্রকাশ হলে পড়ে দেখতে পারেন আগ্রহীরা (৮৬)।

ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি বা রয়্যাল সোসাইটির প্রথম সারির বিজ্ঞানীদের থেকে এবার অন্যদিকে নজর দেই, এমন কোনো কি প্রমাণ আছে, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীতে নিরীশ্ববাদীরা সাধারণত বেশি শিক্ষিত এবং বেশি মেধা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে? বেশ কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে, ধার্মিকতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ও আই কিউ বা বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিসংখ্যানগত আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে। মাইকেল শেরমার (৮৭) তার ‘হাউ উই বিলিভ: দ্য সার্চ ফর গড ইন অ্যান এজ অব সায়েন্স’ বইয়ে এটি বড় আকারের জরিপের উল্লেখ করেছেন যেখানে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বাছাই করা

যুক্তরাষ্ট্রের জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে গবেষণা করেছিলেন শেরমার এবং তার সহযোগী ফ্র্যাঙ্ক সুলোওয়ে। তাদের পাওয়া চমকপ্রদ সব ফলাফলের মধ্যে ছিল ধর্মপ্রিয়তার আসলেই ঋণাত্মক বা নেগেটিভ একটি সম্পর্ক আছে উচ্চশিক্ষার সাথে, অর্থাৎ ধার্মিকতা ক্রমশ কমতে থাকে শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়ার সাথে। উচ্চ শিক্ষিত মানুষদের ধর্মপ্রীতি থাকার সম্ভাবনা সাধারণত কম। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহের এবং রাজনৈতিক উদারপন্থিতার (খুব জোরালো) সাথে ধার্মিকতারও ঋণাত্মক সম্পর্ক আছে। এর কোনোটাই বিস্ময়কর ফলাফল যেমন নয় তেমনি এই সত্যটা অবাক করে না, যেমন পিতামাতা ধার্মিকতার সাথে সন্তানদের ধার্মিকতার ধনাত্মক একটি সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজ-বিজ্ঞানীরা ব্রিটিশ শিশুদের উপর গবেষণায় দেখেছেন, শুধুমাত্র প্রতি ১২ জনে একজন তাদের পিতামাতার ধর্মবিশ্বাস থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারে।

স্পষ্টতই বিভিন্ন গবেষকদের পরিমাপের পদ্ধতিটি ভিন্ন, সুতরাং বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল পারস্পরিক তুলনা করা সহজসাধ্য কাজ নয়। মেটা-অ্যানালাইসিস বা অধিবিশ্লেষণ হচ্ছে একটা পদ্ধতি, যেখানে গবেষকরা কোনো একটি বিষয়ে প্রকাশিত সবগুলো গবেষণাপত্র নিয়ে যাচাই করে দেখেন সেগুলোর মধ্যে কয়টি গবেষণা একই রকম উপসংহারে পৌঁছেছে আর কতগুলোই বা ভিন্ন কোনো একটা উপসংহারে উপনীত হয়েছে। ধর্ম এবং বুদ্ধ্যঙ্কের ওপর আমার জানা একমাত্র অধিবিশ্লেষণটি পল বেল ২০০২ সালে 'মেনসা' ম্যাগাজিনে (মেনসা হচ্ছে উচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন মানুষদের একটি সোসাইটি, এবং আশ্চর্য হবার কোনো কারণ নেই যে, তাদের ম্যাগাজিন এমন কিছু বিষয়ে প্রবন্ধ ছাপায় যা তাদের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করে) প্রকাশ করেছিলেন (৮৮)। বেল এর মতে, ধর্মীয় বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সম্পর্ক নিয়ে ১৯২৭ থেকে শুরু করে মোট ৪৩ টা গবেষণা করা হয়েছে । মাত্র চারটি ছাড়া বাকি সবকয়টি একটি বিপরীত সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর যত বেশি হবে, সেই মানুষগুলোর ধার্মিক হবার সম্ভাবনা, বা কোনো ধরনের 'বিশ্বাস' ধারণ করার সম্ভাবনাও হ্রাস পাবে।

যে-কোনো অধিবিশ্লেষণ অবশ্যই অনেক কম সুনির্দিষ্ট হয়, এই বিষয়ে যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট গবেষণা তুলনায় যেগুলো সাধারণত এই অধিবিশ্লেষণের অংশ হয়। এই ধরনের আরো বেশি গবেষণা হলে ভালো, এমনকি সেরা প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি বা প্রধান প্রধান পুরষ্কারগুলোর বিজয়ীদের - যেমন নোবেল, ক্র্যাফুর্ড, ফিল্ড, কিয়োটো, কসমস ইত্যাদি - মধ্যে আরো গবেষণা পরিচালনা করা প্রয়োজন। আমি আশা করছি এই বইটির ভবিষ্যৎ সংস্করণে সেই সব উপাত্তগুলো সংযুক্ত হবে। বর্তমান গবেষণাগুলো থেকে যুক্তিসঙ্গত উপসংহার, জননন্দিত রোল মডেল, বিশেষ করে বিজ্ঞানীদের ব্যপারে ধর্মীয় পক্ষ সমর্থনকারীদের জন্য হয়তো তাদের স্বভাববিরুদ্ধভাবেই চুপ থাকাটাই মঙ্গলজনক।

পাসকালের বাজি

বিখ্যাত ফরাসী গণিতজ্ঞ ব্লেইজ পাসকাল (৮৯) মনে করতেন, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে যত বড়ই সম্ভাবনা থাকুক না কেন, তার চেয়ে অনেক বেশি খেসারত দিতে হবে, যদি এই বিষয়ে কোনো ধরনের ভুল অনুমান করা হয়। তাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করাই আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে, কারণ আপনি যদি সঠিক হন, আপনি অনন্ত সুখের অধিকারী হবেন এবং আর আপনি যদি ভুলও করেন, সে ক্ষেত্রে আপনার কোনো ক্ষতিও হচ্ছে না। কিন্তু অন্যদিকে যদি আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস না করেন, এবং যদি দেখা যায় আপনার ধারণাটা ভুল, সেক্ষেত্রে আপনার জন্য আছে অনন্ত নরক যন্ত্রণা, আবার আপনি যদি সঠিকও হন, সেক্ষেত্রে আপনার কিছু আসবে যাবে না। এরকম একটি উভয় সংকটে সিদ্ধান্ত নিতে কি খুব বেশি মাথা খাটাতে হবে? সুতরাং ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন।

কিন্তু ভালো করে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, এই যুক্তিটিতে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু অদ্ভুত ব্যপার আছে। কোনো কিছুকে ‘বিশ্বাস’ করাকে কিন্তু আপনি কোনো নীতি হিসাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, নিদেনপক্ষে বিশ্বাস এমন কোনো কিছু না যে, আমি তা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি নিজের একটি ইচ্ছা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। আমি চার্চে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং আমি নাইসিন ক্রিড (৯০) পাঠ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারি, আমি বাইবেলের উপর হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি এই বলে যে, এর ভিতরের সব শব্দকে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু এসব কোনো কিছুই আমাকে আসলে সেটাকে ‘বিশ্বাস’ করাবে না, যদি আমি নিজে ‘বিশ্বাস’ না করি। পাসকালের বাজি তাই শুধু ‘যুক্তি’ হতে পারে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার ‘ভান’ করার ক্ষেত্রে। এবং যে ঈশ্বরকে আপনি বিশ্বাস করছেন বলে দাবী করছেন, ভালো হয় সে যেন সর্বজ্ঞ ধরনের কোনো ঈশ্বর না হয়, এর ব্যতিক্রম হলে তার পক্ষে এই ছলনার ব্যপারটা সহজে ধরে ফেলার কথা। আপনি সিদ্ধান্ত নেবার মাধ্যমে কিছু বিশ্বাস করতে পারবেন এমন হাস্যকর ধারণাটিকে বেশ সুন্দরভাবে ঠাট্টা করেছিলেন ডগলাস অ্যাডামস (৯১) তার ‘ডার্ক জেন্টলিস হলিস্টিক ডিটেকটিভ এজেন্সি’ বইটিতে, যেখানে আমাদের সাথে দেখা হয়, একটি রবোটিক ইলেক্ট্রিক পুরোহিতের সাথে, শ্রম কমানোর যে যন্ত্রটি আপনি কিনতে পারবেন, যে ‘আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিশ্বাস’ করার কাজটি করে দেবে। এর ‘ডি-লাক্স’ মডেলটির বিজ্ঞাপন করা হয়েছে,‘এরা সল্ট লেক সিটিতে আপনি যা কখনো বিশ্বাস করতে পারবেন না, এরা সেটিও বিশ্বাস করতে সক্ষম’।

তবে যা-ই হোক না কেন, আমাদের কেন এই ধারণাটাকে সহজে গ্রহন করে নিতে হবে যে, আপনি যদি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চান, আপনাকে অবশ্যই একটা জিনিস করতে, তা হলো, তাকে বিশ্বাস করতে হবে? বিশ্বাস করার মধ্যে কি বিশেষত্ব আছে? ঈশ্বরের

কি দয়াশীলতা বা উদারতা বা নম্রতাকে পুরষ্কৃত করার কথা না? অথবা আন্তরিকতাকে? কি হতে পারে, যদি ঈশ্বর, একজন বিজ্ঞানী, যিনি সততার সাথে সত্যের অনুসন্ধানকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানবীয় গুণ বলে মনে করেন? আসলেই তো, এই মহাবিশ্বের ডিজাইনার হিসাবে যাকে দাবী করা হয়, তাকে নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক হতে হবে? বার্ট্রান্ড রাসেলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যদি মৃত্যুর পর তিনি ঈশ্বরের মুখোমুখি হন, এবং ঈশ্বর যদি জানতে চান, রাসেল কেন তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না? রাসেলের উত্তর ছিলো (আমি বলবো প্রায় অমর মন্তব্য), 'যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না ঈশ্বর, যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না'। ঈশ্বরের কি পাসকালের কাপুরুষোচিত সুবিধাবাদী বাজির চেয়ে রাসেলকে তার সাহসী সন্দেহবাদিতার জন্য বেশি শ্রদ্ধা করার কথা নয় (বাদ দিলাম রাসেলের সেই সাহসী শান্তিবাদিতা, যার কারণে তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কারাভোগ করতে হয়েছিল)? এবং যদিও আমাদের জানার উপায় নেই, ঈশ্বর কোনো দিকে সমর্থন দেবেন, কিন্তু পাসকালের বাজির যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমাদের আসলেই সেটি প্রয়োজন নেই। মনে রাখতে হবে আমরা একটা বাজির কথা বলছি, এবং পাসকাল কিন্তু বাজির সপক্ষে সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছাড়া আর বেশি কিছু দাবী করেননি; আপনি কি বাজি রাখবেন যে ঈশ্বর অসৎভাবে ভান করা বিশ্বাসকে (বা এমনকি সৎভাবে করা বিশ্বাসকে) আন্তরিক সৎ সন্দেহবাদীতার চেয়ে বেশি মূল্য দেন? এবং তারপরও ধরুন, আপনি মারা যাবার পর যে, ঈশ্বরের মুখোমুখি হলেন, এবং দেখা গেল তিনি হচ্ছেন বা'ল এবং তার পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়াহয়ে (জিহোভা) থেকে যিনি কোনো অংশে কম হিংসুটে না। পাসকালের জন্য ভুল কোনো ঈশ্বরের উপর বাজি রাখার চেয়ে কোনো ধরনের উপর ঈশ্বরের উপর না বাজি রাখাটাই কি উত্তম নয় ? সম্ভাব্য অসংখ্য ঈশ্বর, দেব বা দেবীদের যে-কোনো কারোর উপর বাজি রাখতে পারার সম্ভাবনাটি পাসকালের পুরো যুক্তিটাকে কি প্রশ্নবিদ্ধ করে না? পাসকাল সম্ভবত ঠাট্টা করছিলেন, যখন তিনি তার বাজির পক্ষে প্রচারণা করেছিলেন, ঠিক যেমন আমি এখন ঠাট্টাচ্ছলে একে বর্জন করছি। কিন্তু আমার সাথে এমন মানুষের দেখা হয়েছে, যেমন কোনো লেকচারের পরে প্রশ্নোত্তর পর্বে, যারা খুবই গুরুত্বের সাথে পাসকালের এই বাজিকে ঈশ্বর বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি হিসাবে দাবী করেছেন, সুতরাং একারণেই এটিকে খানিকটা আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

সবশেষে, পাসকালের বাজির ঠিক বিপরীত কোনো বাজির সপক্ষে কি যুক্তি প্রস্তাব করা সম্ভব? ধরা যাক, আমরা মেনে নেই, ঈশ্বরের অস্তিত্বের আসলে খুব সামান্য পরিমাণ সম্ভাবনা আছে। তাসত্ত্বেও বলা যেতে পারে আপনি একটি উত্তম এবং পরিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবেন তার অস্তিত্বের উপর বাজি রাখার চেয়ে তার অস্তিত্বহীনতার উপর বাজি রাখার মাধ্যমে এবং এভাবে আপনার মূল্যবান সময় তাকে উপাসনা করার পেছনে অপচয় না করে, তার জন্য আত্মত্যাগ না করে, বা তার জন্য যুদ্ধ করে বা মৃত্যুবরণ না করে ইত্যাদি। আমি এখানে এই প্রশ্নটি নিয়ে আর অগ্রসর হবো না, কিন্তু

পাঠকরা মনে রাখতে পারেন বিশেষ করে যখন আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার পালনের প্রক্রিয়ার কি ধরনের অশুভ পরিণতি হতে পারে সেই সংক্রান্ত পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আলোচনা করবো।

বায়েসিয়ান যুক্তিগুলো

আমার মনে হয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার সবচয়ে আজব ঘটনাটি আমি দেখেছি বায়েসিয়ান যুক্তির ব্যবহারে, সম্প্রতি স্টিফেন আনউইন (৯২) এই যুক্তিগুলো প্রস্তাব করেছেন তার 'দ্য প্রোবাবিলিটি অব গড' বইটিতে। আমি প্রথমে খানিকটা ইতস্তত বোধ করছিলাম এই যুক্তিগুলো এখানে যোগ করার কথা ভেবে। যা শুধুমাত্র দুর্বলই না, এবং বহুকাল আগে থেকেই অপেক্ষাকৃত কম শ্রদ্ধা কুড়িয়েছে। যদিও আনউইনের বইটি উল্লেখযোগ্যভাবে সাংবাদিকদের নজর কেড়েছিল যখন ২০০৩ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া এই যুক্তিটি আমার বেশ কিছু আলোচনার সূত্র একত্র করার একটা সুযোগ দিয়েছে। তার লক্ষ্য নিয়ে আমার খানিকটা সহমর্মিতা আছে, কারণ ২ নং অধ্যায়ে আমি যুক্তি দিয়েছিলাম, ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিশ্বাস একটি বৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস, এবং অন্ততপক্ষে নীতিগতভাবে পরীক্ষাযোগ্য। আনউইন কুইকজোটিক বা অতিমাত্রায় আদর্শবাদী বাস্তবজ্ঞান বর্জিত একটি প্রচেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনাটির একটি সংখ্যাগত পরিমাপক রূপ দিতে, যা আসলেই হাস্যকর।

বইটির উপশিরোনামটি, 'এ সিম্পল ক্যালকুলেশন দ্যাট প্রুভস দ্য আল্টিমেট ট্রুথ', শেষ সংস্করণে প্রকাশকের সংযোজন তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ এই অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস আনউইনের মূল বইয়ের ভাষায় পাওয়া যায় না। বইটাকে বলা যায়, একটি 'হাউ টু' নির্দেশিতা, এক ধরনের 'বায়েস এর থিওরেম ফর ডামিস' গোছের কোনো বই, যা কিনা হালকা বিদ্রুপাত্মক ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়টিকে একটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করেছে। বায়েসের থিওরেম বোঝাতে আনউইন অনায়াসে একই ভাবে কোনো কাল্পনিক খুনকে পরীক্ষামূলক উদহারণ হিসেবে ব্যবহার করতে পারতেন: গোয়েন্দা তদন্ত কর্মকর্তা প্রথমে নানা আলামত সংগ্রহ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। রিভলভারে আঙ্গুলের ছাপ ইঙ্গিত করছে, মিসেস পিকক এই হত্যাটি করেছেন। এখন এই সন্দেহটাকে গাণিতিকভাবে পরিমাপ করুন তার উপর একটি সম্ভাবনার সম্ভাব্য সংখ্যা আরোপ করে। কিন্তু প্রফেসর প্লুমের (৯৩) উদ্দেশ্য ছিল মিসেস পিকককে দোষী হিসাবে ফাসানো। সুতরাং আগের সম্ভাবনার পরিমাপের থেকে একটি সংখ্যা পরিমাণ হ্রাস করুন; ফরেনসিক প্রমাণ বলেছে বেশ দূর থেকে রিভলভারটি থেকে নির্ভুল নিশানায় গুলি বের হবার শতকরা ৭০ শতাংশ সম্ভাবনা আছে, যা দাবী করছে হত্যাকারী সম্ভবত সামরিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, সুতরাং কর্নেল মাষ্টার্ডকে নিয়ে আমাদের বাড়তি সন্দেহটাকে একটা সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করুন। আবার দেখা যাচ্ছে রেভারেন্ড

গ্রিনেরই খুন করার সবচে সম্ভাব্য মোটিভ আছে (৯৫)। সুতরাং তার ক্ষেত্রে আমাদের গাণিতিক সম্ভাবনার পরিমাপটা বাড়ানো হোক। কিন্তু লম্বা সোনালী যে চুলের নমুনা মৃত ব্যক্তির পরণের জ্যাকেটে পাওয়া গেছে সেটা মিস স্কারলেটের এবং এভাবে আরো ....। এরকম আত্মগতভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভাবনার নানা গাণিতিক পরিমাপ গোয়েন্দা কর্মকর্তার মনে ঘুরপাক খেতে থাকে, বারবার নানা সম্ভাবনা তাকে নানা দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করতে থাকে। বায়েসের থিওরেমটির তাকে একটি উপসংহারে উপনীত হতে সহায়তা করার কথা। এটি হচ্ছে গাণিতিক একটি ইঞ্জিন, যা নানা সম্ভাব্য সংখ্যাকে যুক্ত করে একটি চূড়ান্ত রায় দেয়, যার আবার সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি সম্ভাবনার পরিমাপ আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে চূড়ান্ত সংখ্যাটি কতটুকু উত্তম হবে তা নির্ভর করবে ইঞ্জিনে ইনপুট বা নিবেশিত করা মূল সংখ্যাগুলোর উপর। এগুলো সাধারণত আত্মগতভাবে বিচার করা বা সাবজেকটিভ এবং সেই কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সন্দেহগুলোও এই হিসাবে প্রবেশ করে। সেই GIGO নীতিও (Garbage In Garbage Out - বাজে উপাত্ত বাজে ফলাফল) (৯৫) এখানে প্রযোজ্য, এবং আনউইনের ঈশ্বর উদাহরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযোজ্য বললে খুব বেশি লঘুকরণ করা হয়ে যায়।

আনউইন একজন ঝুঁকি ব্যস্থাপনা পরামর্শক যার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরিসংখ্যানের পদ্ধতির তুলনায় বায়েসিয়ান পদ্ধতিতে উপসংহারে উপনীত হবার বিশেষ একটি দুর্বলতা আছে। তিনি বায়েসিয় থিওরেমটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, কোনো হত্যাকাণ্ডের উদাহরণ নয়, বরং সবচেয়ে বড় পরীক্ষার বিষয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংক্রান্ত বিষয়টিকে। তার পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা দিয়ে বিষয়টি শুরু করা, যা তিনি পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব উভয়ের শতকরা ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা দিয়ে। তারপর তিনি মোট ৬ টি বাস্তব তথ্যের একটি তালিকা করেছেন, যে নিয়ামকগুলোর এই বিষয়টির উপর প্রভাব থাকার সম্ভাবনা আছে, এবং প্রত্যেকটিকে একটি করে পরিমাপগত সংখ্যা ভাগ করে দেয়া হয়েছে, এবং এরপর সব সংখ্যাগুলোকে বায়েসিয় থিওরেমে যন্ত্রে নিবেশ করানো পর তিনি লক্ষ করেছেন কোনো সংখ্যাটি বের হয়ে আসে। সমস্যা হচ্ছে (আবার পুনরাবৃত্তি করছি) এই ৬ টি সংখ্যা যা প্রত্যেকটি নিয়ামক বাস্তব সত্যের সাথে প্রবেশ করানো হয়েছে তা আসলে পরিমাপ করা নয়, এটি সম্পূর্ণ ভাবে স্টিফেন আনউইনের ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার দ্বারা প্রদত্ত, যা এই অনুশীলনের খাতিরে সংখ্যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই ৬ টি বাস্তব সত্য হচ্ছে:

(১) আমাদের ভালোমন্দ বোঝার একটি ক্ষমতা আছে
(২) মানুষ অনেক মন্দ কাজ করে (হিটলার, স্টালিন, সাদ্দাম হুসেইন)
(৩) প্রকৃতিও মন্দ কাজ করে (ভুমিকম্প, সুনামি, হারিকেন)

(৪) ছোটোখাটো অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে (আমি আমার চাবি হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং আবার তা আমি খুঁজে পেলাম)
(৫) বড় মাপের অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে (যীশু তার মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিলেন)
(৬) মানুষের নানা ধরনের ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আছে

এইসব কিছু অবশেষে যা প্রমাণ করে (আমার মতে, কোনো কিছুই না) তা হলো, দোদুল্যমান বায়েসিয় দৌড়ে যেখানে ঈশ্বর আগে থেকে বাজিতে এগিয়ে ছিলেন, সেখান থেকে খানিকটা পিছিয়ে পড়েন, তারপর আবার ধীরে ধীরে তার ৫০ শতাংশ জায়গায় ফিরে যান, যেখান থেকে তিনি শুরু করেছিলেন, অবশেষে শেষ পর্যন্ত তিনি আনউইনের হিসাব মতন ৬৭ শতাংশ সম্ভাবনা অর্জন করেন তার অস্তিত্বের সপক্ষে। এখানে আনউইন বায়েসিয় ফলাফলের উপর সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তার কাছে এই ৬৭ শতাংশ যথেষ্ট বেশি মনে হয়নি, সুতরাং তিনি একটা অদ্ভুত একটি পদক্ষেপের শরণাপন্ন হন, জরুরী ভাবে তিনি ‘বিশ্বাস’ ধারণাটিকে এর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এই সম্ভাবনাকে নিয়ে যান ৯৫ শতাংশর কাছে। স্পষ্টত এটা মনে হতে পারে একটা ঠাট্টা, কিন্তু আসলে ঠিক এভাবেই তিনি কাজটি করেছেন।ঠিক কেন এভাবে কাজটি করেছেন সেটার ব্যাখ্যা আমি যদি দিতে পারতাম ভালো হতো, কিন্তু আসলে আমারও আর কিছুই বলার নেই এই বিষয়ে। এই ধরনের উদ্ভট দাবী আমি আগেও দেখেছি অন্য ক্ষেত্রে, যখন আমি ধার্মিক কিন্তু বুদ্ধিমান বিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ করেছি তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে তাদের যুক্তি ব্যাখা করতে, বিশেষ করে তারা যখন নিজেরাই স্বীকার করেন যে, তাদের বিশ্বাসের সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই: ‘আমি স্বীকার করছি কোনো প্রমাণ নেই। এই জন্য কারণ আছে কেন একটাকে ‘বিশ্বাস’ বা ফেইথ বলা হয়’ (এই শেষ বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় প্রায় সুস্পষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে, আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক এমন বক্তব্যর জন্য নুন্যতম অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইবার কোনো নমনীয়তার চিহ্ন ছাড়াই)।

আশ্চর্যজনকভাবেই আনউইনের ৬ টি নিয়ামকের তালিকায় পরিকল্পনা থেকে নেয়া যুক্তি নেই, এছাড়া আকোয়াইনাস এর পাঁচটি প্রমাণের একটিও এখানে নেই, এছাড়াও বাকি ‘অনটোলজিক্যাল’ যুক্তিগুলোও নেই। এইসব যুক্তিগুলোর সাথে আনউইনের যুক্তির কোনো লেনদেন নেই এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্রশ্নে তার গাণিতিক পরিমাপে ক্ষেত্রে এদের সামান্য অবদান ও প্রভাব নেই। ভালো পরিসংখ্যানবিদের মতোই তিনি এগুলো ব্যাখ্যা করেছেন এবং ফাঁপা যুক্তি বলে এগুলো বাতিল করেছেন। আমি এজন্য তাকে প্রাপ্য স্বীকৃতি দেবো, যদিও তার ‘ডিজাইন যুক্তি’ বাতিল করার কারণ আমার থেকে ভিন্ন। কিন্তু তার বায়েসিয় দরজা দিয়ে যে যুক্তিকে তিনি প্রবেশাধিকার দিয়েছেন, সেটাও একই রকম দুর্বল বলে আমার মনে হয়েছে। এটা বলার একমাত্র কারণ যে আত্মগত গাণিতিক সংখ্যা তিনি তার বাস্তব সত্যের উপর

আরোপ করেছেন, কাজটা আমি করলে সেটি তার থেকে ভিন্ন হত। কিন্তু আত্মগত স্তরে বিচারিক ধারণা প্রয়োগে কারই বা এত মাথাব্যাথা আছে ? তার ধারণা আমাদের ভাল মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা আছে এই বিষয়টি ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে জোরালো প্রমাণ, এবং যেখানে আমি মনে করি বিষয়টা তাকে কোনো দিকেই সমর্থন করছে না, তার প্রাথমিক প্রাকধারণা থেকে (ঈশ্বরের অস্তিত্ব ৫০/৫০)। ৬ এবং অধ্যায় ৭ এ স্পষ্ট হবে যে একটি জোরালো কেস তৈরি করা যাবে যে, আমাদের ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতার ব্যপারে আসলেই কোনো অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের কোনো স্পষ্ট যোগাযোগ নেই, যেমন, বিটহোভেনের কোয়ার্ট্রেট (৯৬) বুঝতে, আমাদের এই ভালোমন্দ বোঝার অনুভূতিটা (অবশ্যই এর অর্থ এই অনুভূতিকে অনুগমন করার আমাদের প্রবণতাটি না) ঈশ্বর থাকলেও যেমন থাকতো, না থাকলেও তেমনই থাকতো।

অন্যদিকে আনউইন অশুভের উপস্থিতি বিশ্বাস করেন, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন ভুমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপরীত দিকেই জোরালো ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে আনউইনের বিচার আমার বিচারের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে যা অনেক ধর্মতাত্ত্বিকেরও অস্বস্তির কারণ। থিওডিসি (৯৭) বা অশুভের উপস্থিতির মুখে স্বর্গীয় সত্তার উপস্থিতি এবং জয়ের প্রমাণ) বহু ধর্মতাত্ত্বিককের অনিদ্রার কারণ। প্রভাবশালী ‘অক্সফোর্ড কমপ্যানিয়ন টু ফিলোসফি’ এই অশুভ বিষয়গুলো উপস্থিতির সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন প্রচলিত ঈশ্বরবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী চ্যালেঞ্জ হিসাবে। কিন্তু এই যুক্তিটা শুধুমাত্র একজন ‘ভালো ঈশ্বরের’ অস্তিত্বের বিরুদ্ধে মাত্র। এই ভালোমন্দ যাচাই করার ক্ষমতা ‘ঈশ্বর হাইপোথেসিসের’ কোনো অংশ না, শুধুমাত্র পছন্দনীয় একটি উপরি মাত্র।

স্পষ্টতই, ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মানুষগুলো সাধারণত সবসময়ই কোনটি আসলেই সত্য এবং কোনটি তারা সত্য বলে ভাবতে ভালোবাসেন, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম। কিন্তু, অতিপ্রাকৃত বুদ্ধিমত্তায় বিশ্বাস করে এমন খানিকটা বেশি শিক্ষিত বিশ্বাসীদের জন্য এই অশুভ শক্তি সমস্যাটা অতিক্রম করা শিশুসুলভ সহজ একটি কাজ। সেই ক্ষেত্রে তাদের শুধুমাত্র একটি খারাপ ঈশ্বরকে কল্পনা করতে হবে, যেমন একজন ওল্ড টেস্টামেন্টের পাতায় পাতায় বিরাজমান, অথবা, আপনি যদি সেটা করতে পছন্দ না করেন, একটা আলাদা অশুভ দেবতাকে আবিষ্কার করুন, আর তার নাম দেন শয়তান বা স্যাটান, বিশ্বের যত অশুভ কাজের জন্য ভালো ঈশ্বরের সাথে তার মহাজাগতিক যুদ্ধের উপর এবার সব দোষ চাপিয়ে দিন। অথবা আরো বেশি অভিজাত সমাধান হিসেবে, এমন ঈশ্বরকে কল্পনা করুন, যার মানুষের দৈনন্দিন হাহাকার নিয়ে ব্যস্ত হবার চেয়ে আরো অনেক মহান কাজ করার আছে বা এমন একজন ঈশ্বর যিনি মানুষের কষ্ট সম্পর্কে নির্বিকার নন, তবে তার কাছে, এই যন্ত্রণা সহ্য করার মানে হচ্ছে তার সুসংগঠিত, আইন মেনে চলা এই মহাবিশ্বে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির (বা ফ্রি উইল) জন্য

আমাদের মূল্য পরিশোধ করা। ধর্মতাত্ত্বিকদের দেখা যায় এইসব যুক্তিগুলো বিনা বাক্য ব্যয়ে তারা মেনে নিয়েছেন।

এই কারণেই যদি আমি নিজে আবার নতুন করে আনউইনের বায়েসিয় অনুশীলনটি করি, তাহলে অশুভ শক্তির উপস্থিতির সমস্যাটি কিংবা সামগ্রিকভাবে নৈতিকতার বিষয়টি আমাকে খুব বেশি পরিবর্তন করাবে না 'নাল' হাইপোথিসিস থেকে, যে-কোনো একটি দিকে (আনউইনের ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা থেকে)। কিন্তু আমি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে আর তর্ক করতে চাচ্ছি না, কারণ কোনোভাবেই আমি ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে উৎসাহ বোধ করতে পারি না, সেটা আমার বা আনউইনের যার হোক না কেন।

এরচেয়ে অনেক শক্তিশালী যুক্তিটি হলো, যা কোনো ব্যক্তিগত অনুধাবন বা মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এবং সেটা হলো 'অসম্ভাব্যতা' থেকে নেয়া যুক্তিটি। যা আমাদের আসলেই ৫০ শতাংশ অজ্ঞেয়বাদ থেকে নাটকীয়ভাবে দূরে নিয়ে যায়, অনেক ঈশ্বরবাদীদের চোখে যা চরম ঈশ্বরবাদী অবস্থানের প্রান্তে, কিন্তু আমার দৃষ্টিতে চরম নিরীশ্বরবাদীতার প্রান্তে। আমি বিষয়টি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছি ইতোমধ্যে, আসলে পুরো বিতর্কটি একটা পরিচিত প্রশ্নের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। 'ঈশ্বরকে তাহলে কে সৃষ্টি করেছে?' যারা চিন্তা করতে পারেন, তারা ইতোমধ্যেই এর উত্তর নিজেরাই খুঁজে নিতে পেরেছেন। একজন পরিকল্পক বা ডিজাইনার ঈশ্বর, কোনো অর্গানাইজড কমপ্লেক্সিটি বা সংগঠিত জটিলতা আসলেই ব্যাখ্যা করতে পারেনা, কারণ কোনো ঈশ্বর, যিনি যথেষ্ট পরিমানে জটিল যে তিনি এমন কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন, তার নিজের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম ব্যাখ্যার দাবী করে। ঈশ্বর এমন ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী মতে ফিরে যাওয়ার একটি অনন্ত প্রক্রিয়ার বা রিগ্রেসের পরিস্থিতি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেন, যেখান থেকে মুক্তি পাবার ব্যপারে তিনি আমাদের কোনো সাহায্য করতে অক্ষম। এই যুক্তিটা, পরবর্তী অধ্যায়ে আমি যা ব্যাখ্যা আরো করবো, দেখাচ্ছে যে ঈশ্বর, যদিও নীতিগতভাবে অপ্রমাণযোগ্য নয়, তবে অবশ্যই খুবই খুবই অসম্ভাব্য।

টীকা

(১) টমাস অ্যাকোয়াইনাস (১২২৫-১২৭৪), ইটালির ডমিনিকান ফ্রায়ার বা যাজক ছিলেন (ক্যাথলিক), এবং তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক ছিলেন।
(২) এডওয়ার্ড লিয়ার (১৮১২-১৮৮৮) ইংরেজ শিল্পী, লেখক, বিশেষভাবে পরিচিত তার মজার ছড়ার জন্য।
(৩) আমি এখানে মনে না করে থাকতে পারছি না, একসাথে জ্যামিতি পড়ার সময় আমার এক স্কুল বন্ধুর ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির প্রমাণ হিসাবে এই ধরনের কিছু যুক্তির ব্যবহার: ত্রিভুজ এবিসি দেখতে সমবাহু ত্রিভুজের মত, সুতরাং ...;

(৪) চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ইংলিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও ভুতাত্ত্বিক। বিবর্তন তত্ত্বে তার অবদানের জন্য সুপরিচিত।

(৫) উইলিয়াম পেইলি (১৭৪৩-১৮০৫) ইংরেজ যাজক, ধর্মবাদী দার্শনিক এবং উপযোগিতাবাদী। তিনি সুপরিচিত তার ন্যাচারাল থিওলজী'র জন্য যেখানে তিনি পরমকারণ বা টেলিওলজিকাল আর্গুমেন্টটি বিস্তারিত করেছিলেন।

(৬) অনটোলজী: মেটাফিজিক্স এর একটি শাখা যা অস্তিত্বের প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন করে।

(৭) এ প্রাইওরী এবং এ পোষ্টেরিওরী শব্দগুলো দর্শনে (এপিসটেমিওলজী বা জ্ঞানতত্ত্ব) ব্যবহৃত হয় দুই ধরনের জ্ঞান, যথার্থতা এবং যুক্তিতর্কের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। এ প্রাইওরী জ্ঞান বা যথার্থতা অভিজ্ঞতা থেকে স্বাধীন (যেমন সব কুমার পুরুষই অবিবাহিত); এ পোষ্টেরিওরী জ্ঞান ও যথার্থতা অভিজ্ঞতা কিংবা পরীক্ষামূলক প্রমাণের উপর নির্ভরশীল।

(৮) সেইন্ট আনসেল্ম (১০৩৩-১১০৯), তাঁকে আনসেল্ম অফ আকোষ্টাও নামে ডাকা হয়, একজন বেনডিক্টাইন যাজক, দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক, ক্যান্টারবুরির আর্চ বিশপ ছিলেন ১০৯৩ থেকে ১১০৯ অবধি।

(৯) জেনোর প্যারাডক্স (Zeno's paradox) এর বিস্তারিত সবার ভালোই জানা আছে বিধায় আমি ফুটনোট ছাড়া এর আর পুনরাবৃত্তি করলাম না। সেখানে বলা হয়েছে যে, অ্যাকিলিস একটি কচ্ছপ থেকে দশগুণ জোরে দৌড়াতে পারে, সুতরাং সে কচ্ছপকে ১০০ গজ দূরত্ব সামনে থেকে দৌড় শুরু করার সুযোগ দিল। অ্যাকিলিস ১০০ গজ দৌড়ায় এবং কচ্ছপ এখন ১০ গজ আগে, অ্যাকিলিস ১০ গজ দৌড়ায় এবং কচ্ছপ ১ গজ আগে। অ্যাকিলিস আরো এক গজ দৌড়ায়, কচ্ছপ তখনো এক গজের ১০ ভাগের একভাগ আগে এবং এভাবে অনন্তকাল চলতে থাকবে, সুতরাং অ্যাকিলিস কচ্ছপ কখনোই ধরতে পারবে না।

(১০) আমরা এমন কিছু বিষয় দেখতে পাই, ইদানিং দার্শনিক অ্যান্থনী ফ্লিউ এর বহুল প্রচারিত পুরানো মতবাদের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ঘটনায়, যিনি তার বৃদ্ধ বয়সে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে তিনি কোনো এক ধরনের দৈবত্বের প্রতি তিনি বিশ্বাসীতে রূপান্তরিত হয়েছেন (যা সমস্ত ইন্টারনেট জুড়ে অতি উৎসাহের সাথে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে); অন্যদিকে রাসেল একজন মহান দার্শনিক, নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন, হয়তো ফ্লিউর এই তথাকথিত রূপান্তরও টেম্পলটন পুরষ্কার অর্জন করতে পারে। সেদিকে তার যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ তার সেই কুখ্যাত সিদ্ধান্ত, ২০০৬ সালে ফিলিপ ই জনসন পুরষ্কার (Phillip E. Johnson Award for Liberty and Truth) গ্রহন। প্রথম এই ফিলিপ ই. জনসন পুরষ্কার গ্রহন করেছিলেন ফিলিপ ই জনসন নিজেই, যে আইনজীবি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের বিখ্যাত 'ওয়েজ স্ট্রাটেজীর' আবিষ্কার করেছিলেন। ফ্লিউ এই পুরষ্কারের দ্বিতীয় জয়ী। এই পুরষ্কারটি প্রদান করে বায়োলা - BIOLA বা the Bible Institute of Los Angeles; না ভেবে আসলে পারা যায় না, ফ্লিউ কি বুঝতে পেরেছেন যে তাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ? ভিক্টর স্টেনগার এর Flew flawed science, Free Inquiry 25: 2, 2005, 17-18; www. secularhumanism.org/ index.php? section= library & page= stenger_25_2 দেখুন।

(১১) জন লেসলি মেকি (১৯১৭-১৯৮১) অষ্ট্রেলীয় দার্শনিক, তার বিশেষ ক্ষেত্র ছিল মেটা এথিকস।

(১২) ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬), স্কটিশ দার্শনিক, পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ একজন দার্শনিক।

(১৩) ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) জার্মান দার্শনিক, আধুনিক দর্শনের কেন্দ্রীয় চরিত্র।

(১৪) নরমান ম্যালকম (১৯১১-১৯৯০) আমেরিকার দার্শনিক।

(১৫) http://www.iep.utm.edU/o/ont-arg.htm.http://www.uq.edu.au/~ pdwgrey/ pubs/gasking. html.

(১৬) ডগলাস গাসকিং: অষ্ট্রেলিয় দার্শনিক।

(১৭) উইলিয়াম গ্রে: অষ্ট্রেলিয় দার্শনিক।

(১৮) গাউনিলো অফ মারমুতিয়ের, একাদশ শতাব্দীর একজন বেনেডিক্টাইন যাজক, বিশেষভাবে পরিচিত সেইন্ট অ্যানসেল্ম এর ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিপক্ষে অনটোলজিকাল যুক্তি প্রস্তাব করেছিলেন।

(১৯) একটি মোডাল হচ্ছে কোনো অভিব্যক্তি বা প্রকাশ (যেমন আবশ্যিকভাবে অথবা সম্ভবত) যা ব্যবহৃত হয় কোনো বিচারিক প্রক্রিয়ায় নেয়া সিদ্ধান্তর সত্যতার গুণাগুণ যাচাই করার জন্য। খুব সংকীর্ণ অর্থে বললে মোডাল লজিক হচ্ছে অভিব্যক্তি বা প্রকাশের ডিডাকটিভ (কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে যুক্তির ব্যবহার) আচরণ নিয়ে অধ্যয়ন: যেমন 'খুবই সম্ভাব্য যে..' কিংবা 'এটি অবশ্যই যে..,' ডিডাকশন হচ্ছে এমন একটি যুক্তি প্রক্রিয়া, যেখানে আপনি এমন কিছু বক্তব্য দিয়ে শুরু করবেন (যাদের বলা হয় প্রেমিস) যাদের অনুমান করে ধরে নেয়া হয় সত্য বলে, তারপর আপনি নির্ধারণ করবেন, যদি এই বক্তব্যটি সত্যি হয় তাহলে আর কি কি সত্য হতে পারে। যেমন ধরুন, আপনি শুরু করলেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে এই বক্তব্যটিকে সত্য হিসাবে ধরে নিয়ে, এরপর আপনি নির্ধারণ করুন এটি যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আর কি কি বিষয় সত্য হতে পারে। আপনি শুরু করতে পারেন যেমন এমন কিছু ধারণা করে যে যদি আপনি চিন্তা করেন, আপনার অবশ্যই অস্তিত্ব আছে এবং এখান থেকে আপনার যুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করুন। গনিতে, আপনি কোনো স্বতঃসিদ্ধ কোনো ধারণা বা এক্সিওম নিয়ে শুরু করেন, এরপর আপনি নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন আর কি কি বিষয় সত্যি হতে পারে যদি এই এক্সিওমটি সত্যি হয়ে থাকে। ডিডাকশন প্রক্রিয়া ব্যবহার কওে আপনি আপনার উপসংহারের সপক্ষে চূড়ান্ত প্রমাণ দিতে পারে, যদি আপনার শুরুর বক্তব্য বা প্রেমিসগুলো সত্যি হয়ে থাকে। তবে যদি সেই প্রেমিসগুলো অপ্রমাণিত বা প্রমাণ অযোগ্য হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে শুধু কথার খাতিরে তাদের মানতে বাধ্য হতে হয় বা বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কিংবা বিষয়টি আরো গভীরভাবে অনুসন্ধান করার খাতিরে। অন্যদিকে ইনডাকশন যুক্তি প্রক্রিয়া আপনি শুরু করবেন কিছু উপাত্ত নিয়ে, তারপর আপনি নির্ধারণ করবেন, এই উপাত্ত থেকে আমরা কি কি সাধারণ উপসংহারে উপনীত হতে পারি। অন্যার্থে আপনি এক বা একাধিক তত্ত্ব প্রস্তাব করবেন যা এই উপাত্তগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন ধরুন আপনি উপাত্ত নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখলেন যে কারো সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বহুগুনে বেড়ে যায় যদি অন্তত পিতামাতার একজনের সিজোফ্রেনিয়া থাকে। এখান থেকে আপনি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করতে পারেন যে, সিজোফ্রেনিয়া রোগটি বংশগত হতে পারে। উপাত্ত যা বলছে সে অনুযায়ী এটি কিন্তু যুক্তিযুক্ত কোনো একটি হাইপোথিসিস সন্দেহ নেই। এখানে লক্ষ রাখতে হবে ইনডাকশন কিন্তু প্রমাণ করছে না তত্ত্বটি সঠিক। মাঝে মাঝে প্রায়শই বিকল্প তত্ত্বও থাকে যা সেই উপাত্তগুলো সমর্থন করতে পারে। যেমন, কোনো পিতামাতার কারো একজনের সিজোফ্রেনিক আচরণের প্রভাব শিশুটিকে সিজোফ্রেনিক রোগীতে রূপান্তরিত করতে পারে, এখানে জিনের কোনো ভূমিকা নেই। ইনডাকশন এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে তত্ত্বগুলো আসলেই উপাত্তগুলোর একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে পারে। শিশুদের সিজোফ্রেনিয়ার উপর পিতামাতার কোনো প্রভাব নেই এমন কোনো উপসংহার উপাত্ত সমর্থন করছে না, সুতরাং সেটি কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা হতে পারে না। কোনো কিছু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ডিডাকশন এবং ইনডাকশন শুধুমাত্র একা একাই যথেষ্ট নয়। যদিও ডিডাকশন চূড়ান্ত প্রমাণ দেয়, এটির সাথে বাস্তব পৃথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো ধরনের পর্যবেক্ষণ কিংবা গবেষণা বা পরীক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই, কোনো উপায় সেই প্রেমিস এর সত্যতা যাচাই করার। এবং ইনডাকশন যদিও পর্যবেক্ষণ নির্ভর, এটি কখনো কোনো একটি তত্ত্বকে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করতে পারেনা। কোনো একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিকাশ নির্ভর করে এই দুটি যৌক্তিক প্রক্রিয়ার ধীর সংশ্লেষণের মাধ্যমে।

(২০) অ্যালডস লিওনার্ড হাক্সলি (১৮৯৪-১৯৬৩), ব্রিটিশ লেখক।

(২১) দেনি দিদোরো (১৭১৩-১৭৮৪) ফরাসী দার্শনিক।

(২২) লিওনহার্ড ওয়িলার (Leonhard Euler) (১৭০৭-১৭৮৩) সুইস গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ।

(২৩) http://www.godlessgeeks.com/ LINKS/ GodProof.htm

(২৪) লুদভিগ ভন বিটহোভেন (১৭৭০-১৮২৭) জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরস্রষ্টা

(২৫) heiliger Dankgesang

(২৬) ফ্রাঞ্জ শুবার্ট (১৭৯৭-১৮২৮) অষ্ট্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরস্রষ্টা।

(২৭) মাইকেলেঞ্জেলো দি লোদেভিচো বুওনারোত্তি সিমোনী (১৪৭৫-১৫৬৪) ইতালী উত্তর - রেনেসাঁ পর্বের ভাস্কর, স্থপতি।

(২৮) উইলিয়াম শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬), ইংরেজী ভাষার শ্রেষ্ঠতম লেখক, নাট্যকার।
(২৯) ইয়োহান সেবাস্টিয়ান বাখ (১৬৮৫-১৯৭৫০) জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরস্রষ্টা।
(৩০) ইংলিশ লেখক ও কবি এমিলি ব্রন্টি (১৮১৮-১৮৪৮) লেখা একমাত্র প্রকাশিত উপন্যাস (১৮৪৫-১৮৪৬)
(৩১) পোপের ভ্যাটিক্যান সিটি প্রাসাদে অবস্থিত একটি চ্যাপেল, এটি বিখ্যাত এর ছাদে মাইকেলেঞ্জেলো আঁকা দ্য লাস্ট জাজমেন্ট ফ্রেস্কোর জন্য।
(৩২) রাফায়েলো সানজিনো দা উরবিনো (১৪৮৩-১৫২০) ইতালীয় শিল্পী, স্থপতি।
(৩৩) রাফায়েল এর একটি শিল্পকর্ম (১৫০২), বর্তমানে ভ্যাটিকানে আছে।
(৩৪) ওলফগাঙ আমাদেউস মোৎসার্ট (১৭৫৬-১৭৯১) অষ্ট্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ, সুরস্রষ্টা।
(৩৫) ফ্রাঞ্জ জোসেফ হাইডেন (১৭৩২-১৮০৯) জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ।
(৩৬) Manx shearwater (Puffinus puffinus), সামুদ্রিক একটি পাখি
(৩৭) জর্জ ডাবলিউ বুশ, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।
(৩৮) স্যাম হ্যারিস (জন্ম ১৯৬৮), যুক্তরাষ্ট্রের লেখক, নিউরোসায়েন্টিষ্ট।
(৪০) মোর্স কোড হচ্ছে তথ্য আদান প্রদান করার একটি পদ্ধতি, যা অন-অফ শব্দ, বা আলো, বা সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করে, যা সরাসরি কোনো দক্ষ শ্রোতা বা পর্যবেক্ষক কোনো বিশেষ যন্ত্র ছাড়াই অনুবাদ করতে পারেন। অন্যতম আবিষ্কারক স্যামুয়েল এফ মোর্সের নামেই এর নামকরণ।
(৪১) ইল্যুশন বা বিভ্রমের পুরো বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন রিচার্ড গ্রেগরী (Richard Gregory) তার বেশ কিছু বইয়ে, যেমন Gregory, R. L. (1997). Eye and Brain. Princeton: PrincetonUniversity Press.
(৪২) এই ব্যাখ্যাগুলোকে বিস্তারিত আলোচনা করার আমার নিজের প্রচেষ্টা আছে Unweaving the rainbow (R. Dawkins: 1998), 268-269)
(৪৩) http://www.sofc.org/Spirituality/s-of-fatima.htm
(৪৪) ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) স্কটল্যাণ্ডে জন্ম নেয় প্রখ্যাত দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, প্রাবন্ধিক, অর্থনীতিবিদ। বিশেষভাবে পরিচিত তার র‍্যাডিক্যাল দার্শনিক এমপেরিসিজম ও স্কেপটিসিজমের জন্য।
(৪৫) যদিও আমার স্ত্রীর বাবা ও মা আসলেই প্যারিসে এমন একটি হোটেলে কিছুদিন ছিলেন, যার নাম, Hotel de L'Univers et du Portugal
(৪৬) ক্লাইভ স্টেপল লুইস (১৮৯৮-১৯৬৩) আইরিশ লেখক, অদীক্ষিত ধর্মতাত্ত্বিক, খ্রিস্টীয় ধর্ম সমর্থনবাদী
(৪৭) পলের এপিস্টল বা চিঠি হচ্ছে নিউ টেস্টামেন্ট এর প্রথম ১৩টি বই,যার প্রথমেই পলের নাম আছে, এগুলো লিখিছিলেন পল দি অ্যাপোষ্টোল (৫-৬৩), যিনি প্রথম শতাব্দীতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেছিলেন।
(৪৮) জন দি অ্যাপোষ্টোল (৬-১০০) যীশুর বারো জন অ্যাপোষ্টোল এর একজন।
(৪৯) গসপেল, যীশুর জীবন কাহিনীর বর্ণনা।
(৫০) ম্যাথিউ গসপেল চারটি স্বীকৃত গসপেল এর একটি, নিউ টেস্টামেন্ট এর প্রথম বই, এর সূত্র ম্যাথিউ দি অ্যাপোষ্টল, যীশুর বারো অ্যাপোষ্টলের একজন।
(৫১) ল্যুকে গসপেলটি আকারে সবচেয়ে বড়, এটি সূত্র লিউক দি ইভানজেলিষ্ট (মৃত্যু ৮৪), তিনি সম্ভবত পলের শিষ্য ছিলেন।
(৫২) অ্যান্ড্রু নরমান উইলসন (জন্ম ১৯৫০), সাংবাদিক,লেখক, অনুসন্ধানী জীবনী রচয়িতা হিসাবে তিনি সুপরিচিত।
(৫৩) রবিন জেন লেন ফক্স (জন্ম ১৯৪৬): ইতিহাসবিদ।
(৫৪) Tom Flynn, `Matthew vs. Luke', Free Inquiry 25: 1, 2004, 34- 45
(৫৫) Robert Gillooly, `Shedding light on the light of the world', Free Inquiry 25: 1, 2004, 27-30.

(৫৬) বহু ঈশ্বরবাদী গ্রিক ধর্ম
(৫৬) আইরা গ্রেশউইন (১৮৯৬-১৯৮৩) আমেরিকার গীতিকার।
(৫৭) বার্ট এহরম্যান (জন্ম ১৯৫৫) নিউ টেস্টামেন্ট বিশেষজ্ঞ।
(৫৮) আমি বইটির সাবটাইটেল বা উপশিরোনামটি উল্লেখ করলাম, কারণ এই নামটার ব্যপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। লন্ডনের কন্টিনিউয়াম থেকে প্রকাশিত বইটার যে কপি আমার কাছে আছে সেটা নাম Whose word is it? আমি এই সংস্করণের কোথাও দেখলাম না এটি, হার্পার সান ফ্রান্সিসকো থেকে প্রকাশিত সংস্করণটি মূলত একই, যেটা আমি দেখিনি, যার প্রধান শিরোনাম Misquoting Jesus; আমার ধারণা তারা একই বই; কিন্তু প্রকাশকরা এই ধরনের সংশয় কেন সৃষ্টি করেন?
(৫৯) উইলিয়াম গ্রাহাম (জন্ম ১৯১৮) আমেরিকার একজন ধর্মপ্রচারক।
(৬০) জাক বার্লিনারব্লাউ, ইতিহাদবিদ, যুক্তরাষ্ট্র
(৬১) Ehrman, B. D. (2003). Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew. Oxford: Oxford University Press. Ehrman, B. D. (2003). Lost Scriptures: Books that Did Not Make It into the New Testament.Oxford: OxfordUniversityPress. Ehrman, B. D. (2006). Whose Word Is It? London: Continuum.
(৬২) এ এন উইলসন, তার রচিত যীশুর জীবনকাহিনীতে, জোসেফ একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন এই তথ্যটিকে সংশয়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। গ্রিক শব্দ Tekton এর আসল অর্থ কার্পেন্টার বা কাঠমিস্ত্রি, কিন্তু এটি অনূদিত হয়েছে আরমায়িক শব্দ Naggar থেকে, যার অর্থ হতে পারে মিস্ত্রি এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। বাইবেলকে কলুষিত করেছে এমন বেশ কিছু ভুল শব্দানূবাদের মধ্যে এটি একটি। সবচেয়ে বিখ্যাত অবশ্যেই ইসাইয়াহ (Isaiah) এর তরুণ রমণীর হিব্রু almah শব্দ থেকে গ্রিক শব্দ কুমারী (Parthenos) ভ্রান্ত অনুবাদ। খুব সহজেই ভুল হতে পারে (এ ধরনের ভুল কেমন করে হতে পারে সেটা বোঝার জন্য চিন্তা করুন ইংরেজী maid আর maiden); অনুবাদকের এই সামান্য একটু ভুল কিভাবে স্ফীত হয়ে যীশুর মা কুমারী ছিলেন বলে একটা বিশাল কাহিনী তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের আরেকটি কাহিনী কেবল এর সাথে তুলনা হতে পারে, সেটাও অনুবাদ বিভ্রাট এবং এর কেন্দ্রেও আছে কুমারী। ইবন ওয়ারাক এ বিষয়ে দারুণ মজার আলোচনা করেছিলেন, প্রত্যেকটি ইসলামী শহীদদের বিখ্যাত প্রতিশ্রুতি দেয়া আছে তারা মৃত্যুর পর বেহেশতে ৭২ জন কুমারী পাবে উপহার হিসাবে, এখানে এই কুমারী শব্দটা একটি ভ্রান্ত অনুবাদ ‘স্ফটিক স্বচ্ছ সাদা আঙ্গুর’ শব্দটির। শুধু এই বিষয়টা যদি আরো বেশি মানুষ জানতো, কত নিরীহ আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীর জীবন বাচতো ? (ইবন ওয়ারাক, Virgins? What virgins? Free Inquiry 26:1,2006, 45-6);
(৬৩) জর্জ অ্যালবার্ট ওয়েলস (জন্ম ১৯২৮) ইংরেজ লেখক, জার্মান ভাষার অধ্যাপক, যীশুর অস্তিত্ব সংক্রান্ত তার বেশ কিছু বই আছে।
(৬৪) ড্যান ব্রাউন, আমেরিকার ঔপন্যাসিক।
(৬৫) আইজাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৬) ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ;
(৬৬) গ্যালিলেও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২): ইটালির পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, প্রকৌশলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানী।
(৬৭) ইয়োহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) জার্মান গণিতজ্ঞ,জ্যোতির্বিজ্ঞানী
(৬৮) চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) ইংরেজ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্বের প্রবক্তা।
(৬৯) এমন কি আমাকে সম্মানিত করা হয়েছে মৃত্যুশয্যায় ধর্মে ফিরে আসার ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে। আসলে এটা ঘটেছে একঘেয়ে নিয়মিতভাবে। প্রতিটি পুনরাবৃত্তি সেই একই ভ্রমের ধোঁয়া তুলে যাচ্ছে, আমার সম্ভবত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে মরার সময় টেপরেকর্ডার এর ব্যবস্থা করতে হবে যেন আমার মরনোত্তর সম্মানটা বজায় থাকে; লালা ওয়ার্ড (রিচার্ড ডকিন্সের স্ত্রী) এর সাথে যোগ করেছেন: মৃত্যুশয্যা

নিয়ে এত লাফালাফি কেন? নিজেকে যদি বিক্রি করতেই চাও তুমি, সময় থাকতে করা কি ভালো না, যাতে টেম্পলটন পুরষ্কারটি পাওয়া যায় আর দোষটা যদি বার্ধক্যের জরাগ্রস্থতার উপর চাপানো যায়।
(৭০) এলিজাবেথ কটন, লেডি হোপ নামে যিনি পরিচিত, ইংলিশ ধর্মপ্রচারক।
(৭১) জেমস হট, লেখক, সাংবাদিক।
(৭২) মাইকেল ফ্যারাডে (১৭৯১-১৮৬৭) ইংরেজ বিজ্ঞানী, যিনি তড়িৎ-চৌম্বকত্ব আবিষ্কারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন।
(৭৩) জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (১৮৩১-১৮৭৯) স্কটিশ গানিতীক পদার্থবিজ্ঞানী, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম এর তাত্ত্বিক।
(৭৪) উইলিয়াম থমসন (লর্ড কেলভিন) (১৮২৪-১৯০৭) ব্রিটিশ গানিতীক পদার্থবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী।
(৭৫) জর্জ ডারউইন (১৮৪৫-১৯১২) ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ, চার্লস ও এমা ডারউইনের ছেলে।
(৭৬) আর্থার রবার্ট পিকক (১৯২৪-২০০৬) ব্রিটিশ ধর্মতাত্ত্বিক ও প্রাণরসায়নবিদ।
(৭৭) রাসেল স্ট্যানার্ড (জন্ম ১৯৩১) ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী।
(৭৮) জন পোলকিংহর্ন (জন্ম ১৯৩৬) ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী,ধর্মতাত্ত্বিক,যাজক।
(৭৯) ফ্রান্সিস কলিন্স (জন্ম ১৯৫০) চিকিৎসক-জিনবিজ্ঞানী, মানব জিনোম প্রকল্পের পরিচালক, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এর পরিচালক। আনঅফিসিয়াল হিউম্যান জিনোম প্রোজেক্ট এর সাথে মিলিয়ে ফেলা যাবেনা, যার নেতুত্বে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান (এবং ধার্মিক নন), সাহসী, যাকে বিজ্ঞানের বাক্কানিয়ার বা দুঃসাহসী অভিযাত্রী বলা হয়: ক্রেইগ ভেন্টার।
(৮০) জেমস ডিউই ওয়াটসন (জন্ম ১৯২৮) যুক্তরাষ্ট্রের জিনবিজ্ঞানী, ১৯৫৩ সালে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স গঠনের আবিষ্কারক।
(৮১) গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) মোরভিয়ার অগাষ্টিনিয়ান ধর্মযাজক এবং মঙ্ক, তার মৃত্যুর পর তিনি চিহ্নিত হয়েছিলেন জেনেটিক্স এর জনক হিসাবে। বংশগতির গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের আবিষ্কারক।
(৮২) ফ্রান্সিস হ্যারী কম্পটন ক্রিক (১৯১৬-২০০৪) ব্রিটিশ জিনবিজ্ঞানী, জৈবপদার্থবিজ্ঞানী, ডিএনএ গঠন আবিষ্কারকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি জেনেটিক কোড আবিষ্কারের ব্যপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন।
(৮৩) Beit-Hallahmi, B. and Argyle, M. (1997). The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London: Routledge
(৮৪) E. J. Larson and L. Witham, Leading scientists still reject God, Nature 394, 1998, 313
(৮৫) http://www.leaderu.com/ftissues/ft9610/reeves.html এখানে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় মতামতের ঐতিহাসিক প্রবণতা সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের ইতিহাসের অধ্যাপক টমাস সি রীভস এর একটি চমৎকার বিশ্লেষণ আছে। এ বিষয়ে রীভস এর প্রকাশিত গ্রন্থ: Reeves, T. C. (1996). The Empty Church: The Suicide of Liberal Christianity. New York: Simon & Schuster.
(৮৬) R. Elisabeth Cornwell and Michael Stirrat, manuscript in preparation, 2006.
(৮৭) মাইকেল শেরমার (জন্ম ১৯৫৪) লেখক, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ; স্কেপটিকস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের এর প্রধান সম্পাদক।
(৮৮) P. Bell, Would you believe it?, Mensa Magazine, Feb. 2002, 12-13
(৮৯) ব্লেইজ পাসকাল (১৬২৩-১৬৬২) ফরাসী গণিতজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানী, দার্শনিক।
(৯০) নাইসিন ক্রিড: খ্রিস্টীয় ধর্মানুষ্ঠানে বিশ্বাসের সপক্ষে যে শপথনামা পাঠ করানো হয়।
(৯১) ডগলাস অ্যাডামস: ব্রিটিশ লেখক।
(৯২) স্টিফেন ডি. আনউইন, ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী
(৯৩) বোর্ড গেম Cluedo (যুক্তরাজ্য) Clue (উত্তর আমেরিকা) ’র চরিত্র ।

(৯৪) রেভারেণ্ড গ্রিন চরিত্রটি ব্রিটেনে বিক্রি হওয়া Cluedo খেলার একটি চরিত্র (ব্রিটেনেই খেলাটির উৎপত্তি), এছাড়া এটি পাওয়া যায় অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যান্ডে, ভারত এবং অন্যান্য ইংরেজী ভাষাভাষী দেশ, তবে উত্তর আমেরিকায় তার নাম হঠাৎ করে কিভাবে মিঃ গ্রিন হয়ে কেন তা অবশ্য জানা নেই।

(৯৫) অর্থাৎ যদি উপাত্ত সঠিক না থেকে বিশ্লেষণও সঠিক হয় না।

(৯৬) কোয়াট্রেট, চারটি বাদ্যযন্ত্র কিংবা কণ্ঠের কোন সঙ্গীত কম্পোজিশন।

(৯৭) Theodicy বা থিওডিসি, এর খুব সাধারণ অর্থে, একজন দয়ালু ঈশ্বর কিভাবে অশুভ নানা বিষয়কে অনুমতি দেন সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে। থিওডিসি চেষ্টা করে অশুভ বিষয়গুলো উপস্থিতির সমস্যাটিকে একটি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান আর সবচেয়ে দয়ালু উপকারি ঈশ্বরের উপস্থিতির সাথে সমন্বয় করার । এটি দাবী করে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে সম্ভব পৃথিবীতে বিদ্যমান নানা অশুভ উপস্থিতি ও তার কারণে সৃষ্ট সব দুর্দশা সত্ত্বেও। ১৭১০ এ গটফ্রিড লাইবনিজ থিওডিসি শব্দটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন।

(৯৮) পরিসংখ্যানে নাল হাইপোথিসিস (Null hypothesis) শব্দটি সাধারণ বোঝায়, একটি সাধারণ প্রস্তাবনা বা শুরু কোনো অবস্থান যে দুটি পরিমাপ করার মত বিষয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই বা দুটি গ্রুপের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নাল হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান বা খণ্ডন করা মানে পরিসংখ্যানগতভাবে ভিত্তি আছে এমন কোনো উপসংহারে পৌছানো দুটি বিষয়ের মধ্য সম্পর্ক আছে (যেমন কোনো একটি চিকিৎসা পদ্ধতির পরিমাপযোগ্য প্রভাব আছে), আর এটি বিজ্ঞানের আধুনিক অনুশীলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা কোনো একটি হাইপোথিসিসকে প্রত্যাখ্যান করার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্দেশ করে দেয়। সাধারণত নাল হাইপোথিসিসকে সত্যি বলে মনে করা হয় যতক্ষণ না প্রমাণ ভিন্ন কিছু ইঙ্গিত দেয়।

৪ চতুর্থ অধ্যায়
কেন প্রায় নিশ্চিৎভাবে বলা সম্ভব ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্ব নেই

‘বিভিন্ন ধর্মীয় গোত্রের প্রচারকরা....বিজ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে সদা শঙ্কিত, যেমন, কাহিনীর ডাইনীরা শঙ্কিত থাকে ভোরের আলোর আগমনের এবং তাদেরও ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এই সব নিয়তি নির্ধারক অগ্রগতির প্রতি, যারা তাদের ছলছাতূরীর জীবিকার বিভক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে’। - টমাস জেফারসন

দি আলটিমেট বোয়িং ৭৪৭

যুক্তি হিসাবে 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ইমপ্রোবাবিলিটি' বা 'অসম্ভাব্যতা থেকে যুক্তি' সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রচলিত 'আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন' বা 'পরিকল্পনা থেকে যুক্তি'র ছদ্মবেশে অনায়াসে এটি বর্তমানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের সপক্ষে প্রস্তাবিত সবচেয়ে জনপ্রিয় যুক্তি এবং যুক্তিটি বিস্ময়কর সংখ্যক ঈশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ আর পুরোপুরিভাবে বিশ্বাসযোগ্য। অবশ্যই যুক্তিটি খুব শক্তিশালী, এবং আমার ধারণা, উত্তর দেয়া সম্ভব নয় বা উত্তরের অযোগ্য এমন একটি যুক্তি কিন্তু সেটি ঈশ্বরবাদীরা যা বোঝাতে চাইছেন, ঠিক এর বিপরীত অর্থে। অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তি যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে এটার মাধ্যমেই ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব নেই তা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। প্রায় নিশ্চিৎভাবেই ঈশ্বরের যে অস্তিত্ব নেই, সে বিষয়ে পরিসংখ্যানগত প্রমাণ প্রদর্শনকে আমি নাম দিয়েছিলাম: দি আলটিমেট বোয়িং ৭৪৭ গ্যামবিট (১)।

নামটার উৎপত্তি ফ্রেড হয়েলের (২) মজার সেই বোয়িং ৭৪৭ এবং স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড (বা পরিত্যক্ত কিংবা অবাঞ্ছিত লোহা লক্কড় আর নানা যন্ত্রের টুকরো যেখানে ফেলে রাখা হয়) রূপক চিত্রটি; আমি অবশ্য নিশ্চিৎ নই, বিষয়টি হয়েল নিজে কোথাও লিখেছিলেন কিনা, কিন্তু এটি যে তার মন্তব্য সেটি সত্যায়িত করেছিলেন তার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী চন্দ্র বিক্রমাসিংহে (৩) এবং ধারণা করা হয় হয়েলই এই মন্তব্যটি করেছিলেন (৪)। হয়েল বলেছিলেন, পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা, কোনো একটি পরিত্যক্ত লোহা-লক্কড়ের স্তূপের ওপর দিয়ে ঘুর্ণিঝড় বয়ে গেলে, সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ যুক্ত হয়ে ঘটনাক্রমে আস্ত একটি বোয়িং ৭৪৭ উড়োজাহাজ তৈরির হবার যতটুকু সম্ভাবনা, তার চেয়ে খুব একটা বেশি নয়। অন্যরা এই রূপকটি ধার করেছেন বিবর্তন পক্রিয়ায় পরের পর্যায়ে জটিল জীবদেহের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে, যেখানে এর একটি মিথ্যা আপাত-গ্রাহ্যতা আছে। এলোমেলোভাবে বিভিন্ন অংশ নড়াচড়া করে যোগ বিয়োগ করে পুরোপুরি কর্মক্ষম একটি ঘোড়া, গুবরে পোকা বা অস্ট্রিচ পাখী গঠন করার সম্ভাবনাটি সেই লোহা-লক্কড়ের স্তূপে ঘুর্ণিঝড়ের সৃষ্টি বোয়িং ৭৪৭ তৈরি করার মত খুবই উঁচু মাত্রার একটি অসম্ভাব্যতার পর্যায়ে পড়ে। এটাই, মোটামুটি সংক্ষেপে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের সবচেয়ে প্রিয় যুক্তি - আর এই ধরনের একটি যুক্তি শুধুমাত্র এমন কারো পক্ষেই প্রস্তাব করা সম্ভব, যার কিনা প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে সামান্যতম কোনো ধারণা নেই : এমন কেউ যিনি মনে করেন প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে শুধুমাত্র চান্স বা আপতন বা দৈবক্রমে ঘটা বিবর্তনীয় পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে এমন কোনো

তত্ত্ব, অথচ আপতন বা দৈবক্রমে ঘটা বিবর্তনীয় পরিবর্তনের প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষাপটে তা সম্পূর্ণভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ধারণাটির ঠিক বিপরীত।

সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের আত্মসাৎকৃত অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তিটির রূপ সবসময়ই একই সাধারণ রূপ ধারণ করে থাকে এবং সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা একে যতই রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের (৫) চমক দেখানো পোষাকে সজ্জিত করুক না কেন, কোনো গুণগত পার্থক্য সেখানে ঘটেনা। কিছু পর্যবেক্ষণকৃত বিষয় - কখনো একটি জীবিত প্রাণী বা এর জটিল কোনো একটি অঙ্গ, কিন্তু যে-কোনো কিছুই হতে পারে, যেমন কোনো একটি অণু থেকে শুরু করে পুরো মহাবিশ্বকে আসলেই সঠিকভাবে অতি প্রশংসায় মহিমান্বিত করা হয় পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অসম্ভাব্য একটি বিষয় হিসাবে। কখনো তথ্য তত্ত্বের ভাষা ব্যবহৃত হ জীবিত পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান সকল তথ্যের উৎস ব্যাখ্যা করতে ডারউইনবাদীদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। কারিগরী অর্থে, তথ্যভাণ্ডার আসলে অসম্ভাব্যতার একটি পরিমাপ বা 'সারপ্রাইজ ভ্যালু', বা যুক্তিটি হয়তো প্রস্তাবনা করে অর্থনীতিবিদদের বহু ব্যবহৃত মন্ত্র : কোনো কিছুই বিনামূল্যে পাওয়া যায় না - এবং কোনো কিছু না করার বিনিময়ে, অনেক কিছুর কৃতিত্ব দাবী করার জন্য ডারউইনবাদকে অভিযুক্ত করা হয়। আসলে, এই অধ্যায়ে আমি প্রমাণ করবো, ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনই হচ্ছে আমাদের জানা আছে এমন একটি মাত্র সমাধান, যা কিনা, কোথা থেকে তথ্যগুলো এসেছে, অন্যথা এই সমাধানযোগ্য নয় এমন ধাঁধাটিকে ব্যাখ্যা করছে। দেখা যাচ্ছে যে, ঈশ্বর হাইপোথিসিসটি চেষ্টা করছে কোনো কিছু না করেই সব কিছু পাবার জন্য। ঈশ্বর নিজেই বিনামূল্যেই কিছু পেতে চাইছেন এবং বেশ তাই হোক। তবে যত বড় পরিসংখ্যানের মাত্রায় অসম্ভাব্য হোক না কেন, এই সত্তা যা আপনি খুঁজছেন , একটি মহান পরিকল্পনাকারী বা ডিজাইনারের অস্তিত্ব কল্পনা করার মাধ্যমে, কমপক্ষে সেই ডিজাইনারের নিজেকেও অবশ্যই সেই পরিমাণ অনুপাতেই অসম্ভাব্য হতে হবে। ঈশ্বরই হচ্ছেন সেই আল্টিমেট বা প্রকৃতার্থেই বোয়িং ৭৪৭।

অসম্ভাব্যতা থেকে নেয়া যুক্তি দাবী করছে, শুধু চান্স বা আপতনের মাধ্যমে কোনো জটিল কিছুর সৃষ্টি হতে পারে না (৬) । কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এই 'চান্স বা আপতনের মাধ্যমে সৃষ্ট' বক্তব্যটি 'কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পক বা ডিজাইনারের পরিকল্পনা বা ডিজাইন ব্যতীত সৃষ্ট' বক্তব্যটার সমার্থক হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেন। সে কারণেই অবাক হবার কিছু নেই যে তারা অসম্ভাব্যতাকে ডিজাইনের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে মনে করেন। ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রদর্শন করে যে, জীববিজ্ঞানীয় অসম্ভাব্যতার প্রেক্ষাপটে এই ব্যাখ্যা কতটুকু ভ্রান্ত। এবং যদিও ডারউইনবাদ অজৈব জগত, যেমন কসমোলজির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত নয়, কিন্তু এটি আমাদের সচেতনতার স্তরকে উচ্চ একটি স্তরে নিয়ে যায়, এর মূল ক্ষেত্র জীববিজ্ঞানের বাইরেও।

ডারউইনবাদ সম্বন্ধে গভীর ধারণা আমাদেরকে চান্স বা আপতনের একমাত্র বিকল্প হিসাবে প্রস্তাবিত ডিজাইন বা পরিকল্পনার সহজ ধারণাগুলো থেকে সতর্ক থাকতে নির্দেশনা দেয়। এবং আমাদের ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া জটিলতার ক্রমানুসারে সাজানো পথগুলো অনুসন্ধান করতে শেখায়। ডারউইনের আগে যেমন দার্শনিক হিউম বুঝতে পেরেছিলেন, জীবনের অসম্ভাব্যতা মানে কিন্তু এই না যে, একে অবশ্যই পরিকল্পিত হতে হবে, কিন্তু তারা এর বিকল্প কোনো কিছু কল্পনা করতে পারেননি। ডারউইনের পর, পরিকল্পনার ধারণাটি সম্বন্ধে আমাদের সবারই, একেবারে অন্তস্থল থেকে, সন্দেহ অনুভব করা উচিত। ডিজাইন বা পরিকল্পনার এই বিভ্রম বা মায়া আসলেই একটা ফাঁদ, যা এর আগেও আমাদের বোকা বানিয়েছিল, এবং ডারউইনের অসাধারণ তত্ত্বটি আমাদের সচেতনতা জাগিয়ে তুলে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা, আর যদি তাই হতো, তাহলে আমাদের সবার ক্ষেত্রেই তিনি সফল হতেন।

সচেতনতা বর্ধক হিসাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন

কোনো একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর নভোযানে, নভোচারীরা পৃথিবীর জন্য আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন, ‘পৃথিবীতে এখন বসন্তকাল, শুধু এটা ভাবলেই... !’, আপনি হয়তো সাথে সাথে এই বাক্যটির ভুলটা ধরতে পারবেন না, কারণ উত্তর গোলার্ধের শভিনিজম বা নিজেদের সবকিছুর কেন্দ্রে মনে করার প্রবণতা, এখানে আমরা যারা বাস করি তাদের অবচেতন মনে গভীরভাবে খোদাই করা আছে; এমনকি যারা এখানে বাস করেন না তাদের অনেকেরও। ‘অবচেতন’ কথাটাই পুরোপুরি ঠিক আছে। এখানেই সচেতনতা বাড়াবার বিষয়টি আসে। শুধুমাত্র লোক দেখানো মজা করা ছাড়াও, আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ জিল্যান্ডে আপনি পৃথিবীর মানচিত্র কিনতে পারবেন যেখানে দক্ষিণ মেরু উপরের দিকে অবস্থিত। সচেতনতা বাড়াতে এই মানচিত্রগুলো কতই না চমৎকার হতে পারতো, যদি উত্তর গোলার্ধের ক্লাসরুমগুলো দেয়ালে এদের আটকিয়ে রাখা যেত। দিনের পর দিন, সেটি শিশুদের মনে করিয়ে দিত ‘উত্তর’ একটি কাল্পনিক মেরুকরণ, শুধুমাত্র যার একারই সবসময় ‘উপরে’ থাকার একচেটিয়া অধিকার নেই। মানচিত্রটি যেমন তাদের জানতে উৎসাহী করে তুলতো, তেমনি তাদের সচেতনতাও বৃদ্ধি করতো। বাসায় ফিরে তারা তাদের বাবা-মাদের তা বলতো - প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, শিশুদের এমন কিছু শেখানো যা দিয়ে তারা তাদের বাবা-মাদের বিস্মিত করতে পারে, সম্ভবত একজন শিক্ষকের পক্ষ থেকে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো উপহার হতে পারেনা।

নারীবাদীরাই সচেতনতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার শক্তি সম্বন্ধে আমার সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছিল। History না Herstory অবশ্যই হাস্যকর, এমনকি শুধুমাত্র এই কারণে,

যে history শব্দটির মধ্যে His শব্দাংশটির উৎপত্তিগত কোনো সম্পর্কই নেই পুরুষবাচক সেই আপত্তিকর সর্বনামের সাথে। শব্দের উৎপত্তিগত দিক থেকে এটিও হাস্যকর সেই ১৯৯৯ সালে ওয়াশিংটনে একজন সরকারী কর্মকর্তার বরখাস্ত হবার ঘটনাটির মত। যার Niggardly শব্দটি ব্যবহার বর্ণবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল (Niggardly শব্দের আভিধানিক অর্থ: কৃপন, এবং শব্দটার উৎপত্তি কিন্তু কোনো ধরনের বর্ণবাদ ইঙ্গিত করেনা); এমনকি নির্বোধের মত উদাহরণও, যেমন, Niggardly বা Herstory কিন্তু আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। যখন আমাদের দার্শনিক ক্রোধটি প্রশমিত করতে এবং হাসি থামাতে পারবো, Herstory আসলেই আমাদের History কে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে শেখাবে। এই ধরনের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কুখ্যাতভাবে লিঙ্গভিত্তিক সর্বনামগুলোর অবস্থান সবসময় সামনের কাতারে। He বা She অবশ্যই Himself বা Herself কে জিজ্ঞাসা করবে, His বা Her তার শৈলী রুচি কখনো Himself বা Herself কে এভাবে কোনো কিছু লেখার ব্যপারে সম্মতি দেয় কিনা। কিন্তু আমরা যদি ভাষার এই অস্বস্তিকর ধ্বনির সমস্যাটা কাটিয়েছে উঠতে পারি, এটা আমাদের মানব জাতির অর্ধেক অংশের সংবেদনশীলতার প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করবে। Man বা মানুষ, Mankind বা মানবজাতি, Rights of Man বা মানুষের অধিকার, সব Man বা মানুষ সৃষ্টি হয়েছে সমানভাবে, একজন Man বা মানুষ একটি ভোট - ইংরেজী ভাষা প্রায়শই মনে হয় Woman বা নারীদের বর্জন করেছে (৭) ।আমার যখন অল্পবয়স ছিল, আমার কখনো মনে হয়নি কোনো নারী The Future of Man বাক্যটি দ্বারা অপমানিত বোধ করতে পারেন। এরপরের মধ্যবর্তী দশকগুলোতে, আমাদের সবারই এই বিষয়ে সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এমনকি যারা Human এর পরিবর্তে Man ব্যাবহার করেন, তারাও সেটা করেন একটি আত্মসচেতন ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে - অথবা কেউ সচেতন আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে, প্রচলিত ভাষার সপক্ষে অবস্থান গ্রহন করে, এমনকি পরিকল্পিতভাবে নারীবাদীদের উত্যক্ত করতে। সময়ের স্পিরিট বা জাইটগাইস্টের সকল অংশগ্রহনকারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে। এমনকি যারা এর বিরুদ্ধে নেতিবাচক অবস্থান নিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের অবস্থানে অনঢ় আছেন, এবং তাদের আক্রমণও দ্বিগুণ করেছেন।

ফেমিনিজিম বা নারীবাদ আমাদের দেখিয়েছে এর সচেতনতা বৃদ্ধি করার শক্তিময় ক্ষমতা, এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্য আমি সেই কৌশলগুলো ধার করতে চাই। প্রাকৃতিক নির্বাচন পুরো জীবনটাকেই শুধু ব্যাখ্যা করেনা, এটি বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করার ক্ষমতার উপরে আমাদের সচেতনতাকেও বাড়িয়ে দেয়: খুব সরল কোনো সূচনা থেকে কিভাবে প্রত্যক্ষ দিক নির্দেশনা ছাড়াই সংগঠিত জটিলতার উদ্ভব হতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা আমাদের সাহস যোগায় অন্যান্য ক্ষেত্রে সেই ব্যাখ্যাগুলো প্রয়োগ করতে। এই সব অন্য ক্ষেত্রেও আমাদের বিশ্লেষণী সংশয়কে এটি বৃদ্ধি করে,

সেই সব মিথ্যা অপ্রমাণযোগ্য বিকল্প মতামতগুলো সম্বন্ধে, যা প্রাক-ডারউইন পর্বে একসময় জীববিজ্ঞানকে প্রতারিত ও দিকভ্রষ্ট করেছিল। ডারউইনের আগে, কেই বা, অনুমান করতে পেরেছিলেন, ডাগ্রন ফ্লাইয়ের ডানা বা ঈগল পাখির চোখ, আপাতদৃষ্টিতে যা পরিকল্পিত বা ডিজাইন করা মনে হলেও এটি আসলে র‍্যানডোম বা লক্ষ্যহীন নয় (নন-র‍্যানডোম) এমন কোনো প্রক্রিয়া, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সুদীর্ঘ ক্রমবিন্যাসের একটি পরিণতি মাত্র ?

ডগলাস অ্যাডামসের (৮) নিজের বৈপ্লবিক নিরীশ্বাবাদীতে রূপান্তরিত হবার মজার এবং হৃদয়স্পর্শী কাহিনীর বিবরণে 'র‍্যাডিকাল' শব্দটির উপর তিনি জোর দিয়েছেন, যেন আবার কেউ তাকে ভুল করে অজ্ঞেয়বাদী বা অ্যাগনস্টিক মনে না করে বসে - ডারউইনবাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষমতার একটি সাক্ষ্যপ্রমাণ, আমি আশা করি আমাকে, আমার এই আত্মপশ্রয়ের জন্য, যা পরবর্তী উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হবে - ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। আমার অজুহাত হলো যে, আমার আগের বইগুলোর মাধ্যমে ডগলাসের রূপান্তর, যেগুলো অবশ্যই কাউকে রূপান্তরের প্রচেষ্টা নয় - আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বইটি নিবেদন করার জন্য - কিন্তু সেটি তাই করেছিল! একটি সাক্ষাৎকারে, যে সাক্ষাৎকারটি 'দ্য স্যামন অব ডাউট' বইয়ে পুনর্মূদ্রিত হয়েছে, ডগলাসকে একজন সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেমন করে তিনি নিরীশ্বরবাদী হয়েছিলেন, তিনি তার উত্তর শুরু করেছিলেন প্রথমে কিভাবে অজ্ঞেয়বাদী হয়েছিলেন সেটা ব্যাখ্যা করে, তারপর তিনি বলেছিলেন:

> এবং এরপর আমি ভাবতে শুরু করলাম বিরামহীনভাবে, কিন্তু আমার কাছে এভাবে ক্রমাগত চিন্তা করার যাবার মত যথেষ্ট পরিমাণ কিছু ছিল না, সুতরাং আমি কোনো মতামতেও পৌঁছাতে পারিনি। ঈশ্বরের ধারণাটি সম্পর্কে আমার তীব্র একটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু কোনো কিছু সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট পরিমাণ জানা ছিল না, ব্যাখ্যা করার জন্য যা একটা কাজ চালানোর মত মডেল হতে পারে, যেমন, জীবন, মহাবিশ্ব এবং সবকিছু যা বর্তমানে যেভাবে যে অবস্থানে আছে। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি, আমি আমার পড়া এবং চিন্তা দুটোই অব্যাহত রেখেছিলাম। আমার বয়স যখন ত্রিশের শুরুর দিকে হঠাৎ করেই আমার বিবর্তন জীববিজ্ঞান পড়ার সুযোগ হয়, বিশেষ করে, রিচার্ড ডকিন্সের বইয়ের মাধ্যমে, দ্য সেলফিশ জিন এবং পরে দ্য ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার এবং হঠাৎ করেই (আমার মনে হয় দ্য সেলফিশ জিন দ্বিতীয় বার পড়ার সময়) সব কিছু আমার মনে স্পষ্ট হয়ে যায়। সেই ধারণা, যা কি বিস্ময়করভাবে সহজ সরল, কিন্তু সেটাই প্রাকৃতিকভাবে অসীম সংখ্যক এবং হতবাক করে দেবার মত জীবনের নানা জটিল রূপগুলো সৃষ্টি করে। যে শ্রদ্ধা আমার মধ্যে এটি জাগিয়ে তুলেছিল, সেটির তুলনায় মানুষ ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গে যে শ্রদ্ধার কথা বলে

স্পষ্টতই তা হাস্যকর মনে হয়েছিল। কোনো অজ্ঞতাপূর্ণ বিস্ময়কে গ্রহন করার চেয়ে, কোনো কিছু অনুধাবন করার বিস্ময় গ্রহন করতে আমি সদা প্রস্তুত (৯)।

যে বিস্ময়কর সহজ সরল ধারণাটির কথা ডগলাস বলছিলেন, তা অবশ্যই, আমার কোনো বিষয় না। সেটি ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচানের মাধ্যমে বিবর্তন তত্ত্ব - সেই চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধিকারক ধারণাটি। ডগলাস, তোমার অনুপস্থিতি ভীষণভাবে অনুভব করছি, তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে বুদ্ধিমান, কৌতুকময়, সবচেয়ে খোলা মনের, তীক্ষ মেধার, সবচেয়ে বড় এবং সম্ভবত মাত্র একজন রূপান্তরিত অবিশ্বাসী। আমি আশা করছি এই বইটা তোমাকে হাসাবে, অবশ্য তুমি যতটা আমাকে হাসিয়েছ ততটা নয়।

বিজ্ঞানমনষ্ক দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট উল্লেখ করেছিলেন, বিবর্তন আমাদের অন্যতম প্রাচীন একটি ধারণাকে বিরোধিতা করে: "সেই ধারণাটি হলো, অপেক্ষাকৃত ছোটো কোনো কিছু সৃষ্টি করতে কোনো বড় বিশাল বুদ্ধিমান কিছুর প্রয়োজন হয়, আমি একে বলবো ট্রিকল ডাউন থিওরি অব ক্রিয়েশন' বা 'চুইয়ে পড়া সৃষ্টিতত্ত্ববাদের তত্ত্ব'। আপনারা কখনোই দেখবেন না যে একটি বর্শা আরেকটি বর্শাকে , কিংবা ঘোড়ার পায়ের লোহার নালকে আস্ত কামার বা কোনো পাত্র কুমার তৈরি করছে' (১১)। ডারউইনের একটি কার্যকর প্রকাশ আবিষ্কার ঠিক সেই প্রচলিত সজ্ঞা নির্ভর ধারণাগুলোর বিপরীত কাজটাই করেছিল, সেই কারণেই মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে তার অবদান এত বেশি বৈপ্লবিক এবং সচেতনতার স্তর বাড়ানোয় অনেক বেশি ক্ষমতাপুষ্ট।

খুব বিস্ময়কর ব্যপার হচ্ছে, এই সচেতনতা বাড়ানোর প্রক্রিয়াটি কত বেশি প্রয়োজন, এমনকি জীববিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীদের চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার জন্য এটি অসাধারণ। ফ্রেড হয়েল একজন দুর্দান্ত মেধাবী পদার্থবিজ্ঞানী এবং বিশ্বতাত্ত্বিক কিন্তু তার 'বোয়িং ৭৪৭' সংক্রান্ত ভুল অনুধাবন, এছাড়া জীববিজ্ঞান সংক্রান্ত তার করা আরো কিছু ভুল যেমন, আর্কিওপটেরিক্সের জীবাশ্মকে ভেলকিবাজি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা স্পষ্টতই ইঙ্গিত দিচ্ছে, সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি করতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জগত সম্বন্ধে একটি ধারণার তার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি মনে করি, একটি বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু আসলে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নির্যাসের মধ্যে ঢুকে বিষয়টিকে বুঝতে হবে, পুরোপুরি অবগাহন করতে হবে, এর মধ্যে সাঁতার কাটতে হবে, তারপরেই এর আসল শক্তি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা হবে।

বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোও পৃথক উপায়ে আমাদের সচেতনতার স্তর উন্নীত করে। ফ্রেড হয়েলের নিজের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের বিজ্ঞান আমাদের অবস্থান নিশ্চিৎ করেছে এই মহাবিশ্বে, রূপকার্থে এবং আক্ষরিকার্থে, আমাদের দম্ভের আকৃতিকে হ্রাস করে একে বসিয়েছে দিয়েছে খুবই ক্ষুদ্র একটি মঞ্চে যেখানে আমরা আমাদের জীবনের নাটক করে যাচ্ছি - মহাজাগতিক বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট আমাদের এই অতি ক্ষুদ্র ধ্বংসাবশেষে। ভূতত্ত্ববিদ্যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কোনো একক প্রাণী এবং প্রজাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বকালের ব্যাপ্তী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। বিষয়টি জন রাসিকনের (১২) সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছিল এবং উদ্বুদ্ধ করেছিল তার স্মরণীয় হৃদয়গ্রাহী ১৮৫১ সালের উদ্ধৃতিটিকে :'যদি এই ভূতত্ত্ববিদরা আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিতেন। আমি ভালোই ছিলাম, কিন্তু ঐসব ভয়াবহ হাতুড়ীর শব্দ, বাইবেলের প্রতিটি অনুচ্ছেদের শেষে আমি সেই ছন্দময় শব্দ শুনি'; বিবর্তনও ঠিক সেই একই কাজ করেছিল সময় সংক্রান্ত আমাদের ধারণার সাথে। ব্যপারটা বিস্ময়কর নয়, যেহেতু এটি ভূতাত্ত্বিক সময়ের মাপকাঠিতেই তার কাজ করে আসছে। কিন্তু ডারউইনীয় বিবর্তন, বিশেষ করে প্রাকৃতিক নির্বাচন আরো বেশি কিছু করে। এটি জীববিজ্ঞানের পুরো সীমানায় পরিকল্পনার বিভ্রম সংক্রান্ত সেই মায়াকে চুর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে, এবং আমাদের পদার্থবিদ্যা বা কসমোলজী বিষয়ে যে-কোনো ধরনের পরিকল্পনার হাইপোথিসিসকে সন্দেহের চোখে দেখতে শিখিয়েছে। আমি মনে করি পদার্থবিদ লিওনার্ড সাসকিন্ড (১৩) এই কথাগুলো ভেবেই লিখেছিলেন: 'ইতিহাসবিদ নই, তবে আমি আমার একটি মতামত দেবো, আধুনিক কসমোলজীর যাত্রার আসল সূচনা হয়েছিল ডারউইন এবং ওয়ালেসের মাধ্যমে। তাদের মত করে এর আগে কেউই আমাদের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারেননি, যেখানে পুরোপুরিভাবে অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তি বা এজেন্টদের উপস্থিতিকে অস্বীকার করা হয়েছে। ডারউইন এবং ওয়ালেস শুধুমাত্র জীববিজ্ঞানের জন্যই একটি মানদণ্ড দিয়ে যাননি, কসমোলজির জন্য তা দিয়ে গেছেন'। অন্যান্য ভৌত বিজ্ঞানীদের মধ্যে যাদের এই ধরনের কোনো সচেতনতার স্তর বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই তাদের অন্যতম ভিক্টর স্টেঙ্গার (১৫), যার বই 'হ্যাস সায়েন্স ফাউন্ড গড?' (বা বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে?), এর উত্তর হচ্ছে না), আমি সবাইকে পড়ার জন্য উৎসাহিত করছি এবং পিটার অ্যাটকিন্স (১৬), যার 'ক্রিয়েশন রিভিজিটেড' আমার সবচেয়ে প্রিয় কাব্যিক বৈজ্ঞানিক গদ্য।

আমি প্রায়শই সেই সব ঈশ্বরবাদীদের দেখে অবাক হই, আমি যেভাবে প্রস্তাব করেছি, সেভাবে তাদের সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি হবার বদলে, তারা বরং আনন্দিত এই ভেবে যে, 'প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে তার সৃষ্টিকে এই পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরের একটি পন্থা'। তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবী ভরা বিভিন্ন জীবের সমারোহ সৃষ্টিতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তন হচ্ছে খুবই সহজ এবং চমৎকার একটি উপায়। ঈশ্বরের কিছুই করা লাগবে না! পিটার অ্যাটকিন্স, তার কিছুক্ষণ আগে উল্লেখ করা বইটি ঠিক এই চিন্তার

সূত্রটি নিয়ে শুরু করে একটি যুক্তিগ্রাহ্য ঈশ্বরহীন উপসংহারে উপনীত হয়েছিলেন, যখন তিনি প্রস্তাব করেন, একজন কল্পিত অলস ঈশ্বর যিনি চেষ্টা করেছেন যত সহজে কম কষ্টে জীবনের উপস্থিতিসহ একটি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা যায়। অ্যাটকিন্সের অলস ঈশ্বর অষ্টাদশ শতাব্দীর এনলাইটেন্টমেন্ট বা নবজাগরনের যুগের ডেইষ্ট বা একাত্মবাদীদের ঈশ্বরের তুলনায় আরো বেশি অলস: deus otosius; আক্ষরিক অর্থে বিশ্রামরত ঈশ্বর, ব্যস্ততাহীন, কর্মহীন, অপ্রয়োজনীয়, বাড়তি। ধীরে ধীরে অ্যাটকিন্স অলস ঈশ্বরের করণীয় কাজকে এমন একটা পর্যায়ে কমিয়ে আনতে সফল হন, যে পরিশেষে দেখা যায়, তার আসলেই কোনো কাজ নেই ; সেক্ষেত্রে বরং তার কোনো অস্তিত্ব থাকারই কি দরকার। আমি আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট শুনতে পাই উডি অ্যালেনের একটি গভীর অনুধ্যানের সেই বিলাপ: ‘অবশেষে যদি দেখা যায়, আসলেই কোনো ঈশ্বর আছেন, আমি মনে করি না তিনি খুব খারাপ কোনো চরিত্র হবেন, কিন্তু সবচেয়ে খারাপ যেটা আপনি তার সম্বন্ধে বলতে পারেন তা হলো, আসলে তার যতটুকু অর্জন করার কথা ছিল, সেটা করতে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছেন’।

ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (১৭) বা অসরলযোগ্য জটিলতা

খুবই বড় মাপের একটি সমস্যা, যা আসলেই অতিরঞ্জন করা প্রায় অসম্ভব, তারই সমাধান করেছিলেন ডারউইন এবং ওয়ালেস। আমি শারীরস্থান, কোষের গঠন, প্রাণরসায়ন এবং আক্ষরিকার্থে যে-কোনো জীবিত প্রাণীর আচরণ থেকে উদাহরণ দিতে পারি, তবে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী লেখকরা আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনার সবচেয়ে চমৎকার কীর্তি হিসাবে যেসব সাফল্যগুলো বেছে নেয়া নিয়েছে (এবং অবশ্যই সুস্পষ্ট কারণে) এবং খানিকটা হালকা শ্লেষাত্মক কৌতুকময়তার মাধ্যমে আমিও আমারগুলো খুঁজে পেয়েছি সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের একটি বই থেকে, যার নাম: ‘লাইফ - হাউ ডিড ইট গেট হেয়ার’; বইটির লেখকের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি, তবে বইটি প্রকাশ করেছে ‘দি ওয়াচটাওয়ার বাইবেল’এবং ট্র্যাক্ট সোসাইটি, মোট ১৬টি ভাষায়, প্রায় ১১ মিলিয়ন কপি, এবং স্পষ্টতই বেশ জনপ্রিয়, কারণ এই এগারো মিলিয়ন কপির কমপক্ষে ছয়টি আমাকে অযাচিত উপহার হিসাবে প্রেরণ করছেন পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শুভাকাঙ্খীরা।

এই অজ্ঞাতনামা লেখকের বিপুল সংখ্যক সংখ্যায় প্রকাশিত এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত এই বইটির পৃষ্ঠাগুলো এলোমেলোভাবে উলটে দেখলে, আমরা একটি স্পঞ্জ খুঁজে পাই, যার আরেক নাম ‘ভেনাস ফ্লাওয়ার বাস্কেট’ (১৮)। এর সাথে আবার, যে-কোনো কারো না, খোদ স্যার ডেভিড অ্যাটেনবুরোর (১৯) উদ্ধৃতি যোগ করা হয়েছে: ‘আপনি যখন স্পঞ্জদের জটিল কংকাল লক্ষ করেন, যেমন, যেগুলো তৈরি সিলিকার স্পিকিউল বা সুচের মত সরু কণা দিয়ে যা ভেনাস ফ্লাওয়ার বাস্কেট নামে পরিচিত, কল্পনাও হতবাক

হয়ে যায়। কেমন করে প্রায় স্বাধীন আণুবীক্ষণিক একগুচ্ছ কোষ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ কাঁচের (সিলিকা) কাঠামো বা স্প্লিন্টার নিঃসরণ করে এবং এরকম একটি জটিল ও সুন্দর জাফরি বা ল্যাটিস কাঠামোটি তৈরি করেছে? আমরা জানিনা'।ওয়াচটাওয়ারের লেখকরা এখানে তাদের তীর্যক মন্তব্য যুক্ত করে দিতে কালক্ষেপণ করেননি: কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানি, 'চান্স বা আপতন খুব সম্ভবত এর ডিজাইনার না'। এই একটা বিষয়ে আমরা সবাই একমত হতে পারি। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি ঘটার পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা যেমন, ইউপ্লেকটেলার কংকাল হচ্ছে সেই কেন্দ্রীয় সমস্যাটির উদাহারণ, জীবনের যে-কোনো তত্ত্বকে সেটার সমাধান করতে হবে; আর যত বেশি পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা থাকবে, এর সমাধান হিসাবে চান্স বা আপতন ততই তা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হবে: অসম্ভাব্যতার অর্থ বলতে সেটাই বোঝায়। কিন্তু অসম্ভাব্যতার এই ধাঁধাঁর সম্ভাব্য সমাধান দুটি কিন্তু ডিজাইন এবং চান্স বা আপাতন না, যা সাধারণত ভুলভাবেই দাবী করা হয়ে থাকে, বরং সেগুলো হচ্ছে ডিজাইন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন। চান্স অবশ্যই কোনো সমাধান নয় যখন জীবিত প্রাণীদের মধ্যে উঁচু মাপের অসম্ভাব্যতা আমরা দেখি। কোনো সুস্থ জীববিজ্ঞানী সমাধান হিসাবে কখনোই এমন কিছু প্রস্তাব করেননি, ডিজাইনও আসল সমাধান নয়, কেন নয়, আমরা পরেই দেখবো। কিন্তু আপাতত আমি, জীবন সংক্রান্ত যে-কোনো তত্ত্বের যে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে, তাহলো 'চান্স' থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে - সেই সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা অব্যাহত রাখতে চাচ্ছি।

ওয়াচটাওয়ারের পাতা উল্টাতে গিয়ে আমরা দারুণ আরো একটি গাছ সম্বন্ধে জানতে পারি, যা পরিচিত 'ডাচম্যানস পাইপ' (২০) নামে। এর প্রতিটি অংশ দেখে মনে হয়, পোকামাকড় আকর্ষণ করার জন্য এটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাদের আকৃষ্ট করে ধরার পর তাদের গায়ে রেণু মাখিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় অন্য ডাচম্যানস পাইপ ফুলের পরাগায়নের লক্ষ্যে। ফুলটির অসাধারণ সূক্ষ্ম জটিলতা ওয়াচটাওয়ারের লেখকদের বেশ আন্দোলিত করেছে একটি প্রশ্ন করতে: এসব কি ঘটেছে চান্স বা আপতনের মাধ্যমে? নাকি, এটা ঘটেছে কোনো বুদ্ধিমান সত্তার ডিজাইন বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা পরিকল্পনা মাধ্যমে? আরো একবার আমি পুনরাবৃত্তি করছি, অবশ্যই চান্সের মাধ্যমে এটা ঘটেনি। এবং আবারো, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন চান্সের কোনো সঠিক বিকল্প না। প্রাকৃতিক নির্বাচন শুধুমাত্র যে একটা বাহুল্যবর্জিত প্রক্রিয়া তাই নয়, একটি ব্যাখ্যা উপযোগী এবং অসাধারণ সুন্দর একটি সমাধান; এটি একমাত্র কর্মক্ষম প্রক্রিয়া, যা চান্সের বিকল্প হিসাবে প্রস্তাব করা হয়েছে। শুধু একমাত্র কর্মক্ষম বিকল্প চান্সের যা প্রস্তাব করা হয়েছে। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনও চান্সের মতোই একই সমস্যার মুখোমুখি; কোনোভাবেই এটি পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতার ধাঁধার ব্যাখ্যা দেবার মত সমাধান নয়। যত বেশি অসম্ভাব্যতা তত বেশি ব্যাখ্যার অযোগ্য হতে থাকে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন। স্পষ্টভাবে দেখলে, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সমস্যাটিকে দ্বিগুণে

রূপান্তরিত করে। আরো একবার, এর কারণ ডিজাইনার নিজেই (Himself/Herself/itself) তাৎক্ষণিকভাবে তার নিজের উৎপত্তি কিভাবে হলো, সেই বৃহত্তর সমস্যাটি সৃষ্টি করে। যে-কোনো একটি বুদ্ধিমান সত্তা, যার কিনা ডাচম্যানস পাইপের (বা মহাবিশ্ব) মত কোনো অসম্ভাব্য কিছু পরিকল্পনা করার ক্ষমতা আছে, তাহলে সেই সত্তাটি নিজেই ডাচম্যানস পাইপের তুলনায় আরো বেশি অসম্ভাব্য হবে। এই ভয়ঙ্কর পশ্চাৎমুখী ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী কারণে ফিরে যাবার প্রক্রিয়াটি (রিগ্রেস) থামানোর বদলে, ঈশ্বর এটি উস্কে দেন আরো তীব্র প্রতিহিংসায়।

ওয়াচটাওয়ারের আরেকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখুন, জায়ান্ট রেড উড (২১) সম্বন্ধে প্রাণবন্ত একটি বিবরণ পাওয়া যাবে। এই গাছটার প্রতি আমার খানিকটা বাড়তি দুর্বলতা আছে কারণ আমার বাগানে এই গাছটি আছে - অবশ্য সেটি শুধু শিশু মাত্র, বড় জোর এক শতাব্দী বয়স হবে, কিন্তু তারপরও এটি এই এলাকায় সবচেয়ে দীর্ঘতম গাছ। “একজন সামান্য মানুষ, সেকোইয়ার নীচে দাড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে নীরব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন এর সুবিশাল বিশালত্ব দেখে; একমাত্র সুপরিকল্পিত ডিজাইন ছাড়া অন্য আর কোনো বিশ্বাস কি অর্থবহ হতে পারে, এই রাজকীয় দানবাকৃতির বৃক্ষ এবং এর ছোটো বীজের ক্ষেত্রে, যা এর আকৃতি ধারণ করে” । আবারো, আপনি যদি মনে করেন ডিজাইনের একমাত্র বিকল্প হচ্ছে ‘চান্স’, তাহলে না, এটি কোনো অর্থ বহন করে না। কিন্তু এখানে লেখকরা সত্যিকারের বিকল্প ব্যাখ্যাটিকে উহ্য রেখেছেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন, হচ্ছে এর কারণ, তারা আসলেই এটি বোঝেন না, বা তারা সেটি প্রকাশ করতে চান না।

যে প্রক্রিয়ায় কোনো উদ্ভিদ, তা সে ছোটো পিম্পারনেল হোক কিংবা সুবিশাল ওয়েলিংটনিয়া হোক না কেন, তাদের তৈরি করা জন্য শক্তি তৈরি করে, তা হলো সালোক সংশ্লেষণ। ওয়াচটাওয়ারের আবারো ৭০ টি পৃথক রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়, যা একজন জীববিজ্ঞানীর ভাষায়, ‘সত্যিকারের অলৌকিক একটি ঘটনা।সবুজ গাছদের বলা হয় প্রকৃতির ফ্যাক্টরী - সুন্দর, শান্ত, দুষণহীন অক্সিজেন উৎপাদনকারী, পানি চক্রকে গতিশীল রাখা, সারা পৃথিবীর খাদ্যের যোগান দেয়া। তাদের কি আসলেই উদ্ভব হয়েছে চান্সের মাধ্যমে? সত্যিই কি কথাটা বিশ্বাসযোগ্য’? না, অবশ্যই তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু নানা উদাহরণের এইভাবে পুনরাবৃত্তি করে কোনো আলোচনাই আসলে সামনে আগায় না। সৃষ্টিতত্ত্ববাদী ‘যুক্তি’ সবসময়ই একই। কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা পরিসংখ্যানগত দিক থেকে আসলেই অসম্ভাব্য, অনেক জটিল, অনেক সুন্দর, অনেক বেশি বিস্ময়কর, শুধু মাত্র ‘চান্সের’ মাধ্যমে তাদের সৃষ্টি হবার জন্য বিষয়টা খুবই বিস্ময়কর। চান্সের একমাত্র বিকল্প ডিজাইনকেই শুধু এই লেখকরা কল্পনা করতে পারেন। সুতরাং একজন পরিকল্পনাকারী নিশ্চয়ই এসব করেছেন। এই ভ্রান্ত যুক্তির প্রতি বিজ্ঞানের উত্তরও

সবসময় এক। চান্সের একমাত্র বিকল্প ডিজাইন নয়। এর চেয়ে উত্তম বিকল্পটি হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন। ডিজাইন আসলেই সত্যিকারের কোনো বিকল্প নয়, কারণ এটি যে সমস্যার সমাধান করছে, তার চেয়ে আরো বড় একটি সমস্যারও সৃষ্টি করছে: ডিজাইনারকে তাহলে কে ডিজাইন করেছে? পরিসংখ্যানগত দৃষ্টিতে কোনো অসম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করতে চান্স এবং ডিজাইন দুটোই ব্যর্থ হয়, কারণ, একটি হচ্ছে সমস্যা এবং আরেকটি প্রথম সমস্যার দিকে ক্রমান্বয়ে পশ্চাৎমুখী পূর্বধারণায় ফিরে যাবার নিরন্তর প্রক্রিয়া। প্রাকৃতিক নির্বাচনই হচ্ছে সত্যিকারের সমাধান। এখন পর্যন্ত প্রস্তাবিত সমাধানগুলোর মধ্যে এটি একমাত্র পরীক্ষা করা সম্ভব এমন কার্যকরী একটি সমাধান। শুধুমাত্র কর্মক্ষম সমাধানই নয়, বিস্ময়কর সুন্দর এবং শক্তিশালী একটি সমাধান।

তাহলে কোন বিষয়টি প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সফল করেছে এই অসম্ভাব্যতার সমস্যার সফল সমাধান হিসাবে, যেখানে একেবারে শুরুতে চান্স এবং ডিজাইন দুটোই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে? এর উত্তর হচ্ছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে ক্রমবর্ধমান 'পুঞ্জীভূত' একটি প্রক্রিয়া, যা অসম্ভাব্যতার সমস্যাটিকে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অংশে বিভাজিত করে ফেলে। প্রতিটি ছোটো অংশ খানিকটা অসম্ভাব্য হতে পারে, তবে চূড়ান্তভাবে অসম্ভব নয়। বহু সংখ্যক খানিকটা বা ঈষৎ অসম্ভব এই ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে একের পর এক যখন সজ্জিত হয়, এই সমষ্টিগত ক্রম উত্তরণের শেষ ফলাফলটি আসলেই খুবই বেশি অসম্ভাব্য মনে হতে পারে; আর চান্সের সীমানার বাইরে সেই অসম্ভাব্যতা। এই সব চূড়ান্ত রূপগুলো সৃষ্টিতত্ত্ববাদীর ক্লান্তিকর বহুব্যবহৃত যুক্তির বিষয়ে পরিণত হয়েছে। একজন সৃষ্টিতত্ত্ববাদী মূল বিষয়টি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ এই ব্যক্তিটি (আমি পুরুষবাচক সর্বনাম ব্যবহার করছি, অন্তত এখানে নারীরা এই সর্বনাম দ্বারা নিজেদের বঞ্চিত হবার জন্য কিছু মনে করবেন না) বার বার জোর করছেন পরিসংখ্যানগত অসম্ভব ব্যপারটি সৃষ্টিতে একটি একক বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে, তিনি ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভুত হতে থাকা পরিবর্তনের শক্তি বোঝেন না।

আমি আমার 'ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইমপ্রোবাবল' বইটিতে একটি রূপকধর্মী উদাহরণ ব্যবহার করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম: যে-কোনো একটি পর্বতের যে পাশটা একেবারে খাড়া সেদিক দিয়ে এই পর্বতটি আহোরণ করা বা বেয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু এটি সেই মাত্রায় অসম্ভব নয় অন্য দিকে, ক্রমশ উঁচু হতে থাকা ঢালু পাশ দিয়ে, যা কিনা ধীরে ধীরে চুড়ায় গিয়ে মিশেছে। ধরা যাক এই চুড়ায় বা শীর্ষবিন্দুতে আছে জটিল কোনো অঙ্গ, যেমন একটি চোখ বা ব্যাক্টেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাকে চলন শক্তি দেয় এমন কোনো জৈব মটর। আর এখানে মনে করা হয় এমন উদ্ভট ধারণাটি হচ্ছে এই ধরনের জটিলতা পূর্ণ কোনো অঙ্গ, যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের তৈরি করে ফেলে, যাকে তুলনা করা যায় পাহাড়ের নীচ থেকে এক লাফে পাহাড়ে চুড়ায় উঠার মত কোনো

একটি ব্যপার। কিন্তু বিবর্তন ঠিক এর বিপরীত, পাহাড়ের খাড়া দিকটি বাদ দিয়ে এটি অন্য পাশের ঢালু দিয়ে ক্রমান্বয়ে এই প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে পাহাড় চুড়ায়তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছায়: সহজ ! হালকা, ধীরে ধীরে বাড়তে থাকা উচ্চতার ঢাল বেয়ে শীর্ষে পৌছাবার মূলনীতিটি, একলাফে নীচ থেকে পাহাড় চুড়ায় ওঠার মূলনীতি থেকে অনেক বেশি সরল। যে কারো বিস্মিত হবার সম্ভাবনা থাকে, কেন একজন ডারউইনের এই দৃশ্যে আসতে এবং বিষয়টি আবিষ্কার করতে এত সময় লাগলো । যখন তিনি কাজটা শেষ করেন, ততদিনে প্রায় তিন শতাব্দী পেরিয়ে গেছে নিউটনের অ্যানাস মিরাবিলিস বা চমৎকার সেই বছর থেকে, যদিও তার কীর্তি সুস্পষ্টভাবে ডারউইনের কীর্তির চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ছিল।

চূড়ান্ত অসম্ভাব্যতার আরেকটি প্রিয় রূপক হচ্ছে ব্যাংক সিন্দুকের কম্বিনেশন লক বা তালা। তাত্ত্বিকভাবে, একজন ব্যাংক ডাকাত ভাগ্যক্রমে সেই সংখ্যাগুলো চান্স বা দৈবক্রমে পেতে পারেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অসম্ভাব্যতাকে যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কোনো ব্যাংকের কম্বিনেশন লক যথেষ্ট সতর্কতার সাথে পরিকল্পিত, ফ্রেড হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ এর মত প্রায় অসম্ভব। কিন্তু এর বদলে কল্পনা করুন একটি খানিকটা বাজেভাবে ডিজাইন করা একটি কম্বিনেশন লক, যা ধীরে ধীরে তার গোপন সংখ্যাগুলো প্রকাশ করে, শিশুদের 'হান্ট দি স্লিপার' খেলাটির শুরু অনুশীলনের মত (২৩)। মনে করুন যখনই লকটি প্রত্যেকটি ডায়াল তাদের সঠিক সেটিং এ এসে পৌছায় দরজাটি খুব সামান্য একটু খোলে, এবং ভল্ট থেকে কিছু টাকা গড়িয়ে পড়ে সেই আংশিক খোলা জায়গাটি দিয়ে, চোর এভাবেই খুব তাড়াতাড়ি তার মূল লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা যারা তাদের অবস্থানের সপক্ষে অসম্ভাব্যতা থেকে যুক্তি ব্যবহার করেন, তারা সবসময় ধরে নেন জীববিজ্ঞানের অভিযোজন অনেকটা লটারিতে 'জ্যাকপট' জেতা, নয়তো কোনো কিছু সম্ভবপর নয়। এই হয় 'জ্যাকপট জেতা, নয়তো কোনো কিছু নয়', এই ভ্রান্ত ধারণাটির অন্য নাম 'ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি' বা অসরলযোগ্য জটিলতা। হয় একটি চোখ তার দেখার কাজ করবে, নয়তো না, হয় পাখনা বা ডানা উড়তে সাহায্য করবে, নয়তো না, কৌশলে ধারণা করে নেয়া হয়েছে প্রজাতি সদস্যদের জন্য এদের মধ্যবর্তী কোনো উপযোগী বা কাজে আসতে পারে এমন কোনো অবস্থার অস্তিত্ব নেই। কিন্তু তাদের এই ধারণাটি পুরোপুরি ভুল। প্রকৃতি পর্যায়ে এই ধরনের অন্তবর্তীকালীন অসংখ্য উদাহরণ বিদ্যমান, এবং ঠিক সেটাই কোনো তত্ত্বে আমাদের আশা করা উচিত। জীবনের কম্বিনেশন লক হচ্ছে, 'খানিকটা গরম হচ্ছে, তারপর ঠান্ডা আবার গরম হবার' হান্ট দ্য স্লিপার খেলার সেই কৌশলের মত; আসল জীবন সেই অসম্ভাব্যতার পর্বত চুড়ায় পৌঁছাতে বেছে নেয় পর্বতের অন্য দিকের সেই ঢালু পথ,

অন্য দিকে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা তাদের সামনের পর্বতের উঁচু খাড়া পিঠ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে অন্ধ।

ডারউইন তার 'অরিজিন অব স্পিসিস' বইটির পুরো একটি অধ্যায় উৎসর্গ করেছিলেন 'পরিবর্তনের সাথে বংশক্রমাগমের তত্ত্বের সমস্যাগুলো' সম্বন্ধে। পক্ষপাতহীনভাবে বলা যায় এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়টি, আজ অবধি প্রস্তাব করা হয়েছে এমন প্রতিটি তথাকথিত সমস্যাই পূর্বধারণা করেছিল, এবং এটি তা খণ্ডনও করেছে। সবচেয়ে বড় যে সমস্যাগুলো ছিল, ডারউইনের 'অতি নিখুঁত সূক্ষ্ম এবং জটিলতম অঙ্গগুলো', যা কখনো কখনো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয় 'ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্স' বা অসরলযোগ্য জটিল অঙ্গ হিসাবে। ডারউইন সুনির্দিষ্টভাবে চোখের কথা উল্লেখ করেছিলেন বিশেষ চ্যালেঞ্জ হিসাবে: 'বিভিন্ন দূরত্বে দেখার লক্ষ্যে ফোকাস ঠিক করার মাধ্যমে চোখের ভিতর প্রবেশ করা আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ, আলো এবং লেন্সের নানা অসঙ্গতিগুলোকে খাপ খাইয়ে নিয়ে সংশোধন করার জন্য চোখের অননুকরণীয় নানা কৌশলগুলো, এইসব বৈশিষ্ট্যগুলো তৈরি হতে পারে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে, আমি দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিচ্ছি, মনে হতেই পারে এটি খুবই বড় মাত্রার কোনো উদ্ভট ভাবনা'; সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা সাধারণত তীব্র আনন্দের সাথে এই বাক্যটির উদ্ধৃতি দেয় বার বার। বলাবাহুল্য, অবশ্যই তারা এরপরের বাক্যগুলো কখনোই উদ্ধৃতিটিতে যোগ করেন না। অতি নম্রতার সাথে ডারউইনের এই ধরনের অকপট স্বীকারোক্তি আসলে উপস্থাপনার একটি কৌশল ছিল মাত্র। তিনি এই কথা দিয়ে তার বিরোধীদের তার দিকে টেনে নিচ্ছিলেন, কারণ তিনি চাচ্ছিলেন যখন আসল কথাটা বলবেন, তখন যেন তার কথাগুলো ঠিক জায়গামত আঘাত করে। এই আঘাতটা অবশই, ডারউইনের অনায়াসে দেয়া সেই ব্যাখ্যা কিভাবে পুঞ্জীভূত ক্ষুদ্র ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে চোখের বিবর্তন ঘটেছিল। ডারউইন হয়তো 'অসরলযোগ্য জটিলতা' কিংবা 'ধীরে ধাপে ধাপে অসম্ভাব্যতার চুড়ায় ওঠা' এসব বাক্যগুলো ব্যবহার করেননি, কিন্তু তিনি স্পষ্টতই দুটোর মূলনীতি বুঝেছিলেন।

'অর্ধেক চোখের কি কোনো উপকারিতা আছে?' এবং 'অর্ধেক ডানারই বা কি উপকারিতা আছে?' এই দুই ক্ষেত্রেই যুক্তিটা এসেছে অসরলযোগ্য জটিলতা থেকে। স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে কাজ করতে পারে এমন কোনো একটি একক কিছুকে 'অসরলযোগ্য জটিলতা' বলা হয় তখনই, যখন এর কোনো একটি অংশ যদি অপসারণ করা হয়, তখন আর এটি কাজ করতে পারে না ; চোখ এবং পাখার ক্ষেত্রে, ধারণা করে আসা হয়েছে এই ব্যপারটা স্বপ্রমাণিত। কিন্তু যখনই আপনি এই ধারণাটি নিয়ে কয়েক মুহূর্ত ভাববেন, আপনি সাথে সাথে এর ভুলটা বুঝতে পারবেন। চোখের লেন্সে ছানি পড়া হবার পর সেই লেন্সটি অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সরানোর পরে চশমা ছাড়া কেউই স্পষ্ট করে কিছু দেখতে পারেন না। কিন্তু তাসত্ত্বেও তাদের যে দেখার ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে

সেটি তাদের কোনো গাছের সাথে ধাক্কা খাওয়া বা পাহাড়ের খাঁদ থেকে নীচে পড়ে যাওয়া থেকে কিন্তু রক্ষা করতে পারে। অর্ধেকটা ডানা অবশ্যই কোনো ডানা না থাকার চেয়ে উপকারি। অর্ধেকটা ডানা কিন্তু কারো জীবন বাঁচাতে পারে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উঁচু কোনো গাছ থেকে তার নিচে পড়াটা খানিকটা মসৃণ করে। প্রায় ৫১ শতাংশ পাখা আরো খানিকটা উঁচু থেকে পড়াটা সহজ করবে, যে পরিমাণ পাখাই আপনার থাকুক না কেন, সেই অনুযায়ী কোনো একটি উচ্চতা থেকে পড়ার সময় সেটা কাজে দেবে, যেখানে তার চেয়ে ছোটো কোনো আংশিক পাখা কোনো কাজে আসবে না। এই বিভিন্ন উচ্চতার চিন্তার পরীক্ষাটি, যেখান থেকে কেউ পড়ে যেতে পারেন, হচ্ছে একটি উপায়ে বিষয়টি দেখা, যে তাত্ত্বিকভাবেই অবশ্যই ক্রমবর্ধমান সুবিধার একটি মাত্রার বিস্তার আছে ,শতকরা ১ ভাগ ডানা থেকে পুরোপুরি শতকরা ১০০ ভাগ ডানা। বনে জঙ্গল এই ধরনের গ্লাইডিং বা প্যারাস্যুট করে আংশিক উড়তে পারা প্রাণীদের দিয়ে পূর্ণ, যারা বাস্তবে অসম্ভবের সেই পর্বত চুড়ার দিকে প্রতিটি ধাপের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বিভিন্ন উচ্চতার গাছের সাথে তুলনা করলে কল্পনা করতে সহজ হবে সেই পরিস্থিতিগুলো ভাবা, যখন অর্ধেক (৫০%) চোখ কোনো প্রাণীর জীবন বাঁচাবে এমন কোনো পরিস্থিতিতে যেখানে ৪৯% চোখ ব্যর্থ হবে। মসৃণ একটি ক্রমবিন্যাস যদি সৃষ্টি করা হয় আলোর তীব্রতার মাত্রাকে পরিবর্তন করে এবং কোনো শিকারকে বা আপনাকে শিকার করবে এমন কোনো শিকারীকে যে দূরত্ব থেকে চোখে পড়তে পারে তার তারতম্য সৃষ্টি করার মাধ্যমে, পাখার মতোই বা উড়বার উচ্চতার মত সম্ভাব্য নানা অন্তবর্তীকালীন অবস্থা কল্পনা করাও কঠিন হবে না; এবং প্রাণীজগতে তাদের সংখ্যার কোনো কমতি নেই। কোনো একটি কেঁচোর যে চোখ আছে , যে-কোনো যুক্তিগ্রাহ্য হিসাবে, তা মানুষের চোখের অর্ধেকের চেয়েও কম। নটিলাসের (এবং হয়তো এর বিলুপ্ত আমোনাইট পরিবারের অন্যান্য জ্ঞাতি প্রাণিরা, যারা প্যালিওজোয়িক এবং মেসোজোয়িক সাগরে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল) চোখ মানুষ এবং কেঁচোর মাঝামাছি একটা অবস্থান হতে পারে। কেঁচোর চোখ, যা আলো এবং ছায়া শনাক্ত করতে পারে, কিন্তু কোনো ছবি নয়, তার থেকে নটিলাসের চোখ আলাদা, ‘পিনহোল’ ক্যামেরার মত যা আসল দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে। কিন্তু আমাদের চোখের তুলনায় যা ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। এই ক্রমশ উন্নতিকে কোনো সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করাটা মিথ্যা পরিমাপ হবে, তবে সুস্থ মনের কেউই অস্বীকার করতে করতে পারবেন না যে এই অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের চোখ এবং আরো অনেক ধরনের চোখ, অবশ্যই কোনো চোখ না থাকার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। এবং এদের সবার অবস্থান অসম্ভাব্যতার চূড়ার দিকে - একটি অবিচ্ছিন্ন, ক্রমশ ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকা। প্রায় চুড়ার কাছাকাছি আমাদের চোখ, অবশ্যই একেবারে চুড়ায় না তবে যথেষ্ট সুউচ্চে যার অবস্থান। আমি ‘ক্লাইম্বিং মাউন্ট ইমপ্রোবাবল’ বইটিতে একটি পুরো অধ্যায় করে চোখ এবং ডানার বিবর্তন নিয়ে ব্যাখ্যা করেছি, দেখিয়েছি ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে

বিবর্তিত হওয়া আসলে কত সহজ (বা এমনকি হয়তো অত বেশি ধীরেও না); এবং এখানে এ বিষয়ে বক্তব্য আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না।

সুতরাং আমরা দেখেছি যে, চোখ কিংবা পাখা, কোনোটাই অবশ্যই অসরলযোগ্য জটিলতার অঙ্গ নয়, তবে যা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো: এই উদাহরণ থেকে আমরা সাধারণ কোন শিক্ষাটা পাচ্ছি। এবং বাস্তবতা হচ্ছে যে কত বেশি মানুষ খুব স্পষ্ট এই বিষয়টি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা পোষণ করেন, তা যেন এর চেয়ে খানিকটা অস্পষ্ট অন্যান্য উদাহরণগুলো বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের জন্য একটা সাবধানবাণী হয়ে থাকে, যেমন কোষ এবং প্রাণরাসায়নিক নানা উদাহরণগুলোর ক্ষেত্রে, যার দালালী করছেন ঐসব সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা, যারা রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক সুভাষণ 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' তাত্ত্বিকের আড়ালে এখন আশ্রয় নিয়েছেন।

একটি সতর্কতা জ্ঞাপন মূলক কাহিনী আছে এখানে, যা আমাদের বলছে: কোনো কিছুকেই অসরলযোগ্য জটিল বলে ঘোষণা দেবেন না; সম্ভাবনা আছে যে, আপনি আসলেই যথেষ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে দেখেননি, অন্যদিকে, আমরা যারা বিজ্ঞানের পক্ষে, আমাদেরও পুরোপুরি অন্ধ আত্মবিশ্বাসী হবারও অবশ্যই দরকার নেই, হয়তো প্রকৃতিতে সত্যি এমন কিছু আছে যা তার সত্যিকারের অসরলযোগ্য জটিলতার মাধ্যমে আসলেই অসম্ভাব্যতার পর্বত চূড়ার দিকে মসৃণ ক্রম উন্নতির ধারাবাহিকতাকে অসম্ভব করে তুলতে পারে। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা ঠিকই বলেন, সত্যিকারের 'অসরলযোগ্য জটিলতা' স্পষ্টভাবে যদি প্রমাণ করে তারা দেখাতে পারেন, এটি ডারউইনের তত্ত্বটিকে ভিত্তিহীন হিসাবে প্রমাণ করবে। ডারউইন নিজেও বলেছেন: 'যদি প্রমাণ করে দেখানো সম্ভব হয় এমন কোনো জটিল অঙ্গের অস্তিত্ব আছে, যা কোনোভাবেই অসংখ্য, ধারাবাহিক, সামান্য পরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব হওয়া সম্ভব হয়নি, আমার তত্ত্বটির ভিত্তি পুরোপুরিভাবে ভেঙ্গে পড়বে, কিন্তু আমি এমন কোনো উদাহরণ পাইনি'। ডারউইন এমন কোনো উদাহরণ পাননি, অনেক কষ্টকর, প্রায় মরিয়া হয়ে চেষ্টা করার পরও আর কেউই তা পাননি সেই ডারউইনের সময় থেকে আজ অবধি। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের এই কাঙ্ক্ষিত 'হলি গ্রেইল' হিসাবে অনেক উদাহরণকে অসরলযোগ্য জটিলতার যোগ্য প্রার্থী হিসাবে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, কিন্তু কোনোটাই বিজ্ঞানীদের নীরিক্ষার সামনে টিকতে পারেনি।

যা-ই হোক না কেন, সত্যিকারের অসরলযোগ্য জটিল কোনো উদাহরণ যদি কখনোও খুঁজে পাওয়া যায়, সেটি ডারউইনের তত্ত্বকে ধ্বংস করবে। তাহলে কি অন্যভাবে বলার উপায় আছে যে, এটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বকে ধ্বংস করতে পারবে না? আসলেই, এটি ইতোমধ্যেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করেছে, কারণ যা আমি বলে আসছি এবং বলা অব্যাহত রাখবো আবার, ঈশ্বর সম্বন্ধে আমরা যত

সামান্যই জানিনা কেন, একটা ব্যপারে আমরা নিশ্চিৎ, তাকে খুব, খুব বেশি মাত্রায় জটিল হতে হবে এবং অনুমেয়ভাবে অসরলযোগ্য মাত্রায় জটিল।

শূন্যস্থানের উপাসনা

সামনে অগ্রসর হবার জন্য 'অসরলযোগ্য জটিলতার' সুনির্দিষ্ট উদাহরণ অনুসন্ধান করা অবশ্যই মৌলিকভাবে বিজ্ঞানসম্মত কোনো উপায় নয়: সেটা হবে বর্তমান অজ্ঞতা থেকে নেয়া যুক্তির একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। এর আবেদন সেই ভ্রান্ত যুক্তিটি ঘিরে, যা পরিচিত The God of the gaps বা শূন্যস্থানগুলোর ঈশ্বর কৌশল হিসাবে, যার বিশেষ নিন্দা করেছিলেন প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ ডিয়েট্রিশ বনহোয়েফার (২৪)। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা দারুণ উৎসাহে বর্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞানের শূন্যস্থানগুলোর সন্ধান করেন, যদি আপাতদৃষ্টিতে কোনো শূন্য স্থান পাওয়া যায়, ধরে নেয়া হয় ঈশ্বর আমোঘ নিয়মানুযায়ী সেই শূন্য স্থানটি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। বনহোয়েফারের মত চিন্তাশীল ধর্মতাত্ত্বিকদের, যেটা ভাবায় তা হলো বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে এই শূন্যস্থানগুলোও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে, এবং ঈশ্বর ক্রমশ কর্মহীন কিংবা লুকিয়ে থাকার মত জায়গার অভাবের হুমকির মুখোমুখি হচ্ছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভাবায় অন্য কিছু। বিজ্ঞানের সাথে জড়িত সকল কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় একটি অংশ হচ্ছে অজ্ঞতাকে স্বীকার করা, এমনকি ভবিষ্যতে জয় করার একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে এই অজ্ঞতায় উল্লাসিত হওয়া। আমার বন্ধু ম্যাট রিডলী (২৫) যেমন লিখেছিলেন, 'অধিকাংশ বিজ্ঞানী, তারা যা আবিষ্কার করে ফেলেছেন, সে বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। নতুন অজানা কিছু বা অজ্ঞতাই তাদের সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা। আধ্যাত্মবাদীরা রহস্যে উল্লসিত হয় এবং রহস্যময়তাকে টিকিয়ে রাখতেই তারা চান, বিজ্ঞানীরা রহস্যের মুখোমুখি আনন্দিত হন অন্য কারণে: কারণ এটা তাদের কিছু করার সুযোগ করে দেয়। খুব সাধারণভাবে, আমি অধ্যায় আটে এই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করবো, ধর্মের সবচেয়ে ক্ষতিকর একটি দিক হলো, এটি আমাদের শিক্ষা দেয়, কোনো কিছু না বুঝে সন্তুষ্ট থাকাটাই হচ্ছে একটি ভালো গুণ'।

অজ্ঞতাকে স্বীকার করে নেয়া এবং এর সাময়িক রহস্যময়তা ভালো বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নিদেনপক্ষে কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, বিষয়টা এ কারণে দূর্ভাগ্যজনক, সৃষ্টিতত্ত্ববাদী প্রচারণাকারীদের প্রধান কৌশলটিই নেতিবাচক, যার উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে আপাতত শূন্যস্থানগুলো খুঁজে বের করা এবং তা সাধারণভাবেই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন দিয়ে পূর্ণ করা। পরের উদাহরণটা যদিও হাইপোথিসিস নির্ভর তবে এটাই সচরাচর দেখা যায়: একজন সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বলছেন, 'লেসার স্পটের উইজেল ব্যাঙের কনুইয়ের অস্থিসন্ধি হচ্ছে অসরলযোগ্যভাবে জটিল। এর কোনো অংশই একক ভাবে কার্যকর নয়, যতক্ষণ না সবগুলো অংশ এক সাথে যুক্ত

না হয়। বাজি রাখছি আপনি কোনোভাবেই এমন কোনো উপায় দেখাতে পারবেন না, যেখানে উইজেল ব্যাঙের কনুই ধীরে ধীরে ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে'। যদি বিজ্ঞানীরা এর একটি তাৎক্ষণিক এবং বোধগম্য উত্তর দিতে ব্যর্থ হন, সাথে সাথেই সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা তাদের সেই একটাই বহুব্যবহৃত উপসংহার টানেন: "বেশ তাহলে সেক্ষেত্রে বিকল্প তত্ত্ব, 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' স্বভাবত বিজয় লাভ করেছে"। এখানে পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তিটা খেয়াল করুন: যদি তত্ত্ব 'ক' কোনো ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, তাহলে তত্ত্ব 'খ' অবশ্যই সঠিক হবে। বলাবাহুল্য যে বিপরীত ক্ষেত্রে কিন্তু যুক্তিটি সেভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। আমাদেরকে বিকল্প তত্ত্বে ঝাপিয়ে পড়ে সমর্থন দেবার জন্য উৎসাহ দেয়া হচ্ছে, যখন এটি যে তত্ত্বকে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব দিচ্ছে, সেই তত্ত্বটির মতো সেই বিশেষ ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটিও ব্যর্থ হচ্ছে কিনা, সেই বিষয়ে কোনো অনুসন্ধান ছাড়াই। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে সবকিছু থেকেই নিঃশর্ত ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে, বিবর্তন তত্ত্বকে যে সুকঠিন প্রমাণের দাবীর মুখোমুখি হতে হয়, তা থেকে একে দেয়া হয়েছে লোভনীয় একটি সুরক্ষা, যেন কোনো জাদুর রক্ষা-বলয়।

কিন্তু এখানে আমার বর্তমান বক্তব্যটি হচ্ছে, সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের চাতুরীর কারণে, অনিশ্চয়তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের স্বাভাবিক - যা আসলেই প্রয়োজনীয় - আনন্দকে তুচ্ছ করে যে দেখা হয়, সে বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। শুধুমাত্র খাঁটি রাজনৈতিক কারণে আজকের বিজ্ঞানীরা হয়তো বলতে ইতস্তত করেন: 'হুম, বেশ কৌতূহলের একটি বিষয় তো, আমিও ভাবছি কেমন করে উইজেল ব্যাঙের পূর্বসূরিদের মধ্যে এই কনুইয়ের অস্থিসন্ধিটা বিবর্তিত হয়েছিল। আমি উইজেল ব্যাঙ বিশেষজ্ঞ নই, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে যেতে হবে এবং ব্যপারটা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, হয়তো কোনো গ্রাজুয়েট ছাত্রের জন্য এটি চমৎকার একটি গবেষণা প্রকল্প হতে পারে', যে মুহূর্তে একজন বিজ্ঞানী এইভাবে উত্তর দেবেন, এবং কোনো ছাত্রের এই প্রকল্প শুরু করার বহু আগেই - সেই একই সুপরিচিত শিরোনাম দেখা যাবে সৃষ্টিতত্ত্বাদীদের প্রচারণা পত্রে: 'উইজেল ব্যাঙের পরিকল্পনা একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন'।

এখানে সেই দুর্ভাগ্যজনকভাবে, গবেষণার দিক নির্দেশনায় অজ্ঞাত বিষয়গুলোকে অনুসন্ধান করতে বিজ্ঞানের পদ্ধতিগত প্রয়োজনীয়তা এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মতবাদীদের সেই অজ্ঞাত স্থানগুলোকে খুঁজে বের করে বিজয় দাবী করার প্রবণতা যুক্ত হয়ে আছে। তাদের যে নিজস্ব কোনো প্রমাণ নেই, এবং বিজ্ঞানের আপতত না জানা শূন্যস্থানগুলোয় এটি যে আগাছার মত বৃদ্ধি পায়, ঠিক এই সত্যটাই, খানিকটা অস্বস্তির সাথেই সহাবস্থান করে বিজ্ঞানের এই সব শূন্যস্থানগুলোকে শনাক্ত এবং সেই একই শূন্যস্থানগুলোকে গবেষণার সূচনা বলে দাবী করার প্রয়োজনীয়তার সাথে। এই অর্থে, বিজ্ঞান তার মিত্র খুঁজে পায় মুক্তবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন ধর্মতত্ত্ববিদদের সাথে, যেমন

বনহয়েফার। তাদের এই কৌশলগত ঐক্য হতে পারে নির্বোধ, জনতুষ্ঠকারী ধর্মতত্ত্ব এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের এর শূন্যস্থান পূজারী নামের যৌথ শত্রুর মুখোমুখি।

জীবাশ্ম রেকর্ডে ‘শূন্যস্থানগুলোর’ সাথে সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের প্রেম তাদের পুরো শূন্যস্থান পূজারী ধর্মতত্ত্বের প্রতীক। আমি একবার ক্যামব্রিয়ান পর্বেও জীবনের বৈচিত্র্যের বিস্ফোরণ নিয়ে একটি অধ্যায় শুরু করেছিলাম এই বাক্যটি দিয়ে: ‘যেন বিবর্তনের কোনো ইতিহাস ছাড়াই জীবাশ্মগুলো সেখানে কেউ সাজিয়েছে রেখেছে। কিন্তু, সেটা ছিল একটি অধ্যায় সুচনা করার লক্ষ্যে ভাষার আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবহার, পুরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার আগে যার উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের কৌতূহল আর জানার তৃষ্ণাকে জাগিয়ে তোলা। বিষণ্ণভাবে এখন ভাবছি, কত বেশি সহজ ছিল ব্যপারটি বোঝা যে, সেখান থেকে উৎসাহী চতুরতার সাথে আমার বর্ণিত বিস্তারিত ব্যাখ্যাটি সযত্নে ছেটে ফেলে দেয়া হবে, আর ভূমিকার সেই ছোটো বাক্য তাদের নিজস্ব মতাদর্শকে সমর্থনের লক্ষ্যে আনন্দের সাথে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃতি দেয়া হবে। সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা জীবাশ্ম রেকর্ডে ‘শূন্যস্থান’ দারুণ ভালোবাসেন, যেমন সাধারণত যে-কোনো জ্ঞানের শূন্যস্থানগুলো তাদের খুব পছন্দের।

অনেক বিবর্তনীয় পরিবর্তন অসাধারণ সুন্দরভাবে কম বেশি অবিচ্ছিন্ন এবং ক্রমান্বয়ে ধীরগতিতে পরিবর্তন হওয়া ক্রান্তিকালীন জীবাশ্মগুলোর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। কিছু আবার নেই, এবং সেটাই সেই বিখ্যাত শূন্যস্থান। মাইকেল শেরমার তার তীক্ষ্ম বুদ্ধির সাথে মন্তব্য করেছিলেন, ‘যদি নতুন কোনো জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়, যা ঠিক মাঝখান থেকে কোনো জীবাশ্মের শূন্যস্থানকে দ্বিধাবিভক্ত করে, তারপরও সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা ঘোষণা দিতে দ্বিধা করবেন না যে, এখন এখানে তাহলে দ্বিগুণ শূন্যস্থান!’ যা-ই হোক না কেন, লক্ষ করুন সেই আবারো প্রচলিত ধারণার অযাচিত ব্যবহার। যদি প্রস্তাবিত বিবর্তনীয় পরিবর্তনের কোনো জীবাশ্ম না পাওয়া যায়, সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের গতানুগতিক ধারণাটি হলো, কোনো বিবর্তনীয় পরিবর্তন হয়নি, সুতরাং ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোনো হস্তক্ষেপ করেছেন।

বিবর্তন বা বিজ্ঞান, যেটাই হোক না কেন, এর কোনো কিছুর ব্যাখ্যার প্রতিটি ধাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ দাবী করাটা হবে পুরোপুরি অযৌক্তিক। এরকম দাবী করার মানে যেন, কাউকে খুনী হিসাবে অভিযুক্ত করার জন্য চলচ্চিত্রের মতো সম্পূর্ণ ঘটনাটির, অর্থাৎ হত্যা করার আগে খুনির প্রতিটা পদক্ষেপের রেকর্ড উপস্থিত করার জন্য দাবী করা, যেখানে একটা ফ্রেমও বাদ পড়া চলবে না। সমস্ত জীব মৃতদেহের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ আসলে জীবাশ্মীভূত হয়েছে, আমরা আসলেই ভাগ্যবান, যতটুকু পাওয়ার কথা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি অন্তবর্তীকালীন প্রাণী জীবাশ্ম আমরা খুঁজে পেয়েছি। কোনো জীবাশ্ম না পাওয়ার সম্ভাবনাই তো ছিল বেশি, কিন্তু তারপরও বিবর্তনের প্রমাণ

আমরা পেতাম অন্য উৎস থেকে, যেমন আণবিক জিনতত্ত্ব এবং প্রজাতিদের ভৌগলিক বিস্তার বা বায়োজিওগ্রাফী থেকে, এবং সেগুলোই এককভাবেই যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। অপর দিকে বিবর্তন দৃঢ়ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করছে যদি একটি জীবাশ্মও ভুত্বকের কোনো প্রস্তাবিত স্তর ছাড়া অন্য কোনো ভুল স্তরে পাওয়া যায়, পুরো তত্ত্বই আসলে ভিত্তিহীন হয়ে যাবে। জে. বি. এস. হলডেনকে (২৬) যখন একজন অতি উৎসাহী পপার (২৭) অনুসারী চ্যালেঞ্জ করেছিলে, কিভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে সেটি বলতে। হলডেন তার বিখ্যাত গর্জন করে বলেছিলেন, প্রি-ক্যামব্রিয়ান স্তরে যদি খরগোশের জীবাশ্ম খুঁজে পাওয়া যায়। এই ধরনের কোনো সময়-বিপরীত জীবাশ্ম আজ অবধি খুঁজে পাওয়া যায়নি, যদিও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের কয়লার স্তরে মানুষের খুলি বা ডায়নাসরদের সাথে মানুষের পায়ের চিহ্ন পাওয়ার বানোয়াট কাহিনী সত্ত্বে।

শূন্যস্থানগুলো সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের মনে প্রথাসিদ্ধভাবে কেবল ঈশ্বর পূরণ করতে পারেন। একই নীতি প্রয়োগ করা হয় সেই অসম্ভাব্যতার পর্বত চুড়ায় ওঠার আপাতদৃষ্টিতে সেই খাড়া উঁচু পাশটির ক্ষেত্রে, যেখানে ধীরে ধীরে চুড়ায় ওঠার ঢালটি সাথে সাথে চোখে পড়ে না, কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে উপেক্ষা করা হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উপাত্তের ঘাটতি আছে বা বোঝার এখনো ঘাটতি আছে, সেই জায়গাগুলো বিনাবাক্য ব্যয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ঈশ্বরের কৃপায় ছেড়ে দেয়া হয়। খুব দ্রুত নাটকীয়ভাবে কোনো কিছুকে অসরলযোগ্য জটিলতা হিসেবে দাবী করার মধ্যে আশ্রয় নেয়ার কৌশল তাদের কল্পনাশক্তির অভাবকেই ইঙ্গিত করে। কিছু জৈব অঙ্গ, যদি চোখ না হয়, তাহলে ব্যাকটেরিয়া ফ্ল্যাজেলার মটর বা কোনো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া, কোনো অতিরিক্ত ব্যাখ্যা কিংবা যুক্তি ছাড়াই অবিভাজ্যভাবে জটিল বলে ঘোষণা দেয়া হয়, এবং এই জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার কোনো ‘প্রচেষ্টাই’ করা হয় না। চোখ, ডানা এবং আরো অনেক কিছুর সতর্কতামূলক কাহিনী সত্ত্বেও এই সন্দেহজনক দাবীর প্রতিটি নতুন প্রার্থীকে সুস্পষ্টভাবে স্বপ্রমাণিত অসরলযোগ্য জটিলতাপূর্ণ পদ্ধতি হিসাবে ধরে নেয়া হয়, এবং এর ওপর সেই পদমর্যাদা আরোপিত করা হয়, যেন কোনো ঐশী ডিক্রি বা ফিয়াটের (২৮) মাধ্যমে এটি সৃষ্টি হয়েছে। তবে ব্যপারটা একটু ভেবে দেখুন। যেহেতু অসরলযোগ্য জটিলতা ব্যবহার করা হচ্ছে পরিকল্পনার পক্ষে একটি জোরালো যুক্তি হিসাবে, সুতরাং পরিকল্পনার চেয়ে কিন্তু এটি বেশি ফিয়াট বা ডিক্রির দাবী করতে পারে না। এর চেয়ে আপনি বরং সরাসরি আরোপ করে দাবী করুন, উইজেল ব্যাঙ পরিকল্পনার চিহ্ন বহন করে (বোমবার্ডিয়ার বিটল ইত্যাদি) কোনো যুক্তি বা সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই, কিন্তু সেটা বিজ্ঞানের পথ নয়।

এবং দেখা যায় যুক্তিও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয় না এর চেয়ে যেমন: আমি (এখানে নিজের নাম যোগ করুন) ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করে আর কোনো উপায় দেখছি না, যে

কিভাবে ধাপে ধাপে (এখানে কোনো জৈববৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ বা বৈশিষ্ট্যের নামটি যোগ করুন) তৈরি হতে পারে। সুতরাং এটি অসরলযোগ্যভাবেই জটিল। এর মানে হচ্ছে এটি ঈশ্বর কর্তৃক পরিকল্পিত। এভাবে আপনি বিষয়টি প্রকাশ করে দেখুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে আপনি দেখতে পাবেন এটি কোনো বিজ্ঞানীর একটি অন্তবর্তীকালীন রূপ খুঁজে বের করা কিংবা অন্ততপক্ষে কল্পনা করার ঝুঁকির মুখে পড়ে গেছে। এমনকি যদি কোনো বিজ্ঞানী কোনো ব্যাখ্যা নিয়ে এগিয়ে না আসেনও, শুধুমাত্র কোনো কিছুকে ‘ডিজাইন’ মনে করার বাজে যুক্তির কারণে এটি কোনো সুবিধা করতে পারবে না। ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ভিত্তির যুক্তি অলস এবং পরাজয়বাদী - সেই প্রথাগত ‘শূন্যস্থান পূর্ণ করা ঈশ্বরের’ যুক্তি। আমি অতীতে এটিকে নাম দিয়েছিলাম ব্যক্তিগত অবিশ্বাস থেকে আসা যুক্তি।

কল্পনা করুন আপনি আসলেই একটি অসাধারণ ম্যাজিক কৌশল দেখছেন। যাদুকর জুটি পেন এবং টেইলরের একটা প্রচলিত জাদু ছিল, তারা একই সাথে মঞ্চে এসে একে অপরকে পিস্তল দিয়ে গুলি করবেন, এবং দুজনেই সেই বুলেট দাঁত দিয়ে আটকে দেবেন। প্রথমেই বেশ সতর্কতার সাথে দুটি বুলেটে শনাক্তকারী চিহ্ন দেয়া হয় পিস্তলে ঢোকানোর আগে, পুরো প্রক্রিয়াটা কাছ থেকে দেখানো হয় দর্শকদের মধ্য থেকে নেয়া স্বেচ্ছাসেবকদের যাদের আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সব ধরনের ছলচাতুরীর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দেখা গেল টেইলরের দাগ দেয়া বুলেট পেনের মুখে, পেনের দাগ দেয় বুলেটটি টেইলরের মুখে; আমি (রিচার্ড ডকিন্স) সম্পূর্ণভাবে অন্য কোনো উপায়ে কিন্তু ভাবতে পারছি না, এটা যে একটা চালাকি হতে পারে। ব্যক্তিগত অবিশ্বাস থেকে আসা যুক্তি আমার প্রাকবৈজ্ঞানিক মস্তিষ্কেও কেন্দ্র থেকে চিৎকার করে বলছে, এবং আমাকে প্রায় বাধ্যও করেছে বলতে যে, ‘এটা তো একটি অলৌকিক ঘটনা, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই, এটি অতিপ্রাকৃত হতে বাধ্য’। কিন্তু আমার মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষুদ্র একটি আওয়াজ বলছে অন্য কথা। পেন এবং টেইলর বিশ্বসেরা জাদুকর জুটি। নিশ্চয়ই এর একটা সঠিক ভালো ব্যাখ্যা আছে। আমি শুধু এই বিষয়ে কম জানি, বা বিষয়টি বেশি ভালো করে লক্ষ করিনি বা কল্পনা শক্তির দুর্বলতার কারণে বিষয়টি ভেবে উঠতে পারছি না এই যা। এটাই জাদুকরী কোনো কৌশলের উচিত জবাব হতে পারে। এবং এটিও জীববিজ্ঞানের নানা প্রাকৃতিক ঘটনার, যা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে অসরলযোগ্য জটিলতা এর ক্ষেত্রেও সঠিক প্রতিক্রিয়া হতে পারে। যে মানুষগুলো প্রাকৃতিক কোনো ঘটনার প্রতি ব্যক্তিগত হতভম্বতা থেকে দ্রুত অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যার শরণাপন্ন হন, তারা ঐসব নির্বোধদের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়, যারা এই ধরনের জাদুকরদের চামচ বাঁকা করতে দেখেন, এবং সেটিকে ‘অতিপ্রাকৃত’ বলে আখ্যা দেন।

স্কটল্যান্ডের রসায়নবিদ এ. জি. কেয়ার্ন স্মিথ (২৯) তার ‘সেভেন ক্লুস টু অরিজিন অফ লাইফ’ বইটিতে একটি খিলানের উদাহরণ ব্যবহার করে আরো একটি অতিরিক্ত বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, অমসৃণভাবে কাটা পাথর দিয়ে তৈরি, কোনো সিমেন্ট ছাড়া, স্বাধীনভাবে দাড়ানো কোনো খিলান কিন্তু একটি ভারসাম্যপূর্ণ স্থায়ী স্থাপনা হতে পারে; তবে এটি অসরলযোগ্যভাবে জটিল, কারণ একটা পাথর যদি মূল কাঠামো থেকে সরানো হয় তবে পুরো আর্চটাই ধ্বসে পড়বে। তাহলে প্রথমেই বা এটা কিভাবে তৈরি হলো। একটা উপায় হলো একসাথে অনেকগুলো পাথর একসাথে জড়ো করে একটা একটা করে পাথর সরানো। সাধারণত এমন অনেক কাঠামোর উদাহরণ আছে তারা অসরলযোগ্য সেই অর্থে যে, এদের কোনো অংশ বাদ দিলে এটি আর তার কাঠামোগত ঐক্য টিকিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু তারা তৈরি হয়েছিল একটি কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই, যা পরবর্তীতে সরিয়ে ফেলা হয় এবং এখন যা আর দৃশ্যমান নয়। বিবর্তনেও একই ঘটনা ঘটে, কোনো অঙ্গ বা কোনো স্ট্রাকচার যা আপনি দেখছেন তারও এমন একটি কাঠামো ছিল তার পূর্বসূরি প্রাণীদের শরীরে, যা এর পরবর্তী প্রজন্মে অপসারিত হয়েছে।

অসরলযোগ্য জটিলতা নতুন কোনো ধারণা নয়, কিন্তু ১৯৯৬ সালে (৩১) সৃষ্টিতত্ত্ববাদী বিজ্ঞানী মাইকেল বিহি (৩০) এই শব্দটি আবিষ্কার করেছেন। তাকে কৃতিত্ব দেয়া হয় (অবশ্য যদি কৃতিত্ব এখানে সঠিক শব্দ হয়ে থাকে) সৃষ্টিতত্ত্ববাদকে জীববিজ্ঞানের নতুন শাখার দিকে নিয়ে যাবার জন্য, তা হলো: প্রাণরসায়ন এবং কোষ বিজ্ঞান, সম্ভবত তার দৃষ্টিতে চোখ কিংবা পাখার চেয়ে এই ক্ষেত্রগুলোয় শূন্যস্থান শিকার করা বেশ সহজ মনে হয়েছিল। ভালো উদাহরণ হিসাবে তার সেরা প্রচেষ্টা (যদিও খারাপ একটা উদাহরণ) হলো ব্যাক্টেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার মটর।

প্রকৃতির একটি অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির নমুনা হলো ফ্ল্যাজেলার মটর। মানুষের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি বাদ দিলে, এটি প্রকৃতিতে আমাদের জানা একটি মাত্র উদাহরণ, যা স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে এমন একটি অ্যাক্সল (Axle) বা অক্ষদণ্ডে গতি সঞ্চার করে। আমার বরং মনে হয়, এর চেয়ে বড় আকারের প্রাণীদের জন্য গোলাকার চাকার উপস্থিতি সত্যিকারে অসরলযোগ্য জটিলতার উদাহরণ হতে পারতো। সম্ভবত এজন্যই প্রকৃতিতে এদের কোনো অস্তিত্ব নেই। কেমন করেই বা স্নায়ু বা রক্ত নালী নানা ধরনের বিয়ারিঙের স্তর পার হতো (৩২)? ফ্ল্যাজেলাম হলো সুতার মত একটি প্রপেলার, যার মাধ্যমে কিছু ব্যাকটেরিয়া পানির মধ্যে চলাফেরা করে অনেকটা গর্ত খুড়ে খুড়ে, আমি গর্তে খুড়ে খুড়ে বলছি, সাতার বলছি না, কারণ ব্যাকটেরিয়া পর্যায়ে তার অস্তিত্বে পানিকে আমাদের মত তরল মনে হবে না, তাদের কাছে মনে হবে, জেলি বা তরল গুড় বা এমন কি বালির মত কোনো মাধ্যম। এবং ব্যাক্টেরিয়ার মনে হবে সে তার মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ বা গর্ত করে চলাফেরা করছে, সাতার নয়। আরেকটু বড় কোনো জীবের ক্ষেত্রে

ফ্লাজেলামের মত যেমন প্রোটোজোয়া, ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাম চাবুকের মত ঢেউ তোলে না বা নৌকার দাঁড় টানার মত আচরণ করে না। সত্যি সত্যি এর একটি স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে এমন 'অ্যাক্সল' আছে, যা ক্রমাগত ঘুরতে থাকে একটি বিয়ারিং সদৃশ জৈব কাঠামোর মধ্যে, এটিকে গতিশীল রাখে খুব ছোটো একটি অসাধারণ মটর। আণবিক পর্যায়ে এই মটর মাংসপেশীর মত একই মূলনীতি ব্যবহার করে, তবে সবিরাম বা থেমে থেমে সংকোচনের বদলে এটি ঘুরতে পারে (ঘুর্ণনক্ষম) (৩৩) ; বেশ আনন্দের সাথে এটি বর্ণনা করা হয়েছে ক্ষুদ্র আউটবোর্ড মটর হিসাবে, যেমন, যান্ত্রিক নৌকার বাইরে থাকা ইঞ্জিনের মত (যদিও প্রকৌশলগত দিক থেকে এবং ব্যতিক্রমী একটি জৈব সিস্টেম হিসেবেও এটি খুব বেশি মাত্রায় একটি অদক্ষ মটর)।

কোনো যুক্তিযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের একটি শব্দ ছাড়াই, ব্যাখ্যা বা বিস্তারিত কোনো আলোচনা ছাড়াই বিহি এক কথায় ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার মটরটিকে 'অসরলযোগ্য জটিল' দাবী করেছিলেন। 'দাবী' করেছিলেন, যেহেতু তার দাবীর সপক্ষে তিনি কোনো যুক্তি দিতে পারেননি, আমরা শুরু করতে পারি, তার কল্পনাশক্তির ব্যর্থতা দিয়ে। তিনি আরো দাবী করেন, বিশেষায়িত জীববিজ্ঞানের গবেষণাপত্রগুলো নাকি ব্যপারটি উপেক্ষা করেছে; তার এই অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণ করতে বিহির জন্য ভয়াবহ রকম বিব্রতকর বিশালকায় প্রমাণ সম্ভার পেনসিলভ্যানিয়ায় ২০০৫ সালে বিচারপতি জন ই. জোনসের আদালতে দাখিল করা হয়েছিল, যেখানে বিহি সৃষ্টিতত্ত্ব মতবাদী একটি গোষ্ঠীর পক্ষে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই গোষ্ঠীটি স্থানীয় পাবলিক স্কুলে বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীতে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' মোড়কে সৃষ্টিতত্ত্ববাদকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। বিচারপতি জোনসের ভাষায় তাদের সেই পদক্ষেপ হচ্ছে, 'অবিশ্বাস্যরকম নির্বুদ্ধিতার' একটি পদক্ষেপ (বিচারপতি জোনসের এই বাক্য এবং তিনি নিজেও নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন)। এই বিচারের সময়েই শুধু বিহি এই বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি, আমরা অচিরেই তা দেখবো।

কোনো কিছুকে অসরলযোগ্য জটিল হিসাবে প্রমাণ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, প্রমাণ করে দেখানো যে, পৃথকভাবে এর কোনো অংশই স্বতন্ত্রভাবে কর্ম উপযোগী নয়, বা তারা একক ভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। এদের একক ভাবে কাজ করার পূর্বশর্ত হলো, তাদের প্রত্যেকটি অংশকে এক জায়গায় একত্র হতে হবে (বিহি'র প্রিয় উদাহরণ ছিল 'মাউস ট্র্যাপ'); বাস্তবে আণবিক জীববিজ্ঞানীদের বেশি পরিশ্রম করতে হয়নি প্রমাণ করে দেখাতে যে, পুরো একটি একক ছাড়াও স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারা এর নানা অংশগুলোকে, যেমন, ফ্ল্যাজেলার মটর এবং বিহির অন্যান্য অসরলযোগ্য জটিল হিসাবে দাবী করা উদাহরণের ক্ষেত্রে। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী কেনেথ মিলার ভালো বলেছিলেন, 'আমি যদি বাজি

রাখতে চাই, তবে এটাই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের সবচেয়ে সফল প্ররোচনাদায়ী শত্রু’, সবচেয়ে কম নয় কারণ তিনিও একজন নিবেদিত প্রাণ খ্রিস্টান। আমি প্রায়ই ধর্মবিশ্বাসীদের মিলারের বই পড়ার জন্য উপদেশ দেই, যারা নিজেদের বিহির ধোকাবাজির শিকার বলে মনে করেন, যেমন, ‘ফাইণ্ডিং ডারউইনস গড’।

ব্যাকটেরিয়ার ঘুর্ণনক্ষম বা রোটারী যন্ত্রের ক্ষেত্রে, মিলার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আরেকটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি, ‘টাইপ থ্রি সিক্রেটরি সিস্টেমের’ প্রতি। টাইপ থ্রি সিক্রেটরি সিস্টেম বা ‘টিটিএসএস’ ঘুর্ণায়মান কোনো গতি সৃষ্টির জন্য ব্যবহৃত হয় না (৩৪)। এটি পরজীবি ব্যাকটেরিয়াদের ব্যবহার করা অনেকগুলো পদ্ধতির একটি, যা ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে এর কোষপর্দা দিয়ে ‘পাম্প’ করে বিষাক্ত পদার্থ পোষকের শরীরে নিঃসরণ করতে। মানুষের মাত্রায় ভাবলে, আমরা ভাবতে পারি, কোনো ছিদ্রর মধ্য দিয়ে তরল কিছু ঢেলে দেয়ার মতো, বা চেপে ঠেলে বের করে দেবার মতো কোনো ‘পাম্প’। কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার পর্যায়ে বিষয়টি অন্যরকম, নিঃসরিত প্রতিটি অণু আকারে এবং ত্রিমাত্রিক গঠনে ‘টিটিএসএস’ কাঠামোর অণুদের মতোই: বলা হয় ঘন একটি কাঠামোর অণু, যা তরল নয়; প্রতিটি অণু এককভাবে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে বাইরে বের করে দেয়া হয়, যেন স্বয়ংক্রিয় কোনো স্লট মেশিন, যা খেলনা বা বোতল সরবরাহ করে। সুতরাং এগুলো সাধারণ কোনো ছিদ্র যার মধ্য দিয়ে কোনো অণু শুধু ‘প্রবাহিত’ হয়। কোষীয় দ্রব্য-সরবরাহকারী নিজেই অনেক ছোটো ছোটো প্রোটিন অণু দিয়ে তৈরি। যার প্রত্যেকটি আকারে এবং গঠনগত জটিলতায় তারা যে অণুগুলো কোষের ভিতর থেকে বাইরে সরবরাহ করে, তাদের সমতূল্য। মজার ব্যপার হলো, ব্যাকটেরিয়াদের এই স্লট মেশিনগুলো কখনো কখনো সম্পর্কযুক্ত নয় এমন ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে প্রায় একই রকম দেখা যায়। তাদের তৈরি করার জিন যেন, কপি এবং পেষ্ট করা হয়েছে অন্য ব্যাকটেরিয়া থেকে: যে কাজটা করতে ব্যাকটেরিয়া অত্যন্ত দক্ষ, সেটা নিজ অধিকারেই একটা অসাধারণ বিষয়, কিন্তু আমি সেই বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না কারণ আমার অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করার তাড়া আছে।

‘টিটিএসএস’ তৈরি করে যে প্রোটিন অণুগুলো তারা ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলার মটর তৈরি করা সাংগঠনিক উপাদানগুলোর সাথে সদৃশ্যতা বহন করে। বিবর্তনবাদীদের কাছে সুস্পষ্ট যে, টিটিএসএস এর নানা অংশগুলো, একটি নতুন, তবে পুরোপুরি না, খানিকটা পরিবর্তিত হয়ে ভিন্ন কাজের জন্য নির্বাচিত হয়েছে, যখন ফ্ল্যাজেলার মটরটি বিবর্তিত হয়েছিল। যখন টিটিএসএস টাগিং বা কোনো অণুকে বাইরের দিকে টেনে নেয় নিজের ভিতর থেকে, তখন (বিস্মিত হবার তেমন কোনো কারণ নেই যে) এটি ফ্ল্যাজেলার মটরের ব্যবহার করা মূলনীতির একটি আদি সংস্করণ ব্যবহার করে, যা অ্যাক্সল বা অক্ষদণ্ড হিসাবে কাজ করা অণুটিকে টেনে ধরে ঘোরাতে থাকে। ফ্ল্যাজেলার

মটর বিবর্তিত হবার আগে স্পষ্টতই এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটি আগে থেকেই সেখানে কর্মক্ষম ছিল। বিদ্যমান কোনো প্রক্রিয়াকে ভিন্ন কাজের জন্য পুনর্নির্দেশনা দেয়া আপাতদৃষ্টিতে অসরলযোগ্য জটিল কোনো যন্ত্রের অসম্ভাব্যতার সেই পাহাড় চুড়ায় আরোহন করার সুস্পষ্ট একটি উপায়।

আরো অনেক বেশি কাজ করার প্রয়োজন আছে অবশ্যই, আমি নিশ্চিৎ সেই গবেষণা হবে। এই ধরনের কাজ কখনোই শেষ হবে না, যদি বিজ্ঞানীরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্ব যে অলস 'ডিফল্ট' অবস্থান নেবার জন্যে প্ররোচিত করে তাতে সন্তুষ্ট না হন। একজন কাল্পনিক ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তাত্ত্বিকের বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বার্তা হতে পারে এমন: 'আপনি যদি না বুঝতে পারেন কিভাবে কোনো কিছু কাজ করছে, কোনো অসুবিধা নেই: সাথে সাথে সেটি বোঝার সব চেষ্টা ছেড়ে দিতে হবে এবং বলতে হবে ঈশ্বরের কাজ এটি। আপনি জানেন না স্নায়ু সংকেত কিভাবে কাজ করছে? ভালো, আপনি জানেন না, আমাদের মস্তিস্কে স্মৃতি কিভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। চমৎকার! সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খুবই জটিল? দারুণ, দয়া করে সমস্যা সমাধান করার দরকার নেই, হাল ছেড়ে দিন, তার চেয়ে বরং ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করুন। প্রিয় বিজ্ঞানীগন দয়া করে আপনাদের অজানা 'রহস্য' নিয়ে কাজ করার কোন দরকার নেই, বরং আমাদের কাছে আপনার রহস্যগুলো নিয়ে আসুন, কারণ আমরা তা ব্যবহার করতে পারবো। খামোকা গবেষণা করে মূল্যবান অজ্ঞতার অপচয় করা থেকে বিরত থাকুন। ঈশ্বরের শেষ ভরসা হিসাবে এইসব মহান শূন্যস্থানগুলো আমাদের প্রয়োজন'। সেন্ট অগাষ্টিন কোনো রাখ ঢাক ছাড়াই বলেছেন, 'আরো এক ধরনের প্রলোভন আছে, আরো বেশি বিপদসঙ্কুল. সেটা হচ্ছে কৌতূহলের অসুখ, এটাই প্রকৃতির গোপন রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করতে আমাদের পরিচালনা করে, যে গোপন রহস্য আমাদের বোধের বাইরে, যা আমাদের কোনো কাজে আসে না, মানুষের যা শেখার আকাঙ্ক্ষা করাও উচিত না' (৩৫)।

অসরলযোগ্য জটিল কোনো পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিহির ভিন্ন আরেকটি প্রিয় উদাহরণ হলো আমাদের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধতন্ত্র। বিচারপতি জোনসের ভাষায় সেই কাহিনী শোনা যাক:

> 'প্রকৃতপক্ষে, পাল্টা প্রশ্নোত্তর পর্বের সময় অধ্যাপক বিহি ১৯৯৬ সালে তার করা দাবী, বিজ্ঞান কখনোই রোগ প্রতিরোধতন্ত্রের বিবর্তনীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবে না, বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। তাকে ৫৮টি পিয়ার রিভিউ প্রকাশনা, নয়টি বই এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধতন্ত্রের বিবর্তনের ব্যাখ্যা হিসেবে বেশ কয়েকটি 'ইমিউনোলজী' পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট অধ্যায় দেখানো হয়, কিন্তু তিনি শুধু দাবী করেন, বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে এগুলো যথেষ্ট, এবং শক্তিশালী নয়।'

বিহি, পাল্টা প্রশ্নোত্তর পর্বে, বাদীপক্ষের প্রধান কৌশুলী এরিক রথসচাইল্ডের প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, তিনি সেই ৫৮টি গবেষণা পত্রের বেশির ভাগই পড়েননি। অবশ্য এটি বিস্ময়কর নয়, কারণ ইমিউনোলজী অনেক কঠিন পরিশ্রমের ব্যপার। একারণে বিহির অবজ্ঞাসুচক 'অর্থহীন' বলে এসব গবেষণা প্রত্যাখ্যান করা আরো বেশি ক্ষমার অযোগ্য। এটা অবশ্যই অর্থহীন, সত্যিকারের পৃথিবী সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের বদলে বিশ্বাসপ্রবণ সাধারণ মানুষ এবং রাজনীতিবিদদের পক্ষে প্রচারণা চালানো যদি আপনার লক্ষ্য থাকে। বিহির কথা শোনার পর, রথসচাইল্ড সুন্দরভাবে পুরো বিষয়টির সারাংশ করেন, যা সেদিন সেই আলাদতে উপস্থিত সকল নীতিবান মানুষই হৃদয়ে অনুভব করেছিলেন:

> আমাদের সৌভাগ্য এবং আমরা কৃতজ্ঞ যে কিছু বিজ্ঞানী আছেন যারা ইমিউন সিস্টেমের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরটি খোঁজার চেষ্টা করেছেন.. এটি ভয়ঙ্কর এবং ক্ষতিকর অসুস্থতাগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ, যে বিজ্ঞানীরা এই সব বই লিখেছেন, বা নিবন্ধ লিখেছেন, তারা সবার চোখের অন্তরালেই পরিশ্রম করে গেছেন, বইয়ের বা বক্তৃতার জন্য কোনো পারিশ্রমিক ছাড়াই। তাদের পরিশ্রম আমাদের সহায়তা করেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসুখের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং চিকিৎসা করতে। তার ঠিক বিপরীতে, অধ্যাপক বিহি এবং পুরো ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন আন্দোলন বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সামনে অগ্রসর হবার ক্ষেত্রে কোনো অবদানই রাখছেন না, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের বিজ্ঞানীদের বলছেন, এসব নিয়ে মাথা না ঘামাতে (৩৬)।

আমেরিকার জিনতত্ত্ববিদ জেরী কয়েন (৩৭) বিহির বইটি সম্বন্ধে তার পর্যালোচনায় লিখেছিলেন,'যদি বিজ্ঞানের ইতিহাস আমাদের কিছু শিখিয়ে থাকে, তা হলো আমাদের অজ্ঞতাকে 'ঈশ্বর' হিসাবে চিহ্নিত করে আমরা কিছুই করতে পারবো না', বা একজন বুদ্ধদীপ্ত ব্লগারের ভাষায়, গার্ডিয়ান পত্রিকায় কয়েন এবং আমার ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বিষয়খ একটি নিবন্ধে যিনি মন্তব্য করেছিলেন:

> কেন ঈশ্বরকে সবকিছুর ব্যাখ্যা হিসাবে গণ্য করা হয়? এটি অবশ্যই তা নয়, এটি ব্যাখ্যা করার ব্যর্থতা, কাধ ঝাকানো একটি 'আমি জানিনা', যা কিনা নিজেকে আধ্যাত্মিকতার পোষাক ও আচারের মাধ্যমে সজ্জিত করেছে। কেউ যদি কোনো কিছুর জন্য ঈশ্বরকে কৃতিত্ব দিতে চান, সাধারণত এর অর্থ হলো তারা এই সম্বন্ধে কিছু জানেন না, সুতরাং তারা এর কারণ ধরাছোঁয়ার বাইরে, জানা অসম্ভব আকাশ পরীর ওপর ন্যস্ত করেন। এখন আপনি যদি

ব্যাখ্যা দাবী করেন ঐ ভদ্রলোক কোথা থেকে আসলেন, খুব সম্ভবত এর উত্তর হিসাবে আপনি তার চির অস্তিত্বময়তা বা প্রকৃতির বাইরে তার অবস্থান সংক্রান্ত একটা অস্পষ্ট মিথ্যা দার্শনিক উত্তর পাবেন, যা অবশ্যই কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা করেনা (৩৮)।

ডারউইনবাদ অন্যভাবে আমাদের সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছে। বিবর্তিত অঙ্গ, যদিও সেগুলো অসাধারণ এবং দক্ষ এবং আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত অনুভূত হয়, তবে তাদের অনেক ত্রুটিও আছে, ঠিক যা আপনি আশা করতে পারেন, যখন কিনা তাদের কোনো বিবর্তনের ইতিহাস থাকে, এবং যদি সেগুলো কেউ পরিকল্পনা করতো তাহলে আপনি সেখানে এইসব ত্রুটি আশা করতেন না। আমি বেশ কিছু উদাহরণ আগেও আলোচনা করেছি অন্য বইতে: যেমন একটি স্নায়ু, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এটি যে নির্দিষ্ট অঙ্গকে স্নায়ুসংযোগ দেয়, সেই অঙ্গের প্রতি এর উৎস থেকে তার যাত্রাপথের অতিমাত্রায় অপব্যায়ী ঘুরপথ বিবর্তনের ইতিহাস আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমাদের অনেকগুলো অসুস্থতা, কোমরের ব্যথা থেকে হার্নিয়া, জরায়ুর বাইরের দিকে বের হয়ে আসা এবং আমাদের 'সাইনাস' সংক্রমণের প্রবণতা এর সবকিছুর কারণ সরাসরিভাবে আমাদের দুই পা ভর করে যে হাঁটার বিষয়টি, আমরা এখন যে শরীরটা নিয়ে দুই পায়ে হাঁটছি তা শত মিলিয়ন বছর ধরে আকারে পেয়েছে চার পায়ে হাঁটার উপর নির্ভর করা একটি শরীর থেকে। আমাদের সচেতনতা আরো বাড়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিষ্ঠুরতা এবং অপচয় রোধের প্রবণতা দেখে। শিকারী প্রাণীদের দেখলে মনে হয় এটিকে যেন এর শিকার প্রাণীটিকে ধরবার জন্য নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত করা হয়েছে, অন্যদিকে আবার শিকার হওয়া প্রাণীটি আক্রমণকারী শিকারী প্রাণীর কবল থেকে রক্ষা পাবার সকল উপায়সহ ঠিক সেই একই নিখুঁত পরিকল্পনার ফসল। তাহলে ঈশ্বর আসলেই কোন পক্ষে (৩৯)।

অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি: গ্রহ সংস্করণ

শূন্যস্থানবাদী ধর্মতাত্ত্বিকরা যারা চোখ এবং পাখা, ফ্ল্যাজেলার মটর এবং রোগ প্রতিরোধতন্ত্রের ওপর থেকে হাল ছেড়ে দিয়েছেন প্রায়শই তারা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার আশায় তাদের শেষ কৌশল হিসাবে জীবনের উৎপত্তির প্রশ্নটি নির্বাচন করে থাকেন। অজৈব রসায়নের বিবর্তনের সূচনালগ্ন, যে কারণেই হোক না কেন আপাতদৃষ্টিতে পরবর্তীতে বিবর্তনের নানা পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট অন্তবর্তীকালীন শূন্যস্থানগুলোর চেয়েও যেন আরো বড় কোনো শূন্যস্থান উপস্থাপন করছে। এবং একটি অর্থে এটি অপেক্ষাকৃত বড় একটি শূন্যস্থান। তবে সেই একটি অর্থ খুব নির্দিষ্ট, যা ধর্মবাদীদের কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনায় না। জীবনের উৎপত্তি শুধু একবারই ঘটতে হবে। সেকারণে আমরা এই ঘটনাটিকে অতি মাত্রায় অসম্ভাব্য বলে মেনে নিতে পারি, আর এই অসম্ভাব্যতার মাত্রা

বেশি ভাগ মানুষ যা অনুধাবন করেন তার চেয়েও বহুগুণ বেশি। আমি তা ব্যাখ্যা করবো। পরবর্তীতে বিবর্তনের ধাপগুলোর প্রতিলিপি হয়েছে, কম বেশি একই ভাবে, সময়ের ধারাবাহিকতায় লক্ষ কোটি প্রজাতির মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ক্রমাগতভাবে যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সুতরাং জটিল জীবনের বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে আমরা একই ধরনের পরিসংখ্যানগত যুক্তির আশ্রয় নিতে পারি না, যা আমরা জীবনের উৎপত্তির ক্ষেত্রে গ্রহন করি। যে ঘটনাগুলো সাদামাটা আটপৌরে বিবর্তনের অংশ, সেগুলো এর একক উৎপত্তি বা সুচনালগ্ন থেকে ভিন্ন (এবং হয়তো কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে) এবং যা খুব বেশি অসম্ভাব্য হতে পারে না।
দুটির মধ্যে এই পার্থক্য বেশ ধাঁধার মত মনে হতে পারে, আমি অবশ্যই ব্যাখ্যা দিবো, তথাকথিত 'অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল' ব্যবহার করে (৪০); ১৯৭৪ সালে অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপালটির নামকরণ করেছিলেন ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ ব্র্যান্ডন কার্টার (৪১) এবং এর একটি বর্ধিত আকার দেন পদার্থবিজ্ঞানী জন বারো (৪১) এবং ফ্র্যাঙ্ক টিপলার (৪২) এই বিষয়ে তাদের প্রকাশিত একটি বইয়ে (৪৪) । অ্যানথ্রোপিক যুক্তি সাধারণত কসমস বা মহাজগতের প্রেক্ষিতে আরোপিত হয়, পরে সেখানে আসছি। কিন্তু আপাতত এখানে আমি সেই ধারণাটিকে খানিকটা ক্ষুদ্র পরিসরে উপস্থাপনা করবো, একটি গ্রহের পরিসরে। এই পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্ব, সুতরাং পৃথিবী এমন একটি গ্রহ, যার ক্ষমতা আছে আমাদের সৃষ্টি এবং প্রতিপালন করার, তা সেটি যত বেশি অসাধারণ এবং স্বতন্ত্র গ্রহই হোক না কেন। যেমন, আমাদের মত জীবন, তরল পানি ছাড়া বাঁচতে পারেনা, আসলেই 'এক্সোবায়োলজি' বিশেষজ্ঞরা যারা ভিনগ্রহের জীবনের সন্ধান করছেন, তারা মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করছেন মূলত পানির সন্ধানে। সাধারণ একটি তারা, যেমন, আমাদের সূর্য, এর চারপাশে আছে সেই তথাকথিত 'গোল্ডিলকস জোন' যা খুব বেশি গরমও না আবার খুব শীতলও না, বরং কোনো গ্রহে তরল পানির অস্তিত্ব থাকার জন্য ঠিক যতটুক দরকার (৪৫)। সুর্যের চারপাশে যার একটি অপ্রশস্ত কক্ষপথ আছে, সূর্য থেকে যা খুব বেশি দূরে না, যেখানে পানি বরফে রূপান্তরিত হয়, আবার খুব কাছেও না, যেখানে পানি গরমে ফুটতে থাকবে, বরং এই দুইয়ের মাঝখানে।

ধারণা করা হয়, জীবন বান্ধব কোনো কক্ষপথকে হতে হবে প্রায় বৃত্তাকার। একটি অতিমাত্রায় উপবৃত্তাকার কক্ষপথ, যেমন, নতুন আবিষ্কৃত দশম গ্রহ, যার বেসরকারী নাম জেনা, এই গল্ডিলকস জোনের মধ্যে আসার সুযোগ করে দেয় পৃথিবীর সময়ে বেশ কয়েক দশকে বা শতাব্দীতে একবার; জেনা নিজে কিন্তু গোল্ডিলকস জোনে মোটেও ঢুকতে পারেনা এমন সুর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আসার সময়ও, যা এটি প্রতি ৫৬০ বছর (পৃথিবীর হিসাবে) পর পর পৌঁছাতে পারে। হ্যালীর ধূমকেতুর তাপমাত্রার তারতম্য হয়, যেমন, পেরিহেলিওনে (৪৬) ৪৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে এপহেলিওনে (৪৭) মাইনাস ২৭০ ডিগ্রি। পৃথিবীর কক্ষপথও, অন্য সব গ্রহের মত কার্যত উপবৃত্তাকার (জানুয়ারীতে এটি সুর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি এবং জুলাইতে এটি সবচেয়ে

দূরে থাকে (আপনার যদি ব্যপারটা অবাক লাগে, তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে উত্তর গোলার্ধের অতিআত্মমন্যতায় ভুগছেন)। কিন্তু বৃত্ত হচ্ছে উপবৃত্তের বিশেষ একটি রূপ, আর পৃথিবী কক্ষপথ, বৃত্তাকারের এত কাছাকাছি এটি কখনোই গোল্ডিলকস জোনের বাইরে যায় না। সৌরজগতে পৃথিবী নানা ভাবে এত বেশি অনুকূল একটি অবস্থানে, যেন জীবনের বিবর্তনের জন্য এটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বিশাল জুপিটারের মাধ্যাকর্ষণের 'ভ্যাকুম ক্লিনারটি' ঠিক এমন একটি জায়গায় অবস্থিত, এটি পৃথিবীর সাথে কোনো গ্রহাণুর ভয়াবহ সংঘর্ষ থেকে রক্ষা করে। আকারে অপেক্ষাকৃত বড় একটি উপগ্রহ, চাঁদ আমাদের পৃথিবীর ঘুর্ণনের অক্ষপথটি স্থিতিশীল রাখে এবং জীবনের প্রতিপালনে সহায়তা করে নানাভাবে (৪৮)। নক্ষত্রদের মধ্যে আমাদের সূর্য ব্যতিক্রম কারণ এটি বাইনারী নক্ষত্র না, যারা অপর একটি সঙ্গী নক্ষত্রের সাথে একই কক্ষপথে বন্দী; বাইনারী নক্ষত্রদের গ্রহ থাকা সম্ভব হতে পারে, তবে তাদের কক্ষপথ বেশ গোলমেলে আর বিচিত্র হবে, যা জীবন বিবর্তনের জন্য সহায়ক না।

আমাদের এই গ্রহের বিশেষভাবে জীবন বান্ধব হবার কারণ হিসাবে দুটি প্রধান ব্যাখ্যা প্রস্তাব করা হয়েছে। ডিজাইন তত্ত্ব বলছে, এই পৃথিবী ঈশ্বর তৈরি করেছেন, এরপর এটি স্থাপন করেছেন গোল্ডিলকস জোনে এবং সুপরিকল্পিতভাবে বাকি সব বিষয়গুলো সাজিয়েছেন আমাদের সুবিধার কথা ভেবে। 'অ্যানথ্রোপিক' দৃষ্টিভঙ্গিটি খুব আলাদা এবং এর একটা হালকা ডারউইনীয় ছোঁয়া আছে। মহাবিশ্বে বেশির ভাগ গ্রহই তাদের সংশ্লিষ্ট তারাদের গোল্ডিলকস জোনে অবস্থান করে না এবং জীবনের জন্য উপযোগীও নয়। এবং সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রহের ক্ষেত্রে কোথাও জীবনের অস্তিত্বও নেই। তবে অল্প কিছু গ্রহ আছে, যেখানে জীবনের বিবর্তনের জন্য উপযোগী পরিস্থিতি থাকতে পারে। আমরা অবশ্যই সেই অল্প কিছু গ্রহের একটি, কারণ আমরা এখানে থেকেই এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছি।

অবাক একটি সত্য বিষয় হলো, ঘটনাক্রমে, সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি খুব ভালোবাসেন। খুব অদ্ভুত কিছু বিচিত্র এবং অবোধ্য কারণে তারা মনে করেন এটি তাদের প্রস্তাবকে সমর্থন করছে। কিন্তু ঠিক এর বিপরীতটাই সত্য। অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতোই ডিজাইন হাইপোথিসিসের একটি বিকল্প; এটি আমাদের একটি যৌক্তিক, ডিজাইনের ধারণা মুক্ত ব্যাখ্যা দেয়, কেন এমন একটি পরিস্থিতিতে আমরা অবস্থান করছি, যা আমাদের অস্তিত্বের জন্য অনুকূল। আমি মনে করি ধর্মীয় মানসিকতায় সংশয়টি ওঠার কারণ, অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি শুধু উল্লেখ করা হয় এমন সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে এবং প্রাসঙ্গিকতায় যা এটি সমাধান করতে পারে। যেমন, আমরা যে জীবনবান্ধব একটি জগতে বাস করছি সেই সত্যটায়। ধার্মিক মন যেটা বুঝতে ব্যর্থ হয় তা হলো, সমস্যাটির দুটি সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাব করা হয়েছে, ঈশ্বর হচ্ছে একটি, অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি হচ্ছে অপরটি। তারা একে অপরের বিকল্প।

আমরা জীবন বলতে যা বুঝি, তার জন্য তরল পানি অবশ্য প্রয়োজনীয়, তবে সেটি এককভাবে পূর্বশর্ত হিসাবে যথেষ্ট নয়। তারপরও জীবনের উৎপত্তি হতে হবে পানিতে, আর জীবনের উৎপত্তি হওয়াটা ছিল অতি অসম্ভাব্য একটি ঘটনা। এবং জীবনের একবার উৎপত্তি হবার পর ডারউইনীয় বিবর্তন তার খুশী মত কাজ করে গেছে জীবনের উপর; কিন্তু কিভাবে জীবনের সুচনা হয়েছিল? জীবনের উৎপত্তি ছিল একটি রাসায়নিক ঘটনা, বা ধারাবাহিক কতগুলো রাসায়নিক ঘটনা, যেখানে প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল উপাদানগুলোর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল। প্রধান উপাদানটি হচ্ছে বংশগতি বা হেরেডিটি, যা হয় 'ডিএনএ' বা (খুব সম্ভবত) এমন কিছু যা 'ডিএনএ' অণুর মত বা তার চেয়ে কম নির্ভুলভাবে নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে, হয়তো এর সাথে সম্পর্কিত অণু ডিএনএ অণু হতে পারে। একবার যখন এই এই প্রধান উপাদানটি, অর্থাৎ কোনো এক ধরনের জিনগত অণু সৃষ্টি হয়েছে, সত্যিকারের ডারউইনীয় নির্বাচন এর ওপর তার কাজ শুরু করে এবং এক সময় জটিল জীবনের উদ্ভব ঘটে এই প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসাবে। কিন্তু স্বতঃস্ফুর্তভাবে দৈবক্রমে প্রথম বংশগতির তথ্যবাহী কোনো অণুর সৃষ্টি অনেকের কাছে মনে হতে পারে অসম্ভব একটি ঘটনা। হয়তো তাই, হয়তো এটা খুবই বেশি মাত্রায় অসম্ভাব্য এবং আমি এই বিষয়ে আরো খানিকটা আলোচনা করবো, কারণ বইটির এই অংশে এটাই মূল বিষয়।

যদিও এখনো ধারণা নির্ভর,তাসত্ত্বেও জীবনের উৎপত্তি ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা গবেষণার একটি ক্ষেত্র। এবং এই ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য যে দক্ষতাটি লাগবে, সেটি হল রসায়ন, এবং যা আমার ক্ষেত্র নয়। আমি সাইড লাইনে বসেই অতি আগ্রহ নিয়ে তাদের অগ্রগতি দেখছি। এবং আমি অবাক হবো না যদি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা দেন তারা ল্যাবরেটরীতে নতুন জীবনের উৎপত্তির ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। যা-ই হোক না কেন, তেমন কিছু এখনো ঘটেনি। এবং এখন আর সবসময়ই, এটি ঘটার সম্ভাবনা ছিল খুব ক্ষীণ - যদিও এটি একবার অবশ্যই ঘটেছিল।

গোল্ডিলকস কক্ষপথ নিয়ে যেমন ব্যাখা দিয়েছিলাম, আমরা প্রস্তাব করতে পারি যে, জীবনের উৎপত্তি, যত অসম্ভব একটি ঘটনা হোক না কেন, আমরা জানি এটি পৃথিবীতে ঘটেছিল, কারণ আমাদের অস্তিত্ব এখানে। এবং আবারো কি হয়েছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে দুটি হাইপোথিসিস আছে: ডিজাইন হাইপোথিসিস এবং বৈজ্ঞানিক বা অ্যানথ্রোপিক হাইপোথিসিস। ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গি প্রস্তাব করছে, একজন ঈশ্বর যিনি এই বিস্তারিত অলৌকিকতাকে নিজে হাতে গড়েছেন প্রিবায়োটিক বা প্রাক-জীবনের স্যুপ বা জৈব মিশ্রণে তার স্বর্গীয় আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে ডিএনএ বা অন্য সমতূল্য কিছু সৃষ্টি করার মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবনের অতি অসাধারণ যাত্রার সুচনা করে।

আবার, গোল্ডিলকসের মতোই, ডিজাইন হাইপোথিসিসের বিকল্প অ্যানথ্রোপিক প্রস্তাবটিও পরিসংখ্যানগত। বিজ্ঞানীরা অনেক বড় সংখ্যার জাদুর অবতারণা করেন সেই সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করতে; অনুমান করা হয় যে, আমাদের ছায়াপথে প্রায় ১ বিলিয়ন থেকে ৩০ বিলিয়ন গ্রহ আছে এবং মহাবিশ্বে প্রায় ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে; যদি কিছু শূন্যও বাদ দেয়া যায় পরিমাপের সাধারণ রক্ষণশীলতায়, তারপরও এক বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহের অস্তিত্ব আছে এই মহাবিশ্বে। এখন ধরুন, জীবনের উৎপত্তি, ডিএনএ সমতূল্য কোনো কিছুর স্বতঃস্ফূর্ত উৎপত্তি সত্যি অকল্পনীয় একটি অসম্ভাব্য ঘটনা, ধরা যাক ঘটনাটির অসম্ভাব্যতা এত বেশি যে, এটি প্রতি ১ বিলিয়ন গ্রহের কেবল একটিতে ঘটে; যে-কোনো অনুদান সংস্থা হাসবে, যদি গবেষণা অনুদানপ্রার্থী কোনো একজন রসায়নবিদ স্বীকার করেন যে, তার প্রস্তাবিত গবেষণার সফলতার সম্ভাবনা ১০০ তে একবার। আর আমরা এখানে কথা বলছি এক বিলিয়নে একবার ঘটা এমন কোনো কিছুর সম্ভাবনা নিয়ে। এবং তারপরও এই অসম্ভব রকমের বিশাল সংখ্যায়, জীবনের উৎপত্তি হতে পারে ১ বিলিয়ন গ্রহে, এবং পৃথিবী, অবশ্যই যাদের মধ্যে একটি (৪৯)।

এই উপসংহারটি এত বিস্ময়কর, আমি আবার বলছি, যদি কোনো গ্রহে স্বতোপ্রণোদিত হয়ে জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনা ১ বিলিয়নে ১ বার হয়, তারপরও সেই অদ্ভুত রকমের অবিশ্বাস্য ঘটনাটি ঘটবে মহাবিশ্বের ১ বিলিয়ন গ্রহে। তবে সেই ১ বিলিয়ন জীবন-বহনকারী গ্রহ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খড়ের গাদায় সুঁচ খোজার সেই প্রবাদ বাক্যটিকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আমাদের বেশি কষ্ট করার সেই সুঁচ খোঁজার (আবার অ্যানথ্রোপিক মূলনীতিতে ফেরত যাই) কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এমন কোনো জীব, যে কিনা এই খোঁজার যোগ্য, নিঃসন্দেহে তারা অবশ্যই সেই ধরনেরই একটি অতিমাত্রায় দুর্লভ সুইয়ের উপরে বসে আছে, এমনকি তাদের অনুসন্ধান শুরু হবার আগেই।

যে-কোনো সম্ভাবনার প্রস্তাবনা করা হয় একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের অজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে। আমরা যদি কোনো একটি গ্রহ সম্বন্ধে কিছুই না জানি, তারপরও আমরা কিন্তু সেখানে জীবনের উৎপত্তি হবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি, যেমন, প্রতি এক বিলিয়নে একবার। কিন্তু যদি আমাদের পরিমাপে নতুন কিছু ধারণা বা তথ্য যোগ করতে পারি, এই সম্ভাবনার পরিমানেও পরিবর্তন হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্রহের হয়তো কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যেমন, হয়তো বিশেষ কিছু মৌলের উপস্থিতি আছে এর পাথরে, যা জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনার পাল্লা ভারী করতে পারে। কিছু গ্রহ, অন্য ভাষায় বলা যায়, অন্য গ্রহদের তুলনায় বেশি 'পৃথিবী সদৃশ', পৃথিবী নিজে অবশ্যই বিশেষভাবে পৃথিবী সদৃশ। এই বিষয়টি আমাদের রসায়নবিদদের উৎসাহ দেয়া উচিত ল্যাবে কৃত্রিমভাবে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য, এটি তাদের সফল হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু আমার আগের হিসাব দেখিয়েছে, এমনকি একটি রাসায়নিক

মডেল যার সফল হবার সম্ভাবনা এক বিলিয়নে একবার, সেটিও ভবিষ্যদ্বাণী করছে মহাবিশ্বে অন্ততপক্ষে এক বিলিয়ন গ্রহে জীবনের উৎপত্তি হবে ; অ্যানথ্রোপিক মূলনীতির সৌন্দর্যটা হচ্ছে এটি আমাদের বলছে, সব অন্তর্জ্ঞানের বিপরীত, একটি রাসায়নিক মডেলের শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে যে জীবনের উৎপত্তি হতে পারে এক বিলিয়ন বা শত কোটি গ্রহের কেবল একটিতে, যা আমাদের এখানে জীবন উপস্থিতির উত্তম এবং সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক একটি ব্যাখা দেবে। আমি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করিনা, কোথাও জীবনের উৎপত্তি বাস্তবিকভাবে এতটাই অসম্ভাব্য। এবং আমি মনে করি, অবশ্যই ল্যাবরেটরিতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করার জন্য অর্থ ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত এবং একই কারণে ‘সেটি’ প্রকল্পও পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার উপযোগী, কারণ আমি মনে করি মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান জীবনের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা আছে।

এমনকি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবনের উৎপত্তি হবার সবচেয়ে নৈরাশ্যবাদী সম্ভাবনার পরিসংখ্যানগত পরিমাপকে আমরা গ্রাহ্য করি, সেই পরিসংখ্যানগত যুক্তি, শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য কোনো ধরনের পরিকল্পনাকারী প্রস্তাবকে পুরোপুরি ধ্বংস করে। নিত্যদিনের সম্ভাবনার হার বা ঝুঁকি পরিমাপে অভ্যস্ত মস্তিষ্কের জন্য বিবর্তনের কাহিনীতে সব আপাত শূন্যস্থানের মধ্যে জীবনের উৎপত্তি মনে হতে পারে অসমাধানযোগ্য একটি অসম্ভাব্যতা: যে পরিমাপের মাত্রায় কোনো গবেষণা অনুদানকারী কর্তৃপক্ষ রসায়নবিদদের প্রস্তাবিত গবেষণা প্রস্তাবগুলো যাচাই করে থাকে। তারপরও এমনকি এমন বড় কোনো শূন্যস্থান অনায়াসে পূর্ণ করে পরিসংখ্যানের জ্ঞানপুষ্ট বিজ্ঞান, অন্যদিকে সেই একই পরিসংখ্যানগত বিজ্ঞান কোনো স্বর্গীয় সৃষ্টিকর্তার সম্ভাবনা বাতিল করে দেয় পুর্বে উল্লেখিত সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ এর প্রেক্ষিতে।

কিন্তু আপাতত, এই অংশের শুরুর সেই কৌতূহলদ্দীপক বিষয়টিতে ফিরে আসা যাক। ধরা যাক কেউ জৈববৈজ্ঞানিক অভিযোজনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করছেন ঠিক যেভাবে আমরা জীবনের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করেছিলাম সেভাবে: বিশাল সংখ্যক গ্রহের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটি পর্যবেক্ষিত সত্য হচ্ছে যে প্রতিটি প্রজাতি এবং এই সব প্রজাতির মধ্যে প্রতিটি অঙ্গ, যাদের নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে, দেখা গেছে তাদের যার যা কাজ সেই কাজে তারা খুবই দক্ষ। পাখির, মৌমাছি এবং বাদুড়ের পাখা ওড়ার জন্য চমৎকার। দেখার জন্য চোখ হচ্ছে পারদর্শী, উদ্ভিদের পাতারা সালোক সংশ্লেষণে দক্ষ। আমরা এমন একটা গ্রহে বাস করি, যেখানে আমাদের চারপাশে প্রায় ১০ মিলিয়ন প্রজাতি, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে আপাতদৃষ্টিতে বিশেষভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে একটি শক্তিশালী বিভ্রম সৃষ্টি করে। প্রতিটি প্রজাতি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় জীবন যাপনের জন্য বিশেষভাবে দক্ষ। আমরা কি ‘বহু সংখ্যক গ্রহ আছে’ বলে যুক্তি দিয়ে এইসব আলাদা আলাদা পরিকল্পনার বিভ্রমের

ব্যাখ্যা এড়াতে পারবো । না, আমরা পারবো না, আবারও বলছি, পারবো না। এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ডারউইনবাদ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার কেন্দ্রে অবস্থিত।

আমরা যে-কোনো সংখ্যক গ্রহ নিয়ে বাজি খেলি না কেন, কিছুই আসে যায় না, ভাগ্য নির্ভর কোনো চান্স বা সুযোগ কখনোই যথেষ্ট হবেনা পৃথিবীর জীবনের সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময়তা ব্যাখ্যা করার জন্য, যেমন করে আমরা যুক্তিটিকে ব্যবহার করি এখানে জীবনের অস্তিত্ব প্রথমে কেমন করে সৃষ্টি হলো - সেটি ব্যাখ্যা করার জন্য। জীবনের বিবর্তন, জীবনের উৎপত্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ, পুনরাবৃত্তি করি, জীবনের উৎপত্তি ছিল একটি অনন্য ঘটনা, যা শুধু একবার ঘটতে হবে। কিন্তু কোনো প্রজাতির তাদের নিজস্ব পৃথক পরিবেশে অভিযোজনীয় দক্ষতা অর্জনের ঘটনা ঘটছে শত লক্ষবার এবং এখনো তা চলছে।

স্পষ্টতই এখানে পৃথিবীতে আমরা জৈব প্রজাতিদের জীবনধারণ ও বংশবিস্তারের জন্য উপযোগী হবার করার একটি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করছি। যে প্রক্রিয়া সমস্ত গ্রহে প্রতিটি মহাদেশে, দ্বীপে এবং সব সময় একইভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা নিরাপদে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি যদি আমরা আরো দশ মিলিয়ন বছর অপেক্ষা করি, সম্পূর্ণ নতুন এক সেট প্রজাতিকে দেখা যাবে তাদের জীবনধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছে দক্ষতার সাথে বর্তমানের প্রজাতিরা যেমন তা করেছে তাদের জীবনযাত্রার সাথে। এটি নিরন্তরভাবে পৌনঃপুনিকভাবে ঘটা, অনুমেয়ভাবেই বহু ঘটনার সমষ্টি, কোনো পরিসংখ্যানের ভাগ্য না, যা পূর্বদৃষ্টি দ্বারা আমরা শনাক্ত করেছি। এবং ডারউইনের কল্যাণে আমরা জানি কেমন করে এসব ঘটেছিল: প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা।

জীবিত প্রাণিদের বহুমুখী বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল। পৃথিবীতে জীবনের বৈচিত্রতা ব্যাখ্যা এবং ডিজাইনের মোহনীয় বিভ্রমকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদের আসলেই ডারউইনের সেই শক্তিশালী রূপক ‘ক্রেইনের’ প্রয়োজন। জীবনের উৎপত্তি, ঠিক এর বীপরিতার্থেই সেই রূপক ক্রেইনের এখতিয়ারের বাইরে, কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচন জীবন ছাড়া সামনে অগ্রসর হতে পারে না। এখানে অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি এককভাবে স্বতন্ত্র। জীবনের উৎপত্তির অনন্যতা বিষয়টিকে আমরা মোকাবেলা করতে পারি একটি অতি বিশাল সংখ্যক সম্ভাব্য গ্রহে জীবনের উৎপত্তির সুযোগের সম্ভাবনা প্রস্তাব করে। যখনই একবার প্রথম জীবনের উৎপত্তি সম্ভাবনাটি সৌভাগ্যের স্পর্শ পায় - যা অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল নিশ্চিৎভাবে মঞ্জুর করে নানা নিয়ামকের সমন্বয়ে - প্রাকৃতিক নির্বাচন তখন এর দ্বায়িত্ব নেয়: আর খুবই সুস্পষ্টভাবেই প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনো ভাগ্যের খেলা নয়।

যাই হোক, হতে পারে জীবনের উৎপত্তি বিবর্তনের ইতিহাসে শুধু একটি মাত্র প্রধান শূন্যস্থান নয়, যা শুধুমাত্র অত্যন্ত ভাগ্যক্রমে সম্পর্কযুক্ত এবং অ্যানথ্রোপিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সিদ্ধ। যেমন আমার সহকর্মী মার্ক রিডলি (৫০) তার ‘মেন্ডেলস ডেমন’ (কৃতজ্ঞতার সাথে স্বীকার করছি, আমেরিকার প্রকাশকরা একে ‘দ্য কো-অপারেটিভ জিন’) শিরোনাম দিয়ে খানিকটা সংশয়পূর্ণ পুননামকরণ করেছিলেন।) বইটিতে প্রস্তাব করেছিলেন, প্রকৃত কোষের উৎপত্তি (আমাদের মত কোষ, যার নিউক্লিয়াস, এবং আরো কিছু জটিল অঙ্গাণু আছে, যেমন, মাইটোকন্ড্রিয়া, যা ব্যাকটেরিয়ার নেই) যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কঠিন এবং জীবনের উৎপত্তি থেকেও অনেক বেশি পরিসংখ্যানগতভাবে অসম্ভাব্য। এই রকম স্বতন্ত্র একটি ঘটনা হয়তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি দিয়ে, খানিকটা নিম্নলিখিত উপায়ে: মহাবিশ্বে হয়তো বিলিয়ন সংখ্যক গ্রহ আছে, যেখানে ব্যাকটেরিয়া সমপর্যায়ে জীবনের উদ্ভব হয়েছে, কিন্তু সেই নানা গঠনের জীবনের খুব সামান্য একটি অংশ গুরুত্বপূর্ণ সেই শূন্যস্থানটা অতিক্রম করতে পেরেছে এবং তৈরি করতে পেরেছে প্রকৃত কোষের মত কিছু । এবং এদের মধ্যে আরো ক্ষুদ্র একটি অংশ সেই পরবর্তী ক্রান্তিসীমার রুবিকোনটি (৫১) পার হতে পেরেছে চেতনা বা সজ্ঞানতার উদ্ভবের মাধ্যমে ; যদি এই দুটো ঘটনাই শুধু একবার ঘটতে পারে এমন কোনো ঘটনা হয়, আমরা তাহলে সর্বব্যাপী বা সর্বত্র দৃষ্ট কোনো ‘প্রক্রিয়া’ নিয়ে কথা বলছি না, যেভাবে সাধারণ, আটপৌরে জীববিজ্ঞানের অভিযোজনের ক্ষেত্রে করে থাকি। অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি বলছে, যেহেতু আমরা জীবিত, প্রকৃতকোষী এবং সজ্ঞানতা সম্পন্ন, আমাদের গ্রহটিকে অবশ্যই সেই অস্বাভাবিক রকম দুর্লভ গ্রহ হতে হবে, যেখানে এই তিনটি ধাপের মধ্যেই সেতু বন্ধন রচিত হয়েছে।

প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করে কারণ সামগ্রিক ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের পথে এটি একমুখী একটি রাস্তা । প্রথমে শুরু করতে খানিকটা ভাগ্যের (জীবনের উৎপত্তি) প্রয়োজন হয়তো আছে এবং বহু ‘বিলিয়ন গ্রহের’ অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি সেই ভাগ্যটা দিয়েছে। হয়তো পরবর্তীতে বিবর্তনের ইতিহাসে আরো কিছু শূন্যস্থানেরও বড় ধরনের ভাগ্যের সংযোগের প্রয়োজন আছে, তবে তা অ্যানথ্রোপিক মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আমরা আর যাই বলি না কেন, জীবনের ব্যাখ্যায় ‘ডিজাইন’ নিঃসন্দেহে অর্থহীন, কারণ ডিজাইন শেষ অবধি ক্রমান্বয়ে ক্রমবর্ধমান উন্নতি নয়, সেই কারণে এটি যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়, তার চেয়ে বড় প্রশ্নের জন্ম দেয় - ডিজাইন আমাদের সরাসরি নিয়ে যায়, সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ রূপকটির দাবী করা অসীম ক্রমান্বয়ে পূর্ববর্তী প্রশ্নে পশ্চাদগমন বা রিগ্রেস প্রক্রিয়ায়।

আমরা এমন একটি গ্রহে বাস করি যা আমাদের মত জীবনের জন্য সহায়ক, এবং আমরা দেখেছি দুটো কারণ, কেন এমনটি হচ্ছে। একটি হচ্ছে, এই পৃথিবীর পরিবেশের

দেয়া শর্তানুযায়ীই জীবন বিকশিত হবার মত করেই বিবর্তিত হয়েছে, এবং এর কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচন। অন্য কারণটি অ্যানথ্রোপিক; মহাবিশ্বে বহু বিলিয়ন গ্রহ আছে, এবং বিবর্তন বান্ধব গ্রহ যতই সংখ্যালঘু হোক না কেন, আমাদের গ্রহটিকে অবশ্যই তাদের একটি হতে হবে। এবার অ্যানথ্রোপিক মূলনীতিকে আরো আগের পর্যায়ে নিয়ে যাবার সময় এসেছে - জীববিজ্ঞান থেকে পুনরায় বিশ্বতত্ত্বে।

অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি: মহাবিশ্ব সংস্করণ

শুধুমাত্র একটি মিত্র গ্রহেই আমরা বাস করিনা, একটি মিত্র মহাবিশ্বেও আমাদের বসবাস। এর কারণ, আমাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে আছে সেই সত্যটিতে, পদার্থবিদ্যার মহাজাগতিক আইনগুলো অবশ্যই যথেষ্ট জীবন বান্ধব হতে হবে জীবনের উৎপত্তির জন্য। সুতরাং বিষয়টি কোনো দুর্ঘটনা নয়, আমরা যখন রাতের আকাশে নক্ষত্র দেখি, সিংহভাগ রাসায়নিক মৌলর অস্তিত্বের জন্য এইসব নক্ষত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়, আর এই সব মৌল এবং রাসায়নিক উপাদান ছাড়া জীবনের কোনো অস্তিত্বই থাকার কথা না। পদার্থবিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখেছেন, পদার্থবিদ্যার আইন এবং ধ্রুবগুলো যদি সামান্যতম ভিন্ন হত তাহলে এমন কোন মহাবিশ্বের সৃষ্টি হতো যেখানে জীবনের উৎপত্তির ঘটনাটি অসম্ভব হতো। বিভিন্ন পদার্থবিদরা এটিকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু উপসংহার সবসময়ই এক (৫২)। মার্টিন রিস তার ‘জাষ্ট সিক্স নাম্বারস’বইয়ে ছয়টি মৌলিক ধ্রুব সংখ্যার একটি তালিকা করেছিলেন, যা মনে করা হয় সমগ্র মহাবিশ্বে প্রযোজ্য। এই ছয়টি সংখ্যার প্রতিটি এমনই সূক্ষ্মভাবে সাজানো যে, সেগুলো যদি সামান্য ভিন্ন হয় এর বর্তমান মাত্রা থেকে, মহাবিশ্বও সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন একটি রূপ নেবে, এবং সেই মহাবিশ্ব সম্ভবত জীবন বৈরী হত (৫৩)।

রিসের ছয়টি সংখ্যার একটি উদাহরণ হচ্ছে, তথাকথিত শক্তিশালী বা স্ট্রং ফোর্সের মাত্রা, যে শক্তিটি কোনো একটি পারমানুর নিউক্লিয়াসের উপাদানগুলোকে একত্রে ধরে রাখে: কোনো অণুকে বিভাজিত করার আগে যে পারমানবিক শক্তিকে অতিক্রম করতে হয় আগে। এটি মাপা হয় ‘E’ দিয়ে , হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভরের যে অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যখন হাইড্রোজেন সন্নিবেশিত বা যুক্ত হয়ে একটি হিলিয়াম অনু তৈরি করে। আমাদের এই মহাবিশ্বে এই সংখ্যার মান, ০.০০৭ এবং মনে করা হচ্ছে যে, কোনো রসায়নের (যা জীবনের উৎপত্তির জন্য অবশ্য শর্ত) অস্তিত্বের জন্য, এই E এর মান এই মাত্রার খুব কাছাকাছি হতে হবে। আমরা যে রসায়নের সাথে পরিচিত, তা মূলত, সন্নিবেশিত এবং পুনসন্নিবেশিত হওয়া মোট ৯০ টি বা সেই রকম সংখ্যক প্রকৃতিতে উপস্থিত পর্যায়-সারণীর মৌল দিয়ে তৈরি। হাইড্রোজেন হচ্ছে সবচেয়ে সাধারণ ও সবচেয়ে বেশি মাত্রায় বিদ্যমান মৌল। মহাবিশ্বের সব অন্য মৌল হাইড্রোজেন থেকেই তৈরি হয় নিউক্লিয়ার ফিউশনের বা পারমাণবিক সংযোজনের

মাধ্যমে। নিউক্লিয়ার ফিউশন কিন্তু খুবই কঠিন একটি প্রক্রিয়া, যা নক্ষত্রের অভ্যন্তরে খুবই উচ্চ তাপামাত্রার পরিবেশে ঘটে (এবং হাইড্রোজেন বোমায়); অপেক্ষাকৃত ছোটো নক্ষত্রগুলো, যেমন আমাদের সূর্য এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র হালকা মৌল তৈরি করতে পারে, যেমন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেনের পরেই পর্যায়-সারণীয় যা দ্বিতীয় লঘুতম মৌল। আরো বড় ও উত্তপ্ত নক্ষত্রর দরকার সেই তাপমাত্রার সৃষ্টি করার জন্য, যা বাকি প্রায় সব ভারী মৌল সৃষ্টি করতে পারে নিউক্লিয়ার ফিউশনের ধারাবাহিক বিক্রিয়া প্রক্রিয়ায়, যার বিস্তারিত প্রক্রিয়াটি উৎঘাটন করেছিলেন ফ্রেড হয়েল এবং তার দুই সহকর্মী (এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি সরূপ, রহস্যজনকভাবে অন্য দুইজনের পাওয়া নোবেল পুরষ্কারের ভাগ হয়েলকে দেয়া হয়নি)। এই বড় নক্ষত্রগুলো সুপারনোভা হয়ে বিস্ফোরিত হতে পারে এবং সেই নক্ষত্রে তৈরি উপাদানগুলো এভাবে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে পর্যায় সারণীর মৌলগুলোসহ ধুলোর মেঘ হিসেবে। এই ধুলোর মেঘগুলো ঘনীভুত হয়ে তৈরি করে নতুন নক্ষত্র, আমাদের পৃথিবীর মত গ্রহ। এই কারণে পৃথিবী সর্বব্যাপী হাইড্রোজেনের অপেক্ষা আরো অনেক বেশি ধরনের মৌলে সমৃদ্ধ। যে মৌলগুলো ছাড়া রসায়ন, এবং জীবন হতো অসম্ভব।

এখানে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি হচ্ছে, নিউক্লীয় সংযোজনের (নিউক্লীয় ফিউশন) ধারাবাহিক বিক্রিয়ায় পর্যায় সারণীর কোন মৌল অবধি তৈরি হবে তা নির্ধারণ করতে স্ট্রং ফোর্সের মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামক। যদি এর পরিমাণ খুব সামান্য হয়, ধরুন ০.০০৬, ০.০০৭ এর বদলে, মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন ছাড়া আর কিছুই থাকতো না, কোনো ধরনের উপযোগী রসায়নেরই অস্তিত্বই থাকতো না। এবং এটি যদি খানিকটা বেশি হত, ধরুন ০.০০৮, তাহলে সব হাইড্রোজেন একসাথে যুক্ত হয়ে ভারী মৌলগুলো তৈরি করতো। আর হাইড্রোজেন ছাড়া কোনো রসায়নই আমরা যে জীবনকে চিনি, তা সৃষ্টি করতে পারতো না। একটা কারণ তো অবশ্যই কোনো পানির অস্তিত্ব থাকতো না। সুতরাং গোল্ডিলকস পরিমাপ হলো ০.০০৭, প্রয়োজনীয় মৌল সরবরাহ করার জন্য যা এই মাত্রায় একদম সঠিক। একটি চমৎকার এবং জীবন সহায়ক রসায়নের ভিত্তি গড়ে দিতে যা প্রয়োজন।

রিসের ৬ টি সংখ্যার বাকিগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো না। তবে প্রত্যেকটি সম্বন্ধে মূল উপসংহার একই। প্রতিটি সংখ্যার পরিমাপ ঠিক সেই ‘গোল্ডিলকস’ অনুকূল সীমায় অবস্থান করছে, যার বাইরে জীবনের উৎপত্তি অসম্ভব একটি ব্যপার। এ বিষয়ে আমাদের প্রতিক্রিয়া কেমন হওয়া উচিত? আবারো, ঈশ্বরবাদীদের উত্তর আছে একদিকে, আর অন্যদিকে আছে অ্যানথ্রোপিক উত্তর। ঈশ্বরবাদীরা বলবেন, ঈশ্বর যখন এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, এর মূল ধ্রুবগুলো তিনি নিজ হাতে এমন ভাবে সূক্ষ্মতা দিয়েছেন, যে প্রত্যেকটি জীবনের উৎপত্তির গোল্ডিলকস সীমানায় অবস্থান করে। যেন ঈশ্বরের কাছে ৬ টি নব আছে এবং তিনি সাবধানে সেটা নাড়াচাড়া করে এর

গোল্ডিলকস সীমানার মানটি ঠিক করেছেন। সবসময়ের মতোই, ঈশ্বরবাদীদের এই উত্তর খুব অসম্পূর্ণ এবং ভীষণ অপূর্ণতার চিহ্ন বহন করে। কারণ এটি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছে। একজন ঈশ্বর যিনি ৬ টি সংখ্যার জন্য সঠিক গোল্ডিলকস পরিমাণ পরিমাপ করতে পারেন, তাকেও অন্ততপক্ষে অবশ্যই সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সংখ্যাগুলোর মতোই অসম্ভাব্য হতে হবে। এবং এই অসম্ভাব্যতাই আসলেই সেই প্রসঙ্গ, যার আলোচনা আমরা করছি। ঈশ্বরবাদীদের উত্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে মূল সমস্যাটার সমাধানে উল্লেখযোগ্য কোনো অবস্থানে পৌঁছাতে। আমি কোনো বিকল্প দেখছি না এটিকে বাদ দেয়া ছাড়া, এবং একই সাথে বিস্ময়বোধ করছি সেই বিশাল সংখ্যক মানুষদের দেখে, যারা এই সমস্যাটি আদৌ দেখতে পাচ্ছেন না, এবং মনে হচ্ছে স্বর্গীয় কারো কলকব্জা নাড়িয়ে নিয়ন্ত্রণ করার এই যুক্তিতে তারা আন্তরিকভাবেই সন্তুষ্ট।

এই ধরনের বিস্ময়কর অন্ধত্বের মনস্তাত্বিক কারণ হয়তো হতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং অসম্ভাব্যতার এই পোষ মানানোর শক্তি দ্বারা জীববিজ্ঞানীদের মতো অনেক মানুষের সচেতনতার স্তরটি আসলে বাড়েনি। জে. অ্যান্ডারসন থমসন (৫৪), বিবর্তন মনোস্তাত্ত্বিকতায় তার দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্য আরেকটি কারণ প্রস্তাব করেছিলেন: সেটি হচ্ছে সকল অজৈব বস্তুকে কোনো এজেন্ট বা প্রভাব ফেলতে পারে এবং কাজ করতে সক্ষম এমন কোনো সত্তার সাথে একাত্ম করে চিহ্নিত করার আমাদের মনোস্তাত্ত্বিক পক্ষপাতিত্ব এবং প্রবণতা। থমসন যেমন বলেছেন, কোনো চোরকে ছায়া ভাবার চেয়ে কোনো ছায়াকে চোর ভাবার প্রবণতাই আমাদের বেশি। একটি মিথ্যা পজিটিভ বা যা সত্য বলে ভাবছিলাম তা আসলে মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়াটা হয়তো সময় নষ্ট করে, তবে কোনো মিথ্যা নেগেটিভ, বা যা মিথ্যা ভাবছেন তা আসলে সত্যি হলে, এর ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। আমাকে লেখা তার একটি চিঠিতে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, আমাদের পূর্বসূরিদের অতীতে আমাদের চারিদিকে আমাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসলে এসেছে আমাদের স্বগোত্রীদের একে অপরের কাছ থেকে: 'মানুষের উদ্দেশ্য নিয়ে সেই ধরে নেয়া বা 'ডিফল্ট' ধারণাটির ফলাফল, প্রায়শই 'ভয়'; আমাদের খুবই কষ্ট হয়, মানুষের দ্বারা সৃষ্টি হয়নি এমন কোনো কিছু ভাবতে'; আমরা প্রাকৃতিকভাবে সবকিছু গণ হারে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বলে চিহ্নিত করি। এই কোনো কিছু কারো দ্বারা সৃষ্ট বা এজেন্টের মোহময়তার ধারণায় আবার ফিরে আসবো পরে পঞ্চম অধ্যায়ে।

জীববিজ্ঞানীরা, অসম্ভাব্য জিনিসগুলোর উদ্ভবেরব্যাখ্যা দিতে পারেন প্রাকৃতিক নির্বাচনের শক্তি দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তাদের সচেতনতা দিয়ে, তাদের এমন কোনো তত্ত্বতে সন্তুষ্ট হবার কথা নয়, যা অসম্ভাব্যতার সমস্যাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। ঈশ্বরবাদীদের এই অসম্ভাব্যতার ধাঁধার উত্তর হচ্ছে একটি বিশাল সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া। যা

সমস্যাটিকে নতুন করে তো ব্যাখ্যা করেই না, বরং উদ্ভটভাবে বিষয়টি আরো বিশাল করে তোলে। তাহলে, এবার অ্যানথ্রোপিক বিকল্প ব্যাখ্যাটির দিকে দৃষ্টি ফেরাই। অ্যানথ্রোপিক উত্তর, এর সবচেয়ে সাধারণ রূপে হলো, আমরা শুধু সেই ধরনের মহাবিশ্বে এই প্রশ্নগুলো আলোচনা করতে পারবো, যা কিনা আমাদের তৈরি করতে সক্ষম। সুতরাং আমাদের অস্তিত্ব নির্ধারণকারী পদার্থবিদ্যার মৌলিক যে ধ্রুবগুলোকে এদের সংশ্লিষ্ট গোল্ডিলকস বা জীবন-অনুকূল সীমানায় অবশ্যই থাকতে হবে। আমাদের অস্তিত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করতে বিভিন্ন পদার্থবিদরা বিচিত্র ধরনের অ্যানথ্রোপিক সমাধানকে সমর্থন করেন।

কট্টরপন্থী পদার্থবিদরা বলেন, এই ছয়টি ধ্রুব সংখ্যার সুইচ বা নবগুলো শুরুতেই তাদের নিজেদের ইচ্ছামত পরিবর্তন হবার মত স্বাধীন ছিল না ; এবং আমরা যখন শেষ পর্যন্ত আমাদের দীর্ঘদিন আশায় থাকা 'থিওরি অব এভরিথিং' বা সবর্জনীন তত্ত্বে পৌঁছাতে পারবো, আমরা দেখবো যে এই ছয়টি প্রধান সংখ্যা পারস্পরিক নির্ভরশীল বা এমন কিছুর উপর নির্ভরশীল যা এখনো অজানা বা এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে আজ আমরা তা কল্পনাও করতে পারবো না। এই ছয়টি সংখ্যা হয়তো দেখা যাবে, বৃত্তের পরিধির সাথে তার ব্যাসের অনুপাতের যে ভিন্নতা থাকতে পারে তার চেয়ে বেশি স্বাধীন নয়। দেখা যাবে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হবার আসলে একটাই উপায় ছিল। সেই ছয়টি নব নাড়া চাড়া করার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজন তো বহুদূরের কথা, কোনো নবই ছিল না নড়াচাড়া করার মত।

অন্য পদার্থবিদরা (তাদের একজন উদাহরণ হতে পারেন মার্টিন রিস) মনে করেন, এই ব্যাখ্যাটি সন্তোষজনক না । এবং আমি মনে করি, আমি তাদের সাথে একমত। আসলে এটি যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যাযোগ্য যে মহাবিশ্ব হবার একটি পথই আছে, কিন্তু সেই একটি পথ বা উপায় কেনই বা এমন ভাবে সাজানো আছে যা ক্রমান্বয়ে আমাদের বিবর্তনের জন্য দায়ী? কেনই বা এটিকে সেই ধরনের মহাবিশ্ব হতে হবে, যা মনে হয় - তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের (৫৫) মহাবিশ্ব যেন 'অবশ্যই আগে থেকেই জানতো আমরা আসছি'? দার্শনিক জন লেসলি (৫৬) ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন মানুষের রূপক ব্যবহার করে ব্যাখ্যা করেছিলেন, হতে পারে ফায়ারিং স্কোয়াড টিমের ১০ জনই তাদের বন্দুকের নিশানা ভুল করলো। পরে বিষয়টি ভেবে দেখলে, এমন অবস্থায় বেঁচে যাওয়া কেউ তার ভাগ্য নিয়ে আনন্দিত হয়ে বলতেই পারেন, 'বেশ, নিশ্চয়ই তারা সবাই নিশানা ভুল করেছে নয়তো সে কথা ভাবার জন্য আমি এখানে থাকতাম না'। কিন্তু তারপরও সে কিন্তু ক্ষমাযোগ্য কোনো বিস্ময় নিয়ে ভাবতেই পারেন, কেন তারা সবাই নিশানা ভুল করলো, এবং নানা সম্ভাব্য হাইপোথিসিস নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারেন, যেমন তাদের ঘুষ দেয়া হয়েছে অথবা তারা সবাই মাতাল ছিল ইত্যাদি।

এর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগের আরো একটি প্রস্তাব দিয়ে উত্তর দেয়া যেতে পারে, যা মার্টিন রিস নিজেই সমর্থন করেছিলেন, তা হলো একাধিক বা বহু সংখ্যক মহাবিশ্ব আছে, ফেনার বুদ্বুদের মত যারা সহাবস্থান করছে, কোনো একটি মাল্টিভার্স বা বহুমহাবিশ্বে (বা মেগাভার্স যেমন লিওনার্ড সাসকিন্ড বলতে পছন্দ করেন) (৫৭); কোনো একটি মহাবিশ্বে আইন এবং ধ্রুবগুলো, যেমন আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে ,আসলে বহুমহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্সে হচ্ছে উপআইন বা বাই ল বা স্থানীয় আইন। সম্পূর্ণ মাল্টিভার্সে স্পষ্টতই অসংখ্য সেট বিকল্প উপ-আইন বা বাই-ল আছে। অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি এখানে বলছে যে, সেই মহাবিশ্বগুলোর কোনো একটিতে (যা সংখ্যায় খুবই কম বলেই অনুমান করা হয়) আমরা অবশ্যই অবস্থান করছি, যেখানকার পদার্থবিদ্যার উপ-আইনগুলো ঘটনাক্রমে আমাদের ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের পক্ষে উপযোগী এবং সেজন্যই আমরা সমস্যাটি নিয়ে ভাবতে পারছি।

মাল্টিভার্স তত্ত্বের একটি মজার সংস্করণের উৎপত্তি হয়েছে আমাদের মহাবিশ্বের সর্বশেষ পরিণতির কথা বিবেচনা করে। মার্টিন রিসের ৬ টি ধ্রুব সংখ্যার মানের উপর নির্ভর করে আমাদের মহাবিশ্ব হয়তো অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সম্প্রসারণশীল হতে পারে, বা এটি একটি ভারসাম্যে স্থিতাবস্থায় পৌঁছাতে পারে বা এই ক্রমসম্প্রসারণশীলতা বিপরীতমুখী হতে পারে এবং সৃষ্টি করতে পারে একটি মহাসংকোচন বা বিগ ক্রাঞ্চ। কিছু বিগ ক্রাঞ্চ মডেলে মহাবিশ্ব আবার সম্প্রসারিত হওয়া শুরু করে এবং এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য, যেমন ধরুন ২০ বিলিয়ন বছরের একটি সময় চক্রে। আমাদের ‘স্ট্যান্ডার্ড মডেল’ মহাবিশ্বে, সময় ১৩ বিলিয়ন বছর আগে তার নিজের যাত্রা শুরু করেছিল ‘বিগ ব্যাঙ্গের’ মাধ্যমে মহাশূন্যে সূচনার সাথে। প্রায় ধারাবাহিক বিগ ক্র্যাঞ্চ মডেল হয়তো এই বাক্যটিকে পরিববর্তন করতে পারে এভাবে: আমাদের সময় এবং মহাশূন্যের আসলে সূচনা হয়েছিল আমাদের বিগ ব্যাঙ্গের সময়, যা অসংখ্য বিগ ব্যাঙ্গের সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে সাম্প্রতিকতম ঘটনা। যাদের প্রত্যকটির শুরু হয়েছিল আবার বিগ ক্রাঞ্চের মাধ্যমে, যা এই ধারাবাহিকতায় এর আগের মহাবিশ্বটির সমাপ্তির কারণ। কেউই বুঝতে পারেননি কি ঘটেছিল আসলে বিগ ব্যাঙ্গের মত কোনো সিঙ্গুলারিটি ঘটনার সময়। সুতরাং ধারণা করা যায় যে, সব আইন এবং ধ্রুবগুলো নতুন একটি মানে রিসেট বা পুনর্নির্ধারিত হয়ে, প্রতিবারই এই চক্রে। যদি এভাবে ব্যাঙ্গ - সম্প্রসারণ- সংকোচন- ক্র্যাঞ্চ চক্র চলতেই থাকে মহাজাগতিক অ্যাকর্ডিয়নের মত, আমরা সমান্তরাল কোনো মাল্টিভার্স সংস্করণের পরিবর্তে পাই ধারাবাহিক মাল্টিভার্স। আরো একবার অ্যানথ্রোপিক নীতি তার ব্যাখ্যার দ্বায়িত্ব পালন করে। ধারাবাহিক মহাবিশ্বের সবকয়টির মধ্যে হয়তো অল্প কয়েকটির ধ্রুব বং আইনগুলো এমন করে সাজানো ছিল, যে তারা জীবনের উদ্ভবের জন্য সহায়ক ছিল। এবং অবশ্যই, বর্তমান মহাবিশ্ব সেই সংখ্যালঘু মহাবিশ্বের একটি, কারণ আমরা এখানে বসবাস করছি। এই মাল্টিভার্সের এই ধারাবাহিক সংস্করণটি একসময় যেমন ভাবার

হতো এখন এর সম্ভাবনাকে সেভাবে ভাবা হয়না। কারণ সাম্প্রতিক প্রমাণ আমাদের মহাসংকোচনের ধারণা থেকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্বের নিয়তিতে চিরন্তন সম্প্রসারণ আছে।

লি স্মোলিন (৫৮), আরেকজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, যিনি মাল্টিভার্স তত্ত্বটির একটি কৌতূহলোদ্দীপক ডারউইনীয় সংস্করণ প্রস্তাব করেছেন, যার মধ্যে ধারাবাহিক এবং সমান্তরাল দুটি মহাবিশ্বের ধারণাই বিদ্যমান। স্মোলিনের ধারণাগুলো - যার বিশদ ব্যাখ্যা আছে তার 'দ্য লাইফ অব দ্য কসমস' বইটিতে - নির্ভর করে আছে সেই তত্ত্বের উপর, যা বলছে, কোনো একটি মাতৃ মহাবিশ্ব থেকে কন্যা মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয় পুরো মাত্রার মহাসংকোচনের মাধ্যমে নয়, বরং স্থানীয়ভাবে কোনো কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের মধ্যে। বংশগতির একটি অন্যকরম ধারণা স্মোলিন এখানে তার প্রস্তাবিত তত্ত্বে যোগ করেন: কন্যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় তাদের মৌলিক ধ্রুবগুলোও খানিকটা মিউটেশন বা পরিবর্তিত হয় মাতৃ মহাবিশ্ব থেকে। ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচনে এই হেরেডিটি বা বংশগতি হচ্ছে অপরিহার্য একটি উপাদান, আর স্মোলিনের বাকি তত্ত্ব এখান থেকেই প্রাকৃতিকভাবেই অগ্রসর হয়। যে মহাবিশ্বগুলোর সেই বৈশিষ্ট্য আছে যা তাদের 'টিকে' থাকতে এবং আরো পরবর্তী 'প্রজন্ম' সৃষ্টি করতে সহায়তা করে, মাল্টিভার্সে সেই সব মহাবিশ্বগুলো ক্রমান্বয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। যেহেতু এই পরবর্তী প্রজন্মের মহাবিশ্ব তৈরির প্রক্রিয়াটি ঘটে কৃষ্ণ গহবরে, সফল সব মহাবিশ্বগুলোর কৃষ্ণ কৃষ্ণগহ্বর তৈরি করার প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকে। এই দক্ষতা ইঙ্গিত করছে, আরো বাড়তি কিছু বৈশিষ্ট্যের। যেমন, পদার্থের ঘনীভূত হয়ে নক্ষত্র ও পরবর্তীতে কৃষ্ণ গহবর সৃষ্টি করা। নক্ষত্র যাদের আমরা দেখেছি প্রয়োজনীয় রসায়ন সৃষ্টি করতে, এবং সেভাবে যারা জীবনেরও পূর্বসূরি। সুতরাং স্মোলিনের প্রস্তাব, মাল্টিভার্সেও মহাবিশ্বদের উপরও কাজ করছে একটি ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন, যা সরাসরি কৃষ্ণগহ্বর সমৃদ্ধ মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং পরোক্ষভাবে জীবনের উৎপত্তিকে বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছে। অবশ্যই সব পদার্থবিদরা স্মোলিনের প্রস্তাবের সাথে একমত নন, যদিও নোবেল জয়ী পদার্থবিদ মারে গেল-মানের এর উদ্ধৃতি, 'স্মোলিন? সেই ক্ষ্যাপাটে চিন্তার অল্প বয়সী ছেলেটি না? তার ধারণা ভুল নাও হতে পারে' (৫৯)। একজন দুষ্টু জীববিজ্ঞানী হয়তো ভাবতেই পারেন, অন্য কোনো পদার্থবিদদের ডারউইনীয় সচেতনতা বৃদ্ধি করার দরকার আছে কিনা ।

খুব সহজ কিন্তু চিন্তা করা (এবং অনেকেই এর শিকার) যে, এক গুচ্ছ মহাবিশ্বের ধারণার প্রস্তাব করা মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা এবং এ ধরনের চিন্তাকে প্রশ্রয় না দেয়াই উত্তম। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তিটি হচ্ছে, যদি অসংখ্য মহাবিশ্বের এই বাহুল্যর ধারণাটিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়, তাহলে আমরা কেনই বা আরেকটু বেশি ধারণা করি না কেন, কেনই বা তাহলে ঈশ্বরের ধারণাটিকে প্রশ্রয় দেই না। দুটি ধারণাই কি একই মাত্রায় অমিতব্যায়ী

নয়, যা বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত হাইপোথিসিস এবং সমানভাবে অসন্তোষজনক? যারা এভাবে ভাবেন তাদের সচেতনতার স্তর বৃদ্ধি হয়নি প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা। সত্যিকারের বাহুল্যময় ঈশ্বর হাইপোথিসিস এবং আপাতদৃষ্টিতে বাহুল্যময় মাল্টিভার্স হাইপোথিসিসের মধ্যে প্রধান পার্থক্যটি হচ্ছে মূলত পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা। মাল্টিভার্স তার সব বাহুল্য আর আড়ম্বর নিয়ে সরল। ঈশ্বর বা বুদ্ধিমান, সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সম্পন্ন, গণনাকারী কোনো এজেন্ট, খুবই অসম্ভাব্য সেই একই পরিসংখ্যানগত পরিমাপের ধারণায়, যে সত্তাগুলোর অস্তিত্ব তার ব্যাখ্যা করা কথা। মাল্টিভার্সকে মনে হতে পারে 'সুবিশাল' পরিমানে বাহুল্যময় মহাবিশ্বের সংখ্যা, কিন্তু এই প্রত্যেকটি মহাবিশ্ব কিন্তু তার মৌলিক সুত্রের ক্ষেত্রে সরল। আমরা কিন্তু এখানে এমন কিছু এখন প্রস্তাব করছি না যা খুব বেশি মাত্রায় অসম্ভাব্য। কিন্তু অন্য যে-কোনো বুদ্ধিমান সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রে এর ঠিক বিপরীতটাই বলতেই হবে।

কিছু পদার্থবিদ আছেন যারা সবার জানা মতেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসী (রাসেল স্ট্যানার্ড এবং জন পোলকিংহর্ন, এই দুইজন ব্রিটিশ পদার্থবিদের উদাহরণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি)। যেমনটা হবার কথা ছিল, তারা ভৌত ধ্রুবগুলোর সবকয়টির কম বেশি সংকীর্ণ একটি গোল্ডিলকস সীমায় টিউন বা নির্দিষ্ট করার বিষয়টির অসম্ভাব্যতার বিষয়টি লুফে নিয়েছেন এবং প্রস্তাব করেছেন, নিশ্চয়ই কোনো মহাজাগতিক বুদ্ধিমান সত্তা এই নির্ধারণের কাজটি পরিকল্পিতভাবেই করেছেন। আমি আগেই এই ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছি, কারণ এটি যা সমাধান করছে, তারচেয়ে আরো বড় প্রশ্নের জন্ম দেয়। কিন্তু এর উত্তর হিসাবে প্রস্তাব করতে ঈশ্বরবাদীরা কি চেষ্টা করেছেন? তারা কিভাবে এই যুক্তির সাথে সমঝোতা করতে পারেন: কোনো ঈশ্বর যিনি এই মহাবিশ্বকে ডিজাইন করতে পারেন, আমাদের বিবর্তনের জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পূর্বদৃষ্টি নিয়ে এর সব ধ্রুবগুলোকে উপযোগী করে তুলেছেন অবশ্যই তাকে খুবই জটিল এবং অসম্ভাব্য একটি সত্তা হতে হবে, যার অস্তিত্ব ব্যাখ্যা দেবার জন্য যে ব্যাখ্যা তার প্রস্তাব করার কথা, তার চেয়েও আরো বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

ধর্মতাত্ত্বিক রিচার্ড সুইনবার্ন - আমরা যেমনটা আশা করতে শিখেছি ধর্মবাদীদের কাছে - মনে করেন, এই সমস্যার জন্য তার একটি সমাধান আছে। তিনি তার 'ইস দেয়ার এ গড'? বইয়ে এই বিষয়টির বিশদ ব্যাখা দিয়েছেন। বিষয়টি ব্যাখ্যা করার ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই যদিও তিনি শুরু করেছিলেন, কেন আমাদের সবসময় সবচেয়ে সরলতম হাইপোথিসিসটিকে বেছে নেয়া উচিত, যা সব বাস্তব সত্যের সংগতিপূর্ণ হয়। সরল বিষয়গুলোর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে বিজ্ঞান আরো জটিল সব বিষয়গুলো সাধারণত ব্যাখ্যা করে। যে ব্যাখ্যাটি পরিশেষে মৌলিক কণাদের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আরো বিস্তারিত রূপ ধারণ করে। আমি (আমি সাহস করে বলতে পারি আপনিও) মনে করি এটি খুব সুন্দর সরল একটি

ধারণা যে, সব কিছুই তৈরি হয় মৌলিক কিছু কণা দিয়ে, আর যত অগণিত সংখ্যক হোক না কেন, সবকিছুর সৃষ্টি সীমিত সংখ্যক এক সেট মৌলিক কণা থেকেই উদ্ভুত। আমরা যদি ধারণাটিতে সংশয় বোধ করি তার কারণ শুধু এটিকে খুবই সরল একটি ধারণা বলেই আমরা তা ভাবছি। কিন্তু সুইনবার্নের জন্য, এটি আসলে একদমই সরল কোনো বিষয় ছিল না, বরং ঠিক এর বিপরীত।

কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রকারের কণিকা, যেমন ধরুন ইলেক্ট্রন, এর সংখ্যা এত বিশাল যে, সুইনবার্ন মনে করেন বিষয়টা শুধু কাকতলীয় কোনো ঘটনা হতে পারেনা , এদের সবার একই ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকবে। একটি ইলেক্ট্রন তিনি হজম করতে পারবেন, তবে বিলিয়ন বিলিয়ন ইলেক্ট্রন, 'সবার একই বৈশিষ্ট্য', বিষয়টি তার অবিশ্বাসকে বেশ উত্তেজিত করে তোলে। তার মতে যদি সবগুলো ইলেকট্রন পরস্পর থেকে আলাদা হতো, সেই ব্যাখ্যাটা হত অনেক বেশি সরল, বেশি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক, যথেষ্ট কম কষ্টসাধ্য হতো সেই ব্যাখ্যা। আরো খারাপ তার মতে, কোনো ইলেকট্রনের উচিত না তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এক সাথে এক মুহূর্তের বেশি সময় ধরে স্থিতিশীল রাখা, তাদের প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য বদলানো উচিত, নিজের খেয়াল খুশী মত, এলোমেলো, এই মূহূর্ত থেকে অন্য মূহূর্ত আলাদা, দ্রুত পরিবর্তনশীল। সুইনবার্নের দৃষ্টিতে এটাই সরলাবস্থা, সবকিছুর আদি অবস্থা। 'সমবৈশিষ্ট্যপূর্ণ (যা আমি বা আপনি হয়তো বলবেন আরো বেশি সরল) কোনো কিছুর জন্য দরকার বিশেষ ব্যাখ্যা। শুধুমাত্র এর কারণ হচ্ছে, ইলেক্ট্রন এবং তামার কণাগুলো এবং অন্যান্য সব পদার্থগুলোর বিংশ শতাব্দীতে শক্তি ধারণ করে, উনবিংশ শতাব্দীতেও তাদের একই পরিমান শক্তি ছিল এবং সেই সবকিছুই আগে যেমন ছিল এখনো তেমন আছে'।

এখানে ঈশ্বরের আগমন, ঈশ্বরের প্রবেশ হলো, এই ইচ্ছাকৃত এবং নিরন্তর একই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার মাধ্যমে এই সব বিলিয়ন বিলিয়ন ইলেক্ট্রন, তামার টুকরাদের বুনো এলোমেলো আচরণ ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের জন্য তাদের নিজস্ব অন্তর্গত প্রবণতা থেকে উদ্ধার করতে। এই কারণে আপনি যখন একটি ইলেকট্রন দেখবেন, আপনার সব দেখা হয়ে যাবে. সে কারণেই তামার টুকরাগুলো সবাই তামা টুকরার মত আচরণ করে। এই কারণে প্রতিটি ইলেক্ট্রন এবং তামার প্রতিটি টুকরো ঠিক নিজের মতো থাকে মাইক্রোসেকেন্ডের পর মাইক্রোসেকেন্ড, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এর কারণ ঈশ্বর নাকি সারাক্ষণই প্রতিটি কণার উপর তার ঐশী আঙ্গুল দিয়ে রেখেছেন, কোনো ধরনের স্বেচ্ছাচারী বাড়াবাড়ি আচরণ দমনের উদ্দেশ্যে এবং তিনি শাসন করেন যেন বেয়াড়া কণারা তাদের বাকি ইলেক্ট্রন সহকর্মীদের সাথে এক লাইনেই থাকে; যেন তারা সবাই ঠিক একই রকম আচরণ করে।

কিন্তু সুইনবার্ণের পক্ষে কিভাবে সম্ভব হবে তার এই অদ্ভুত হাইপোথিসিসটাকে টিকিয়ে রাখা? যেখানে ঈশ্বর একই সাথে গ্যাজেলিয়ন (অগণিত) আঙ্গুল দিয়ে নিয়ম না মানা ইলেক্ট্রনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন, এটা কিভাবে একটি 'সরল' হাইপোথিসিস হতে পারে? অবশ্যই এটা সরলের ঠিক বিপরীত। সুইনবার্ণ এখানে খেলা দেখালেন তার নিজের মনগড়া চমক দেখানো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক 'ঔদ্ধত্ব' দেখিয়ে। কোনো যৌক্তিকতা ছাড়াই তিনি দাবী করেন যে ঈশ্বর হচ্ছে 'একক' একটি বস্তু দিয়ে গঠিত। কি অসাধারণ তার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করার এই অর্থনীতি, যদি তা তুলনা করা হয় ঐ গ্যাজেলিয়ন সংখ্যক ইলেক্ট্রন স্বতন্ত্রভাবে মূলত একই, সেই ধারণার সাথে!

ঈশ্বরবাদীরা দাবী করছেন, প্রতিটি জিনিস যার অস্তিত্ব আছে, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার কারণ হচ্ছে মাত্র একটি.. ঈশ্বর। এবং এটি দাবী করা যে, প্রতিটি বৈশিষ্ট্য যা প্রতিটি জিনিসের আছে, তা হচ্ছে ঈশ্বরের কারণে বা তার অনুমতিতে শুধুমাত্র তারা অস্তিত্বশীল। এটি বেশ কিছু কারণকে ব্যাখ্যার জন্য সাধারণ সরল একটি ব্যাখ্যার বিশিষ্ট উদাহরণ। এই ক্ষেত্রে সম্ভাবনা আছে একটার বেশি সরলতম কোনো ব্যাখ্যা না থাকার, শুধু সেটাই যা কেবল একটি কারণকেই প্রস্তাব করে। বহুঈশ্বরবাদ থেকে ঈশ্বরবাদ এই কারণে সরল। এবং ঈশ্বরবাদের জন্য একটি কারণ প্রস্তাব করছে, একটি সত্তা (যার আছে) অসীম ক্ষমতাময় (ঈশ্বর যৌক্তিকভাবে সম্ভব এমন সব কিছুই করতে পারেন), অসীম জ্ঞানের অধিকারী (যৌক্তিকভাবে যা জানা সম্ভব তা সবকিছু জানেন ঈশ্বর), অসীম স্বাধীন।

সুইনবার্ন দয়াপরবশ হয়ে মেনে নিয়েছেন, ঈশ্বর এমন কোনো কিছু করতে পারেন না যা 'যৌক্তিকভাবে' অসম্ভব এবং তার এই সংযমের জন্য তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। এটা মেনে নিয়েই বলছি, কোনো কিছু ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতার ব্যবহারের কোনো সীমাবদ্ধতা ঈশ্বরবাদীরা অনুধাবন করেননি কখনোই। বিজ্ঞানের কি 'ক' ব্যাখ্যা করতে খানিকটা সমস্যা হচ্ছে? কোনো অসুবিধা নেই, 'ক' নিয়ে আর সময় নষ্ট করার দরকার নেই, ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতাকে টেনে নিয়ে আসা হয় 'ক'ব্যাখ্যা করতে (সেই সাথে বাকি সবকিছুই), এবং এটাকে দাবী করা হবে সর্বশ্রেষ্ট সরলতম ব্যাখ্যা হিসাবে, কারণ, সর্বোপরি ঈশ্বর তো শুধুমাত্র একজন। এর চেয়ে জটিলতামুক্ত আর কি হতে পারে?

বেশ, সত্যিকথা বলতে গেলে, প্রায় সবকিছুই। এমন একজন ঈশ্বর যিনি কিনা মহাবিশ্বের প্রতিটি কণাকে বিরামহীনভাবে পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তিনি তার যাই হোন না কেন, সরল কোনো সত্তা হতেই পারেন না। তার নিজের অস্তিত্বটির বর্ণনা জন্যই তো প্রয়োজন আছে বিশাল একটি ব্যাখ্যার। আরো খারাপ (সরলতার দৃষ্টিকোণ থেকে) ব্যপার হচ্ছে, ঈশ্বরের অতিকায় চেতনার অন্য প্রান্তগুলোও একই

সাথে প্রতিটি মানুষের কর্মকাণ্ড, তাদের আবেগ ও অনুভূতি এবং প্রার্থনা নিয়ে ব্যস্ত ; এছাড়া ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সীর অন্যান্য গ্রহে যদি অন্য কোনো বুদ্ধিমান ভিনগ্রহবাসী থাকে তারা তো আছেনই। সুইনবার্নের মতে তিনি এমনকি নিরন্তরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন আমাদের রক্ষা করতে অলৌকিকভাবে হস্তক্ষেপ 'না' করার জন্য, যেমন, যখন আমরা ক্যান্সারে আক্রান্ত হই। সেটা তিনি কখনো করবেন না, কারণ, 'ঈশ্বর যদি কোনো আক্রান্ত রোগীর স্বজনের বেশির ভাগ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন তাকে ক্যান্সার থেকে বাঁচানোর জন্য, তাহলে সমাধানের জন্য মানুষের জন্য ক্যান্সার কখনো সমস্যা থাকবে না। তাহলে আমরা আমাদের সময় নিয়ে কি করবো'?

সব ধর্মতাত্ত্বিকরা আবার সুইনবার্নের মত এত দূর যেতে চান না, তবে যা-ই হোক না কেন, ঈশ্বর হাইপোথিসিস যে সরল, এই অদ্ভুত দাবী কিন্তু বেশ কিছু আধুনিক ধর্মতাত্ত্বিকদের রচনায় দেখা যায়, যেমন, কিথ ওয়ার্ড, যখন তিনি অক্সফোর্ডের ডিভিনিটির রিজিয়াস অধ্যাপক ছিলেন, তার লেখা ১৯৯৬ সালের 'গড, চান্স অ্যান্ড নেসেসিটি' বইটিতে এই বিষয়ে বেশ স্পষ্ট একটি বক্তব্য ছিলো:

> আসল কথা হলো, ঈশ্বরবাদীরা দাবী করেন মহাবিশ্বর অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বর হচ্ছেন অতি অসাধারণ, সুন্দর, সুবিধাজনক এবং কার্যকর একটি ব্যাখ্যা। এটি সহজসাধ্য উপযোগী কারণ এটি মহাবিশ্বের সবকিছুর অস্তিত্ব এবং তাদের প্রকৃতির গুণাবলী আরোপ করেছে একটি মাত্র সত্তার উপর, সেই চূড়ান্ত কারণ, যা সবকিছুর অস্তিত্বের কারণ, এমনকি তার নিজের অস্তিত্বেরও। ধারণাটি সুন্দর, কারণ একটি প্রধান ধারণা থেকে, সম্ভবপর এমন কোনো নিখুঁততম সত্তা - ঈশ্বরের সম্পূর্ণ প্রকৃতি এবং সমগ্র মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (৬০) ।

সুইনবার্নের মতোই, কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বলতে কি বোঝায়, সেই বোঝানো ক্ষেত্রেও ওয়ার্ডও একই ভুল করেন তার এই বক্তব্যে। এবং মনে হয় তিনি বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন, কোনো কিছুকে যদি সরল বলা হয়, আসলে সেটা সম্বন্ধে কি বোঝাচ্ছে। আমি স্পষ্ট না ওয়ার্ড আসলেই কি ঈশ্বরকে সরল ভাবছেন কিনা? বা উপরের অনুচ্ছেদটি অস্থায়ী 'তর্কের খাতিরে বলা' এমন কোনো অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করছে? স্যার জন পোলকিংহর্ন, 'সায়েন্স অ্যান্ড ক্রিষ্টিয়ান বিলিফ' বইয়ে ওয়ার্ডে'র টমাস অ্যাকোয়াইনাসের আগের সমালোচনার উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন,'এটা মৌলিক একটি ভুল, ঈশ্বরকে যৌক্তিকভাবে সরল মনে করা - সরল এখানে শুধুমাত্র এই অর্থে না যে তার সত্তা অবিভাজ্য বরং আরো বেশি দৃঢ় অর্থে যে, ঈশ্বরের কোনো অংশ সত্যি হলে ঈশ্বর সম্পূর্ণভাবে সত্য। এই কারণে এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত হবে মনে করা, ঈশ্বর, যখন অসরলযোগ্য, অন্তর্গতভাবে জটিল'। ওয়ার্ড কিন্তু এখানে ব্যাপারটা ঠিকই ধরতে

পেরেছেন। আসলে, জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি, ১৯১২ সালে, জটিলতার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন গঠনের নানা অংশের বৈসাদৃশ্যতা হিসাবে, যা দিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরনের বৃত্তিগত বা প্রায়োগিক অবিভাজ্যতা আর অসরলযোগ্যতা বোঝাতে চেয়েছিলেন।

কোথা থেকে জটিল জীবনের উদ্ভব হয়েছে তা বোঝার জন্য ধর্মতাত্ত্বিক মানসিকতার বিশেষ পদ্ধতিগত সমস্যা সৃষ্টি করে সেই বিষয়ে অন্য জায়গায় ওয়ার্ড কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি আরেকজন ধর্মবাদী বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রাণরসায়নবিদ আর্থার পিকক (আমার আগেই উল্লেখ করা ব্রিটিশ ধর্মীয় বিজ্ঞানীত্রয়ের তৃতীয় সদস্য) জীবিত পদার্থের অস্তিত্বকে ক্রমান্বয়ে 'জটিলতর হয়ে ওঠার প্রবণতা' হিসাবে প্রস্তাব করার সময়। ওয়ার্ড যাকে বিশেষায়িত করেছেন বিবর্তনীয় পরিবর্তনের কোনো একটি অন্তর্নিহিত নির্দেশনা হিসাবে যা জটিলতার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবার বিষয়টিকে বাড়তি সুযোগ দেয়। তিনি এরপর আরো প্রস্তাব করেন, এক ধরনের পক্ষপাতিত্ব, 'হতে পারে কোনো মিউটেশন প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া, যেন আরো জটিল মিউটেশনের উদ্ভব হতে পারে। 'ওয়ার্ডের এ বিষয়ে সংশয় ছিল, তার যা হওয়া উচিত সঙ্গতকারণে। ক্রমশ জটিলতর হবার পথে বিবর্তনীয় বিভক্তি যে সকল বংশধারায় আদৌ এসেছে, তা তাদের ক্রমান্বয়ে জটিল হবার অন্তর্গত প্রবণতা, বা পক্ষপাতদুষ্ট কোনো মিউটেশনের কারণে সৃষ্টি হয়নি। এটির কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচনে : যে প্রক্রিয়া, আমরা যতটুকু জানি, এখনো একমাত্র প্রক্রিয়া, যা খুব সরলাবস্থা থেকে জটিলতা সৃষ্টি করতে সক্ষম। প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্ব আসলেই খুবই সরল। এবং যেখান থেকে এটি শুরু করে, সেটিও। কিন্তু অপরদিকে এটি যা ব্যাখ্যা করতে পারে, সেটি বর্ণনাতীতভাবে জটিল: আমরা কল্পনার চেয়েও জটিল, শুধুমাত্র ঈশ্বরবাদীদের প্রস্তাবিত ঈশ্বর ছাড়া যিনি এটি ডিজাইন করতে সক্ষম।

কেমব্রিজে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি

কেমব্রিজে সম্প্রতি বিজ্ঞান এবং ধর্ম নিয়ে একটি সম্মেলনে এই যুক্তিটি আমি প্রস্তাব করেছিলাম, যা এখানে উল্লেখ করেছি আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ যুক্তি হিসাবে। আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে অন্ততপক্ষে সেটি ছিল একটি ঈশ্বরের সরলতা প্রশ্নে চিন্তার সম্মিলনের একটি আন্তরিক ব্যর্থতা। এই অভিজ্ঞতা আমার জন্য ছিল বেশ শিক্ষণীয়, সেই অভিজ্ঞতাটাই আপনাদের সাথে ভাগ করে নেবো এখানে।

প্রথমেই আমার স্বীকার (সম্ভবত এটিই সঠিক শব্দ) করে নেয়া উচিত এই সম্মেলনটি পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল টেম্পলটন ফাউন্ডেশন। ব্রিটেইন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন বিশেষভাবে বাছাই করা বিজ্ঞান সাংবাদিকরা ছিলেন এর দর্শক। আমন্ত্রিত বক্তাদের

মধ্যে আমি ছিলাম একমাত্র নিরীশ্বরবাদী। এদের মধ্যে একজন সাংবাদিক জন হরগান, উল্লেখ করেছিলেন, এই সম্মেলনে অংশগ্রহন করার জন্য অন্য সব খরচ বাদ দিয়ে তাকে ১৫,০০০ ডলার পরিমানে মোটা একটি পারিশ্রমিক দেয়া হয়েছিল। ব্যপারটি আমাকে বিস্মিত করেছিল। অ্যাকাডেমিক সম্মেলনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, এমন কোনো উদাহরণ নেই যেখানে দর্শকদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় (বক্তাদের ব্যতিক্রম)। আমি যদি আগে জানতাম, সাথে সাথেই তাহলে আমার সন্দেহ হত। বিজ্ঞান সাংবাদিকদের কোনো বেআইনী কাজ করার প্ররোচনা দিতে এবং তাদের বৈজ্ঞানিক সততাটিকে বিপথগামী করা চেষ্টায় টেম্পলটন কি তার অর্থ ব্যবহার করছে,? জন হরগান পরবর্তীতে তেমনটি ভেবেছিলেন এবং তার পুরো অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি নিবন্ধও লিখেছিলেন; যেখানে তিনি প্রকাশ করেন, আমার কারণেই, একজন বক্তা হিসাবে আমার নাম দিয়ে প্রচারণা করার কৌশল তার মতোই আরো অনেক সাংবাদিকের সন্দেহ কাটাতে সাহায্য করেছিল:

> ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স - এই সম্মেলনে যার অংশগ্রহন আমাকে এবং আমার অনেক সহকর্মীকে বিশ্বাস যুগিয়েছিল এর বৈধতা সম্পর্কে - ছিলেন একমাত্র বক্তা যিনি ধর্ম বিশ্বাসকে সমালোচনা করেন বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অযৌক্তিক এবং ক্ষতিকর হিসাবে উল্লেখ করে। অন্যান্য বক্তারা - তিনজন অজ্ঞেয়বাদী, একজন ইহুদী, একজন একাত্মবাদী এবং বারো জন খ্রিস্টীয় (শেষ মূহূর্তে একজন মুসলিম দার্শনিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য অপারগতা প্রকাশ করেছিলেন) - সবাই সুস্পষ্টভাবে ধর্ম এবং খ্রিস্টীয় ধর্মের প্রতি সুস্পষ্টভাবে পক্ষপাতমূলক বক্তব্য রাখেন (৬১)।

হরগানের এই নিবন্ধটি পছন্দনীয়ভাবে নিরাপদ মাঝামাঝি একটা অবস্থান। তার নানা সংশয়বোধ সত্ত্বেও তার অভিজ্ঞতার বেশ কিছু ব্যপার ছিল, যা তিনি নিঃসন্দেহে স্বীকার করেছেন (এবং আমিও, নীচের অনুচ্ছেদগুলোয় যা সুস্পষ্ট হবে); হরগান লিখেছিলেন:

> বিশ্বাসীদের সাথে আমার কথপোকথন আমার সেই বোধকে দৃঢ় করেছে কেন কিছু বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষ ধর্মকে একাত্ম করে নিয়েছেন। একজন রিপোর্টার আলোচনা করেছেন স্বয়ংক্রিয়, অচেতন স্তরে কথা বলার অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আরেকজন যীশুর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকার কথা বলেছেন। আমার বিশ্বাস পরিবর্তিত হয়নি কিন্তু অন্যদের হয়েছে। অন্তত একজন সহকর্মী বলেছেন ডকিন্সের ধর্ম ব্যবচ্ছেদ করার ফলাফল হিসাবে তার বিশ্বাস দোলা খেয়েছে। এবং যদি টেম্পলটন ফাউন্ডেশন আমার স্বপ্নের সেই ধর্ম মুক্ত পৃথিবী দিকে অগ্রসর হতে সামান্যতম সহায়তা করে, তা কি এমন খারাপ হতে পারে?

লিটারেরী এজেন্ট জন ব্রকম্যানের ওয়েবসাইট এজ (৬২) এটি প্রকাশ করে দ্বিতীয় দফা প্রচারও করা হয় (যাকে বলা অনলাইন বৈজ্ঞানিক স্যালন), যেখানে এটি বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, যাদের মধ্যে একটি ছিল তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসনের। আমি ডাইসনের মন্তব্যেও প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলাম, তিনি যখন টেম্পলটন পুরষ্কার গ্রহন করেছিলেন, সেই সময় দেয়া তার একটি ভাষণ থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করে। তার ভালো লাগুক বা না লাগুক, টেম্পলটন পুরস্কার গ্রহন করে ডাইসন সারা পৃথিবীকে একটি শক্তিশালী অন্য রকম বার্তা দিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর ধর্মকে সমর্থন করার ইঙ্গিত:

> ‘আমি সন্তুষ্ট অসংখ্য খ্রিস্ট ধর্মমতাবলম্বীদের একজন হিসাবে, যারা আদৌ ট্রিনিটি মতবাদ বা গসপেলের ঐতিহাসিক সত্য নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নয়।’

কিন্তু ঠিক এমন ভাবেই কি বলার কথা না কোনো একজন নিরীশ্বরবাদী বিজ্ঞানীর, যিনি নিজেকে একজন খ্রিস্টান হিসাবে ধারণা দিতে চাইবেন? আমি ডাইসনের আরো উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলাম তার পুরষ্কার গ্রহন করার সময় দেয়া সেই ভাষণ থেকে, যার মধ্যে কাল্পনিক ব্যাঙ্গাত্মক কিছু প্রশ্নও জুড়ে দিয়েছিলাম (নীচে) একজন টেম্পলটন কর্মকর্তার প্রতি।

> ওহ, আপনি আরো গভীর কিছু শুনতে চাইছেন তাহলে? বেশ এটা কেমন?
> আমি মন এবং ঈশ্বরের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট কোনো পার্থক্য করি না, কারণ ঈশ্বর হলো আমাদের মনের একটি অবস্থা যখন এটি আমদের বোধের সীমানা অতিক্রম করে’।
> আমি কি যথেষ্ট বলিনি এর মধ্যে, আমি কি আমার পদার্থবিদ্যার গবেষণায় ফেরত যেতে পারি এখন?
> ওহ, এখনো যথেষ্ট না? বেশ তাহলে, এটা কেমন:
> এমন কি বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্কর অতীত সত্ত্বেও আমি ধর্মে প্রগতির কিছু চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। দুই জন ব্যক্তি যারা আমাদের শতাব্দীতে শয়তানের প্রতিরূপকে প্রতিনিধিত্ব করেন, অ্যাডলফ হিটলার এবং জোসেফ স্ট্যালিন, তারা দুজনেই আত্মস্বীকৃত গোঁড়া নিরীশ্বরবাদী ছিলেন (যা অবশ্য পুরোটাই মিথ্যা, বিস্তৃত আলোচনা আছে সপ্তম অধ্যায়ে)।
> বেশ, এবার কি যেতে পারি আমি?

টেম্পলটনে পুরষ্কার গ্রহনের ভাষণে করা এই উদ্ধৃতিগুলোর প্রভাব ডাইসন কিন্তু অনায়াসে প্রতিরোধ করতে পারতেন, যদি তিনি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন,

ঈশ্বর বিশ্বাসের সপক্ষে তিনি আসলে কি প্রমাণ পেয়েছেন, যা কিছুটা শুধুমাত্র আইনস্টাইনীয় অর্থেও চেয়ে বেশি, যা আমি প্রথম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা দিয়েছি, যা আমরা অনেকেই সহজভাবে নিজেদের ধারণার সাথে একাত্ম করতে পারি। আমি যদি হরগানের বক্তব্যটা বুঝি, এটা হচ্ছে টেম্পলটনের টাকা যা বিজ্ঞানকে কলুষিত করছে দুর্নীতি দিয়ে। কিন্তু তার ভাষণ তারপরও দুঃখজনক, কারণ এটি অন্যদের জন্য উদাহরণ তৈরি করবে। টেম্পলটন পুরষ্কার কেমব্রিজে সেই সম্মেলনে যোগ দেয়া সাংবাদিকদের দেয়া সন্মানীর অনেক গুণ বেশি, পরিকল্পিতভাবে এর পরিমাণকে নোবেল প্রাইজের অর্থ মূল্যের চেয়ে বেশি রাখা হয়েছে। ফাউস্তিয়ান অর্থে আমার বন্ধু ও দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'রিচার্ড, যদি কোনোদিন তুমি অর্থ কষ্টে পড়ো..'।

ভালো হোক কিংবা খারাপ, আমি কেমব্রিজ সম্মেলনে দুই দিনই উপস্থিত ছিলাম, আমার নিজের বক্তৃতা দিয়েছি, আলোচনায় অংশ নিয়েছিলাম বেশ কিছু বক্তৃতা। আমি ধর্মতাত্ত্বিকদের চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গে এর উত্তর দিতে, একজন ঈশ্বর যে কিনা এই জটিল মহাবিশ্ব বা যে-কোনো কিছু পরিকল্পনা করতে পারেন, তাকেও সেই পরিমাণ জটিল আর পরিসংখ্যানগতভাবে অসম্ভাব্য হতে হবে। সবচেয়ে কঠিন যে প্রতিক্রিয়া আমি পেয়েছিলাম তা হলো, আমি খুব নিষ্ঠুরভাবে একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানতাত্ত্বিক ধারণাকে অনিচ্ছুক ধর্মতত্ত্বের উপর চাপিয়ে দিচ্ছি (এই অভিযোগ সেই 'নোমা' ধারণার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম); ধর্মতাত্ত্বিকরা চিরকালই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করেছে খুব সাধারণ সরল হিসাবে, আমি কে? একজন বিজ্ঞানী হয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের জ্ঞান দিচ্ছি যে, তাদের ঈশ্বরকে জটিল হতে হবে? বৈজ্ঞানিক যুক্তি, যেমন, আমি আমার নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত, এখানে তা অপ্রযোজ্য কারণ ধর্মতাত্ত্বিকরা মনে করেন তাদের ঈশ্বরের অবস্থান বিজ্ঞানের বাইরে।

আমার কিন্তু এমন মনে হয়নি যে, ধর্মতত্ত্ববিদরা যারা এই এড়িয়ে যাবার মত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিচ্ছেন তারা ইচ্ছা করেই অসৎ হচ্ছেন। আমি মনে করি তারা সৎভাবেই আন্তরিক। যা-ই হোক না কেন, বারবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল, ফাদার টেইলহার্ড দ্য শারদাঁর 'দ্য ফেনোমেনোন অব ম্যান' বইটি সম্পর্কে পিটার মেদাওয়ারের (৬৩) মন্তব্যটি, যেটাকে বলা যেতে পারে সর্বকালের সেরা নেতিবাচক পুস্তক সমালোচনা: 'এর লেখককে অসততার জন্য ক্ষমা করা যেতে পারে শুধুমাত্র এই অর্থে যে, তিনি অন্যদের প্রতারণা করার করা আগে নিজেকে প্রতারণা করার জন্য বিশেষ কষ্ট করেছেন' (৬৪)। আমার সেই কেমব্রিজে দেখা হওয়া ধর্মতাত্ত্বিকরা তাদেরকে সুরক্ষা করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক নিরাপদ এলাকায়, যেখানে যৌক্তিক কোনো যুক্তি তাদের স্পর্শ করতে পারে না, কারণ বিশেষ ঐশী

আদেশের মত তারা ঘোষণা দিয়েছেন, এই যুক্তির আক্রমণ থেকে তারা মুক্ত। আমি বলার কে যে, যৌক্তিক যুক্তি হলো একমাত্র গ্রহনযোগ্য যুক্তি? বৈজ্ঞানিক ছাড়াও আরো জ্ঞান আহরণের অনেক প্রক্রিয়া আছে এবং ঈশ্বরকে বুঝতে সেই ধরনের কোনো একটি প্রক্রিয়াকে অবশ্যই বেছে নিতে হবে।

এই অন্যভাবে জানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি পথ হচ্ছে ব্যক্তিগত, ঈশ্বর সংক্রান্ত সাবজেকটিভ বা আত্মগত অভিজ্ঞতা। কেমব্রিজে বেশ কয়েকজন আলোচক দাবী করেছিলেন, ঈশ্বর তাদের সাথে কথা বলেছেন, তাদের মাথার মধ্যে, কোনো মানুষ যেভাবে কথা বলতে পারে, স্পষ্টভাবে, ব্যক্তিগতভাবে। আমি তৃতীয় অধ্যায়ে ইল্যুশন বা মায়া এবং হ্যালুসিনেশন নিয়ে কথা বলেছি (ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি); কিন্তু কেমব্রিজ সম্মেলনে আমি দুটি বিশেষ যুক্তি যোগ করেছিলাম: যদি ঈশ্বর সত্যি সত্যি মানুষের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন, তাহলে সেই বিষয়টি বা সত্যটি খুবই স্পষ্টভাবেই অবশ্যই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে নয়। ঈশ্বর তার অপার্থিব জগতের নিজস্ব নিবাস থেকে হঠাৎ করেই আবির্ভুত হবেন আমাদের বিশ্বে, যেখানে তার বার্তা মানুষের মস্তিষ্ক বুঝতে সক্ষম হবে এবং সেই ঘটনার সাথে বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক থাকবে না, তা কি করে হতে পারে? দ্বিতীয়ত, একজন ঈশ্বর যিনি বহু মিলিয়ন মানুষকে একই সাথে বোধগম্য বার্তা পাঠানো ও তাদের সবার কাছে থেকে বার্তা একই সাথে গ্রহন করতে সক্ষম, তিনি আর যাই হোক না কেন, জটিল ব্যতীত সরল কোনো সত্তা হতে পারেন না। এত বেশি ব্যান্ডউইথ ! ঈশ্বরের অবশ্যই নিউরোন দিয়ে তৈরি মস্তিষ্ক নেই বরং একটি 'সিপিইউ' আছে যা সিলিকন দ্বারা তৈরি। যদি তার যে ক্ষমতা আছে বলে বলা হয়, তিনি অবশ্যই এমন কিছু হবেন যিনি খুব সূক্ষ্ম জটিলতা, বিস্তারিত পরিকল্পনার মাধ্যমে সৃষ্ট আমাদের জানা মতে সবচেয়ে বড় কোনো মস্তিষ্ক বা সবচেয়ে বড় কোনো কম্পিউটার এর চেয়েও বহু গুণে বিশাল হবে।

বার বার আমার ধর্মতত্ত্ববিদ বন্ধুরা একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তা হলো, কোনো কিছু না থাকার চাইতে কিছু থাকার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। সবকিছুর নিশ্চয়ই একটি প্রাথমিক কারণ থাকার কথা এবং আমরাও বরং এর নাম দিলাম ঈশ্বর। হ্যাঁ, আমি বলেছি, এটা অবশ্যই এমন কিছু ছিল যা খুব সাধারণ এবং সরল, এবং সুতরাং আমরা একে যে নামেই ডাকি না কেন ঈশ্বর অবশ্যই এর সঠিক নাম হতে পারে না (যদি না আমরা স্পষ্ট ভাবে খুব ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন বিশ্বাসী কারো মনে 'ঈশ্বর' শব্দটির সাথে জড়িত নানা অনুসঙ্গ এবং ভাবকে পরিহার করতে পারি); যে প্রথম কারণটাকে আমরা খুঁজছি, সেটা নিশ্চয়ই খুব সরল একটা ভিত্তি ছিল কোনো স্বয়ংক্রিয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত বা 'সেল্ফ বুটস্ট্র্যাপিং' ক্রেইনের, যা আমাদের জানা সমস্ত পৃথিবীটাকে টেনে তুলে এনেছে আজকের এই জটিল অস্তিত্বের পর্যায়ে। যদি প্রস্তাব করা হয় মূল আদি কারণ বা প্রক্রিয়া শুরু করা সেই সত্তাটি যথেষ্ট জটিল ছিল, যে কিনা

ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা পরিকল্পনা সৃষ্টির পিছনে সময় ক্ষেপণ করেছে এবং একই সাথে বহু মিলিয়ন মানুষের মন পড়তে পারার ক্ষমতা তো আছেই, ব্যপারটা অনেক তাসের ব্রিজ খেলায় পারফেক্ট কার্ড বা হাত পাওয়ার সমতূল্য। পৃথিবীতে জীববৈচিত্র্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমাজনের ক্রান্তীয় বনে, জালের মত করে ছড়ানো গাছের কাণ্ড, ব্রোমেলিয়াডের ঝোপ, শিকড় আর ফ্লাইং বাট্রেস, এদের নিজস্ব পিপড়া বাহিনী এবং তাদের জাগুয়ার, টাপির, পেকারী, গেছোব্যাঙ এবং টিয়া পাখি। যা দেখছেন তা হলো সেই নিখুঁত তাসের হাত পাওয়ার মত প্রায় অসম্ভাব্য পরিসংখ্যানের সমতূল্য (এবার ভাবুন আরো কতভাবে আপনি এটি সন্নিবেশ করতে পারেন এর অংশগুলো, যার কোনোটাই সফল হবে না) - শুধু আমরা জানি কেমন করে এসবের সৃষ্টি হয়েছে : প্রাকৃতিক নির্বাচনের ক্রমান্বয়ে কাজ করা ক্রেইনের মাধ্যমে। সবকিছু স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছে এই প্রস্তাবকে মুখ বুজে মেনে নেয়ার জন্য শুধুমাত্র বিজ্ঞানীরাই প্রতিবাদ করছেন না, আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও সরব এর বিরুদ্ধে, প্রথম কারণ হিসাবে প্রস্তাব করা, সেই মহান অজানা যা কোনো কিছু না থাকার বদলে অস্তিত্ব থাকার জন্য দায়ী, যে কিনা পুরো মহাবিশ্ব ডিজাইন করতে সক্ষম এবং একই সাথে লক্ষ কোটি মানুষের মনের কথা পড়তে সক্ষম- এ ধরনের প্রস্তাব আসলে কোনো ব্যাখ্যা খোঁজার প্রচেষ্টা থেকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নেয়ার মতো। এটি আত্মতুষ্টি ও আত্মপ্রবঞ্চনা, চিন্তাকে অস্বীকারকারী দ্বিতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করা আকাশ হুক প্রস্তাবের একটি ভয়াবহ প্রদর্শনী।

আমি কোনো সংকীর্ণ বৈজ্ঞানিক চিন্তা করার প্রক্রিয়ার ওকালতি করছি না। কিন্তু অন্ততক্ষে যে-কোনো সৎ সত্য অনুসন্ধান প্রচেষ্টা অবশ্যই এই অকল্পনীয় সুবিশাল অসম্ভাব্যতা, যেমন কোনো ক্রান্তীয় বনাঞ্চল, কোনো প্রবাল প্রাচীর বা একটি মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে, যা তা হলো 'ক্রেইন', কোনো 'স্কাই হুক' না। এই ক্রেইনকে যে প্রাকৃতিক নির্বাচন হতে হবে তেমন না। তবে স্বীকার করতেই হবে এরচেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আর কেউ কখনো ভাবেনি। কিন্তু অন্য প্রক্রিয়া থাকতে পারে যা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। হয়েতো এটাই সেই ইনফ্লেশান বা স্ফীতি যা পদার্থবিদরা প্রস্তাব করেছেন যা মহাবিশ্বের অস্তিত্বের প্রথম ইয়োক্টো সেকেন্ড (১ X $১০^{-২৪}$) অংশ বিশেষ দখল করে ছিল, যখন হয়তো এটা আরো ভালো করে বোঝা সম্ভব হবে, হয়তো দেখা যাবে এটি একটি কসমোলজিক্যাল ক্রেইন যা ডারউইনের জৈববৈজ্ঞানিক ক্রেইনের মতো। বা হয়েতো সেই দুর্লভ ক্রেইন যা কসমোলজিষ্টরা খুঁজে বেড়াচ্ছেন তা হয়তো ডারউইনের ধারণারই একটি অন্য সংস্করণ: স্মোলিনের প্রস্তাবিত মডেল বা এর সদৃশ কিছু। বা হয়তো বা এটা হবে সেই মাল্টিভার্স এবং অ্যানথ্রোপিক মূলনীতির, যা মার্টিন রিস এবং অন্যরা সমর্থন করেন। এমন কি এটা হতে পারে কোনো অতিমানবীয় ডিজাইনার, কিন্তু, যদি তাই হয়, এটি অবশ্যই সেই ঈশ্বরবাদীদের প্রস্তাবিত ডিজাইনার হবেন না, যিনি হঠাৎ করে অস্তিত্বশীল হওয়া কেউ না বা এমন কেউ না যিনি সবসময়ই

ছিলেন। যদি (যা আমি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করিনা) আমাদের মহাবিশ্ব ডিজাইন করা হয়ে থাকে, এবং এ ফর্টিওরি বা আরো জোরালো যুক্তির কারণে, যদি ডিজাইনার আমাদের চিন্তা পড়ার ক্ষমতা রাখেন, আমাদের সবজান্তা উপদেশ দেয়া, ক্ষমা এবং পাপ থেকে মুক্তি দেন, সেই ডিজাইনার নিজেও কোনো এক ধরনের ক্রমান্বয়ে পরিবর্ধনশীল এসকেলেটর বা ক্রেইন এবা অন্য কোনো মহাবিশ্বের ডারউইনবাদের একটি সংস্করণের সর্বশেষ ফলাফল ।

কেমব্রিজে আমার সমালোচনাকারীদের শেষ আশ্রয়ের ভরসা ছিল আক্রমণ। আমার সমস্ত বিশ্ব চিন্তাকে অপবাদ দেয়া হলো 'উনবিংশ শতাব্দীর' আখ্যা দিয়ে। এটা এত বাজে একটা যুক্তি, আমি বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে প্রায়শই এর মুখোমুখি হতে হয় আমার। বলাবাহুল্য, কোনো যুক্তিকে উনবিংশ শতাব্দীর বলা কিন্তু এই যুক্তির কি সমস্যা সেটা ব্যাখ্যা করা না। অনেক উনবিংশ শতাব্দীর ধারণাই ছিল বেশ ভালো ধারণা, আর ডারউইনের ভয়ঙ্কর ধারণাটি তো অবশ্যই। যা-ই হোক এই বিশেষ ধরনের সমালোচনা মনে হয় একটু বেশি বাড়াবাড়ি, কারণ এটি এমন একজন ব্যক্তির কাছে থেকে এসেছে (একজন বিখ্যাত কেমব্রিজ ভূতত্ত্ববিদ, নিঃসন্দেহে ফাউস্তিয় পথ ধরে টেম্পলটন পুরষ্কার পাবার পথে অনেক এগিয়ে আছেন); যিনি তার খ্রিস্টীয় বিশ্বাসকে জায়েজ করার চেষ্টা করেছেন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে, যাকে তিনি বলেছেন, নিউ টেস্টামেন্ট এর নব্য ঐতিহাসিক সত্যতা। ঠিক এই বিষয়টার প্রতি সংশয়ের প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ধর্মতাত্ত্বিকরা প্রমাণ ভিত্তিক ঐতিহাসিক গবেষণার মাধ্যমে। আসলেই এ বিষয়ে খুব দ্রুত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সম্মেলনে উপস্থিত ধর্মবিদরা।

যা-ই হোক না কেন আমি জানি প্রাচীনদের এই 'উনবিংশ শতাব্দী'র বিদ্রুপটা । এটা সেই 'গ্রামের নাস্তিক' এর সাথে মানানসই, এটা সেই 'আপনি যা মনে করুন না কেন, হা হা হা, আমরা কোনো সাদা দাড়ীওয়ালা বৃদ্ধ মানুষকে বিশ্বাস করি না আর, হা হা হা'। এই সব ঠাট্টাই অন্য কিছুকে বোঝানোর একটি সংকেত। যেমন, ১৯৬০ সালে আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম 'আইন শৃঙ্খলা' ছিল কালোদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাবের একটি সাংকেতিক প্রকাশ। তাহলে, ধর্ম সম্পর্কে যুক্তির ক্ষেত্রে আপনার চিন্তাধারা সেই উনবিংশ শতাব্দীর আসলে কি সাংকেতিক বার্তা বহন করে? এটি আসলে হচ্ছে এই বাক্যটার সংকেত : 'এই ধরনের সরাসরি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, আপনি এত স্থূলরুচির, চক্ষুলজ্জাহীন, কেমন করে আপনি এত অনুভূতিহীন এবং অভদ্র হতে পারলেন: যেমন,'আপনি কি অলৌকিক অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করেন 'বা' আপনি কি বিশ্বাস করেন যীশুর জন্ম হয়েছিল কুমারী মায়ের গর্ভে?' আপনি কি জানেন না ভদ্র সমাজে এ ধরনের প্রশ্ন কেউ জিজ্ঞাসা করে না? এই ধরনের প্রশ্নের চলন ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু চিন্তা করুন ধর্মবাদীদের প্রতি আজ এই ধরনের এমন

সরাসরি, সত্যিকারের প্রশ্ন করাটা কেন অনম্রতার পরিচয়, কারণ এটি বিব্রতকর! কিন্তু প্রশ্ন না এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হচ্ছে বিব্রতকর, যদি এদের উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর সম্পর্কটা এখন স্পষ্ট। উনবিংশ শতাব্দীই ছিল শেষ সময়, যখন সম্ভব ছিল কোনো শিক্ষিত মানুষের পক্ষে কুমারী মায়ের জন্ম দেয়ার মত অলৌকিক ঘটনাকে কোনো বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ার সম্ভাবনা ছাড়াই সত্য বলে বিশ্বাস করা যেত। উত্তরের জন্য চাপাচাপি করে প্রশ্ন করলে, অনেক শিক্ষিত খ্রিস্টান আজও অনেক বেশি অনুগত, যারা কুমারী মাতার জন্ম দেয়া এবং পুনরুত্থানকে অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু বিষয়টি তাদের বিব্রত করে, কারণ তাদের যৌক্তিক মন জানে এটি কত অসম্ভব একটি ব্যপার, সুতরাং তাদের প্রতি এ ধরনের প্রশ্ন না করাটাকে তারা শ্রেয়তর মনে করেন। সেকারণে আমার মত কেউ যদি নাছোড়বান্দার মত এই প্রশ্নটি করতেই থাকে, আমাকেই অভিযুক্ত করা হয় 'উনবিংশ শতাব্দীর' মানসিকতা সম্পন্ন বলে। চিন্তা করলে দেখবেন বিষয়টি আসলেই হাস্যকর।

আমি সেই সম্মেলন ত্যাগ করি, আরো প্ররোচিত, নতুন শক্তিতে বলীয়ান এবং আমার বিশ্বাস দৃঢ়করণের মাধ্যমে, যে অসম্ভাব্যতা থেকে যুক্তি -সেই আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭ - প্রস্তাবটি আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্বেও বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি, যার বিরুদ্ধে আমি এখনো কোনো ধর্মতাত্ত্বিককে কোনো যুক্তিযুক্ত উত্তর দিতে শুনিনি, বহুবার তাদের সেই সুযোগ এবং আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও। ড্যান ডেনেট সঠিকভাবেই বর্ণনা করেছিলেন, 'এটি হচ্ছে একটি অখণ্ডনযোগ্য পাল্টা যুক্তি। এখনো এটি শক্তিশালী সেই সময়ের মত যখন দুই শতাব্দী আগে হিউমের সংলাপে ফিলো ক্লিয়েনথেসকে পরাজিত করতে এটি ব্যাবহার করেছিলেন। কোনো আকাশ থেকে নেমে আসা স্কাই হুক বড় জোর এই সমস্যার সমাধানকে স্থগিত করতে পারে। কিন্তু হিউম তখন কোনো ক্রেইনের কথা ভাবতে পারেননি, সুতরাং খানিকটা পিছু তাকে হটতে হয়েছিল। অবশ্যই ডারউইন, সেই গুরুত্বপূর্ণ ক্রেইনটি সরবরাহ করেছিলেন, হিউম এটিকে কত বেশি যে পছন্দ করতেন তা বলাবাহুল্য।

এই অধ্যায়ে আমার বই এর কেন্দ্রীয় যুক্তিগুলো আছে এবং সে কারণে, পুনরাবৃত্তি হবার ঝুঁকি নিয়েও আমি সংক্ষিপ্ত আকারে এই ছয়টি পৃথক প্রস্তাবনা আকারে উল্লেখ করছি:

১. বহু শতাব্দী ধরেই মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রতি সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি ছিল, কেমন করে মহাবিশ্বে জটিল এবং আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভাব্য ডিজাইন বা পরিকল্পনার এই রূপটির উদ্ভব হয়েছে।

২. স্বাভাবিকভাবে প্রবণতা হলো, এই আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইন বা পরিকল্পনাকে সত্যিকারের ডিজাইন হিসাবে গুণারোপ করে। মানুষের তৈরি কোনো বস্তু যেমন একটি ঘড়ি, যেখানে পরিকল্পনাকারী বা ডিজাইনার আসলেই একজন বুদ্ধিমান প্রকৌশলী। একটি চোখ, একটি পাখা, একটি মাকড়শা বা কোনো মানুষের ক্ষেত্রেও এই একই যুক্তি প্রয়োগ করা খুবই লোভনীয়।

৩. এই লোভনীয় প্ররোচণাটি মিথ্যা, কারণ ডিজাইনার হাইপোথিসিসটি আরো বড় একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়, কে ডিজাইন করেছে এই সবকিছুর ডিজাইনারকে। আমরা যে মূল সমস্যাটি নিয়ে প্রথমে শুরু করেছিলাম তা ছিল পরিসংখ্যানগত দিক থেকে অসম্ভাব্যতাকে ব্যাখ্যা করার বিষয়টি। বেশি অসম্ভব কিছুকে প্রস্তাব করা অবশ্যই কোনো সমাধান নয়। আমাদের দরকার একটি ‘ক্রেইন’, কোনো ‘স্কাই হুক’ না। কারণ ক্রেনই পারে সেই কাজটি করতে, ধীরে ধীরে ব্যাখ্যাযোগ্য কোনো একটি উপায়ে সরলতা থেকে সেই অসম্ভাব্য জটিলতার দিকে অগ্রসর হতে।

৪. সবচেয়ে অসাধারণ এবং শক্তিশালী ক্রেইন এই অবধি যা আবিষ্কার হয়েছে তা হলো প্রাকৃতিক নির্বাচেনের মাধ্যমে ডারউইনীয় বিবর্তন। ডারউইন এবং তার পরবর্তী অনুসারীরা প্রমাণ করেছেন কিভাবে জীবিত প্রাণী, তাদের অবিশ্বাস্য রকম চমকপ্রদ পরিসংখ্যানগত অসম্ভাব্যতা ও আপাতদৃষ্টিতে ডিজাইন মনে হওয়ার মত বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে বিবর্তিত হয়েছ মন্থর একটি ক্রমাগত প্রক্রিয়ায় খুব সরল একটি সুচনা থেকে। আমরা এখন নিরাপদে বলতে পারে, জীবিত প্রাণিদের মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের ডিজাইনের বিভ্রম আসলেই শুধুমাত্র একটি বিভ্রম।

৫. পদার্থবিজ্ঞানের জন্য সমতূল্য কোনো ‘ক্রেইন’ আমাদের নেই। কোনো এক ধরনের মাল্টিভার্স তত্ত্ব নীতিগত ভাবে পদার্থবিদ্যার জন্য সেই ব্যাখ্যার কাজটি পারে যা জীববিজ্ঞানের জন্য ডারউইনবাদ করেছে। এই ধরনের ব্যাখ্যা ডারউইনবাদের জীববিজ্ঞানীয় সংস্করণের হালকাভাবে কম সন্তোষজনক হবে, কারণ ভাগ্যের উপর এটির দাবী অনেক বেশি। কিন্তু অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল আমাদের সুযোগ করে দিয়েছে প্রস্তাব করার জন্য যে, আমাদের সীমাবদ্ধ মানবীয় অন্তর্দৃষ্টি যতটুকু স্বস্তিবোধ করে তার চেয়ে বেশি ভাগ্যের ভূমিকার কথা।

৬. জীববিজ্ঞানে ডারউইনবাদ যেমন শক্তিশালী পদার্থবিজ্ঞানে তেমন শক্তিশালী কোনো কিছু, আরো উত্তম কোনো ক্রেইনের ব্যাখ্যার জন্য আমাদের আশা ছাড়া ঠিক হবে না। কিন্তু এমনকি জীববিজ্ঞানের ক্রেইনের মতো আরো বেশি সন্তোষজনক কোনো ক্রেইনের অনুপস্থিতিতে, অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল ক্রেইনটি যা বর্তমানে আমাদের আছে, যা সাথে

বাড়তি শক্তি হিসাবে যুক্ত অ্যানথ্রোপিক মূলনীতি, সুস্পষ্টভাবেই একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনারের স্বপরাজিত স্কাই হুক হাইপোথিসিসের চেয়ে যা উত্তম।

যদি এই অধ্যায়ের যুক্তিগুলো মেনে নেয়া হয়, তাহলে ধর্মের পক্ষে সত্য দাবী করার যুক্তি 'দ্য গড হাইপোথিসিস', আসলেই আর প্রমাণযোগ্য থাকে না। ঈশ্বরের প্রায় নিঃসন্দেহে কোনো অস্তিত্ব নেই। এই বইটির আপাতত এটাই মূল উপসংহার। অনেক ধরনের প্রশ্ন এখন উঠবে। এমন কি আমরা যদি মেনে নেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তারপরও কি ধর্মের টিকে থাকার বহু রসদ থাকার কথা নয়? বিষয়টা কি সান্ত্বনার নয়? এটা কি মানুষকে ভালো কাজ করতে প্ররোচিত করে না? ধর্ম না থাকলে, আমরা কিভাবে কোনোটা ভালো তা জানবো? কেনই বা, তাহলে ধর্মের প্রতি এত শত্রুভাবাপন্ন হচ্ছি ? যদি এটি মিথ্যাই হয়ে থাকে, তাহলে কেন পৃথিবীর প্রতিটি সাংস্কৃতিকে ধর্ম বিষয়টির অস্তিত্ব আছে? সত্যি কিংবা মিথ্যা হোক, ধর্মর উপস্থিতি সর্বব্যাপী, তাহলে কোথা থেকে এটি আসলো? পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই শেষ প্রশ্নটির উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো।

টীকা:

(১) গ্যামবিট (Gambit): দাবা খেলার একটি চাল, যেখানে কোনো খেলোয়াড় তার কোনো একটি গুটিকে (সাধারণত সৈন্য) বিসর্জন দেয় আরো সুবিধাজনক কোনো একটি অবস্থান পাবার পাবার আশায়। সাধারণত কোনো কিছু করা বা বলা সুবিধা কিংবা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাবার আশায়।
(২) ফ্রেড হয়েল (১৯১৫-২০০১) ব্রিটিশ কসমোলজিষ্ট, লেখক; বিশেষভাবে খ্যাত তিনি স্টেলার নিউক্লিওসিনথেসিস তত্ত্বের জন্য।
(৩) নালিন চন্দ্র বিক্রমাসিংহ (জন্ম ১৯৩৯), শ্রীলংকা জন্ম নেয় ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী, জ্যোতিজীববিজ্ঞানী।
(৪) সৃষ্টিতত্ত্ববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এই উদ্ধৃতির গুরুত্ব, ব্যবহার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে গের্ট কর্টহফের একটি পর্যালোচনায়, সেটি পাওয়া যাবে এখানে: http:// home.wxs.nl/ ~gkorthof/ kortho46a.htm;
(৫) ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে অনেক সময়ই নির্দয়ভাবে বলা হয় স্যুট বা টাক্সিডো পরা সৃষ্টিতত্ত্ববাদ।
(৬) বিজ্ঞানের প্রেক্ষিতে চান্স (Chance) শব্দটার অর্থ ভিন্ন। বিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট নন অনেকেই মনে করেন বিবর্তন হচ্ছে চান্সের বা সুযোগের মাধ্যমে। এই শব্দটা ব্যবহার করে তারা যেটা বোঝাতে চাইছেন, বিবর্তন হচ্ছে কোনো কারণ বা কোনো লক্ষ্য ছাড়াই। সেই সূত্রানুযায়ী প্রকৃতিতে সবকিছুই – রাসায়নিক বিক্রিয়া, আবহাওয়া, গ্রহের গতি, ভুমিকম্প সবকিছু হচ্ছে চান্সের মাধ্যমে, এইসব কিছু কোনোটারই কোনো উদ্দেশ্য বা পারপাস নেই। কিন্তু আসলেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এই 'উদ্দেশ্য' এবং 'লক্ষ্য' ,এই বিষয়গুলোর শুধু অস্তিত্ব আছে মানুষের চিন্তার জগতে, তারা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাকে উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে করেন না। কিন্তু বিজ্ঞানীরাও

রাসায়নিক বিক্রিয়া বা গ্রহদের গতি এসব কিছুকেও কোনো চান্স জনিত ঘটনা মনে করেন না। কারণ বিজ্ঞানে, চান্স শব্দটার ভিন্ন অর্থ আছে। যদিও চান্সের অর্থ হতে পারে জটিল কোনো দর্শনের বিষয়, কিন্তু বিজ্ঞানীরা চান্স বা র‍্যানডমনেস শব্দকে ব্যবহার করেন এই অর্থে: যখন কোনো ভৌত কারণ বেশ কয়েকটি ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে, আমরা আগে থেকে যা অনুমান করতে পারি না যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফলাফল কি হবে। যাই হোক, আমরা হয়তো নির্দিষ্ট করতে পারি, এদের কোনো একটি ফলাফলের সম্ভাবনা বা প্রোবাবিলিটি এবং এভাবে তাদের ঘটার হার বা ফ্রিকোয়েন্সি কত। যেমন, আমরা কোনো দম্পতির পরবর্তী শিশুর লিঙ্গ কি হবে বলতে পারি না, তবে যথেষ্ট নিশ্চয়তার সাথে আমরা এটা বলতে পারি, পরবর্তীতে তাদের মেয়ে শিশু হবার সম্ভবনা প্রায় ০.৫ বা ৫০ শতাংশ; প্রায় সবকিছুতে একই সাথে দুটি জিনিসের প্রভাব দেখা যায়, চান্স (অনুমান করা যায় না) এবং নন-র‍্যানডোম বা ডিটারমিনিষ্টিক বা অনুমানযোগ্য কারণগুলো। আমাদের মধ্যে যে কারোই গাড়ি দুর্ঘটনা হতে পারে অন্য কোনো ড্রাইভারের অনুমান করা সম্ভব না বা আনপ্রেডিকটেবল আচরণের জন্য, এবং এই সম্ভাবনাকে আমরা অনুমান করা যায় এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারি যদি আমরা মাতাল হয়ে গাড়ী চালাই। বিবর্তনের ক্ষেত্রেও সেটা ঘটছে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হচ্ছে ডিটারমিনিষ্টিক (deterministic বা predictable), নন-র‍্যানডোম একটি প্রক্রিয়া। এবং সেই একই সাথে বিবর্তনে গুরুত্বপর্ণ র‍্যানডোম প্রক্রিয়াও আছে, যেমন মিউটেশন এবং জেনেটিক অ্যালিল বা হ্যাপ্লোটাইপদের র‍্যানডোম কমবেশি নানা হার হওয়া (random genetic drift)।

(৭) ধ্রুপদী ল্যাটিন কিংবা গ্রীকে সেটা তেমনভাবে কিন্তু ঘটেনি, ল্যাটিন Home (গ্রিক Anthropo) অর্থ হচ্ছে মানুষ, যেমন Vir (Andro-) অর্থ পুরুষ, এবং Femina (Gyne-) র অর্থ হচ্ছে নারী। সেকারণে Athropology র বিষয় হচ্ছে মানব জাতি। যেখানে Andrology ও Gynecology চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র দুটি শাখা।

(৮) ডগলাস অ্যাডামস, ব্রিটিশ লেখক,নাট্যকার।

(৯) এই উদ্ধৃতিটি প্রয়াত ডগলাস অ্যাডাম এর দি স্যামন অব ডাউট এর ৯৯ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া। আমার Lament for Douglas লেখাঁটি তার মৃত্যুও ঠিক একদিন পরেই লেখা, এবং তার বই দি স্যামন অব ডাউট (The Salmon of Doubt (২০০৩) এর এপিলোগ এবং আমার A Devils Chaplain বইটিতে; যেখানে St. Martin-in-the-Fields চার্চে তার স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে আমার দেয়া ইউলোজিটি প্রকাশিত হয়েছে।

(১০) ড্যানিয়েল ডেনেট, যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক।

(১১) Der Spiegel, 26 Dec. 2005 এ প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার।

(১২) জন রাসকিন (১৮১৯-১৯০০): ব্রিটিশ শিল্প সমালোচক, পৃষ্ঠপোষক, শিল্পী, চিন্তাবিদ।

(১৩) লিওনার্ড সাসকিন্ড (জন্ম ১৯৪০) যুক্তরাষ্ট্রের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী।

(১৪) Susskind, L. (2006). The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design. New York: Little, Brown.

(১৫) ভিক্টর জন স্টেঙ্গার (১৯৩৫-২০১৪) যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিজ্ঞানী,দার্শনিক, লেখক।

(১৬) পিটার অ্যাটকিন্স (জন্ম ১৯৪০) ব্রিটিশ রসায়নবিদ, অক্সফোর্ডের প্রাক্তন অধ্যাপক।

(১৭) ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি (Irreducible Complexity) হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্বেও প্রস্তাবকদের একটি যুক্তি যা বলছে, কোন কোন জীববিজ্ঞানীয় সিস্টেম বা তন্ত্র এতবেশি সূক্ষ্ম এবং জটিল যা কিনা কোন সরলতর বা অধিক অসম্পূর্ণ কোন পূর্বসূরি থেকে

বিবর্তিত হতে পারে না, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে, যে প্রক্রিয়াটি কিছু সুবিধাজনক প্রাকৃতিকভাবে ঘটিত ধারাবাহিক চান্স বা আপতনের মাধ্যমে সৃষ্ট মিউটেশনেরর উপর কাজ করে। এই যুক্তিটি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের কেন্দ্রীয় প্রস্তাবের একটি, এবং বৃহত্তর বৈজ্ঞানিক সমাজে এটি প্রত্যাখ্যাত, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনকে ছদ্মবিজ্ঞান হিসাবে মনে করেন। সৃষ্টিতত্ত্ববাদী প্রাণরসায়নবিদ মাইকেল বিহি এই ধারণাটির উদ্ভাবক, তিনি একে সংজ্ঞায়িত করেন, কোন একটি ইররিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি সিস্টেম হচ্ছে এমন কোনো একটি সিস্টেম যা তৈরি করে বেশ কিছু পারস্পরিক সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশদের সমন্বয়ে, পারস্পরিক ক্রিয়া- প্রতিক্রিয়াশীল এই অংশগুলো প্রত্যেকেই মূল কিছু কাজের সাথে জড়িত, এবং এদের যে কোন একটিকে যদি সরিয়ে ফেলা হয়য় পুরো সিস্টেমটাই কার্যকরীভাবে কাজ করা স্থগিত করে দেয়। তবে বিবর্তন জীববিজ্ঞানী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, এ ধরনের কোন সিস্টেমও বিবর্তিত হতে পারে।

(১৮) Euplectella

(১৯) ডেভিড অ্যাটেনবরো, ব্রিটিশ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, টিভি অনুষ্ঠান নির্মাতা ও উপস্থাপক।

(২০) *Aristolochia trilobata*

(২১) *Sequoiadendron giganteum*

(২২) Climbing mount improbable

(২৩) Hunt The Slipper: বোকা বানানোর একটি খেলা। সব খেলোয়াড়রা যেখানে গোল হয়ে আসন করে বসে এমনভাবে যেমন একটি স্যান্ডেল তাদের হাটুর নীচ দিয়ে একজন থেকে অন্যজনের কাছে হাতবদল করা যেতে পারে। প্রতিটি খেলোয়াড় এভাবে একে অপরের কাছে স্যান্ডেল বা কোনো কিছু হস্তান্তর করে হাটুর নিচ দিয়ে গোপনে, এবং বৃত্তের বাইরে ঘুরতে থাকা একজন সেটি হাতে আছে যার তাকে অনুমান করে স্পর্শ করার চেষ্টা করে। যে শিকার করছে তাকে যারা লুকাচ্ছে তারা ইঙ্গিত দেয় সংকেতের সাহায্যে, যেমন যদি সে যার কাজে স্যান্ডেলটি লুকানো আছে তার কাছাকাছি আসে, বলা হয় সে খুব গরম হয়ে আছে, যদি দূরে যায় তখন বলা হয় সে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

(২৪) ডিয়েট্রিশ বনহোয়েফার (১৯০৬-১৯৪৫) জার্মান ধর্মতাত্ত্বিক, যাজক।

(২৫) ম্যাথিউ রিডলী (জন্ম ১৯৫৮) সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক।

(২৬) জে বি এস হলডেন (১৮৯২-১৯৬৪) ব্রিটিশ (পরে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহন) বিজ্ঞানী, গবেষণার বিষয় শরীরতত্ত্ববিদ্য, বিবর্তন জীববিজ্ঞান, জেনেটিক্স, জৈবপরিসংখ্যান।

(২৭) কার্ল পপার (Karl Popper) এর তত্ত্ব বা তার মতবাদ সংশ্লিষ্ট; বিশেষ করে সেই তত্ত্ব সংক্রান্ত: কোনো একটি হাইপোথিসিস যাকে কোন পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে দৃষ্ট কোন ব্যতিক্রম দিয়ে মিথ্যা প্রমাণ করা যায় কিন্তু কখনোই চূড়ান্তভাবে হিসাবে তাদের প্রমাণ করা যায়না।

(২৮) ফিয়াট (Fiat) ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে কোন ঐশী আদেশ বা নির্দেশ যা কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে শূন্য থেকে বা কোন বাড়তি প্রচেষ্টা ছাড়াই। যেমন ফিয়াট লুক্স (লেট দেয়ার বি লাইট);

(২৯) আলেক্সজান্ডার গ্রাহাম কেয়ার্ণ-স্মিথ (জন্ম ১৯৩১) স্কটিশ রসায়নবিদ, জীবনের উৎপত্তির ব্যাপারে ক্লে ক্রিষ্টাল সেলফ রেপলিকেশন তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন।

(৩০) মাইকেল বিহি (জন্ম ১৯৫২) আমেরিকার প্রাণরসায়নবিদ, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন এর সমর্থক।

(৩১) Behe, M. J. (1996). Darwin's Black Box. New York: Simon & Schuster

(৩২) কল্পকাহিনীতে এর একটি উদাহরণ দিতে পারি এর, লেখক ফিলিপ পুলম্যান তার ডার্ক ম্যাটেরিয়ালস এ কল্পনা করেছিলেন এক প্রজাতির প্রাণীর, মুলেফা, যাদের সহাবস্থান ছিল বৃক্ষের সাথে যারা মাঝখানে ছিদ্রযুক্ত গোলাকৃতি বীজবাহী পড বা বীজাধার তৈরি করতো; এই পডগুলো মুলেফা ব্যবহার করতো চাকা হিসাবে। চাকাগুলো যেহেতু শরীরের অংশ ছিলনা, সে কারণে তাদের স্নায়ু বা রক্ত সংযোগও ছিলনা যারা মুলেফার অ্যাক্সল (শিং এর বাকানো নোখ, হাড়) মধ্যে পেচিয়ে যেতো। পুলম্যান দূরদৃষ্টিপূর্ণ একটি পর্যবেক্ষণ ছিল, সিস্টেমটি কাজ করতো কারণ গ্রহটিতে প্রাকৃতিক ভাবে ব্যাসল্ট এর ফিতা বেছানো রাস্তা ছিল, যা রাস্তা হিসাবে কাজ করতো। রাস্তাহীন অমসৃন ভুমিতে চাকা খুব একটা উপকারি নয়।

(৩৩) বিস্ময়করভাবে, মাংসপেশীর মূলনীতি আরো একটি তৃতীয় মোডে বা উপায়ে ব্যবহৃত হয়, কিছু কীটপতঙ্গ, যেমন মৌমাছি, মাছি; যেখানে ওড়ার মাংশপেশীটি মূলত অসিলেটরী, যা রেসিপ্রেকেটিং ইঞ্জিনের মত কাজ করে। অন্য পতঙ্গ যেমন লোকাষ্টরা প্রতিটি পাখনা নাড়ানোর জন্য স্নায়ু সংকেত প্রেরন করে (যেমন পাখীরা), মৌমাছিরা একবারই সংকেত পাঠায় অসিলেটরী মটোরকে সক্রিয় করতে (বা নিষ্ক্রিয় করতে); ব্যাকটেরিয়ার যে মেকানিজমটি আছে সেটি সাধারণ সংকোচনশীল কিছু (যেমন পাখীদের) নয় বা রেসিপ্রকেটর নয়,(যেমন মৌমাছি) বরং একটি সত্যিকারের ঘুর্ণায়মান বা রোটেটর। সেই ক্ষেত্রে এটি বৈদ্যুতিক মটর বা ওয়াঙ্কেল ইঞ্জিনের মত।

(৩৪) http://www.millerandlevine.com/km/evol/design2/article.html.

(৩৫) Freeman Dyson এর The Closing of the Western Mind থেকে উদ্ধৃত

(৩৬) Dover trial, এর বিবরণ সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃতিগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে A. Bottaro, M. A. Inlay I N. J. Matzke এর লেখা Immunology in the spotlight at the Dover Intelligent Design trial (Nature Immunology 7, 2006,433) থেকে।

(৩৭) জেরি অ্যালেন কয়েন, বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়র অধ্যাপক।

(৩৮) জেরি কয়েনের নিবন্ধটি: . Coyne, God in the details: the biochemical challenge to evolution, Nature 383, 1996); কয়েন ও আমার যৌথ নিবন্ধ: One side can be wrong প্রকাশিত হয়েছিল গার্ডিয়ান পত্রিকায় (Guardian ,1 Sept. 2005: http://www.guardian.co.uk/life/feature/story/0,13026,1559743,00.html; আর ব্লগারের উদ্ধৃতিটি আছে এখানে:http://www.religionisbullshit.net/blog/2005_09_01_archive.php)

(৩৯) Dawkins, R. (1995). River Out of Eden. London: Weidenfeld & Nicolson.

(৪০) অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল, জ্যোতিপদার্থবিদ্যা এবং কসমোলজিতে একটি দার্শনিক বিবেচনা যা প্রস্তাব করছে যে কোনো একটি পর্যবেক্ষণযোগ্য মহাবিশ্বকে অবশ্যই সচেতন যে জীবনের রূপ বা জীব এটিকে পর্যবেক্ষণ করছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল এর কিছু প্রস্তাবক যুক্তি দেন যে এটি ব্যাখ্যা করে কেন মহাবিশ্বের যে পরিমাণ বয়স এবং মৌলিক ভৌত ধ্রুবগুলো আছে যা সচেতন জীবনের উদ্ভব হবার জন্য সহায়ক। আর

সেকারণেই মনে করা হয় সেই বাস্তব সত্যটি আসলে গুরুত্বপূর্ণ না যে, মহাবিশ্বের মৌলিক ধ্রুবগুলো আসলে একটি সংকীর্ণ জীবনের-উদ্ভব-হবার সহায়ক সীমানায় থাকে।

(৪১) ব্রান্ডন কার্টার (জন্ম ১৯৪২) ব্রিটিশ পদার্থবিদ ও গণিতজ্ঞ

(৪২) জন ডি. ব্যারো (জন্ম ১৯৫২) ব্রিটিশ কসমোলজিষ্ট,গণিতজ্ঞ

(৪৩) ফ্রাঙ্ক জেনিংস টিপলার (১৯৪২) যুক্তরাষ্ট্রের কসমোলজিষ্ট ও গণিতজ্ঞ

(৪৪) কার্টার (ব্র্যান্ডন কার্টার) স্বীকার করেছিলেন যে এই সর্বজনীন মূলনীতির একটি ভালো নাম হতে পারতো cognizability principle, ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত anthropic principle এর চেয়ে। B. Carter, The anthropic principle and its implications for biological evolution, Philosophical Transactions of the Royal Society of London A, 310, 1983, 347-63. , Barrow and Tipler (1988) : Barrow, J. D. and Tipler, F. J. (1988). The Anthropic Cosmological Principle. New York: Oxford University Press;

(৪৫) গোল্ডিলকস জোন (Goldilocks zone): গ্রহ ও প্রাকৃতিক উপগ্রহ (যেমন চাঁদ) এর মূল নক্ষত্রের বাসযোগ্য সীমানায় (এবং প্রায় বৃত্তকার কক্ষপথে) অবস্থান করাটা কোন একটি গ্রহের জীবনের বাসযোগ্যতা বহু পূর্বশর্তগুলোর একটি। এবং তাত্ত্বিকভাবে সম্ভব এই বাসযোগ্য সীমানার বাইরেও বাসযোগ্য কোন গ্রহের উপস্থিতি। Goldilocks planet শব্দটি ব্যবহার করা হয় যে কোনো গ্রহের জন্য যা কিনা নক্ষত্রের চারপাশের বিদ্যমান বাসযোগ্য এলাকায় অবস্থান করে (circumstellar habitable zone) । অবশ্য শব্দটি যখন কোনো গ্রহের বাসযোগ্যতা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়, এটি বলতে যা বোঝায় তা হচ্ছে পৃথিবী সদৃশ গ্রহগুলো যেখানকার বায়ুমণ্ডল ও পরিবেশ মোটামুটিভাবে পৃথিবীর সাথে তুলনা করা যায়। Goldilocks নামটির উৎস Goldilocks and the Three Bears এর রূপকথা থেকে। যেখানে একটি ছোটো বালিকাকে তিন সেট জিনিস থেকে একটি সেট বেছে নিতে হয়েছিল চরম মাত্রার কোন কিছু বাদ দিয়ে (চরম বড় বা ছোটো, চরম গরম বা ঠাণ্ডয় বাদ দিয়ে ইত্যাদি), এবং সে ঠিক এর মাঝামাঝি কোন একটি অবস্থার সেটটি বেছে নেয়, যেটি হচ্ছে ‘প্রায় ঠিক’ একটি অবস্থা। এভাবে কোন একটি গ্রহ এই মূলনীতি ব্যবহার করে যা কোন নক্ষত্র থেকে খুব দূরেও না আবার খুব কাছেও অবস্থান না করলে সেখানে তরল পানির অস্তিত্ব আশা করা যেতে পারে।

(৪৬) পেরিহেলিওন, কক্ষপথে সেই বিন্দু যা সূর্যের নিকটবর্তী প্রান্তে।

(৪৭) এপহেলিওন, কক্ষপথে সেই বিন্দু যা সুর্যের দূরবর্তী প্রান্তে।

(৪৮) Comins, N. F. (1993). What if the Moon Didn't Exist? New York: HarperCollins.

(৪৯) বিস্তারিত যুক্তি আছে রিচার্ড ডকিন্সের The Blind Watchmaker (1986) এ।

(৫০) মার্ক রিডলী (জন্ম ১৯২৬): ব্রিটিশ প্রাণী বিজ্ঞানী এবং বিবর্তন বিষয়ক লেখক। (রিচার্ড ডকিন্স এর পিএইচডি ছাত্র।

(৫১) রুবিকন অতিক্রম: (Rubicon - Latin: Rubicō, Italian: Rubicone) উত্তর পূর্ব ইতালীতে অবস্থিত একটি অগভীর নদী। Crossing the Rubicon প্রবাদ বাক্যটির অর্থ এমন একটি পর্যায় অতিক্রম করা যে সেখানে থেকে আর পিছিয়ে আসা যায়না। এই প্রবাদের সাথে জড়িয়ে আছে সেনাপতি জুলিয়াস সীজারের নাম যিনি ৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এটি অতিক্রম

করেছিলেন রোমের প্রত্যক্ষ নির্দেশ অমাণ্য করে। তার এই বিদ্রোহ পরবর্তীতে তাকে রোমান সাম্রাজ্যের শীর্ষে নিয়ে যায়।

(৫২) পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গার (যেমন, তার God, The Failed Hypothesis) সাধারণ ঐক্যমতের এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এবং ভৌতিক সব আইন এবং ধ্রুব যে বিশেষভাবে জীবন সহায়ক এই বিষয়টি তিনি মানতে নারাজ। যাই হোক আমি একটু অতিমাত্রায় নমনীয় হয়ে বিষয়টি মেনে নেবো, শুধু যুক্তি দেখানোর জন্য যে, যা-ই হোক না কেন, এই ধারণাটি কোনভাবেই ঈশ্বরবাদীরা ব্যবহার করতে পারেন না যুক্তিসঙ্গতভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সপক্ষে তাদের প্রস্তাবনায়।

(৫৩) আমি বলবো 'সম্ভবত আংশিকভাবে যার কারণ, আমাদের জানা নেই ভিন গ্রহে জীবনের আকার আকৃতি কতটা ভিন্ন আমাদের থেকে, এবং আংশিকভাবে এর অপর কারণটি হল, শুধু মাত্র একটি ধ্রুব এককভাবে পরিবর্তন করলে আমাদের ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে বেশি। আসলে কি কয়েটি ধ্রুব একটি সমন্বয় থাকতে পারে না, যা হতে পারে জীবন বান্ধব? আমরা যে সমন্বয়টি এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি, কারণ আমরা ব্যস্ত এককভাবে ধ্রুবগুলোর মাত্রা নিয়ে। যা-ই হোক আমি আমার আলোচনা করে যাবো, এমনভাবে যেন, আসলেই আপাতদৃষ্টিতে মৌলিক ধ্রুবগুলোর পরিমাপের সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ বা ফাইন টিউনিং এর বিষয়টি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আসলেই আমাদের বড় একটি সমস্যা আছে।

(৫৪) জে অ্যান্ডারসন টমাস (জুনিয়র), যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী।

(৫৫) ফ্রিম্যান জন ডাইসন (জন্ম ১৯২৩) ব্রিটিশ বংশোদ্ভুত তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ।

(৫৬) জন. এ. লেসলি (জন্ম ১৯৪০) কানাডীয় দার্শনিক।

(৫৭) সাসকিণ্ড তার The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design বইটিতে অ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপালের একটি চমৎকার সমর্থন করেছিলেন মেগাভার্সে। তিনি বলেন, বেশির ভাগ পদার্থবিদরাই এই ধারণাটি অপছন্দ করেন। যদিও আমি বুঝতে পারিনা কেন. আমি মনে করি এটি দারুণ সুন্দর একটি প্রস্তাব হয়তো এর কারণ ডারউইন আমার সচেতনতার স্তরটিকে উন্নীত করেছেন।

(৫৮) লী স্মোলীন (জন্ম ১৯৫৫) আমেরিকার তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী।

(৫৯) Murray Gell-Mann, quoted by John Brockman on the Edge website, http:// www.edge. Org/3rdculture/ bios/ smolin.html.

(৬০) Ward, K. God, Chance and Necessity. Oxford: Oneworld. (1996: 99); Polkinghorne, J. (1994). Science and Christian Belief: Theological Reflections of a Bottom-Up Thinker. London: SPCK (1994: 55).

(৬১) J. Horgan, The Templeton Foundation: a skeptics take, Chronicle of Higher Education, 7 April 2006;

(৬২)http://www.edge.org/3rd_culture/horgan06/horgan06_index.html.

(৬৩) পিটার মেদাওয়ার (৯১৫-১৯৮৭) ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী, ইমিউনোলোজি, অঙ্গ প্রতিস্থাপনের গবেষণার অগ্রদূত, বিজ্ঞান লেখক।

(৬৪) P. B. Medawar, review of The Phenomenon of Man, repr. in Medawar, P. B. (1982). Pluto's Republic. Oxford: Oxford University Press (1982: 242).

৫ পঞ্চম অধ্যায়
ধর্মের শিকড়

একজন বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সর্বজনীন আড়ম্বরময় বাহুল্যতা এবং সময়, সম্পদ, কষ্ট এবং আত্মবিসর্জনের মানদণ্ডে তাদের মূল্যে, মানড্রিলের পশ্চাৎদেশের মতোই সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়া উচিত যে, ধর্ম হয়তো অভিযোজনীয় একটি কৌশল। - মারেক কোন (১)

ডারউইনীয় আবশ্যিকতা

ধর্ম কোথা থেকে আসলো এবং কেন প্রতিটি মানব সংস্কৃতিতে বিষয়টি বিদ্যমান এই বিষয়ে সবারই নিজস্ব কোনো না কোনো পছন্দের তত্ত্ব আছে। এটি আমাদের সান্ত্বনা দেয়, স্বস্তি দেয়; গোষ্ঠী অভ্যন্তরে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আর নৈকট্যকে লালন করে। কেন আমরা বেঁচে আছি? অস্তিত্বের এই প্রশ্নের উত্তরটিকে বোঝার জন্য এটি আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে সন্তুষ্ট করে। আমি কিছুক্ষণ পরেই এই সব তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা দেবো, কিন্তু তার আগে আমি পূর্ববর্তী একটি প্রশ্ন দিয়েই শুরু করতে চাই, যে প্রশ্নটি অগ্রাধিকার পাবে বিভিন্ন কারণে, যা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখবো: সেটি প্রাকৃতিক নির্বাচন সংক্রান্ত একটি ডারউইনীয় প্রশ্ন।

আমরা যে ডারউইনীয় বিবর্তনের ফসল সেই বিষয়টি মনে রেখেই, আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় আরোপিত কোন চাপ বা চাপসমূহ মূলত ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আমাদের এই তাড়নাকে উৎসাহিত করেছে। সাধারণ ডারউইনীয় বিবেচনায় মিতব্যয়িতা অর্থাৎ অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্ম এত বেশি অপচয়পূর্ণ, বাহুল্যময় এবং ডারউইনীয় নির্বাচন স্বভাবগত প্রক্রিয়ায় যে-কোনো ধরনের অমিতব্যয়িতাকে এর নিশানা করে ও নির্মূল করে। প্রকৃতি খুবই কৃপন স্বভাবের একজন হিসাব রক্ষকের মত, যে প্রতিটি পয়সা খুবই সতর্কভাবে মেপে মেপে খরচ করে, সময়ের দিকে নজর রেখে, সামান্যতম বাহুল্যতাকে যে শাস্তি দেয়; যেমন ডারউইন ব্যাখ্যা করেছিলেন, ‘অবধারিত এবং অবিরামভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রতি দিন, প্রতি ঘন্টায় সারা বিশ্বজুড়ে এর নজরদারী অব্যাহত রাখে, প্রতিটি বৈচিত্র্য, তা যত সামান্যই হোক না কেন; যা ক্ষতিকর সেগুলো বর্জন করে, এবং রক্ষা ও ক্রমশ জমা করতে থাকে যা কিছু উপকারি; নীরবে, অনুভূতিহীনভাবে সে কাজ করে যাচ্ছে, যেখানে এবং যখনই সেই সুযোগ আসছে, প্রতিটি জীবের উন্নতির লক্ষ্যে’। যদি কোনো বন্য জীব স্বভাববশত প্রতিদিনই অর্থহীন কোনো কর্মকাণ্ড করে যেতে থাকে, প্রাকৃতিক নির্বাচন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সদস্যদের বিশেষ সহায়তা করবে যারা তাদের সময় এবং শক্তি ও শ্রম, অর্থহীন কোনো কর্মকাণ্ডের পরিবর্তে বেঁচে থাকা ও বংশ বিস্তারের জন্য বরং ব্যয় করে। প্রকৃতির খামখেয়ালী অপ্রয়োজনীয় কাজকে প্রশ্রয় দেয়ার কোনো উপায় নেই। নিষ্ঠুর উপযোগিতাবাদেরই জয় হয়, এমনকি যখন বহু ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে সেই রকম কিছু হচ্ছে বলে আমাদের কাছে মনে হয় না।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, ময়ুরের পুচ্ছ হচ্ছে অন্যতম সেরা খামখেয়ালী একটি ইচ্ছার উদাহরণ। নিশ্চয়ই এটি এর বাহককে বেঁচে থাকার জন্য কোনো বাড়তি সুবিধা প্রদান করছে না। কিন্তু এটি অবশ্যই সহায়তা করছে এর বাহকের জিনকে, কম দৃষ্টিনন্দন কিংবা বিশেষত্ব সম্পন্ন পুচ্ছসহ অন্য বাহক থেকে পৃথক করার মাধ্যমে। ময়ুরের এই

পুচ্ছ আসলে বিজ্ঞাপন, যা তাকে প্রকৃতির অর্থনীতিতে তার প্রজনন সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করার জায়গাটি ক্রয় করার সুযোগ করে দেয়, এবং বিষয়টি ঠিক একই ভাবে সত্য পুরুষ বোয়ার (২) পাখিদের ক্ষেত্রে, যারা বিস্ময়কর পরিমাণ শ্রম ও সময় ব্যয় করে তাদের বোয়ার তৈরি করতে : বোয়ার হচ্ছে গাছের ডালপালা দিয়ে তৈরি একটি স্থাপনা, যাকে বলা যায় এক ধরনের শরীরের বাইরে তৈরি করা পুচ্ছ, যা পুরুষ বোয়ার পাখীরা স্ত্রী বোয়ার পাখিদের আকর্ষণ করার জন্য গাছের ডাল, ঘাস, রঙ্গীন কোনো ফল বা বেরী, এবং যদি পাওয়া যায় নানা রঙ্গের পুতি, বোতলে ছিপি বা কোনো রঙ্গীন কোনো কিছু দিয়ে সেটি সজ্জিত করে। বা আরো একটি উদাহরণ পছন্দ করা যেতে পারে, যা এই রকম কোনো বিজ্ঞাপনের সাথে জড়িত না, যেমন, অ্যান্টিং (৩), বেশ কিছু পাখিদের অদ্ভুত একটি অভ্যাস আছে সেটি হলো , হলো পিপড়ার ডিবিতে 'গোছল' করা বা অন্য কোনো উপায়ে পাখিগুলো তাদের নিজেদের ডানায় পিপড়াদের ছড়িয়ে দেবার প্রক্রিয়া। কেউই নিশ্চিৎ নয় এই কাজটা করার কি উপকারিতা আছে - হতে পারে এটি কোনো ধরনের স্বাস্থ্য রক্ষার একটি উপায়, পালক থেকে পরজীবি জীবাণুগুলো পরিষ্কার করার একটি প্রক্রিয়া; আরো অনেক হাইপোথিসিস প্রস্তাবিত হয়েছে এই বিষয়ে, কিন্তু সেগুলোর সপক্ষে তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ আপাতত নেই। কিন্তু এই ধরনের কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ে অনিশ্চয়তা কখনোই (এবং কখনোও উচিত না) কোনো ডারউইনবাদীদের বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে ধারণা করতে কোনো বাঁধা দেয়না যে, এই অ্যান্টিং এর অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ আছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও হয়তো একমত হবে, কিন্তু ডারউইনীয় যুক্তির এভাবে চিন্তা করার কিছু নির্দিষ্ট কারণ আছে, যেমন, যদি পাখীরা এভাবে কাজটি না করে, তাহলে হয়তো দেখা যেতে পারে তাদের জিনগত সাফল্যের পরিসংখ্যানগত প্রত্যাশিত সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এমনকি যদিও আমরা বর্তমানে জানি না ঠিক কিভাবে এই ক্ষতিটি হতে পারে। কারণ এই উপসংহারের মূলে আছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জোড় ভিত্তিটি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, সময় এবং শক্তি, এ দুটোর অপচয়কেই শাস্তি দেয় এবং এই সব পাখীদের সময় এবং শক্তি ব্যয় করে অ্যান্টিং করতে দেখা যায় নিয়মিতভাবেই। যদি এক বাক্যের কোনো ম্যানিফেস্টো দিয়ে এই অ্যাডাপশনিস্ট বা অভিযোজনবাদী মূলমন্ত্রকে প্রকাশ করা যায়, কোনো সন্দেহ নেই এটিকে চূড়ান্ত এবং বাড়াবাড়ি রকমের গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন হার্ভার্ড এর বিখ্যাত জিনতত্ত্ববিদ রিচার্ড লেওনটিন: 'আমার মনে হয় এই বিষয়ে বিবর্তনবাদীরা সবাই একমত হবেন যে, তাদের নিজস্ব পরিবেশে কোনো একটি জীব অভিযোজনের জন্য যা করছে তার চেয়ে আরো ভালো কোনো ভাবে সেই কাজটি করা প্রায় অসম্ভব' (৪)। যদি 'অ্যান্টিং' আচরণটি বেঁচে থাকা এবং প্রজনন এই দুটি ক্ষেত্রে কোনো ইতিবাচক উপযোগিতা না রাখতো, বহু আগেই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রজাতির যে সদস্যরা এটি করছে না তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতো। একজন ডারউইনবাদীও ধর্ম সম্বন্ধে সেভাবে বলার জন্য কোনো তাড়না অনুভব করতে পারেন, আর সেই কারণেই এই আলোচনা।

একজন বিবর্তনবাদীর কাছে ধর্মীয় আচারগুলো সূর্যের আলোয় উদ্ভাবিত বনের কোনো খোলা মাঠে ঝকমক করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ময়ুরের পেখমের (ড্যান ডেনেট এর ভাষায়) মতোই মনে হতে পারে। ধর্মীয় আচরণ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই পাখিদের অ্যান্টিং বা বোয়ার বানানো মত আচরণের মনুষ্য সমতূল্য একটি কাজ। অবশ্যই এই কাজটি সময় সাপেক্ষ, শক্তি ব্যয়কারী, প্রায়ই অতিমাত্রায় বাহুল্যপূর্ণ বা আলঙ্কারিক, বার্ড অব প্যারাডাইসের পালকপুঞ্জের মতোই। কখনো ধর্ম, কোনো ধার্মিক ব্যক্তির জন্য এবং এমনকি অন্যদের জন্য প্রাণঘাতী হতে পারে; লক্ষ হাজার মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করা হয়েছে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি তাদের প্রদর্শিত আনুগত্যের জন্য, অতি উৎসাহী ধর্মান্ধদের হাতে তাদের সহ্য করতে হয়েছে সীমাহীন নিপীড়ন হয়তো এমন কোনো বিশ্বাসের জন্য যা প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিকল্প অন্য বিশ্বাসটি (যাদের অনুসারীদের হাতে নিপীড়নের শিকার হতে হচ্ছে) থেকে আসলে খুব সামান্যই ভিন্ন। ধর্ম অর্জিত সম্পদকে গ্রাস করে, এবং কখনো তার মাত্রা অতিরিক্ত। মধ্যযুগীয় কোনো ক্যাথিড্রাল বানানোর জন্য শত মানুষের শতাব্দী কালব্যাপী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, অথচ সেই স্থাপনাটি যার পেছনে এত সময়, শ্রম আর সম্পদের ব্যবহার হচ্ছে, সেই স্থাপনাটি কখনোই বসবাসের জন্য বা স্বীকৃত এমন কোনো উপযোগী কারণে নির্মাণ করা হয় না। এটা তাহলে এক ধরনের স্থাপত্যকর্মের ময়ুর পুচ্ছ? যদি তাই হয়, তাহলে এর বিজ্ঞাপনটি কাদের প্রতি নির্দেশিত। পবিত্র ভক্তিসঙ্গীত এবং ভক্তিময় চিত্রকলা মধ্যযুগীয় এবং রেনেসাঁর প্রতিভায় প্রায় একচেটিয়া প্রভাব ফেলেছিল। ভক্তিপূর্ণ ধর্মে নিবেদিত কোনো মানুষ তার ঈশ্বরের জন্য যেমন মরতেও পারে, অন্যকেও অনায়াসে মারতেও পারে। তারা নিজেদের চাবুক দিয়ে পিটিয়ে শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করে রক্তক্ষরণ করে, বা আজীবন কুমার হয়ে একাকী নির্জনতায় জীবন কাটাতে কঠোরতম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সবই ধর্মের জন্য নিবেদিত। কেন? কিসের জন্য এই সব? ধর্মের কি আসলেই কোনো 'উপকারিতা' আছে?

এই 'উপকারিতা' শব্দটি দিয়ে ডারউইনবাদীরা সাধারণত বোঝান কোনো একক সদস্যের বহনকারী জিনগুলো বেঁচে থাকার জন্য কোনো ধরনের উপকারি ও উপযোগী পরিবর্ধন। আর এই ধারণার মধ্যে যে বিষয়টি অনুপস্থিত তা হলো ডারউইনীয় কোনো উপকারিতা কোনো একক জীব সদস্যর জিনের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়। উপকারিতার সম্ভাব্য আরো তিনটি বিকল্প নিশানাও থাকতে পারে। একটি আসছে 'গ্রুপ সিলেকশন' তত্ত্ব থেকে, আর সেই বিষয়ে আমি পরে আলোচনায় আসছি। দ্বিতীয়টি আসছে সেই তত্ত্ব থেকে যা আমি ব্যাখ্যা ও সমর্থন করেছিলাম আমার 'দ্য এক্সটেন্ডেড ফেনোটাইপ' বইটিতে: কোনো একটি একক জীব যাকে আপনারা দেখছেন, সেটি হয়তো অন্য আরো একটি একক জীবের জিনের নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবের আওতায় কাজ করছে, হয়তো সেটা হতে পারে কোনো পরজীবি। ড্যান ডেনেট আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, সাধারণ

সর্দিজ্বরের মতোই ধর্ম সব মানুষের মধ্যে সর্বজনীন, তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এমন প্রস্তাব করছি না যে, সর্দি জ্বর আমাদের কোনোভাবে উপকার করছে। প্রাণী জগতে এমন অনেক উদাহরণ আছে, যেখানে কোনো পরজীবির এক পোষক থেকে অন্য পোষকে বিস্তার লাভ করার সুবিধার জন্য তারা তাদের পোষক জীবটির আচরণগত পরিবর্তন ঘটাতে প্ররোচিত করতে সক্ষম। আমি এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলাম আমার 'দ্য এক্সটেন্ডেড ফেনোটাইপের কেন্দ্রীয় সূত্র' হিসাবে: কোনো জীবের আচরণ, সেই আচরণের 'জন্য' নির্দিষ্ট জিনগুলোকে টিকিয়ে রাখার বিষয়টি সর্বোচ্চভাবে নিশ্চিৎ করার চেষ্টা করে, জিনগুলো সেই আচরণ করা প্রাণীর শরীরে থাকুক বা না থাকুক।

তৃতীয়, কেন্দ্রীয় তত্ত্বটি হয়তো জিন শব্দটিকে আরো সাধারণ বহু ব্যবহৃত রেপ্লিকেটর বা অনুলিপিকারী শব্দটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে ধর্মের সর্বব্যাপীতা সম্ভবত ইঙ্গিত করছে যে, ধর্ম কোনো না কোনো কিছুর উপকারিতার জন্য কাজ করছে কিন্তু সেটি আমাদের বা আমাদের জিনের প্রতি নির্দেশিত নাও হতে পারে। হতে পারে এটি শুধু ধর্মীয় ধারণাগুলোর নিজেদের জন্য উপকারি; এবং তা এমন পর্যায় অবধি যে সেই অর্থে তাদের আচরণ অনেকটাই জিন বা অনুলিপনকারীদের মত। বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে আমি আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছি, 'সাবধানে হাটুন, কারণ আপনি আমার মিমের উপর দিয়ে হাটছেন' এই শিরোনামের অধীনে। তবে তার আগে আমি ডারউইনবাদের আরো বেশ ঐতিহ্যবাহী ব্যাখ্যাটা নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে চাই। যেখানে বেনিফিট বা উপকার বলতে মনে করা হয়েছে কোনো একক জীব সদস্যর বেঁচে থাকা এবং প্রজনন ক্ষেত্রে উপকার বা ইতিবাচক প্রভাব।

ধারণা করা হয় আদি পূর্বসূরিরা যেভাবে বাস করতেন অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসী শিকারী-সংগ্রহকারী বা 'হান্টার-গ্যাদারার' মানবগোষ্ঠী খুব সম্ভবত সেই রকম উপায়ে জীবন যাপন করে। নিউ জিল্যান্ড-অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানের দার্শনিক কিম স্টেরেলনাই তাদের জীবনের নাটকীয় কিছু স্ববিরোধীতা বা বৈপরিত্যকে তুলে ধরেছেন। একদিকে যেমন, আদিবাসীরা বেঁচে থাকার জন্য দুর্দান্ত কৌশলী, বিশেষ করে যে বৈরী পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে তাদের সকল ব্যবহারিক আর প্রায়োগিক দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হয়; কিন্তু স্টেরেলনাই আরো যোগ করেন, 'আমরা প্রজাতি হিসাবে বুদ্ধিমান হতে পারি, তবে এই বুদ্ধিমত্তাটা খানিকটা বিকৃত। যে মানুষগুলো প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখে, জানে সেখানে কিভাবে বেঁচে থাকতে হয়, তারাই আবার কি করে একই সাথে তাদের মনের ভিতরে নানা উদ্ভট বিশ্বাস এলোমেলো করে ভরে রাখে, যে বিশ্বাসগুলো একেবারে স্পষ্টভাবেই মিথ্যা, যার জন্য 'অর্থহীন' শব্দটিও হবে অতিমাত্রায় একটি স্বল্পভাষণ'। কিম স্টেরেলনাই নিজে সুপরিচিত ছিলেন পাপুয়া নিউ গিনির আদিবাসীদের সম্বন্ধে। তারা বেঁচে থাকে ভীষণ কঠিন একটি পরিবেশে, যেখানে খাদ্যর সন্ধান পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য একটি বিষয়, আর সেটি সম্ভব হয় শুধুমাত্র তাদের

চারপাশের জৈববৈজ্ঞানিক পরিবেশ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান প্রয়োগ করার মাধ্যমেই, কিন্তু তারা তাদের এই প্রাকৃতিক জ্ঞানটার সাথেই যুক্ত করে রেখেছে নারীর মাসিককালীন দূষিতকরণ এবং ডাকিনীবিদ্যা সম্বন্ধে তাদের গভীরভাবে ক্ষতিকর বদ্ধমূল কিছু ধারণা। অসংখ্য স্থানীয় গোত্র নানা ধরনের যাদুকরী এবং ডাকিনীবিদ্যার ভয় এবং সেই ভয়ের সাথে জড়িত সহিংস অত্যাচারের শঙ্কায় শঙ্কিত। স্টেরেলনাই আমাদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেন, 'কেমন করে আমরা একই সাথে এত বুদ্ধিমান এবং এক নির্বোধ হতে পারি' (৫)?

খুঁটিনাটি বিষয়ে পার্থক্য হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে এমন কোনো সংস্কৃতি নেই, যেখানে কোনো না কোনো এক সংস্করনের এই ধরনের সময় বিনষ্টকারী, সম্পদ নষ্টকারী, শত্রুতার অনুভূতি উস্কে দেবার মত আচার আচরণ, অবাস্তব অনুৎপাদনশীল ধর্মীয় কল্পকাহিনীর অস্তিত্ব নেই। কিছু শিক্ষিত মানুষ হয়তো ধর্মকে ত্যাগ করেছেন, কিন্তু তারা সবাই প্রতিপালিত হয়েছেন কোনো না কোনো ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে, যেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সাধারণত তাদের সচেতনভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উত্তর আয়ারল্যান্ডের বেশ পুরোনো কৌতুকটি: 'বেশ ভালো কথা, বুঝলাম আপনি নাস্তিক ,কিন্তু আপনি কি প্রটেস্টান্ট নাস্তিক? নাকি ক্যাথলিক নাস্তিক?' এখানে কিন্তু মিশ্রিত আছে তিক্ত সত্যটি। বিষমকামী যৌনতার বিষয়টি যেমন সর্বজনীন বলা হয়, ধর্মীয় আচরণও তেমন মানুষের জন্য সর্বজনীন একটি আচরণ বলা যেতে পারে। দুই সাধারণীকরণের মধ্যেই সুযোগ আছে এককভাবে ব্যক্তিগত এর থেকে ভিন্ন কোনো আচরণের বিষয়টি মেনে নেবার, কিন্তু সেই সব ব্যতিক্রমকেও ব্যাখ্যা দেয়া হয় বা বোঝানো হয় যে, তারা আসলে মূল নিয়ম থেকে সরে এসেছে। আর কোনো প্রজাতির মধ্য বিদ্যমান সর্বজনীন কোনো বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ডারউইনীয় ব্যাখ্যা দাবী করে।

অবশ্যই কোনো জীবের যৌন আচরণের ডারউইনীয় উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা তেমন কোনো কঠিন কাজ না; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান উৎপাদন করা, এমনকি যখন জন্মনিরোধক ব্যবহার বা সমকামিতা আপাতদৃষ্টিতে এই বিষয়টি মিথ্যা এমন একটি ধারণা দেয়। কিন্তু ধর্মীয় আচরণ তাহলে কি? কেন মানুষ নিয়ম মাফিক উপবাস করে, নতজানু হয়ে মাথা নত করে, নিজেদের চাবুক দিয়ে পেটায়, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে পাগলের মত মাথা নাড়ায়, ধর্মযুদ্ধ করে বা অনথ্যায় এমন কিছু কষ্ট আর সময়সাপেক্ষ আচরণের ব্যস্ত হয়, যা তাদের সমস্ত জীবনকে অধিগ্রহণ আর গ্রাস করে এবং চরম কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুও নিশ্চিৎ করে।

ধর্মের প্রস্তাবিত কিছু প্রত্যক্ষ উপকারিতা

ধর্মীয় বিশ্বাস মানুষকে স্ট্রেস বা মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট নানা অসুখ থেকে রক্ষা করছে এমন প্রস্তাবের সপক্ষে খুব সামান্যই প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। এমনকি যে প্রমাণগুলো আছে সেগুলোর কোনোটাই তেমন মজবুত নয়। কিন্তু যদি বিষয়টি সত্য হয় তাহলেও কিন্তু এটি অবাক হবার মত কোনো বিষয় হবে না, কারণ সেই একই, বিশ্বাস নির্ভর নিরাময় যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে কারণে কাজে লেগে যায়। ধর্মের দাবীর আসল মূল্যকে আরো জোরদার করতে, আমি মনে করি না এই উপকারি প্রভাবের বিষয়টি এর সাথে যোগ করার কোনো দরকার থাকতে পারে। জর্জ বার্নার্ড শ (৬) যেভাবে বলেছিলেন, 'কোন সন্দেহবাদীর তুলনায় কোনো বিশ্বাসী যে সুখে আছে এই সত্যটা একজন মাতাল ব্যক্তি যেমন নেশাগ্রস্থ নয় এমন কারো চেয়ে সুখী যে কারণে, তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়'।

কোনো একজন রোগীকে চিকিৎসাসেবা হিসাবে কোনো একজন ডাক্তার যা দিতে পারেন, তার একটি অংশ হচ্ছে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস। রোগীর উপর এই বিষয়টির প্রভাব কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। আমার ডাক্তার হয়তো তার হাত দিয়ে আক্ষরিক অর্থ 'বিশ্বাস নির্ভর নিরাময়' বা যাকে বলে 'ফেইথ হিলিং' - এর কোনো অনুশীলন করেন না, কিন্তু অনেকবারই ছোটোখাটো রোগ-ব্যাধি থেকে আমি প্রায় সাথে সাথেই নিরাময় লাভ করেছি, যখনই স্টেথোস্কোপ পরা একজন বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের আশ্বস্ত করার মত কণ্ঠ আমি শুনেছি। 'প্ল্যাসিবো প্রভাব' নিয়ে বেশ গবেষণাও হয়েছে এবং এবং এটি খুব রহস্যময় কোনো ব্যপার নয়; 'ডামি পিল' বা ঔষধকল্প, যাদের কোনো ধরনেরই ফার্মাকোলজী নির্ভর বা ঔষধীয় কোনো প্রভাব নেই, কিন্তু দেখা গেছে সেটি রোগীর অবস্থার উন্নতি করছে। এই কারণেই সব ডাবল ব্লাইন্ড গবেষণা (গবেষক এবং রোগী উভয়ের কাছে যখন অজানা থাকে তারা কি চিকিৎসা পাচ্ছেন, আসল ঔষধ, নাকি ঔষধকল্প যাকে বলা হয় প্লাসিবো পিল) গবেষণায় প্লাসিবোকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কন্ট্রোল (যার সাথে মূল ঔষধটি আসলেই কার্যকরী কিনা তা তুলনা করে দেখা হয়) হিসেবে। এবং এই কারণে হোমিওপ্যাথীর 'চিকিৎসাগুলো' কাজ করে বলে মনে করা হয়, এমনকি তারা এমনই লঘু মাত্রার যে, প্লাসিবো কন্ট্রোলদের মতো সেগুলোয় একই পরিমাণ সক্রিয় (!) উপাদান থাকে অর্থাৎ শূন্য সংখ্যক অণু। ঘটনাচক্রে, আইনজীবিদের ডাক্তারদের ক্ষমতার এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করার একটি দুর্ভাগ্যজনক উপজাত বিষয় হচ্ছে, ডাক্তাররা এখন তাদের সাধারণ চিকিৎসাসেবা দেবার সময় ব্যবস্থাপত্রে প্লাসিবো পিল উল্লেখ করতে ভয় পান, বা আমলাতান্ত্রিকতা তাদের বাধ্য করে কোনোটি প্লাসিবো সেটি লিখিতভাবে চিহ্নিত করার জন্য, যা কিনা রোগী নিজেই দেখতে পায়, এবং যে কারণে অবশ্যই প্লাসিবো পিলের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যহত হয়। হোমিওপ্যাথরা এক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সফলতা অর্জন করেছেন কারণ তারা প্রচলিত চিকিৎসকদের ব্যতিক্রম, কারণ রোগীদের এখনো অন্য নামে (ঔষধ হিসাবে) প্লাসিবো ঔষধ দেবার জন্য তাদের অনুমতি আছে, উপরন্তু তাদের হাতে সময়ও থাকে বেশি,

ফলে অপেক্ষাকৃতভাবে তারা রোগীর সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা বলা ও বাড়তি সহানুভুতিশীল ও দয়াপরবশ হবারও সুযোগ পান। হোমিও চিকিৎসার দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথমাংশে, এর সুনাম কিন্তু বৃদ্ধি পেয়েছিল ঘটনাচক্রে, যার প্রধান একটি কারণ ছিল এর ঔষধগুলো কোনো কিছুই করে না এবং যা স্পষ্টতই ব্যতিক্রম ছিল তৎকালীন প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো থেকে, যেমন, রক্তপাত করানো; যা সরাসরি রোগীর ক্ষতির কারণ হতো।

তাহলে ধর্ম কি একটি প্ল্যাসিবো যা জীবনকে প্রলম্বিত করে মানসিক চাপ ও অবসাদ হ্রাস করে? সম্ভবত, যদিও এই তত্ত্বটিকে সন্দেহবাদীদের ছাকুনী অতিক্রম করতে হয়েছে, যা সফলভাবেই প্রদর্শন করেছে যে, অনেক পরিস্থিতিতেই কমানোর চেয়ে ধর্ম বরং মানসিক চাপের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। যেমন, বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়ানো ভয়াবহ অপরাধবোধের প্রায় চিরস্থায়ী কোনো অবস্থায় কারো স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হতে পারে, যা কিনা সাধারণ মানবিক দুর্বলতা সম্পন্ন ও অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান কোনো রোমান ক্যাথলিকরা ভুগে থাকেন। হয়তো শুধুমাত্র ক্যাথলিকদের আলাদা করে চিহ্নিত করাটা তাদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে না। যুক্তরাষ্টের কমেডিয়ান ক্যাথি ল্যাডমানের পর্যবেক্ষণ: ‘সব ধর্মই তো এক : মূলত ধর্মই হচ্ছে অপরাধবোধ, যাদের ছুটির দিনগুলো শুধু ভিন্ন ভিন্ন দিনে’। তবে যা-ই হোক না কেন, আমি মনে করি ধর্ম প্রপঞ্চটির ব্যাপক সর্বব্যাপীতা ব্যাখ্যা করতে এই ধরনের প্লাসিবো তত্ত্বটি যথেষ্ট নয়। আমি মনে করিনা, আমাদের পূর্বসূরিদের মানসিক চাপ কমাতো বলেই ধর্মের অস্তিত্ব টিকে গেছে, এই কার্যকারণটি ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে প্লাসিবো তত্ত্বটি যথেষ্ট ব্যাপক কোনো তত্ত্ব নয়, যদিও এটি এক ধরনের সহায়ক কোনো দায়িত্ব পালন করে থাকতেও পারে। ধর্ম একটি বিশাল ব্যপার, বড় মাপের একটি প্রপঞ্চ, পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব এমন একটি বিষয়, এর ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন আরো বড় কোনো একটি তত্ত্ব।

অন্য তত্ত্বগুলো ডারউইনীয় ব্যাখ্যার মূল বিষয়টি আদৌ স্পর্শ করতে পারেনি। আমি সেই ব্যাখ্যাগুলোর কথা বলছি যেমন: ‘ধর্ম মহাবিশ্ব এবং সেখানে আমাদের অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে’ বা ‘ধর্ম সান্ত্বনাদায়ক’; কিছু মনোস্তাত্ত্বিক সত্যতা হয়তো এখানে আছে, যা আমরা অধ্যায় ১০ এ আলোচনায় দেখবো, কিন্তু কোনোটাই এককভাবে ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যা নয়। স্টিভেন পিংকার যেমন সরাসরি সান্ত্বনাদায়ক বা আশ্বস্তকারী তত্ত্বের বিষয়ে বলেছেন তার ‘হাউ দ্য মাইণ্ড ওয়ার্কস’ বইটিতে: “এটি শুধুমাত্র আরেকটি প্রশ্নের জন্ম দেয়, ‘কেন’ এমন একটি মন বা মনোস্তাত্ত্বিক কাঠামোর বিবর্তন হবে, যা কিনা এমন কোনো বিশ্বাসে স্বস্তি পাবে, যা এটিকে সুস্পষ্টভাবে মিথ্যা বলেও বুঝতে পারে। একজন শীতার্ত ব্যক্তি শুধু নিজেকে উষ্ণ ভেবে কোনো স্বস্তি পেতে পারেন না কিংবা সিংহের মুখোমুখি দাড়ানো কোনো মানুষ, সিংহকে খরগোশ বিশ্বাস করে কখনো সহজ হতে পারেন না’ (৮)। কমপক্ষে এই

সান্ত্বনা প্রদান করার তত্ত্বটিকে ডারউইনীয় শব্দমালায় অর্থবহ হতে হবে, এবং আপনি যা ভাবছেন বিষয়টি তার চেয়ে বেশ কঠিন। কিছু বিশ্বাসকে মানুষদের পছন্দ বা অপছন্দ করার প্রক্রিয়াটির মনোস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাগুলো 'প্রক্সিমেট' পকৃতির, অর্থাৎ এটি তাৎক্ষণিক, অবশ্যই চূড়ান্ত বা মূল বা 'আল্টিমেট' কারণগুলোর ব্যাখ্যা নয়।

ডারউইনবাদীরা এই 'প্রক্সিমেট' এবং 'আলটিমেট' বা যথাক্রমে তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত, এই দুটির মধ্যকার পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। 'ইন্টারনাল কমবাশন' ইঞ্জিনের সিলিন্ডারে বিস্ফোরণের তাৎক্ষণিক ব্যাখ্যা হিসাবে প্রতীয়মান হয়, স্পার্কিং প্লাগ। কিন্তু আল্টিমেট বা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা হলো কি উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরণটি পরিকল্পনা করা হয়েছে: সিলিন্ডার থেকে পিস্টনটা বাইরের দিকে বের করে গতিশীল করা বা চালানোর জন্য, এবং তার মাধ্যমে মূল ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটটিকে ঘোরানো। ধর্মের 'প্রক্সিমেট' কারণ হতে পারে আমাদের মস্তিষ্কের কোনো একটি অংশ বা অংশসমুহ বা নোডের অতিসক্রিয়তা। আমি স্নায়ুবৈজ্ঞানিক সেই 'গড সেন্টারের' ধারণা এখানে আলোচনা করবো না, প্রক্সিমেট কারণ নিয়ে আমি এখানে আলোচনা করতে চাচ্ছি না। তার মানে এই না, আমি এদের খাটো করে দেখছি, আমি পাঠকদের মাইকেল শেরমারের (৯) 'হাউ উই বিলিভ: দ্য সার্চ ফর গড ইন এজ অব সায়েন্স' (৯) বইটা পড়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি এই বিষয়ে স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্ট একটি আলোচনার জন্য, যেখানে মাইকেল পেরসিংগার (১১) এবং অন্যদের প্রস্তাবও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা প্রস্তাব করছে যে, বড় কোনো ধরনের এবং উজ্জ্বল নানা দৃশ্যকল্প সমৃদ্ধ কোনো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সাথে টেম্পোরাল লোব এপিলেপসি (মৃগী রোগ, যা মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু অংশের অতিসক্রিয়তার কারণে সৃষ্ট হতে পারে, যেমন এখানে টেমপোরাল লোবের সংশ্লিষ্টতা আছে)।

কিন্তু এই অধ্যায়ে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডারউইনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে 'আলটিমেট' ব্যাখ্যাটি অনুসন্ধান করা। স্নায়ুবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো 'গড সেন্টার' যদি খুঁজেও পান, আমার মত ডারউইনীয় বিজ্ঞানীরা তারপরও সেই বিশেষ প্রাকৃতিক নির্বাচনী চাপটি বুঝতে চাইবেন, যা এমন কোন 'গড সেন্টার' এর বিবর্তনে বিশেষ সহায়তা ও পক্ষপাতিত্ব করেছে। কেন আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যাদের 'গড সেন্টার' তৈরি হবার জিনগত প্রবণতা ছিল, তারা বেশি বেঁচে ছিলেন এবং বেশি সংখ্যক বংশধর সৃষ্টি করে গেছেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায়, যাদের এ ধরনের কোনো প্রবণতা ছিলনা। ডারউইনীয় আল্টিমেট প্রশ্ন কিন্তু স্নায়ুবিজ্ঞানীদের 'প্রক্সিমেট' প্রশ্নের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উত্তম প্রশ্ন নয় কিংবা অপেক্ষাকৃত গভীর বা প্রগাঢ় কোনো প্রশ্নও না, এমন কি বেশি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নও বলা যাবে না; কিন্তু সেই প্রশ্নটাই নিয়ে আমি এখানে কথা বলছি।

ডারউইনবাদীরা কোনো রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারাও সন্তুষ্ট হবেন না, যেমন, ‘ধর্ম একটি কৌশল বা উপকরণ যার দ্বারা শাসক শ্রেণীগোষ্ঠী তাদের অধস্তন শোষিত শ্রেণীগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করে’। নিশ্চিৎভাবে এটা সত্য যে যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসরা অন্য জীবনের প্রতিশ্রুতিতে সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন, যা তাদের বর্তমান জীবন নিয়ে অসন্তুষ্টি ও কষ্টের অনুভূতিকে সহনশীল করে তুলতো, যা প্রকারন্তরে সহায়তা করতো তাদের শোষক মালিকদেরকেই। কিন্তু আসলেই দূরভিসন্ধিপূর্ণ কোনো যাজক বা শাসকরা সুচিন্তিতভাবে ধর্ম পরিকল্পনা করেছিলেন কিনা এই প্রশ্নটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক, যার উত্তর খুঁজতে পারেন কেবল ইতিহাসবিদরা, কিন্তু এটিও স্বতন্ত্রভাবে ডারউইনীয় প্রশ্ন নয়। ডারউইনবাদীরা তারপরও জানতে চান, কেন মানুষ ধর্মের মাদকতায় সহজে মোহাচ্ছন্ন হয়, ধমের্র নানা ছল চাতুরী আর প্রতিশ্রুতির শিকার হয়, আর সেই কারণেই যাজক, রাজনীতিবিদ এবং শাসকদের শোষণের শিকার হবারও সম্ভাবনা থাকে বেশি।

দূরভিসন্ধিপূর্ণ কোনো নৈরাশ্যবাদী ধূর্ত কেউ যৌন লালসাকে রাজেনৈতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু তারপরও আমাদের ডারউইনীয় একটি ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে কেন এটি কাজ করে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে। যৌন লালসার ক্ষেত্রে এই উত্তরটা সহজ: আমাদের মস্তিষ্কের কাঠামো গঠিত হয়েছে এমনভাবে যে আমরা যৌনকর্মকে উপভোগ করি কারণ, যৌনকর্ম তার স্বাভাবিক প্রাকৃতিক অবস্থায় সন্তান উৎপাদন করে। অথবা কোনো রাজনৈতিক কলকাঠি নিয়ন্ত্রক কূটকৌশলী হয়তো শারীরিক নিপীড়ন বা নির্যাতনকে বেছে নিতে পারে তার মতলব হাসিলের জন্য। আবারো ডারউইনবাদীদের অবশ্যই ব্যাখ্যার যোগান দিতে হবে কেন নির্যাতন কার্যকরী ফলাফল দিচ্ছে এখানে, কেন আমরা প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণাকে এড়ানোর জন্য প্রায় যে-কোনো কিছু করতে রাজী আছি। আবারো স্পষ্টভাবে এর কারণ খুবই আটপৌরে সাধারণ হওয়া সত্ত্বেও ডারউইনবাদীদের সেটা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা দিতে হবে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন শারীরিক ব্যাথা বা যন্ত্রণা অনুভব করার ক্ষমতাকে জীবননাশী শারীরিক কোনো ক্ষতির চিহ্ন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, এবং এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য এটি আমাদের ভেতর শক্তিশালী জৈবিক তাড়না সৃষ্টির প্রয়োজনীয় নির্দেশও বিবর্তিত করেছে। কিছু দুর্লভ মানুষ আছেন, যারা কোনো কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভব করতে পারেন না, বা সেটি নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন, তারা সাধারণত অল্প বয়সে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে মারা যান, যে আঘাতগুলো আমরা অন্যরা বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এড়িয়ে চলি। কেউ কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুক কিংবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেকে প্রকাশ করুক না কেন, কি সেই চূড়ান্ত কারণ যা আসলেই ঈশ্বর বা দেব-দেবীদের পূজা করার প্রতি আমাদের সর্বজনীন লালসাটিকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

গ্রুপ সিলেকশন বা গোষ্ঠী নির্বাচন

কিছু প্রস্তাবিত আল্টিমেট বা চূড়ান্ত ব্যাখ্যা আসলে দেখা যাচ্ছে প্রায় অথবা পুরোপুরিভাবেই গ্রুপ সিলেকশন বা গোষ্ঠী নির্বাচন তত্ত্ব নির্ভর। 'গ্রুপ সিলেকশন' একটি বিতর্কিত ধারণা যা দাবী করে, ডারউইনীয় নির্বাচন বিভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে বা অন্য কোনো জীব সদস্যদের 'গ্রুপ' বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বাছাই করে। কেমব্রিজের প্রত্নতত্ত্ববিদ কলিন রেনফ্রিউ (১২) প্রস্তাব করেছিলেন যে, খ্রিস্ট ধর্ম এক ধরনের গ্রুপ সিলেকশনের মাধ্যমেই তার অস্তিত্ব রক্ষা করেছে কারণ এটি গ্রুপের মধ্যে বা অন্তঃগ্রুপ আনুগত্য ও ভাতৃপ্রতিম ভালোবাসাকে প্রতিপালন করেছিল, যা বেশি ধার্মিক গোষ্ঠীগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম ধার্মিক গ্রুপগুলোর চেয়ে সফলতার সাথে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রুপ সিলেকশন তত্ত্বের অন্যতম প্রচারক ডি. এস. উইলসন (১৩) স্বতন্ত্রভাবে একই ধরনের একটি প্রস্তাব দাড় করিয়েছিলেন আরো বিস্তারিতভাবে তার 'ডারউইনস ক্যাথিড্রাল' বইটিতে (১৪)।

ধর্মের 'গ্রুপ সিলেকশন' তত্ত্ব আসলে কি বলছে, তা বোঝানোর জন্য একটি কল্পিত উদাহরণ দেয়া যাক: একটি গোত্র, যারা অতিমাত্রায় এক যুদ্ধবাজ 'যুদ্ধের দেবতার' উপাসনা করে, তারা শান্তি আর ঐক্যের তাগিদ দেয় এমন কোনো দেবতার পূজারী প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র, কিংবা কোনো দেবতারই পূজা করে না এমন কোনো গোত্রের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে জয় লাভ করে। যোদ্ধারা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করে, যুদ্ধে শহীদ হিসাবে মৃত্যু তাদেরকে সরাসরি স্বর্গে জায়গা করে দেবে, তারা অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করে এবং দ্বিধাহীন স্বেচ্ছায় তারা নিজের জীবন উৎসর্গ করে। সুতরাং এমন ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী গোত্রদের আন্তঃগোত্র যুদ্ধ বিগ্রহে জয়ী হয়ে টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি, তারা তাদের প্রতিপক্ষ গোত্রের গবাদীপশু দখল ও তাদের নারীদের অপহরণ করে উপপত্নী বানাবে। এই ধরনের গোত্র আরো সমমনা কন্যা গোত্রের জন্ম দেবে দ্রুত উৎপাদনশীল হারে, যারা সবাই একই গোত্র দেবতার পূজা করবে। এই গোত্রের অন্য কন্যা গোত্র জন্ম দেয়ার ধারণাটি, অনেকটা কোনো মৌচাক থেকে একগুচ্ছ মৌমাছিকে ছুড়ে ফেলে দেবার মত, একেবারে অসম্ভব, নয় যদিও। নৃতাত্ত্বিক নেপোলিয়ন শ্যানন (১৫), এই ধরনের বিভিন্ন গ্রামের সংযুক্তিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গলে ইয়ানোমামো আদিবাসী নিয়ে তার গবেষণায় (১৬) ।

শ্যানন গ্রুপ সিলেকশন তত্ত্বের সমর্থক নন, আমিও না। কারণ এর বিরুদ্ধে বেশ কিছু শক্ত যুক্তি আছে। এই বিতর্কের একজন যোদ্ধা হিসাবে আমাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এটি নিয়ে আলোচনা করার সময় যেন এই বইটির মূল বিষয়ের বেশি বাইরে যেন চলে না যাই। অনেক জীববিজ্ঞানীরই সংশয় আছে 'সত্যিকারের' গ্রুপ সিলেকশন বিষয়টি নিয়ে, যা আমি আমার যুদ্ধের দেবতা পূজারী গোত্রের কাল্পনিক উদাহরণের ব্যাখ্যা করেছি এবং অন্য একটি বিষয়ের মধ্যে, যাদের তারা ভ্রান্তভাবেই গ্রুপ সিলেকশন বলছেন, অথচ ভালো করে যা লক্ষ করলেই বোঝা যাবে আসলে সেটি হয়

’কিন সিলেকশন’ কিংবা ‘রেসিপ্রোকাল আলট্রুইজম বা পারস্পরিক পরার্থবাদ (অধ্যায় ৬ এ যা ব্যাখ্যা করবো বিশেষ ভাবে)।

আমরা যারা গ্রুপ সিলেকশনকে খাটো করে দেখি তারা স্বীকার করি নীতিগতভাবে এটা হতেও পারে। তবে আসল প্রশ্নটি হচ্ছে, বিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি সেটি হতে পারে কিনা? যখন আরো নীচের স্তরের নির্বাচনে সাথে তুলনা করা হয়, যেমন যখন গ্রুপ সিলেকশনকে ব্যক্তিগত আত্মবিসর্জনের ব্যাখ্যা হিসাবে তুলনামূলক প্রস্তাব করা হয়, তখন নীচের স্তরের নির্বাচনই আরো শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। আমাদের কাল্পনিক সেই গোত্রে একজন স্বার্থপর যোদ্ধাকে কল্পনা করুন, যেখানে মূলত প্রাধান্য বিস্তার করে আছে গোত্রের জন্য শহীদ হয়ে স্বর্গীয় পুরষ্কার পেতে উৎসুক যোদ্ধারা। নিজের প্রাণ বাঁচানো প্রচেষ্টায় যুদ্ধে পেছনের দিকে সাবধানে থাকার কারণে জয়ী দলে শেষ পর্যন্ত তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খানিকটা বেশি হবে; গড়পড়তা তাদের সবার যতটুকু উপকার করার কথা, তার সহযোদ্ধাদের আত্মদান তাকেই খানিকটা বেশি উপকার করবে, কারণ সে ছাড়া বাকিরা তখন মৃত। সুতরাং মৃত সহযোদ্ধাদের তুলনায় তার প্রজনন সুযোগ ও পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি করার সম্ভাবনাও বেশি, সুতরাং এই আত্মত্যাগের প্রবণতার হারও ক্রমান্বয়ে কমে যাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মেগুলোর মধ্যে।

এটি একটি সরলীকৃত উদাহরণ, কিন্তু গ্রুপ সিলেকশন সম্বন্ধে একটি চিরন্তন সমস্যার এটি ব্যাখ্যা দিচ্ছে। ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের গ্রুপ সিলেকশন তত্ত্বটি সবসময়ই এর ভিতর থেকে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনায় থাকে; পুরো গোত্রের বিলুপ্তি বা সংযুক্তির তুলনায়, ব্যক্তিগত মৃত্যু ও প্রজনন সময়ের মাপকাঠিতে বেশ দ্রুত ঘটে: গাণিতিক মডেলও তৈরি করা যেতে পারে বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে, যেখানে গ্রুপ সিলেকশন শক্তিশালী বিবর্তনীয় চালিকা শক্তি হিসাবে দেখানো যায়। এই বিশেষ পরিস্থিতিগুলো সাধারণত প্রকৃতিতে কল্পনা করাটা খানিকটা বাস্তবতা বিবর্জিত, কিন্তু যুক্তি দেখানো যেতে পারে মানুষের গোত্রগত দলবদ্ধতায় ধর্মগুলো সেই বাস্তবতা বিবর্জিত বিশেষ পরিস্থিতিগুলো প্রতিপালন করতে পারে। এটিও একটি কৌতূহলোদ্দীপক তত্ত্ব , আমি বিষয়টি নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না, শুধু মেনে নেয়া ছাড়া যে ডারউইন নিজেই, যদিও তিনি প্রজাতির একক সদস্যর ক্ষেত্রে নির্বাচন কাজ করে এমন ধারণার দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, তিনিও গ্রুপ সিলেকশন ধারণার যতটুকু কাছে আসা সম্ভব, ততটুকুই এসেছিলেন, মানুষের গোত্র বা ট্রাইব নিয়ে আলোচনার সময়:

> যখন একই দেশে বসবাসকারী আদি মানবদের দুটি গোত্র পারস্পরিক কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসে, যদি একটি গোত্রে (অন্য সব পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকবে এমন শর্তে) বেশি সংখ্যক সাহসী, সহানুভূতিশীল এবং অনুগত বিশ্বাসী সদস্যরা থাকে, যারা সবসময় পরস্পরকে বিপদ থেকে সতর্ক ও

> সুরক্ষা করতে প্রস্তুত।তাহলে সন্দেহ নেই এই গোত্রটি সবচেয়ে সফল হবে এবং অন্য গোত্রগুলো জয় করতে সক্ষম হবে। স্বার্থপর বিবাদপ্রিয় মানুষরা একসাথে জোট বাঁধতে বা সহাবস্থান করতে পারে না, আর সহযোগিতা ছাড়া কোনো কিছুরই ফলাফল মেলে না। কোনো গোত্র যাদের সদস্যদের মধ্যে উপরে বর্ণিত সব গুণাবলী সর্বোচ্চভাবে বিদ্যমান, তারা দ্রুত আকারে সম্প্রসারিত হবে এবং অন্য সব গোত্রকে জয় করে নেবে। কিন্তু সময়ের ধারাবাহিকতায়, এই গোত্রটিও, অতীতের সকল ইতিহাস যা বলে, আরো উন্নত গুণাবলী সম্পন্ন কোনো গোত্র দ্বারা বিজিত হবে (১৭)।

জীববিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ যারা হয়তো এই বইটি পড়তে পারেন,তাদের আশ্বস্ত করার জন্য আমার উচিত হবে যোগ করা যে, ডারউইনের এই ধারণাটি পুরোপরি গ্রুপ সিলেকশন নয়, সফল গ্রুপ সিলেকশন সত্যিকার অর্থে যা বোঝায়, সফল গোত্রগুলো কন্যা গ্রুপ সৃষ্টি করবে, যাদের হার গননা করা যাবে নানা গোত্রের জনসংখ্যায়; বরং ডারউইন গোত্রগুলোকে দেখেছেন পরোপকারী পরস্পর সহযোগিতাকারী সদস্যদের বিস্তার এবং সদস্যদের সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে যাবার দৃষ্টিকোণ থেকে; ডারউইনের মডেল, ব্রিটেনে অনেকটা লাল কাঠবিড়ালীদের জায়গায় ধুসর কাঠবিড়ালীদের বিস্তারের মত: ইকোলজিক্যাল রিপ্লেসমেন্ট বা পরিবেশগত প্রতিস্থাপন, সত্যিকারের গ্রুপ সিলেকশন নয়।

অন্য কোনো কিছুর বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত হিসাবে ধর্ম

যাই হোক, আমি এখন গ্রুপ সিলেকশনকে একপাশে সরিয়ে রাখতে চাই এবং ধর্মের ডারউইনীয় সারভাইভাল ভ্যালু বা বাঁচা ও প্রজনন সফল হবার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে চাই (সারভাইভাল ভ্যালু বা উদবর্তন মূল্য হচ্ছে কোনো দক্ষতা, ক্ষমতা অথবা বৈশিষ্ট্যের গুণাবলী, যা এই গুণাবলীর ধারক ব্যক্তির টিকে থাকা, প্রজনন সফল হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়)। সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তে থাকা জীববিজ্ঞানীদের মতো আমিও ধর্মকে দেখি অন্য কোনো কিছু একটির 'বাই-প্রোডাক্ট'বা উপজাত হিসাবে। আরো সাধারণভাবে, আমি বিশ্বাস করি, ডারউইনীয় সারভাইভাল ভ্যালু সম্বন্ধে আমরা যারা ধারণা করার চেষ্টা করছি তাদের প্রয়োজন 'বাই-পোডাক্ট' এর চিন্তা করা; যখন আমরা কোনো কিছুর বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তার কি উপযোগিতা মূল্য আছে তা জানতে চাই, তখন হয়তো ভুল প্রশ্নটি করে থাকি; আমাদের আরো খানিকটা সহায়ক পন্থায় প্রশ্নটি নতুন করে লিখতে হবে। যে বৈশিষ্ট্যটি নিয়ে আমাদের বিশেষ উৎসাহ (এই ক্ষেত্রে যেমন ধর্ম), হয়তো তার সরাসরি কোনো নিজস্ব উদবর্তন মূল্য নেই (বা এমন কোনো গুণাবলী নেই যা বেঁচে থাকা ও প্রজনন সফল হবার ক্ষেত্রে ডারউইনীয় অর্থে সহায়ক হতে পারে) কিন্তু এটি এমন কিছু

একটির বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত, যার সেই উদবর্তন মূল্যটি আছে। আমার নিজের গবেষণার ক্ষেত্র, প্রাণী আচরণের একটি উদাহরণ দিয়ে এই উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট এর ধারণাটাকে ব্যাখ্যা করলে আমি মনে করি সেটি বোঝার জন্য সহায়ক হতে পারে।

মোমবাতির জ্বলন্ত শিখায় মথদের সরাসরি ঝাপিয়ে পড়তে দেখা যায় এবং ভালো করে লক্ষ করলে কিন্তু মনে হয় না এটি কোনো দুর্ঘটনা। তারা যেন অতি উদ্যোগী হয়ে নিজেদের আগুনে পুড়িয়ে আত্মাহুতি দেয়। তাদের এই অদ্ভুত আচরণকে আমরা নাম দিতে পারি ‘আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে নিজেকে আগুনে পোড়ানো’ বা ‘সেলফ ইমোলেশন’ আচরণ এবং এই রহস্যময় নামের আড়ালে আমরা বিস্মিত হই কেমন করে, প্রাকৃতিক নির্বাচন এই ধরনের একটি আচরণ বিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এখানে আমার বক্তব্য হচ্ছে, অবশ্যই আমাদেরকে নতুন করে প্রশ্নটি লিখতে হবে, এমনকি কোনো বুদ্ধিমান উত্তর খোঁজার চেষ্টা করার আগেই। এটি আত্মহত্যা নয়। আপাতদৃষ্টিতে এই আত্মহত্যা অন্য কোনো একটা কিছুর অযাচিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বা উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট। উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট, কিন্তু কার? বেশ, নীচে বর্ণিত হয়েছে এমন একটি সম্ভাবনা, যা হতে পারে, এবং বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

রাতের পৃথিবীকে কৃত্রিম আলোর আবির্ভাব বেশ সাম্প্রতিক, এর আগে রাতে আলো যা চোখে পড়তো তার উৎস ছিল প্রাকৃতিক আলো, যা আসতো চাঁদ আর নক্ষত্র থেকে , কিন্তু আলোর উৎস হিসাবে তাদের অবস্থান দৃষ্টিসীমার অসীমে বা অপটিক্যাল ইনফিনিটিতে, সুতরাং সেই উৎস থেকে আসা আলোক রশ্মিগুলো সমান্তরাল, দিক নির্দেশনার চিহ্ন হিসাবে ব্যবহার করার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি এদের উপযোগী করে তোলে। জীববিজ্ঞানীদের কাছেও বিষয়টি অজ্ঞাত নয় যে, সাধারণত পতঙ্গরা মহাকাশে অবস্থিত বস্তু যেমন সূর্য কিংবা চাঁদ থেকে আসা আলোর রশ্মি ব্যবহার করে সরাসরি পথে বা সরল রেখায় যাতায়াত করার জন্য এবং খাদ্য সন্ধানের অভিযান শেষে ঠিক সেই কম্পাসটাই তারা আবার বিপরীতমুখী পথে ঘরে ফেরার জন্য ব্যবহার করে। পতঙ্গদের স্নায়ুতন্ত্র খুব একটি সাময়িক গড়পড়তা বা ‘রুল অব থাম্ব’ নিয়ম বেধে দেয়ার জন্যে দক্ষ, যেমন: ‘এমন পথ ধরে যেতে হবে যেন আলোক রশ্মি তোমার চোখে ঠিক ৩০ ডিগ্রি কোণে আঘাত করতে পারে’; যেহেতু পতঙ্গদের চোখ হচ্ছে যৌগিক (যেখানে লম্বা সোজা টিউব বা আলোকে গাইড করার টিউব চোখের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে থাকার মত সাজানো থাকে (সজারুর গায়ের কাটাগুলোর মত), তাদের কাছে এই নিয়মের অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট একটি অংশের লাইট টিউব বা ওমাটিডিয়ামে শুধু আলোটাকে ধরে রাখার জন্য তাদের অনুশীলন করতে হয়।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে আলোর এই কম্পাসটির সফলভাবে কাজ করার বিষয়ট অপরিহার্যভাবে নির্ভর করে এই সব মহাজাগতিক আলোর উৎসগুলোর দৃষ্টিসীমার অসীমে থাকার ওপর। যদি তা না হয়, আলোর রশ্মিগুলো আর সমান্তরাল থাকে না বরং কোনো সাইকেলের চাকার স্পোকের মত চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে রশ্মিগুলো। একটি স্নায়ুতন্ত্র ৩০ ডিগ্রি কোণের (বা যে কোনো সূক্ষ্ম কোণ হতে পারে) ধরাবাঁধা নিয়ম যদি চাপিয়ে দেয়া হয় কাছাকাছি থাকা কোনো মোমবাতির আলোক উৎসের উপর, যেন সেই মোমবাতিটি হলো অসীম দৃষ্টিসীমায় থাকা চাঁদ, এটি মথকে সর্পিলকার একটা পথের দিকে চালিত করে নিয়ে যাবে, সরাসরি আগুনের শিখার দিকে; আপনার নিজের বোঝার জন্য বিষয়টি একে দেখুন, আপনিও মোমবাতির শিখা বরাবর লগারিদম নির্ভর চমৎকার একটি সর্পিলাকার ট্রাজেক্টরী বা গতিপথ পাবেন।

যদিও এই বিশেষ পরিস্থিতির জন্য এটি প্রাণঘাতী, তবে মথদের মস্তিষ্কের এই গড়পড়তা একটি ধরাবাঁধা নিয়ম কিন্তু বেশ ভালো, কারণ গড়পড়তা কোনো একটি মথের জন্য চাঁদের চেয়ে বরং মোমবাতির দেখা পাওয়াটাই বেশি দূর্লভ; আমরা কখনো খেয়াল করি না, শত শত মথ নীরবে এবং খুব কার্যকরীভাবেই চাঁদের বা কোনো উজ্জল নক্ষত্রের আলো এবং এমনকি দূর শহর থেকে আসা হালকা আলোর আভা ব্যবহার করে তাদের পথ খুঁজে নিচ্ছে রাতের অন্ধকারে। শুধু মথগুলোকে যখন আমরা মোমবাতির শিখার দিখে ঘুরে ঘুরে পড়তে দেখি এবং ভুল প্রশ্নটা করি: কেন এই মথগুলো আত্মহত্যা করছে? বরং আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত কেন তাদের এমন একটি স্নায়ুতন্ত্র আছে, যা তাদের আলোক রশ্মির সাথে নির্দিষ্ট একটি কোণে উড়তে নির্দেশ দেয়, যে কৌশলটা শুধুমাত্র আমাদের নজরে পড়বে কোথাও ভুল হলে। যখন প্রশ্নটা নতুনভাবে করা হয়, রহস্যও বাষ্পীভূত হয়ে উবে যায়। এটিকে আত্মহনন কখনোই বলা ঠিক না, এটি সাধারণত সবসময় কাজ করে এমন একটি উপযোগী কম্পাসের হঠাৎ ভুল করে ঘটে যাওয়া একটি উপজাত বা বাই-প্রোডাক্ট।

এইবার উপজাত উদাহরণটির শিক্ষা মানুষের ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন। আমরা লক্ষ করতে পারি যে বহু মানুষ, কোনো কোনো জায়গায় যা শতকরা ১০০ ভাগ, তারা এমন কিছু বিশ্বাসকে ধারণ করে, যা সরাসরি প্রমাণযোগ্য সকল বৈজ্ঞানিক সত্যকে এবং সেই সাথে অন্যদের বিশ্বাস করা ধর্মকেও অস্বীকার করে। আর এই বিশ্বাসগুলোকে লালন করে তীব্র আবেগময়তায় চরম সত্য হিসাবে মানুষ যে মেনে নেয় শুধু তাই নয়, উপরন্তু তারা এই বিশ্বাস ধারণ করার কারণে সৃষ্ট বা এর নির্দেশিত নানা ব্যয়বহুল কর্মকাণ্ডে তাদের সময় এবং কষ্টার্জিত সম্পদও ব্যয় করে।

এই বিশ্বাসের কারণে তারা মৃত্যুবরণ করে, বা এর জন্য হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না। আমরা এটি দেখে বিস্মিত বোধ করি, ঠিক যেমন অবাক হই মথদের মোমবাতির

শিখায় আত্মহননের আচরণ দেখে (সেলফ ইমোলেশন বা আত্ম-দহনের মাধ্যমে)। হতভম্ব আমরা জানতে চাই, কেন? কিন্তু এখানে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, হয়তো আমরা ভুল প্রশ্নটা করছি। ধর্মীয় আচরণ হয়েতো যা হবার কথা ছিল না এমন কোনো ‘মিসফায়ারিং’ বা অভীষ্ট পরিণতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হওয়া কোনো প্রক্রিয়া বা হয়তো কোনো অন্তর্নিহিত মানসিক প্রবণতার একটি দূর্ভাগ্যজনক উপজাত, যা অন্য কোনো পরিস্থিতিতে, কিংবা অতীতের কোনো একসময় উপযোগী ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রবণতাটি যা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ,তা হয়তো সেই অর্থে ধর্ম ছিল না; এর অন্য কিছু উপকারিতা ছিল, এবং শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে এটি ধর্মীয় আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে । শুধুমাত্র এটিকে পুনরায় নামকরণ করার মাধ্যমে আমরা ধর্মীয় আচরণকে বুঝতে পারবো ।

তাহলে, যদি ধর্ম অন্য কিছুর একটি উপজাত হয়ে থাকে, তাহলে সেই অন্য কিছুটি আসলে কি? মহাজাগতিক আলোক রশ্মির কম্পাস ব্যবহার করে দিক নির্দেশনা ও চলাফেরা করার মথদের সেই আচরণটির অপর সংস্করণটি কি? কি সেই আদিমভাবে সুবিধাজনক বৈশিষ্ট্য যা কখনো এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে উপজাত হিসেবে ভুল করে ধর্মের উদ্ভব করে? উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে আমি একটি প্রস্তাব দেবো। কিন্তু একটি বিষয়ের ওপর আমি গুরুত্বারোপ করতে চাই, সেটি হচ্ছে আমি সেই ‘ধরনের’ বিষয় বোঝাতে চাইছি এটি শুধু তার একটি উদাহরণ মাত্র। এবং আমি এর সমান্তরালে অন্যরা যা প্রস্তাব দিয়েছেন, তারও ব্যাখ্যা দেবো ক্রমান্বয়ে যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট উত্তরের চেয়ে বরং আমি সেই মূলনীতির ধারণাটিরই বেশি সমর্থন করি: প্রশ্নটাই আসলে ঠিক মতো হওয়া উচিত, প্রয়োজনে যা নতুন করে লিখতে হবে।

আমার নির্দিষ্ট হাইপোথিসিসটি শিশুদের নিয়ে। অন্য যে-কোনো প্রজাতির চেয়ে, আমরা বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মগুলোর পুঞ্জীভুত অভিজ্ঞতার উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করি। আর সেই অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের কাছে হস্তান্তরিত করা প্রয়োজন, তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য। তাত্ত্বিকভাবে শিশুরা কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে পারে, যেমন, খাড়া পাহাড়ের খুব কিনারায় না যাওয়া, আগে পরীক্ষা করে খেয়ে দেখা হয়নি এমন কোনো বুনো ফল না খাওয়া, কুমির আছে এমন পানিতে সাতার না কাটা ইত্যাদি। কিন্তু নিদেনপক্ষে এটা স্পষ্ট যে সেই শিশুদের মস্তিষ্ক একটি বিশেষ নির্বাচনী সুবিধা পাবে, যে মস্তিষ্ক একটি গড়পড়তা নিয়ম বা ‘রুল অব থাম্ব’ ধারণ করে: কোনো প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করো, তোমাদের গুরুজনরা যা বলেন, তোমাদের পিতামাতাকে মান্য করো, গোত্রের গুরুজনদের মান্য কর, বিশেষ করে যখন তারা গম্ভীর এবং ভীতি প্রদর্শন করার মত কণ্ঠ ধারণ করে, কোনো প্রশ্ন ছাড়া তোমাদের গুরুজনদের বিশ্বাস করো। কোনো শিশুর জন্য সাধারণত এটি মূল্যবান একটি নিয়ম, কিন্তু মথদের যেমন হয়, এটির ফলাফল খারাপও হতে পারে।

শৈশবে আমার স্কুলের গীর্জায় যাজকের দেয়া একটি ভয়াবহ উপদেশময় বক্তৃতা আমি কখনোই ভুলতে পারিনি; এখন ভাবলে এর ভয়াবহতাটা বোধগম্য হয়,অর্থাৎ সেটি সেই সময় আমার শিশু মস্তিষ্ক গ্রহন করে নিয়েছিল যাজক যে উদ্দেশ্যে তা বলেছিলেন সেভাবেই; তিনি আমাদের একদল সেনাদের গল্প বলেছিলেন, যারা রেলওয়ে লাইনের পাশে কুচকাওয়াজ করছিলেন, কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যখন ড্রিল সার্জেন্টের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তিনি তাদের থামবার নির্দেশটি দিতে ভুলে যান; কিন্তু সেনারা কোনো প্রশ্ন ছাড়া সেই নির্দেশ মান্য করার শিক্ষায় এমনই দীক্ষা পেয়েছিল যে তারা সরাসরি এগিয়ে আসা একটি ট্রেনের অভিমূখে তাদের কুচকাওয়াজ অব্যাহত রাখে; অবশ্যই আমি গল্পটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি না এবং আমি আশা করি ধর্মযাজক নিজেও সেটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু আমার বয়স যখন নয় আমি তা বিশ্বাস করেছিলাম, কারণ আমি এটা শুনেছিলাম একজন প্রাপ্তবয়স্ক ও আমার উপর কর্তৃত্ব আছে এমন একজন মানুষের নিকট থেকে। তিনি সেটা বিশ্বাস করুন বা না করুন, যাজক সৈন্যদের সেই ক্রীতদাসের মতো প্রশ্ন ছাড়াই কোনো কর্তৃত্বস্থানীয় কারো নির্দেশ, সেই নির্দেশ যত ভয়াবহ আর অবিশ্বাস্যই হোক না কেন, নির্দেশ মান্য করার মানসিকতাকে যেন আমরা শিশুরা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি এবং নিজেদের সেই আদলে গড়ে তুলি। আমার কথা যদি বলি, আমি মনে করি আমরা ব্যপারটা সপ্রশংস দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলাম, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে পরবর্তীতে আমার শৈশবে সেই আমিকে কোনো কৃতিত্ব দিতে পারিনি, যে কিনা ভেবেছিল ট্রেনের নীচে অবধারিত মৃত্যু জেনে কুচকাওয়াজ অব্যাহত রাখার মত সেই সাহস আছে কিনা । কিন্তু যা-ই হোক, এভাবেই আমার সেই অনুভূতিটাকে মনে পড়ে। যাজকের সেই বক্তৃতা অবশ্যই আমার মনে গভীর একটি দাগ কেটেছিল, কারণ আমি এখনও সেটি স্মরণ করতে পারি, এবং এখানে প্রকাশ করার মাধ্যমে আপনাদের সাথে সেটা ভাগ করে নিয়েছি।

নিরপেক্ষভাবে যদি ভাবি, আমার মনে হয় না যাজক আদৌ মনে করেছেন যে তিনি আমাদের কোনো ধর্মীয় উপদেশ বিতরণ করছেন, ধর্মীয় কোনো বিষয়ের তুলনায়, এটি মূলত সামরিক, টেনিসনের (১৮) বিখ্যাত 'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেডের' মূলসুরে, সম্ভবত যার উদ্ধৃতি তিনি দিয়েছিলেন (১৯)।

Forward the Light Brigade!
Was there a man dismayed?
Not though the soldiers knew
Some one had blundered:
Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,

Theirs but to do and die:
Into the valley of Death
Rode the six hundred.

সামরিক কোনো হাই কমান্ডের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যপারটাকে চূড়ান্ত পাগলামি মনে হতে পারে যে, প্রতিটি সৈনিক কোন নির্দেশ মানবে কি মানবে না, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার নেয়ার অনুমতি তাদের উপর ন্যস্ত করা। যে জাতির পদাতিক সৈন্যরা তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কাজ করে, অনুমতি না মেনেই যুদ্ধে যায়, সাধারণত তাদের পরাজয় ঘটে। সুতরাং কোনো জাতির দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি সরল সহজ গড়পড়তা নিয়ম হিসাবে উপযোগী এমনকি যদিও কখনো কখনো এটি ব্যক্তিগত ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণ হতে পারে। সৈন্যরা এমনভাবে প্রশিক্ষিত হয় যেন তারা যতটা সম্ভব অটোমাটা বা কম্পিউটারের মত হয়।

কম্পিউটারকে যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা সেটা করে। তারা ক্রীতদাসের মত যে-কোনো নির্দেশ মান্য করে তাদের নিজস্ব প্রোগ্রামিং-এর ভাষায়। এভাবেই তারা নানা উপযোগী কাজ করতে পারে যেমন, ওয়ার্ড প্রসেসিং বা স্প্রেডশিটের নানা গণনা। কিন্তু, এরই একটি অবশ্যম্ভাবী উপজাত হিসাবে, তারা পুরোপুরি রোবটের মতোই আচরণ করে কোনো বাজে নির্দেশ মান্য করার ক্ষেত্রে। তাদের কোনোভাবেই বলার কোনো উপায় নেই, কোন নির্দেশের কি ফলাফল হতে পারে, খারাপ কিংবা ভালো। তাদের কাজ শুধমাত্র সেই নির্দেশগুলো মেনে চলে, সৈনিকরা যেমন করতে বাধ্য। তাদের এই শর্তহীন আনুগত্য কম্পিউটারকে যেমন পরিণত করেছে একটি উপযোগী যন্ত্র হিসাবে আবার সেই ঠিক একই জিনিস তাদের নিশ্চিতভাবে অবশ্যই কোনো সফটওয়্যার ভাইরাস বা ওয়ার্ম কোডের আক্রমণের শিকারেও পরিণত করে; কোনো খারাপ উদ্দেশ্যে লেখা একটি প্রোগাম যে বলে, ‘আমাকে কপি করে, এবং হার্ড ডিস্কে তুমি যে কয়টা ঠিকানা পাও, সব ঠিকানায় আমাকে পাঠাও’, কম্পিউটারের পক্ষে সেটি অমান্য করা অসম্ভব, আর এই অনুগতভাবে নির্দেশ মানার ঘটনাটি ঘটবে প্রতিটি কম্পিউটারেই, যারা সেই নির্দেশ পেয়েছে, খুবই কঠিন একটি কাজ হবে। হয়তো এমন কোনো কম্পিউটার পরিকল্পনা করা অসম্ভব, যা নির্দেশ অনুসরণে অনুগত, আবার একই সাথে ভাইরাসের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত।

বিষয়টিকে সহজভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমি যদি সফল হয়ে থাকি, তাহলে আপনি হয়তো ইতোমধ্যেই শিশুর মস্তিষ্ক ও ধর্ম নিয়ে আমার যুক্তিটি সমাপ্ত করে ফেলেছেন; প্রাকৃতিক নির্বাচন শিশুর মস্তিষ্ককে এমন করে গড়ে তোলে যে, তারা তাদের পিতামাতা বা গোত্রের গুরুজনরা যা বলেন বা নির্দেশনা দেন, সেটি পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করে। এই ধরনের বিশ্বাস নিষ্ঠ আনুগত্য বেঁচে থাকার জন্য খুবই মূল্যবান: চাঁদের আলোক

রশ্মির সহায়তায় মথদের পথ চলার মত। কিন্তু বিশ্বাস নিষ্ঠ আনুগত্যের অপর পিঠ হচ্ছে অতিমাত্রায় নির্বিচারে বিশ্বাস করার দাস সুলভ প্রবণতা। এর একটি অবশ্যম্ভাবী উপজাত হলো মনের ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রবণতা। ডারউইনীয় সারভাইভাল বা টিকে থাকার সাথে খুবই সঙ্গত কারণে সংশ্লিষ্ট, কোনো শিশুর মস্তিষ্কের প্রয়োজন আছে তার বাবা-মাকে এবং বাবা-মার নির্দেশিত গুরুজনদের বিশ্বাস করা। এর একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে যে বিশ্বাসকারীর ভালো একটি উপদেশ থেকে খারাপ কোনো উপদেশকে পৃথক করার কোনো উপায়ই জানা নেই; শিশুদের জানার উপায় নেই, 'কুমির ভরা লিম্পোপো নদীতে সাতার কাটবে না' হচ্ছে একটি ভালো উপদেশ, কিন্তু 'তোমাকে একটা ছাগল কোরবানি দিতে হবে পূর্ণিমার দিনে, নয়তো বৃষ্টি হবে না', এই উপদেশটি বড় জোর সময় আর ছাগলের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। শিশুর মনে এই নির্দেশ একই রকম বিশ্বাসযোগ্য লাগবে শুনতে। দুটোই এসেছে ভক্তি করা হয় এমন একটি উৎস থেকে এবং তাদের যে ভাবগম্ভীর আন্তরিকতার সাথে প্রদান করা হয় হয়, তা অনায়াসে যেমন সমীহ জাগায় তেমনি এর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যও দাবী করে। এবং ঠিক একই ঘটনা ঘটে এই পৃথিবী সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণার ক্ষেত্রেও, যেমন, মহাবিশ্ব বিষয়ে, নৈতিকতা প্রসঙ্গে এবং মানুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে; এবং খুব সম্ভবত, যখন শিশুটি বড় হয় এবং তাদের নিজেরও সন্তান হয়, খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সেও তার পরবর্তী প্রজন্মকে, সেই একই সংক্রমণযোগ্য ভাবগম্ভীর আচরণ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক অর্থহীন এবং অর্থবহ জ্ঞান হস্তান্তর করে।

এই মডেলে আমাদের প্রত্যাশা করা উচিত যে, বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে, বিভিন্ন কাল্পনিক বিশ্বাসগুলো, যাদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, সেগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হবে। বহু প্রজন্মের উপযোগী ঐতিহ্যগত কোনো জ্ঞানের মতো একই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে, যেমন, ফসলের জন্য সার উপকারি এমন বিশ্বাসটি। আমাদের আরো প্রত্যাশা করা উচিত, কুসংস্কার এবং অবাস্তব বিশ্বাসগুলো স্থানীয়ভাবে বিবর্তিত হবে, কয়েক প্রজন্মের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তিত হবে - হয় লক্ষ্যহীন কোনো দিকে পরিবর্তনের (বা ড্রিফট) মাধ্যমে নয়তো ডারউইনীয় নির্বাচনের সমরূপী কোনো প্রক্রিয়ায় - যা কোনো এক সময় এর মূল উৎস থেকে উল্লেখযোগ্য রকমের ভিন্নতা প্রদর্শন করবে (কয়েক মুহূর্ত পরে এই বিষয়ে আমি আবার আলোচনায় ফিরে আসবো); সম্ভবত ভিত্তিহীন কাল্পনিক বিশ্বাস এবং নানা নিষেধাজ্ঞাগুলোর ক্ষেত্রেও একই ভাবে বিষয়টা সত্য, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়েছে সেই বিশ্বাসগুলো, শিশু মস্তিষ্কের সহজে 'প্রোগামিং' (বা দীক্ষার দ্বারা প্রভাবিত) করার ক্ষমতা যাদের একটা ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

আর ধর্মীয় নেতারা কিন্তু খুব ভালো করেই শিশু মস্তিষ্কের এই প্রবণতার কথা জানেন, আর একারণে শৈশবেই দীক্ষা দেবার তাগিদটা তারা এত গুরুত্বের সাথে প্রচার করে

থাকেন। জেসুইটদের গর্বিত উদ্ধৃতি, ‘জীবনের প্রথম সাত বছরে কোনো শিশুকে আমার কাছে দাও, আমি তোমাকে একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ হিসাবে ফেরত দেব’- কিন্তু বহু ব্যবহারে এর সত্যতা (বা ভয়াবহতা) হারায়নি। আধুনিক সময়ে যেমন, জেমস ডবসন, কুখ্যাত ‘ফোকাস অন দ্য ফ্যামিলি মুভমেন্টের’ (২০) প্রতিষ্ঠাতা, খুব ভালো করে এই মূলনীতির সাথে পরিচিত: ‘তরুণদের কি হয়তো শেখানো হবে, বা তারা কি ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হবে-কি তারা দেখবে, চিন্তা করবে ও বিশ্বাস করবে, এই সব কিছু যারা নিয়ন্ত্রণ করেন, তারাই জাতির ভবিষ্যতের পথ নির্দেশ করেন (২১)।’

কিন্তু মনে রাখবেন, শিশুর উপকারি বিশ্বাসপ্রবণ মন সম্বন্ধে আমার এই বিশেষ প্রস্তাব শুধু একটি উদাহরণ সেই সব কিছুর যা কিনা চাঁদের বা তারার আলোক রশ্মির সাহায্যে মথদের পথ খুঁজে চলা প্রক্রিয়ার সমতূল্য বা সমরূপ কোনো একটি প্রক্রিয়া হতে পারে। প্রাণীদের আচরণ বিশেষজ্ঞ বা ইথোলজিষ্ট রবার্ট হিন্ড (২২) তার ‘হোয়াই গড পারসিস্ট’ (২৩) বইয়ে এবং নৃতত্ত্ববিদ পাসকাল বয়ের (২৪) তার ‘রেলিজিয়ন এক্সপ্লেইনড’ (২৫) ও স্কট আটরান (২৬) ‘ইন গড উই ট্রাষ্ট’ (২৭) বইয়ে স্বতন্ত্রভাবে যে সাধারণ ধারণাটি প্রস্তাব করেছেন তাহলো, ধর্ম হচ্ছে স্বাভাবিক মনোবৈজ্ঞানিক বা মনোস্তাত্ত্বিক কাঠামোর একটি বাই-প্রোডাক্ট বা উপজাত - আমার বরং বলা উচিত ‘অনেকগুলো’ উপজাত, কারণ নৃতাত্ত্বিকরা বিশ্বব্যাপী ধর্মের বৈচিত্র্যটি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে এদের পারস্পরিক সদৃশ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে বিশেষভাবে ব্যস্ত। নৃতাত্ত্বিকদের বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও আবিষ্কার বিস্ময়কর আর অদ্ভুত মনে হয়, কারণ আমাদের কাছে সেগুলো অপরিচিত। প্রতিটি ধর্মীয় বিশ্বাস, যারা কিনা সেই বিশ্বাসের পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত হননি, তাদের কাছে অদ্ভুতই মনে হবে। বয়ের ক্যামেরুনের ফাঙ (Fang) নৃগোষ্ঠীর মধ্যে বেশ কিছু গবেষণা করেছিলেন, যারা বিশ্বাস করে:

> ‘ডাইনীদের শরীরে একটির বাড়তি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ থাকে, যা রাতের বেলায় উড়ে গিয়ে অন্য মানুষের ফসল নষ্ট করে, বা তাদের রক্ত বিষাক্ত করে। এবং তারা এটাও মনে করে, কখনো কখনো এই ডাইনীরা একত্র হয়ে বিশাল ভোজসভার আয়োজন করে, সেখানে তারা তাদের শিকারদের খায় এবং ভবিষ্যৎ আক্রমণের পরিকল্পনা করে। অনেকেই আপনাকে বলবে, যে তার কোনো বন্ধুর বন্ধু, সত্যি সত্যি গ্রামের উপর দিয়ে কলাপাতার ওপর ডাইনীদের উড়ে যেতে দেখেছে বা তারা অতর্কিতে জাদুর তীর ছুড়ে তাদের শিকারদের ঘায়েল করছে’।

বয়ের তার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতা এর সাথে যোগ করেন:

‘কেমব্রিজ কলেজে এক নৈশভোজের সময় আমি এইসব এবং আরো কিছু বিচিত্র চমকপ্রদ কাহিনী বলছিলাম, তখন একজন অতিথি, কেমব্রিজের প্রখ্যাত একজন ধর্মতাত্ত্বিক, আমার দিকে ঘুরে তাকান এবং মন্তব্য করেন: ‘এই কারণে নৃতত্ত্ব এত বিস্ময়কর, এবং কঠিন। কারণ আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হয়, কিভাবে মানুষ এই সব আজগুবি জিনিস বিশ্বাস করতে পারে’। কিছুক্ষণের জন্য মন্তব্যটি আমাকে হতবাক করে দিয়েছিল, কেটলি কিংবা চায়ের পট সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কোনো প্রত্যুত্তর খুঁজে পাবার আগে কথপোকথনটি ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছিল’।

কেমব্রিজ এই ধর্মতাত্ত্বিক মূলধারার একজন খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাসী হবেন এমন ধারণা করে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, তিনি সম্ভবত নিম্নে উল্লেখিত এক বা একাধিক এমন কিছু বিষয়ে বিশ্বাস করেন:

- আমাদের পূর্বপুরুষদের সেই প্রাচীন সময়ে, একজন পুরুষ, যিনি জন্মগ্রহন করেছিলেন একজন কুমারী মায়ের গর্ভে, যেখানে তার জন্মের জন্য কোনো মানব (জৈববৈজ্ঞানিক) পিতার ভূমিকাই ছিল না।

- সেই একই পিতৃহীন পুরুষ ব্যক্তিটি ল্যাজারাস নামক তার একজন বন্ধুকে আহবান করেছিলেন, যিনি পচন ধরে যাবার মত সময়কাল ধরে মৃত ছিলেন এবং তার সেই আহবান শুনে ল্যাজারাস দ্রুত জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন।

- পিতৃহীন এই পুরুষ মানুষটি নিজেও মৃতাবস্থা এবং কবর দেবার পর তৃতীয় দিনে জীবিত স্বশরীরে ফিরে আসেন।

- এবং এর চল্লিশ দিন পর এই পিতৃহীন মানুষটি নিজেই একটি পাহাড়ের চুড়ায় আরোহন করেন এবং স্বশরীরে তিনি আকাশে অদৃশ্য হয়ে যান।

- যদি কোনো চিন্তা আপনি নিজের মনে ব্যক্তিগতভাবে ফিসফিস করে উচ্চারণ করেন, পিতৃহীন ব্যক্তিটি এবং তার পিতা (তিনি নিজেও সেই জন) আপনার সেই চিন্তা শুনতে পান, এবং যদি তিনি চান সে বিষয়ে কিছু পদক্ষেপও নিতে পারেন। এছাড়াও তিনি একই সাথে সারা পৃথিবীর অন্য সবাই কি চিন্তা করছেন সেটাও শুনতে পান।

- আপনি খারাপ যদি কিছু করে থাকেন, বা ভালো কিছু, সেই একই পিতৃহীন পুরুষ সবই দেখতে পাবেন,এমনকি যখন আর কেউই সেটা না দেখতে পান না। আপনার কর্মানুযায়ী আপনি হয়তো পুরষ্কার কিংবা শাস্তি পেতে পারেন, বর্তমানে এবং আপনার মৃত্যুর পরে।

- পিতৃহীন এই পুরুষটির কুমারী মা কখনো মৃত্যুবরণ করেননি, তিনিও স্বশরীরে স্বর্গে 'আরোহণ' করেছিলেন।

- রুটি এবং মদ, যদি কোনো যাজক দ্বারা আর্শীবাদপুষ্ট হয় (যার অবশ্যই অণ্ডকোষ থাকতে হবে), সেগুলো তাহলে সেই পিতৃহীন পুরুষ মানুষটির 'শরীর এবং রক্তে' পরিণত হয়।

এবার ভাবুন, কেমব্রিজে ফিল্ডওয়ার্কের সময় যদি কোনো একজন নৈর্ব্যক্তিক নৃতাত্ত্বিক এই ধরনের বিশ্বাসের মুখোমুখি হন, তাহলে তিনি এর কি ব্যাখ্যা দেবেন?

ধর্মবিশ্বাসী হবার জন্য মনস্তাত্তিক পূর্বপ্রস্তুতি

মনোস্তাত্ত্বিক উপজাতের ধারণাটি খুব স্বাভাবিকভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান বিবর্তন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিকশিত হয়েছে। বিবর্তন মনোবিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেন, চোখ যেমন দেখার জন্য বিবর্তিত একটি অঙ্গ, ডানা যেমন উড়ার জন্য বিবর্তিত একটি অঙ্গ, আমাদের মস্তিষ্ক একটি গুচ্ছ প্রত্যঙ্গের (বা মডিউল, অর্থাৎ অংশ) একটি সমষ্টি, যাদের মূল কাজ হচ্ছে বিশেষায়িত তথ্য ও উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ। সেখানে একটি মডিউল আছে, যা আত্মীয়তা (কিনশিপ) সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে, একটি মডিউলের কাজ যেমন পারস্পরিক বিনিময় (রেসিপ্রোকাল এক্সচেঞ্জ), একটি মডিউলের কাজ সহমর্মিতা (এমপ্যাথি) নিয়ে এবং এভাবে আরো বেশ কিছু মডিউলের সমন্বয়। এবং ধর্মকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, এই ধরনের একাধিক মডিউলের 'মিসফায়ারিং' (বা যে কাজটি এর মূল উদ্দেশ্য নয়) কারণে সৃষ্ট উপজাত (বা বাই-প্রোডাক্ট) ফলাফল হিসাবে। যেমন, 'থিওরি অব আদার মাইন্ড' (বা মানসিক অবস্থা আরোপ করার ক্ষমতা, যেমন বিশ্বাস, উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, ভান করা বা জ্ঞান ইত্যাদি, নিজের উপর কিংবা অন্যদের এবং বুঝতে পারার ক্ষমতা যে, অন্যদেরও বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা কিংবা উদ্দেশ্য কারো নিজের থেকে ভিন্ন হতে পারে) তৈরির মডিউল, সহযোগী জোট তৈরি করার জন্য মডিউল, আগন্তুকদের তুলনায় স্বগোত্রীয়দের সহযোগিতা করার পক্ষপাতমূলক আচরণের মডিউল। এর যে কোনোটি মথদের নক্ষত্র কিংবা চাঁদের আলো ব্যবহার করে দিক নির্দেশনা দেবার মানবীয় একটি সংস্করণ হতে পারে, যার ভুল করে ভিন্ন পরিণতি সৃষ্টি করার (মিসফায়ারিং) স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে, শৈশবের অতি বিশ্বাসপ্রবণতার ক্ষেত্রে আমি যেভাবে এর ব্যাখ্যা দিয়েছি। মনোবিজ্ঞানী পল ব্লুম (২৭) উপজাত হিসাবে ধর্মের উৎপত্তি সংক্রান্ত ধারণার আরো একজন প্রস্তাবক, এই বিষয়টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হলো, মনের 'দ্বৈততা' (বা ডুয়ালিস্টিক) তত্ত্বের প্রতি শিশুদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। ধর্ম তার মতে, এই সহজাত দ্বৈততার একটি উপজাত। তার প্রস্তাব অনুযায়ী আমরা মানুষরা, বিশেষ করে শিশুরা, জন্মগতভাবেই দ্বৈতবাদী (২৮)।

একজন দ্বৈতবাদী মন এবং বস্তুর মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করে নেন। মোনিষ্ট বা অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, মন হচ্ছে পদার্থ, এটি মস্তিষ্কের অংশ, বা হয়তো বা একটি কম্পিউটারের কোনো অংশ বা একটি প্রকাশ এবং বস্তু থেকে এর পৃথক কোনো অস্তিত্ব নেই। দ্বৈতবাদীরা বিশ্বাস করেন, মন হচ্ছে এক ধরনের শরীর বিচ্ছিন্ন কোনো আত্মা যা শরীরের মধ্যে বসবাস করে, এবং সুতরাং বোধগম্য কারণে এটি শরীরকে ত্যাগ করতে পারে, এবং অন্য কোথাও থাকতে পারে। দ্বৈতবাদীরা মানসিক অসুখকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করে, 'অশুভ শয়তানের দ্বারা আচ্ছন্ন' হওয়া একটি পরিস্থিতি হিসাবে। এই শয়তানগুলো যেহেতু 'আত্মা', শরীরে তাই তাদের অবস্থান সাময়িক, এবং সেই কারণে তাদের শরীর থেকে 'বিতাড়িত' করাও সম্ভব। দ্বৈতবাদীরা সুযোগ পেলেই প্রাণহীন যে কোনো ভৌত বস্তুকে 'পারসোনিফাই' বা সেটির উপর ব্যক্তিরূপ বৈশিষ্ট্য আরোপ করেন, তারা জলপ্রপাত কিংবা মেঘে আত্মা এবং দানবের উপস্থিতিও দেখতে পান।

এফ. আনসেটের (২৯) ১৮৮২ সালের 'ভাইস ভার্সা' (৩০) উপন্যাসটি যে-কোনো দ্বৈতবাদীর কাছেই অর্থবহ মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয়টি আমার মত খাঁটি অদৈত্ববাদী কারো কাছে অবোধ্য হওয়া উচিত। এই উপন্যাসে জনাব বাল্টিটুড (৩১) এবং তার পুত্র, দুজনই একদিন রহস্যজনকভাবে লক্ষ করেন, তাদের শরীরের অদল বদল ঘটেছে। পুত্রের বিশেষ আনন্দ যেহেতু, বাবাকে পুত্রের শরীরে স্কুলে যেতে হচ্ছে এবং অন্যদিকে পুত্র বাবা শরীরের তার অপরিপক্ক সিদ্ধান্তের জন্য বাবার ব্যবসাকে প্রায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। পি. জি. উডহাউসের (৩২) 'লাফিং গ্যাস' (৩৩) উপন্যাসটি প্রায় একই ধরনের একটি কাহিনীসূত্র ব্যবহার করেছে, যেখানে একটি দন্তচিকিৎসকের চেম্বারে হ্যাভারশটের আর্ল এবং একজন শিশু চলচ্চিত্র তারকা পাশাপাশি একই সাথে চেতনানাশক ঔষধ পান, এবং পরবর্তীতে শরীরে তাদের ঘুম ভাঙ্গে পরস্পরের সাথে বিনিময় হওয়া শরীরে। আবারো এই গল্পের কাহিনীসূত্র অর্থবহ হতে পারে শুধু দ্বৈতবাদীদের কাছে, লর্ড হ্যাভারশটের এমন কিছু আছে যা তার শরীরের অংশ নয়, নতুবা কি করে তিনি শিশু অভিনেতা শরীরে জেগে উঠতে পারেন?

অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতোই আমি দ্বৈতবাদী নই, কিন্তু তাসত্ত্বেও 'ভাইস ভার্সা' এবং 'লাফিং গ্যাস' বইগুলোর মজা আমি সহজেই উপভোগ করতে পারি। এ বিষয়ে পল ব্লুম যা বলবেন তা হলো, যদিও আমি বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরে অদ্বৈতবাদী হতে শিখেছি, তবে যেহেতু আমি একজন মানুষ নামক প্রাণী, সেই কারণ আমি সহজাতভাবেই দ্বৈতবাদী হিসাবে বিবর্তিত হয়েছি। আমার চোখের পেছনে একটা 'আমি' যে ঘাপটি মেরে বসে আছে এবং অন্ততপক্ষে যে কিনা গল্পে আরেকজনের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে - এই ধারণাটি আমার এবং অন্য যে-কোনো মানব মস্তিষ্কের অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে

আছে, অদ্বৈতবাদের প্রতি আমাদের বৌদ্ধিক যে অবস্থানই থাকুক না কেন, ব্লুম তার এই দাবীর সপক্ষে বেশ কিছু পরীক্ষামূলক প্রমাণও প্রস্তাব করেন, তিনি দেখান যে, শিশুরা প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় আরো বেশি দ্বৈতবাদী, বিশেষ করে খুবই অল্প বয়সের শিশুরা। এটাই ইঙ্গিত করে, আমাদের মস্তিষ্কের অন্তর্গত সহজাত একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দ্বৈতবাদের এর পূর্বাপস্থিতি বজায় রাখার একটি প্রবণতা আছে, এবং ব্লুমের মতে আমাদের ধর্মীয় ধারণাকে সাদরে গ্রহন করার জন্য এটি স্বাভাবিক একটি পরিস্থিতি ও প্রাক-প্রস্তুতিমূলক একটি অবস্থা সৃষ্টি করে রাখে।

ব্লুম আরো প্রস্তাব করেন যে, জন্মগতভাবেই আমাদের সৃষ্টিতত্ত্ববাদী হবার প্রবণতা থাকে। আমাদের কাছে প্রাকৃতিক নির্বাচন সহজাতভাবেই অর্থবহ হয় না; শিশুরা, বিশেষ করে সবকিছুর উপরে কারণ বা উদ্দেশ্য আরোপ করে, যা মনোবিজ্ঞানী ডেবোরাহ কেলেমান (৩৪) তার “আর চিল্ডরেন ইনটুইটিভ থেইস্ট’? প্রবন্ধটিতে আমাদের জানিয়েছেন; ‘বৃষ্টির’ জন্য মেঘ বলে কিছু আছে, পাথরের সুঁচালো কোণ থাকে কারণ ‘কোনো জন্তুর যখন গা চুলকায় তারা সেখানে গা ঘষে চুলকিয়ে নিতে পারে’। সবকিছুর পেছনে এভাবে কোনো উদ্দেশ্য আরোপ করাকে বলে টেলিওলজী বা পরমকারণবাদ। শিশুরা জন্মগতভাবেই টেলিওলজিষ্ট বা পরমকারণবাদী এবং অনেকেই এর থেকে আর কখনো বের হতে পারে না।

এই পুর্বেই উপস্থিত দ্বৈতবাদ এবং পরমকারণবাদ উপযুক্ত শর্তাবলীর উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হবার প্রবণতা সৃষ্টি করে, ঠিক যেমন করে আমার ইতোপূর্বে দেয়া উদাহরণ, মথদের আলোক-কম্পাসের প্রতি প্রতিক্রিয়া যেমন তাদের ভুল অনিচ্ছাকৃত তথাকথিত ‘আত্মহত্যা’ করার প্রবণতা বৃদ্ধি করে। আমাদের সহজাত দ্বৈতবাদ আমাদেরকে ‘আত্মা’ বিষয়ক ধারণায় বিশ্বাস করতে প্ররোচিত করে, যা শরীরের প্রত্যক্ষ অংশ হবার বদলে আমাদের ভিতরে পৃথক সত্তা বজায় রেখে বসবাস করে। এই ধরনের শরীর বিচ্ছিন্ন আত্মাকে নিয়ে খুব সহজেই কিন্তু ভাবা যায়। আমাদের মৃত্যুর পর এটি অন্য কোথায় চলে যায়। এছাড়া জটিল কোনো বস্তুর বিকশিত কোনো বৈশিষ্ট্য হিসাবে নয়, বরং বস্তু থেকে স্বাধীন হিসাবে আমরা খুব সহজে ‘বিশুদ্ধ আত্মা’ হিসাবে ঈশ্বরকে বা দেব-দেবীদের কল্পনা করতে পারি, এবং আরো স্পষ্টভাবে, শিশুসুলভ টেলিওলজি বা পরমকারণবাদ ধর্মের জন্য আমাদের প্রস্তুত করে। যদি সবকিছুরই কোনো কারণ বা উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে সেগুলো কার উদ্দেশ্য? অবশ্যই ঈশ্বরের।

কিন্তু মথদের আলোক-কম্পাসের যে ‘উপযোগিতা’ এখানে তার সমতূল্য কি? তাহলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কেন দ্বৈতবাদ এবং পরমকারণবাদকে আমাদের পূর্বপুরুষ ও তাদের সন্তানদের মস্তিষ্কে টিকে থাকার সুবিধা দিয়েছে? আপাতত, ‘জন্মগত দ্বৈতবাদী’ তত্ত্ব

সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যা প্রস্তাব করছে যে, মানুষ জন্মগতভাবেই দ্বৈতবাদী ও পরমকারণবাদী। বেশ, কিন্তু এর ডারউইনীয় সুবিধাটি কি হতে পারে? আমাদের চারপাশের জগতে উপস্থিত নানা সত্তার আচরণ সম্বন্ধে পূর্ব ধারণা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা হয়তো প্রত্যাশা করতে পারি, প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের মস্তিষ্কের গঠনটিকে এই কাজটি দ্রুত ও দক্ষতার সাথে করার জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলেছে। দ্বৈতবাদ আর পরমকারণবাদ কি আমাদের এই ক্ষমতায় কোনো সহায়তা করে? এই হাইপোথিসিসটাকে দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেটের বিবরণ থেকে হয়তো আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারি। 'ইনটেনশনাল স্ট্যান্স' বা উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির (বুদ্ধিবৃদ্ধিজাত যে দৃষ্টিভঙ্গি) আলোকে তিনি এটি বর্ণনা করেছেন।

ডেনেট 'স্ট্যান্স' বা দৃষ্টিভঙ্গির ত্রিমুখী শ্রেণীবিভাগের একটি বোধগম্য প্রস্তাব করেছেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা অবলম্বন করি বোঝার প্রচেষ্টায়, এবং সেই কারণে নানা সত্তার আচরণ সম্বন্ধে পূর্বধারণা করতে পারি, যেমন কোনো প্রাণী বা যন্ত্র বা একে অন্যের এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো হচ্ছে, ভৌত দৃষ্টিভঙ্গি বা ফিজিক্যাল স্ট্যান্স, পরিকল্পনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা ডিজাইন স্ট্যান্স এবং উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা ইনটেনশনাল স্ট্যান্স। 'ফিজিক্যাল স্ট্যান্স' সবসময় নীতি মেনে কাজ করে, কারণ সবকিছুই পদার্থবিদ্যার সূত্র মেনে চলে। কিন্তু এই ভৌত দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করার পক্রিয়া বেশ মন্থর গতির হতে পারে। যতক্ষণে আমরা কোনো জটিল একটি বস্তুর চলমান নানা অংশগুলোর মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করে শেষ করবো, ততক্ষণে এর আচরণ সংক্রান্ত কোনো পূর্বধারণা করা সম্ভবত আমাদের জন্য বেশ দেরী হয়ে যাবে। কোনো একটি বস্তু যা আসলেই পরিকল্পনা করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন ওয়াশিং মেশিন বা একটি ক্রসবো, 'ডিজাইন স্ট্যান্স' সেখানে একটি মিতব্যায়ী সংক্ষিপ্ততর উপায় হতে পারে। আমরা পদার্থবিদ্যার ব্যাখ্যা একপাশে সরিয়ে রেখে কিন্তু অনুমান করতে পারে বস্তুটির আচরণ কি হতে পারে, সরাসরি এর ডিজাইন বা পরিকল্পনার দিকে নজর দিয়ে। যেমন ডেনেট বলেছেন (৩৫):

> বাইরের দিক একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে একটি অ্যালার্ম ঘড়ি কখন শব্দ করবে প্রায় যে কেউই তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবেন। এটি কি স্প্রিং প্যাচানো, নাকি ব্যাটারী চালিত, নাকি সূর্যালোক ব্যবহার করে, তামার চাকা, নাকি রত্নের বিয়ারিং বা সিলিকন চিপস দিয়ে তৈরি ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে কারো এত মাথাব্যাথা নেই - শুধু ধারণা করে নেয়া যায়, এমনভাবে এটি ডিজাইন করা যে, ঠিক তখনই অ্যালার্মের শব্দ বাজবে ঠিক যখন বাজবার জন্য এটির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

জীবিত প্রাণীরা ডিজাইন বা পরিকল্পিত নয়, কিন্তু ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গির একটি সংস্করণকে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে এখানে অনুমতি দেয়। এভাবেই আমরা আমাদের হৃৎপিণ্ডকে বোঝার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত উপায় খুঁজে পাই, যদি আমরা ধরে নেই রক্তকে পাম্প করার জন্যই এটিকে ডিজাইন করা হয়েছে। কার্ল ভন ফ্রিশ (৩৬) মৌমাছিদের 'কালার ভিশন' বা রং দেখতে পারার ক্ষমতা নিয়ে একটি গবেষণার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (বিশেষ করে যখন মূলত সবার ধারণা ছিল মৌমাছিরা রঙ দেখতে পারে না বা তারা 'কালার ব্লাইন্ড') কারণ তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মৌমাছিদের আকর্ষণ করার জন্য ফুলদের উজ্জ্বল রং আসলে 'পরিকল্পিত' হয়েছে। পরিকল্পিত বা ডিজাইন শব্দটিকে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে আবদ্ধ করার উদ্দেশ্য মিথ্যাচারী সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের খানিকটা ভয় দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা, নয়তো তারা হয়তো দাবী করে বসবেন যে, অষ্ট্রিয়ার এই বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী তাদের মতোই একজন সৃষ্টিতত্ত্ববাদী ছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গিটাকে সঠিক ডারউইনীয় ভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবেই দক্ষ ছিলেন।

'ইনটেশনাল স্ট্যান্স' বা উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে আরেকটি 'শর্টকাট' এবং এটি ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরো এক ধাপ উপরে: কোনো সত্তাকে ধরে নেয়া হয় - শুধু বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যেই তাদের ডিজাইন করা হয়নি, উপরন্তু এরা হচ্ছে 'এজেন্ট' বা কোনো 'এজেন্ট' ধারণ করে, তাদের সব কর্ম উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করার লক্ষ্যে। আপনি যখন কোনো বাঘকে দেখেন, তার সম্ভাব্য আচরণ সম্বন্ধে অনুমান করতে আপনার তখন দেরি করা উচিত হবে না। এর অণু পরমাণুর পদার্থবিদ্যা নিয়ে বা এর পা, নোখ, দাঁতের আকৃতির ডিজাইন সম্বন্ধে তখন আর কোনো চিন্তার অবকাশ নেই। বাঘ আপনাকে খেতে চাইছে,এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে এটি তার পা, নোখ এবং দাঁত অত্যন্ত দক্ষতা আর সাবলীলতার সাথে ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং সবচেয়ে দ্রুত এর সম্ভাব্য আচরণ অনুমান করার একমাত্র উপায় হল, পদার্থবিদ্যা আর শরীরবৃত্তীয় নানা খুঁটিনাটি সব ভুলে গিয়ে এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দ্রুত ধারণা করে নেয়া। লক্ষ করতে হবে, ডিজাইন দৃষ্টিভঙ্গি ডিজাইন করা এমন কিছুর ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি ডিজাইন করা নয় এমন কিছুর ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং, এই উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সচেতন উদ্দেশ্যপূর্ণ কিছুর ক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহৃত হয়, একই ভাবে যাদের সুনির্দিষ্ট সচেতন কোনো উদ্দেশ্য নেই এমন সব জিনিসের ক্ষেত্রেও সেটি কাজ করে।

আমার মনে হয় এটি খুবই সম্ভাব্য একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, বেঁচে থাকার জন্য এই ইনটেনশনাল বা উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির একটা গুরুত্ব আছে, যা মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া হিসাবে সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়াটি দ্রুততর করে যে-কোনো বিপজ্জনক এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পরিস্থিতিতে। সহজেই কিন্তু স্পষ্ট হয়না যে দ্বৈতবাদ উদ্দেশ্যমূলক

দৃষ্টিভঙ্গিরই একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ। আমি ব্যপারটা এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে যাবো না, কিন্তু আমি মনে করি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে কোনো এক ধরনের 'থিওরী অব আদার মাইন্ড' সংক্রান্ত একটি সমর্থনীয় উদাহরণ এখানে গড়ে তালা যেতে পারে, যাকে অনায়াসে বর্ণনা করা যেতে পারে দ্বৈতবাদী, যা উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে -বিশেষ করে জটিল কোনো সামাজিক পরিস্থিতিতে, এমনকি বিশেষ করে যেখানে আরো উচু পর্যায়ের উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।

ডেনেট তৃতীয় মাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক (থার্ড অর্ডার ইনটেনশনালটি) (পুরুষটি বিশ্বাস করে যে, নারীটি জানে সে তাকে কামনা করছে), চতুর্থ মাত্রার উদ্দেশ্যমূলক (নারীটি বুঝতে পারছেন যে,পুরুষটি বিশ্বাস করে নারীটি জানে সে তাকে কামনা করে), এমনকি পঞ্চম মাত্রার উদ্দেশ্যমূলক (শামান অনুমান করছেন যে নারীটি বুঝতে পেরেছে,পুরুষটি বিশ্বাস করে যে নারীটি জানে সে তাকে কামনা করছে) দৃষ্টিভঙ্গি কথা উল্লেখ করেছেন। আরো বেশি মাত্রার উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সম্ভবত কল্পকাহিনীতে সীমাবদ্ধ, মাইকেল ফ্রায়ান (৩৭) তার অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ 'দ্য টিন ম্যান' উপন্যাসে যেমন শ্লেষাত্মক ভাষায় লিখেছিলেন, 'নুনোপুলোসকে দেখে, রিক জানতো সে প্রায় নিশ্চিৎ যে, অ্যানা তীব্র ঘৃণা অনুভব করেছিল ফিডলিংচাইল্ডের তার অনুভূতিগুলো বুঝতে না পারার ব্যর্থতার প্রতি এবং সে (অ্যানা) জানতো যে, নীনা আগে থেকেই জানতো যে সে (অ্যানা) জানে নুনোপুলোস এর এ বিষয়ে কি ধারণা...'। কিন্তু বাস্তব সত্যটি হলো, আমরা এই অন্য কারো মন সম্বন্ধে নেয়া সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে একরম জটিল দ্বন্দ্ব দেখে যে হাসতে পারছি সম্ভবত এটি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে, যেমন আমাদের মন কেমন করে বাস্তব জগতে কাজ করার জন্য প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে।

নিদেনপক্ষে কম মাত্রায় উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, পরিকল্পনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মতো সময় বাঁচায়, যা বাঁচার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। ফলাফলে প্রাকৃতিক নির্বাচন শর্টকাট হিসাবে উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার করার উপযোগি করে আমাদের মস্তিষ্ক গড়ে তুলেছে। আমরা জৈববৈজ্ঞানিকভাবেই পূর্বনির্দেশিত, যে-কোনো সত্তা উপর উদ্দেশ্য আরোপ করার ক্ষেত্রে - যাদের আচরণ আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আরো একবার, পল ব্লুম শিশুদের মধ্যে এর পরীক্ষামূলক প্রমাণ উল্লেখ করে বলেছেন, শিশুরা বিশেষভাবে উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বেছে নেয়। যখন ছোটো শিশুরা কোনো বস্তু দেখে অপর একটি বস্তুকে অনুসরণ করছে (যেমন কোনো কম্পিউটারের পর্দায়),তারা ধরে নেয় সক্রিয়ভাবে একটি আরেকটির পিছু নিচ্ছে, আর এই অনুগমন একটি উদ্দেশ্যসহ এজেন্ট বা কার্যকর্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তারা সত্যিকারের বিস্ময় প্রকাশ করে যখন কাল্পনিক সেই এজেন্টটি তার এই ধাওয়া করে ধরার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়।

'ডিজাইন স্ট্যান্স' ও 'ইনটেনশনাল স্ট্যান্স' খুব উপকারি দুটি মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি, কোনো সত্তা সম্বন্ধে ধারণার প্রক্রিয়াটিকে এরা দ্রুত করে, যা বাঁচার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আক্রমণ করতে পারে এমন শিকারী প্রাণী বা সম্ভাব্য প্রজনন সঙ্গী। কিন্তু মস্তিষ্কের অন্য কর্মপদ্ধতিগুলোর মত এই স্ট্যান্স বা বুদ্ধিবৃদ্ধিজাত দৃষ্টিভঙ্গিগুলো ভুল করতে পারে। শিশুরা ও আদি মানুষরা আবহাওয়া, ঢেউ, স্রোত, গড়িয়ে পড়া পাথরের উপর উদ্দেশ্য আরোপ করে। আমাদের সবারই যন্ত্রের সাথে সেই একই কাজ করার প্রবণতা আছে, বিশেষ করে যখন তারা ঠিক মত কাজ না করে আমাদের হতাশ করে। অনেকেই হয়তো খানিকটা ভালোলাগার সাথে মনে থাকতে পারে, যেদিন বাসিল ফল্টির (৩৯) গাড়ি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ একটি রাতের ভোজসভার আয়োজন বাঁচানোর প্রচেষ্টায় নেয়া গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশনের সময় তার গাড়িটি হঠাৎ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তিনি গাড়িটিকে প্রথমে সাবধান বাণী শোনান, তিন পর্যন্ত গণনা করেন, এরপর গাড়ী থেকে বের হয়ে একটা গাছের ডাল যোগাড় করেন, সমানে গাড়িটিকে পেটাতে থাকেন প্রায় মেরে ফেলবার অভিপ্রায়ে। আমাদের অনেকের জীবনে এই পরিস্থিতি হয়েছে, ক্ষণকালের জন্য হলেও, সে অভিজ্ঞতা গাড়ি নিয়ে না হলে হয়তো কম্পিউটার নিয়ে হয়েছে। জাস্টিন ব্যারেট (৪০) 'হাইপারঅ্যাকটিভ এজেন্ট ডিটেকশন ডিভাসের' একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রস্তাব করেছিলেন: আমরা অতিসক্রিয় হয়ে যে-কোনো কিছুর কারণ হিসাবে কোনো না কোনো এজেন্ট বা কার্যকর্তাকে খুঁজে বের করি, যখন হয়তো সেখানে আসলে এই ধরনের কোনো এজেন্টর অস্তিত্ব নেই, এবং এসব ক্ষেত্রে এটাই আমাদের খারাপ বা ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে, যেখানে আসলে প্রকৃতি শুধুমাত্র নির্বিকার। আমি আমাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও লক্ষ করেছি মনে তীব্র বুনো বিতৃষ্ণা পোষণ করতে, কোনো নির্দোষ প্রাণহীন কোনো বস্তুর প্রতি, যেমন আমার সাইকেলের চেইন। একটি দুঃখজনক সাম্প্রতিক ঘটনা জানাচ্ছে, এক ব্যক্তি তার ঠিকমত বাঁধা না থাকা জুতোর ফিতায় জড়িয়ে সিড়ি বেয়ে নীচে গড়িয়ে গিয়েছিল কেমব্রিজের ফিৎসউইলিয়াম মিউজিয়ামে, এই নীচে গড়িয়ে পড়ার সময় তিনি দুর্লভ এবং অমূল্য একটি কিং রাজবংশের শাসনামলে নির্মিত চিনামাটির একটি পাত্রের উপর এসে পড়েন, যা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল। মিউজিয়াম কর্মচারীরা সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পান ব্যক্তিটি সেই ভেঙ্গে যাওয়া পাত্রটির অজস্র টুকরোর ঠিক মাঝখানে বসে আছেন হতবাক হয়ে, ঘটনার প্রতিক্রিয়া হতবাক সবাই যখন গভীর নীরবতায় চুপ করে আছেন, ব্যক্তিটি বার বার তার জুতার ফিতার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলছিল,'এই যে, এটাই আসল অপরাধী' (৪১) ।

ধর্মের অন্য উপজাত সংক্রান্ত ব্যাখ্যাগুলো প্রস্তাব করেছিলেন হিন্ড, শেরমার, বয়ের, ডেনেট, আটরান, ব্লুম, কোলম্যানসহ আরো অনেকে। একটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক সম্ভবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন ডেনেট, ধর্মের অযৌক্তিকতা হচ্ছে আমাদের

মস্তিষ্কের একটি নির্দিষ্ট সহজাত অযৌক্তিকতারই একটি উপজাত: সেটি হচ্ছে আমাদের প্রেমে পড়ার প্রবণতা, যার সম্ভবত জিনগত কিছু সুবিধা আছে।

নৃতাত্ত্বিক হেলেন ফিশার (৪২), তার 'হোয়াই উই লাভ' (৪৩) বইটিতে রোমান্টিক ভালোবাসার উন্মত্ত পাগলামোটাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন এবং কিভাবে একে অতি মাত্রায় তুলনা করা হয় এমন কিছুর সাথে, যা মনে হতে পারে অবশ্যই প্রয়োজনীয়। বিষয়টি এভাবে লক্ষ করুন: কোনো পুরুষর দৃষ্টিভঙ্গিতে তার পরিচিতদের মধ্যে শুধু মাত্র একজন নারী অন্যান্য নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা শতগুণ বেশি ভালোবাসাযোগ্য হবার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই কম। কিন্তু তারপরেও পুরুষটি এভাবেই তার ভালোবাসার পাত্রীকে বর্ণনা করে থাকে যখন সে তার 'প্রেমে' পড়ে। এই উন্মত্ত গোঁড়া একগামী আনুগত্যের প্রবণতা, আমাদের সবারই যার শিকার হবার সম্ভাবনা আছে, তার তুলনা কিন্তু এক ধরনের পলিআমোরি বা বহুপ্রেমের চেয়ে বেশি যৌক্তিক মনে হতে পারে (পলিঅ্যামোরী, হচ্ছে সেই বিশ্বাস, যে কেউ একই সাথে বিপরীত লিঙ্গর কয়েকজন সদস্যকে ভালোবাসতে পারেন, ঠিক যেমন করে কেউ একাধিক মদ, সুরকার, বই কিংবা খেলা ভালোবাসতে পারেন)। আমরা আনন্দের সাথে মেনে নেই যে, আমরা একাধিক শিশু, পিতামাতা, ভাইবোন, শিক্ষক, বন্ধু কিংবা পোষা প্রাণীদের ভালোবাসতে পারি। আপনি যখন বিষয়টা এভাবে ভাবেন, তখন এই স্বামী-স্ত্রী বা সঙ্গী-সঙ্গিনীর ভালোবাসার মধ্যে আমরা যে একচেটিয়া অধিকার দাবী করি সেটিকে কি অবশ্যই বেশ অদ্ভুত মনে হয় না ? তারপরও আমরা ঠিক 'সেটাই' প্রত্যাশা করি এবং সেটা অর্জন করার জন্যই আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। নিশ্চয়ই কোনো একটি কারণ আছে এর পেছনে।

হেলেন ফিশার এবং অন্যান্যরা আমাদের দেখিয়েছেন যে, ভালোবাসায় আপ্লুত থাকার সাথে সংশ্লিষ্টদের আমাদের মস্তিষ্কের অনন্য কিছু পরিস্থিতি, যেমন কিছু স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য (যেগুলো আসলে প্রাকৃতিক মাদক) যারা এই ধরনের পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিবর্তন-মনোবিজ্ঞানীরা একমত তার (ফিশার) সাথে, এই অযৌক্তিক 'বজ্রাঘাত' অপর সহ-মাতা বা সহ-পিতার প্রতি আনুগত্যকে নিশ্চিৎ করার একটি প্রক্রিয়া হতে পারে, যা যথেষ্ট দীর্ঘ হয়, যেন তারা একত্রে একটি সন্তানের প্রতিপালন করতে পারেন। ডারউইনীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, নানাবিধ কারণে কোনো সন্দেহ নেই একজন ভালো জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একবার নির্বাচন করে ফেলার পর - এমনকি যদি সেটি খারাপও হয় - এবং একটি সন্তান ধারণ করার পর, যে-কোনো পরিস্থিতিতে একে অপরের সাথে থাকাটা আরো বেশি প্রয়োজনীয়, কমপক্ষে শিশুটি যতদিন মায়ের বুকের দুধ না ছাড়ে।

অযৌক্তিক ধর্ম বিশ্বাস কি সেই অযৌক্তিকতার প্রক্রিয়াটির একটি উপজাত, যা প্রাকৃতিক নির্বাচন মূলত প্রেমে পড়ার জন্য আমাদের মস্তিষ্কে যা অন্তর্গ্রথিত একটি প্রক্রিয়া হিসাবে সৃষ্টি করেছে? নিশ্চয়ই, ধর্মীয় বিশ্বাসের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রেমে পড়ার মতোই (দুই অবস্থারই অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য মনে হতে পারে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে থাকার মতোই) (৪৪); স্নায়ুমনোচিকিৎসাবিদ জন স্মিথিস (৪৫) আমাদের সতর্ক করেছেন যে, মস্তিষ্কের যে এলাকাগুলো এই দুই ম্যানিয়া বা উন্মত্ততায় সক্রিয় হয় তার মধ্যে স্পষ্ট কিছু তারতম্য আছে, তবে তাসত্ত্বেও বেশ কিছু মিলও আছে তাদের মধ্যে:

> ধর্মের বহুরূপের একটি রূপ হচ্ছে, অতিপ্রাকৃত একটি সত্তার প্রতি নিবেদিত তীব্র ভালোবাসা, যেমন, ঈশ্বর। এছাড়া এই সত্তার নানা প্রতীক বা নিদর্শনের প্রতি তীব্র শ্রদ্ধা। মানুষের জীবন প্রধানত পরিচালিত হয় আমাদের স্বার্থপর জিন এবং দৃঢ়ীকরণের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ইতিবাচক বা পজিটিভ দৃঢ়ীকরণের অনেকটাই আসে ধর্ম থেকে: ভালোবাসা পাবার উষ্ণ ও স্বস্তি জাগানো এবং বিপদজ্জনক এই পৃথিবী থেকে সুরক্ষিত বোধ করার অনুভূতি, মৃত্যুভয় থেকে পরিত্রাণ, খারাপ সময়ে পাহাড়ের চুড়া থেকে প্রার্থনার উত্তরে আসা সহযোগিতা ইত্যাদি। একই ভাবে বাস্তবে উপস্থিত সত্যিকার কোনো মানুষের প্রতি (সাধারণত অন্য লিঙ্গের) রোমান্টিক ভালোবাসা সেই একই গভীর মনোসংযোগের উপস্থিতির নিদর্শন বহন করে এবং এটাও ইতিবাচক দৃঢ়ীকরণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। এই অনুভূতিগুলো সুচনা হতে পারে অন্যজনের কোনো নির্দশন দেখার মাধ্যমে, যেমন, চিঠি, ফটোগ্রাফ, আর সেই ভিক্টোরিয়ার যুগে এক গোছা চুল, ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে থাকার সেই অবস্থায় অনেক শারীরবৃত্তীয় অনুসঙ্গ আছে, যেমন, হাপরের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলা (৪৬)।

১৯৯৩ সালে আমি ভালোবাসায় নিমজ্জিত হওয়া এবং ধর্মের মধ্যে তুলনামূলক একটি আলোচনা করেছিলাম, যেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম, খুব বিস্ময়করভাবে ধর্ম দ্বারা সংক্রমিত হওয়া কোনো ব্যক্তির উপসর্গগুলো, সাধারণত যৌন ভালোবাসার সাথে সংশ্লিষ্ট উপসর্গগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের মস্তিষ্কে এটি অত্যন্ত জোরালো একটি শক্তি, এবং আদৌ বিস্ময়কর কোনো ব্যপার নয় যে, কিছু 'ভাইরাস' এটিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতা অর্জন করতে বিবর্তিত হতেই পারে ('ভাইরাস' শব্দটি এখানে ধর্মের রূপাকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে : আমার সেই নিবন্ধের নাম ছিল 'ভাইরাসেস অব দ্য মাইন্ড'(৪৭))। এখানে পুনরায় উল্লেখ করার জন্য আভিলার সেইন্ট টেরেসার (৪৮) সেই তীব্র সুখানুভূতি (বা অর্গাজমের) সংক্রান্ত বিখ্যাত স্বপ্নটি তো যথেষ্ট কুখ্যাত। তবে আরো গুরুত্বের সাথে এবং আরো খানিকটা কম স্থুল

ইন্দ্রিয়পরায়নতার পর্যায়ে, দার্শনিক অ্যান্থনি কেনি (৪৯) চমৎকার কিছু সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, “কি বিশুদ্ধ তীব্র আনন্দ অপেক্ষা করছে তাদের জন্য, যারা ‘ট্রান্সসাবস্টানসিয়েশনের’ (রোমান ক্যাথলিক ধর্ম মতে ট্রান্সসাবস্টানসিয়েশন হচ্ছে একটি মতবাদ যা প্রস্তাব করছে, ইউক্যারিষ্ট বা হলি কমিউনিয়নের সময়, গমের রুটি এবং আঙ্গুরের রসের মদ যীশু খ্রিস্টের শরীর এবং রক্তে রূপান্তরিত হয়) রহস্যটির ওপর কোনোভাবে তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন”। রোমান ক্যাথলিক যাজক হিসাবে তার দীক্ষা এবং ‘মাস’ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা কিভাবে তাকে ক্ষমতায়ন করেছিলো সেটি ব্যাখ্যা করে তিনি প্রাণবন্ততার সাথে স্মৃতিচারণ করেন:

> প্রথম মাসগুলোর সেই তীব্র আনন্দের কথা, যখন আমার রোববারের প্রার্থনা সভা বা মাস পরিচালনা করার ক্ষমতা ছিল; সাধারণত দেরী করে ধীরে আর অলসতার সাথে বিছানা থেকে উঠতে অভ্যস্ত আমি সকালে প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠতাম, পুরোপুরি সজাগ এবং তীব্র উত্তেজনা অনুভব করতাম, যে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার জন্য সুযোগ আমি পেয়েছি সেটি চিন্তা করে...
>
> খ্রিস্টের শরীর স্পর্শ করা, যীশুর যাজকদের সান্নিধ্য, আমাকে মুগ্ধ করতো। কনসেক্রেশনের শব্দগুলো উচ্চারণ করার পর আমি শান্ত দৃষ্টি মেলে হোস্টের দিকে তাকাতাম, যেমন করে কোনো প্রেমিক বা প্রেমিকা প্রিয়জনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে.. যাজক জীবনের সেই শুরুর দিনগুলো আমার স্মৃতিতে পূর্ণ তৃপ্তি আর তীব্র সুখের দিন হিসাবে রয়ে গেছে, যা অমূল্য এবং দীর্ঘস্থায়ী হবার নয় এমন ভঙ্গুর, যেমন কোনো রোমান্টিক ভালোবাসা যার সমাপ্তি ঘটে কোনো অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবাহের বাস্তবতায়।

মথদের আলোক-কম্পাসের প্রতিক্রিয়ার সমতূল্য হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে অযৌক্তিক তবে একজন এবং শুধুমাত্র বিপরীত লিঙ্গের একজন মাত্র সদস্যের সাথে প্রেমে পড়ার উপযোগী কার্যকর আচরণটি। মিসফায়ারিং বা ভুল প্রতিক্রিয়ার উপজাত যেমন মোমবাতির আগুনে উড়ে আত্মাহুতি দেবার সমতূল্য হচ্ছে ইয়াহয়ে বা ঈশ্বরের প্রেমে পড়া (বা কুমারী মেরি বা আল্লাহ) এবং এই ধরনের ভালোবাসা দ্বারা তাড়িত হয়ে অযৌক্তিক আচরণ করা।

জীববিজ্ঞানী লুইস ওলপার্ট (৫০) তার ‘সিক্স ইমপসিবল থিংস বিফোর ব্রেকফাস্ট’ (৫১) বইটিতে একটি প্রস্তাব করেছিলেন, যা গঠনমূলক অযৌক্তিকতার ধারণাটির একটি সাধারণীকরণ রূপ হিসাবে দেখা যেতে পারে। তার বক্তব্য ছিল অযৌক্তিকভাবে ধারণ করা কোনো দৃঢ় বিশ্বাস মনের প্রায়শই দ্রুত পরিবর্তনশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে: যে বিশ্বাসগুলো জীবন বাঁচিয়েছিল, যদি তাদের দৃঢ়ভাবে ধারণ করা না হত, সেটা

আদি মানুষের বিবর্তনের জন্য সুবিধাজনক হতো না। বরং খুবই অসুবিধার কারণ হতো সেটি, যেমন, শিকার করার সময় বা টুল বা হাতিয়ার তৈরির সময়, দ্রুত মন পরিবর্তন করা। ওলপার্টের যুক্তির একটি অর্থ হলো নিদেনপক্ষে কোনো কোনো পরিস্থিতিতে, দোদুল্যমান অনিশ্চয়তা নয়, বরং অযৌক্তিক বিশ্বাসে অটল থাকাই শ্রেয়, এমনকি যখন নতুন প্রমাণ বা যুক্তি পরিবর্তনের সপক্ষে অবস্থান করে। খুবই সহজ কিন্তু প্রেমে পড়ার যুক্তিটি একটি বিশেষ পরিস্থিতির উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা ও একইভাবে খুব সহজ এটি দেখা যে, ওলপার্টের এই 'অযৌক্তিক স্থিতিশীলতা' আরো একটি উপযোগী মানসিক প্রবণতা যা অযৌক্তিক ধর্মীয় আচরণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারে: আরো একটি উপজাত।

রবার্ট ট্রিভার্স (৫২) তার সোস্যাল ইভ্যোলুশন (৫৩) বইটিতে ১৯৭৬ সালের আত্মপ্রবঞ্চনার বিবর্তনীয় তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিলেন বিস্তারিতভাবে:

> আত্ম-প্রবঞ্চনা হলো সচেতন মন থেকে সত্যকে লুকিয়ে রাখা, যেন সেটি অন্যদের কাছ থেকেও লুকিয়ে রাখা যায় উত্তমভাবে। আমাদের প্রজাতিতে আমরা সেটি শনাক্ত করতে পারি, দৃষ্টি এড়ানোর প্রচেষ্টা, ঘেমে ওঠা হাতের তালু এবং ফেটে যাওয়া গলার আওয়াজ হয়তো সেই ছলনা করার সচেতন জ্ঞান থেকে উদ্ভুত চাপের বহিঃপ্রকাশ। এই ছলনার ব্যাপারটিকে সচেতন স্তরে উপেক্ষা করার মাধ্যমে, ছলনাকারী এই সব চিহ্ন একজন পর্যবেক্ষককারীর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে। সেই ব্যক্তিটি অনায়াসে মিথ্যা কথা বলতে পারে ছলনার সংশ্লিষ্ট উত্তেজনা, অস্থিরতা ছাড়াই।

নৃতাত্ত্বিক লায়োনেল টাইগার (৫৪) এই ধরনের কিছু কথা বলেছেন তার 'অপটিমিজম: দ্য বায়োলজী অফ হোপ' (৫৫) বইটিতে। গঠনমূলক অযৌক্তিকতা যা আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা দেখা যাবে ট্রিভার্সের 'উপলদ্ধিগত প্রতিরক্ষা' বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদে:

> মানুষের একটি প্রবণতা আছে, সচেতনভাবে তারা যা চায় তা দেখতে পারে। নেতিবাচক কোনো কিছু দেখতে তাদের আক্ষরিক অর্থেই কষ্ট হয় যেমন ঠিক ততটাই সহজে তারা ইতিবাচক বিষয়গুলো দেখতে পায়। যেমন যে শব্দগুলো চিন্তার উদ্রেক করে, হয়তো এর সাথে সংশ্লিষ্ট কারো ব্যক্তিগত ইতিহাস বা পরীক্ষামূলক কোনো ম্যানিপুলেশন, সেগুলো বোধগম্য হবার আগেই প্রয়োজন আরো বিষদ ব্যাখ্যা। ধর্মের খামখেয়ালী চিন্তার সাথে এর প্রাসঙ্গিকতার বিষদ ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন পড়ে না।

দুর্ঘটনাবশত সৃষ্ট উপজাত হিসাবে ধর্ম - কোনো উপযোগী কিছুর মিসফায়ারিং (অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন না করা, ভ্রান্ত পরিণতি সৃষ্টি করা) এই সাধারণ তত্ত্বটির সপক্ষে আমার অবস্থান। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা বহুরূপী, জটিল এবং বিতর্কিত। উদাহরণ দেবার খাতিরে, আমি আমার 'অতি বিশ্বাসপ্রবণ' শিশুর তত্ত্বটি সাধারণ উপহজাত তত্ত্বের একটি প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে ধরে আলোচনায় অগ্রসর হবো। এই তত্ত্বটি যে, শিশুর মস্তিষ্ক, কিছু উত্তম কারণেই, মানসিক ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হবার প্রবণতা থাকে - পাঠকদের কাছে হয়তো অসমাপ্ত মনে হতে পারে। হতে পারে মন সংবেদনশীল, সহজেই যে আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু অন্য কিছু নয়, কেন এটি 'এই' ভাইরাস দিয়ে আক্রান্ত হবে? কোনো কোনো ভাইরাস কি বিশেষভাবে দক্ষ এই ধরনের সহজে আক্রম্য কোনো মনকে সংক্রমিত করার জন্য? কেন এই 'সংক্রমণ' আত্মপ্রকাশ করে ধর্ম হিসাবে, অন্য কোনোভাবে না কেন? আমি যা বলতে চাইছি তার অংশ বিশেষ হচ্ছে, বিশেষ কোনো ধরনের অর্থহীনতা শিশুর মস্তিষ্কে আক্রান্ত করে তাতে কিছু যায় আসেনা, একবার সংক্রমিত হলে, শিশুটি প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তার পরবর্তী প্রজন্মকে সংক্রমিত করে একই অর্থহীনতা দিয়ে, সেটা যা-ই হোক না কেন?

নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেমন ফ্রেজারের (৫৬) 'গোল্ডেন বাউ' (৫৭) আমাদের চমৎকৃত করে মানুষের বৈচিত্র্যময় অযৌক্তিক বিশ্বাস সমুহের বিবরণ। একবার যখন সংস্কৃতির গভীরে সেগুলো প্রোথিত হয়, তারা টিকে থাকে, বিবর্তিত হয় এবং নানা ধারায় বিভাজিত হয়, তাদের বিবর্তনের প্রক্রিয়া জীববিজ্ঞানের বিবর্তনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তারপরও ফ্রেজার কিছু সাধারণ নীতিমালা চিহ্নিত করেছেন, যেমন, 'হোমিওপ্যাথির জাদু'; যেখানে নানা মন্ত্র বাস্তব পৃথিবীর কোনো কিছুর প্রতীকী রূপ ঋণ করে যাকে তারা প্রভাবিত করতে চাইছে। এই ধরনের বিশ্বাসের দুঃখজনক ফলাফলের একটি উদাহরণ হচ্ছে, গন্ডারের শিং গুড়ার যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধি করার গুণাবলী আছে; অসার তো বটেই, দৃঢ় উত্থিত পুরুষাঙ্গের সাথে গন্ডারের শিঙের (যদি এটি শিং নয়) সাদৃশ্য থেকে এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম। হোমিওপ্যাথির জাদুময়তার সর্বব্যাপিতা প্রস্তাব করে, এই অর্থহীনতা যা আক্রম্য মস্তিষ্ককে সংক্রমণ করে সেটি আসলে পুরোপুরিভাবে লক্ষ্যহীন কাল্পনিক অর্থহীনতা নয়।

জীববিজ্ঞানীয় সমতূল্য কোনো কিছু কল্পনা করা বেশ লোভনীয়, যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো কি কোনো কিছু কি এখানে কাজ করছে? কিছু ধারণা কি আসলেই অন্য ধারণাদের চেয়ে বেশি দ্রুত বিস্তার লাভ করে, এর অন্তর্নিহিত আবেদন বা গুণ বা বিদ্যমান মানসিক গঠনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার কারণে, আর এটা কি সত্যিকার ধর্মে, আমরা তাদের যেভাবে দেখি, তার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচন যেমন সকল জীবের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারে? গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে সেটা হলো: এর 'গুণ বা মেরিটের' অর্থ এখানে

শুধু বেঁচে থাকা আর বিস্তার লাভ করা; এর অর্থ এই না যে এটি ইতিবাচক মানের বিচার প্রত্যাশা করে - এমন কোনো কিছু যা নিয়ে আমরা মানবিকভাবে গর্ব করতে পারি।

এমনকি কোনো বিবর্তনীয় মডেলেও, সেখানে কোনো প্রাকৃতিক নির্বাচন থাকার বাধ্যবাধকতা নেই। জীববিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে-কোনো একটি জিন জনসংখ্যার মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারে, কারণ যে এটা কোনো ভালো জিন তাই নয় বরং এর কারণ হচ্ছে শুধু ভাগ্য; আমরা একে 'জেনেটিক ড্রিফ্ট' বলি; প্রাকৃতিক নির্বাচনের মুখোমুখি এটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা এখনো বিতর্কিত। কিন্তু বর্তমানে এটি তথাকথিত আণবিক জীববিজ্ঞানের নিরপেক্ষ তত্ত্বের একটি রূপ হিসাবে ব্যাপকভাবে গ্রহনযোগ্য। যদি কোনো জিন মিউটেশন বা পরিবর্তন হয়ে তার নিজেরই একটি ভিন্ন সংস্করণ সৃষ্টি করে, যার ঠিক একই ধরনের প্রভাব আছে, তখন এই পার্থক্যটা নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ; প্রাকৃতিক নির্বাচন এই দুটি সংস্করণের কোনো একটি প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করতে পারে না। যাই হোক পরিসংখ্যানবিদদের ভাষায় যাকে বলা হয় বহু প্রজন্ম ধরে 'সাম্পলিং এরর'। নতুন মিউট্যান্ট (পরিবর্তনবাহী) জনসংখ্যায় জিন সম্ভারে এই জিনটি ধীরে ধীরে মূল রূপটিকে প্রতিস্থাপিত করবে। পরমাণুর পর্যায়ে এটি সত্যিকারে বিবর্তনীয় পরিবর্তন (এমনকি যখন পুরো প্রাণীর পর্যায়ে কোনো পরিবর্তন যদি লক্ষ করাও না যায়)।এটি একটি নিরপেক্ষ বিবর্তনীয় পরিবর্তন যার উপর নির্বাচনী চাপ বা সুবিধার কোনো প্রভাব নেই।

জেনেটিক ড্রিফটের সাংস্কৃতিক সমতূল্য একটি জোরালো সম্ভাবনা যা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না যখন ধর্মের বিবর্তন নিয়ে আমরা চিন্তা করি। ভাষা বিবর্তিত হয় একটি প্রায় জৈববৈজ্ঞানিক একটি উপায়ে এবং এর বিবর্তনে যে দিকটি সে অনুসরণ করে মনে হতে পারে তা অনির্দিষ্ট, অনেকটা র‍্যানডোম ড্রিফটের মত; জেনেটিক ড্রিফটের একটি সাংস্কৃতিক অনুরূপ এর মাধ্যমে এটি হস্তান্তরিত হয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত প্রতিটি সূত্রই এতোটাই বদলে যায় যে আর পারস্পরিক বোধগম্যতা থাকে না। সম্ভব হতে পারে যে, ভাষার বিবর্তনের কিছু অংশ এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু এর সপক্ষে যুক্তিগুলো তেমন জোরালো নয়। আমি নীচে ব্যাখ্যা দেব, এই ধরনের কিছু ধারণা যা প্রস্তাব করা হয়েছে ভাষার প্রধান ধারাগুলোকে ব্যাখ্যা করতে, যেমন, 'দ্য গ্রেট ভাওয়েল শিফট', যা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্বে ইংরেজী ভাষায় ঘটেছে, কিন্তু আমরা যা দেখি তা ব্যাখ্যা করার জন্য এই ধরনের 'ফাঙ্কশনাল হাইপোথিসিস' যথেষ্ট নয়। সম্ভবত মনে হতে পারে যে ভাষা সাধারণত বিবর্তিত হয়েছে র‍্যানডোম জেনেটিক ড্রিফটের কোনো সাংস্কৃতিক সমরূপ প্রক্রিয়ায়। ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ল্যাটিন ভাষা বদলে হয়েছে স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ইটালীয়, ফরাসী, রোমানশ এবং এই ভাষাগুলোর নানা উপভাষা।

অন্ততপক্ষে বলতেই হবে, এইসব বিবর্তনীয় পরিবর্তন স্থানীয় সুবিধা বা কোন 'নির্বাচনী চাপকে' প্রতিফলিত করছে সেই বিষয়টি কিন্তু স্পষ্ট না ।

আমি সারাংশ করবো যে, ধর্ম, ভাষার মত, বিবর্তিত হয়েছে যথেষ্ট লক্ষ্যহীনতার সাথে, যার শুরুটা ছিল যথেষ্ট কাল্পনিক, যা জন্ম দিয়েছে হতবাক করা-এবং কখনো বিপজ্জনক-বৈচিত্র্যময়তার সমাহার যা আমরা দেখছি। এবং একই সাথে সম্ভবত প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো কোনো একটি কিছু, মানব মনোস্তাত্ত্বিকতার মৌলিক সমরূপতার সাথে যা যুক্ত হয়ে নিশ্চিৎ করেছে, বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন ধর্মগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে যেন সাদৃশ্যতা থাকে। অনেক ধর্ম, যেমন নৈর্ব্যাক্তিকভাবে অসম্ভব, ব্যাখ্যাতীত, তবে নিজস্ব ধারণাগতভাবে আকর্ষণীয় সেই মতবাদ শিক্ষা দেয়: আমাদের ব্যক্তিত্ব শরীরের মুত্যুর পরও বেঁচে থাকে। অমরত্বের ধারণা নিজেই টিকে থাকে এবং বিস্তার লাভ করে কারণ এটি পছন্দনীয় অভিলাষী চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয়। এবং এই সব চিন্তারও গুরুত্ব আছে, কারণ মানুষের মনোজগতে বিশ্বাসকে নানা আকাঙ্ক্ষার রঙে রঞ্জিত করার প্রায় সর্বজনীন একটি প্রবণতা আছে ('হ্যারি, তোমার ইচ্ছাটাই হচ্ছে সেই চিন্তার জনক', শেক্সপিয়ার এর হেনরী ফোর্থ পার্ট ২, তার পুত্রের উদ্দেশ্যে) (৫৮) ।

মনে হয় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, ধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যই আসলে ধর্মের নিজের এবং মানুষের সাংস্কৃতিক মিশ্রণে সেই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী। এখন প্রশ্ন যে তাহলে এই ভালো সামঞ্জস্যতাটি কি অর্জিত হয়েছে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন' দিয়ে, নাকি 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' দিয়ে। উত্তর সম্ভবত দুটোই। ডিজাইনের পক্ষে ধর্মীয় নেতারা সম্পূর্ণভাবে দক্ষ ধর্মকে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দাবলী, আচার এবং কৌশল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। মার্টিন লুথার (৫৯) খুব ভালো করে জানতেন যুক্তি হচ্ছে ধর্মের সবচেয়ে বড় শত্রু। এবং তিনি প্রায়শই যুক্তির বিপজ্জনক রূপটি নিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করে গেছেন: 'যুক্তি হচ্ছে বিশ্বাসের সবচেয়ে বড় শত্রু, আত্মিক কোনো বিষয়ে এটি কখনোই সহায়ক হতে পারে না, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি স্বর্গীয় জগতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে যা কিছু এসেছে সেই সব কিছুর প্রতি এটি অবজ্ঞা পোষণ করে (৬০)। আবার যেমন বলেছেন: 'যারাই খ্রিস্টান হতে চান, তাদের চোখ সরাতে হবে যুক্তির বাইরে'। এবং আবারো, যেমন: ' খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী সবার মধ্যে যুক্তিকে নিশ্চিহ্ন করা উচিত'। লুথারের কোনো সমস্যাই হোত না ধর্মকে টিকে থাকতে সাহায্য করতে এর বুদ্ধিমত্তাহীন অংশটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করতে। কিন্তু তার অর্থ এই না যে, তিনি বা অন্য কেউ এটি পরিকল্পনা করেছেন। এটি বিবর্তিত হতে পারে জিনগত (জিন নির্ভর) নয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের এমন কোনো একটি রুপের মাধ্যমে, যা পরিকল্পক লুথার নন, তবে তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, যিনি এর কাযর্কারিতা ভালোভাবে লক্ষ করেছিলেন।

যদিও প্রথাভিত্তিক জিনগুলোকে ডারউইনীয় নির্বাচন হয়তো সহায়তা করেছে সেই সব ধরনের মনোস্তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করতে যা উপজাত হিসাবে ধর্ম সৃষ্টি করেছে, তবে এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর আকার দেবার ব্যপারে এর ভূমিকা না থাকারই কথা। আমি এর আগেই এই ব্যপারে কিছু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, যদি আমি কোনো এই ধরনের নির্বাচনী তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিস্তারিত বিষয়গুলোর উপর প্রয়োগ করার বিষয়টি ভাবতে চাই, আমাদের জিনের দিকে নয় বরং এর সাংস্কৃতিক কোনো সমতূল্য বিষয়ের দিকে তাকানো উচিত। ধর্মগুলো মিমদের (৬১) মতোই এমন কিছু?

সাবধানে, কারণ আপনি আমার মিমের উপর দিয়ে হাটছেন

ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে শুধু সেই মতামতটি, যা টিকে গেছে।-অস্কার ওয়াইল্ড (৬২)

এই অধ্যায়টি শুরু হয়েছিল একটি পর্যবেক্ষণ দিয়ে যেহেতু ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন যে-কোনো ধরনের অপচয়কে সহ্য করতে পারে না, সে কারণেই কোনো প্রজাতির মধ্যে সর্বব্যাপী দৃশ্যমান কোনো বৈশিষ্ট্য, যেমন ধর্ম, নিশ্চয়ই কিছু উপযোগিতা প্রদান করেছিল, নয়তো এটি টিকে থাকতো না। কিন্তু আমি ইঙ্গিত করেছিলাম সেই উপযোগিতা বা সুবিধাটির, প্রজাতির কোনো সদস্যর বেঁচে থাকা বা প্রজনন সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আমরা যেমনটি দেখেছি, সর্দিজ্বরের ভাইরাসের জিনগুলোর প্রদর্শিত উপযোগিতাই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট, আমাদের প্রজাতির মধ্যে কেন এই কষ্টকর অসুস্থতা নিয়ে অভিযোগের সর্বব্যাপীতা (৬৩)। এবং আমাদের উপকার করার মতো কোনো জিন এর থাকতে হবে এমন কোনো প্রয়োজনীয়তাও নেই। যে-কোনো একটা অনুলিপনকারী হলেই চলে। অনুলিপনকারীদের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণ হচ্ছে জিন, তবে এই মর্যাদা পাবার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা হচ্ছে, কম্পিউটার-ভাইরাস এবং সাংস্কৃতিক বংশগতির বাহক মিম এককগুলো, এবং এই অংশের যেটি আলোচ্য বিষয়।; মিম কি সেটি যদি আমাদের বুঝতে হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঠিক কিভাবে তার কাজ করে আমাদের সেটি আগে বুঝতে হবে।

এর সবচেয়ে সাধারণতম রুপে, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে অবশ্যই বিকল্প রেপ্লিকেটর বা অনুলিপনকারীদের মধ্য থেকে কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়। একটি রেপ্লিকেটর হচ্ছে সংকেতাবদ্ধ তথ্যমালা যা তার হুবহু অনুলিপি সৃষ্টি করতে সক্ষম, তবে কখনো কখনো একেবারে হুবহু না হয়ে সামান্য ভিন্ন অনুলিপির সৃষ্টি করে (মিউটেশন)। এর একটি কারণ হচ্ছে ডারউইনীয়, যে ধরনের অনুলিপনকারী অণু নিজেদের অনুলিপি তৈরিতে দক্ষ, তারা সংখ্যায় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে অনুলিপনে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ

অনুলিপনকারী অণুদের তুলনায়। এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের একেবারে মূল কথা। সবচেয়ে আদর্শ অনুলিপনকারী অণু (রেপ্লিকেটর) হচ্ছে জিন, ‘ডিএনএ’ অণুর বেস অনুক্রমের একটি অংশ যার অনুলিপি সৃষ্টি হয় সবসময় প্রায় অত্যন্ত নিখুঁতভাবে, অসীম সংখ্যক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। মিম তত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি হচ্ছে, সাংস্কৃতিক অনুকরণেরও কি অনুরূপ কোনো একক আছে, যারা সত্যিকারের অনুলিপনকারী, যেমন জিনের মত আচরণ করে? আমি বলছি না যে, মিমরা অবশ্যই জিনের সবচেয়ে নিকটবর্তী অনুরূপ হবে, শুধুমাত্র যতই তারা জিনের মত আচরণ করে, মিম তত্ত্বটি ততই ভালোভাবে কাজ করতে পারে। এবং এই অংশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞাসা করা, মিম তত্ত্বটি ধর্মের এই বিশেষ ক্ষেত্রে হয়তো কাজ করে কিনা?

জিনদের জগতে, অনুলিপন প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে ঘটা ত্রুটি (মিউটেশন) যে দ্বায়িত্ব পালন করে তা হলো, মূল জিন সম্ভার বা পুলে যে-কোনো জিনের বিকল্প রূপগুলোর উপস্থিতি নিশ্চিৎ করে - ‘অ্যালিল’। সুতরাং যে বিকল্প রূপগুলোকে হয়তো মনে করা যেতে পারে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, কিন্তু কিসের জন্য সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ক্রোমোজোমের একটি নির্দিষ্ট জায়গা বা ‘লোকাসের’ জন্য কি, যেখানে সেই সেট অ্যালিলগুলো অবস্থান করতে পারে এবং কিভাবে তারা এই প্রতিযোগিতা করে? সরাসরি একটি অণু সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী অণুর যুদ্ধ নয়, তাদের প্রতিনিধি বা প্রক্সির মাধ্যমে। এই প্রক্সিটি হলো তাদের ‘ফিনোটাইপিক’ বৈশিষ্ট্য- কিছু বাহ্যিক দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য যেমন, পায়ের দৈর্ঘ্য বা লোমের রং : জিনের যে প্রকাশ শারীরস্থানিক, শারীরবৃত্তীয়, প্রাণ-রসায়নিক কিংবা আচরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। কোনো জিনের নিয়তি নির্ভর করে সেই শরীরগুলোর উপর যেখানে তারা ধারাবাহিকভাবে অবস্থান করে। শরীরের উপর তাদের প্রভাব কেমন, এই বিষয়টি প্রজাতির সামগ্রিক জিনপুলে তার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে প্রভাবিত করে। জিন পুলে অনেক প্রজন্মান্তরে জিনগুলোর উপস্থিতির হার বাড়ে কিংবা কমে, মূলত তাদের ‘ফিনোটাইপিক’ (বাহ্যিক বা প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য) প্রক্সির কল্যাণে।

মিমদের ক্ষেত্রেও কি এমন কিছু সত্য হতে পারে? একটি ক্ষেত্রে তারা জিনদের মত নয়, কারণ, এখানে সুস্পষ্টভাবে ক্রোমোজোম বা লোকাই বা আলিল বা যৌন-প্রজননকালীন রিকম্বিনেশন বা পুনসংযোগের অনুরূপ কিছু নেই। মিম পুলের গঠন জিন পুলের মত সংগঠিত নয় । তাসত্ত্বেও কোনো একটি মিম পুলের কথা বলা খুব একটা অর্থহীন হবে বলে মনে হয় না, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট মিমের উপস্থিতির হার হয়তো পরিবর্তিত হতে পারে বিকল্প মিমগুলোর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল হিসাবে।

অনেকেই মিম নির্ভর ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেছেন। বিরোধীতার কারণও ভিন্ন, তবে মোটামুটিভাবে সব কারণগুলো সাধারণত উদ্ভুত হয়েছে মিমরা আসলে পুরোপরিভাবে

জিনদের মত নয় - সেই সত্য থেকে। জিনের সঠিক ভৌত বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃতি এখন আমাদের জানা (এটি 'ডিএনএ' অণুর বেস বা নিউক্লিওটাইডদের অনুক্রম), মিমদের সম্বন্ধে সেই করম কিছু জানা যায়নি। এবং বিভিন্ন মিমতত্ত্ববিদরাও কোনো একটি ভৌত মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে মিমের উপস্থিতি পরিবর্তন করার মাধ্যমেও পরস্পরকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আমাদের মস্তিষ্কে কি মিমদের অস্তিত্ব আছে? বা ধরা যাক, কোনো একটি লিমেরিক বা ক্ষুদ্র কবিতার কাগজে করা প্রতিটি অনুলিপি এবং ইলেক্ট্রনিক কপিকেও কি মিম বলা যেতে পারে? তা ছাড়া জিন তার অনুলিপি তৈরি করে যথেষ্ট নিখুঁতভাবে, যদি মিমরা আদৌ তাদের অনুলিপি সৃষ্টি করতে পারে, তারা কি যথেষ্ট কম নিখুঁতভাবে সেটি করবে না?

মিমদের নিয়ে প্রস্তাবিত এই সমস্যাগুলো খানিকটা অতিরঞ্জিত। মিম তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত সকল অভিযোগগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, ডারউইনীয় 'রেপ্লিকেটর' হিসাবে কাজ করার জন্য মিমগুলো যথেষ্ট নিখুঁতভাবে তাদের অনুলিপিগুলো সৃষ্টি করতে পারে না। মূল সন্দেহটা হচ্ছে, যদি প্রতিটি প্রজন্মেই মিউটেশনের বা পরিবর্তনের হার গ্রহনযোগ্য সীমা অতিক্রম করে যায়, তাহলে মিম পুলে তাদের উপস্থিতির হারের উপর ডারউইনীয় প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনো প্রভাব ফেলার আগেই মিমরা মিউটেশনের মাধ্যমেই নিজেদের অস্তিত্ব বিলোপ করে ফেলবে। কিন্তু সমস্যাটা কাল্পনিক, একজন মাষ্টার কাঠমিস্ত্রি কিংবা প্রাগৈতিহাসিক সময়ের কোনো ফ্লিন্ট পাথরের হাতিয়ার তৈরির কারিগরের কথা ভাবুন, যিনি তার নবীন শিক্ষার্থীকে কোনো একটি বিশেষ কৌশল শেখাচ্ছেন হাতে কলমে তা করে দেখিয়ে, যদি শিক্ষার্থীটি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তার শিক্ষকের প্রতিটি হাতের কাজ ধাপ অনুক্রমে পুনরাবৃত্তি করে, শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সেটি সঞ্চালিত হবার পর তারপরও কি সত্যিই আপনি আশা করতে পারেন যে এই মিমটি পুরোপুরিভাবে পরিবর্তিত হবে। কিন্তু অবশ্যই শিক্ষার্থী তার শিক্ষকের দেখানো হাতের প্রতিটি নাড়াচাড়াকে হুবহু নকল করে না। আর খুবই হাস্যকর হবে এমন করাটা, বরং সে লক্ষ করে মূল চূড়ান্ত সেই ফলাফলটিকে, যা তার শিক্ষক অর্জন করার চেষ্টা করছেন এবং সেটাকেই সে অনুকরণ করে। যেমন, পেরেকটাকে হাতুড়ী দিয়ে ঠুকতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটি পুরোপুরি ঢুকে যায়, যত সংখ্যক হাতুড়ীর আঘাত লাগুক না কেন, তার সেই সংখ্যাটি তার শিক্ষকের প্রদর্শিত সংখ্যার সাথে নাও মিলতে পারে। এই ধরনের নিয়মগুলোই যা অপরিবর্তিত হয়ে সঞ্চারিত হয় অসীম সংখ্যক অনুকরন 'প্রজন্ম' হিসাবে, তাদের কাজটি সম্পাদন করার প্রক্রিয়াটি ব্যক্তি বিশেষে এবং ঘটনা বিশেষে ভিন্ন হতে পারে। কোনো কিছু বোনার কাজের সময় সেলাই , দড়িতে বাঁধা গিট বা মাছ ধরার জাল, অরিগ্যামির কাগজ ভাজ করা, কাঠের বা পটারী বা মৃৎশিল্পের নানা উপযোগী কৌশল, এই সব কিছুকে পৃথক উপাদান হিসাবে ভাবা সম্ভব যা আসলেই অসংখ্য সংখ্যক অনুকরণ প্রজন্ম হিসাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চারিত হতে পারে। খুঁটিনাটি বিষয়গুলো একক ব্যক্তি পর্যায়ে

যতই বিচিত্র হোক না কেন মূল বিষয়টি কিন্তু অপরিবর্তিত হয়ে বিস্তার লাভ লাভ করে, এবং জিনের সাথে মিমের সমরূপ ব্যাখ্যাটিকে কাজ করার জন্য আসলে শুধু সেটুকুই প্রয়োজন।

সুজান ব্ল্যাকমোরের (৬৪) 'দ্য মিম মেশিন' (৬৫) বইটির ভূমিকা লেখার সময় আমি চাইনিজ 'জাঙ্কের' (৬৬) মডেল বানানোর অরিগ্যামি (৬৭) প্রক্রিয়ার একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছিলাম। প্রক্রিয়াটি এমনিতেই একটি জটিল পদ্ধতি, প্রায় ৩২ টি ভাজ (বা সে রকম কিছু) আছে সেখানে। শেষ ফলাফল (চাইনীজ জাঙ্ক বা কাগজের জাহাজটি) এবং সেই সাথে পুরো ক্রমবিকাশে মধ্যবর্তী কমপক্ষে এর তিনটি ধাপ: 'কাটামারান', 'দুটি ঢাকনী সহ একটি বাক্স', এবং 'ছবির ফ্রেম' খুবই দৃষ্টিনন্দন। পুরো প্রক্রিয়াটি আসলেই মনে করিয়ে দেয়, নানা ভাজ আর খাজসহ কোনো ভ্রুণ যেন নিজেকে রূপান্তরিত করছে ব্ল্যাস্টুলা (৬৮) থেকে গ্যাস্ট্রুলা (৬৯) হয়ে নিউরালায় (৭০)। শৈশবে আমার বাবার কাছ থেকে আমি চাইনীজ জাঙ্ক বানাতে শিখেছিলাম, যিনি নিজেও ঠিক একই বয়সে সেই দক্ষতাটা অর্জন করেছিলেন তার বোর্ডিং স্কুলে পড়ার সময়। তিনি স্কুলে থাকার সময় চাইনীজ জাঙ্ক বানানো ধুম পড়ে গিয়েছিল যার সুচনা করেছিলেন তার স্কুলের মেট্রন, পুরো স্কুলে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল হামের মহামারিন মতো। অবশ্য হামের মহামারি মতোই এই কাগজের জাঙ্ক বানানোর গণ উৎসাহেও ভাটাও পড়ছিল একটি সময়। ছাব্বিশ বছর পর, সেই মেট্রন যখন রূপান্তরিত হয়েছেন পুরোনো স্মৃতিতে, আমিও সেই একই স্কুলে পড়তে গিয়েছিলাম, চাইনীজ জাঙ্ক বানানোর ধুমটা আমি আবার নতুন করে শুরু করি, এবং আবারো এটি ছড়িয়ে পড়ে আরেকটি হামের মহামারির মত এবং আবারো ম্লান হয়ে একসময় সেটি হারিয়ে গিয়েছিল। এখানে মূল বিষয়টি হলো, এই ধরনে হাতে কলমে শেখানো সম্ভব কোনো দক্ষতা মহামারির মত যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এই বিষয়টা আমাদের মিম-নির্ভর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সঞ্চারণে ত্রুটিহীনতা সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত দেয়। আমরা নিশ্চিৎ ভাবেই বলতে পারি, ১৯২০ এর দশকে আমার বাবার প্রজন্মের স্কুলের শিক্ষার্থীদের বানানো জাঙ্ক, আমার ১৯৫০ এর প্রজন্মের স্কুল ছাত্রদের বানানো জাঙ্ক থেকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যে খুব একটা আলাদা কিছু ছিল না।

একটি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা এই প্রপঞ্চটিকে আরো একটু পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করতে পারি: শিশুতোষ একটি খেলা, চাইনীজ হুইসপারের (যুক্তরাষ্ট্রের শিশুরা যাকে টেলিফোন নামে চেনে) একটি ভিন্ন রুপের মাধ্যমে। প্রথমে দুইশ মানুষকে একত্র করুন যারা কোনোদিনও চাইনীজ জাঙ্ক বানাননি, এবার প্রতি দশ জনকে নিয়ে একটি দল করে মোট বিশটি দল গঠন করুন। তারপর প্রতিটি দলের যারা প্রধান, তাদেরকে একসাথে জড়ো করুন, এবং তাদের সবার সামনে একটি চাইনীজ জাঙ্ক বানিয়ে হাতে কলমে শেখান কিভাবে চাইনীজ জাঙ্ক বানাতে হয়। এরপর তাদের নিজেদের দলে

ফেরত পাঠান এবং নির্দেশ দেন যেন তারা প্রত্যেকে তাদের টিম থেকে নিজের বাছাই করা শুধু দ্বিতীয় আরেকজনকে নির্বাচন করবেন, এবং তিনি যাকে চাইনীজ জাঙ্ক হাতে কলমে বানিয়ে দেখানোর মাধ্যমে শেখাবেন। প্রতিটি দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থী তার দলে এরপর তৃতীয় অন্য একজনকে শেখাবে কিভাবে চাইনীজ জাঙ্ক বানাতে হয়, এবং এই ধারাবাহিকতায় প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে প্রতিটি দলের দশম সদস্য পর্যন্ত শেখাবে তার আগের প্রজন্মের শিক্ষকরা। পরবর্তীতে পর্যবেক্ষণের জন্য এই প্রশিক্ষণের সময় তৈরি করা প্রতিটি জাঙ্ক সঠিকভাবে চিহ্নিত করে রাখতে হবে দল ও প্রজন্মের সংখ্যা ব্যবহার করে।

আমি নিজে এই পরীক্ষাটি করিনি (অবশ্যই আমি করতে চাই) , কিন্তু খুব দৃঢ়ভাবেই আমার মনে হয় যে, আমি পূর্বধারণা করতে পারি, এর ফলাফল কি হতে পারে। আমার ধারণা হচ্ছে, এই বিশটি দলের সব কয়টি দল তাদের দলের দশম সদস্য পর্যন্ত এই কৌশলটি শেখাতে বা হস্তান্তর করতে সফল হবে না। তবে মোটামুটিভাবে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষেত্রে তারা সফল হবেন। কোনো কোনো টিমে ভুল ভ্রান্তি হবে; হয়তো শিক্ষকদের ধারাবাহিকতায় কোনো একটি দুর্বল যোগসূত্রে কেউ হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অনুকরণ করতে ভুলে যেতে পারেন এবং তার পরবর্তী সবাই সেই একই ভুল করার মাধ্যমে তাদের কাজটির উদ্দেশ্য সফলে ব্যর্থ হবেন। যেমন, হয়তো দল ৪ ‘কাটামারান’ পর্যায় পৌঁছাতে পারে, তবে এরপর আর না। হয়তো ১৩ নং দলের অষ্টম সদস্য একটি পরিবর্তিত বা মিউট্যান্ট রূপ, যা ‘দুটি ঢাকনী সহ বাক্স’ এবং ‘পিকচার ফ্রেমের’ মাঝামাঝি কোনো রূপ সৃষ্টি করবেন এবং তার টীমের নবম এবং দশম সদস্য এই পরিবর্তিত রূপটাই পরবর্তীতে আবার অনুকরণের মাধ্যমে সৃষ্টি করবেন।

এখন যে সব দলে যেখানে শেখানো এই দক্ষতাটি দশম প্রজন্ম পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে সফলভাবে, সেখানে আমি আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই। আপনি যদি তাদের তৈরি জাঙ্কগুলোকে তাদের প্রজন্মানুযায়ী ‘ক্রমানুসারে’ সাজান, আপনি প্রজন্ম সংখ্যার সাথে ক্রমান্বয়ে পদ্ধতিগত পর্যায়ে কোনো গুণগত অবনতি লক্ষ করতে পারবেন না। কিন্তু যদি আপনি এমন কোনো একটি পরীক্ষা পরিচালনা করেন, যা সবদিক থেকে হুবহু শুধু মাত্র যে দক্ষতা হস্তান্তরিত হয়েছে সেটা কোনো অরিগ্যামি নয় বরং জাঙ্ক এর ‘ড্রইং’ এর একটি অনুলিপি আঁকা, তাহলে সেখানে আপনি পদ্ধতিগতভাবেই অবশ্যই গুণগত মানের অবমূল্যায়ন দেখতে পাবেন এর নিখুঁততায়, যেভাবে প্রজন্ম ১ থেকে প্রজন্ম ১০ অবধি টিকে যায় প্যাটার্ন বা নকশাটি।

পরীক্ষাটির ড্রইং সংস্করণে, প্রজন্ম ১০ এর সবকটি ড্রইং প্রজন্ম ১ এর সব ড্রইংগুলোর সাথে খানিকটা সদৃশ্যতা বহন করবে। এবং প্রতিটি দলের মধ্যে এই সদৃশ্যতা কম

স্থিরভাবে অবনতি হতে থাকে প্রজন্মান্তরে। এর থেকে ভিন্ন অরিগ্যামি সংস্করণের পরীক্ষায়, এই ভুলটি হয় সম্পূর্ণ নয়তো একেবারেই না। তাদের পরিবর্তনটা হবে 'ডিজিটাল' পরিবর্তনের মত। হয় কোনো টীম কোনো ভুলই করবে না, এবং প্রজন্ম ১০ এর জাঙ্ক খুব খারাপও হবে না, আবার ভালো হবে না, গড় পড়তায় তা প্রজন্ম ৫ বা প্রজন্ম ১ এর বানানো জাঙ্কের মতোই হবে বা হয়তো কোনো একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মে কোনো একটি মিউটেশন হবে, ফলে এর পরবর্তী প্রজন্মের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে পুরোপুরি, হুবহু মিউটেশনটিকে অনুলিপি করার মাধ্যমে।

এই দুই দক্ষতার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটা কি? সেটা হচ্ছে, অরিগ্যামির ক্ষেত্রে দক্ষতাটা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে করতে হবে এমন কতগুলো সুনির্দিষ্ট ক্রিয়া, যাদের কোনোটাই এককভাবে করা কোনো কঠিন কাজ নয়, বেশির ভাগই সেই ক্রিয়াগুলো যেমন, 'ঠিক মাঝখানে ভাজ করুন, দুই পাশে'। দলের কোনো একটি নির্দিষ্ট সদস্য হয়তো এই ধাপটি অনুকরণ করেন অদক্ষভাবে, তবে পরবর্তী সদস্য, যিনি শিখছেন তার কাছে স্পষ্ট অনুভূত হবে, সে আসলে কি করার 'চেষ্টা' করছে। অরিগ্যামি ধাপগুলো আসলে স্ব-স্বাভাবিকীকরণ (সেলফ নরমালাইজিং) একটি প্রক্রিয়া, এবং এটাই একে ডিজিটাল বৈশিষ্ট্য দিয়েছে; এটা আমার কাঠমিস্ত্রির মাষ্টারের উদাহরণটির মত, যার 'কাঠের মধ্যে পেরেকের মাথাটা পুরোপুরি ঢুকাতে হবে' এই উদ্দেশ্যটা তার শিক্ষার্থীর কাছে পরিষ্কার, হাতুড়ী আঘাতের খুঁটিনাটি যাই হোক না কেন। অরিগ্যামির ক্ষেত্রে আপনি হয় কোনো একটি ধাপ ঠিকমত ধরতে পারবেন অথবা পারবেন না। অন্যদিকে আঁকার দক্ষতা মূলত 'অ্যানালগ' একটি দক্ষতা, প্রত্যেকেই একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন, তবে কোনো কোনো মানুষের অনুলিপি অপেক্ষাকৃত বেশি নিখুঁততর হবে অন্যদের তুলনায় এবং কেউ একেবারে সঠিকভাবে এর হুবহু অনুলিপি তৈরি করতে পারবেন না। কোনো একটি ড্রইং সংস্করণের নিখুঁততাও নির্ভর করে কি পরিমাণ সময় এবং সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে এটি তৈরি করার সময় এবং এটি ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনশীল একটি নিয়ামক। দলের কিছু সদস্য উপরন্তু আরো খানিকটা অলঙ্করণ এবং 'গুণগতমানের উন্নতি' বৃদ্ধি করবে শুধুমাত্র এর আগের প্রতিলিপিটি হুবহু নকল করতে দেবার বদলে।

শব্দ - অন্ততপক্ষে তাদের অর্থ যখন বোধগম্য হয় - সেটিও স্ব-স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, যেমন অরিগ্যামির তৈরি করার ক্ষেত্রে হয়। চাইনীজ হুইসপারের (টেলিফোন) মূল খেলায় প্রথম শিশুকে একটি গল্প বা বাক্য শোনানো হয়, এরপর তাকে বলা হয় সেটি তার পরবর্তী শিশুকে কানে কানে জানাতে এবং এভাবে খেলাটি অগ্রসর হয়।যদি বাক্যটি সাত শব্দের কম হয়, এবং তা প্রত্যেকটি শিশুর মাতৃভাষায় হয়ে থাকে, বাক্যটির দশম প্রজন্ম অবধি অপরিবর্তিত রূপে টিকে যাবার ভালো সম্ভাবনা আছে। যদি সেটা অচেনা কোনো ভিনদেশী ভাষার হয়ে থাকে এবং প্রতিটি

শব্দ, শব্দ হিসাবে উচ্চারণ না করে যদি শিশুরা বাধ্য হয় তাদের ধ্বনি অনুযায়ী বা ফোনেটিক উপায়ে সেটি উচ্চারণ করার জন্য, তাহলে বার্তাটি শেষ অবধি টিকতে পারে না, প্রজন্মের ক্রমানুসারে এই অবনতি সেই ড্রইং সংস্করণের মতোই আরো অস্পষ্ট, অবোধ্য হয়ে যায়। যখন বার্তাটি শিশুর নিজের ভাষায় কোনো অর্থ বহন করে, এবং যদি কোনো অপরিচিত শব্দ যেমন 'ফিনোটাইপ' বা 'অ্যালিল' না থাকে, তাহলে এটি টিকে থাকে, তখন শব্দগুলোকে তাদের ধ্বনি অনুযায়ী উচ্চারণ না করে, শিশুরা প্রতিটি শব্দকে তাদের সীমাবদ্ধ শব্দভাণ্ডারের সদস্য হিসাবে চিহ্নিত করে, এবং একই শব্দগুলাকে বাছাই করে, যদিও যখন তারা পরবর্তী শিশুর নিকট বার্তাটি হস্তান্তর করে, খুব সম্ভবত তারা তা উচ্চারণ করে ভিন্ন কোনো বাচনভঙ্গীতে; লিখিত ভাষাও স্ব-স্বাভাবিকীরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে, কারণ কাগজে লেখা নানা বর্ণ, তাদের খুঁটিনাটি বিষয়ে যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন, তাদের একটি সীমাবদ্ধ (ধরা যাক) ছাব্বিশটি বর্ণের পরিবার থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

মিমরা কখনো কখনো তাদের অনুলিপিকরণ প্রক্রিয়ায় খুব বেশি মাত্রার নিখুঁততা প্রদর্শন করতে পারে এই ধরনের স্ব-স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়ার জন্য, মিম -জিন সমরূপতা সংক্রান্ত কোনো ধরনের অভিযোগের উত্তর দেবার জন্য এই সত্যটাই যথেষ্ট। এছাড়া যা-ই হোক না কেন, এর বিকাশের এই আদি পর্যায়ে মিম তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য, ওয়াটসন-ক্রিকের জিনতত্ত্বের সমমানের সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোনো ধরনের বোধগম্য পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রদান করা নয়। মিমকে সমর্থন করার আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল, আসলে সেই ধারণাটির মোকাবেলা করা, যে জিনরাই শুধু একমাত্র ডারউইনীয় প্রভাবের বিষয়, যে ধারণাটি 'দ্য সেলফিশ জিন'(৭১) বইটি প্রচার করছে এমন একটা ঝুঁকি থেকে যাবার সম্ভাবনা ছিল। পিটার রিচারসন ও রবার্ট বয়েড এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছিলেন তাদের মূল্যবান এবং চিন্তার খোরাক যোগানো 'নট বাই জিনস এলোন'(৭২) বইয়ের শিরোনামের মাধ্যমে। যদিও তারা তাদের কারণ বলেছেন কেন তারা মিম শব্দটি গ্রহন করেননি, বরং 'কালচারাল ভ্যারিয়ান্ট' বা সাংস্কৃতিক প্রকরণ শব্দটি তারা নির্বাচন করেছিলেন। স্টিফেন শেনানের 'জিনস, মিমস অ্যান্ড হিউমান হিস্টরি' (৭৩) বইটির আংশিক অনুপ্রেরণা বয়েড ও রিচারসনের এর আগের একটি অসাধারণ বই 'কালচার অ্যান্ড ইভোল্যুশনারি প্রসেস'(৭৪)। মিম নিয়ে আলোচনা করা অন্য পূর্ণাঙ্গ বইগুলো মধ্যে আছে রবার্ট আঙ্গারের 'দি ইলেকট্রিক মিম' (৭৫), কেট ডাস্টিনের 'দ্য সেলফিশ মিম' (৭৬) এবং রিচার্ড ব্রডির 'ভাইরাস অব দ্য মাইন্ড: দ্য নিউ সায়েন্স অব মিম' (৭৭)।

কিন্তু সুজান ব্ল্যাকমোর তার দ্য মিম মেশিন বইয়ে মিমেটিক তত্ত্বটি যে কারোর চেয়েই বেশি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বারবার মস্তিষ্ক (বা অন্য কোনো গ্রহন বা ধারণকারী বা কোনো চ্যানেল বা মাধ্যম) দিয়ে পূর্ণ একটি পৃথিবী এবং যেখানে

মিমরা পরস্পরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে সেই জায়গাগুলো দখল করার চেষ্টা করছে, এমন একটি দৃশ্যকল্পের কথা বলেছেন। জিনপুলের জিনদের মত, মিমরা যারা শেষ অবধি টিকে যাবে, সেগুলো আসলে সেই মিমগুলো, যারা কিনা নিজেদের অনুলিপি তৈরি করতে দক্ষ। এর কারণ হতে পারে তাদের সরাসরি কোনো আবেদন আছে, যেমন, ধারণা করা যেতে পারে 'অমরত্বের' মিম, কিছু মানুষের কাছে এর যেমন বিশেষ আবেদন আছে। অথবা হতে পারে তারা সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয় অন্য কিছু মিমদের উপস্থিতিতে যারা ইতোমধ্যেই মিম পুলে অসংখ্য। এটি মিম পুলে মিম-কমপ্লেক্স বা মিমপ্লেক্সের সৃষ্টি করে। মিমদের ব্যপারে যথারীতি আমরা আরো ভালো করে বুঝতে পারি এর সাথে জিনতাত্ত্বিক তুলনার উৎসে ফেরত গিয়ে।

বোঝানোর জন্যই আমি জিনদের এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছি যেন, তারা স্বতন্ত্র একক, যারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম। কিন্তু অবশ্যই তারা পরস্পর থেকে স্বাধীন নয়, এই বিষয়টি প্রকাশ পায় দুটি উপায়ে: প্রথমত, ক্রোমোজোমের উপর সরলরৈখিকভাবে জিনগুলো সাজানো থাকে, এবং প্রজন্মান্তরে তারা তাদের নিকটবর্তী ক্রোমোজমের 'লোকাই'-এর অন্যান্য জিনগুলোকে নিয়ে সঞ্চারিত হয়। আমরা যে যোগসূত্রকে বলি জিনগত 'লিংকেজ' এবং আমি এই বিষয়ে আর কিছু বলছি না কারণ মিমদের জিনদের মত কোনো ক্রোমোজোম কিংবা অ্যালিল নেই বা যৌন পুনসংযোগও ঘটে না। অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে জিনগুলো যে স্বাধীন নয় তা জিনগত লিংকেজ থেকে খুবই ভিন্ন, এবং এখানে বেশ ভালো মিমেটিকের অনুরূপ একটি তুলনা আছে, এটি ভ্রূণতত্ত্ব বিষয়ক - এবং যে সত্যটি প্রায়শই ভুল বোঝা হয় - এটি জিনতত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের শরীর জিগস পাজল বা ধাঁধার মত টুকরো টুকরো জোড়া লাগানো নানা ফিনোটাইপের অংশ নয়, যারা কিনা প্রত্যেকে পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন জিনের অবদান। এককভাবে কোনো জিনের সাথে শরীরের গঠন বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যর কোনো সরাসরি সংযোগ নেই। আরো শতাধিক অন্যান্য জিনের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি বিকাশ প্রক্রিয়া পরিচালনা করে শরীর সৃষ্টির মাধ্যমে যার ফলাফল পূর্ণ হয়। ঠিক যেমন করে কোনো রেসিপির নানা শব্দ রান্না করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বিশেষ ডিশ তৈরি করে। রেসিপির প্রতিটি শব্দ ডিশটির নানা টুকরোকে সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করছে, এমনটি কিন্তু নয়।

সুতরাং জিনরা আসলে দলবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শরীর তৈরি করে এবং এটি ভ্রূণতত্ত্বের একটি মূলনীতি। প্রাকৃতিক নির্বাচন এক দল জিনকে সহায়তা করে অন্যান্য বিকল্প একদল জিনের তুলনায় এমনভাবে বলার একটা প্রলোভন এড়ানো কঠিন। এবং এখানেই সংশয়; আসলে যেটা ঘটে, তাহলো জিনপুলে অন্যান্য জিনরা সেই পরিবেশের একটি বড় অংশ তৈরি করে, যেখানে প্রতিটি জিন বনাম তার বিকল্প অ্যালিল বা সংস্করণটি নির্বাচিত হয়। যেহেতু প্রতিটি জিন নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে

সফলতা অর্জন করে অন্য জিনদের উপস্থিতিতে - যারা নিজেরাও একই ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত হয়েছে - এভাবে সহযোগী জিনদের গুচ্ছ বা কার্টেল নির্বাচনের মাধ্যমে 'উদ্ভব' হয়। আমাদের যেটা আছে সেটি পরিকল্পিত নিয়মিত অর্থনীতির তুলনায় বরং অনেকটাই মুক্ত বাজার অর্থনীতির মত। এখানে কসাই আছেন একজন, রুটি বানানো বেকার আছেন একজন, কিন্তু বাজারে একটি শূন্যস্থান হয়তো আছে একজন মোমবাতির কারিগরের। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অদৃশ্য হাত সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করে। এটি কিন্তু একজন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাকারীর উপস্থিতির ধারণা থেকে ভিন্ন, যিনি কসাই-বেকার আর মোমবাতির কারিগরের এই ত্রিমুখী সহযোগী গ্রুপগুলোকে সমর্থন করেন। পরস্পর সহযোগিতাপূর্ণ জিনগুচ্ছ বা কার্টেল অদৃশ্য হাত দিয়ে এক জায়গায় জড়ো করার ধারণাটি ধর্মের মিমগুলো এবং কিভাবে তারা কাজ করে বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

বিভিন্ন ধরনের জিনদের গ্রুপ বা কার্টেলের উদ্ভব হয় বিভিন্ন জিন পুলে। মাংসাশী জিন পুলে এমন জিন থাকবে যা শিকার ধরার ইন্দ্রিয়, শিকার ধরার মত নখর, মাংসাশী দাত, মাংস হজম করার জন্য প্রয়োজনীয় উৎসেচক এবং আরো অন্যান্য জিন, সবাই বিশেষভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং শারীরবৃত্তীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে। এবং একই সাথে, নিরামিশভোজী প্রাণীদের জিন পুলে ভিন্ন পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ জিনগুলো সহায়তা পাবে তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করার জন্য। আমরা সেই ধারণার সাথে পরিচিত , একটি জিন প্রজাতির বহিঃপরিবেশের সাথে এর প্রকাশ বা ফেনোটাইপের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতার কারণে বিশেষ সহায়তার জন্য নির্বাচিত হয়, মরুভুমি, বনভুমি বা সেটা যেখানেই হোক না কেন। আমি যে বিষয়টা এখানে উল্লেখ করতে চাইছি তা হলো, এছাড়াও সহায়তার জন্য এটি নির্বাচিত হয় কোনো একটি নির্দিষ্ট জিনপুলে অন্যান্য জিনের সাথে এর পারস্পরিক সামঞ্জস্যতার উপরেও ভিত্তি করে। কোনো মাংসাশী জিন নিরামিশভোজী প্রাণীদের জিনপুলে টিকতে পারবে না এবং এর উল্টোটাই ঘটে মাংসাশী জিন পুলে কোনো নিরামিশাষী জিনগুলোর ক্ষেত্রে। যদি জিনের দীর্ঘদৃষ্টি দিয়ে ব্যপারটা দেখা হয়, কোনো প্রজাতির জিন পুল - জিনদের সেই সেট যা বারবার বিন্যস্ত ও পুনর্বিন্যস্ত হচ্ছে যৌন প্রজননের মাধ্যমে - তারা সেই জিনতাত্ত্বিক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে প্রতিটি জিন নির্বাচিত হয় তাদের পারস্পরিক সহযোগিতা করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। যদিও মিমদের পুল জিনপুলের মত এতো নিয়ম নির্ভর বা গোছানো নয়, তাসত্ত্বেও আমরা একটি মিম পুলের কথা বলতে পারি, কোনো মিমপ্লেক্সের প্রতিটি মিমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ 'পরিবেশ' হিসাবে।

মিমপ্লেক্স হচ্ছে এক সেট মিম যারা, নিজেরা এককভাবে টিকে থাকতে তেমন দক্ষ না হলেও, মিমপ্লেক্সে অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এরা সফলভাবে টিকে থাকতে

সক্ষম। এর আগের অনুচ্ছেদে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম ভাষার বিবর্তনের খুঁটিনাটি ক্ষেত্রগুলো বিশেষ কোনো সুবিধা পায় না এক ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। আমার ধারণা যে, ভাষার বিবর্তন বরং নিয়ন্ত্রণ করে 'র‍্যানডোম ড্রিফট'; অনুমান করা সম্ভব যে কিছু স্বরবর্ণ বা ব্যাঞ্জনবর্ণ পাহাড়ী পরিবেশে অন্য স্বরবর্ণ বা ব্যাঞ্জন বর্ণ অপেক্ষা বেশি প্রযোজ্য এবং সেই কারণে সেগুলো বৈশিষ্ট্যমূলক যেমন, সুইস, তীব্বতীয় এবং আন্দেজ পর্বতাঞ্চলের ভাষার আঞ্চলিকতা। অন্য দিকে যেমন কিছু শব্দ ফিসফিস করে বলার জন্য উপযুক্ত, যেমন গভীর জঙ্গলে, এই কারণে বৈশিষ্ট্যমূলক পিগমী বা আমাজনীয় ভাষায়। কিন্তু ভাষা নিয়ে যে উদাহরণ আমি উল্লেখ করেছিলাম সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে – 'গ্রেট ভাওয়েল শিফটের' তত্ত্বটির হয়তো একটি ব্যাখ্যা আছে - যদিও সেই ব্যাখ্যাটি এই ধরনের না হতে পারে। বরং এটি হতে পারে পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মিমপ্লেক্স এ মিমদের উপযুক্ত জায়গা খুঁজে নেবার মাধ্যমে। একটি স্বরবর্ণ প্রথমে পরিবর্তিত হয়, অজানা কোনো কারণে - হয়তো কোনো প্রশংসার পাত্র বা শক্তিশালী কোনো ব্যক্তির মত করে ফ্যাশন দূরস্ত উচ্চারণ অনুকরণের মাধ্যমে, 'স্প্যানিশ লিস্প' এর কারণ হিসাবে যা বলা হয়। কিভাবে গ্রেট ভাওয়েল শিফট হলো সেটা যা-ই হোক না কেন: এই তত্ত্বানুযায়ী একবার যখন প্রথম স্বরবর্ণ পরিবর্তিত হয়, অন্য স্বরবর্ণ সেটি পালাক্রমে অনুসরণ করে যে-কোনো ধরনের অস্পষ্টতাকে হ্রাস করার প্রচেষ্টায়, এইভাবে ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে। এবং দ্বিতীয় পর্বে ইতোমধ্যে বিদ্যমান মিমপুল থেকে মিমরা নির্বাচিত হয়, যারা পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মিমদের নিয়ে মিমপ্লেক্স তৈরি করে।

অবশেষে ধর্মের মিমেটিক তত্ত্বটি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এখন আমরা যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করেছি; কিছু ধর্মীয় ধারণা, কিছু জিনের মতোই হয়তো টিকে সাথে শুধুমাত্র এর নিজের যোগ্যতায়। এই মিমগুলো টিকে থাকতে পারে যে-কোনো মিম পুলে, তাদের চারপাশে যে মিম থাকুক না কেন (এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমি অবশ্যই আবার বলছি যে যোগ্যতা বা মেরিট এই অর্থে মিম পুলে টিকে থাকার 'যোগ্যতা' মাত্র, এর বাইরে এই শব্দটির বিশেষ চূড়ান্ত কোনো মূল্য বিচার নেই)।

কিছু ধর্মীয় ধারণা টিকে থাকে কারণ, কোনো একটি মিমপ্লেক্সের অংশ হিসাবে মিমপুলে যে মিমগুলো ইতোমধ্যেই সংখ্যায় প্রচুর সেই মিমগুলোর সাথে তারা সামঞ্জস্যপূর্ণ। নীচে আমি ধর্মীয় মিমগুলোর একটি আংশিক তালিকা উল্লেখ করলাম, যা সম্ভবত মিমপুলে টিকে থাকার বিশেষ যোগ্যতা আছে , হয় সম্পূর্ণভাবে তাদের একক 'যোগ্যতায়' অথবা বিদ্যমান মিমপ্লেক্সগুলোর সাথে এর সামঞ্জস্যতার কারণে।

- আপনার মৃত্যুর পরও আপনি বেঁচে থাকবেন।

- যদি আপনি শহীদ হিসাবে মৃত্যুবরণ করেন, তবে আপনার জায়গা হবে বেহেশতের বিশেষ একটি স্থানে যেখানে আপনি বাহাত্তরটি কুমারী নারী ভোগ করতে পারবেন (সেই দুর্ভাগা কুমারীর জন্য একটু ভেবে দেখুন)।

- ধর্মীয় ভিন্নমতাবলম্বী বা হেরেটিক, অবমাননাকারী এবং স্বধর্মত্যাগীদের হত্যা করা উচিত (বা তাদের অন্য কোনোভাবে শাস্তিপ্রদান করা উচিত যেমন, তাদের পরিবার থেকে তাদের সম্পর্কচ্যুত করা ইত্যাদি)।

- ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সদগুণ বা পূণ্য। আপনি যদি কখনো অনুভব করেন যে, আপনার বিশ্বাস দোদ্যুল্যমান, তবে সেটিকে স্থির ও দৃঢ় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করুন এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন আপনার অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে তিনি যেন আপনাকে সাহায্য করেন (পাসকালের বাজি সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমি উল্লেখ করেছিলাম, সেই অদ্ভুত ধারণাটি কথা, যে ঈশ্বর আমাদের কাছে আসলে যে জিনিসটা চান সেটা হচ্ছে তার উপর আমাদের বিশ্বাস। সেই সময় আমি এটাকে একটি ব্যতিক্রম হিসাবে চিহ্নিত করেছিলাম, তবে এখন এর একটি কারণ আছে আমাদের)।

- ফেইথ (কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই যে বিশ্বাস) হচ্ছে একটি উত্তম গুণ। আপনার বিশ্বাস যত বেশি প্রমাণকে উপেক্ষা করবে, তত বেশি ধর্মীয় গুণে গুণান্বিত হবেন আপনি। একনিষ্ঠ গুণবান বিশ্বাসীরা যত বেশি অদ্ভুত কিছু বিশ্বাস করতে সক্ষম হন, যা অসমর্থিত এবং কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য না কোনো প্রমাণের আলোকে বা যুক্তিতে, তারা তাদের এই অন্ধবিশ্বাসের জন্য বিশেষভাবে পুরস্কৃত হবেন।

- প্রত্যেকেই, এমনকি যাদের কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস নেই, ধর্ম বিশ্বাসীদের বিশ্বাসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং প্রশ্নাতীতভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে, এবং অন্য ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি সাধারণত যা করা হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় তাদের সেই বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে (অধ্যায় ১ এ বিষয়টি আলোচনায় এসেছে)।

- বেশ অদ্ভুত কিছু বিষয় আছে (যেমন, ট্রিনিটি, ট্রান্সসাবস্টানসিয়েশন, ইনকারনেশন) যা আমাদের 'বোঝার' জন্য না; এমনকি এসব কোনো কিছু বোঝার কোনো 'চেষ্টা' করারও দরকার নেই কারণ বিষয়গুলো বোঝার প্রচেষ্টার প্রক্রিয়া সেগুলোকে ধ্বংস করে দিতে পারে। বরং শিখুন এগুলোকে 'রহস্য' হিসাবে চিহ্নিত করে কিভাবে পূর্ণতা এবং সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

- সুন্দর সঙ্গীত, শিল্পকলা এবং ধর্মীয় গ্রন্থ হলো নিজেরাই স্ব-অনুলিপনকারী ধর্মীয় ধারণার টোকেন।

উপরে তালিকায় বর্ণিত কিছু মিমের সম্ভবত চূড়ান্ত সারভাইভাল মূল্য আছে এবং সেটি যে-কোনো মিমপ্লেক্সে ভালোভাবেই টিকে থাকতে পারে সফলতার সাথে। কিন্তু, জিনের ক্ষেত্রে যেমন হয়, কিছু মিম টিকে থাকে অন্য বেশ কিছু মিমের উপস্থিতিতে সৃষ্ট একটি উপযুক্ত পরিবেশে, যা বিকল্প নানা মিমপ্লেক্সগুলো গড়ে উঠতে সহায়তা করে। দুটি ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসকে দেখা যেতে পারে, দুটি বিকল্প মিমপ্লেক্স হিসাবে, যেমন, হয়তো ইসলাম হচ্ছে মাংসাশী জিন কমপ্লেক্সের অনুরূপ, এবং বৌদ্ধধর্মবাদ যেমন নিরামিশাষী জিন কমপ্লেক্সের অনুরূপ। চূড়ান্ত কোনো অর্থে কিন্তু কোনো ধর্মের 'ধারণাগুলো' অন্য কোনো একটি ধর্মের 'ধারণাগুলো'র চেয়ে উত্তম নয়। ঠিক যেমন মাংসাশী জিন নিরামিষাশী জিন থেকে উত্তম না যে অর্থে। এই ধরনের ধর্মীয় মিমগুলোর চূড়ান্তভাবে টিকে থাকার থাকার কোনো বিশেষ গুণাবলী থাকতেই হবে এমন কোনো প্রয়োজনীয়তাও কিন্তু নেই। তাসত্ত্বেও, তারা টিকে থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ এই অর্থে যে, তারা শুধু তাদের ধর্মের অন্য মিমদের উপস্থিতিতে ভালোভাবেই তাদের জায়গা করে নিতে পারে, বিকশিত হতে পারে, যা অন্য ধর্মের মিমদের উপস্থিতিতে ঘটে না। এই মডেলে, রোমান ক্যাথোলিকবাদ ও ইসলাম, ধরুন অবশ্যই কোনো একক ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, বরং তারা বিবর্তিত হয়েছে পৃথক পৃথকভাবে বিকল্প মিমদের একটি গুচ্ছ হিসোবে যারা পূর্ণ বিকাশ হবার সুযোগ পেয়েছে একই মিমপ্লেক্সদের সহাবস্থানে।

সংগঠিত ধর্ম সংগঠিত হয়েছে মানুষের দ্বারাই: যাজক এবং বিশপ, রাবাই, ইমাম, আয়াতোল্লাহদের দ্বারাই। কিন্তু আমি মার্টিন লুথার সংক্রান্ত যে বিষয়টির অবতারণা করেছিলাম আগে, সেই বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করেই বলছি, এর অর্থ কিন্তু এটা নয়, যে ধর্মের প্রথম ধারণার সূত্রপাত বা পরিকল্পনা করেছে কোনো মানুষ; এমনকি যেখানে ধর্মকে অপব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ক্ষমতায় থাকা মানুষগুলোর স্বার্থে। প্রবল সম্ভাবনা আছে যে, প্রতিটি ধর্মের খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ই মূলত তার আকৃতি পেয়েছে অচেতন বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়। কোনো জিনতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে না, কারণ সেই প্রক্রিয়া খুবই ধীর, যা ধর্মের বিবর্তন ও এবং নানা বিভাজনকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই কাহিনীতে জিনতাত্ত্বিক প্রাকৃতিক নির্বাচনের ভূমিকা হলো, প্রয়োজনীয় প্রাক-প্রবণতা এবং পক্ষপাতিত্বসহ সেই মস্তিষ্ক সরবরাহ করা - অর্থাৎ একটি হার্ডওয়ার প্ল্যাটফর্ম ও লো লেভেল সিস্টেম সফটওয়্যার, যা মিমেটিক বা মিম-নির্ভর নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। এই প্রেক্ষাপটে আমার কাছে মনে হয় কোনো এক ধরনের মিম নির্ভর প্রাকৃতিক নির্বাচনই ব্যাখ্যা করতে পারে কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মের বিস্তারিত বিবর্তন প্রক্রিয়াটিকে। ধর্মীয় বিবর্তনের প্রাথমিক ধাপগুলোতে, এটি কোনো সংগঠিত রূপ নেবার আগে, সাধারণ মিমগুলো মানুষের মনস্তত্ত্বে তাদের বিশেষ

আবেদনের জন্য টিকে থাকে। এবং এখানেই ধর্মের মিমতত্ত্ব এবং মানসিক কোনো প্রক্রিয়ার উপজাত হিসাবে ধর্মের উৎপত্তি তত্ত্বটি একে অপরের সাথে মিশে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে যখন ধর্ম রূপান্তরিত হয় সংগঠনে, বিস্তারিত নানা ধরনের আচার এবং কাল্পনিক নানা নিয়মকানুনের মাধ্যমে ভিন্নতা পায় অন্যান্য ধর্মগুলো থেকে, সেই পর্যায়ে ধর্মের নানা বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার জন্য মিমপ্লেক্স তত্ত্বটি বেশ যথেষ্ট - পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মিমদের কার্টেল বা গোষ্ঠী। এটি অবশ্য যাজক কিংবা অন্যদের পরিকল্পনা মাফিক বাড়তি কিছু ম্যানিপুলেশনের ভূমিকা থাকার সম্ভবনাকে বাতিল করে না; ধর্ম সম্ভবত কিছুটা অংশ, বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পরিকল্পনার অংশ, যেমন করে শিল্পকলার ক্ষেত্রে নানা স্কুল বা ঘরানা বা শৈলীগুলো সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

প্রায় সম্পূর্ণ একটি ধর্ম যাকে বুদ্ধিমত্তা দ্বারা ‘ডিজাইন’ করা হয়েছে, সেটি হচ্ছে সায়েন্টোলজি (৭৮), কিন্তু আমার সন্দেহ এটি ধারার ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনাই বেশি। পুরোপুরি পরিকল্পিত ধর্মের খেতাব পাবার আরেক দাবীদার হচ্ছে মরমনবাদ (৭৯)। জোসেফ স্মিথ, এই ধর্মটির অত্যন্ত বিশেষ প্রকৃতির সৃজনশীল ও মিথ্যাচারী আবিষ্কারক, এক অস্বাভাবিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন একটি পবিত্র গ্রন্থ সৃষ্টি করেছিলেন, ‘বুক অব মর্মন’, যেখানে একেবারে শূন্য থেকে তিনি নতুন একটি আমেরিকার মিথ্যা কাল্পনিক ইতিহাসের অবতারণা করেন ভুয়া সপ্তদশ শতকের ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করে। এছাড়াও উনবিংশ শতাব্দীতে এর সৃষ্টি হবার পর মরমনবাদ বিবর্তিত হয়েছে অনেকটাই এবং এখন এটি যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সম্মানজনক একটি ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। আসলেই, দাবী করা হচ্ছে এটি সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মগুলোর একটি এবং এখন ভবিষ্যত তাদের একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী খুঁজে বের করার ব্যপারে কথা হচ্ছে।

সব ধর্মই বিবর্তিত হয়। ধর্মীয় বিবর্তনের যে তত্ত্বই আমরা গ্রহন করি না কেন, সেই তত্ত্বটিকে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে যে বিস্ময়কর হারে ধর্মীয় বিবর্তন প্রক্রিয়া অগ্রসর হতে পারে, সেটি ব্যাখ্যা করতে হবে।একটি কেস স্টাডি আলোচনা করা যাক:

কেস স্টাডি: কার্গো কাল্ট

‘দ্য লাইফ অব ব্রায়ান’ (৮০) চলচ্চিত্রে মন্টি পাইথন টিমের (৮১) অনেকগুলো সঠিক ধারণার একটি ছিল, কিভাবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে একটি নতুন ধর্মীয় কাল্ট বা গোষ্ঠী তার যাত্রা শুরু করতে পারে। রাতারাতি এরা গজিয়ে উঠতে পারে, প্রায় একরাতের মধ্যেই এবং এরপর যা মূলধারার সংস্কৃতির সাথে আত্তীকৃত হয়, যেখানে অস্বস্তিকর প্রভাবশালী একটি ভূমিকায় এদের দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় মেলানেশিয়া এবং নিউ গিনি ভিত্তিক ‘কার্গো কাল্ট’ সম্ভবত এর সবচেয়ে বিখ্যাত বাস্তব একটি উদাহরণ

হতে পারে। এই ধরনের বেশ কিছু কাল্টের, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আমাদের বর্তমান স্মৃতিতেই রক্ষিত আছে। কাল্ট অব জিসাস হয়তো একটি ব্যতিক্রম, যার সূচনা খুব বিশ্বাসযোগ্যভাবে চিহ্নিত করা যাবে না, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধরনের ধর্মীয় গোষ্ঠীর জীবনচক্রটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ব্যপারটা ঘটে যায় আমাদের চোখের সামনেই (এবং এমনকি তারপরও, আমরা পরে যে বিষয়টি দেখবো, বেশ কিছু খুঁটিনাটি বিষয় কিন্তু হারিয়ে যায়)। খ্রিস্ট ধর্মীয় গোষ্ঠী বা কাল্ট যে একইভাবে শুরু হয়েছিল এবং শুরুর দিকে সেই একই দ্রুততার সাথে এটি ছড়িয়ে পড়েছিল এমন অনুমানের একটি আকর্ষণীয় শক্তি উপেক্ষা করা কষ্ঠসাধ্য।

‘কার্গো কাল্ট’ সম্পর্কে আমার মূল তথ্যসূত্র ডেভিড অ্যাটেনবুরোর (৮২) ‘কোয়েস্ট ইন প্যারাডাইস’ (৮৩) প্রামাণ্যচিত্রটি, অনুগ্রহ করে আমাকে যার একটি কপি তিনি উপহার দিয়েছিলেন। এখানে সেই উনবিংশ শতাব্দীর আদি কাল্ট থেকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের সবগুলোর বিখ্যাত কাল্টগুলো, সব ক্ষেত্রেই একই প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়। আপাতদৃষ্টিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের দ্বীপে আসা শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের, যেমন নতুন শাসক, মিশনারী কিংবা সৈন্যদের সঙ্গে করা আনা বিবিধ জিনিশপত্র দেখে পুরোপুরি বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল দ্বীপবাসীরা। তারা সম্ভবত (আর্থার সি) ক্লার্কের (৮৪) তৃতীয় সুত্রের স্বীকার, আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে যেটি উল্লেখ করেছিলাম, ‘যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর কোনো প্রযুক্তিকে জাদু থেকে পৃথক করা যায় না’।

দ্বীপের অধিবাসীরা যেটা লক্ষ করেছিলো তা হলো, এই শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিরা, যারা এই বিস্ময়কর সামগ্রীগুলো উপভোগ করেন, তারা সেগুলো নিজেরা তৈরি করেন না। যখন কোনো সামগ্রী মেরামতের প্রয়োজন হয় তারা সেগুলো অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেন এবং সেই জায়গায় নতুন সেই সামগ্রীগুলো ‘কার্গো’ হিসাবে জাহাজে বা পরে উড়োজাহাজে করে সেখানে ক্রমাগত আসতেই থাকে। কোনো শ্বেতাঙ্গকে কোনোদিনও সেই সব সামগ্রী বানাতে বা মেরামত করতে দ্বীপবাসীদের কেউ দেখেনি, এবং আসলেই তাদের এমন কিছু করতেও কখনো দেখা যায় না যা উপযোগী (ডেস্কের পিছনের বসে সারাদিন কাগজ নাড়াচড়া করা নিশ্চয়ই কোনো ধরনের ধর্মীয় ভক্তি আচারেরই প্রকাশ) মনে হতে পারে। স্পষ্টতই, এই ‘কার্গো’ অবশ্যই কোনো অতিপ্রাকৃত উৎস থেকেই আসছে, এবং যেন দ্বীপবাসীদের এই ধারণা সমর্থন করতেই শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলো এমন কিছু নির্দিষ্ট কাজ করে, যাকে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান হিসাবে শুধুমাত্র দেখা যেতে পারে:

তারা উঁচু উঁচু মাস্তুল বানায়, যার সাথে সংযোগ করা থাকে তার। সাদা মানুষগুলো সেখানে বসে ছোটো বাক্সের মধ্যে কি যেন শোনে, সেখানে বিচিত্র নানা রঙের আলো জ্বলে আর নেভে এবং বিচিত্র শব্দ এবং চাপা গলার আওয়াজ সেখানে শোনা যায়; তারা স্থানীয় মানুষগুলোকে একই ধরনের পোষাক পরার জন্য রাজি করায় এবং সেই কাপড়

পরিয়ে তাদের কুচকাওয়াজ করানো হয় - এবং অযথা কালক্ষেপণ করার এর চেয়ে আর কোনো পেশা উদ্ভাবন করা খুবেই কষ্টসাধ্য। এবং তারপর স্থানীয় অধিবাসীরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এই রহস্য সমাধানের সূত্রটি অবশেষে তারা খুঁজে পেয়েছে; এই সব অবোধ্য কর্মকাণ্ডগুলো আসলে সেইসব ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যা সাদা মানুষগুলো ব্যবহার করে ঈশ্বরকে যথাসময়ে সেখানে ‘কার্গো’ প্রেরণ করার জন্য রাজী করানোর উদ্দেশ্যে। যদি স্থানীয় অধিবাসীরা কার্গো চায়, তাহলে তাদেরও অবশ্যই সেই একই আচার অনুষ্ঠানগুলো পালন করতে হবে।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যপার হলো ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে ব্যাপকভাবে বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোয় এমন অনেক ‘কার্গো কাল্ট’ স্বতন্ত্রভাবে গড়ে উঠেছিল। ডেভিড অ্যাটেনবুরো আমাদের যা বলছেন:

> নৃতাত্ত্বিকরা নিউ ক্যালিডোনিয়ায় দুইটি, সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে চারটি, ফিজিতে চারটি, নিউ হেবরিডিজে সাতটি, নিউ গিনিতে পঞ্চাশেরও অধিক এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করেছিলেন। অধিকাংশই এলাকাই মূলত পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, ঘটনাগুলোর পারস্পরিক কোনো যোগসূত্রতাও ছিল না। এই ধর্মগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুসারীদের দাবী, একটি নির্দিষ্ট মেসাইয়া বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি যেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে, সেই দিন তাদের জন্য ‘কার্গো’ নিয়ে আসবেন।

স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হওয়া বহু সংখ্যক ভিন্ন কিন্তু অনুরূপ ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো সামাগ্রিকভাবে মানব মনোস্তাত্ত্বিক জগতে একাত্মকারী কিছু বৈশিষ্ট্যসমুহের ইঙ্গিত দেয়।

নিউ হেবরিডেস (১৯৮০ সাল থেকে যা পরিচিত ভানুয়াতু দ্বীপপুঞ্জ হিসাবে) দ্বীপপুঞ্জের তাননা দ্বীপের বিখ্যাত একটি ‘কাল্ট’ এখনো টিকে আছে। এটি কেন্দ্রে আছে ‘জন ফ্রাম’ নামক একজন মহামানবীয় চরিত্র। সরকারী দলিল পত্রে জন ফ্রাম সংক্রান্ত তথ্য লক্ষ করা যায় প্রায় ১৯৪০ সাল থেকেই। কিন্তু এমনকি এত সাম্প্রতিক একটি কিংবদন্তী হওয়া সত্ত্বেও, নিশ্চিৎভাবে কারোরই জানা নেই, আসলেই সত্যিকার কোনো মানুষ হিসাবে জন ফ্রামের আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল কিনা। একটি কিংবদন্তী তাকে বর্ণনা করেছে, ছোটোখাট একজন পুরুষ হিসাবে, যার গলার স্বর ছিল তীক্ষ্ম, বিবর্ণ রঙের চুল ছিল তার, চকচকে বোতামসহ পরনে থাকতো একটি কোট। তিনি বেশ কিছু অদ্ভুত সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এবং তার বিশেষ প্রচেষ্টার একটি ছিল স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা। একটি সময় তিনি তার পূর্বপুরুষদের কাছে ফিরে যান, যাবার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান, বিজয়ীরে বেশে তিনি আবার ফিরে আসবেন, প্রচুর পরিমানে ‘কার্গো’ সাথে নিয়ে। তার মহাপ্রলয়ের ধারণাটি ছিল একটি

ভয়াবহ বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের ঘটনা; যখন সব পর্বত ভেঙ্গে সমতলের সমান হয়ে সাথে মিশে যাবে, উপত্যকাগুলো পূর্ণ হয়ে যাবে, বৃদ্ধ মানুষরা তাদের যৌবন ফিরে পাবেন এবং সকল ব্যাধি অদৃশ্য হবে, চিরকালের জন্য শ্বেতাঙ্গদের দ্বীপ থেকে বিড়াতিত করা হবে এবং বিশাল পরিমানে তাদের কাছে 'কার্গো' এসে পৌঁছাবে এবং যে যতটুকু চায় ততটুকুই তারা নিতে পারবেন' (৮৫)।

স্থানীয় সরকারের কাছে সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিষয়টি ছিল, জন ফ্রাম আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার দ্বিতীয়বার আসার সময়, তিনি নতুন পয়সা নিয়ে আসবেন, যেখানে নারিকেলের ছবির ছাপ থাকবে। সেই কারণে সবাইকে অবশ্যই শ্বেতাঙ্গদের টাকা পরিত্যাগ করতে হবে। ১৯৪১ সালে এই ধরনের বার্তা অধিবাসীদের মধ্যে অতিমাত্রায় কেনাকাটা করার ধুম ফেলে দিয়েছিল, মানুষ কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, এবং পরিণতিতে দ্বীপের সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বীপের ঔপনিবেশিক প্রশাসকরা এদের মূলনেতাদের গ্রেফতার করেছিলেন, কিন্তু তারা এমন কিছুই করতে পারেননি যাতে গোষ্ঠীটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। এছাড়া খ্রিস্টান মিশনারীদের নির্মিত চার্চ আর স্কুলগুলো জনশূন্য পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল।

এবং এর কিছুদিন পর, ধর্মগোষ্ঠীটির মধ্যে নতুন একটি মতবাদ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছিল: জন ফ্রাম একদা যুক্তরাষ্ট্রের রাজা ছিলেন; এবং ঘটনাক্রমে, সেই একই সময়ে যুক্তরাষ্টের সৈন্যরা নিউ হেবরিডেসে আসতে শুরু করেছিলেন, এবং দ্বীপবাসীদের বিস্ময়ের মধ্যে আরো বিস্ময় ছিল, সেই নতুন আগত সেনাবহরে কৃষ্ণাঙ্গরাও ছিলেন, যারা দ্বীপের অধিবাসীদের মত দরিদ্র নয় বরং ..শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের মত তারাও নানা সামগ্রীর (কার্গো) মালিক। তাননা দ্বীপের অধিবাসীদের তীব্র একটি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। মহাপ্রলয়ের দিন তাহলে অতি সন্নিকটে। আপাতদৃষ্টিতে সবাই জন ফ্রামের দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেছিলেন। তাননার অন্যতম একজন নেতা অভিমত দিয়েছিলেন, জন ফ্রাম আসবেন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উড়োজাহাজে চড়ে এবং শত শত মানুষ দ্বীপের ঠিক মধ্যখানে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করেছিল, যেন তার সেই উড়োজাহাজ অবতরণ করার জন্য জায়গা বা এয়ারস্ট্রিপ পায়।

আদিবাসীদের বানানো সেই 'বিমান বন্দরে' ছিল, বাঁশের তৈরি একটি কন্ট্রোল টাওয়ার, সেখানে কাঠের মিথ্যা হেডফোন পরা এয়ার ট্রাফিক নিয়ন্ত্রকরাও ছিলেন। এমনকি সেখানে সেই তথাকথিত রানওয়েতে 'ডিকয়' হিসাবে মিথ্যা উড়োজাহাজও সাজানো ছিলো, যেন তারা জন ফ্রামকে বহনকারী উড়োজাহাজটিকে ঠিক সেখানে অবতরণ করার জন্য প্রলোভিত করতে পারেন।

জন ফ্রামের অনুসারী এই অদ্ভুত গোষ্ঠী নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে ১৯৫০ এর দশকে তরুণ ডেভিড অ্যাটেনবরো, ক্যামেরাম্যান জিওফ্রে মুলিগানকে নিয়ে তাননা দ্বীপে এসেছিলেন। তারা সেখানে সেই ধর্মের বহু প্রমাণ আবিষ্কার করেছিলেন এবং এক পর্যায়ে ধর্মগোষ্ঠীটির সবচেয়ে উঁচু স্তরের যাজক 'নামবাস' নামক এক ব্যক্তির সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল।

নামবাস তাদের মেসিয়াহ জন ফ্রামকে শুধু 'জন' নামেই উল্লেখ করেছিলেন, যেন তিনি তার অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত এমন কেউ। এছাড়া নিয়মিত এই জনের সাথে 'রেডিওর' মাধ্যমে তার কথাবার্তা হয় বলেও তিনি দাবী করেছিলেন। যোগাযোগের এই উপকরণটি ('জনের রেডিও') মূলত হচ্ছে একজন বৃদ্ধা, যার কোমরে চারপাশে একটি বৈদ্যুতিক তার প্যাচানো রয়েছে, যে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে গিয়ে অবোধ্য ভাষায় কিছু শব্দ সৃষ্টি করে থাকে, আর নামবাস জন ফ্রামের প্রেরিত বার্তা হিসাবে সেটি অনুবাদ করেন। নামবাস দাবী করেছিলেন, ডেভিড অ্যাটেনবরোর যে তার সাথে দেখা করতে আসছেন সেটি তিনি আগেই জানতেন, কারণ জন ফ্রাম 'রেডিওর' মাধ্যমে আগেই সেই তথ্যটি তাকে জানিয়েছিলেন। অ্যাটেনবরো নামবাসের কাছে এই বিশেষ রেডিওটি দেখতে চাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তা (বোধগম্য কারণেই) প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নামবাসের কাছে অ্যাটেনবরো জানতে চেয়েছিলেন, তিনি কখনো জন ফ্রামকে স্বচক্ষে দেখেছেন কিনা।

> নামবাস খুব দৃঢ়তার সাথে মাথা ঝাকিয়ে উত্তর দেন, 'আমি তাকে বহুবার দেখেছি'।
> 'কেমন দেখতে তিনি?'
> নামবাস আমার দিকে আঙ্গুল তুলে বলে, 'সে তোমার মত দেখতে, তার সাদা মুখ আছে, সে লম্বা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে।'

উপরে বর্ণিত এই বিষয়টি দীর্ঘদিনের সেই জনের কিংবদন্তীর সাথে স্ববিরোধী হয়ে যায়, যে কাহিনীতে তাকে খর্বকায় একজন মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিবর্তিত কিংবদন্তীগুলোর সাথে সাধারণত এমনই হয়ে থাকে।

এই ধর্মাগোষ্ঠীর সদস্যরা বিশ্বাস করেন, জন ফ্রামের প্রত্যাবর্তনের দিনটি হবে ১৫ ফেব্রুয়ারি, কিন্তু কোনো বছরে, সেটি কেউ জানেন না। সেই কারণে প্রতি বছর ১৫ ফেব্রুয়ারী তার অনুসারীরা তাকে স্বাগত জানাতে নানা ধর্মীয় আচার ও অনুষ্ঠানে একত্রিত হয়ে থাকেন। তবে এখনো পর্যন্ত তিনি ফিরে আসেননি, কিন্তু এজন্য তার অনুসারীদের উৎসাহে অবশ্য কোনো ভাটা পড়েনি। ডেভিড অ্যাটেনবরো একজন এই ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্যাম নামক একজন সদস্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন:

কিন্তু স্যাম, প্রায় ১৯ বছর তো হয়ে গেল, জন বলেছিলে সে কার্গো নিয়ে আসবে, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, এর পরে আবারো প্রতিজ্ঞা করেছেন, কিন্তু কার্গোতো এখনো আসলো না। এই ১৯ বছর কি অপেক্ষা করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় না? স্যাম মাটির দিক থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, যদি তুমি যীশু খ্রিস্টের জন্য দুই হাজার বছর অপেক্ষা করতে পারো, সে যদি না আসে, তাহলে আমি কি জনের জন্য ১৯ বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে পারি না ?

রবার্ট বাকমান (৮৬) তার 'ক্যান উই বি গুড উইদাউট গড'?(৮৭) বইয়ে জন ফ্রামের কোনো ভক্তের প্রশংসাযোগ্য সেই একই উদ্ধৃতির উল্লেখ আছে, তবে সেটি করা হয়েছে একজন কানাডীয় সাংবাদিকের কাছে এবং ডেভিড অ্যাটেনবরোর সাথে দেখা হবার পর প্রায় ৪০ বছর পরে।

যুক্তরাজ্যের রানি এবং তার স্বামী প্রিন্স ফিলিপ ১৯৭৪ সালে এই এলাকায় সফরে এসেছিলেন, এবং প্রিন্স যথারীতি পরবর্তীতে জন ফ্রামের ধর্মগোষ্ঠীর মতোই ঐশ্বরিক রূপ পেয়েছিলেন (আবারো লক্ষ করুন কত দ্রুত ধর্মীয় বিবর্তনের বিস্তারিত খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পরিবর্তিত হতে পারে); প্রিন্স ফিলিপ নিঃসন্দেহে একজন সুদর্শন পুরুষ, তার নৌবাহিনীর ইউনিফর্ম এবং পালক লাগানো হেলমেটে স্থানীয় অধিবাসীদের মনে তিনি বিশেষ রুপে দৃশ্যমান হতেই পারেন, এবং এটা হয়তো বিস্ময়কর নয়, রানিকে নয়, বরং তাকে এই বিশেষ মর্যাদায় আসীন করা হয়েছিল। এটি কিন্তু দ্বীপের স্থানীয় সংস্কৃতিতে কোনো নারীকে দেবী হিসাবে স্বীকার করার বিষয়টি যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে, তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কার্গো কাল্ট নিয়ে আমি খুব বেশি কিছু আর বলতে চাইছি না। তবে এই কাল্টগুলো দারুণ বিস্ময়কর একটি সমসাময়িক মডেল আমাদের সামনে তুল ধরে, যা ব্যাখ্যা করতে পারে কিভাবে ধর্ম একেবারে শূন্য গজিয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে সাধারণভাবে এই ধর্মগুলোর উৎপত্তির ক্ষেত্রে মডেলটি চারটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রস্তাব করে। আমি সংক্ষেপে নীচে তারই ব্যাখ্যা দেবো। প্রথমটি হচ্ছে, অবিশ্বাস্যরকম বিস্ময়কর দ্রুত গতিতে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী গড়ে উঠেতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কি বিস্ময়কর দ্রুততায় এটি এর উৎপত্তি প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো লুকিয়ে ফেলতে পারে। জন ফ্রাম, যদি তার আদৌ কোনো অস্তিত্ব থেকেও থাকে, তবে সেটা আমাদের স্মরণকালের অতীতের মধ্যেই ছিল। তারপরও, এত সাম্প্রতিক হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও কারো কাছেই কোনো নিশ্চিৎ তথ্য নেই আসলেই আদৌ তার অস্তিত্ব ছিল কিনা। তৃতীয় শিক্ষাটি আসছে, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে একই ধরনের ধর্মীয়

গোষ্ঠীগুলোর উৎপত্তির বিষয়টি থেকে; এইসব সদৃশ্যতার পদ্ধতিগত গবেষণা আমাদের মানুষের মনোজাগতিক এবং সহজেই ধর্মবিশ্বাসের শিকার হবার প্রবণতা সম্বন্ধে বলছে। চতুর্থত, কার্গো কাল্টগুলো একই ধরনের, এই সদৃশ্য শুধু তাদের নিজেদের মধ্যেই না, বরং মিল আছে অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগুলোর সাথেও। খ্রিস্ট ধর্ম এবং অন্যান্য প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত ধর্মগুলো যেগুলো বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেছে, তাদেরও উৎপত্তি ঘটেছিল স্থানীয় কোনো ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে, যেমন, জন ফ্রামের কাল্ট। আসলেই গেজা ভারমেসের (৮৮) মতো গবেষক, যিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জিউইশ স্টাডির অধ্যাপক, প্রস্তাব করেছিলেন, জিসাস হচ্ছে প্যালেস্টাইনে তার সেই সময়ে জীবিত বেশ কয়েকজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একজন, যাদের কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একই ধরনের নানা কিংবদন্তী। বেশির ভাগ গোষ্ঠী নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে একটি টিকে গেছে, সেটাকেই আমরা এখন মূলধারা হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। এবং বহু শতাব্দী পেরিয়ে গেলে এটি আরো সূক্ষ্মভাবে সংগঠিত হয়েছে একটি জটিল বিস্তৃত পদ্ধতিতে বিবর্তনের মাধ্যমে (মিমেটিক নির্বাচন, আপনি যদি সেটা এভাবে বলতে চান, আর না চাইলে নয়) অথবা উত্তরসূরি বেশ কিছু ধারায় বিভাজিত হয়েছে - যা এখন বিশ্বের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রাজত্ব করছে। আকর্ষণীয় আধুনিক কিছু ব্যক্তিত্বদের, যেমন, হাইলে সেলাসি (৮৯), এলভিস প্রিসলি (৯০), প্রিন্সেস ডায়ানা (৯১) - মৃত্যু, অনুগত গোষ্ঠীগুলোর কিভাবে দ্রুত উত্থান ঘটে এবং পরবর্তীতে মিমেটিক বিবর্তনের বিষয়টি অধ্যয়ন করতে আমাদের সুযোগ করে দেয়।

ধর্মের উৎপত্তির ব্যাপারে আমি যা বলতে চাই সেটাই হচ্ছে উপরের এই আলোচনা। যদিও অধ্যায় দশে এই আলোচনায় আবার সংক্ষিপ্তভাবে ফিরে আসবো, যখন আমি শৈশবের কাল্পনিক বন্ধুত্বের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি, আমাদের মনোস্তাত্ত্বিক যে 'প্রয়োজনগুলো' যা ধর্ম পূরণ করে এই শিরোনামের নীচে।

নৈতিকতা সম্বন্ধে প্রায়ই মনে করা হয়, ধর্মের মধ্য থেকেই এটির উৎপত্তি হয়েছে, এবং পরবর্তী অধ্যায়ে আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্ন করে দেখাতে চাই, আমি যুক্তি দেবো যে, নৈতিকতার জন্ম নিজেই একটি ডারউইনীয় প্রশ্নের বিষয়, যেমন আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, ধর্মের ডারউইনীয় উদবর্তন মূল্য (সারভাইভাল ভ্যালু) কি। সেকারণে নৈতিকতা নিয়ে আমরা সেই একই প্রশ্ন করতে পারি। নৈতিকতা, আসলেই, ধর্ম উদ্ভব হবার আগেই আবির্ভূত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন আমরা একটি প্রশ্ন থেকে শুরু করেছিলাম এবং নতুন করে প্রশ্নটির একটি ভিন্ন রূপ দিয়েছিলাম, নৈতিকতাকেও অন্য কোনো কিছুর উপজাত হিসাবে গণ্য করা সবচেয়ে উত্তম হবে।

টীকা:
(১) মারেক কোন: ব্রিটিশ বিজ্ঞান লেখক।

(২) Bower, ফ্যামিলি: *Ptilonorhynchidae*
(৩) Anting*:* পাখিদের একটি আচরণ যেখানে পাখিরা তাদের পালক এবং চামড়া ঘষতে বিশেষত পিপড়া ব্যবহার করে।
(৪) Dawkins, R. (1982). The Extended Phenotype. Oxford: W. H. Freeman
(৫) K. Sterelny, The perverse primate, in Grafen, A. and Ridley, M., eds (2006). Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think. Oxford: Oxford University Press.
(৬) জর্জ বার্নাড শ (১৮৫৬-১৯৫০) আইরিশ নাট্যকার, লেখক।
(৭) স্টিভেন পিংকার (জন্ম ১৯৫৪) কানাডীয়-আমেরিকান কগনিটিভ মনোবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক ও লেখক।
(৮) Pinker, S. How the Mind Works (Norton, 1997)
(৯) মাইকেল শেরমার, যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান লেখক, বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ, স্কেপটিকস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা এবং স্কেপটিকস পত্রিকার সম্পাদক।
(১০) How We Believe: The Search for God in an Age of Science 2001
(১১) মাইকেল পেরসিংগার, বর্তমানে কানাডায় কর্মরত যুক্তরাষ্ট্রের কগনিটিভ নিউরোসায়েন্টিষ্ট, যার গবেষণা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে হচ্ছে নিউরোথিওলজী বা স্পিরিচ্যুয়াল নিউরোসায়েন্স।
(১২) আর্থার কলিন রেনফ্রিউ (জন্ম ১৯৩৭) ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ, প্রত্নভাষাতত্ত্ববিদ।
(১৩) ডেভিড স্লোয়ান উলসন (David Sloan Wilson) (জন্ম ১৯৪২) আমেরিকার বিবর্তন জীববিজ্ঞানী।
(১৪) Darwin's Cathedral: Evolution, Religion, and the Nature of Society, 2002 book (১৫) নেপোলিয়ন শ্যানন (জন্ম ১৯৩৪) আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ।
(১৬) N. A. Chagnon, Terminological kinship, genealogical relatedness and village fissioning among the Yanomamo Indians, in Alexander and Tinkle (1981: ch. 28).
(১৭) C. Darwin, The Descent of Man vol. 1, 156
(১৮) আলফ্রেড টেনিসন (১৮০৯-১৮৯২) ইংরেজ কবি।
(১৯) চার্জ অব দি লাইট ব্রিগেড কবিতার মূল বিষয়টি ক্রিমিয়ার যুদ্ধের একটি ঘটনা। চেইন অব কম্যান্ডের ভুল বার্তার কারণে ব্রিটিশ এই লাইট ব্রিগেডটি সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে অনেক হতাহতের কারণ হয়েছিল। মানুষের কণ্ঠস্বরের রেকর্ডিং এর অন্যতম পুরোনো নিদর্শনের একটি হচ্ছে লর্ড টেনিসনের নিজের কণ্ঠে আবৃত্তি করা এই কবিতাটি, এবং যেন অতীতের গভীর থেকে বেরিয়ে কোনো দীর্ঘ সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে ভেসে আসা আসা ফাঁপা সেই আওয়াজ শিহরণ জাগানোর জন্য খুবই প্রযোজ্য।

সামনে এগিয়ে যাও লাইট ব্রিগেড!
এমন কেউ কি আছে যে আতঙ্কিত?
যদিও সেনারা জানতো
কেউ একজন বড় ভুল করেছে:
উত্তর দেয়া তাদের কাজ নয়,
কোনো প্রশ্ন করা তাদের কাজ নয়,
বরং নির্দেশ মানা ও মৃত্যু তাদের কাজ,
মৃত্যুর উপত্যাকায়
এগিয়ে চলে ছয়শ প্রাণ। (টেনিসন, চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড)

(২০) আমি বেশ মজা পেয়েছিলাম, যখন Focus on your own damn family লেখা একটি বাম্পার স্টিকার কলোরাডোতে একটি গাড়ীর পেছনে লাগানো দেখেছিলাম। কিন্তু এখন ব্যপারটা ঠিক সেই রকম

কৌতুককর মনে হয়না আর। কোনো কোনো শিশুর সত্যি তাদের নিজেদের পিতা মাতাদের দ্বারা মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রক্রিয়া থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা আছে, নবম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

(২১) Barker, D. (1992). Losing Faith in Faith. Madison, WI: Freedom From Religion Foundation

(২২) রবার্ট হিন্ড (জন্ম ১৯২৩) ব্রিটিশ প্রাণীবিজ্ঞানী।

(২৩) R A. Hinde. Why Gods Persist: A Scientific Approach to Religion 2nd ed. London: Routledge

(২৩) পাসকাল বয়ের, ফরাসী নৃতত্ত্ববিদ।

(২৪) P. Boyer. Religion Explained: The Human Instincts That Fashion Gods, Spirits and Ancestors.

(২৫) স্কট আটরান, আমেরিকার নৃতত্ত্ববিদ।

(২৬) S. Atran. In Gods We Trust: The Evolutionary Landscape of Religion.

(২৭) পল ব্লুম, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান এবং কগিনিটিভ সায়েন্স এর অধ্যাপক।

(২৮) ডুয়ালিজম বা দ্বৈতবাদ দাবী করে মন আর শরীর পৃথক।

(২৯) টমাস আন্সটে গুথরী (১৮৫৬-১৯৩৪) ইংরেজ লেখক।

(৩০) Vice Versa: A Lesson to Fathers, Thomas Anstey Guthrie (pseudonym "F. Anstey")

(৩১) আন্সটের উপন্যাস ভাইস ভার্সার চরিত্র।

(৩২) পি. জি. উডহাউস (১৮৮১-১৯৭৫) ইংরেজ লেখক, বিশেষ পরিচিত তার কৌতুক রচনায়।

(৩৩) Laughing Gas: P. G. Wodehouse

(৩৪) ডেবোরাহ এফ কোলমান, ক্লিনিকাল মনোবিজ্ঞানী।

(৩৫) The Intentional Stance. Daniel C. Dennett

(৩৬) কার্ল রিটার ভন ফ্রিশ (১৮৮৬-১৯৮২), নোবেল পুরস্কার জয়ী অষ্ট্রিয় প্রাণী আচরণবিদ।

(৩৭) মাইকেল ফ্রেইন (জন্ম ১৯৩৩) ইংরেজ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।

(৩৮) The Tin Men; Michael Frayn,

(৩৯) ব্রিটিশ টেলিভিশন কমেডি, The Faulty Towers এর প্রধান চরিত্র, জন ক্লীজ অভিনয় করেছিলেন।

(৪০) জাস্টিন এল ব্যারেট, মনোবিজ্ঞানী।

(৪১) Guardian, 31 Jan. 2006.

(৪২) হেলেন ফিশার, মনোবিজ্ঞানী।

(৪৩) Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love: Helen Fisher

(৪৪) ভয়ঙ্কর মাদক Gerin Oil নিয়ে আমার নিবন্ধ: 'Gerin Oil', Free Inquiry 24: 1, 2003, 9-11. Gerin oil: Gerin oil বা Geriniol একটি কাল্পনিক মাদকদ্রব্য, এই নিবন্ধে। যা ব্যবহার করা হয়েছিল ধর্ম বা religion কে সমালোচনা করার জন্য। শব্দটি Religion শব্দটির একটি অ্যানাগ্রাম। প্রথম নিবন্ধ Gerin Oil প্রকাশিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী প্রকাশনা ফ্রি এনকোয়ারীর, ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায়। Opiate of the Masses শীর্ষক অপর একটি প্রবন্ধে শব্দটিকে জনপ্রিয়করণ করা হয়েছিল। Gerin oil বা Geriniol কে সেখানে বর্ণিত করা হয়েছে ভয়ঙ্কর একটি বৈধ মাদক দ্রব্য রুপে। রিচার্ড ডকিন্স সেখানে দাবী করেছিলেন এই মাদকটি ঐতিহাসিকভাবে অসংখ্য সহিংস ঘটনার জন্য দায়ী, যেমন সেপ্টেম্বর ১১ সন্ত্রাসী আক্রমণ, দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী গণহত্যা এবং সালেম এর ডাইনী বিচার। ডকিন্স তার এই প্রহসনমূলক রচনায় বর্ণনা করেন যে, ব্যবহারকারীরা এই মাদকের সংস্পর্শে আসেন সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যেমন কোনো বিয়ে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি। সামান্য পরিমানে এর ব্যবহার কোনো ক্ষতি না করলেও এর ব্যবহারের মাত্রা

দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। মাঝারি মাত্রায় এর ব্যবহার কাউকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, যেখানে ব্যবহারকারীরা আশা করেন তাদের সব ব্যক্তিগত ইচ্ছার পূরণ হবে, এর সাথে মাংশপেশীর সংকোচন ও প্রসারণ হতে পারে। বেশিমাত্রায় এর ব্যবহার শব্দ ও দৃষ্টি বিভ্রমের কারণ। এছাড়াও এটি শিশু বিকালঙ্গ করণ, যৌণ দমন এবং গণহত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত হবার সময় মুখে স্মিত হাসি থাকার প্রবণতা থাকে।

(৪৫) জন রেমন্ড স্মিথিস, নিউরোসাইক্রিয়াটিষ্ট।

(৪৬) Smythies J. (2006). Bitter Fruit. Charleston, SC: Booksurge.

(৪৭) Viruses of the mind: http://www.inf.fu-berlin.de/ lehre/pmo/eng/ Dawkins-MindViruses.pdf

(৪৮) Saint Teresa of Ávila, স্প্যানিশ নান, ধর্মতাত্ত্বিক ও বিখ্যাত ক্যাথলিক সেইন্ট।

(৪৯) অ্যান্থনী জন প্যাট্রিক কেনি (জন্ম ১৯৩১) ব্রিটিশ দার্শনিক।

(৫০) লুই ওলপার্ট (জন্ম ১৯২৩) দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেয়া ব্রিটিশ ভ্রূণতাত্ত্বিক জীববিজ্ঞানী ও লেখক।

(৫১) Six Impossible Things Before Breakfast: The Evolutionary Origins of Belief. Lewis Wolpert

(৫২) রবার্ট লুডলো ট্রিভার্স (জন্ম ১৯৪০) বিবর্তন জীববিজ্ঞানী ও সোসিওবায়োলজিষ্ট, জীববিজ্ঞানের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক ধারণার প্রণেতা।

(৫৩) Social Evolution: Robert Trivers

(৫৪) লাওনেল টাইগার, কানাডায় জন্ম নেয়া আমেরিকাবাসী নৃতত্ত্ববিদ।

(৫৫) Optimism: The Biology of Hope, Lionel Tiger

(৫৬) জেমস জন ফ্রেজার (১৮৫৪-১৯৪১),স্কটিশ নৃতত্ত্ববিদ।

(৫৭) The Golden Bough: A Study in Comparative Religion (পুননামকরণ The Golden Bough: A Study in Magic and Religion) James George Frazer, অত্যন্ত প্রভাবশালী এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯০ সালে।

(৫৮) কৌতুকটি আমার না, এর উৎস হচ্ছে: 1066 and All That. ডাবলিউ সি সেলার এবং আর সি ইয়েটম্যান (১৯৩০)

(৫৯) মার্টিন লুথার, জার্মান যাজক, যিনি প্রটেষ্টান্ট রিফরমেশন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন।

(৬০) http://jmm.aaa.net.au/articles/14223.htm.

(৬১) মিম (Meme) হচ্ছে কোনো ধারণা, আচরণ বা রীতি যা কোনো একটি সংস্কৃতিতে একজন ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। মিম সাংস্কৃতিক ধারণা, রীতি বা প্রতীক বহনকারী একটি একক হিসাবে কাজ করে, যা একটি মন থেকে অন্য মনে বিস্তার লাভ করতে পারে, লেখা, কথা, আচরণ, আচার বা অন্য কোনো অনুকরণ করা সম্ভব এমন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যারা মিম তত্ত্বের সমর্থক তারা একে জিনের সমতূল্য একটি রূপ হিসাবে দেখেন, যারা নিজেদের প্রতিলিপি করতে পারে, পরিবর্তিত হতে পারে (মিউটেশন) এবং যা নির্বাচনী চাপের প্রতি সংবেদনশীল; মিম শব্দটি mimeme শব্দটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (জিনের মত একই মডেলে) (শব্দটির উৎপত্তি প্রাচীন গ্রিক mīmēma শব্দ থেকে যার অর্থ কোনো কিছুর অনুকরণ করা); শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ব্রিটিশ বিবর্তন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৭৬ সালে তার দ্য সেলফিশ জিন বইটিতে বিভিন্ন আইডিয়া এবং সাংস্কৃতিক ফেনোমেনাগুলোর বিস্তারের ক্ষেত্রে বিবর্তনীয় ধারণাটি আলোচনা করার জন্য। কিছু মিম এর উদাহরণ যেমন সেখানে ছিল .. মেলোডি, কিছু বহুব্যবহৃত বাক্য, ফ্যাশন, এছাড়া আর্চ বা খিলান বানানোর কৌশল ইত্যাদি।

(৬২) অস্কার ওয়াইল্ড, বিখ্যাত আইরিশ লেখক।

(৬৩) বিশেষ করে আমার নিজের জাতি, জাতীয় বৈশিষ্ট্যসূচক আচরণের পুরাণ কাহিনী মোতাবেক: 'Voici l'anglais avec son sang froid habituel' (Here is the Englishman with his habitual

bloody cold অর্থাৎ এই যে একজন ইংরেজ যথারীতি সর্দি সহ); এটি এসেছে এফ এস পিয়ারসনের কাছ থেকে, এছাড়া যেমন 'coup de grace' (lawnmower).
(৬৪) সুজান জেন ব্ল্যাকমোর, মনোবিজ্ঞানী, লেখক।
(৬৫) he Meme Machine, Susan Blackmore. Oxford University Press.
(৬৬) Chinese Junk: প্রাচীন চীনা জাহাজ
(৬৭) অরিগামি: কাগজ ভাজ করার জাপানী শিল্পকলা।
(৬৮) ভ্রুণ বিকাশের একটি পর্ব, একটি ফাঁপা গোলকের মত, যার চারিদিকে ঘিরে থাকে এক স্তরের কোষ, ব্লাস্টোমেয়ার।
(৬৯) ব্লাষ্টুলার পরে আসে গ্যাস্ট্রুলা, যখন এককোষী স্তরটি তিনটি স্তরে সজ্জিত হয়।
(৭০) গ্যাস্ট্রুলার পরের পর্ব নিউরালা, যখন প্রথম স্নায়ুতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে।
(৭১) The Selfish Gene, Richard Dawkins
(৭২) Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution: Peter J. Richerson, Robert Boyd
(৭৩) Genes, Memes and Human History: Darwinian Archaeology and Cultural Evolution, Stephen Shennan
(৭৪) Culture and the Evolutionary Process:Robert Boyd, Peter J. Richerson
(৭৫) The Electric Meme: A New Theory of How We Thin,Robert Aunger
(৭৬)The Selfish Meme: A Critical Reassessment, Kate Distin
(৭৭) Virus of the Mind: The New Science of the Meme. Richard Brodie
(৭৮) সায়েন্টোলজী (Scientology) বিজ্ঞান কল্পকাহিনী লেখক রন হুবার্ড এর সৃষ্ট একটি ধর্ম।
(৭৯) মরমনিজম (Mormonism), জোসেফ স্মিথ এর প্রবর্তিত ধর্ম
(৮০) Life of Brian (1979) British comedy by the comedy group Monty Python (Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones and Michael Palin), directed by Terry Jones.
(৮১) Monty Python: জনপ্রিয় ব্রিটিশ কমেডি সিরিজ/টিম।
(৮২) ডেভিড অ্যাটেনবুরো (জন্ম ১৯২৩) ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী, টিভি অনুষ্ঠান নির্মাতা ও উপস্থাপক।
(৮৩) Quest in Paradise , David Attenborough
(৮৪) আর্থার সি ক্লার্ক, বিজ্ঞান লেখক, ফিউচারিষ্ট।
(৮৫) ঈসাইয়া ৪০:4 এর সাথে তুলনা করুন: প্রতিটি উপত্যকা উপরে উঠে আসবে এবং প্রতিটি পর্বতমালা এবং পাহাড় নীচু হয়ে যাবে; এই সাদৃশ্যতা কিন্তু আবশ্যিকভাবেই কোনো ইঙ্গিত দিচ্ছে না মানুষের মনোস্তাত্ত্বিকতার কোনো মৌলিক বৈশিষ্ট্যে বা কার্ল ইয়ুং এর 'সম্মিলিত অবচেতন' এর, কারণ এই দ্বীপগুলোতে মিশনারীদের উপস্থিতি বহুদিন ধরেই।
(৮৬) রবার্ট আলেক্সজান্ডার অ্যামিয়েল বাকমান, ব্রিটিশ কানাডীয় চিকিৎসক,লেখক, টিভি উপস্থাপক।
(৮৭) Can We be Good Without God?, Biology, Behavior, and the Need to Believe. Rob Buckman
(৮৮) গেজা ভেরমেস (১৯২৪-২০১৩) হাঙ্গেরিয় ব্রিটিশ গবেষক, ধর্মীয় ইতিহাসবিদ।
(৮৭) হাইলে সেলাসী, ইথিওপিয়ার সম্রাট (১৯১৬-১৯৭৪), তাকে কেন্দ্র করে রাসফারিয়াবাদের জন্ম হয়েছিল জ্যামাইকাতে ১৯৩০ এর দশকে।
(৮৮) এলভিস অ্যারন প্রিসলী (১৯৩৫-১৯৭৭) আমেরিকার অত্যন্ত জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী ও অভিনেতা ছিলেন।
(৮৯) ডায়ানা ফ্রান্সেস স্পেন্সার (১৯৬১-১৯৯৭), প্রিন্সেস অব ওয়েলস।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়
নৈতিকতার শিকড়: কেন আমরা ভালো?

‘এই পৃথিবীতে আমাদের পরিস্থিতি খুবই অদ্ভুত; এখানে প্রত্যেকেই আমরা স্বল্প সময়ের অতিথি, আর আমাদের জানাও নেই কেন, তারপরও, মাঝে মাঝে আপাতদৃষ্টিতে স্বর্গীয় রূপ দিয়ে কোনো একটি উদ্দেশ্য সৃষ্টি করি। যদিও, দৈনন্দিন জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তত একটা বিষয় আমাদের জানা আছে, তা হলো: আমরা মানুষরা এখানে, অন্য মানুষের জন্য - আর সবার উপরে, বিশেষ করে তাদের জন্য, যাদের মুখের হাসি এবং ভালো থাকার উপরে আমাদের নিজেদের সুখি হবার বিষয়টি নির্ভরশীল’। - আলবার্ট আইনস্টাইন

অনেক ধার্মিক মানুষের জন্য কল্পনা করা বেশ কঠিন, ধর্ম ছাড়া কিভাবে কোনো একজন মানুষ ভালো হতে পারেন, বা ভালো হবার জন্য আদৌ কোনো ইচ্ছা বোধ করতে পারেন। এই অধ্যায়ে আমি এই ধরনের প্রশ্নগুলো আলোচনা করবো । কিন্তু সন্দেহ আসলে আরো সর্বব্যাপী, এবং কিছু তাদের লালিত বিশ্বাসকে 'বিশ্বাস' করে না যারা, তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণায় আবেগাক্রান্ত হতে যা ধার্মিক মানুষকে প্ররোচিত করে।

এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পেছনে যে সব নৈতিকতা সংক্রান্ত বিবেচ্য বিষয়গুলো লুকিয়ে থাকে, সেগুলোর সাথে নৈতিকতার সত্যিকারের কোনো যোগসূত্রতা নেই। বিবর্তনের বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষাদান করার ক্ষেত্রে বিরোধীতার একটি বিশাল অংশেরই আসলে বিবর্তনের সাথে কিংবা বৈজ্ঞানিক কিছুর সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, এটি উস্কে দিয়েছে দিয়েছে নৈতিকতা নির্ভর তীব্র কিছু ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া, যা একেবারে সরল ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভুত হতে পারে, যেমন, 'আপনি যদি আপনার সন্তানকে শেখান যে, তারা বানর থেকে বিবর্তিত হয়েছে, তাহলে তারা সবাই বানরের মতোই আচরণ করবে', কিংবা আরো জটিল অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও সেখানে থাকতে পারে, যেমন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন মতবাদীদের 'ওয়েজ স্ট্রাটেজি' (১), যে অশুভ উদ্দেশ্যটির বিষয় নির্দয়ভাবে উন্মোচন করেছে বারবারা ফরেষ্ট (২) এবং পল গ্রস (৩) তাদের 'ক্রিয়েশনিজমস ট্রোজান হর্স' (৪) বইটিতে।

আমার বইগুলোর জন্য আমি পাঠকদের কাছ থেকে অসংখ্য চিঠি পাই (৫), যেগুলোর অধিকাংশই অত্যন্ত উৎসাহব্যজ্ঞকভাবে বন্ধুভাবাপন্ন, তাদের কিছু গঠনমূলক সমালোচনাপূর্ণ, কিছু খুবই নোংরা মানসিকতার, এবং এমনকি খুবই হিংস্র। এবং আমি দুঃখের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, সবচেয়ে নোংরা মানসিকতার চিঠিগুলোর মূল প্রণোদনাদায়ক বিষয়টি হচ্ছে ধর্ম। যাদের খ্রিস্ট ধর্মের শত্রু মনে করা হয়, প্রায়শই তাদের এই ধরনের অখ্রিস্টসূলভ দুর্ব্যবহার মুখোমুখি হতে হয়। উদাহরণ হিসাবে একটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা ইন্টারনেটে পোষ্ট করা হয়েছিল ব্রায়ান ফ্লেমিংকে (৬) উদ্দেশ্য করে, যিনি নিরীশ্বরবাদকে সমর্থন করে চমৎকার হৃদয়স্পর্শী এবং আন্তরিক 'দ্য গড হু ওয়াজন্ট দেয়ার' (৭) প্রামাণ্য চিত্রটির লেখক এবং পরিচালক। 'বার্ন হোয়াইল উই লাফ' শিরোনামে ব্রায়ানের উদ্দেশ্যে লেখা এই চিঠিটির সময়কাল ২১ ডিসেম্বর, ২০০৫, এবং যার ভাষা ছিল এই ধরনের:

> আপনার যে যথেষ্ট পরিমাণ সাহস আছে সেই বিষয়ে আমি নিশ্চিৎ। আমি খুবই চাই আপনাদের মত নির্বোধদের ছুরি নিয়ে কুপিয়ে পেটের নাড়ি ভুড়ি বের করে দেই এবং আনন্দে চিৎকার করি, যখন আপনাদের সামনেই আপনাদের নাড়িভুড়িগুলো বের হয়ে আসতে থাকবে - আপনি সেই পবিত্র

> যুদ্ধটি শুরু করার চেষ্টা করছেন, যখন কোনো একদিন আমি এবং আমার মত অনেকেই উপরে বর্ণিত কাজটি করতে আনন্দের সাথে দায়িত্ব নেবে।

চিঠির এই পর্যায়ে লেখক দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছিলেন, তার ভাষা আদৌ খ্রিস্ট সুলভ নয়, কারণ এর পর খানিকটা উদারতার সুরে তিনি উল্লেখ করতে থাকেন,

> যদিও ঈশ্বর আমাদের প্রতিশোধ না নিয়ে বরং আপনাদের মত সবার জন্য প্রার্থনা করার শিক্ষা দেন।

অবশ্য তার এই দয়াশীলতা খুবই ক্ষণস্থায়ী:

> তবে আমি শান্তি পাবো এই জেনে যে, আপনার উপর ঈশ্বর যে শাস্তি আরোপ করবেন, সেটি আমার দেয়া যে-কোনো শাস্তির তুলনায় আপনার ১০০০ গুণ বেশি যন্ত্রণা-ভোগের কারণ হবে। সবচেয়ে ভালো ব্যপার হচ্ছে আপনি অনন্তকাল ধরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন এই সব পাপের জন্য, যা সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈশ্বরের ক্রোধ কোনো দয়া প্রদর্শন করে না। আপনার জন্যই আমি আশা করি, ছুরি আপনার মাংসে স্পর্শ করার আগে যেন সত্য আপনার কাছে উন্মোচিত হয়। শুভ বড়দিন!
>
> পুনশ্চ: আপনার মতো মানুষদের আসলে কোনো ধারণা নেই আপনাদের নিয়তিতে কি নির্দিষ্ট করা আছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই - কারণ আমি আপনাদের মত নই।

আমার কাছে আসলেই ধাঁধার মত মনে হয়, ধর্মীয় চিন্তাধারার সামান্যতম মতপার্থক্য কি পরিমাণ বিষাক্ততার জন্ম দিতে পারে। আরো একটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'ফ্রি থট টুডে' পত্রিকার সম্পাদকের নিকট থেকে যা সংগ্রহ করা হয়েছে। ফ্রি থট টুডে প্রকাশ করে ফ্রিডম ফ্রম রেলিজিয়ন ফাউন্ডেশন (৯), যারা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করে আসছেন, যখন ও যেখানে চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত পৃথক অবস্থানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

> হ্যালো, পনির-খেকো জঘন্য ব্যক্তিরা, আপনাদের মত অপদার্থদের তুলনায় আমরা খ্রিস্টানরা সংখ্যায় অনেক বেশি। চার্চ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পৃথককরণ হবে না এবং আপনারা নরকের কীটরা অবশ্যই পরাজয় স্বীকার করবেন।

পনির খাওয়া সংক্রান্ত তথ্য ইঙ্গিতের বিষয়টা আসলে কি? আমার যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুরা অবশ্য প্রস্তাব করেছেন, কিছুটা ‘কুখ্যাত’ ভাবে উদারপন্থী যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যটির সাথে এর একটা সম্পর্ক থাকতে পারে। ফ্রিডম ফ্রম রেলিজিয়ন ফাউন্ডেশনের মূল কার্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের দুধ ও দুগ্ধজাত শিল্পের প্রধান কেন্দ্র হচ্ছে উইসকনসিন। কিন্তু নিশ্চয়ই ব্যাখ্যাটা এত সরল নয়, আর তাহলে ঐসব ফরাসী ‘পনিরখেকো আত্মসমর্পনকারী বানররা’ (১০) তাহলে কি? এখানে পনির শব্দটি ভাষায় ব্যবহারে শব্দগত প্রতীকী তাৎপর্য কি?

চিঠিটির ভাষায় ফিরে আসা যাক আবার -

> শয়তান পূজারী অপদার্থ.. দয়া করে মরো এবং নরকে যাও ... আমি আশা করি আপনাদের যেন মলনালীতে ক্যান্সারের মত খুব কষ্টদায়ক কোনো অসুখ হয়, এবং ধীরে ধীরে খুব কষ্ট ভোগ করে যেন মৃত্যু হয়, তাহলে আপনি আপনার ঈশ্বর, শয়তানের সাথে দেখা করতে পারবেন.. এই ধর্ম থেকে স্বাধীনতা বিষয়টি খুবই খারাপ, সুতরাং আপনারা সব ফ্যাগ (fag: পুরুষ সমকামিদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক শব্দ) এবং ডাইকসদের (নারী সমকামিদের প্রতি ইঙ্গিতবহ অবজ্ঞাসূচক শব্দ) বেশি উত্তেজিত হবার কোনো কারণ নেই, বরং চিন্তা করেন কোথায় আপনারা যাচ্ছেন, কারণ যখন আপনারা আদৌ খেয়াল করবেন না, ঠিক তখনই ঈশ্বর আপনাদের শায়েস্তা করবে, যদি আপনাদের এই দেশ বা এই দেশ যা কিছুর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটি ভালো না লাগে, এই দেশ থেকে দূর হয়ে যান, সরাসরি নরকে যান..
>
> পুনশ্চ : কমিউনিষ্ট বেশ্যা, আপনার কৃষ্ণাঙ্গ পশ্চাৎদেশটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূর হয়ে যান। আপনাদের দেবার মত কোনো অজুহাত আর নেই। সৃষ্টি যথেষ্ট প্রমাণ মহান যীশু খ্রিষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার।

কেন আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা না? বা ব্রহ্মারই বা না কেন? বা এমন কি ইয়াহয়ে বা না কেন?

> আমরা নীরবে সরে যাবো না, ভবিষ্যতে যদি সহিংসতার প্রয়োজন হয়, মনে রাখবেন এর জন্য আপনারাই দায়ী। আমার রাইফেলে গুলি ভরা আছে।

কেন? আমি না ভেবে থাকতে পারছি না, কেন এই ঈশ্বরের এই ধরনের ভয়ঙ্কর হিংস্রতার সাথে প্রতিরক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়? যে কারোরই তো মনে

হবার কথা, তিনি নিজেকে সুরক্ষা করার জন্য যথেষ্ট পরিমানে যোগ্য। মনে রাখতে হবে, এই সব কুৎসিত হিংস্র বাক্যের অপমান আর হুমকির নিশানা কিন্তু শান্ত শিষ্ট ভদ্র, সুশীল চমৎকার একজন তরুণী।

হয়তো আমি আমেরিকায় বসবাস করিনা বলে আমাকে লেখা বেশির ভাগ ঘৃণা প্রকাশ করা চিঠির ভাষা পুরোপুরি এই স্তরের না, তবে তারা সেই দয়া প্রদর্শনের যোগ্য হবার বিষয়টির কথাও বলেন না, যে দয়াশীলতার জন্য খ্রিস্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বিশেষভাবে সুপরিচিত। ২০০৫ সালে মে মাসে লেখা পরের এই চিঠিটির লেখক একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক। যদিও এটি নিঃসন্দেহে ঘৃণা সমৃদ্ধ, তবে পুরোপুরি নোংরা হবার চেয়ে বরং আমার কাছে পত্র লেখকের অন্তর্দ্বন্দ্বের কষ্ট অনুভূত হয়েছে এবং যা তিনি প্রকাশ করেছেন কেমন করে নৈতিকতার পুরো বিষয়টি নিরীশ্বরবাদীতার বিরুদ্ধে সকল সহিংসতার উৎস। শুরুতেই বেশ কিছু অনুচ্ছেদে বিবর্তনকে ব্যবচ্ছেদ করার পর (এবং শ্লেষাত্মকভাবে জিজ্ঞাসাসহ যে, তাহলে নিগ্রোরা কি এখনো বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় আছে?), ব্যক্তিগত পর্যায়ে ডারউইনকে অপমান করে, ভ্রান্তভাবে হাক্সলিকে বিবর্তন বিরোধী হিসাবে উল্লেখ করার পর এবং আমাকে একটি বিশেষ বই পড়ার জন্য উৎসাহ প্রদান করে - (যা আমি পড়ছি), যেখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে পৃথিবী মাত্র আট হাজার বছর প্রাচীন (তিনি কি আসলেই একজন চিকিৎসক হতে পারেন?) - তিনি পরিশেষে লিখেছিলেন:

> আপনার নিজের বইগুলো, অক্সফোর্ডে আপনার সম্মান, যা কিছু আপনি জীবনে ভালোবাসেন, এবং অর্জন করেছেন, সবই ব্যর্থ প্রচেষ্টা কামু'র প্রশ্ন - চ্যালেঞ্জ এখানে এড়ানো অসম্ভব, কেন আমরা সবাই আত্মহত্যা করি না (১১)? সত্যি, আপনার বিশ্বধারণা ছাত্রদের এবং আরো অনেকের উপর এই ধরনের প্রভাব ফেলে, যে আমরা সবাই বিবর্তিত হয়েছি অন্ধ আপতন বা চান্সের মাধ্যমে, কোনো কিছু থেকে না, কোনো কিছুতেই আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না, এমন কি ধর্ম যদি সত্যও না হয়, তাও উত্তম, অনেক বেশি উত্তম, একটি মহান পুরাণ কাহিনীকে বিশ্বাস করা, প্লেটোর মতো, যদি তা কারো মনে শান্তি দিতে পারে আমাদের এই জীবনকালে। কিন্তু আপনার বিশ্বধারণা দুশ্চিন্তা মাদকাসক্তি, হিংস্রতা, নৈরাজ্যবাদ, ভোগবাদীতা, ফ্রাঙ্কেনস্টাইনিয় বিজ্ঞান এবং পৃথিবীতে নরক ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করে। আমি ভাবছি আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে কতটা সুখী? তালাকপ্রাপ্ত? বিপত্নীক? সমকামি? আপনাদের মত মানুষরা কখনো সুখী হতে পারে না, বা তারা খুবই চেষ্টা করে প্রমাণ করতে কোনো সুখ নেই, বা কোনো কিছুরই কোনো অর্থ নেই।

এই চিঠির আবেগ, যদিও এর ভাষা নয়, অন্য অনেক চিঠির মতোই বৈশিষ্ট্যসূচক; এই ব্যক্তিটি ডারউইনবাদ বিশ্বাস করেন, অন্তর্গতভাবেই এর প্রকৃতিতে নৈরাশ্যবাদী, যা শিক্ষা দেয় আমরা বিবর্তিত হয়েছি অন্ধ চান্স বা আপতনের মাধ্যমে (অসংখ্যবারের মত আবারও বলছি, প্রাকৃতিক নির্বাচন চান্স বা আপতন প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত) এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো আমরা যখন মারা যাবো। এই ধরনের অভিযোগকৃত নেতিবাচকতার সরাসরি ফলাফল হিসাবে সব ধরনের অশুভ জিনিস প্রবাহিত হয়। ধরে নেয়া যেতে পারে, তিনি সত্য বলতে চাননি যে, আমার ডারউইনবাদের প্রতি সমর্থনের সরাসরি ফলাফল বৈধব্য হতে পারে; কিন্তু এই বিষয়টির দ্বারা, তার চিঠি, এমন একটি উন্মত্ত অশুভ কামনা পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বারবার আমি সেটি শনাক্ত করেছি আমার খ্রিস্টীয় পত্র লেখকদের মধ্যে। আমি আমার পুরো একটি বই, 'আনউইভিং দ্য রেইনবো' (১২) উৎসর্গ করেছি সেই জীবনের মূল অর্থ, বিজ্ঞানের কাব্যময়তার প্রতি, এবং যুক্তি খণ্ডন করেছি হালকা এবং বিস্তারিতভাবে এই নৈরাশ্যবাদী নেতিবাচকতার অভিযোগটির, সুতরাং এখানে আমি নিজেকে সংযত করছি। এই অধ্যায়টি খারাপ এবং এর বিপরীত, ভালো বিষয় নিয়ে; নৈতিকতা বিষয়ে, কোথা থেকে এটি এসেছে, কেন আমাদের এটিকে সাদরে গ্রহন করা উচিত এবং সেটি করতে আমাদের ধর্মের্র কি কোনো প্রয়োজন আছে কিনা।

আমাদের নৈতিকতাবোধের কি কোনো ডারউইনীয় উৎস আছে?

বেশ কিছু বই, যেমন রবার্ট হিন্ডের 'হোয়াই গুড ইস গুড' (১৩), মাইকেল শেরমারের 'দ্য সায়েন্স অব গুড অ্যান্ড ইভিল' (১৪), রবার্ট বাকমানের 'ক্যান উই বি গুড উইথআউট গড?' (১৫) এবং মার্ক হাউজারের (১৬) 'মোরাল মাইন্ডস' (১৭) যুক্তি প্রদর্শন করেছে যে, আমাদের ভালো ও মন্দ বোঝার ক্ষমতার উৎপত্তি হয়েছে আমাদের ডারউইনীয় অতীতে। এই অংশে আমি সেই যুক্তিগুলোর নিজস্ব সংস্করণ উপস্থাপন করবো।

বাহ্যিক দিক থেকে ডারউইনীয় ধারণাটি, প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা পরিচালিত বিবর্তন প্রক্রিয়াকে মনে হয় আমাদের ধারণা করা সব মানবিক শুভ বৈশিষ্ট্যগুলো বা আমাদের নৈতিকতা, শ্লীলতা, সমমর্মিতা এবং করুণা সংক্রান্ত অনুভূতিগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য অনুপোযুক্ত। প্রাকৃতিক নির্বাচন খুব সহজেই ক্ষুধা, ভয়, এবং যৌন তাড়নার মত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে। যেগুলো সরাসরি আমাদের বেঁচে থাকা এবং আমাদের জিনের ধারাবাহিকতা সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সেই হৃদয় নিংড়ানো সহানুভূতির ব্যাখ্যা আসলে কি, যা আমরা কোনো এতিম শিশুকে কাঁদতে বা বৃদ্ধ বিধবার একাকীত্বের হতাশায় বা যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা কোনো প্রাণীকে দেখে অনুভব করি? কোন জিনিসটি বা কি আমাদের তীব্রভাবে তাড়িত করে

নাম গোপন রেখে পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে ঘটা সুনামীর শিকার অসহায় মানুষদের জন্য অর্থ সাহায্য কিংবা কাপড় পাঠাতে, যাদের কারোর সাথেই আমাদের জীবনে কোনোদিনও দেখা হবে না এবং খুব সম্ভবত কোনোদিনও তার এই সহায়তার কোনো প্রতিদান দিতে পারবে না? আমাদের মধ্যে এই ভালো পরোপকারী বা 'সামারিটান' বৈশিষ্ট্যগুলো কোথা থেকে আসলো? ভালো আর মহৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলোর তো স্বার্থপর জিন তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কথা না, তাই নয় কি? না, এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে সুপরিচিত, হতাশাব্যঞ্জক (এবং পূর্বধারণা সাপেক্ষে পূর্বপ্রত্যাশিত) ভুল ধারণা (১৮)। সঠিক শব্দটির উপর এখানে জোর দেয়া প্রয়োজন; সেলফিশ বা স্বার্থপর নয়, 'জিন' শব্দটার উপর জোর দেয়া ঠিক হবে, কারণ এটি স্বার্থপর কোনো 'জীব' বা ধরা যাক, প্রজাতি ধারণাটির সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করে; আমি বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। ডারউইনবাদের যুক্তি বলছে যে এককটি জীবনের প্রাধান্যপরম্পরায় টিকে থাকে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুনী অতিক্রম করতে পারে, সেটির স্বার্থপর হবার প্রবণতা থাকার কথা। এই পৃথিবীতে টিকে থাকবে সেই এককগুলো, যারা তাদের নিজস্ব স্তরে প্রাধান্যপরম্পরায় অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী এককগুলোর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সফল হয়েছে। এই প্রাসঙ্গিকতায় স্বার্থপর বলতে ঠিক এটাকেই বোঝায়। এখন প্রশ্ন হলো, এই প্রক্রিয়াটি ঠিক কোন পর্যায়ে বা স্তরে ঘটছে? স্বার্থপর জিনের পুরো ধারণাটি 'জিন' শব্দটির উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা সাপেক্ষে হচ্ছে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের একক (বা আত্মস্বার্থের একক) কোনো স্বার্থপর জীব নয়, স্বার্থপর কোনো গোষ্ঠীও বা স্বার্থপর প্রজাতি নয় কিংবা স্বার্থপর কোনো পরিবেশমণ্ডল নয়, বরং স্বার্থপর এককটি হচ্ছে 'জিন'; এবং এই জিনটি, যা তথ্য রূপে, হয় বহু প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে, নয়তো নয়। জিনের মত করে (এবং তর্ক সাপেক্ষে মিম) কোনো জীব, গোষ্ঠী কিংবা প্রজাতি সেই অর্থে একক হিসাবে কাজ করতে পারে না, কারণ তারা তাদের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে না, এবং এ ধরনের স্বঅনুলিপিকারী সত্তাদের সম্ভারে বা পুলে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারে না। এবং জিনরা ঠিক সেটাই করে এবং সেটাই হচ্ছে মূলত যৌক্তিক - ডারউইনীয় বিশেষ স্বার্থপর অর্থে জিনকে স্বার্থপরতার একক হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য বেছে নেবার সপক্ষে যৌক্তিকতা।

সবচেয়ে সুস্পষ্ট যে উপায়ে জিনগুলো অন্যান্য জিনের সাপেক্ষে তাদের নিজস্ব স্বার্থপর বেঁচে থাকাটা নিশ্চিৎ করে তা হলো তাদের বহনকারী কোনো একক অর্গানিজম বা জীবকে স্বার্থপর করে তোলার মাধ্যমে। আসলেই এমন বহু পরিস্থিতি আছে যেখানে কোনো একটি জীবের টিকে থাকার মাধ্যমে তার বহন করা জিনগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন কৌশল প্রাধান্য পায়, কিছু পরিস্থিতি আছে -খুব বেশি দুর্লভ নয় - যেখানে জিন তাদের নিজেদের স্বার্থপর টিকে থাকাটা নিশ্চিৎ করে তাদের বহনকারী জীবদের নিঃস্বার্থ, পরার্থে আচরণ করানোর মাধ্যমে। এই পরিস্থিতিগুলো সম্বন্ধে আমাদের এখন ভালো ধারণা আছে এবং এদেরকে

মূল দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: কোনো জিন, যা কোনো জীবের একক কোনো সদস্যদের নির্দেশিত করে তাদের জিনগত আত্মীয় বা জেনেটিক কিনদের সহায়তা করার জন্য, পরিসংখ্যাগতভাবে সেই জিনগুলো অনুলিপি হবার ক্ষেত্রে সুবিধা পাবার সম্ভাবনাও বেশি। এই ধরনের জিনের সংখ্যা প্রজাতির জিনপুলে বেড়ে যেতে পারে এমন হারে যে যেখানে জিনগত আত্মীয় বা কিন পরার্থবাদীতা (বা অ্যালট্রুইজম) খুব স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে। নিজেদের সন্তানদের প্রতি উপকারি হওয়া এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ, কিন্তু এটাই একমাত্র এমন উদাহরণ নয়; মৌমাছি, ওয়াস্প, পিপড়া, টারমাইট এবং খানিকটা, কিছু নির্দিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণী যেমন, ন্যাকেড মোল র‍্যাটস, মীরকাটস এবং অ্যাকর্ন উডপেকাররা এমন একটি সমাজের বিবর্তন ঘটিয়েছে যেমন বড় ভাইবোনরা তাদের ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করে (যাদের সাথে তাদের জিন ভাগ করে নেবার সম্ভাবনা থাকে)। সাধারণত - যা আমার প্রয়াত সহকর্মী ডাবলিউ. ডি. হ্যামিলটন (১৯) দেখিয়েছিলেন - প্রাণীদের নিজেদের আত্মীয় বা জিনগত কিনদের দেখাশোনা করা, বিপদ থেকে রক্ষা করা, সম্পদ ভাগাভাগি, বিপদে সতর্ক করা বা কোনো না কোনো ভাবে নিঃস্বার্থ ব্যবহার করার প্রবণতা আছে। এবং এর কারণ স্পষ্টতই পরিসংখ্যানগতভাবে সম্ভাবনা থাকে তাদের আত্মীয়রা তাদের মত একই জিনগুলোর অনুলিপি বহন করে।

'অ্যালট্রুইজম' বা পরার্থবাদের অন্য প্রধান প্রকারটি, যার জন্য আমাদের খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা ডারউইনীয় যুক্তি আছে, তা হলো পারস্পরিক পরার্থবাদ (তুমি আমার পিঠ চুলকিয়ে দাও আমিও তার বিনিময়ে তোমার পিঠ চুলকিয়ে দেবো)। এই তত্ত্বটি বিবর্তন জীববিজ্ঞানে প্রথম উপস্থাপন করেছিলেন রবার্ট ট্রিভার্স (২০) এবং প্রায়ই এটিকে প্রকাশ করা হয় 'গেম' তত্ত্বের গাণিতিক ভাষায়, এবং এটি একই জিন ভাগাভাগি করার মত কোনো পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না। এবং পুরোপুরি ভিন্ন প্রজাতিদের মধ্যে এটি একই ভাবে কাজ করে, সম্ভবত আরো ভালোভাবে, যখন অনেক সময় এদের বলা হয় সিমবায়োসিস বা মিথোজীবিতা। একই নীতি মানুষেরও সকল বাণিজ্য এবং বিনিময় কর্মকাণ্ডেরও ভিত্তি। শিকারীর প্রয়োজন বর্শা আর কুমারের প্রয়োজন মাংস। চাহিদার এই অসাম্যতা বাণিজ্যের একটি ভিত্তি হিসাবে চুক্তি রচনা করে, মৌমাছির দরকার মধু আর ফুলের দরকার পরাগায়ন। ফুল যেহেতু উড়তে পারেনা, তারা নেকটারের মাধ্যমে মৌমাছিকে বিনিময় মূল্য পরিশোধ করে তাদের পাখনার ভাড়া হিসাবে। হানিগাইড নামের পাখি মধু কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে তা জানে কারণ তারা মৌচাক খুঁজে বের করে জানে, তবে মৌচাক তারা ভাঙ্গতে পারে না। কিন্তু হানি ব্যাজার (রাটেল) মৌচাক ভাঙ্গতে পারে, তবে পাখিদের মত তাদের ডানা নেই যে তারা মৌচাক খুঁজে বের করতে পারবে; হানিগাইডরা রাটেলদের (এবং কখনো মানুষদেরও) মধুর উৎসের দিকে নিয়ে যায় বিশেষ প্রলুব্ধকর একটি উড়ার কৌশল ব্যবহার করার মাধ্যমে, যে কৌশল হানিগাইড শুধুমাত্র এই কাজটির জন্য ব্যবহার করে

থাকে। উভয় পক্ষই এই বিনিময়ের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। একটি বড় পাথরের নীচে হয়তো সোনার বড় একটি টুকরো চাপা দেয়া আছে, আর পাথরটা খুবই ভারি এবং কারোর একার পক্ষে সেটি সরানো সম্ভব নয়, সে তখন অন্যদের সাহায্য নেয় কাজটা করার জন্য, যদিও এজন্য তাকে ভাগ দিতে হবে সেই সোনার, কারণ তা না করলে সে তো কিছুই পাবে না। জীবজগতে এই ধরনের পারস্পরিক সাহায্য নির্ভর সম্পর্কের সংখ্যা অগণিত। ষাঢ় এবং অক্সপেকারস, লাল নলাকৃতির ফুল এবং হামিংবার্ড, গ্রুপার এবং ক্লিনার র‍্যাস মাছেরা, গরু এবং তাদের পেটের অণুজীবরা; পারস্পরিক পরার্থবাদের সম্পর্ক কাজ করে কারণ তাদের নিজস্ব প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে এককভাবে তাদের নিজেদের দক্ষতা বা ক্ষমতায় অসাম্যতা আছে। আর এই কারণে দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে এটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। যেখানে দুটি প্রজাতির প্রয়োজন বা চাহিদায় অসাম্যতাও অনেক বেশি।

মানুষের ক্ষেত্রে ঋণপত্র এবং অর্থ হচ্ছে সে রকম কিছু উপকরণ যা কোনো কিছু বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব সৃষ্টি করে। বানিজ্য করছে এমন পক্ষগুলো কিন্তু সাথেই সাথেই তাদের দ্রব্য একে অপরকে হস্তান্তর করছে না, কিন্তু তারা সেটি ঋণ হিসেবে গচ্ছিত রাখতে পারে ভবিষ্যতের জন্য বা এমনকি ঋণটি অন্য বানিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারে। আমি যতদূর জানি, মানুষ ছাড়া আর অন্য কোনো বন্য প্রাণী সরাসরি টাকার অনুরূপ কোনো বিনিময় মাধ্যম ব্যবহার করে না। কিন্তু এককভাবে কোনো সদস্যের পরিচয় সম্পর্কে স্মৃতি খানিকটা অনানুষ্ঠানিকভাবে সেই একই দায়িত্ব এখানে পালন করে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়রা তাদের সামাজিক দলটির কোন সদস্যের উপর নির্ভর করা যেতে পারে সেটি শিখে নেয়, যারা কিনা তাদের ঋণ শোধ করবে (গিলে ফেলা আংশিক পরিপাক হওয়া রক্ত পুনরায় গলা দিয়ে বের করে আনার মাধ্যমে) এবং কারা তাদের সাথে প্রতারণা করবে। প্রাকৃতিক নির্বাচন সেই সব জিনগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা করে, যা কোনো জীবের একক সদস্যদের, যারা একটি অপ্রতিসম ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন ও সুযোগের পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখছে, তাদের কোনো কিছু দান করতে, বা দিতে যখন তারা পারে বা সক্ষম হয় এবং যখন তারা তা পারে না তখন তারা সেই রকমই প্রতিদানের জন্য অন্য সদস্যদের কাছে অনুরোধ করার বা চেয়ে নেবার প্রবণতার কারণ হয়। এটি কোনো দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য মনে রাখা, কোনো বিদ্বেষ মনে রাখা, পারস্পরিক বিনিময়ের সম্পর্কটি নজরদারি করার, এবং যারা নেয় কিন্তু তাদের সময় হলে বিনিময়ে কিছু দেয় না এমন প্রতারকদের শাস্তি দেবার প্রবণতা গড়ে উঠতে সহায়তা করে।

যেহেতু সবসময়ই প্রতারকরা থাকবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার 'গেম' তত্ত্বের এই ধাঁধাটির স্থায়ী সমাধানে সব সময় এমন কিছু থাকে যা প্রতারকদের শাস্তির ব্যপারটা নিশ্চিৎ করে। গাণিতিক তত্ত্ব দুটি বড় শ্রেণীর স্থায়ী সমাধানের অনুমতি দেয় এই ধরনের

‘গেমের’ ক্ষেত্রে, সবসময় ‘খারাপ’ হতে হবে, এটি স্থায়ী এই অর্থে যে, যদি সবাই একই কাজ করে তাহলে একজন ভালো কোনো সদস্যর একার পক্ষে তার চেয়ে ভালো কিছু করতে পারে না। কিন্তু এছাড়া আরেকটি সুস্থির সমাধান বা কৌশল হচ্ছে (এখানে সুস্থির অর্থ যখন কোনো জনসংখ্যায় এটি একটি নির্দিষ্ট হারের সীমা অতিক্রম করবে, এর কোনো বিকল্প তার চেয়ে ভালো কিছু করতে পারে না)।এই কৌশলটা হলো, প্রথমে সবার সাথে ভালোভাবে লেনদেন শুরু করা, অন্যদের বিশ্বাস করে কিছু সুযোগ দেয়া, এরপর ভালো কাজের প্রতিদান ভালো কাজের মাধ্যমে শোধ করা, তবে খারাপ কাজের জন্য যথাযথ প্রতিশোধ নেয়া; গেম তত্ত্বের ভাষায় এই কৌশলের (বা একই ধরনে কৌশলগুলোর সমষ্টি) বিভিন্ন নাম আছে, যেমন, টিট ফর ট্যাট (ইটের বদলে পাটকেলটা), সমুচিত পাল্টা জবাব এবং পারস্পরিক বিনিময়। কিছু কিছু পরিস্থিতিতে এটি বিবর্তনীয়ভাবে স্থিতিশীল এই অর্থে যে, যদি কোনো জনসংখ্যায় পারস্পরিক আদান-প্রদানকারীদের সংখ্যা প্রাধান্য বিস্তার করে, যেখানে যেমন খারাপ কেউ নেই এবং নিঃশর্তভাবে একজন ভালো সদস্য নেই, এটি বেশ ভালো ভাবে কাজ করবে। আরো একটা বেশ জটিল ‘টিট ফর ট্যাট’ কৌশলটির ভিন্নরূপ আছে,, যা কোনো কোনো পরিস্থিতিতে আরো ভালো ব্যাখ্যার কাজ করে।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আত্মীয়তা বা কিনশিপ এবং পারস্পরিক আদান প্রদান বা বিনিময়ের সম্পর্কটি ডারউইনীয় বিশ্বে আলট্রুইজম বা পরার্থবাদের জোড় স্তম্ভ। কিন্তু এছাড়া আরো কিছু কাঠামো এই দুই প্রধান স্তম্ভেও উপর ভর করে আছে। বিশেষ করে মানুষের সমাজে, ভাষা এবং কথোপকথন গল্পগুজবের ব্যাপকতা যেখানে প্রকট, সেখানে সুনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কোনো একজন ব্যক্তি হয়তো তার দয়াশীলতা ও উদারতা বৈশিষ্ট্যে কারণে সুখ্যাত, অন্য কেউ হয়তো অবিশ্বস্ততা, প্রতারণা বা চুক্তি অসম্মান করার কুখ্যাতি আছে। আবার অন্য কারো হয়তো দয়াশীলতার সুখ্যাতি আছে, সম্পর্কের মধ্যে যখন পারস্পরিক বিশ্বাসর ভিত্তিটা মজবুত হয়। তবে কোনো ধরনের প্রতারণার নিষ্ঠুর শাস্তি দিতে যে ইতস্তত বোধ করে না। পারস্পরিক পরার্থবাদিতার অনাড়ম্বর তত্ত্বটি আশা করছে যে, কোনো প্রজাতির সদস্যরা তাদের স্বপ্রজাতির অন্যান্য সদস্যদের এই ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি সৃষ্ট অচেতন একটি প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করবে। মানুষের সমাজগুলোয় আমরা ভাষার শক্তি যুক্ত করেছি, যে ভাষা কারো সুনাম বা দুর্নাম ছড়িয়ে দেয়, সাধারণ গসিপ বা গালগল্পের আকারে। ধরুন, জনাব ‘ক’ যখন কোনো পানশালায় সবাইকে পান করানোর জন্য তার দ্বায়িত্বটা এড়িয়ে গিয়েছিল, সে সময় আপনার সেখানে থাকার দরকার নেই, বা তার আচরণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবারও দরকার নেই, কারণ আপনি, লতায় পাতায় কিংবা বাতাসে ভেসে আসা নানা গুজবে তার সম্বন্ধে জানতে পারবেন, ‘খ’ খুবই কৃপন বা একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া এই উদাহরণে যোগ হতে পারে যে, জনাব ‘খ’ হচ্ছে মিথ্যা গল্পবাজ, ‘ক’ সম্বন্ধে এসব কথা ছড়িয়েছে। কারো জন্য তার খ্যাতি

খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধমাত্র একজন ভালো পারস্পরিক প্রতিদানকারী বা যে কোনো কিছুর পাওয়ার বিনিময়ে কিছু দিতে প্রস্তুত এমন হওয়াটাই যথেষ্ট নয়ম উপরন্তু এই বিনিময়ের ব্যপারে তার সততা সংক্রান্ত একটি সুনামও লালন করার মধ্যে যে একটি ডারউইনীয় টিকে থাকার মূল্যবান বিষয় আছে তা জীববিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। ম্যাট রিডলির (২১) 'দি অরিজিন অফ ভার্চু' (২২) বইটি ডারউইনীয় নৈতিকতার পুরো ক্ষেত্রটির চমৎকার স্পষ্ট একটি বিবরণ ছাড়াও, এটি বিশেষ দক্ষতার সাথে সুনাম বা দুর্নাম বা খ্যাতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পেরেছে (২৩)।

নরওয়েজীয় অর্থনীতিবিদ থরস্টেইন ভেবলেন (২৪) এবং খানিকটা ভিন্নভাবে ইসরায়েলীয় প্রাণিবিজ্ঞানী আমোৎজ জাহাবি (২৫) আরো একটি চমৎকার ধারণা এর সাথে যুক্ত করেছিলেন, পরহিতকর কোনো কাজে বা পরার্থে কোনো কিছু দেয়া হতে পারে প্রাধান্য বিস্তার বা নিজের শ্রেষ্টত্ব প্রমাণের জন্য একটি বিজ্ঞাপন। নৃতাত্ত্বিকদের কাছে 'পটল্যাচ ইফেক্ট' (২৬) হিসাবে এটি পরিচিত। এই নামটি এসেছে একটি সামাজিক প্রথা থেকে, উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপবাসী নানা গোত্রগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র প্রধানরা পরস্পরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খুবই উদারতার সাথে, এবং প্রায় নিজেদের ধ্বংস করে দেবার মত বিশাল ভোজসভার আয়োজন করে। কিছু চরম ক্ষেত্রে এই পাল্টা ভোজসভা চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত এক পক্ষ সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব না হয়, আর অন্য পক্ষও কিন্তু তার চেয়ে খুব একটা ভালো অবস্থায় থাকে না। ভেবলেনের 'কন্সপিক্যুয়াস কনসাম্পশন' বা দৃষ্টিগ্রাহ্য বা লোক দেখানো ভোগ করার ধারণাটি আধুনিক গবেষণার দৃশ্যপটে অনেকেরই দৃষ্টি আকষর্ণ করেছিল। জাহাবির অবদান, অতি সাম্প্রতিক সময় অবধি যা জীববিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরেই তেমন কোনো গুরুত্ব দেননি যখন তার প্রস্তাবটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে তাত্ত্বিক অ্যালান গ্রাফেনের (২৭) অসাধারণ গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে, যা আমাদের 'পটল্যাচ' প্রভাবের বিবর্তনীয় একটি সংস্করণ প্রদান করেছে। জাহাবির গবেষণার বিষয় ছিল 'অ্যারাবিয়ান ব্যাবলার' (২৮), ছোটো বাদামী এক প্রকারের পাখি যারা সমাজবদ্ধ গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করে এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমবায়ের মাধ্যমে প্রজনন, বংশবিস্তার ও প্রজন্ম প্রতিপালন করে। অন্য অনেক ছোটো পাখিদের মতোই ব্যাবলাররা আসন্ন বিপদ সংকেত হিসাবে চিৎকার করে অন্যদের সতর্ক করে. এবং তারা পরস্পরকে খাবারও দান করে। এই ধরনের পরার্থে করা কোনো কাজকে একটি মানসম্পন্ন ডারউইনীয় নীরিক্ষা দিয়ে যদি পর্যালোচনা করতে হয়, তাহলে দেখা উচিত প্রথমত, পাখিদের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় ও জিনগত আত্মীয়তার সম্পর্কটিকে, যখন কোনো ব্যাবলার তার সঙ্গীকে তার নিজের সংগ্রহ করা খাদ্য খাওয়ায়, তার কারণটি এই আশায় যে ভবিষ্যতে তাকেও কোনোদিন একইভাবে এভাবে খাদ্য খাওয়ানো হবে? নাকি যারা এই সাহায্য পাচ্ছে তাদের সাথে সাহায্যদাতার নিকটবর্তী জিনগত কোনো সম্পর্ক আছে? বা তারা জিনগত আত্মীয়? এ বিষয়ে জাহাবির ব্যাখ্যাটি ছিল ভীষণভাবে অপ্রত্যাশিত। প্রধান বা

প্রাধান্য বিস্তারকারী ব্যবলাররা সামাজিক অবস্থানে তাদের প্রাধান্যটিকে দৃঢ় করে তাদের অধীনস্তদের খাওয়ানোর মাধ্যমে, জাহাবির প্রিয় ‘মানুষের ভাষায়’ এই ধরনের আচরণকে নরাত্বরোপ করলে বলা যায়, প্রধান পাখিটি হয়তো সমতূল্য এই ধরনের কিছু বলে, দেখো, ‘আমি তোমার চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে খাদ্য দান করতে পারি’ বা ’আমি তোমার চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ, আমি উঁচু ডালে বসে বাজপাখীর সামনে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহারাদারের মতো মাটিতে খেতে থাকা তোমাদের দলকে সতর্ক করতে পারি’। জাহাবি ও তার সহকর্মীদের পর্যবেক্ষণ প্রস্তাব করছে যে, ব্যাবলাররা নিজেদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে প্রতিযোগিতা করে, কে ঝুঁকিপূর্ণ এই পাহারাদারের কাজটি করবে; এবং যখনই কোনো অধীনস্ত কেউ প্রাধান্য বিস্তারকারী কোনো ব্যাবলারকে খাদ্য দান করার চেষ্টা করে, আপাতদৃষ্টিতে তার এই দানশীলতাকে হিংস্রভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়; জাহাবির ধারণার মূল বিষয়টি হলো, ‘শ্রেষ্ঠত্ব’ প্রমাণ বা প্রদর্শনের এই বিজ্ঞাপন এর জন্য পরিশোধিত মুল্যের মাধ্যমে সত্যায়িত হয়। শুধুমাত্র সত্যিকারভাবেই শ্রেষ্ঠ একজন সদস্যই পারে কোনো মূল্যবান উপহার দান করে সেই সত্যের বিজ্ঞাপন করতে। প্রজাতির সদস্যরা সাফল্য কেনে, যেমন, প্রজনন সঙ্গী আকর্ষণ করতে, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের ব্যয়সাপেক্ষ প্রদর্শনীর মাধ্যমে, যার মধ্যে আছে সুস্পষ্টভাবে অতিমাত্রায় প্রদর্শন করা দানশীলতা এবং প্রকাশ্যে সবাইকে দেখিয়ে ঝুঁকি নেয়া।

কেন প্রজাতির কোনো সদস্য পরোপকারী, অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দয়াশীল ও দানশীল হয় ও নৈতিক আচরণ প্রদর্শন করে সেটি ব্যাখ্যা করতে তাহলে আমাদের কাছে এখন চারটি জোরালো ডারউইনীয় কারণ আছে। প্রথমত, জিনগত আত্মীয়তা বা কিনশীপের একটি বিশেষ ব্যপারতো আছেই; দ্বিতীয়ত, ‘রেসিপ্রোকেশন’ বা পারস্পরিক বিনিময়, অর্থাৎ কোনো কিছু পাওয়ার বিনিময়ে কিছু দেয়া: কোনো উপকারের প্রতিদান দেয়া এবং ভবিষ্যতে প্রতিদান পাওয়ার সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই উপকার করতে সচেষ্ট হওয়া। এখান থেকে শুরু করে আসছে তৃতীয় কারণটি: দয়াশীলতার ও দানশীলতার সুনাম অর্জন করার একটি বিশেষ ডারউইনীয় সুবিধা। চতুর্থত, যদি জাহাবির ধারণা সঠিক হয়, এই বিশেষ প্রদর্শনমূলক বা সবাইকে দেখানো দানশীলতা বা দয়াশীলতার বাড়তি সুবিধা হচ্ছে একেবারে খাঁটি, অনুকরণযোগ্য নয় এমন বিজ্ঞাপন ক্রয় করা।

আমাদের প্রাগৈতিহাসিক সময়ের বড় একটি অংশ জুড়ে, মানুষ এমন পরিস্থিতিতে বসবাস করেছে যা খুব দৃঢ়ভাবে এই চার ধরনেরই পরার্থবাদ বিবর্তনে সহায়তা করেছে। আমরা গ্রামে, বা তার আরো আগে বেবুনদের মত আলাদা আলাদা যাযাবর দল হিসাবে জীবন যাপন করতাম, যারা পার্শ্ববর্তী কোনো দল বা গ্রাম থেকে আংশিকভাবে বিচ্ছিন্ন ছিল। তখন দলের সদস্যদের অধিকাংশই হয়তো পরস্পরের

নিকটাত্মীয় ছিল। পার্শ্ববর্তী কোনো ভিন্ন দলের সদস্যদের চেয়ে, নিজ দলের সদস্যদের সাথে সেই দলের যে-কোনো সদস্য অবশ্যই বেশি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। আর এই ধরনের পরিস্থিতিতে কিন বা আত্মীয়দের প্রতি পরোপকারিতা বা পরার্থবাদ বিবর্তনের প্রচুর সুযোগও ছিল। এবং আত্মীয় হোক বা না হোক, সেই দলের যে-কোনো সদস্য দলের অন্য একজন সদস্যকে পৌনঃপুনিকভাবে, বহুবার, সারাজীবন ধরেই সাক্ষাৎ করবে। যা পারস্পরিক পরার্থবাদ বিবর্তন হবার জন্য বেশ আদর্শ একটি পরিস্থিতি। এবং এই পরিস্থিতিগুলো অবশ্যই পরোপকারিতার সুনাম গড়ে তোলার জন্য আদর্শ পরিস্থিতি। এবং এটা অবশ্যই একই ভাবে সেই ধরনের আদর্শ একটি পরিস্থিতি, যেখানে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা প্রদর্শন করার মত দয়াশীলতা ও উদারতার বিজ্ঞাপন করা যায়। এই চারটি উপায়ের যে-কোনো একটি কিংবা সবগুলো উপায়ে পরার্থবাদের প্রতি আদি মানুষের জিনগত প্রবণতা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ছাকুনীতে বিশেষ সহায়তা পেয়েছিল।

খুব সহজেই দেখা যায়, কেন আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষরা তাদের স্বগোত্রীয় সদস্যদের প্রতি সদয় এবং উপকারি ছিলেন তাদের আচরণে, কিন্তু ভিন্ন গোত্রীয়দের প্রতি খারাপ ছিলেন তাদের আচরণে, অহেতুক ভয়, অবিশ্বাস আর সন্দেহপূর্ণ প্রায় অজ্ঞাতব্যক্তিভীতি বা জিনোফোবিয়া অবধি। কিন্তু কেন - এখন যখন আমরা অধিকাংশ মানুষ বড় শহরগুলোয় বাস করি, যেখানে চারপাশে আমরা আর আগের মত স্বজন দ্বারা পরিবেষ্টিত নেই, এবং যেখানে প্রতিদিন আমাদের বহু বিচিত্র মানুষের সাথে দেখা হয়; যাদের সাথে আর কখনো আমাদের আর দেখা হবে না; তাহলে কেন আমরা একে অপরের সাথে ভালো আচরণ করি, এমন কি কখনো এমন কারো সাথে, যাকে ভাবা যেতে পারে আমাদের গ্রুপের বহিরাগত?

প্রাকৃতিক নির্বাচনের নাগাল সম্বন্ধে ভুল কথা না বলা খুব জরুরী। নির্বাচন আপনার জিনের জন্য কি ভালো সে বিষয়ে কগনিটিভ বা অবধারণগত সচেতনতা বিবর্তনে কোনো সহায়তা করেনি। সেই সচেতনতাকে অবধারণ বা বৌদ্ধিক পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাতে বিংশ শতাব্দী অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে, এবং এখনো পুরো বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান সীমাবদ্ধ আছে অল্প কিছু বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের কাছেই। প্রাকৃতিক নির্বাচন যেটিকে গড়ে উঠতে এবং টিকে থাকতে সহায়তা করে সেটি হলো ‘রুলস অব থাম্ব’ বা গড়পড়তা কোনো নিয়ম, যা আসলে কাজ করে সেই সব জিনগুলোকে প্রোমোট করার মাধ্যমে যারা তাদের বা সেই নিয়মগুলোকেই তৈরি করে। কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্যগত কারণেই এই সব ‘রুলস অব থাম্বস’ মাঝে মাঝে ভুল করে বসে; যেমন পাখিদের মস্তিষ্কে, সেই গড়পড়তা নিয়ম বা রুল অব থাম্ব, ‘তোমার বাসায় চিৎকার করা ছোটো ছোটো প্রাণীগুলোকে ভালো করে দেখাশুনা করতে হবে এবং তাদের হা করা লাল মুখের গর্তে খাওয়া ফেলতে হবে’, এটির বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে প্রভাব পড়েছে

সেই সব জিনগুলোকে রক্ষা করার মাধ্যমে যারা এই রুলটি তৈরি করেছে, কারণ কোনো পূর্ণবয়স্ক পাখির নীড়ে এই চিৎকার করতে থাকা ও হা করে থাকা লাল গর্তসহ জিনিসগুলো সাধারণত তার নিজের সন্তান, এই নিয়মটি 'মিসফায়ার' বা ভুল করে বসে, যখন অন্য কোনো পাখির বাচ্চা কোনোভাবে এই নীড়ে ঢুকে পড়ে (যেমন ব্রুড প্যারাসাইট বা প্রজনন পরজীবি কিছু পাখি প্রজাতির ক্ষেত্রে), এরকম একটি পরিস্থিতি তৈরি করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে কোকিলরা। তাহলে কি এই ভালোমানুষি পরোপকার করার প্রবণতাটি এরকমই কোনো মিসফায়ারিং বা ভুল ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে, যা রিড ওয়ার্বলার মাতাপিতাসুলভ সহজাত প্রবৃত্তির মিসফায়ারিং-এর অনুরূপ, যখন এই প্রবৃত্তির তাড়নায় এই পাখিগুলো অমানুষিক প্ররিশ্রম করে এবং না জেনেই কোকিলের বাচ্চাকে প্রতিপালন করে বড়ে করে? কিংবা আরো একটি নিকটবর্তী অনুরূপ দৃষ্টান্ত হতে পারে কোনো শিশুকে দত্তক নেবার ব্যপারে মানুষদের নিজস্ব সেই তাড়নাটি। অতিসত্বর আমাকে অবশ্যই এখানে যোগ করতে হবে যে এই 'মিসফায়ারিং' বিষয়টির অবতারণার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ডারউইনীয় অর্থে, নিন্দাসূচক কোনো অর্থে এটি ব্যবহার করা হচ্ছে না।

এই 'ভুল' বা উপজাত বা 'বাই- প্রোডাক্ট' ধারণা যা আমি সমর্থন করছি, এভাবেই কাজ করে। পূর্বসূরিদের সেই আদি কালে, যখন আমরা বেবুনদের মত ক্ষুদ্র কিন্তু স্থিতিশীল দল বা গোষ্ঠী হিসাবে বসবাস করতাম, প্রাকৃতিক নির্বাচন আমাদের মস্তিষ্কে পরোপকারিতা বা পরার্থবাদী তাড়নাকে প্রোগ্রাম করেছিল, অন্যান্য আরো প্রয়োজনীয় তাড়নাগুলোর সাথে, যেমন যৌন কামনা, ক্ষুধা, ভিনদেশীদের প্রতি প্রদর্শিত সন্দেহপ্রবণতা ইত্যাদি সহ আরো অনেক তাড়না। একটি বুদ্ধিমান দম্পতি, তারা ডারউইন পড়তে থাকতে পারেন এবং তারা হয়তো জানেন, তাদের যৌন তাড়নার মূল কারণটি হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টি করা, তারা এটাও জানেন নারীটি গর্ভধারণ করতে পারবে না, কারণ তিনি জন্ম-নিরোধক বড়ি সেবন করছেন। কিন্তু তারপরও তারা আবিষ্কার করেন তাদের যৌন-কামনা সেটি জানার কারণে কোনো অংশেই কমে যাচ্ছে না। যৌন কামনা হচ্ছে যৌন কামনা, এবং এর শক্তি, কোনো একটি ব্যক্তির মনোস্তাত্ত্বিক স্তরে, সেই মূল ডারউইনীয় চাপ যা এটি পরিচালিত করে, তার থেকে স্বাধীন; এটি একটি তীব্র শক্তিশালী তাড়না, যা তার মূল যৌক্তিক কারণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে।

আমি প্রস্তাব করছি, দয়াশীলতার তাড়না বা কারো প্রতি দয়াশীল হবার প্রবৃত্তিটাও একইভাবে সত্য, পরার্থবাদ, বা পরোপকার করার তাড়না, উদারতা, সহমর্মিতা প্রকাশ করা, করুণা করা ইত্যাদিও। পূর্বসূরিদের সেই অতীতে, শুধু কাছের আত্মীয় বা সম্ভাব্য যারা আমাদের দানের প্রতিদান দিতে পারবে শুধু তাদের প্রতি পরোপকারী মনোভাবাপন্ন হবার সুযোগ ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে এই বিধিনিষেধ আর ছিল না, তবে

সেই গড়পড়তা নিয়মটি টিকে আছে। আর কেনই বা তা থাকবে না? এটিও ঠিক যৌন তাড়নার মতোই, আমরা আমাদের অন্য লিঙ্গের সদস্যদের প্রতি যৌনকামনার উদ্রেক হওয়া থেকে যতটুকু নিজেদের রক্ষা করতে পারি (সে অনুর্বর বা বন্ধ্যা হতে পারে, অথবা অন্য কোনো কারণে প্রজননে অক্ষমও হতে পারে) , কোনো ক্রন্দনরত দুর্ভাগার প্রতি করুণার উদ্রেক হওয়া থেকে তার চেয়ে বেশি কোনোভাবে নিজেদের রক্ষা করতে পারি না (যার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই এবং যখন তাদের আমাদের দানের প্রতিদান দেবার কোনো সম্ভাবনা নেই)। এই দুটোই 'মিসফায়ারিং' বা ভ্রান্ত পরিণতি, ডারউইনীয় ভুল: আশীর্বাদপুষ্ট, কাঙ্ক্ষিত মহামূল্যবান সেই ভ্রান্তি। এক মুহূর্তের জন্যেও দয়া করে চিন্তা করবেন না, এই ধরনের ডারউইনীয় বিবরণ, বা ব্যাখ্যা সহমর্মিতা এবং উদারতার মত মহান অনুভূতি আর আবেগকে মর্যাদাহীন করছে বা লঘু করছে। যৌনকামনাকেও সেটি লঘু করে না, যৌনকামনা যখন ভাষাগত সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেটি প্রকাশ পায় অসাধারণ কবিতা আর নাটকের মাধ্যমে, জন ডানের প্রেমের কবিতা, কিংবা 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট', এবং অবশ্যই 'মিসফায়ার' হওয়া স্বজনদের প্রতি পরার্থবাদ বা বিনিময় নির্ভর সহমর্মিতার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। ঋণগ্রস্থ কারোর প্রতি দয়া, যখন মূল প্রাসঙ্গিকতার বাইরে দেখা হয়, অন্য কারো শিশু দত্তক নেবার মতোই সেটাকেও অ-ডারউইনীয় মনে হয় ('দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিসে' যেমন পোর্শিয়া উচ্চারণ করে (২৯)):

> The quality of mercy is not strained.
> It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath.

মানবিক উচ্চাশা আর সংগ্রামের সিংহভাগ একটি অংশের চালিকা শক্তি হচ্ছে যৌনকামনা এবং এর অধিকাংশই মূলত মিসফায়ারিং (যার জন্য এটি বিবর্তিত হয়নি) ; একই ভাবে উদার এবং সহমর্মী হতে চাইবার কামনার ক্ষেত্রে এটি সত্যি না হবারও কোনো কারণই নেই; যদি এটি আমাদের পূর্বসূরিদের গ্রামীণ জীবনের 'মিসফায়ার' থেকে সৃষ্ট ফলাফল হয়েই থাকে। আমাদের পূর্বসূরিদের সেই অতীতে এই দুই ধরনের কামনার তাড়না গড়ে তুলতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায় ছিল আমাদের মস্তিষ্কেও মধ্যে ধরাবাঁধা একটি নিয়ম বা 'রুল অব থাম্ব' গেঁথে দেয়া, আর সেই নিয়মগুলো এখনো আমাদের প্রভাবিত করে চলছে, এমনকি যখন অবস্থা বা পরিস্থিতি তাদের মূল কাজের জন্য অপ্রযোজ্য হয়ে গেছে।

এই সব ধরাবাঁধা নিয়মগুলো এখনো আমাদের প্রভাবিত করছে। তবে জন ক্যালভিনের ধর্মতত্ত্বে বর্ণিত সেই 'ডিটারমিনিষ্টিক' বা পরিণামবাদী উপায়ে না, বরং সামাজিক প্রথা এবং সাহিত্যে, আইন এবং ঐতিহ্যগত নানা প্রথার সভ্যতা সৃষ্টিকারী প্রভাবের ছাকুনীর

মধ্য দিয়ে - এবং অবশ্যই ধর্ম সেই ছাকুনীগুলোর মধ্যে অন্যতম। ঠিক যেমন করে আদিম মস্তিষ্কে যৌন কামনার আইনটি সভ্যতার ছাকুনি দিয়ে অতিক্রম করে রোমিও ও জুলিয়েটের ভালোবাসার দৃশ্যে আবির্ভুত হয়েছে, একই ভাবে আদিম মস্তিষ্কের সেই আমরা বনাম অন্যরা সংক্রান্ত ভেনডেট্টো বা পূর্বপুরুষদের প্রতিহিংসারও পুনরাবির্ভাব ঘটে ক্যাপুলেট ও মন্টেগিউদের (৩০) চলমান যুদ্ধ রুপে; যখন আদিম মস্তিষ্কের সেই পরার্থবাদ এবং সহমর্মিতার নিয়মের ‘মিসফায়ার’ ঘটে, আমাদের তা আনন্দিত করে শেক্সপিয়ারের শেষ দৃশ্যে দ্বন্দ্বরত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় বিশুদ্ধ মিত্রতা সৃষ্টি হতে দেখে।

নৈতিকতার শিকড় সংক্রান্ত একটি কেস স্টাডি

আমাদের নৈতিকতাবোধ, যৌনকামনার মত, যদি আসলেই আমাদের ডারউইনীয় অতীতের গভীরে প্রোথিত হয়ে থাকে, যা কিনা ধর্মের উৎপত্তিরও বহু আগে, মানুষের মনের উপর কোনো গবেষণায় তাহলে এমন কিছু ‘মোরাল ইউনিভার্সাল’ বা কিছু নৈতিক ধ্রুব বিষয় আমাদের লক্ষ করার প্রত্যাশা করা উচিত, যা কিনা সকল ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে ধর্মীয় পরিমণ্ডলেও স্থির থাকবে। হার্ভার্ড জীববিজ্ঞানী মার্ক হাউসার, তার ‘মোরাল মাইন্ডস’ বইটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার সূত্রকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন চিন্তা-পরীক্ষার উপযোগী মাধ্যম ব্যবহার করে, যে কৌশলগুলো ইতোপূর্বে মূলত প্রস্তাব করেছিলেন নীতিশাস্ত্রের দার্শনিকরা। হাউসারের গবেষণায় এই কৌশলগুলো আরো একটি বাড়তি উদ্দেশ্য পূরণ করেছিল, তা হলো নীতিশাস্ত্রের দার্শনিকরা কিভাবে চিন্তা করেন এটি তারও একটি ভূমিকা আমাদের জন্য উপস্থাপন করে। একটি কাল্পনিক নৈতিক দ্বন্দ্ব বা উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতি উপস্থাপন করা হয় এবং সেই পরিস্থিতিতে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার ক্ষেত্রে আমরা যে সমস্যার সন্মুখীন হই, সেটি আমাদের ভালো মন্দ বোঝার বোধ সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেয়। যেখানে হাউসার দার্শনিকদের থেকে আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে যান, তিনি মানুষের নৈতিকতাবোধ পরীক্ষা করার জন্য আসলেই পরিসংখ্যানগত জরিপ এবং মনোস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, যেমন, ইন্টারনেটে করা প্রশ্নের মাধ্যমে আসল মানুষের নৈতিকতাবোধ নিয়ে গবেষণা করেন। বর্তমান আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়টি হচ্ছে বেশির ভাগ মানুষই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যখন তাদের এইসব উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করা হয়, এবং তাদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে সদৃশ্যতা সেই সিদ্ধান্তগুলোয় পৌছানোর নেপথ্যে কারণগুলো ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা অনেক বেশি শক্তিশালী, এবং সেটাই আমরা আশা করতে পারি যদি আমাদের নৈতিকতাবোধ আমাদের মস্তিষ্কের ভিতর আগে থেকেই নির্দেশিত বা দৃঢ়ভাবে গাঁথা থাকে, যেমন, আমাদের সহজাত যৌন প্রবৃত্তি বা আমাদের উচ্চতাসংক্রান্ত ভীতি বা হাউসার নিজে যেভাবে বলতে শ্রেয় মনে করেন, আমাদের ভাষা

ব্যবহারে দক্ষতা (খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সংস্কৃতি সাপেক্ষে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু এর গভীরে মূল ব্যাকরণের সূত্রগুলো সর্বজনীন)। আমরা পরে যা দেখবো, মানুষ এই সব নৈতিক প্রশ্নগুলো যেভাবে প্রত্যুত্তর করে, এবং সেই উত্তরের কারণকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের ধর্মবিশ্বাস থাকা বা না থাকা উপর নির্ভরশীল নয় বলেই প্রতীয়মান হয়। হাউসারের বইটির বার্তা তার নিজের শব্দে, যা আশা করতে পারি তাহলো: আমাদের নৈতিকতা নির্ভর কোনো কিছু বিচার করার ক্ষমতা হচ্ছে সর্বজনীন নৈতিক একটি ব্যাকরণে মতো, আমাদের মনের একটি ফ্যাকাল্টি বা ক্ষমতা, যা বিবর্তিত হয়েছে মিলিয়ন বছর ধরে, যা একগুচ্ছ মূলনীতির ভিত্তির উপর সম্ভাব্য বেশ কিছু নৈতিক পদ্ধতির সীমানা গড়ে তোলে। ভাষার মতোই, এইসব মূলনীতি যা আমাদের নৈতিক ব্যাকরণের মূল ভিত্তি রচনা করে, তা আমাদের সচেতনতার স্তরে ধরা পড়ে না।

গবেষণাটিতে হাউজার এর ব্যবহৃত বৈশিষ্ট্যসূচক নৈতিক উভয় সঙ্কটময় পরিস্থিতিগুলো যেমন, রেললাইনের উপর লাগামহীনভাবে ছুটে চলা ট্রলির দৃশ্যপট, যা লাইনের উপর দাড়িয়ে থাকা বেশ কিছু মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে এমন মূলভাবেরই রকমফের; সবচয়ে সরলতম কাহিনীটি কল্পনা করছে একজন ব্যক্তি, যার নাম ডেনিস, এমন একটি বিশেষ অবস্থানে দাড়িয়ে আছে, সে চাইলে ট্রাকের উপর দাড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে সজোরে ধেয়ে আসা ট্রলিটিকে পার্শ্ববর্তী ভিন্ন একটি লাইনে ঘুরিয়ে দিতে পারে, এবং তার মাধ্যমে মূল লাইনের উপর আটকে পড়া পাঁচ জন ব্যক্তির জীবন সে বাঁচাতে পারবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাশের সেই লাইনের ওপরেও একজন মানুষ আটকে আছে, কিন্তু যেহেতু সে একা, মূল লাইনে আটকে থাকা বাকি পাঁচ জন মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সে হেরে যায় এবং গবেষণায় অংশ নেয়া বেশির ভাগ মানুষই মনে করেন ডেনিসের জন্য ট্রলিটির গতিপথ পরিবর্তন করার সুইচ নাড়ানো এবং পাশের লাইনে একজনের মৃত্যুর বদলে বাকি পাঁচ জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো নৈতিকভাবে সমর্থনীয় একটি পদক্ষেপ। যদিও কেউ মনে করেননি কাজটি ডেনিসের জন্য বাধ্যতামূলক। আমরা এখানে কাল্পনিক কিছু সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করেছি, যেমন যে মানুষটা সেই পাশের লাইনে দাড়িয়ে আছে, তিনি বিটহোভেন কিংবা ডেনিসেরই কোনো ঘনিষ্ঠ একজন বন্ধু হতে পারেন।

চিন্তার এই পরীক্ষাটির বিস্তারিত বিবরণ ক্রমান্বয়ে আমাদের ধাপে ধাপে আরো কঠিন উভয়সংকটময় নৈতিক পরিস্থিতি ও ধাঁধার মুখোমুখি করে। কি হতে পারে যদি, ধেয়ে আসা ট্রলিটাকে আমরা থামিয়ে দিতে পারি উপরের একটি সেতুর থেকে ভারী কোনো বস্তু এর সামনে ফেলে? খুবই সহজ প্রশ্ন, অবশ্যই আমরা ভারী ওজনটা নীচে ফেলবো সেই কাজটি করার জন্য; কিন্তু কি হবে যদি ভারী ওজনদার কিছু বলতে সেতুর উপর বসে থাকা খুব স্থুল একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই যদি আমাদের কাছে না থাকে, যে

মানুষটি সেখানে বসে সুর্যাস্তের শোভা উপভোগ করছেন? গবেষণায় প্রায় সবাই একমত হয়েছিলেন, মোটা এই মানুষটিকে সেতুর উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে ট্রলিটি থামানো অনৈতিক বা নৈতিকভাবে গ্রহনযোগ্য নয়; লক্ষ করে দেখুন, এমনকি একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই উভয়সংকটটি কিন্তু একটু আগেই উল্লেখ করা ডেনিসের সংকটের মতোই; যেখানে সে লাইন পরিবর্তনের সুইচ নামালে একজন হয়তো মারা যাবে, তবে বাকি পাঁচ জনের জীবন বাঁচবে। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে, অধিকাংশই মানুষের মনে একটি শক্তিশালী সহজাত ধারণাগত অন্তর্দৃষ্টি বা স্বজ্ঞা (ইনটুইশন) আছে, সেটি হলো, এই দুটি দৃশ্যপটের মধ্যে অবশ্যই কিছু মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, যদিও আমরা হয়তো স্পষ্ট করে বলতে পারবো না সেই পার্থক্যটি আসলে কি।

সেতুর উপর থেকে স্থুল ব্যক্তিটিকে নীচে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়ার দৃশ্যপটটি হাউসারের প্রস্তাবিত অন্য একটি উভয়সঙ্কটের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দৃশ্যপটে আমরা দেখি পাঁচ জন রোগী যারা হাসপাতালে ভর্তি, এবং যারা মরণাপন্ন, প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন প্রয়োজন, যা অকেজো হয়ে গেছে। সবাইকে বাঁচানো যাবে যদি প্রত্যেকটি রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় সেই নির্দিষ্ট অঙ্গটি দান করার মতো কোনো অঙ্গ দাতা খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু হঠাৎ করে চিকিৎসক সার্জন লক্ষ করলেন, হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে একজন সুস্থ সবল মানুষ বসে আছেন, যার মধ্যে এই পাঁচটি অঙ্গ ভালোভাবে কাজ করছে এবং সেই অঙ্গগুলো প্রতিস্থাপন করারও যোগ্য। এই ধরনের কোনো পরিস্থিতিতে সম্ভবত কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা কিনা বলবেন, এই একজনকে মেরে বাকি পাঁচ জনকে বাঁচানো নৈতিকভাবে সমর্থনীয়।

সেতুর উপর দাড়ানো স্থুল ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে অন্তর্দৃষ্টি বা স্বজ্ঞা আমরা অধিকাংশই ভাগাভাগি করে নেই সেটি হচ্ছে যে, উপস্থিত একজন নিরপরাধ কোনো ব্যক্তিকে তার পূর্ব অনুমতি ছাড়া পরার্থে হঠাৎ করে কোনো খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে টেনে আনা উচিত নয়।ইমানুয়েল কান্ট বিখ্যাতভাবে সেই মূলনীতিটি সূত্রবদ্ধ করেছিলেন যে, কখনোই কোনো পরিস্থিতিতে যৌক্তিক বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন কোনো সত্তাকে, শুধু সম্মতিহীন একটি উপায় হিসাবে কোনো উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা উচিত নয়, এমন কি অন্যদের উপকার করার স্বার্থেও না’। এই বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি দৃশ্যপট, সেতুর উপর দাড়ানো স্থুল ব্যক্তি (বা হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে বসা ব্যক্তি) বা ডেনিসের ক্ষেত্রে পাশের লাইনে দাড়ানো মানুষের মধ্যে মূল পার্থক্যটা সৃষ্টি করছে। ব্রীজের উপর বসা স্থুল সেই ব্যক্তিকে বেপরোয়াভাবে ধেয়ে আসা ট্রলিটির গতিরোধ করতে সরাসরি ব্যবহার করা হচ্ছে, এটি সরাসরি কান্টিয় মূলনীতিকে অস্বীকার করছে। পাশের লাইনে দাড়ানো ব্যক্তিটিকে কিন্তু পাঁচ জন মানুষের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে সরাসরি ব্যবহার করা হচ্ছে না, এবং সেখানে শুধু ট্রলির গতিপথ বদলে দেবার উদ্দেশ্যে

পাশের লাইনটি ব্যবহার করা হচ্ছে , আর সেই লাইনে দাড়িয়ে থাকাটা সেই ব্যক্তির জন্য দুর্ভাগ্য মাত্র। কিন্তু আপনি যখন এভাবে দুজনের মধ্যে বিভেদ রেখা টানেন, সেটি আসলে আমাদের কোন ইচ্ছাকে সন্তুষ্ট করছে? কান্টের জন্য এটি হচ্ছে একটি নৈতিক ধ্রুব বা 'মোরাল অ্যাবসোল্যুট'; আর হাউসারের মতে, আমাদের বিবর্তন প্রক্রিয়া এটি আমাদের ভিতর দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছে।

বেপরোয়া ছুটে আসা ট্রলির এই কাল্পনিক পরিস্থিতিটি ক্রমান্বয়ে আরো ব্যতিক্রমী জটিল রূপ ধারণ করে এবং সেই সাথে সংশ্লিষ্ট নৈতিক উভয়সঙ্কটও আরো জটিলতর হয়ে উঠে, হাউসার দুজন কাল্পনিক ব্যক্তি, নেড ও অস্কারের অনুভূত অন্তর্দ্বন্দ্বের পার্থক্য আমাদের প্রদর্শন করেছিলেন। ট্রলি লাইনের পাশে দাড়িয়ে আছে আছে নেড, ডেনিসের মতো সে ধেয়ে আসা ট্রলিটাকে সম্পূর্ণ অন্য একটা পাশের লাইনে সরিয়ে দিতে পারে না ঠিকই তবে নেডে হাতের নাগালে থাকা একটি 'সুইচ' বা নিয়ন্ত্রক নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছুটে আসা ট্রলিটি পাশ্ববর্তী লাইনের একটি লুপের দিকে সরিয়ে দেয়, যা আবার কিছুটা দূরে গিয়ে মূল লাইনে ফিরে আসে ঠিক পাঁচ জন মানুষ যেখানে আটকে আছে তার আগেই। সুতরাং এই বিন্দুতে শুধুমাত্র সুইচ দিয়ে কিছু হচ্ছে না, ট্রলি ঠিকই পাঁচ জনকে মাড়িয়ে চলে যাবে, যখন সেই বিকল্প লাইনটি আবার মূল লাইনের সাথে যুক্ত হয়। তবে ঘটনাচক্রে সেই বিকল্প লাইনে খুব স্থুল একজন ব্যক্তি দাড়িয়ে আছেন, যার ওজন ট্রলিটিকে থামানোর জন্য যথেষ্ট। এখানে নেড কি সুইচটি সক্রিয় করবে এবং ট্রেনটিকে বিকল্প পথের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাবে, বেশিরভাগ মানুষের স্বজ্ঞা বলবে নেডের সেটা করা উচিত হবে না। কিন্তু নেডের উভয় সংকট বা নৈতিক দ্বন্দ্ব আর ডেনিসের দ্বন্দ্বটির মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে ? ধারণা করা যেতে পারে, মানুষ তার প্রবৃত্তিগতভাবে কান্টিয় মূলনীতি প্রয়োগ করছে এখানে। পাঁচজন মানুষকে বাঁচাতে ডেনিস ট্রলির গতিপথ অন্য দিকে সরিয়ে দেয়, এবং এর দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয় এর পাশের লাইনে দাড়ানো একজন, সেটি হচ্ছে সমপার্শ্বিক (অনিচ্ছাকৃত ও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়) ক্ষতি, রামসফেল্ডিয় চটকদার শব্দ যদি ব্যবহার করা হয়, যে লোকটি চাপা পড়বে তাকে ডেনিস ইচ্ছা করে ব্যবহার করছে না, অন্যদের বাঁচানোর জন্য ; নেড আসলেই স্থুল ব্যক্তিটিকে ট্রলিটাকে থামানোর জন্য ব্যবহার করছে এবং অধিকাংশ মানুষই (কোনো চিন্তা ছাড়াই হয়তো), কান্টের (বিস্তারিতভাবে যিনি তা ভেবেছেন) মতো এই দুটি ক্ষেত্রে একটি বড় পার্থক্য চিহ্নিত করছে।

এই পার্থক্যটা আবার দেখা যায় অস্কারের উভয় সংকটে। অস্কারের পরিস্থিতিটা নেডের মতো একই রকম, শুধু সেখানে পাশের লাইনের সেই লুপে পাথরের একটি ভারি জিনিস আছে যা ট্রলিটাকে থামাতে পারবে, স্পষ্টতই অস্কারের কোনো সমস্যা হবার কথা না, সুইচ টেনে ট্রলিটাকে বিকল্প পথের দিকে নিয়ে যাওয়া, শুধুমাত্র ঘটনাচক্রে সেখানে একজন পথচারী সেই লোহার ওজনের ভারটির সামনে আকস্মিকভাবে হেঁটে

এসে পড়ে। সে অবশ্য মারা পড়বে যদি অস্কার সুইচটা টানেন, যেমন, নেডের ক্ষেত্রে স্থূল ব্যক্তির মত, পার্থক্যটা হচ্ছে ট্রলিটিকে থামানোর জন্য অস্কার এই পথচারীকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ব্যবহার করছে না, সে হচ্ছে এই পরিস্থিতির সমপার্শ্বিক (অনিচ্ছাকৃত ও অনিবার্য) ক্ষতি, ডেনিসের দ্বন্দ্বের মত; হাউসার ও তার গবেষণায় অধিকাংশ অংশগ্রহনকারীদের মতো, আমিও মনে করি অস্কারকে অনুমতি দেয়া যায় সুইচ দেবার জন্য, কিন্তু নেডকে না; কিন্তু এই সহজাত অন্তদৃষ্টিটি বা স্বজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করাও আমার জন্য কঠিন, হাউসারের বক্তব্য হচ্ছে, এই ধরনের কোনো নৈতিক অন্তর্দৃষ্টি প্রায়শই খুব ভালো করে করা কোনো চিন্তার বহিঃপ্রকাশ না ঠিকই কিন্তু আমাদের বিবর্তনীয় ঐতিহ্যের কারণে সেগুলো আমরা বেশ দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পারি।

নৃতত্ত্বের এই গবেষণাটি নিয়ে একটি কৌতূহলোদ্দীপক উদ্যোগ গ্রহন করেন হাউসার ও তার সহকর্মীরা। নৈতিকতার এই পরীক্ষাগুলো তারা কুনা আদিবাসীদের উপর উপযোগী করে প্রয়োগ করেছিলেন। মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্র একটি নৃগোষ্ঠী হচ্ছে কুনা, যারা প্রাতিষ্ঠানিক কোনো ধর্ম এবং পশ্চিমাদের সংস্পর্শে খুব একটা আসেনি কখনো। গবেষকরা লাইনের উপর দিয়ে ধেয়ে আসা ট্রলির উদাহরণে ট্রলির বদলে স্থানীয়ভাবে বোধগম্য বিকল্প রূপক ব্যবহার করেন, যেমন নৌকার দিকে দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে আসা কুমির। সংশিষ্ট কিছু সামান্য পার্থক্য ছাড়া তাদের গবেষণায় কুনা আদিবাসীরাও আমাদের মতো একই নৈতিক বিচার-বিবেচনার প্রমাণ দেয় ।

এই বইটিতে সবচেয়ে বিশেষভাবে যে বিষয়টি চিন্তার উদ্রেক করে, তা হলো হাউসারের একটি ভাবনা: ধর্মবাদীরা কি তাদের নৈতিক অন্তর্দৃষ্টির দিক থেকে নিরীশ্বরবাদীদের থেকে ভিন্ন? নিশ্চয়ই, যদি আমরা আমাদের ধর্ম থেকে নৈতিকতা সংক্রান্ত বোধগুলো পাই, তাহলে তো তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকাই উচিত। কিন্তু যা প্রদর্শিত হয়েছিল সেটি হচ্ছে, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নীতিশাস্ত্রের দার্শনিক পিটার সিংগারকে (৩১) নিয়ে হাউসার তিনটি হাইপোথেটিকাল উভয়-সংকটের উপর দৃষ্টি দেন এবং এই তিনটি পরিস্থিতিতে নিরীশ্বরবাদীদের রায়ের সাথে ধর্মবাদীদের সিদ্ধান্তগুলোর তুলনামূলক একটি পর্যালোচনা করেন (৩২)। প্রত্যেক ক্ষেত্রে অংশগ্রহনকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়, কোনো একটি কাল্পনিক সিদ্ধান্ত বা কাজ নৈতিকভাবে ‘আবশ্যিক’, ‘অনুমতিযোগ্য’ বা ‘নিষিদ্ধ’ কিনা সেটি চিহ্নিত করতে। তিনটি ডাইলেমা বা উভয়সঙ্কটময় কাল্পনিক পরিস্থিতি হলো:

(১) ডেনিসের উভয়সঙ্কট: নব্বই শতাংশ মানুষ বলেছে ট্রলিটিকে বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেয়া অনুমতিযোগ্য, পাঁচ জনকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে একজনকে মারা যেতে পারে।

(২) আপনি একজন বাচ্চাকে পুকুরে ডুবতে দেখছেন এবং একমাত্র আপনি ছাড়া আশে পাশে কেউ নেই যে তাকে বাঁচাতে পারে; আপনি বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারবেন, কিন্তু আপনার প্যান্টটি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। ৯৭ শতাংশ মানুষই মনে করেন আপনার বাচ্চাকে উদ্ধার করা উচিত (আশ্চর্যজনকভাবে ৩ শতাংশ মানুষ মনে করেন তাদের জন্য প্যান্ট বাঁচানো শ্রেয়তর!!);

(৩) অঙ্গ প্রতিস্থাপনের উদাহরণটি যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে: ৯৭ শতাংশ মানুষই মনে করেন ওয়েটিং রুমে বসা একটা সুস্থ মানুষকে হত্যা করে তার শরীরের অঙ্গগুলো সংগ্রহ করা অবশ্যই নৈতিকভাবে সমর্থনীয় হতে পারে না, এমনকি যদিও সেটি আরো পাঁচ জনের জীবন বাঁচাতে পারে।

হাউসার এবং সিংগারের গবেষণার মূল উপসংহার হলো, পরিসংখ্যানগত দিক থেকে ধর্মবাদী এবং নিরীশ্বরবাদীদের এই বিষয়গুলো নিয়ে মতামত বা নৈতিক বিচারের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। ব্যপারটা কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আমিসহ আরো অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গি: ভালো কিংবা মন্দ হতে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।

যদি ঈশ্বরই না থাকে, তাহলে আমরাই বা কেন ভালো হবো?

এভাবে যদি উপস্থাপন করা হয়, উপরের এই প্রশ্নটা নিঃসন্দেহে আর মহান বা সম্মানজনক শোনায় না। যখন কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি আমার কাছে এভাবে প্রশ্নটি উত্থাপন করেন (এবং অনেকেই তাই করেন), আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নীচের এই চ্যালেঞ্জটি ছুড়ে দেয়া : আপনি কি আসলেই বলতে চাইছেন, আপনার ভালো হবার প্রচেষ্টার একমাত্র কারণ ঈশ্বরের কৃপা আর পুরষ্কার অর্জন, বা তার রোষানল বা শাস্তি এড়ানো? কিন্তু সেটি নৈতিকতা না, এটি পদলেহন করা, চাটুকারিতা করা, আকাশের মহান 'সার্ভেইলেন্স' ক্যামেরার দিকে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখা। এখনো আপনার মাথার মধ্যে ছোটো একটি আড়ি পাতা যন্ত্র আছে, আপনার সমস্ত কর্মকাণ্ড যা পর্যবেক্ষণ করছে, আপনার সকল খারাপ চিন্তা সম্বন্ধে তিনি সর্বজ্ঞ। আইনস্টাইন যেমন বলেছিলেন, 'মানুষ যদি শুধুমাত্র ভালো হয় কারণ তারা শাস্তির ভয় পায় আর পুরষ্কারের আশা করে, তাহলে সত্যি আমরা বড়ই হতভাগ্য'। মাইকেল শেরমার তার 'দ্য সায়েন্স অব গুড অ্যান্ড ইভিল' বইটিতে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন বিতর্ক সমাপনকারী যুক্তি হিসাবে; 'আপনি যদি একমত হন যে, ঈশ্বরের অনুপস্থিতিতে আপনি ডাকাতি, ধর্ষণ আর খুন করতে পারবেন, আপনি সেক্ষেত্র নিজেকে একজন অনৈতিক ব্যক্তি হিসেবেই চিহ্নিত করলেন, এবং আপনার থেকে যত দূরে থাকা সম্ভব ততদূরে থাকা উচিত এই উপদেশটি আমাদের অবশ্যই মেনে চলা প্রয়োজন, আবার অন্যদিকে

যদি ঐশ্বরিক নিবিড় পর্যবেক্ষণ আর নজরদারি ছাড়াও আপনি সত্যি ভালো মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি নিজেই "আমাদের ভালো মানুষ হবার জন্য ঈশ্বর অবশ্য প্রয়োজনীয় এমন দাবীটিকে চূড়ান্তভাবে অবমূল্যায়ন করলেন"।' আমার সন্দেহ একটি বিশাল সংখ্যক ধার্মিক ব্যক্তিরা মনে করেন যে, তাদের ভালোমানুষ হবার জন্য ধর্মই মূল প্রণোদনাকারী দায়িত্ব পালন করে, বিশেষ করে তারা যদি সেই সব বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী হয়ে থাকেন যে ধর্মগুলো পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তিগত অপরাধবোধগুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই অপব্যবহার করে থাকে তাদের নিজেদের স্বার্থে।

আমার মনে হয়, বেশ অনেকটুকু পরিমাণ নীচু আত্মসম্মানবোধের প্রয়োজন আছে এমন কোনো কিছু ভাবতে পারার জন্য যে, যদি পৃথিবী থেকে হঠাৎ করেই ঈশ্বর বিশ্বাস সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় আমরা সবাই উদাসীন, দয়ামায়াহীন, অনুদার স্বার্থপর ভোগবাদীতে রূপান্তরিত হবো, ভালো বা শুভ গুণাবলীর কোনো লেশমাত্র থাকবে না; প্রচলিত ধারণা মতে দস্তয়ইয়েভস্কি (৩৩) এই ধরনের মতামত ধারণ করতেন, সম্ভবত যার কারণ তার সৃষ্ট চরিত্র ইভান কারামাজমের মুখে উচ্চারিত কিছু বাক্য (৩৪):

> (ইভান) গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিল যে, প্রকৃতিতে এমন কোনো আইন নেই যা কিনা মানুষকে মানবতাকে ভালোবাসাতে পারে, এবং যদি সেই ভালোবাসার অস্তিত্ব থাকে, বা আজ অবধি পৃথিবীতে সেটির অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে সেটি অবশ্যই কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের কল্যাণে নয়, বরং সম্পূর্ণভাবে যার কারণ মানুষ তার নিজের অমরত্বে বিশ্বাস করে। এর পাশাপাশি তিনি যোগ করেন, ঠিক সেই জিনিসটাই যা প্রাকৃতিক আইন গঠন করে, অর্থাৎ নিজের অমরত্বের প্রতি তার বিশ্বাস যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন শুধু তার ভালোবাসার ক্ষমতাই নিঃশেষ হবে না, পৃথিবীতে জীবন পোষণকারী প্রাণশক্তিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। এবং অধিকন্তু তখন কিছুই আর অনৈতিক বলে বিবেচিত হবে না, সবকিছুরই অনুমতি থাকবে, এমনকি নরমাংস ভক্ষণ। এবং পরিশেষে, এটুকুই যেন যথেষ্ট নয়, তিনি ঘোষণা করেন, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য, যেমন আপনি এবং আমি, যারা ঈশ্বর বা নিজের অমরত্বে বিশ্বাসী নয়, প্রাকৃতিক আইনগুলো তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ববর্তী ধর্মভিত্তিক আইনের সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে উঠতে বাধ্য, এবং এই আত্মবাদ এমনকি অপরাধ সংঘটনকেও অন্তর্ভুক্ত করবে, যা শুধু অনুমতিই পাবে না, মানব অস্তিত্বের যৌক্তিক, এমনকি সবচেয়ে মহানতম কারণ হিসাবে শনাক্ত হবে।

হয়তো খানিকটা সরলভাবেই, ইভান কারামাজভের চেয়ে আমি মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত কম নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি। আমাদের কি সত্যি সত্যি

নজরদারীর প্রয়োজন আছে, ঈশ্বরের কিংবা পারস্পরিক - যা আমাদের স্বার্থপর এবং অপরাধীসুলভ আচরণ থেকে বিরত রাখতে পারে? আমি তীব্রভাবে বিশ্বাস করতে চাই যে, আমার জন্য এই ধরনের কোনো নজরদারী প্রয়োজন নেই। এবং প্রিয় পাঠকরা, আপনাদেরও প্রয়োজন নেই; আবার অন্যদিকে, আমাদের আত্মবিশ্বাসে খানিকটা ফাটল ধরিয়ে দুর্বল করে স্টিফেন পিংকারের (৩৫) মন্ট্রিয়ল পুলিশ ধর্মঘটের সময় তার মোহমুক্তির অভিজ্ঞতাটি - যা তিনি তার 'দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্লেট' বইটিতে বর্ণনা করেছিলেন:

> গর্বিতভাবে শান্তিপ্রিয় কানাডায় কল্পনাবিলাসী ষাটের দশকে অল্পবয়সী একজন কিশোর হিসাবে আমি বাকুনিনের(মিখাইল বাকুনিন) অ্যানার্কিজম বা নৈরাজ্যবাদের একনিষ্ঠ বিশ্বাসী ছিলাম। আমি আমার বাবা-মায়ের যুক্তি, যদি সরকার কোনোদিন তার অস্ত্র সমর্পন করে তাহলে ভয়াবহ নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভবিষ্যদ্বাণী দুটির পরীক্ষার সন্মুখীন হয় ১৯৬৯ সালের ১৭ অক্টোবর সকাল ৮ টায়, সেদিন যখন মন্ট্রিয়লের পুলিশ বাহিনী তাদের ধর্মঘট শুরু করেছিল। ১১:২০ মিনিটে, প্রথম ব্যাংক ডাকাতিটি হয়, বেপরোয়া লুটতরাজের ভয়ে দুপুরের মধ্যে শহরের সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায় আর কয়েক ঘন্টার মধ্যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা একটি লিমোজিন সার্ভিসের গ্যারেজে আগুন জ্বালিয়ে দেয়, যারা তাদের সাথে বিমান বন্দরের খদ্দের নিয়ে দ্বন্দ্বরত ছিল। ছাদের উপরে লকিয়ে থাকা এক বন্দুকধারী একজন পুলিশ অফিসারকে খুন করে, দাঙ্গাবাজরা বেশ কিছু হোটেল আর রেস্টুরেন্ট ভাঙ্গচুর করে, উপশহরে নিজের বাসায় অনুপ্রবেশ করা এক আগন্তুককে গুলি করে হত্যা করে একজন ডাক্তার। দিনের শেষে দেখা যায় মোট ছয়টি ব্যাঙ্ক আর শতাধিক দোকান লুট করা হয়েছে, বারোটি জায়গায় আগুন ধরানো হয়েছে, চল্লিশটি গাড়ি ভর্তি দোকানের কাচ ভাঙ্গা হয়েছে। নগর কর্মকর্তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনী, এবং অবশ্যই কেন্দ্রীয় পুলিশকে তলব করার আগে সম্পদ ধ্বংসের পরিমাণ প্রায় ৩ মিলিয়ন ডলার স্পর্শ করেছিল। এবং তারা যথারীতি ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে; এই সুস্পষ্ট চাক্ষুষ পরীক্ষা আমার রাজনৈতিক চিন্তা আর ধারণাকে এলোমেলো করে দিয়েছিল।

হয়তো আমিও একজন পলিয়ানা (৩৭), (অর্থাৎ অতিমাত্রায় হাসিখুশী আর আশাবাদী মানুষ), ঈশ্বরের পর্যবেক্ষণ আর নজরদারী নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মানুষ ভালো থাকতে পারবে এমনটাই যে বিশ্বাস করে। কিন্তু অন্যদিকে মন্ট্রিয়লের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠী মূলত ধর্মবিশ্বাসী, তাহলে ঈশ্বর ভয় কেন তাদেরকে এসব কাজ করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, যখন পৃথিবীর সেই মানব-পুলিশরা সাময়িকভাবে দৃশ্য থেকে বিদায় নিয়েছিল? মন্ট্রিয়লের এই পুলিশ ধর্মঘটটি কি খুব ভালো একটি প্রাকৃতিক পরীক্ষা ছিল

না, যা ঈশ্বরবিশ্বাস আমাদের ভালো মানুষ বানায় এমন হাইপোথিসিসটি হাতে কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দিয়েছিল? বা নৈরাশ্যবাদী এইচ. এল. মেনকেন (৩৮) ঠিক বলেছিলেন, যখন তিনি তার বুদ্ধিদীপ্ত তীর্যক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, 'মানুষ যখন বলে আমাদের ধর্ম প্রয়োজন যখন তারা আসলে বোঝাতে চায় আমাদের আসলে পুলিশের প্রয়োজন'।

স্পষ্টতই মন্ট্রিয়লের সবাই কিন্তু সেদিন খারাপভাবে আচরণ করেননি যখনই পুলিশ দৃশ্য থেকে চলে গিয়েছিল। একটি বিষয় জানা খুব কৌতূহলোদ্দীপক হবে যদি কোনো ধরনের পরিসংখ্যানগত প্রবণতা আছে কিনা দেখা সম্ভব হয়, তা যত সামান্যই হোক না কেন, অবিশ্বাসীরা ধর্মবিশ্বাসীদের তুলনায় সেদিন বেশি লুটপাট এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল কিনা? তবে এ বিষয়ে আমার তথ্যপুষ্টহীন ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, ঠিক এর বিপরীতটাই ঘটেছে। নৈরাশ্যবাদী সুরে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, 'ফক্সহোলে কোনো নিরীশ্বরবাদী নেই' (এটি একটি প্রচলিত প্রবাদ, যা প্রায়শই যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয় এই বলে যে, প্রচন্ড বিপদের মুখে, বা চাপে, যেমন বিশেষ করে যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রত্যেকেই কোনো না কোনো স্বর্গীয় শক্তিতে বিশ্বাস করে বা আশা করে এমন কোনো শক্তির উপস্থিতি আছে)। তবে আমি সংশয় প্রকাশ করে বলছি (কিছুটা প্রমাণসহ, যদিও সেখান থেকে উপসংহার টানা বেশি সরলীকরণ হয়ে যাবে) জেলখানায় খুব কমই নিরীশ্বরবাদী আছেন। আমি অবশ্যই দাবী করছি না নিরীশ্বরবাদ নৈতিকতা বৃদ্ধি করে, যদিও হিউম্যানিজম বা মানবতাবাদ - যে নীতিশাস্ত্র দর্শনটি নিরীশ্বরবাদীদের সাথে প্রায়ই যুগপৎ অবস্থান করে- সম্ভবত সেই কাজটি করে। আরেকটি ভালো সম্ভাবনা হতে পারে, নিরীশ্বরবাদীতা আরো একটি তৃতীয় নিয়ামকের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেমন, উচ্চশিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা এবং কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করার প্রবণতা, যা অপরাধ করার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করতে পারে। এই ধরনের গবেষণাগত যতটুকু প্রমাণ আছে, সেগুলো অবশ্যই ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে নৈতিকতার কোনো ইতিবাচক বা ধনাত্মক সম্পর্ক আছে এমন কোনো সাধারণ ধারণাকে সমর্থন করে না। পারস্পরিক সম্পর্কের প্রমাণ কখনো চূড়ান্ত নয় ঠিকই তবে নীচের উপাত্তগুলো, যা স্যাম হ্যারিস (৩৯) তার 'লেটার টু এ ক্রিশ্চিয়ান নেশন' বইটিতে বর্ণনা করেছিলেন, সেগুলো নিঃসন্দেহে দৃষ্টি আকর্ষণ করে (৪০):

> যদিও যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা সংশ্লিষ্টতা ধর্মীয় মানসিকতার একেবারে নির্ভুল সূচক হিসাবে গ্রহন করা যাবে না, তবে বিষয়টি আদৌ গোপন নয় যে, 'রেড' (রিপাবলিকান সমর্থকরা যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ) অঙ্গরাজ্যগুলো প্রধানত 'রেড', কারণ সেখানে বসবাসরত বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল খ্রিস্টানদের রাজনৈতিক প্রভাব। যদি খ্রিস্টীয় রক্ষণশীলতা ও সামাজিক স্বাস্থ্যসূচকগুলোর মধ্যে কোনো শক্তিশালী সম্পর্ক

> থাকতো, তবে রেড-স্টেট যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের সেটির নির্দশন দেখতে পাওয়ার কথা ছিল, সেটি আমরা কিন্তু দেখি না। যে ২৫ টি শহর, যেখানে ভয়ঙ্কর অপরাধের হার সর্বনিম্ন, তার শতকরা ৬২ শতাংশ 'ব্লু' (ডেমোক্র্যাটিক প্রধান) আর ৩৮ শতাংশ 'রেড' (রিপাবলিকান প্রধান) অঙ্গরাজ্যগুলোতে অবস্থিত। আর যে পঁচিশটি শহর, যেখানে ভয়ঙ্কর অপরাধের হার সবচেয়ে বেশি, সেই তালিকার শহরগুলোর ৭৬ শতাংশ 'রেড' ও ২৪ শতাংশ 'ব্লু' অঙ্গরাজ্যগুলোতে অবস্থিত; বাস্তবিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটি সবচেয়ে অপরাধপ্রবণ শহরের তিনটি অবস্থিত বিশেষভাবে ধার্মিক অঙ্গরাজ্য টেক্সাসে। অবৈধ গৃহ অনুপ্রবেশ ও চুরির হার বেশি এমন শীর্ষ বারোটি অঙ্গরাজ্য রেড বা রিপাবলিকান প্রধান। এছাড়া চুরির হার বেশি এমন ২৯ টি রাজ্যের ২৪টি হচ্ছে রেড। খুনের হারের দিক থেকে শীর্ষে থাকা মোট ২২ টি রাজ্যের মধ্যে ১৭টি হচ্ছে রেড (৪১)।

পদ্ধতিগত গবেষণা যদি কিছু থাকে সেটাও এই সম্পর্কগুলোকে সমর্থন করার প্রবণতা প্রদর্শন করে। 'জার্নাল অব রেলিজিয়ন অ্যান্ড সোসাইটিতে' ২০০5 এ প্রকাশিত গ্রেগরি এন. পল তার একটি প্রবন্ধে ১৭ টি অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন (৪২) এবং একটি বিধ্বংসী উপসংহারে উপনীত হন:
সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় একটি সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস, এবং উপাসনার উচ্চতর হার হত্যা, তরুণ ও অকাল মৃত্যু, যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব, কৈশোরে গর্ভধারণ ও গর্ভপাতের উচ্চ হারের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। ড্যান ডেনেট, তার 'ব্রেকিং দ্য স্পেল' বইটিকে এই বিষয়ে শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেছিলেন, যদিও স্যাম হ্যারিসের নির্দিষ্ট এই বইটির তথ্য প্রসঙ্গে নয়, সাধারণভাবে এ ধরনের গবেষণার ফলাফল নিয়ে।

> 'মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, এইসব ফলাফল ধর্মমনাদের মধ্যে নৈতিকতাসংক্রান্ত বোধ অপেক্ষাকৃত বেশি এই ধরনের প্রচলিত দাবীকে এত দৃঢ়ভাবে আঘাত করেছিল যে, ধর্মীয় সংস্থাগুলো এই উপসংহার খণ্ডানোর জন্য পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। একটা বিষয়ে আমরা নিশ্চিৎ হতে পারি যে, 'যদি' নৈতিক আচরণ ও ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতা, বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, খুব শীঘ্রই তা জানা যাবে। বিশেষ করে যখন অসংখ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উৎসাহের সাথে তাদের এই প্রথাগত বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন (তারা সাধারণত বিজ্ঞানের সত্য অনুসন্ধান করার প্রক্রিয়াটি দেখে বেশ মুগ্ধ হন, যখন তারা যা কিছু ইতোমধ্যেই বিশ্বাস করেন, সেটিকে বিজ্ঞান সমর্থন করে। এই ধরনের কিছু প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়া প্রতিটি 'মাস' যখন অতিক্রান্ত হচ্ছে,

তখন আসলে এই বিষয়টি সেই সন্দেহের দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে, আদৌ সে রকম কিছু হবে না'।

চিন্তাক্ষম অতিকাংশ ব্যক্তি স্বীকার করবেন, কোনো ধরনের পুলিশী-নজরদারী ছাড়া বিদ্যমান যে নৈতিকতা বোধ কোনো না কোনোভাবে আসলেই সত্যিকারের নৈতিকতা বোধ, সেই মিথ্যা নৈতিকতাবোধের তুলনায় যা শ্রেয়তর। যে মিথ্যা নৈতিকতা বোধ উধাও হয়ে যায় যে মুহূর্তে পুলিশরা ধর্মঘটে যায় বা লুকানো গোপন ক্যামেরা বন্ধ হয়। সেই স্পাই ক্যামেরা সত্যিকারের হোক, যা দিয়ে কিনা পুলিশ নজর রাখে, কিংবা স্বর্গে থাকা কোনো কাল্পনিক ক্যামেরাই হোক না কেন। কিন্তু নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে, যদি ঈশ্বর না থাকেন তাহলে ভালো হবার কি প্রয়োজন এই প্রশ্নটি ব্যবচ্ছেদ করা হয়তো পক্ষপাতমুক্ত না (এইচ এল. মেনকেন, আবারও তার বৈশিষ্ট্যসূচক নৈরাশ্যবাদীতায় বিবেককে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন, ভিতরের সেই কণ্ঠস্বর হিসেবে, যা আমাদের সাবধান করে দেয় কেউ হয়তো আপনাকে দেখছে)। কোনো ধর্মীয় চিন্তাবিদ হয়তো আরো আন্তরিক কোনো নৈতিকতা পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন কাল্পনিক কোনো ধর্মের পক্ষে সাফাই গাওয়া কোনো সমর্থনবাদীদের নীচের বক্তব্যের আদলে.. 'আপনি যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করেন, তাহলে আপনি নৈতিকতার কোনো চূড়ান্ত মানদণ্ডে বিশ্বাস করেন না; পৃথিবী সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম সদিচ্ছা নিয়ে আমি হয়তো ভালো মানুষ হবার চেষ্টা করবেন, কিন্তু আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন কোনোটা ভালো আর কোনোটা খারাপ? শুধু ধর্মই পারে আপনাকে সেই ভালো আর মন্দের চূড়ান্ত মানদণ্ডটি দিতে। ধর্মের অনুপস্থিতিতে আপনাকে এটি প্রয়োজন মাফিক বানিয়ে নিতে হবে; সেই নৈতিকতার ভিত্তিতে কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, প্রয়োজনের খাতিরে তৈরি করে নেয়া নৈতিকতা। যদি নৈতিকতা শুধু পছন্দ অপছন্দের ব্যপার হয়, তাহলে তার নিজস্ব জিনগত বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হিটলারও নিজেকে নৈতিক বলে দাবী করতে পারেন। এবং সব নাস্তিকরা যা করতে পারে তা হলো একটি ব্যক্তিগত পছন্দ বেছে নিতে, যা দিয়ে তারা ভিন্নভাবে জীবনযাপন করবে। খ্রিস্টান, ইহুদী বা মুসলিমরা এর ব্যতিক্রম, তারা অশুভ কোনো কিছুর একটি চূড়ান্ত অর্থ দিতে পারে, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অভিন্ন এবং সেটি অনুযায়ী হিটলার চূড়ান্তভাবে অশুভ একটি চরিত্র'।

এমন কি যদি সত্যিও হয়, আমাদের নৈতিকতা সম্পন্ন হতে ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, সেটা অবশ্যই ঈশ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয় না, শুধু তার অস্তিত্বকে বেশি কাঙ্ক্ষিত করে তোলে (বেশির ভাগ মানুষই এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না), কিন্তু সেটা বিবেচ্য বিষয় না এখানে। আমার কাল্পনিক ধর্ম-সমর্থনকারী ব্যক্তিটির কোনো প্রয়োজন নেই স্বীকার করার যে, ঈশ্বরের তোষামদ করা হচ্ছে তার ভালো কাজ করার ধর্মীয় প্রণোদনা, বরং তিনি দাবী করছেন যে ভালো কিছু করার 'উদ্দেশ্য' যেখান থেকেই আসুক না কেন, ঈশ্বর ছাড়া কোনো মানদণ্ড বা চূড়ান্ত নির্ধারক নেই, যা দিয়ে

আমরা ভালো বা মন্দ নির্ধারণ করতে পারি। আমরা প্রত্যেকেই ভালোর একটি নিজস্ব সংজ্ঞা তৈরি করে নিতে পারি, এবং সেভাবে আচরণ করতে পারি। শুধু ধর্মের উপর ভিত্তি করে থাকা নৈতিক মূলনীতিকে (এর বিপরীতে ধরুন 'গোল্ডেন রুল', যা ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করা হচ্ছে অহরহ কিন্তু তাদের উৎপত্তি অন্য কোথাও) বলা যেতে পারে অ্যাবসল্যুটিষ্ট বা চূড়ান্তবাদী । ভালো হচ্ছে ভালো আর খারাপ হচ্ছে খারাপ এবং কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কি হবে, যেমন, কেউ কষ্ট সহ্য করছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না আমরা, আমার ধর্মীয় সমর্থনকারী দাবী করবেন যে, শুধু ধর্মই পারে কোনটা ভালো, সেটার সিদ্ধান্ত নেবার ভিত্তি রচনা করতে।

বেশ কয়েকজন দার্শনিক, উল্লেখযোগ্যভাবে কান্ট (৪২) ধর্মীয় পরিমণ্ডলের বাইরে অ্যাবসোল্যুট বা চূড়ান্ত নৈতিকতার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন।যদিও তিনি নিজে একজন ধার্মিক মানুষ ছিলেন, তার সময়ে যা অবশ্যম্ভাবী ছিল (৪৩)। কান্ট নৈতিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন তার ঈশ্বরের উপর নয় বরং কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য সম্পাদনের উপর। তার বিখ্যাত 'ক্যাটেগরিক্যাল ইমটপেরাটিভ' বা শ্রেণীবদ্ধ অপরিহার্য বা অবশ্যপালনীয় আমাদের নির্দেশ দেয়: কেবলমাত্র সেই সর্বোচ্চ নীতি অনুযায়ী কাজ করুন, একই সময়ে যে নীতিটিকে আপনি সর্বজনীন আইন হিসাবে পরিণত হতে চাইতে পারেন'(কান্টের নৈতিক দর্শনে কেন্দ্রে আছে শ্রেণীবদ্ধ অপরিহার্য, যা মূলত কোনো কাজের উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়; তার ভাষায় ইম্পেরাটিভ বা অপরিহার্য বা অবশ্যপালনীয় হচ্ছে যে-কোনো একটি প্রস্তাব যা কোনো কাজকে আবশ্যিক রূপে চিহ্নিত করে। তিনি দুই ধরনের 'অপরিহার্য' প্রস্তাব করেছিলেন: হাইপোথেটিক্যাল ইমপেরাটিভ বা কল্পিত অপরিহার্য, যা প্রযোজ্য হয় যখন কেউ সেই কাজের উপর নির্ভর করে কোনো একটি নির্দিষ্ট ফলাফল অর্জন করতে চায়, যেমন যদি আমার তৃষ্ণা পায়, আমাকে পান করতে হবে। কিন্তু ক্যাটেগরিক্যাল ইম্পেরাটিভ হচ্ছে কোনো চূড়ান্ত বা অ্যাবসোল্যুট, নিঃশর্ত প্রয়োজন, যা যে-কোনো পরিস্থিতিতে যে-কারো জন্য অবশ্যপালনীয়, যা প্রয়োজনীয় এবং এর মূল উদ্দেশ্য সেই কাজটির মধ্যে নিহিত। যে দাবীটির যৌক্তিকতা কোনো উদ্দেশ্য বা ফলাফল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, যেমন, চুরি করা যাবে না, একটি শ্রেণীবদ্ধ অবশ্যপালনীয়, যা কল্পিত অপরিহার্যের ধারণা থেকে আলাদা, যেমন, যদি জনপ্রিয় হতে চাও তাহলে চুরি করো না। কান্টের সবচেয়ে বিখ্যাত শ্রেণীবদ্ধ অপরিহার্যের ধারণাটি আমাদের নির্দেশ দেয়, আপনি যদি কোনো কাজ সম্পাদন করতে উদ্যত হন (যা সারারণ নীতি হিসাবে সংজ্ঞয়িত), তাহলে আপনি শুধুমাত্র সেই কাজটি করতে পারবেন, যদি কাজটি করা সবার জন্য সঠিক হয়।)

'মিথ্যা' বলার উদাহরণের সাথে এটি বেশ ভালোভাবেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি পৃথিবী কল্পনা করুন, যেখানে সবাই নীতিগতভাবে মিথ্যা কথা বলে, যেখানে

মিথ্যা বলার কাজটি একটি ভালো এবং নৈতিক গুণ হিসাবে বিবেচ্য, এই ধরনের পৃথিবীতে, একসময় মিথ্যা বিষয়টির আরো কোনো অর্থ থাকবে না। মিথ্যার সংজ্ঞার জন্যেই প্রয়োজন 'সত্য' সম্বন্ধে একটি পূর্বধারণার উপস্থিতি।(মূল ধারণাটি হচ্ছে কোনো একটি কাজ শুধুমাত্র তখনই নৈতিক হবে যদি কোনো পরস্পরবিরোধীতা ছাড়াই সেটিকে সর্বজনীন রূপ দেয়া যেতে পারে। যেমন, আগের পরিস্থিতির রূপ দেই, মিথ্যা বলার অনুমতি আছে - যদি সবাই সবসময় মিথ্যা বলে তাহলে সবাই ধরে নিতে পারবে বাকিরা সবাই সবসময় মিথ্যা বলছে। বিষয়টি মিথ্যা বলা অসম্ভব করে তোলে, কারণ বাকি সবাই আগেই থেকে জানে আপনি সত্য কথা বলছেন না। সুতরাং এখানে অসঙ্গতিটা আছে, সেকারণে মিথ্যা বলা অনৈতিক।) যদি কোনো নৈতিক মূলনীতি হচ্ছে এমন কিছু যা কিনা সবাই অনুসরণ করবে বলে আমরা ইচ্ছা পোষণ করে থাকি, তাহলে মিথ্যা কথা বলা কখনোই নৈতিক মূলনীতি হতে পারবে না, কারণ এই মূলনীতিটি নিজেই এর অর্থহীনতার কারণে অকেজো হয়ে পড়বে। মিথ্যা কথা বলা, জীবনের একটি আইন হিসাবে, অন্তর্গতভাবেই অস্থিতিশীল। আরো সাধারণ অর্থে, স্বার্থপরতা বা 'ফ্রি-রাইডিং' বা বিনাশ্রমে আরেক জনের সদিচ্ছার উপর ভর করে নিজের উপকার আদায় করে নেয়া বা পরজীবিতা একজন একাকী স্বার্থপর ব্যক্তি হিসাবে হয়তো আমার একার জন্য কাজ করবে, এবং নিজেকে ব্যক্তিগত সন্তুষ্টি দেবে, কিন্তু নিশ্চয়ই আমি আশা করতে পারি না যে, নৈতিক মূলনীতি হিসাবে সবাই স্বার্থপর পরজীবিতার নীতি অনুসরণ করবে, এর অন্তত একটি কারণ হচ্ছে, কারো উপর তাহলে আমি আমার পরজীবিতার জীবন চাপিয়ে দিতে পারবো না, কারণ সবাই সেখানে পরজীবী।

সত্যি কথা বলা এবং অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে কান্টীয় আবশ্যিকতাগুলো আপাতদৃষ্টিতে কাজ করে। কিন্তু খুব সহজ নয় এটি বোঝা যে এই ধারণাটিকে কিভাবে সামগ্রিকভাবে সাধারণ নৈতিকতার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারণ করা যায়। কান্ট সত্ত্বেও, আমার সেই কাল্পনিক ধর্মীয় সমর্থকের সাথে একমত হবার প্রতি একটি প্রলোভন কাজ করে, তা হলো চূড়ান্ত নৈতিকতার বিষয়গুলো ধর্ম সাধারণত পরিচালনা করে থাকে। কোনো অনারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মুমুর্ষ রোগীর নিজের অনুরোধের উপর ভিত্তি করে তাকে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়াটা কি আসলেই সবসময় ভুল হবে? একই লিঙ্গের কারো সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াটি আসলেই কি সবসময় ভুল হবে? কোনো একটি ভ্রূণকে হত্যা করা কি আসলেই সবসময় ভুল? অবশ্য এমন মানুষ আছেন যারা ঠিক সেটাই বিশ্বাস করেন, এবং তারা এর বিরুদ্ধে কোনো তর্ক বা যুক্তির জায়গা রাখেন না। তারা মনে করে, যারা এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবেন তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা যেতে পারে: অবশ্যই রূপকার্থে, আক্ষরিক অর্থে না শুধু আমেরিকার গর্ভপাত ক্লিনিকের কিছু চিকিৎসক ছাড়া (পরবর্তী অধ্যায়ে দেখুন)। সৌভাগ্যজনকভাবে যদিও নৈতিকতার কোনো বিষয়কে যে চূড়ান্তই হতে হবে এমন কোনো কারণ নেই।

নীতিশাস্ত্রের দার্শনিকরা হচ্ছেন মূলত পেশাজীবী দার্শনিক, যারা কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন। রবার্ট হিন্ড চমৎকারভাবে যা বলেছিলেন, ‘তারা একমত যে, নৈতিক ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি যে যুক্তি দ্বারা তৈরি হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তবে সেটি যুক্তি দিয়ে রক্ষা করতে পারার মত অবশ্যই হতে হবে’ (৪৪)। নীতিশাস্ত্রের দার্শনিকরা নিজেদেরকে নানাভাবে শ্রেণীবিন্যাস করে থাকেন, তবে আধুনিক শব্দমালায় মূল বিভাজনটি হচ্ছে: ‘ডিওন্টোলজিস্ট’ বা নীতিশাস্ত্রবাদী (যেমন কান্ট) এবং ‘ ‘কনসিকোয়েন্সশিয়ালিস্ট’ বা পরিণতিবাদী (যেমন ইউটিলিটারিয়ান বা উপযোগিতাবাদী দার্শনিক জেরেমি বেনথাম)। ডিওন্টোলজি হচ্ছে সেই বিশ্বাসের একটি পোষাকী নাম, যা দাবী করে নৈতিকতা মূলত বিধি বা নিয়ম মেনে চলা, আক্ষরিকার্থে এটি হচ্ছে কর্তব্যের বিজ্ঞান, শব্দটির গ্রিক অর্থ ‘যা কিছুর শর্ত দেয়া আছে’। ডিওন্টোলজি কিন্তু নৈতিক চরমবাদের মত একই জিনিস নয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম বিষয়ক কোনো বইয়ে এই দুটির পার্থক্য নিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই। চরমবাদীরা বিশ্বাস করেন, সঠিক এবং ভুলের নিরঙ্কুশ বা চূড়ান্ত একটি অবস্থান আছে; অবশ্যপালনীয় কর্তব্যগুলো যেগুলো দঢ় আঁটসাঁট বাধুনী তাদের ফলাফল বা পরিণতি সম্পর্কে কোনো ধরনের তথ্য দেয় না।পরিণতিবাদীরা আরো প্রায়োগিক মানসিকতায় বিশ্বাস করেন, পরিণতি বা ফলাফল বিচার করার মাধ্যমে কোনো একটি কাজের নৈতিকতা বিচার করা যাবে।পরিণতিবাদের একটি সংস্করণ হচ্ছে উপযোগিতাবাদ, বেনথাম (৪৫) ও তার বন্ধু জেমস মিলসের ছেলে জন স্টুয়ার্ট মিলসের (৪৬) সাথে যে দার্শনিক ধারণাগুলো সংযুক্ত। উপযোগিতাবাদের সারাংশটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায়শই বেনথামের খানিকটা অসঠিক মন্তব্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়: ‘সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের জন্য সবেচেয়ে বেশি সুখ হচ্ছে নৈতিকতা এবং আইনের মূল ভিত্তি’ (৪৭)।

সব চূড়ান্তবাদ কিন্তু ধর্ম থেকে আসেনি। তাসত্ত্বেও, চরমবাদীদের নৈতিকতাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ছাড়া অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে বিচার করা খুব কঠিন। একটি প্রতিদ্বন্দ্বী যা আমি চিন্তা করতে পারি তা হলো ‘দেশপ্রেম’, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়। স্পেনের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক লুই বুনুয়েল বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর এবং দেশ হচ্ছে অপরাজিত একটি টিম; তারা নিপীড়ন এবং রক্তপাতের সকল রেকর্ড ভঙ্গকারী’। সেনাবাহিনীর নিয়োগকর্তারা তাদের শিকারদের দেশপ্রেমের অনুভূতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নারীরা যে সমস্ত তরুণরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়নি তাদের সাদা পালক বিতরণ করতো এই বলে যে:

> ওহ, আমরা তোমাদের হারাতে চাই না, কিন্তু আমরা মনে করি তোমাদের যুদ্ধে যাওয়া উচিত, কারণ রাজা এবং দেশ উভয়েরই প্রয়োজন আছে, তোমরা যেন সেই ভাবে দ্বায়িত্ব নাও।

যারা বিবেকের তাড়নায় যুদ্ধে অংশগ্রহন করেননি, তারা ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন, এমনকি যারা দেশের শত্রু তাদের কাছেও। কারণ দেশপ্রেমকে একটি চূড়ান্ত গুণ হিসাবে মনে করা হয়, কোনো পেশাজীবী সৈন্যের বিশ্বাস করা 'সঠিক কিংবা ভুল হোক আমার দেশ', এর চেয়ে চূড়ান্ত কিছু খুঁজে পাওয়া কঠিন; কারণ এই শ্লোগান আপনাকে যে কাউকে হত্যা করতে বাধ্য করবে, যাকে ভবিষ্যতে রাজনীতিবিদরা হয়তো দেশের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করবেন। যদিও পরিণতিবাদী যুক্তিতর্ক হয়তো যুদ্ধে যাবার রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবিত করতে পারে, কিন্তু একবার যখন যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়, চূড়ান্ত দেশপ্রেম তার দৃঢ় শক্তি দিয়ে সব কিছু অধিগ্রহন করে, যে-ধরনের শক্তি সাধারণত ধর্মের বাইরে দেখা যায় না। একজন সৈন্য যে তার নিজস্ব পরিণতিবাদী চিন্তাকে অনুমতি দেয় বেশি বাড়াবাড়ি না করতে, তার নিজেকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি দেখবার ও এমনকি মৃত্যুদণ্ডে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা বেশি।

নৈতিক দর্শন নিয়ে এই আলোচনার সূত্র ছিল ধর্মবাদীদের একটি কল্পিত দাবী যে, ঈশ্বর ছাড়া, নৈতিকতা হচ্ছে আপেক্ষিক এবং কাল্পনিক। কান্ট এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত নীতিশাস্ত্রের দার্শনিকরা বাদে, এবং দেশপ্রেমের অনুভূতির তীব্রতার প্রতি যথাযোগ্য নজরসহ, চূড়ান্ত বা চরমবাদী নৈতিকতার শ্রেয়তর উৎস হচ্ছে সাধারণত কোনো না কোনো একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যাদের ব্যাখ্যা করা হয় এমন কর্তৃত্বশালী হিসাবে, যার কর্তৃত্ব ইতিহাসের যৌক্তিকতা প্রমাণের তোয়াক্কা করে না। আসলেই ধর্মগ্রন্থের কর্তৃত্বের অনুসারীরা হতাশাজনকভাবে তাদের ধর্মগ্রন্থের ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্বন্ধে খুব সামান্যই কৌতূহল প্রদর্শন করে (সাধারণত যা খুবই সন্দেহজনক)।

পরবর্তী অধ্যায়ে যে বিষয়টি প্রদর্শন করবো তা হলো, যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, যারা দাবী করেন যে, তাদের নৈতিকতাবোধগুলো তারা ধর্মগ্রন্থ থেকে পেয়েছেন, তারা আসলে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তা কিন্তু ব্যবহার করছেন না। এবং সেটি অবশ্যই ভালো, বিষয়টি নিয়ে খানিকটা চিন্তা করলে তাদেরও সেই সত্য স্বীকার করে নেয়া উচিত।

টীকা:

(১) ওয়েজ স্ট্রাটেজি রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপন্থা যার সূচনা করেছে ডিসকভারি ইন্সস্টিটিউট। যে প্রতিষ্ঠানটি ইন্টেলিজেন্ট মতবাদের মূল কেন্দ্র। এই কৌশলটি বর্ণিত হয়েছে ডিসকভারী ইন্সস্টিটিউটের ইশতেহারে, যা পরিচিত ওয়েজ ডকুমেন্ট নামে (Wedge Document)। এই ডকুমেন্টটি মূলত ব্যাখ্যা করেছে একটি ব্যাপক সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাভিত্তিক কর্মপন্থা - যার মূল উদ্দেশ্য বস্তুবাদিতা, প্রকৃতিবাদ এবং বিবর্তনের ধারণার বিরোধিতা করা। ওয়েজ রূপকটি এসেছে ফিলিপ ই. জনসনের নিকট থেকে এবং রূপকটি মূলত একটি ধাতু নির্মিত গোঁজ, যা কোনো কাঠের গুড়িকে চিরে দুই টুকরো করছে,

এটি আগ্রাসী জনসংযোগ কর্মসূচীর প্রতিনিধিত্ব করছে যা একইভাবে জনগনের বিজ্ঞান সংক্রান্ত ধারণার মধ্যে অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলোর প্রবেশ করার একটি পথ সৃষ্টি করতে পারে। মূল বিষয়টি হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্ববাদী ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ছদ্ম রুপে ওয়েজ স্ট্রাটেজি ব্যবহার করে ছলনার কৌশল নিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে প্রবেশ করতে চাইছে।
(২) বারবার ক্যারল ফরেষ্ট, যুক্তরাষ্ট্রের দার্শনিক।
(৩) পল গ্রস, জীববিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক।
(৪) Creationism's Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design. Barbara Forrest and Paul R. Gross.
(৫) সঠিকভাবে উত্তর দেবার ইচ্ছা সত্ত্বে সংখ্যায় যার পরিমাণ অনেক বেশি, এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।
(৬) ব্রায়ান ফ্লেমিং, আমেরিকার চিত্রপরিচালক, লেখক, নাট্যকার এবং অ্যাক্টিভিষ্ট।
(৭) The God Who Wasn't There, documentary film, Brian Flemming.
(৮) রবার্ট বাকমান (১৯৪৮-২০১১) ব্রিটিশ কানাডিয়ান চিকিৎসক, লেখক, টিভি উপস্থাপক।
(৯) https://ffrf.org/publications/freethought-today
(১০) "Cheese-eating surrender monkeys", কখনো সংক্ষিপ্তরুপে "surrender monkeys" ব্যঙ্গাত্মক শব্দ যা ফরাসীদের প্রতি নির্দেশ করে। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় টেলিভিশন ধারাবাহিক The Simpsons এ উচ্চারিত হয়েছিল, লেখক কেন কিলার এর মাধ্যমে।.
(১১) আলবেয়ার্ত কামু, ফরাসী লেখক ও দার্শনিক।
(১২) Unweaving the Rainbow, Richard Dawkins
(১৩) Robert Hinde. Why Good is Good: the Sources of Morality
(১৪) Michael Shermer. The Science of Good and Evil: Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule
(১৫) Rob Buckman. Can We be Good Without God? Biology, Behavior, and the Need to Believe.
(১৬) মার্ক ডি. হাউসার, বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, হিউম্যান ও অ্যানিম্যাল কগনিশন গবেষণায় অগ্রদূত।
(১৭) Marc Hauser, Moral Minds: How Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong.
(১৮) আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়েছিলাম গার্ডিয়ান পত্রিকায় (অ্যানিমাল ইনস্টিঙ্কটস, ২৭ মে ২০০৬) পড়ে যে কুখ্যাত এনরন কর্পোরেশনের সিইও জেফ স্কিলিং-এর প্রিয় বই হচ্ছে দ্য সেলফিশ জিন এবং এর সোস্যাল ডারউইনিজমের একটি রূপ থেকে তিনি নাকি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। গার্ডিয়ানের সাংবাদিক রিচার্ড কনিফ এই ভুল বোঝাবুঝির একটি ভালো ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এখানে: http://money. guardian.co.uk/ workweekly/ story/0, ,1783900,00.html; আমিও ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল বোঝার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার জন্য অক্সফার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের দ্য সেলফিশ জিন এর ত্রিশতম প্রকাশনা বার্ষিকী সংস্করণের ভূমিকায় এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছি।
(১৯) উইলিয়াম ডোনাল্ড 'বিল' হ্যামিলটন (১৯৩৬-২০০০) ব্রিটিশ বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, তাঁকে বিংশ শতাব্দীর সেরা বিবর্তন তাত্ত্বিক হিসাবে মনে করা হয়।
(২০) রবার্ট ট্রিভার্স, যুক্তরাষ্ট্রের বিবর্তন জীববিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিক।
(২১) ম্যাথিউ রিডলি, ব্রিটিশ সাংবাদিক,রাজনীতিবিদ,লেখক।
(২২) Matt Ridley. The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation.
(২৩) রেপুটেশন বা সুনামের ব্যপারটি শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; সম্প্রতি দেখা গেছে এটি প্রাণীজগতে পারস্পরিক পরার্থবাদের অন্যতম একটি ধ্রুপদী উদাহরণের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করে করা যায়: ক্ষুদ্র ক্লিনার ফিস এবং তাদের খদ্দের বড় মাছের পারস্পরিক মিথোজীবিতা সম্পর্কে। একটি অসাধারণ

বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষার মাধ্যমে গবেষকরা লক্ষ করেছেন যে, একক কোনো ক্লিনার র‍্যাস মাছকে (Labroides dimidiatus) যখন কোনো সম্ভাব্য খদ্দের লক্ষ করে যে সে খুব ভালোভাবে তার কাজটি করছে আর তার অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী *Labroides dimidiatus*, তার কাজে অবহেলা করছে, এদের দুজনের মধ্য থেকে তাদের খদ্দের বড় মাছগুলোর পরিশ্রমী *Labroides dimidiatus* কে বেছে নেবার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। তথ্যসূত্র: R. Bshary and A. S. Grutter, Image scoring and cooperation in a cleaner fishmutualism, Nature 441, 22 June 2006,

(২৪) থরস্টেইন বুন্ড ভেবলেন (১৮৫৭-১৯২৯), নরওয়ে-আমেরিকার অর্থনীতিবিদ।

(২৫) আমোৎজ জাহাবি (জন্ম ১৯২৮) ইসরায়েলী বিবর্তন জীববিজ্ঞানী।

(২৬) Potlatch Effect

(২৭) অ্যালেন গ্রাফেন, অক্সফোর্ড এর প্রাণীবিজ্ঞানের অধ্যাপক, তাত্ত্বিক জীববিজ্ঞানী।

(২৮) *Turdoides squamiceps*

(২৯) উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের একটি নাটক:

কিন্তু দয়ার গুণাবলী থাকে অক্ষুন্ন,
শান্ত বৃষ্টির ধারার মতোই এটি স্বর্গ থেকে নীচে মর্তে নেমে আসে;

(৩০) উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এর রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট নাটকে দুই দ্বন্দ্বরত পরিবার।

(৩১) পিটার সিংগার,অষ্ট্রেলিয় দার্শনিক।

(৩২) M. Hauser ,P. Singer, 'Morality without religion', Free Inquiry 26: 1, 2006, 18-19.

(৩৩) ফিওদর মিখাইলোভিচ দস্তয়ইয়েভস্কি (১৮২১ - ১৮৮৮) রুশ ঔপন্যাসিক, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক ও দার্শনিক।

(৩৪) F. Dostoevsky. The Karamazov Brothers. Oxford: Oxford University Press. (1994: bk 2, ch. 6, p. 87).

(৩৫) স্টিভেন পিংকার, কানাডিয়-আমেরিকান কসনিটিভ সায়েন্টিষ্ট ও এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজীষ্ট, লেখক।

(৩৬) S. Pinker.The Blank Slate, , (2002). . New York, NY: Viking.

(৩৭) পলিয়ানা হচ্ছে এমন কেউ যার অদম্য আশাবাদ আছে, সবকিছুর মধ্যে কিছু না কিছু ভালো খোজার প্রবণতা আছে। শব্দটির উৎপত্তি পলিয়ানা (Pollyanna), Eleanor Porter এর ১৯১৩ সালে প্রকাশিত Pollyanna উপন্যাসের নায়িকা।

(৩৮) এইচ. এল. মেনকেন (১৮৮০-১৯৫৬) আমেরিকার সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক।

(৩৯) স্যাম হারিস, যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক লেখক।

(৪০) Letter to a Christian Nation: Sam Harris

(৪১) লক্ষ করুন এই লাল আর নীল রঙের বন্টন যা অ্যামেরিকায় আমরা দেখি, ব্রিটেনে কিন্তু তা ঠিক এর বিপরীত, যেখানে নীল হচ্ছে কনজারভেটিভ পার্টির রঙ, এবং লাল, সারা পৃথিবীর মতোই ঐতিহ্যগতভাবে রাজনৈতিক বাম মতাদর্শদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

(৪২) Gregory S. Paul. Cross-National Correlations of Quantifiable Societal Health with Popular Religiosity and Secularism in the Prosperous Democracies. Journal of Religion & Society Volume 7 (2005) 1522-5658 (http://moses.creighton.edu/jrs/2005/2005-11.pdf)

(৪২) ইমানুয়েল কান্ট: জার্মান দার্শনিক

(৪৩) এটি কান্টের দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর একটি মানসম্পন্ন ব্যাখ্যা; তবে বিখ্যাত দার্শনিক এ সি গ্রেলিং ব্যাখ্যা সহ যুক্তি দিয়েলেন (নিউ হিউম্যানিষ্ট জুলাই-আগষ্ট ২০০৬)) যে, যদি কান্ট বাহ্যিকভাবে তার সময়ে ধর্মীয় প্রধান সব আচার অনুষ্ঠানই মেনে চলতেন তবে তিনি আসলে সত্যি একজন নাস্তিক ছিলেন।

(৪৪) Hinde, R. A. Why Good Is Good: The Sources of Morality.London: Routledge
(৪৫) জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২) ব্রিটিশ দার্শনিক, আধুনিক উপযোগিতাবাদের জনক।
(৪৬) জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ব্রিটিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ, তাত্ত্বিক।
(৪৭) Greatest happiness of the greatest number is the foundation of morals and legislation

৭ সপ্তম অধ্যায়

‘পবিত্র’ গ্রন্থ এবং যুগের সাথে বদলে যাওয়া নৈতিকতার জাইটগাইস্ট বা যুগধর্ম

‘রাজনীতি হত্যা করেছে হাজারে, কিন্তু ধর্ম হত্যা করেছে হাজারে হাজারে’।
- সন ও’ কাহাসি (১)

দুইটি উপায়ে ধর্মগ্রন্থ নৈতিকতা আর জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বিধির উৎস হতে পারে। একটি হচ্ছে সরাসরি নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে, যেমন, টেন কম্যান্ডমেন্টস (২), যা যুক্তরাষ্ট্রের অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক যুদ্ধের তীব্র তর্ক-বিতর্কের একটি অত্যন্ত তিক্ত বিষয়। অন্য উপায়টি হচ্ছে উদাহরণের মাধ্যমে, যেমন, ঈশ্বর বা বাইবেলে বর্ণিত অন্য কোনো চরিত্র হয়তো যাকে আধুনিক ভাষায় বলা যায় - কোনো রোল-মডেল বা অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব - সেই দ্বায়িত্ব পালন করে। নৈতিকতা শিক্ষা দান করার দুটোই শাস্ত্রীয় পন্থা, যদি খুব ধার্মিকভাবে (এই ক্রিয়াগুণটি কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে রূপকার্থে, তবে এর উৎসের প্রতি পূর্ণ নজর রেখে) মেনে চলা হয়, সেটি এমন একটি নৈতিক পদ্ধতিকে উৎসাহিত করবে যে, ধার্মিক ও নিধার্মিক নির্বিশেষে যে-কোনো সভ্য আধুনিক ব্যক্তি এটিকে - আমি এর চেয়ে মৃদুভাবে বিষয়টি বলতে অক্ষম - ঘৃণ্য হিসেবেই অনুভব করবেন।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যদি বলা হয়, বাইবেলের অধিকাংশ অংশ কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে অশুভ নয়, বরং বলা যায় স্পষ্টতই খুব অদ্ভুত, এই ধরনের কোনো এলোমেলোভাবে সংকলিত, পরস্পর বৈসাদৃশ্য প্রমাণিক দলিলের ক্ষেত্রে যা সাধারণত প্রত্যাশিত। প্রায় নয় শতাব্দী জুড়ে যা রচিত, সংযোজিত, পুনসংশোধিত, সম্পাদিত, অনূদিত, বিকৃত এবং ‘উৎকর্ষতা’ সাধিত হয়েছে শত শত নামহীন লেখক, সম্পাদক, অনুলিপিকারকদের দ্বারা, যারা আমাদের কাছে যেমন, তেমনি পরস্পরের কাছেও অচেনা ছিলেন। এই ব্যপারটি হয়তো বাইবেলের খুব বেশি অদ্ভুত ব্যপারগুলোর ব্যাখা হয়তো দিতে পারে (৩)। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই একই অদ্ভুত বইটা ধার্মিক অত্যুৎসাহীরা নৈতিকতার এবং জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বিধির অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয় উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন। যারা তাদের নৈতিকতাকে আক্ষরিক অর্থে বাইবেল-ভিত্তিক করে তোলার ইচ্ছা পোষণ করেন, তারা হয় বাইবেল পড়েননি বা তা আদৌ বোঝেননি, যেমন বিশপ জন শেলবি স্পং (৪) তার ‘দ্য সিনস অব স্ক্রিপচার’ বইটিতে সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন (৫)। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বিশপ স্পং, উদারপন্থী বিশপদের মধ্যে একটি চমৎকার উদাহরণ, যার বিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাণ অগ্রসর এবং সেটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যারা নিজেদের খ্রিস্টান বলেন তাদের থেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার ব্রিটিশ সমতূল্য হচ্ছেন রিচার্ড হলোওয়ে (৬), এডিনবরা বিশপের দ্বায়িত্ব থেকে যিনি সম্প্রতি অবসর গ্রহন করেছেন। বিশপ হলোওয়ে এমনকি নিজেকে আরোগ্যলাভের পথে একজন এক খ্রিস্টান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার সাথে এডিনবরায়, একটি উন্মুক্ত আলোচনা করার সুযোগ হয়েছিল আমার, যা অন্যতম একটি কৌতুলোদ্দীপক সাক্ষাৎকার ছিল আমার জন্য (৭) ।

ওল্ড টেস্টামেন্ট (৮)

জেনেসিস বা সৃষ্টির কাহিনী দিয়ে শুরু হওয়া, নোয়ার (আরবী, নুহ) (৯) অত্যন্ত লোকপ্রিয় একটি গল্প, যার মূল উৎস ব্যাবিলনীয় উটনাপিশটিমের (১০) পুরাণ কাহিনী, এবং বেশ কয়েকটি সংস্কৃতির প্রাচীন পুরাণেও যা পরিচিত। জোড়ায় জোড়ায় সব প্রাণীদের নোয়ার বানানো নৌকায় ওঠার পুরাণ কাহিনী বেশ আবেদনময় আর সুন্দর,তবে নোয়ার এই গল্পের নৈতিক শিক্ষাটা কিন্তু ভয়ঙ্কর: মানুষ সম্পর্কে ঈশ্বর এতটাই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেছিলেন যে, তিনি (একটি মাত্র পরিবার ছাড়া) বাকিদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেন, যাদের মধ্যে শিশুরাও ছিল, এবং সেই সাথে আর্কের (নৌকা) মধ্যে আশ্রয় নেয়া প্রাণীরা ছাড়া, বাকি সব প্রাণীদের হত্যা করা হয় (যারা ছিল স্পষ্টতই নির্দোষ)।

অবশ্য বিরক্ত ধর্মতত্ত্ববিদরা প্রতিবাদ করতে পারেন এই বলে যে, আমরা এখন আর জেনেসিসের বইটাকে আদৌ আক্ষরিকভাবে গ্রহন করি না। আর সেটা আমারও কিন্তু মূল বক্তব্য। আমরা ধর্মগ্রন্থ থেকে বাছাই করে ঠিক করি কোনো অংশটা বিশ্বাস করবো, আর কোনো অংশটাকে প্রতীকী বা রূপক বলে চিহ্নিত করবো। আর এই ধরনের যাচাই বাছাই করার বিষয়টি ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের একটি ব্যপার, যেমন, কম বা বেশি নিরীশ্বরবাদীদের এই নৈতিক নির্দেশনা মান্য করার ক্ষেত্রে তাদের নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর মত বা সেগুলো ছিল কোনো ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের মত যার চরম বা চূড়ান্ত কোনো ভিত্তি নেই। যদি এর মধ্যে কোনোটি ‘যখন যা প্রয়োজন সেই মোতাবেক কোনো নৈতিকতা’ হয়ে থাকে, তাহলে অন্যটিও তাই।

শিক্ষিত ধর্মতাত্ত্বিকদের ভালো উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও, ভয়ঙ্কর রকম একটি বিশাল সংখ্যক মানুষ নোয়ার গল্পসহ তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে আক্ষরিকভাবে সত্য বলেই মান্য করে থাকে করেন। গ্যালাপ কোম্পানির একটি গণ-জরিপ জানাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের ভোটারদের মধ্যে এদের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ। এছাড়া কোনো সন্দেহ নেই এশিয়ার বহু সাধু সন্তরা যাদের অনেকেই প্লেট-টেকটোনিকের অবস্থান পরিবর্তন নয় বরং মানুষের পাপকর্মকে ২০০৪ সালের ভয়াবহ সুনামির কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, যেমন মদ্যাপান থেকে শুরু করে, মদ্যশালায় নাচ কিংবা সাবাথের (জেনেসিস এ বর্ণিত সপ্তাহের বিশ্রামের দিন হিসাবে চিহ্নিত দিনটি) কোনো ছোটোখাট বিধি না মানার পাপ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে (১১)। নোয়ার গল্পে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, বাইবেল শিক্ষা ছাড়া আর সবকিছু সম্বন্ধে অজ্ঞ, এইসব মানুষগুলোকে কে দোষ দিতে পারে? তাদের পুরো শিক্ষাই শিখিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষের কর্মকাণ্ডের সাথেই যুক্ত, মানুষের পাপের ফলাফল, কখনোই প্লেট টেকটোনিকের মতো নৈর্ব্যক্তিক কোনো কিছুর কারণে হবার মত কিছু নয়। এছাড়া লক্ষণীয় যে, কি পরিমাণ অহংকারী, অন্ধ আত্মকেন্দ্রিকতা থাকলে

বিশ্বাস করা সম্ভব যে, পৃথিবী কাপানো ঘটনাগুলো, যে মাত্রায় সাধারণত একজন ঈশ্বর (বা একটি টেকটোনিক প্লেট) কাজ করতে পারে, তার সাথে অবশ্যই আমরা মানুষদের কোনো সংযোগ থাকতে পারে। সৃষ্টি আর অনন্তকাল নিয়ে ব্যস্ত একজন স্বর্গীয় সত্তা কেনই বা মানুষের অপকর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবেন? আমরা মানুষরাই বা কেন আমাদের নিজেদের এই প্রবোধ দেই, নিজেদের তুচ্ছ ছোটোখাটো 'পাপগুলোকে' এমনকি একেবারে মহাজাগতিক পর্যায়ে বিশাল আর মহাগুরুত্বপূর্ণ করে তুলি?

টেলিভিশনের জন্য আমি যখন যুক্তরাষ্টের সুপরিচিত গর্ভপাত বিরোধী আন্দোলনের নেতা রেভারেন্ড মাইকেল ব্রের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ইভানজেলিকাল খ্রিস্টানরা একজন মানুষের ব্যক্তিগত যৌন পছন্দ, যেমন সমকামিতা নিয়ে কেন সারাক্ষণই এত মোহাবিষ্ট হয়ে থাকে, যা কিনা অন্য কারো জীবনে কোনো সমস্যা করছে না। তার উত্তর ছিল খানিকটা আত্মপক্ষ সমর্থন। ঈশ্বর যখন কোনো কোনো শহরের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে আঘাত হানেন, কারণ যেখানে পাপীদের বসবাস, তার পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া কিংবা অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির শিকার হয় নিষ্পাপ অবুঝ নাগরিকরাও । ২০০৫ এ চমৎকার শহর নিউ অরলিয়ন্সের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া হারিকেন কাটরিনা পরবর্তী ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে আক্রান্ত হয়েছিল। রেভারেন্ড প্যাট রবার্ট, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে সুপরিচিত টেলিভ্যানজেলিষ্ট (যারা টেলিভিশনের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও তহবিল সংগ্রহ করে থাকেন) এবং একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এই হারিকেনের জন্য ঘটনাচক্রে নিউ অরলিয়েন্স শহরে বসবাসকারী একজন লেসবিয়ান কমেডিয়ানকে দায়ী করে মন্তব্য করেছিলেন, আপনি ভাবতেই পারেন, মহাক্ষমতাধর ঈশ্বর পাপীদের শায়েস্তা করতে খানিকটা সুনির্দিষ্ট নিশানা মাফিক কোনো পথ কি বেছে নিতে পারতেন না, যেমন, নির্বিচারে পুরো শহরকে ধ্বংস করার বদলে, তিনি হয়তো সময় মত হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ যাওয়ার মত কোনো ঘটনা হয়তো বেছে নিতে পারতেন। আর ধ্বংসের কারণ কিনা ঘটনাচক্রে সেই শহরে একজন সমকামী কমেডিয়ানের বাসস্থান (১২)।

নভেম্বর ২০০৫, পেনসিলভেনিয়ার ডোভার শহরের নাগরিকরা পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় স্কুল বোর্ডকে ভোট দিয়ে বাতিল করে দিয়েছিল, যারা ছিল ধর্মীয় মৌলবাদীদের পুরো একটি গ্রুপ - তাদের কর্মকাণ্ড শহরটিকে কুখ্যাতি এনে দিয়েছিল, হাস্যকর একটি ঘটনা হিসাবে এটি চিহ্নিত করা না হয় বাদই দিলাম। স্কুলে জোর করে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন পড়ানোর প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। পরে যখন প্যাট রবার্টসন জানতে পারেন যে মৌলবাদীরা গণতান্ত্রিক উপায়ে ভোটে পরাজিত হয়েছে ব্যালট বক্সে, তিনি ডোভারের প্রতি কঠিন একটি হুশিয়ারী বার্তা শোনান:

আমি ডোভারের সকল সুনাগরিকদের বলছি আপনাদের এলাকায় যদি কোনো মহাদুর্যোগ হয়, ঈশ্বরের কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবেন না, আপনারা তাকে আপনাদের শহর থেকে বহিষ্কার করেছেন এইমাত্র এবং ভাববেন না যে কেন যখন বিপদ শুরু হলে, কেন তিনি আপনাদের সাহায্য করেননি। আমি বলছি না সেই রকম কিছু হবে, কিন্তু যদি হয়, মনে রাখবেন, আপনারা ভোট দিয়ে তাকে শহর ছাড়া করেছেন মাত্র; সেক্ষেত্রে তাহলে তার সাহায্যের জন্য কোনো প্রার্থনা করবেন না, কারণ তিনি সেখানে নাও থাকতে পারেন (১৩)।

প্যাট রবার্টসন এই মন্তব্য নির্মল হাস্যরসের বিষয়বস্তু হতে পারতো, যদি না তিনি আজ যুক্তরাষ্ট্রে যারা ক্ষমতা আর প্রভাবের কেন্দ্রে অবস্থান করেন তাদের চেয়ে গুণতগভাবে খানিকটা ভিন্ন কিছু হতেন।

সডোম আর গমোরাহ শহর দুটি ধ্বংসের সময়, সেই মহাধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ঈশ্বর নোয়ার সমতূল্য একজনকে তার পরিবারসহ বেছে নিয়েছিলেন, কারণ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি, তিনি আত্মীয়তার সূত্রে আব্রাহামের ভাইপো লট (১৪)। দুইজন পুরুষ ফেরেশতাকে সডোমে লটের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল তাকে আগেই সতর্ক করে দিতে, সে যেন দ্রুত তার পরিবারসহ শহর ছেড়ে চলে চায়, কারণ শহরের উপর ঈশ্বরের শাস্তি স্বরূপ আগুনের পাথর বা সেই বাইবেল কুখ্যাত ব্রিমস্টোন (সালফার বা গন্ধক) নেমে আসছে। লট আতিথেয়তার সাথে ফেরেশতাদের তার বাসায় স্বাগত জানান। খবর পেয়ে সডোমের অন্য পুরুষরা সেখানে একসাথে জমায়েত হয়, এবং তারা লটের কাছে দাবী করে, ফেরেশতা দুজনকে যেন তাদের হাতে তুলে দেয়া হয়, যেন তারা তাদের ধর্ষণ করতে পারেন (....আর কি?): “আজ রাতে আপনার বাসায় যে দুই ব্যক্তি এসেছে তারা কোথায়? আমাদের সামনে তাদের নিয়ে আসুন, যেন আমরা তাদের ‘জানতে’ পারি” (জেনেসিস ১৯:৫); ‘হ্যা, এই ‘জানা’ শব্দটি বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকৃত সব সংস্করণে একটি প্রচলিত সুভাষণ আর যা এই প্রসঙ্গে খুবই হাস্যকর (এই জানা শব্দটি বাইবেলে কারো সাথে যৌন সংসর্গ করা বোঝায়)। শহরবাসীদের এমন দাবীকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে লটের সাহসিকতা দেখে প্রথমে মনে হতে পারে, হয়তো ঈশ্বর ঠিকই লটের চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু বিষয় ধরতে পেরেছেন, যখন তিনি তাকে আলাদা করে বাছাই করেছিলেন সডোমের একমাত্র ভালো মানুষ হিসাবে, কিন্তু লটের এই ভালোত্ব কলঙ্কময় হয়ে যায় শহরবাসীদের সেই আবেদন অস্বীকার করার শর্তাবলী যখন তিনি উচ্চারণ করেছিলেন: “আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করছি, আমার শহরবাসী ভাইগন, মন্দ কোনো আচরণ করা থেকে বিরত থাকুন; এখন দেখুন, আমার দুটি কন্যা আছে যারা কোনো পুরুষকে কখনো ‘জানেনি’; আপনাদের কাছ মিনতি করছি, আপনাদের সামনে তাদের উপস্থিত করার জন্য আমাকে অনুমতি দিন,আপনারা যা কিছু করতে চান তাদের

সাথে করুন, এই অতিথি দুই জনের সাথে কিছু করবেন না, কারণ তারা আমার ছাদের ছায়ার নীচে আশ্রয় নিয়েছে (জেনেসিস ১৯;৭-৮)।

এই আজব গল্পের যে অর্থই থাকুক না কেন, এটি নিঃসন্দেহে তীব্রভাবে ধর্মীয় সংস্কৃতিগুলোয় নারীদের প্রতি যে-ধরনের সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেই বিষয়টি সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের একটি ধারণা দেয়। এই কাহিনী আরো কিছুটা অগ্রসর হলে দেখা যায়, নিজের মেয়েদের কুমারীত্বকে বিলিয়ে দেবার লক্ষ্যে লটের এই প্রস্তাবের অবশ্য কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না, কারণ ফেরেশতারা সফল হয়েছিল উত্তেজিত আর আক্রমণ করতে উদ্যত জনতাকে অতিপ্রাকৃত উপায়ে ঠেকিয়ে দিতে। শহরবাসী সেই পুরুষদের সব অন্ধ করে দিয়েছিল ফেরেশতারা, তারপর তারা লটকে অনুরোধ করে সে যেন দ্রুত তার পরিবার ও তার পোষা প্রাণীদের নিয়ে এই মুহূর্তে শহর ছেড়ে চলে যান, কারণ পুরো শহরটা কিছুক্ষণের মধ্যে ধ্বংস হতে যাচ্ছে। লটের পুরো পরিবার পালাতে সক্ষম হয়, শুধুমাত্র লটের হতভাগ্য স্ত্রী ছাড়া, যাকে ঈশ্বর লবনের একটি স্তম্ভে রূপান্তরিত করেছিলেন কারণ তিনি একটি অপরাধ করেছিলেন - চিন্তা করলে দেখা যায় - যা তুলনামূলকভাবে খুবই সামান্য - শুধু পিছনের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি সডোমের ধ্বংসলীলা বা ঈশ্বরের ফায়ার ওয়ার্ক দেখেছিলেন।

লটের দুই কন্যা সংক্ষিপ্তভাবে আবার গল্পে ফিরে আসে। তাদের মা লবনের স্তম্ভে পরিণত হবার পর, তারা তাদের পিতার সাথে একটি গুহায় বসবাস করতো, পুরষসঙ্গ বঞ্চিত দুই বোন সিদ্ধান্ত নেয় তারা তাদের পিতাকে নেশাগ্রস্ত করে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হবে, লট মাতাল অবস্থায় লক্ষই করতে পারেননি যে তার বড় মেয়ে তার শয্যায় এসেছে বা কখন সে তার শয্যা ছেড়ে গেছে - কিন্তু স্পষ্টতই তিনি যথেষ্ট মাতাল ছিলেন না তার কন্যাকে অন্তঃস্বত্ত্বা করার জন্য, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরের রাতে ছিল ছোটো বোনের পালা, আবারো লট নাকি এমনই মাতাল যে লক্ষ করতে পারেননি কি হয়েছে এবং তাকেও অন্তঃসত্ত্বা করে ফেললেন (জেনেসিস ১৯:৩১-৬)। ঈশ্বরের নৈতিকতার শিক্ষা দেবার জন্য এই অদ্ভুত সমস্যাপূর্ণ পরিবার যদি সডোমের সেরা পরিবার হয়, ঈশ্বর এবং তার বিচারের অস্ত্র ব্রিমস্টোন আর আগুনের পাথরের বৃষ্টি দিয়ে শহর পোড়ানোর শাস্তির ব্যপারে যে কেউই নির্দিষ্টভাবে খানিকটা সমবেদনা অনুভব করতে পারবেন।

লট এবং সডোমবাসীদের কাহিনী বিস্ময়করভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টের ১৯ তম অধ্যায়, বুক অব জাজেসে (১৫) খানিকটা ভিন্নভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটে, যেখানে একজন নামহীন লেভাইট (বা যাজক) তার উপপত্নীকে নিয়ে গিবিয়াহতে ভ্রমণ করছিলেন, যাত্রার সময় বিরতি হিসাবে তারা একজন সদয় অতিথিবৎসল বৃদ্ধের বাড়িতে একটি রাত কাটান। যখন তারা রাতের খাবার খাচ্ছিলেন, শহরের পুরুষরা একসাথে জড়ো হয়ে সেই বাসার

দরজায় কড়া নাড়ে, এবং তারা বৃদ্ধ গৃহস্বামীর কাছে দাবী জানান, তার পুরুষ অতিথিকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য, ‘যেন আমরা তাকে ‘জানতে’ পারি।’ প্রায় হুবহু লটের সেই বাক্য ব্যবহার করে বৃদ্ধ গৃহকর্তা বলেন, ‘না, আমার ভাইরা, না, আপনাদের কাছে আমি প্রার্থনা করি, এতটা খারাপ আচরণ করবেন না, এই মানুষটা আমার বাসায় এসেছে দেখে এই আচরণ করবেন না, দেখুন আমার কন্যা একজন কুমারী এবং তার উপপত্নী এখানে আছে, তাদের আমি নিয়ে আসছি, তাদেরকে আপনারা আপনাদের অনুগত করে নেন ..তাদের সাথে যা খুশি করুন..যেটা করতে ভালো লাগে আপনাদের, কিন্তু এই মানুষটার সাথে কোনো খারাপ কিছু দয়া করে করবেন না (জাজেস ১৯:২৩-৪)’। আবারো নারীবিদ্বেষী নৈতিকতার স্বরূপ দেখা গেল..সুস্পষ্টভাবে। বিশেষ করে এই ‘হাম্বল ইয়ে দেম’ বাক্যটি পড়লে আমি শিউরে উঠি। ‘আমার মেয়ে আর যাজকের উপপত্নীকে নিয়ে ইচ্ছামত অপমান আর ধর্ষণ করে আপনারা আনন্দ করুন, কিন্তু আমার অতিথির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদান করুন, কারণ আর যা-ই হোক না কেন তিনি পুরুষ মানুষ। দুটো গল্পের মধ্যে সদৃশ থাকা সত্ত্বেও এখানে ঘটনার প্লট লটের কন্যাদের ভাগ্যে ঘটা ঘটনার চেয়ে লেভাইটের উপপত্নীর জন্য অপেক্ষাকৃত কম সুখকর হয়েছিল।

কাহিনীতে দেখা যায় যে, লেভাইট তার উপপত্নীকে উত্তেজিত জনতার হাতে তুলে দেয়, যাকে সারা রাত ধরে গণধর্ষণ করা হয়: ‘তারা তাকে ‘জানে’ এবং সকাল অবধি অত্যাচার করে, এবং যখন ভোরের আলো ফুটতে থাকে, তারা তাকে ছেড়ে দেয়। এরপর সেই নির্যাতিত রমণীটি খুব ভোরে সেই বৃদ্ধের ঘরের দরজার সামনে এসে শুয়ে পড়ে, যেখানে তার স্বামী অধিপতি অবস্থান করছেন। পুরোপুরি সকাল হবার আগে (জাজেস ১৯: ২৫-৬)’। সকালে ঘুম থেকে উঠে লেভাইট তার উপপত্নীকে দরজার সামনে শুয়ে থাকতে দেখেন এবং বলেন .. যা কিনা আজ যে কোনো কারো কাছে মনে হতে পারে চরমতম অসংবেদনশীলতাপূর্ণ একটি মন্তব্য, ‘ওঠো, আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে, কিন্তু তার উপপত্নী অনড়, কারণ অত্যাচারের কারণে ইতোমধ্যে তার সেখানে মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং লেভাইট একটি ধারালো ছুরি দিয়ে, তার উপপত্নীকে কেটে টুকরো টুকরো করে, তার হাড়সহ মোট ১২টি ভাগ করে খণ্ডগুলোক ইজরায়েলের বিভিন্ন প্রান্তে প্রেরণ করে’। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই পড়েছেন, জাজেস ১৯:২৯ দেখুন; খানিকটা করুণার সাথে এটিকে বাইবেলের সর্বব্যাপী উদ্ভট কিছু বিষয়ের একটি মনে করে নেই। এই গল্প সাথে এর আগেই উল্লেখিত লটের গল্পর সাথে এতই মিল যে মনে হতে পারে, ভুল করে মূল পাণ্ডুলিপির কিছু পাতা প্রাচীন কোনো স্ক্রিপটোরিয়াম বা পাণ্ডুলিপি অনুলিপন করার ঘরে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল: পবিত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তুর নানা খেয়ালীপূর্ণ উৎসের একটি উদাহরণ।

লটের চাচা আব্রাহাম (১৬) ছিলেন তিনটি প্রধান ও তথাকথিত ‘মহান’ একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রত্যেকটির মূল প্রতিষ্ঠাতা আদি পিতা। তার এই পৈতৃক অবস্থান তাকে ঈশ্বরের চেয়ে সামান্য খানিকটা নীচে অবস্থিত অনুকরণীয় একটি চরিত্র হিসাবে উপস্থাপন করেছে তার অনুসারীদের কাছে। কিন্তু আধুনিক যুগের কোনো নীতিবান মানুষ কি আসলেই তাকে অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন? তার সুদীর্ঘ জীবনের শুরুর দিকে, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে আব্রাহাম তার স্ত্রী সারাহকে নিয়ে মিসরে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এমন সুন্দরী একজন সহচরী রমণী নিশ্চয়ই মিশরীয়দের কাছে কাঙ্ক্ষিত হবে, সুতরাং তার স্বামী হিসাবে তার নিজের জীবনটাও সারাক্ষণ ঝুঁকির মধ্যে থাকতে পারে, সুতরাং তিনি তার স্ত্রীকে নিজের বোন হিসাবে পরিচয় দেন, আর সেই পরিচিতিতেই সারাহকে ফারাওদের হারেম বা নারীমহলে সুরক্ষিত জায়গা দেয়া হয় এবং আব্রাহামও ফলাফলে ফারাওদের বিশেষ অনুগ্রহে বিপুল অর্থবিত্তের মালিক হন। ঈশ্বর নিজে অবশ্য আব্রাহামের এই সুবিধাবাদী বন্দোবস্ত পছন্দ করেননি, সুতরাং তিনি ফারাও এর প্রাসাদে মহামারি বা প্লেগ প্রেরণ করেছিলেন (মজার বিষয় হচ্ছে আব্রাহামের উপর নয় কেন..?), যথাযোগ্যকারণে ক্রুদ্ধ ফারাও আব্রাহামের কাছ জানতে চান কেন সে তাকে জানায়নি সারাহ তার স্ত্রী, এরপর তিনি সারাহকে আব্রাহামের কাছে ফিরিয়ে দেন এবং দুজনকে দেশ থেকে বের করে দেন (জেনেসিস ১২: ১৮-১৯)। অদ্ভুতভাবে, এই দম্পতি আবারো সেই একই চালাকীর আশ্রয় নেবার চেষ্টা করে, এবার জেরার (১৭) রাজা আবিমেলেখের কাছে, আব্রাহামের প্ররোচনায় তিনিও সারাহকে বিয়ে করার চেষ্টা করেন, কারণ সারাহ তার বোন, স্ত্রী নয়, এমন একটি ধারণাই আব্রাহাম তাকেও দিয়েছিল (জেনেসিস ২০:২-৫)। পুরো ব্যপারটা জানার পর তিনিও নিন্দা জানিয়েছেন মিসর সম্রাটের ঠিক সেই একই শব্দাবলী ব্যবহার করে; উভয় ক্ষেত্রেই এই দুই নৃপতির জন্য সমবেদনা অনুভব করাটাই স্বাভাবিক। এই সদৃশ্যতা কি বাইবেলের তথ্যগত বিচ্যুতির আরেকটি ইঙ্গিত?

আব্রাহামের গল্পের এই সব অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো খুব মামুলী অপরাধ মনে হবে যদি তার পুত্র আইজাককে (১৮) বিসর্জন দেবার সেই কুখ্যাত কাহিনীর সাথে তুলনা করা হয় (মসুলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আব্রাহামের অন্য পুত্র ইসমায়েলকে নিয়ে একই ঘটনার বিবরণ আছে)। ঈশ্বর আব্রাহামকে চূড়ান্ত আত্মত্যাগের একটি পরীক্ষা হিসাবে তার বহুকাঙ্ক্ষিত পুত্রকে তার উদ্দেশ্যে বিসর্জন করার নির্দেশ দেন। আব্রাহাম ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক বিসর্জনের বেদী তৈরি করেন, তার উপর জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে আইজাককে শুইয়ে দেন। বিসর্জন দেবার জন্য প্রস্তুত ছুরি হাতে যখন তিনি আইজাককে জবাই করতে যাচ্ছেন ঠিক তখনই নাটকীয়ভাবে একজন ফেরেশতা সেখানে আবির্ভুত হন, এবং জানান যে শেষ মুহূর্তে ঈশ্বরের পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন হয়েছে, সুতরাং আপাতত এই বিসর্জন পর্ব স্থগিত। ঈশ্বর কি তাহলে আসলেই ঠাট্টা করছিলেন, আব্রাহামকে প্ররোচণা দিচ্ছিলেন তার বিশ্বাস কতটা মজবুত তা পরীক্ষা করার জন্য?

একজন আধুনিক নৈতিকতাবাদী কেউ কিন্তু সেই বিষয়টি নিয়ে না ভেবে পারেন না: কোনোদিনও কি এই শিশুটি এই ধরনের মনোস্তাত্ত্বিক আঘাত থেকে নিজেকে নিরাময় করতে পারবে? আধুনিক নৈতিকতার মানদণ্ড অনুযায়ী, এই ন্যাক্কারজনক গল্পে একই সাথে শিশু নির্যাতন এবং দুটি অসম শক্তির সম্পর্কের একপক্ষের বিশেষ অন্যায় জোর খাটানোর সুস্পষ্ট উদাহরণ আছে এবং এখানে প্রথমবারের মত লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই তথাকথিত 'নুরেমবার্গ ডিফেন্স' (১৯) ব্যবহারের উদাহরণ...'আমি শুধু উপরের নির্দেশ অনুসরণ করেছি মাত্র'; তারপরও এই কিংবদন্তীর কাহিনীটি তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রত্যেকটির প্রতিষ্ঠা সংশ্লিষ্ট পুরাণের ভিত্তি রচনা করেছে।

আবারো আধুনিক ধর্মতত্ত্ববিদরা প্রতিবাদ করবেন এই বলে যে, আব্রাহামের আইজাককে প্রায় বিসর্জন দেবার কাহিনীটি আক্ষরিকভাবে নেয়া উচিত হবে না। এবং আবারো এর উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দুইটি, প্রথমত, এমনকি আজ অবধি বহু মানুষ পুরো ধর্মগ্রন্থ আক্ষরিকভাবে সত্য বলে মনে করেন, এবং আমাদের বাকি সকলে উপর তাদের যথেষ্ট পরিমাণ রাজনৈতিক শক্তি আছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইসলামী বিশ্বে । দ্বিতীয়ত, যদি আক্ষরিক সত্য হিসাবে গ্রহন না করি, তাহলে এই গল্পগুলো আমাদের কিভাবে নেয়া উচিত, রূপকার্থে? তাহলে কিসের রূপকার্থে? নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য কিছু নয়। নৈতিক শিক্ষা হিসাবে? এই ধরনের ভয়ঙ্কর গল্প থেকে কোন ধরনের নীতিবোধের শিক্ষা আমরা গ্রহন করতে পারি? স্মরণ করুন, আমি এখন শুধু প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি যে, বাস্তবিকভাবেই আমাদের নৈতিকতাগুলো ধর্মগ্রন্থ থেকে আসে না। অথবা, আমরা যদি সেখান থেকে নৈতিকতা গ্রহন করি, আমরা এই গ্রন্থগুলোর মধ্য থেকে ভালো অংশগুলো নির্বাচন করি, আর খারাপ ও নোংরা অংশগুলো বর্জন করি। তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের স্বাধীন কোনো মানদণ্ড আছে, যা ব্যবহার করে আমরা নৈতিক অংশগুলো নির্ধারণ করতে পারি: আর সেই মানদণ্ডটি যেখান থেকেই আসুক না কেন, ধর্মগ্রন্থ থেকে সেটি আসতে পারে না, এবং আমরা ধার্মিক বা নিধার্মিক যা-ই হই না কেন, সেটি সম্ভবত সবার জন্যই উন্মুক্ত।

ধর্মীয় সমর্থনকারীরা এমনকি এই নিন্দনীয় কাহিনীতে ঈশ্বর চরিত্রটির খানিকটা শ্লীলতা রক্ষা করার চেষ্টা করে থাকেন, তারা বলেন, শেষ মুহূর্তে আইজাকের জীবন বাঁচিয়ে ঈশ্বর কি ভালো কাজ করেননি? এই ধরনের বিশেষ অশ্লীল অজুহাতের দ্বারা আমার কোনো পাঠক প্ররোচিত হতে পারেন এমন অসম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমি তাদের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে আরেকটি মানব বিসর্জনের কাহিনী সম্বন্ধে অবহিত করতে চাই, যার পরিণতি আদৌ সুখকর ছিল না। জাজেসের অধ্যায় ১১, সামরিক নেতা জেফতাহ ঈশ্বরের সাথে একটি চুক্তি করেন, ঈশ্বর যদি অ্যামোনাইটদের (২০) বিরুদ্ধে তাকে জয়যুক্ত করেন, তাহলে জেফতাহ, অবশ্যই চূড়ান্ত একটি বিসর্জন দেবেন তার উদ্দেশ্যে....'আমি যখন ফিরবো, আমার ঘরের দরজা দিয়ে প্রথম যে বেরিয়ে

আসবে আমার সাথে দেখা করতে..'; যথারীতি জেফতাহ অ্যামোনাইটদের পরাজিত করেছিলেন ('অসংখ্য হত্যার পর', বুক অব জাজের অন্য ঘটনার সাথে সমতূল্য হারে) এবং বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরেন, এবং আদৌ বিস্ময়কর না, তার কন্যা, একমাত্র সন্তান প্রথম বাড়ির বাইরে এসে তাকে প্রথম স্বাগত জানায় (বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে এবং নেঁচে), এবং হায় দুর্ভাগ্যজনকভাবে .. সে ছিল প্রথম দেখা করতে আসা জীবিত প্রাণী, তার নিজের প্রিয় সন্তান - বোধগাম্য কারণে তীব্র দুঃখ আর হতাশায় জেফতাহ তার কাপড় ছিড়েছেন, কিন্তু তার কিছুই করার ছিল না। ঈশ্বর নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহে ছিলেন তাকে প্রতিজ্ঞা করা বিসর্জনের এই উপঢৌকনের, এবং এই পরিস্থিতিতে তার কন্যা কোনো প্রতিবাদ না করেই পিতার প্রতিজ্ঞা পূরণে আত্মবিসর্জনে রাজী হয়েছিল। তার একটাই দাবী ছিল তাকে যেন দুই মাসের জন্য পাহাড়ে যেতে দেয়া হয়, যেন সে তার কুমারীত্বের জন্য শোক করতে পারে, দুই মাস পরে তিনি যথারীতি ফিরে আসেন, এবং তার বাবা ঈশ্বরকে দেয়া তার প্রতিজ্ঞামত আগুনে পুড়িয়ে তাকে বিসর্জন দেন। কোনো হস্তক্ষেপ করার জন্য এখানে কিন্তু ঈশ্বর আদৌ সঙ্গত মনে করেননি ।

যখনই তার বাছাইকৃত জনগোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো ঈশ্বর বা দেবদেবীদের নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছে, তখন ঈশ্বরের অতি তীব্রতম ক্রোধ যৌন ঈর্ষার সবচেয়ে কুৎসিততম রূপ স্মরণ করিয়ে দেয়। এবং আবারো আধুনিক কোনো নৈতিকতাবাদীর কাছে সেটা কোনোভাবেই অনুকরণযোগ্য আচরণ হতে পারে না। যৌন অবিশ্বস্ততার প্রলোভন খুব সহজে বোঝা সম্ভব। এমনকি যারা কখনো এই ধরনের প্রলোভনে শিকার হন না, তাদের পক্ষেও এটা বোঝা সম্ভব, এবং নানা কাহিনী এবং নাটকেরও এটি মূল বিষয়, শেক্সপিয়ার (২১) থেকে শুরু করে শয়নকক্ষের প্রহসনেও। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ভিনদেশী কোনো দেবদেবীর নিবেদনে বেশ্যাবৃত্তি করার অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন কখনো কখনো আমাদের আধুনিক মনে কোনো সহমর্মিতার জায়গা করে নেয় না। আমার অবুঝ চোখে 'আমাকে ছাড়া তোমরা আর কোনো ঈশ্বরের উপাসনা করবে না', মনে হতে পারে পালন করার জন্য খুব সহজ একটা নির্দেশ: ছেলে খেলা মাত্র, যে- কেউ তা ভাবতে পারেন, যদি এটি তুলনা করা হয় অন্য কোনো আদেশগুলোর সাথে, যেমন, তোমরা কেউই প্রতিবেশীর স্ত্রীকে বা তার গাধা বা গবাদী পশুকে কামনা করবে না । তারপরও ওল্ড টেস্টামেন্টে সেই একই নিশ্চয়তার সাথে নিয়মিতভাবে ঘটতে দেখি আমরা যেমনটা শয়নকক্ষের প্রহসনের ক্ষেত্রে হয়। ঈশ্বর শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্য দিকে তাকালেই হলো এবং ইজরায়েলের সন্তানেরা সব ভুলে বা'ল কিংবা অন্য কোনো মূর্তি পূজায় লিপ্ত হয় (২২) বা একটি ভয়াবহ ঘটনায় যেমন সোনার তৈরি বাছুর।

মোজেস (২৩), যিনি আব্রাহামের চেয়ে আরো বেশি গ্রহনযোগ্য রোল মডেল তিনটি একেশ্বরবাদী ধর্মের অনুসারীদের কাছে। আব্রাহাম হতে পারেন আদি পিতা, তবে যদি কাউকে জুডাইজম বা ইহুদীবাদ ও এর থেকে উদ্ভুত ধর্মগুলোর মূল মতবাদের প্রবক্তা

হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই মোজেস। সোনালী বাছুরের সেই ঘটনাটির সময়, মোজেস বেশ নিরাপদ দূরত্বে মাউন্ট সাইনাই পাহাড়ের উপরে অবস্থান করছিলেন, ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ এবং তার আদেশ সম্বলিত খোদাই করা পাথরের ট্যাবলেটগুলো সংগ্রহ করছিলেন। পাহাড়ের নীচে (যাদের সেই পাহাড় স্পর্শ করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল, যার শাস্তি ছিল যন্ত্রণাময় মৃত্যু) তার অনুসারীরা কোনো সময় নষ্ট করেননি:

> যখন তারা দেখেছিল যে, পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসতে মোজেসের বিলম্ব হচ্ছে, তারা সবাই মোজেসের ভাই অ্যারনের কাছে এসে তাকে বলেন, তাড়াতাড়ি, আমাদের কোনো দেব-দেবীর মূর্তি বানিয়ে দাও, যা আমরা অনুসরণ করতে পারবো, আর এই মোজেস, যে মানুষটা আমাদের মিসর থেকে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে, আমরা জানিনা তার কি পরিণতি হয়েছে (এক্সোডাস ৩২:১)।

অ্যারন সবার কাছ থেকে সোনা সংগ্রহ করে, তা গলিয়ে একটি সোনার বাছুর বানিয়ে দেয়, যার জন্য তিনি একটি উপাসনার বেদী তৈরি করেন, যেখানে সবাই তাদের পূজা এবং বিসর্জনের উপঢৌকন রাখতে শুরু করে।

বেশ, তাদের ভালো করেই জানার কথা ছিল, ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে তার পেছনে এই ধরনের কাজ করা তাদের উচিত হচ্ছে না, তিনি হয়তো পাহাড়ের উপর থাকতে পারেন চোখের আড়ালে, কিন্তু সর্বোপরি তিনি তো সর্বজ্ঞ আর অন্তর্যামী এবং দেরী করলেন না তিনি। তার দূত মোজেসকে দ্রুত সেখানে প্রেরণ করেন তার আজ্ঞা পালন করতে, মোজেস দ্রুত বেগে পর্বত থেকে নীচে নেমে আসেন পাথরের ট্যাবলেটগুলো নিয়ে, যার উপর ঈশ্বর তার দশটি নির্দেশ বা টেন কম্যান্ডমেন্টস খোদাই করে দিয়েছিলেন। পাহাড়ের নীচে পৌঁছে যখন মোজেস দেখলেন, তার অনুসারীরা সোনালী বাছুর পূজা করছে, তিনি এত রেগে গেলেন যে সব ট্যাবলেট মাটিতে ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন (ঈশ্বর অবশ্য তাকে আরেক সেট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন পরে), এরপর সোনালী বাছুরটিকে পুড়িয়ে, সেটিকে ভালো করে পিষে পাউডারের মত করে পানিতে মিশিয়ে তিনি সবাইকে গিলে খেতে বাধ্য করেছিলেন, তারপর তিনি একটি যাজক গোত্র লেভাইটদের বললেন, তলোয়ার হাতে নিয়ে যে কয়জনকে হত্যা করা যায়, তাদের হত্যা করতে, যার ফলাফলে প্রায় ৩০০০ জনের মৃত্যু হয়। যা, অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন অন্য দেবতাদের প্রতি ঈশ্বরের উগ্র ঈর্ষাকে শান্ত করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ একটি সংখ্যা, কিন্তু না, তখনো ঈশ্বরের ক্রোধ শেষ হয়নি; এই ভয়ঙ্কর অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে তার শেষ আঘাত দেখা যায়, যে কয়জন বেঁচে ছিলেন তাদের উপর কঠিন অসুখ ছড়িয়ে দেয়া কারণ ‘তারা বাছুরকে দেবতা বানিয়েছে যা অ্যারন তাদের বানিয়ে দিয়েছিল’।

বুক অব নাম্বারস (২৪) বলছে কিভাবে ঈশ্বর মোজেসকে উস্কে দেন মিডিয়ানাইটদের (২৫) আক্রমণ করতে; তার সৈন্যরা অনায়াসেই মিডিয়ানাইট সব পুরুষদের হত্যা করে এবং তাদের সকল শহর পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু তারা নারী ও শিশুদের তখনো হত্যা করেনি, তার সৈন্যদের এই দয়াশীল আচরণ মোজেসকে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সব পুরুষ শিশু, এবং কুমারী নয় এমন সব নারীকে হত্যা করতে হবে, কিন্তু সব নারী ও মেয়ে শিশুরা, যারা এখন কোনো পুরুষের শয্যাসঙ্গী হয়নি তাদের বাঁচিয়ে রাখো তোমাদের ভোগের জন্য (নাম্বারস ৩১:১৮)। নাহ, আধুনিক কোনো নৈতিকতাবাদীর কাছে মোজেস আদর্শ অনুকরণীয় কোনো চরিত্র হতে পারেন না।

আধুনিক ধর্মীয় লেখকরা যা আপাতত মিডিয়ানাইটদের গণহত্যার ব্যপারে কোনো ধরনের রূপক অর্থ যুক্ত করেছেন, সেই রূপক অর্থটি সংযুক্ত হয়েছে ভিন্ন দিক বরাবর। দুর্ভাগা মিডিয়ানাইটরা, বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী যতটুকু বলা যায়, নিজের দেশেই গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। তারপরও তাদের নাম খ্রিস্টীয় রূপকথায় টিকে আছে একটি জনপ্রিয় হিম বা স্তব সঙ্গীতে (যা আমি এখনো গাইতে পারবো আমার স্মৃতি থেকে প্রায় ৫০ বছর পরে, দুটি ভিন্ন সুরে যা প্রত্যেকে নীচের স্কেলে বেশ গম্ভীর) (২৬);

> Christian, dost thou see them
> On the holy ground?
> How the troops of Midian
> Prowl and prowl around?
> Christian, up and smite them,
> Counting gain but loss;
> Smite them by the merit
> Of the holy cross.

হায়, হতভাগা অকারণে মিথ্যাভাবে কলঙ্ককৃত, হত্যাকৃত মিডিয়ানাইটদের শুধুমাত্র স্মরণ করা হবে ভিক্টোরিয়া যুগের একটি স্তবসঙ্গীতে কাব্যিক রূপক হিসাবে।

প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা বা'ল (২৭) সম্ভবত এই ধরনের 'বিকল্প' ঈশ্বর-বিরোধী উপাসনার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন। বুক অব নাম্বারসের ২৫ অধ্যায় বলছে, মোয়াবাইট (২৯) রমণীরা বহু ইসরায়েলাইটদের (২৮) তাদের বা'ল দেবতার প্রতি বিসর্জন দিতে প্রলুব্ধ করেছিলেন। এই ঘটনায় ঈশ্বর তার স্বভাবসুলভ ক্রোধ প্রদর্শন করেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি মোজেসকে নির্দেশ দেন, এই সব ব্যক্তিদের

মস্তক কর্তন করে তাদের ঈশ্বরের সন্মুখে সুর্যের মুখোমুখি ঝুলিয়ে রাখতে, যেন ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ক্রোধ ইজরায়েলকে স্পর্শ না করে। আবারো বিস্মিত না হবার কোনো কারণ নেই, প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো দেবতাকে পূজা করা সংক্রান্ত পাপ বিষয়ে ঈশ্বর কেন এই ধরনের অস্বাভাবিক কঠোর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। মূল্যবোধ আর ন্যা বিচার সংক্রান্ত আমাদের আধুনিক বোধে যা মনে হতে তুচ্ছ একটি পাপ মনে হতে পারে, যদি নিজের কন্যাদের গণধর্ষণের জন্য নিবেদন করার সাথে তুলনা করা হয়। ধর্মগ্রন্থ আর আধুনিক (যদি কেউ নিজেকে সভ্য বলে দাবী করেন) নৈতিকতার মধ্যকার বিশাল পার্থক্যগুলোর এটি আরো একটি উদাহরণ । অবশ্যই মিম তত্ত্বের আলোকে মিমপুলে টিকে থাকতে ঐশ্বরিক সত্তার কি প্রকৃতির হতে হবে, সেটি যথেষ্ট সহজে বোঝা সম্ভব।

বিকল্প দেবতাদের প্রতি ঈশ্বরের উন্মত্ত তীব্র প্রতিশোধপরায়ন হিংসার ট্র্যাজিক প্রহসনের পৌনঃপুনিভাবে ওল্ড টেস্টামেন্টে আবির্ভূত হয়েছ। টেন কম্যান্ডমেন্ট বা ঈশ্বরের দশ নির্দেশিকার প্রথম নির্দেশটির প্রেরণা (যা পাথরের উপর খোদাই করা ছিল, এবং মোজেস যা ভেঙ্গে ফেলেছিলেন, এক্সোডাস ২০, ডিউটেরোনমি ৫), এবং এটি আরো বেশি স্পষ্ট অন্য নির্দেশগুলোতে (আপাতদৃষ্টে যদিও ভিন্ন), প্রতিস্থাপিত যে পাথরে নির্দেশগুলো যা ঈশ্বর মোজেসকে দিয়েছিলেন ভেঙ্গে যাওয়া পাথরের ট্যাবলেটগুলোর বদলে (এক্সোডাস ৩৪); তাদের জন্মভুমি থেকে হতভাগা আমোরাইটস (৩০), কানানাইট (৩১), হিটাইট (৩২), পেরিজাইট (৩৩), হিভাইট (৩৪)এবং জেবুসাইটদের (৩৫) উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা করার পর ঈশ্বর মূল বিষয়টাতে আসেন, যা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ: প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতারা...

> তোমরা তাদের পূজার বেদী ধ্বংস করবে, তাদের উপাসিত দেবতাদের সব মুর্তি আর প্রতিকৃতি ভাঙ্গবে, তাদের বপন করা বাগান উৎপাটন করবে। কারণ তোমরা আর কোনো ঈশ্বরের উপাসনা করবে না: কারণ মহান ঈশ্বর, যার নাম হচ্ছে ঈর্ষা, তিনি ঈর্ষান্বিত একজন ঈশ্বর। যদি তোমরা স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে চুক্তিতে আসো, এবং তারা তাদের দেবতাদের বেশ্যাবৃত্তি করে এবং অন্য দেবতাদের জন্য উৎসর্গ করে এবং তোমাদের আহবান করে, তোমরা তাদের বিসর্জন ভক্ষণ করো এবং তোমরা তাদের কন্যাদের তোমার পুত্রদের সাথে বিবাহ দাও, এবং তাদের কন্যারা তাদের দেবতার বেশ্যাবৃত্তি অব্যাহত রাখে এবং তোমাদের পুত্রদেরও সেই দেবতারই বেশ্যাবৃত্তি করাবে, তোমরা তোমাদের জন্য কোনো গলিত ধাতুর দেবতা সৃষ্টি করবে না (এক্সোডাস ৩৪: ১৪-১৭)।

আমি জানি, হ্যাঁ, অবশ্যই সময় বদলেছে, বর্তমানে কোনো ধর্মীয় নেতা (তালিবান বা তাদের সমতূল্য যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টানরা ছাড়া) মোজেসের মত চিন্তা করেন না। আর

সেটাই আমারও মূল বক্তব্য, আমি যেটা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছি, আধুনিক নৈতিকতা যেখান থেকেই আসুক না কেন, বাইবেল থেকে সেটা আসেনি। ধর্মীয় তোষণবাদীরা ‘ধর্ম ভালো আর মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে তাদের অন্তর্গত একটি ধারণা দিয়েছে, এবং যে বিশেষ সুবিধাজনক উৎসের ওপর নিরীশ্বরবাদীদের কোনো দাবী নেই’ বলে নিস্তার পেতে পারেন না। এমনকি যখন তারা নির্দিষ্ট নির্বাচিত ধর্মগ্রন্থ আক্ষরিক না বলে রূপকার্থে ব্যাখ্যা করার দাবী করেন। কিন্তু কি মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোন অংশটি প্রতীকী আর কোনটি আক্ষরিক?

মোজেসের সময় থেকে যে জাতিগত বিশোধন শুরু হয়েছিল সেটি বুক অব জোশুয়ায় পূর্ণতা পেয়েছিল (৩৬)। এই বইটির সেই সব রক্তপিপাসু গণহত্যা এবং বর্ণবাদী জাতিগত বিদ্বেষপ্রসূত যে উৎসাহে এগুলো ঘটানো হয়েছিল সেগুলোর বিবরণ লক্ষণীয়। প্রাচীন একটি গান যার প্রশস্তি বর্ণনা করেছে, ‘জশুয়া জেরিকোর জন্য যুদ্ধ করেছিল, এবং সব দেয়াল ধ্বংস হয় .... জেরিকোর যুদ্ধে সেই জশুয়ার মত আর কেউ নেই’। মহৎ জশুয়া বিশ্রাম নেননি যতক্ষণ না পর্যন্ত ‘তলোয়ারের ধারালো প্রান্ত দিয়ে শহরে যা কিছু ছিল সব কিছুই তার সৈন্যরা পুরোপুরি ধ্বংস করেছিল, পুরুষ ও নারী, বৃদ্ধ ও শিশু, ষাঁড়, এবং ভেড়া এবং গাধা’ (জশুয়া ৬:২১)।

আবারো ধর্মতত্ত্ববিদরা প্রতিবাদ করবেন, এমন কিছু ঘটেনি, বেশ কোনো গল্পই বলে না, দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে শুধু মানুষের চিৎকার আর শিঙ্গার আওয়াজে, সুতরাং আসলেই এটা ঘটেনি কিন্তু মূল বিষয় না, বিষয়টি হলো সত্য হোক বা না হোক, বাইবেল এটিকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে নৈতিকতার উৎস হিসাবে এবং বাইবেলে বর্ণিত জশুয়ার জেরিকোর ধ্বংসের কাহিনী এবং প্রতিশ্রুত ভূমিতে আগ্রাসন ও গণহত্যা সাধারণ নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে হিটলারের পোল্যান্ড আগ্রাসন বা সাদ্দাম হোসেনের কুর্দ (৩৭) এবং মার্শ (৩৮) আরবদের গণহত্যা থেকে ভিন্ন নয়। বাইবেল বই হিসেবে আকর্ষণীয় সাহিত্য এবং কাব্যিক কাহিনীর কোনো নমুনা হতে পারে, তবে নৈতিকতার শিক্ষা নেবার জন্য কখনোই এই বইটি আপনি আপনার সন্তানদের হাত তুলে দেবেন না। ঘটনাচক্রে কিন্তু জশুয়ার জেরিকো অভিযান শিশু নৈতিকতার বিষয়ে একটি মজার পরীক্ষা হতে পারে, যে বিষয়টি এই অধ্যায়ের পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনায় আসবে।

যা-ই হোক, এই গল্পে ঈশ্বর চরিত্রটির তথাকথিত প্রতিশ্রুত ভূমি অধিকারের জন্য যে-কোনো হত্যা কিংবা গণহত্যার আবশ্যিকতা যে অনৈতিক, সেই বিষয়টি নিয়ে কি আপনি সামান্যতম সন্দেহ বা দ্বন্দ্ব পোষণ করেন? বরং এর বিপরীত, তার নির্দেশগুলো, যেমন ডিউটেরোনোমী ২০ এ তিনি নিষ্ঠুরতার সাথে সুস্পষ্টভাবে বিভাজন করেছেন, যে মানুষগুলো সেই দেশে বসবাস করছে যা তার প্রয়োজন, এবং সেই মানুষগুলো যারা

সেই দেশ থেকে বহু দূরে বসবাস করে। প্রথমে তার প্রয়োজনীয় ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের আত্মসমর্পণের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। তারা যদি অস্বীকার করে, সব পুরুষদের তাহলে হত্যা করতে হবে, এবং প্রজননের কাজে ব্যবহার করার জন্যে তাদের নারীদের বন্দী করা হবে। এই আপেক্ষিক মানবিক আচরণের বিপরীত দেখুন কি ভাগ্যে আছে সেই সব হতভাগ্য গোত্রদের যারা দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই প্রতিশ্রুত 'লেবেনসরমে' (৩৯) এত দিন ধরে বসবাস করে আসছেন: 'কিন্তু সেই সব গোত্রের মানুষদের শহরগুলো, যা তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করেছেন, যা কিছু শ্বাস নেয়, তোমরা এমন কিছুই বাঁচিয়ে রাখবে না, তোমরা অবশ্যই তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে, যেমন, হিটাইট আর অ্যামোরাইট, ক্যানানাইট এবং পেরিজাইট, হিভাইট এবং জেবুসাইট, যেমন তোমাদের প্রভু তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন'।

যে মানুষগুলো বাইবেল হাতে নিয়ে দাবী করে যে তাদের নৈতিক দৃঢ়তার অনুপ্রেরণা হচ্ছে সেই বই, তাদের কি সামান্যতম ধারণা আছে আসলে কি লেখা আছে সেখানে?' লেভিটিকাস ২০ মোতাবেক নিম্নলিখিত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হবার দাবী রাখে: পিতামাতাকে গালমন্দ করা, ব্যভিচার করা, সৎমা এবং পুত্রবধুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, সমকামিতা, কোনো নারী এবং তার কন্যাকে একই সাথে বিবাহ করা, পশুর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া (এবং এখানে আবার সেই দুর্ভাগা পশুটিকে মেরে ফেলতে হবে)। এছাড়াও সাবাথ বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কাজ করলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতে পারে: এই বিষয়টি ওল্ড টেস্টামেন্টে পৌনঃপুনিকভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাম্বারস ১৫ তে, ইজরায়েলের শিশুরা যখন জঙ্গলের মধ্যে একটি মানুষকে দেখতে পায় কাঠ কুড়াচ্ছে সেই কাজ করার জন্য নিষিদ্ধ দিনে, তারা তাকে আটক করে, তারপর ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে তার শাস্তি হিসাবে কি করা যেতে। স্পষ্টতই ঈশ্বর সেদিন কোনো কাজ হালকাভাবে করার মেজাজে ছিলেন না, এবং প্রভু মোজেসকে বললেন, নিশ্চয়ই মানুষটিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যেতে পারে।উপস্থিত সবাই তাকে পাথর ছুড়ে আঘাত করবে নির্বিচারে, এবং সবাই তাকে খোলা জায়গায় নিয়ে এসে পাথরের ছুড়ে মারতে লাগলো এবং সে মারা যায়; এই নিরীহ কাঠ কুড়ানো মানুষটার কি কোনো স্ত্রী বা সন্তান ছিল, যারা তার জন্য শোক করেছিল? সে কি ভয়ে কুঁকড়ে উঠেছিল যখন প্রথম পাথরটি সে উড়ে আসতে দেখেছিল বা যন্ত্রণায় চিৎকার করেছিল যখন পাথরগুলো তার গায়ে এসে আঘাত করতে শুরু করেছিল? এই ধরনের গল্পগুলোয় আমাকে আজ যে বিষয়টি হতবাক করে সেটি কিন্তু ঘটনাটি আদৌ ঘটেছিল কিনা তা নয়, হয়তো তা ঘটেনি, আমাকে যেটা বিস্মিত করে তাহলো আজকের যুগে মানুষ তাদের জীবন ভিত্তি হিসাবে এই ধরনের ভয়ঙ্কর একজন রোল মডেল ইয়াহয়েকে বেছে নিয়েছেন - এবং আরো জঘন্য, তারা গায়ের জোরে সেই একটি অশুভ বর্বর দৈত্যটাকে (সত্য হোক বা কাহিনী হোক) আমাদের বাকি সবার উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের টেন কম্যান্ডমেন্ট ট্যাবলেট ধারকদের রাজনৈতিক শক্তির ক্ষমতার প্রাবল্য আসলেই হতাশাজনক বিশেষ করে প্রগতিশীল জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত জাতির পিতারা সুস্পষ্টভাবে ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে যে দেশটির মহান প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান লিখেছিলেন। আমরা যদি টেন কম্যাণ্ডমেন্টস গুরুত্বের সাথে নিতাম, তাহলে আমরা ভুল ঈশ্বরদের উপাসনা করা, এবং তেমন কোনো উপাসনার জন্য ছবি বা মুর্তি বানানোর বিষয়টিকে সব পাপের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পাপের পর্যায়ে বিবেচনা করতাম। আফগানিস্থানের পর্বতে ১৫০ ফুট উঁচু বামিয়ানের বুদ্ধমুর্তি (৪০) ডায়নামাইট দিয়ে ধ্বংস করা তালিবানদের জঘন্য, অকথ্য বর্বরতাকে ধিক্কার জানাবার বদলে আমাদের তাদের সত্যিকারের ন্যায় আর ধর্মপ্রেমকে প্রশংসাই করতাম। আমরা তাদের এই ধ্বংসলীলাকে আন্তরিক ধর্মীয় উদ্দীপনার চিহ্ন হিসাবে ভাবতাম। এ বিষয়টিকে উজ্জ্বলভাবে সত্যায়িত করেছে খুব অদ্ভুত সত্য একটি কাহিনী, যা ২০০5 সালের আগস্ট মাসে লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকাটি শীর্ষ সংবাদ হিসেবে প্রথম পৃষ্ঠায় ‘দ্য ডেসট্রাকশন অব মক্কা’ শিরোনামের নীচে প্রকাশ করেছিল:

> ঐতিহাসিক মক্কা, ইসলাম ধর্মের সূতিকাগার, ধর্মীয় অতিউৎসাহীদের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে এই পবিত্র শহরের সমৃদ্ধ ও বহুস্তর বিশিষ্ট ইতিহাসের প্রায় সবটাই বিনষ্ট হয়েছে... এবং নবী মোহাম্মদের সত্যিকারের জন্মস্থান এখন বুলডোজারের সামনে, সৌদী ধর্মীয় কর্তৃপক্ষদের যোগসংযোগে, যাদের ইসলামের কঠোরপন্থী ব্যাখ্যা তাদেরকে বাধ্য করেছে নিজেদের ঐতিহ্যকে মুছে ফেলতে, এই ধ্বংসলীলার প্রেরণা হচ্ছে ওয়াহাবীবাদীদের উগ্র গোঁড়া ভয় যে, এ ধরনের নানা ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো মূর্তিপূজা বা বহুঈশ্বরবাদের জন্ম দিতে পারে, যেখানে বহু এবং সম্ভাব্য সমক্ষমতা সম্পন্ন দেবতাদের পূজা করা হবে। সৌদি আরবে মূর্তিপুজার শাস্তি এখনো নীতিগতভাবে শিরোচ্ছেদ।

আমি বিশ্বাস করিনা, এমন কোনো নিরীশ্বরবাদী আছেন এই পৃথিবীতে, যিনি মক্কা বা শার্ত্রের ক্যাথিড্রাল (৪১), ইয়র্ক মিনিষ্টার (৪২) বা নতর দাম (৪৩) বা শেউই ড্রাগন, কিয়োটোর মন্দির (৪৪) এবং অবশ্যই বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করতে চাইবেন। যেমনটি যুক্তরাষ্টের নোবেল জয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী স্টিভেন ওয়াইনবার্গ বলেছিলেন, ‘মানুষের সন্মানের উপর ধর্ম হচ্ছে একটি অপমান, এটি সহ বা ছাড়া, আপনি দেখবেন ভালো মানুষরা ভালো কাজই করছে এবং খারাপ মানুষ খারাপ কাজ করছে কিন্তু কোনো ভালো মানুষকে দিয়ে যদি খারাপ কাজ করাতে চান তাহলে আপনার প্রয়োজন শুধু ধর্ম’। ব্লেইজ পাসকাল (যিনি বিখ্যাত ঈশ্বর বিশ্বাস সংক্রান্ত বাজি রেখেছিলেন) একই

রকম মন্তব্য করেছিলেন, ‘ধর্মীয় বিশ্বাসে বশবর্তী হয়ে করা ছাড়া মানুষ কখনোই চূড়ান্তভাবে কোনো খারাপ কাজ এত আনন্দের সাথে করে না’।

এখানে আমার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটা দেখানো নয় যে ধর্মগ্রন্থ থেকে আমাদের নৈতিকতা শিক্ষা নেয়া উচিত নয় (যদিও সেটা আমার মতামত)। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখানো যে, আমরা (এবং এর মধ্যে অধিকাংশ ধর্মীয় মানুষরাও আছেন), সত্যিকারভাবে আমাদের নৈতিকতা কিন্তু ধর্মগ্রন্থ থেকে পাইনা; আমরা যদি তাই করতাম, তাহলে কঠোরভাবে সাবাথ মানতাম, এবং ভাবতাম যারা সাবাথের নিয়ম ভাঙ্গছে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত। আমরা যে-কোনো নবপরিনীতাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতাম যে কিনা তার কুমারীত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হতো, যদি তার স্বামী নিজে ঘোষণা দেয় সে সন্তুষ্ট হয়নি, বা আমরা অবাধ্য সন্তানদের হত্যা করতাম.. এবং আমরা হয়তো... কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন, হয়তো আমি নিরপেক্ষ আচরণ করছি না, ভালো খ্রিস্টানরা এই পুরো অনুচ্ছেদ জুড়ে প্রতিবাদ করবেন এই বলে যে : বেশ, সবাই জানে ওল্ড টেস্টামেন্ট স্পষ্টতই বেশ অপ্রীতিকর, যীশু খ্রিস্টের নিউ টেস্টামেন্ট এর ক্ষতিকর দিকগুলো খানিকটা সামাল দিয়েছে, এটিকে গ্রহনযোগ্য করেছে, তাই না?

নিউ টেস্টামেন্ট ওল্ড টেস্টামেন্টের চেয়ে আদৌ কি ভালো কিছু?

বেশ, অস্বীকার করার উপায় নেই, নৈতিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নিষ্ঠুর মানবরূপী দৈত্যের তুলনায় যীশু অনেক বড় মাপের একটি উন্নতি। আসলেই জিসাস, যদি তার অস্তিত্ব থেকে থাকে (বা যিনি তার গ্রন্থ রচনা করেছে, তিনি যদি তা না করে থাকেন) নিশ্চয়ই ইতিহাসের অনত্যম সেরা নৈতিকতার সংস্কারক। তার ‘সারমন অব দ্য মাউন্ট’ স্পষ্টতই সময়ের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল। তার ‘এক গালে মারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দেয়া’ মতবাদ এসেছে গান্ধী এবং মার্টিন লুথার কিং-এর সেই মতবাদ গ্রহন করার দুই হাজার বছর আগে। কোনো কারণ ছাড়াই আমি কিন্তু সেই ‘অ্যাথিষ্ট ফর জিসাস’ প্রবন্ধটি লিখিনি, (এবং বেশ আনন্দ পেয়েছিলাম পরবর্তীতে এটি লেখা একটি টি শার্ট উপহার পেয়ে)(৪৫)।

কিন্তু ঠিক যীশু খ্রিস্টের নৈতিক শ্রেষ্ঠতাই আমার বক্তব্যটাকে অর্থবহ করে তোলে, তার নিজের প্রতিপালনের সময় শেখানো ধর্মগ্রন্থ থেকে জিসাস তার নৈতিকতার শিক্ষা গ্রহন করে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি প্রকাশ্যে সেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন, যেমন যখন তিনি সাবাথের নিয়ম ভাঙ্গার কঠোর সর্তকতাকে গুরুত্বহীন করে দিয়েছিলেন এই বলে যে: ‘মানুষের জন্য সাবাথ তৈরি হয়েছে, সাবাথের জন্য মানুষ নয়’ একটি জ্ঞানগম্ভীর প্রবাদ হিসাবে নানা ক্ষেত্রেই বহুসাধারণীকৃত আর বহুব্যবহৃত

হয়েছে, যেহেতু এই অধ্যায়ের মূল বিষয়টি হচ্ছে ধর্মগ্রন্থ থেকে আমরা নৈতিকতা গ্রহন করি না, এবং করা উচিতও না, আর এই মূল প্রস্তাবনার বিষয়ে কাজটি করে দেখানো জন্য যীশু একটি মডেল হিসাবে সম্মানিত হতে পারেন।

যীশুর পারিবারিক মূল্যবোধ, স্বীকার করতেই হবে যে, এমন কিছু ছিল না যে, কেউ সেটাকে গুরুত্ব দেবার ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন। মায়ের সাথে তার আচরণে ঘাটতি ছিল, প্রায় রুঢ় বলা যেতে পারে সে আচরণ, তিনি তার শিষ্যদের উৎসাহিত করেছিলেন তাদের পরিবার পরিজন পরিত্যাগ করে তাকে অনুসরণ করতে: ‘যদি কেউ আমার কাছে আসে এবং সে তার বাবা এবং মা, এবং স্ত্রী এবং সন্তান এবং ভাই এবং বোনদের, হ্যাঁ, তার নিজের জীবনকেও ঘৃণা করতে না পারে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না’। যুক্তরাষ্ট্রের কমেডিয়ান জুলিয়া সুইনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তার ‘লেটিং গো অব গড’ স্টেজ শোতে (৪৬) : ‘এমন কাজই কি ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো করে না? আপনাকে দিয়ে আপনার পরিবারকে পরিত্যাগ করায়, যেন তাদের দীক্ষা আপনাদের আরো ভিতরে দৃঢ়ভাবে ঢোকানো যায়’ (৪৭)?

তার এই খানিকটা ঘোলাটে পারিবারিক মূল্যবোধগুলো সত্ত্বেও যীশুর নৈতিকতার শিক্ষা - যদি ওল্ড টেস্টামেন্টের ভয়ঙ্কর নৈতিকতার বিপর্যস্ত অংশগুলোর সাথে তুলনা করা হয় -তাহলে প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু নিউ টেস্টামেন্টে আরো শিক্ষা আছে যা কোনো ভালো মানুষের পক্ষে সমর্থন করা উচিত হবে না। আমি এখানে বিশেষভাবে ইঙ্গিত করতে চাইছি খ্রিস্ট ধর্মের একটি মূল মতবাদের দিকে: সেটি হলো ‘অরিজিনাল সিন’ বা আদি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই শিক্ষাটাই নিউ টেস্টামেন্টের ধর্মতত্ত্বের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থান করছে। এবং এটিও আব্রাহামের আইজাককে পুড়িয়ে মারতে যাবার ঘটনাটির মত নৈতিকভাবেই অসহ্যরকম আপত্তিকর, যার সাথে ঘটনাটির মিলও আছে, এবং তা আকস্মিক না, যেমন, গেজা ভেরমেস (৪৮) তার ‘দ্য চেন্জিং ফেসেস অব জিসাস’(৪৯) বইয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আদি পাপের ধারণাটি সরাসরি এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্টের সেই অ্যাডাম এবং ইভের (আদম ও হাওয়া) পুরাণ কাহিনী থেকে। তাদের পাপ ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষ থেকে ফল খাওয়া, যথেষ্ট সামান্য একটা অপরাধ যার জন্য খানিকটা গালমন্দ এবং সতর্ক করে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ফলটির প্রতিকী রূপ (ভালো মন্দ পার্থক্য করার জ্ঞান, তবে সেই মুহর্তের বাস্তবতায় প্রায়োগিক ক্ষেত্রে যা শুধুমাত্র সে জ্ঞানটিকেই ইঙ্গিত করেছিল যে, তারা আসলে দুজনেই নগ্ন) যথেষ্ট ছিল তাদের এই নিষিদ্ধ ফলের বাগানে ফল চুরি করার অভিযানটিকে সকল পাপের জনক জননীতে রূপান্তরিত করার জন্য (৫০) । তারা দুজন এবং তাদের অনাগত সকল বংশধর স্বর্গীয় উদ্যান বা ইডেন থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত হয়েছিল। চিরন্তন জীবনের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হয় তাদের, আদম ও হাওয়ার শাস্তি হয় কষ্টকর পরিশ্রমের জীবনের, যথাক্রমে, ফসলের মাঠে এবং সন্তান প্রসবের সময়।

এই পর্যন্ত এতটাই প্রতিশোধপরায়ন, যা ওল্ড টেস্টামেন্টর মতোই চলছিল, তবে নিউ টেস্টামেন্টে ধর্মতত্ত্ব এখানে আরেকটি অবিচার নির্বিকারভাবে যুক্ত করেছিল, যার উপরে চেপে বসে একটি নতুন ধর্ষমর্ষকামীতা, যার হিংস্র ভয়াবহতা এমনকি ওল্ড টেস্টামেন্টও কোনোমতে অতিক্রম করেছে। যখন আপনি ভাববেন, বিষয়টি কিন্তু লক্ষ করার মত, একটি ধর্ম, যা কিনা নিপীড়ন আর হত্যার একটি উপকরণকে এর পবিত্রতার রূপক হিসাবে গ্রহন করা উচিত মনে করে, প্রায়ই যা গলায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। লেনী ব্রুস (৫১) সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছিলেন,‘যদি যীশুকে বিশ বছর আগে হত্যা করা হতো, তাহলে ক্যাথলিক স্কুলের ছেলে মেয়েরা গলায় ক্রুসের বদলে ইলেক্ট্রিক চেয়ার ঝুলিয়ে রাখতো’। কিন্তু এর পেছনে ধর্মতত্ত্ব এবং শাস্তির তত্ত্বটি আরো খারাপ। ধারণা করা হয় আদম হাওয়ার সেই আদি পাপ, পুরুষ বংশধারার মাধ্যমে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। সেইন্ট অগাস্টিনের (৫২) মতে পুরুষের বীর্যের মাধ্যমে এটি বংশানুক্রমে বিস্তার লাভ করে। এটি কোন ধরনের নৈতিকতার দর্শন, যা কিনা সকল শিশুকে দণ্ডায়িত করে, এমনকি তাদের জন্মের আগেও, দূর অতীতের কোনো পূর্বপুরুষের পাপ বংশগতভাবে তাদের উপর অর্পিত হয়? অগাস্টিন কিন্তু নিজেকে সঠিকভাবে তার নিজেকে পাপের ব্যপারে একজন ব্যক্তিগত বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভাবতেন, এবং ‘অরিজিনাল সিন’ শব্দদ্বয়কে তিনি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। তার আগে এই পাপটি ‘অ্যানসেস্ট্রাল সিন’ বা পূর্বপুরুষের পাপ নামে পরিচিত ছিল। অগাস্টিনের যুক্তি তর্ক এবং নানা বক্তব্য আমার মনে হয় আদি খ্রিস্ট ধর্মতত্ত্ববিদদের অতিমাত্রায় পাপ নিয়ে চিন্তা করার বিষয়টিকে প্রমাণ করে। তাদের ধর্মকথনে পাতার পর পাতা তারা নক্ষত্রখঁচিত আকাশ বা পর্বতমালা এবং সবুজ বনভূমি বা ভোরের পাখিদের সমবেত সঙ্গীত বন্দনা করে ব্যয় করতে পারতেন। তবে এসব তারা কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন, কিন্তু খ্রিস্ট ধর্মের মূল নিশানা অতিমাত্রায় পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ পাপ। কি বাজে একটা চিন্তা যা কারো জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকতে পারে। স্যাম হারিস দারুণভাবে তার ‘লেটার ট্যু এ ক্রিশ্চিয়ান নেশন’ বইটিতে বিষয়টি ব্যবচ্ছেদ করেছেন এভাবে: ‘আপনার প্রধান চিন্তা আপাতদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কিছু কাজে - যা মানুষ করে যখন তারা নগ্নাবস্থায় থাকে; আপনাদের এই অতিশিষ্টাচারপনা মানব কষ্টের ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত বোঝায় প্রতিনিয়ত যোগান দিচ্ছে।’

কিন্তু এখন, স্যাডো-ম্যাসোকিজম বা ধর্ষমর্ষকামীতা বিষয়টি দেখা যাক। ঈশ্বর নিজেকে মানুষ – যীশু রূপে পুনর্জন্ম দেন। তার উদ্দেশ্য, আদমের সেই বংশগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যেন তাকে নির্যাতন নিপীড়ন এবং দণ্ড দিয়ে হত্যা করা হয়। যখন থেকেই পল এই বীতস্পৃহা সৃষ্টিকারী মতবাদটি ব্যাখ্যা করেছেন, তখন থেকেই যীশুকে উপাসনা করা হচ্ছে মানবজাতির সকল পাপের ত্রাণকর্তা হিসাবে। আদমের সেই অতীত

পাপের জন্যই না, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন সব পাপের জন্যও, ভবিষ্যতের মানুষ সেই পাপ করার সিদ্ধান্ত নিক বা না নিক।

একটি ভিন্ন দিক, বহু মানুষের যা মনে হয়েছে, যাদের মধ্যে রবার্ট গ্রেভস (৫৩) ও তার মহাকাব্যিক উপাখ্যান 'কিং জিসাস' সৃষ্টিটিও অন্তর্ভুক্ত, হতভাগ্য জুডাস ইসকারিওট ইতিহাসের শুধু অবিচারই পেয়ে এসেছেন, যখন তার বিশ্বাসঘাতকতা শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সামগ্রিক সেই মহাজাগতিক পরিকল্পনারই একটি প্রয়োজনীয় অংশ ছিল। একই কথা বলা যাবে যীশুর অভিযুক্ত হত্যাকারীদের ক্ষেত্রেও। যদি যীশু নিজেই চান যে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে হত্যাকারীদের দ্বারা নিহত হবেন, যেন তিনি আমাদের সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন, তাহলে ব্যপারটা বরং পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয় না যে, যারা কিনা নিজেদের পাপ থেকে অবমুক্ত মনে করেন, তারা আবার সেই কারণেই জুডাস এবং পরবর্তীতে যুগে যুগে ইহুদী নিপীড়নে লিপ্ত হন? আমি ইতোমধ্যেই মূলধারায় সংযুক্ত করা হয়নি এমন গসপেল সংকলনের একটি দীর্ঘ তালিকা আগের একটি অধ্যায়ে উল্লেখ করেছিলাম। একটি পাণ্ডুলিপি যা জুডাসের হারিয়ে যাওয়া গসপেল দাবী করা হয়, অতি সম্প্রতি অনুদিত হয়েছে এবং ফলাফলে বেশ প্রচারও পেয়েছে। এর আবিষ্কার সংক্রান্ত পরিস্থিতিটি বিতর্কিত, কিন্তু এটি আত্মপ্রকাশ করে মিসরে, ৭০ এর বা ৬০ এর দশকের কোনো সময়ে; এবং কপ্টিক হরফে লেখা, প্যাপিরাসের ৬২ টি পাতায় (৫৫); কার্বন ডেটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যেমে জানা গেছে এটির উৎপত্তি ৩০০ খ্রিষ্টাব্দের আশেপাশে, কিন্তু এটি সম্ভবত লেখা হয়েছে আগের একটি গ্রিক পাণ্ডুলিপির অনুকরণে। এর লেখক যে-ই হোক না কেন, জুডাস ইসকারিওটের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গসপেলটি দেখা হয়েছে। এবং সেখানে যে প্রস্তাব করা হয়েছে, জুডাস যীশুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন যীশুর নির্দেশে, যীশু নিজেই তাকে সেই ভূমিকা পালন করতে বলেছিলেন। পুরোটাই ছিল যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে আত্মবিসর্জন বা মৃতুবরণ করে মানব-জাতিকে তার সকল পাপ থেকে মুক্তি দেয়ার পরিকল্পনার একটি অংশ মাত্র। যত অপ্রীতিকর সেই মতবাদ হোক না কেন, স্পষ্টতই এটি এর পর থেকে বিশ্বাসঘাতক হিসাবে জুডাসের চরিত্রহরণের অস্বস্তিকর বিষয়টিকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দেয়।

আমি খ্রিস্ট ধর্মের কেন্দ্রীয় মতবাদ হিসাবে আদি পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা উল্লেখ করেছি একটি হিংস্র, কলুষিত বিদ্বেষপূর্ণ ধর্ষ-মর্ষকামী এবং বীতস্পৃহা সৃষ্টিকারী একটি মতবাদ হিসাবে। চূড়ান্ত উন্মাদনা বলে এটিকে আমাদেরও বর্জন করা উচিত কিন্তু এটির সর্বব্যাপী পরিচিতি আর বিস্তার আমাদের বস্তুনিষ্ঠ বিচার করা ক্ষমতাকে খানিকটা ভোতা করে দেয়; যদি ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতেই চেয়ে থাকেন, কেন তিনি শুধু সেগুলো মাফ করে দিলেন না নিজ ক্ষমতা বলে, নিজেকে নিপীড়ন করে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুদণ্ডাদেশ মাথায় পেতে নেবার কি দরকার ছিল তার মূল্য পরিশোধ হিসাবে। এবং

সেকারণেই ঘটনাচক্রে তিনি ইহুদীদের ভবিষ্যতের প্রজন্মকেও দণ্ডিত করেন যীশুর হত্যাকারী হিসাবে ভয়াবহ পগ্রোম (ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহিংস আক্রমণ) এবং নিপীড়ন নির্যাতন আর হত্যার দণ্ডাদেশে। বংশপরম্পরার সেই পাপটিও কী বীর্যের মাধ্যমে ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল?

ইহুদী ধর্মের ইতিহাসবিদ গেজা ভেরমেসের মতে, পল (৫৬) স্পষ্টতই সেই প্রাচীন ইহুদী ধর্মতত্ত্বীয় মূলনীতিতে আকণ্ঠ মজে ছিলেন : রক্ত ছাড়া কোনো প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব না (৫৭); সত্যি তার 'এপিস্টল টু দ্য হিব্রুস' (৯:২২) বা হিব্রু জাতির প্রতি লেখা পত্রে, তিনি সেই ধরনের কথাই বলেছিলেন; প্রগতিশীল নৈতিকতার সমর্থক কারো পক্ষে আজ কোনো ধরনের প্রতিহিংসামূলক শাস্তি প্রদানের নীতি সমর্থন করা কঠিন। এটি নিরীহ মানুষকে শাস্তি বা 'স্কেপগোট' তত্ত্ব, যেখানে নিরপরাধ মানুষকে দণ্ডিত করা হয় ভিন্ন অপরাধীদের অপরাধের দণ্ডের শিকার হিসাবে। সব গুছিয়ে বললে, আদম, এই তথাকথিত প্রকৃত পাপের মূল পাপী, তার তো কোনো অস্তিত্বই ছিলনা: একটি বিব্রতকর সত্য, যে বিষয়টি সম্বন্ধে পলের অজ্ঞতা ক্ষমাযোগ্য কিন্তু অনুমান করা সম্ভব বিষয়টি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের (এবং জিসাস, যদি আপনি বিশ্বাস করেন তিনি ঈশ্বর) অজানা থাকার কথা নয়। যা মৌলিকভাবে এই সম্পূর্ণ পেঁচানো বাজে গল্পটির মূল বিষয়টিকে ভিত্তিহীন করে দেয়; ওহ .. কিন্তু অবশ্যই, আদম আর হাওয়ার গল্পটি শুধু প্রতীকী ছিল, তাই না? প্রতীকী? তাহলে 'অস্তিত্বহীন' এক মানুষের 'প্রতীকী' পাপের জন্য সবার প্রতিনিধি হয়ে শাস্তি হিসাবে যীশু একটি অনুকূল ধারণা হিসেবে তার নিজের উপর নিপীড়নের ঘটনাটি ঘটিয়ে ছিলেন এবং নিজের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিৎ করে ছিলেন। আমি যেমন বলেছিলাম চূড়ান্ত পাগলামী, এবং খুবই জঘন্যরকমের অপ্রীতিকর।

বাইবেল বিষয়ে আলোচনা শেষ করার আগে, আমি এর নৈতিক শিক্ষা সহ্য করার অনুপযুক্ত একটি বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। খ্রিস্টানরা কদাচিৎ অনুধাবন করতে পারেন যে অন্যদের প্রতি তাদের বেশির ভাগ নৈতিক বিবেচনা, যা আপাতদৃষ্টিতে ওল্ড এবং নিউ, উভয় টেস্টামেন্টই শিক্ষা প্রদান করেছে, মূলত খুবই সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট অন্তঃগোত্রের সদস্যের প্রতি প্রয়োগ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল, 'লাভ দাই নেইবর' বা আপনার প্রতিবেশীদের ভালোবাসুন। এর অর্থ আমরা এখন যা করছি তা কিন্তু আগে ছিল না, এর অর্থ ছিল শুধুমাত্র আরেকজন ইহুদীকে ভালোবাসো। এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছে আমেরিকার চিকিৎসক এবং বিবর্তনীয় নৃতাত্ত্বিক জন হারটাং (৫৮), নৈতিকতার বিবর্তন ও বাইবেলের ইতিহাস নিয়ে অসাধারণ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, অন্তঃগ্রুপ (ইন গ্রুপ) যেখানে তিনি জোর দিয়েছিলেন এর অপর পিঠটি, বহিঃগ্রুপ (বা আউট গ্রুপ) শত্রুতা।

আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন

জন হারটাং এর খানিকটা তীর্যক রসিকতা তার রচনাটির শুরু থেকেই দৃশ্যমান, যেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের একটি ব্যাপটিস্ট উদ্যোগের কথা বলেছিলেন, যারা নরকে কয়জন আলাবামাবাসী আছেন তার সংখ্যা গণনা করার প্রচেষ্টা করেছিলেন। নিউ ইয়র্ক টাইমস আর নিউজডে দৈনিকে এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট বলছে, একটি গোপন পদ্ধতি অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় ১.৮৬ মিলিয়ন হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে, যেমন, মেথডিষ্টদের রোমান ক্যাথলিকদের চেয়ে বেশি সম্ভাবনা আছে নরক থেকে ত্রাণ লাভ করার এমন একটি পূর্বানুমান ছিল, অন্যদিকে মূলত সবাই, যারা কোনো না কোনো চার্চের সাথে যুক্ত নয়, তাদের নরকে যাওয়া ছাড়া বাঁচার কোনো উপায় রাখা হয়নি। এইসব মানুষগুলোর এই অত্যধিক আত্মতৃপ্তি আজ প্রতিফলিত হয় 'রাপচার' (৫৯) নামের বিভিন্ন ওয়েব-সাইটগুলোয়। যেখানে লেখক পুরোপুরি নিশ্চিৎভাবে ধরে নিয়েছেন, যখন 'শেষ সেই সময়' আসবে, তিনি স্বর্গে 'অদৃশ্য' হওয়া মানুষেদের একজন হবেন; রাপচার রেডির লেখকের লেখা থেকে একটি বৈশিষ্ট্যমূলক উদাহরণ, এই ধারার অন্যতম কদর্য ছলধার্মিক নমুনা: 'যদি রাপচারের ঘটনাটি ঘটে, যা আমার অনুপস্থিতির কারণ হবে, তাহলে 'ট্রিবুলেশন সেইন্টদের' দ্বায়িত্ব নিতে হতে হবে এই সাইটির একটি মিরর সাইট, বা এই সাইটটি আর্থিক সহায়তা করার জন্য (আপনি হয়তো জানেন না এই বাক্যে ট্রিবুলেশন সেইন্টের অর্থ কি, এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই, আপনার এর চেয়ে অনেক ভালো কিছু করার আছে ।)

হারটাঙের বাইবেল ব্যাখ্যা প্রস্তাব করছে, বইটি খ্রিস্টানদের মধ্যে এই ধরনের কোনো অতিরিক্ত আত্মতৃপ্তির সুযোগ রাখেনি। যীশু তার এই অন্তঃগ্রুপ সদস্যদের, যাদের রাপচারের মাধ্যমে রক্ষা করা হবে, তা শুধু কঠোরভাবে ইহুদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যেক্ষেত্রে তিনি ওল্ড টেস্টামেন্টের ঐতিহ্য অনুসরণ করছিলেন, এর বাইরে তার কিছু জানাও ছিল না তখন। হারটাং স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেছিলেন, 'তুমি হত্যা করবে না' (বা দাউ শ্যাল্ট নট কিল) এই নির্দেশটির কখনোই সেই অর্থ ছিল না, এটির অর্থ আমাদের কাছে এখন যেমন। এর অর্থ হচ্ছে, খুব নির্দিষ্টভাবে, তোমরা কোনো ইহুদী হত্যা করবে না (বা দাউ শ্যাল্ট নট কিল জিউস) এবং ঐ সব কমান্ডমেন্ট বা নির্দেশগুলো যা আপনার প্রতিবেশী (দাই নেইবর) বিষয়টির উল্লেখ করেছে, তারাও সমভাবে সুনির্দিষ্ট, এই 'প্রতিবেশী' মানে আরেকজন ইহুদী। মোজেস মাইমোনাইডেস (৬০), অত্যন্ত সম্মানিত দ্বাদশ শতকের একজন র‍্যাবাই এবং ডাক্তার, এর বিষদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে, 'কাউকে হত্যা করবে না' এই নির্দেশের অর্থ হচ্ছে: 'যদি কেউ একজন ইসরায়লাইটকে (ইসরায়েলবাসী) হত্যা করে, সে ধর্মগ্রন্থের নিষিদ্ধ নির্দেশগুলোর প্রতি নেতিবাচক আচরণ বা অমান্য করে।কারণ ধর্মগ্রন্থ বলছে, তোমরা হত্যা করবে না, যদি কেউ ইচ্ছামূলকভাবে কোনো সাক্ষীর উপস্থিতিতে কাউকে হত্যা করে, তাকে তরবারী দিয়ে শিরোচ্ছেদ করে শাস্তি দেয়া হবে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন যে-

কোনো অবিশ্বাসীকে হত্যা করার জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে না'। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন বা বলার অপেক্ষা রাখে না !!

হারটাং সানহেড্রিনের (ইহুদী সুপ্রীম কোর্ট, যা উচু পদমর্যাদার যাজকদের সমন্বয়ে যা গঠিত) কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যা একই ধরনের অপরাধে এমন কাউকে দায়মুক্ত করে। যেমন ধরুন, ভুলক্রমে যখন কেউ কোনো পশু বা অবিশ্বাসীকে খুন করতে গিয়ে কোনো ইসরায়েলবাসীকে হত্যা করে বসে, এই বিদ্রুপাত্মক নৈতিকতার ধাঁধা একটি ভালো বিষয়েরও অবতারণা করেন। কি হবে যদি সে এমন একটি পাথর ছুড়ে মারে নয় জন অবিশ্বাসী আর একজন ইসরায়েলবাসী একটি দলের দিকে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ইসরায়েলাবাসী তাতে হত হয়? হুম, কঠিন! কিন্তু উত্তরও প্রস্তুত, তার দায়মুক্ততার ব্যাপারটা নিশ্চিৎ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে তথ্যটি থেকে, যা বলছে অধিকাংশ অবিশ্বাসী ছিল সেখানে।

হারটাং একই বাইবেলের অনেকগুলো উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন, যা এই অধ্যায়ে আমি ব্যবহার করেছি; মোজেস, জশুয়া এবং জাজেসদের প্রতিশ্রুত ভূমি বিজয় সংক্রান্ত ব্যাপারে। আমি সতর্কতার সাথে স্বীকার করে নিয়েছি, ধার্মিক মানুষগুলো বাইবেলের মত একইভাবে চিন্তা করেন না। আমার কাছে এই বিষয়টি প্রতীয়মান করছে যে, আমাদের নৈতিকতাগুলো, আমরা ধার্মিক হই বা না হই, এসেছে ভিন্ন উৎস থেকে। এবং সেই অন্য উৎস, সেটা যা-ই হোক না কেন, আমাদের সবার জন্য যা উন্মুক্ত, ধর্ম বা ধর্মহীনতা কোনো ব্যাপারই সেখানে প্রভাব ফেলে না। কিন্তু হারটাং একজন ইসরায়েলি মনোবিজ্ঞানী জর্জ তামারিনের ভয়ঙ্কর একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করেছিলেন। গবেষণাটিতে তামারিন ইজরায়েলের কয়েকটি বিদ্যালয়ে আট থেকে চৌদ্দ বছর বয়সী সহস্রাধিক শিশুদের সামনে 'বুক অব জশুয়ায়' বর্ণিত জেরিকোর যুদ্ধের বর্ণনা তুলে ধরেন:

> জশুয়া (৬১) তার অনুগত মানুষদের বলেন, 'চিৎকার করে বলো, মহান প্রভু ঈশ্বর তোমাদের এই শহরটি দান করেছেন, এবং এই শহর ও তার মধ্যে সব কিছু ঈশ্বরের প্রতি বিসর্জনের লক্ষ্যে ধ্বংস করা হবে, কিন্তু সব রৌপ্য এবং স্বর্ণ এবং ব্রোঞ্জের পাত্র ও লোহা মহান প্রভুর কাছে পবিত্র, সেগুলো মহান প্রভুর ধনভাণ্ডারে যোগ করা হবে..;' এরপর তারা সম্পূর্ণভাবে শহরটির সবকিছু ধ্বংস করে, পুরুষ, নারী ..তরুণ আর বয়োবৃদ্ধ, পালিত ষাড়, ভেড়া, গাধাদের সবকিছুই ধ্বংস করা হলো তলোয়ারের ধারালো আঘাতে। পুরো শহরটাকে তারা আগুন দিয়ে প্রজ্বলিত করে, পুড়িয়ে দেয় এর মধ্যে যা ছিল সব কিছু, শুধুমাত্র রৌপ্য, সোনা এবং ব্রোঞ্জ আর লোহার পাত্রগুলো ছাড়া, যা তারা ঈশ্বরের ধনভাণ্ডারে জমা করে।

এরপর তামারিন শিশুদের একটি সাধারণ নৈতিকতার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন: ‘তোমরা কি মনে করো, জশুয়া আর ইসরায়েলবাসীরা কাজটা ঠিক করেছিল? উত্তর হিসাবে বাছাই করতে তাদের তিনটি বিকল্প উত্তরের যে কোনো একটি বাছাই করার সুযোগ দেয়া হয়েছিল : ‘এ’ (পুরো সম্মতি), ‘বি’ (আংশিক সম্মতি) এবং ‘সি’ (পুরোপুরি অসম্মতি); এই জরিপের ফলাফলে স্পষ্ট মেরুকরণের চিহ্ন ছিল: শতকরা ৬৬ ভাগ পুরো সম্মতির পক্ষে, ২৬ ভাগ পুরো অসম্মতির পক্ষে, এবং কিছু কম প্রায় শতকরা ৮ শতাংশের অবস্থান মধ্যম, আংশিক সম্মতির সপক্ষে। এখানে প্রথম গ্রুপ (এ) পুরো সম্মতির সপক্ষে কারণ হিসাবে উল্লেখ করা তিনটি বৈশিষ্ট্যসুচক উত্তর দেয়া হলো:

> আমার মতে জশুয়া এবং ইজরায়েলের সন্তানরা সঠিক আচরণ করেছিল, এবং এর কারণ হচ্ছে: ঈশ্বর তাদের এই ভূমি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাদের এই দেশটি জয় করবার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা যদি সেভাবে কাজ না করতো বা কাউকে হত্যা না করতো, তাহলে বিপদের সম্ভাবনা রয়ে যেত ইজরায়েলের সন্তানদের গয়িমদের (৬২) সাথে মিশে যাওয়ার।

> আমার মতে জশুয়া ঠিক কাজই করেছিলেন, একটি কারণ হচ্ছে ঈশ্বর নিজেই তাকেই নির্দেশ দিয়েছেন সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করতে যাতে, যেন ইজরায়েলের অন্য গোত্ররা তাদের সাথে না মিশে যেতে পারে এবং তাদের খারাপ জীবনাচরণ না শিখতে পারে।

> জশুয়া ভালো কাজ করেছিলেন কারণ যে মানুষরা এই দেশে বাস করতো তাদের ধর্ম ছিল ভিন্ন এবং যখন জশুয়া তাদের হত্যা করে, সে তাদের ধর্মকে পৃথিবী থেকে মুছে দিয়েছিল।

জশুয়ার গণহত্যার সপক্ষে এই ধরনের যুক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রকৃতির। এমনকি যাদের উত্তর ‘সি’, অর্থাৎ পুরোপুরি অসম্মতির পক্ষে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারাও ধর্মের বিষয়টি হালকাভাবে এনেছে। একটি শিশু যেমন জশুয়ার জেরিকো বিজয়ে অসম্মতি দিয়েছে, কারণ তার মতে এটা করতে হলে তাকে জেরিকোতে তাকে ঢুকতে হবে:

> আমি মনে করি কাজটা খারাপ হয়েছিল, যেহেতু আরবরা অপবিত্র, সুতরাং কেউ যদি সেই অপবিত্র ভূমিতে প্রবেশ করে, সে নিজেও অপবিত্র হয়ে যাবে এবং তাদের উপর বিদ্যমান অভিশাপেরও ভাগীদার হবে সে।

আরো দুজন যারা পুরোপুরি অসম্মতি জানিয়ে ছিল, তাদের কারণ হচ্ছে, জশুয়া সবকিছু ধ্বংস করেছিল, সম্পত্তি এবং গবাদীপশুসহ, সেই সম্পদ ইসরায়েলবাসীদের জন্য কিছুই তিনি রাখেননি।

> আমি মনে করি জশুয়া ঠিক কাজ করেননি, তারা কিছু গবাদী পশু ধ্বংস না করে নিজেদের জন্য রাখতে পারতেন।

> আমি মনে করি জশুয়া ঠিক কাজটি করেননি, তিনি জেরিকোর সম্পদ বিনষ্ট না করতে পারতেন কারণ তিনি যদি সম্পদ ধ্বংস না করতেন সেগুলো ইজরায়েলের সন্তানদেরই হতো।

আবারো, সাধু মাইমোনাইডেস, প্রায়শই জ্ঞানের পাণ্ডিত্যের জন্য যার উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়, কোনো সন্দেহ নেই এই বিষয়ে তার অবস্থান কি ছিল; 'সাত জাতিকে ধ্বংস করার জন্য এটি হ্যাঁ বাচক নির্দেশ ছিল, যেমনটি এটি নির্দেশ করেছে : তোমরা তাদের পুরোপুরি ধ্বংস করবে', কেউ যদি তাদেরকে হত্যা না করে যখন সে পারে, তাহলে সে সরাসরি নির্দেশটি অমান্য করে, যেমন বলা হয়েছে: 'জীবিত এমন কিছুকে তোমরা রক্ষা করবে না যারা শ্বাস নেয়'।

মাইমোনাইডেসের ব্যতিক্রম তামারিনের পরীক্ষার সেই শিশুদের সবারই যথেষ্ট বয়স কম, নিষ্পাপ, সম্ভবত যে বন্য মনোভাবটি তারা প্রকাশ করছে, সেটি সম্ভবত তাদের পিতামাতার বা সেই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর চিন্তাধারার প্রভাব, যেখানে তারা প্রতিপালিত হচ্ছে। আমার মনে হয়, প্যালেস্টাইনীয় শিশুদের ক্ষেত্রেও, যারা যুদ্ধ বিদ্ধস্ত দেশে বসবাস করছে, তারাও সম্ভবত বিপরীত অভিমূখী একই মতামত দিতে পারে। এই বিষয়গুলো আমাকে হতাশাগ্রস্থ করে। আমার কাছে বিষয়টি ধর্মের বিশাল শক্তিকে প্রদর্শন করছে বলেই অনুভুত হয়। বিশেষত ধর্মীয় পরিমণ্ডলে প্রতিপালিত শিশুদের ক্ষেত্রে, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ এবং ঐতিহাসিক শত্রুতা এবং বংশগতভাবে জীঘাংসাকে লালন করার বিশেষ প্রক্রিয়াটির অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি বাধ্য হচ্ছি মন্তব্য করতে যে, তামারিনের গবেষণায় উত্তর গ্রুপ 'এ' র প্রতি তিন জন উত্তরদাতার দুজনই জাতিগত মিশ্রণের অশুভ প্রতিক্রিয়া নিয়ে মন্তব্য করেছে, অপরদিকে তৃতীয় মন্তব্যটি কোনো ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে সেই ধর্মের মানব হত্যার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে।

তামারিন তার এই পরীক্ষাটি একটি বিস্ময়কর নিয়ন্ত্রিত গ্রুপের মধ্যে পরিচালনা করেছিলেন, ভিন্ন ১৬৮ জন ইসরায়েলী শিশুদের একটি গ্রুপকে 'বুক অব জশুয়া' থেকে একই অংশ পড়তে দেয়া হয়, তবে যেখানে জশুয়ার নামের বদলে নাম দেয়া হয়

জেনারেল লিন এবং ইজরায়েলের বদলে সেখানে লেখা হয়া প্রায় ৩০০০ বছর আগের কোনো চীনা রাজ্যর নাম। এবার এই গবেষণার ফলাফল হলো বিপরীত, মাত্র ৭ শতাংশ জেনারেল লিনের আচরণ সমর্থন করেছিল, অপর দিকে ৭৫ শতাংশই জেনারেল লিনের এই কাজের যথার্থতা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করেছিল। অন্যার্থে সিদ্ধান্ত নেবার এই প্রক্রিয়া থেকে যখনই তাদের আনুগত্য সরিয়ে রাখা হয়, অধিকাংশ শিশুই আধুনিক মানুষ যে নৈতিকতার বিচার সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করে তার সাথে একমত হত। জশুয়ার সেই কর্মটি একটি বর্বরোচিত গণহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অনুভূত হয়; আর এই বৈষম্যটা শুরু হয় জীবনের শুরু থেকে; এখানে শিশুদের এই গণহত্যাকে নিন্দা কিংবা আর সমর্থন করার মধ্যে ধর্মই মূল বিভাজন সৃষ্টিকারী।

হারটাঙের প্রবন্ধটির বাকি অংশে, তিনি নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে আলোচনা করেন, তার মূল বক্তব্যর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ এভাবে দেয়া যেতে পারে : যীশু সেই একই অন্তঃগোত্র নৈতিকতার অনুসারী, যার সাথে যুক্ত গোত্র-বহির্ভুতদের প্রতি শত্রুভাবাপন্নতা সংশ্লিষ্ট, যে বিষয়টি ওল্ড টেস্টামেন্টে স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে ধরা হয়েছে। যীশু একজন অনুগত ইহুদী ছিলেন; পলই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আবিষ্কার করেছেন কিভাবে ইহুদী ঈশ্বরের ধারণাটি ইহুদী নয় এমন জনগোষ্ঠীর কাছে নিয়ে যাওয়া যায়। হারটাং কোনো রাখঢাক না করেই আমার চেয়ে সাহসী উচ্চারণ করেছেন,‘যীশু তার কবরে নড়ে উঠতেন যদি তিনি জানতেন যে, পল তার পরিকল্পনাটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন’।

‘বুক অব রিভিলেশন’ নিয়ে হারটাং বেশ মজা করেছেন, যা নিঃসন্দেহে বাইবেলের বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আজব। বলা হয় বইটি লিখেছেন সেইন্ট জন (৬৩) এবং কেন স্মিথ তার ‘কেনস গাইড ট্যু বাইবেল’ (৬৪) বইটিতে সুন্দরভাবে বলেছেন: ‘যদি তার এপিস্টল (কারো উদ্দেশ্যে লেখা রচনা, চিঠি) পড়ে কেউ মনে করেন যে জন গাঁজা খেয়েছেন, তাহলে রিভিলেশন পড়লে মনে করতে হবে যে জন পুরো এলএসডির উপরে ছিলেন’। হারটাং দুটো রিভিলেশন বা অনুচ্ছেদে, যেখানে পরিত্রাণ পাওয়া (সিলড) মানুষের সংখ্যা (যা অন্য কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী, যেমন, জিহোভাস উইটনেস, যাদের কাছে এই ‘সিলড’ শব্দটি হচ্ছে উদ্ধারপ্রাপ্ত) সীমাবদ্ধ ১৪৪,০০০ এ; হারটাঙের বক্তব্য হলো তাদের সবাইকে ইহুদী হতে হবে, ১২ টি গোত্রের প্রতিটি গোত্র থেকে ১২,০০০। কেন স্মিথ আরো খানিকটা গভীরে ব্যাখ্যা করে উল্লেখ করেন যে, ১৪৪,০০০ নির্বাচিত মানুষ হবে তারা, যারা তাদেরকে কোনো রমণীর সংসর্গে এসে নিজেদের দূষিত করেননি; যার সম্ভবত অর্থ হতে পারে, এদের কেউ নারী হতে পারবেন না, বেশ, এমন কিছু আমরা ইতোমধ্যেই ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা করতে শিখেছি।

হারটাঙের প্রবন্ধে আরো অনেক কিছু আছে, আমি শুধু আরো একবার এটি পড়ার জন্য প্রস্তাব করছি, এবং একটি উদ্ধৃতির মধ্যে পুরো ব্যপারটির সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করবো:

> বাইবেল হচ্ছে অন্তঃগোত্র (বা ইন গ্রুপ) নৈতিকতার একটি নীলনকশা। গণহত্যা, অন্য গোত্রের সদস্যদের দাস হিসাবে বন্দি করা এবং পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তার করার নির্দেশনা সম্বলিত একটি বই। বাইবেল শুধুমাত্র এর উদ্দেশ্যের কারণে, বা খুন, হত্যা, নিষ্ঠুরতা এবং ধর্ষণকে গৌরবমণ্ডিত করার অপরাধের জন্য কিন্তু অশুভ নয়। কারণ বহু প্রাচীন কাহিনী ঠিক একই কাজ করেছে, যেমন, ইলিয়াড, অ্যাইসল্যান্ডের সেই গাথা, প্রাচীন সিরিয়াবাসীদের কাহিনী এবং প্রাচীন মায়াদের খোদাই করে রাখা ইতিহাস; কিন্তু কেউই নৈতিকতার ভিত্তি হিসাবে ইলিয়াডকে সমর্থন করছে না, এবং সমস্যাটা সেখানেই; বাইবেল বিক্রি এবং কেনা হয় একটি নির্দেশিকা হিসাবে, কেমন করে মানুষ তাদের জীবন কাটাবে সেই নির্দেশনা সম্বলিত একটি বই। এবং এটি সারা বিশ্বে আপাতত সবচেয়ে বেশি বিক্রিত একটি বই, বেস্ট সেলার।

যদি কেউ ভাবেন যে ঐতিহ্যবাহী জুডাইজমে শুধু নিজস্ব অন্তঃগোত্র সংকীর্ণতা আছে, তাহলে আইজাক ওয়াটস (১৬৭৪-১৭৪৮) এর লেখা একটি হিম বা প্রার্থনা সঙ্গীত লক্ষ করা যাক (৬৫):

> Lord, I ascribe it to Thy Grace,
> And not to chance, as others do,
> That I was born of Christian Race
> And not a Heathen or a Jew

এই অংশটিতে আমাকে যা বিস্মিত করে, সেটি শুধু নিজেদের বিশেষত্ব আর অনন্যতার যে দাবী করা হয়েছে সেটি নয়, বরং এর যুক্তিটা; যেহেতু অসংখ্য মানুষ খ্রিস্টান ছাড়াও আরো অনেক ধর্মে জন্মগ্রহন করেছেন, তাহলে কিভাবে ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভবিষ্যতে কোনো মানুষের বিশেষভাবে তার পছন্দের ধর্মে জন্ম হবে? কেন আইজাক ওয়াট বা সেই মানুষগুলো. যাদের তিনি কল্পনা করেছেন তার স্তবসঙ্গীত গাইছে, তাদের কেন বিশেষ খাতির করা হবে? যা-ই হোক না কেন, আইজাক ওয়াট তার মাতৃগর্ভে ভ্রূণ হিসাবে যাত্রা শুরু করার আগে, সত্তার আসলে কি প্রকৃতি থাকতে হবে যা বিশেষ সুনজর পেতে পারে? গভীরতম বিষয়তো বটে তবে অবশ্যই অসীম গভীর নয়, বিশেষ করে যে মন ধর্মতত্ত্বের চিন্তায় অভ্যস্ত তাদের কাছে। আইজাক ওয়াটের এই স্তব সঙ্গীত মনে করিয়ে দেয় গোঁড়া এবং রক্ষণশীল (কিন্তু সংশোধন কিংবা সংস্কার হয়নি)

পুরুষ ইহুদীরা যা আবৃত্তি করার জন্য শেখেন, তাদের তিনটি দৈনন্দিন প্রার্থনার সময় পড়ার জন্য; ‘আপনার অসীম করুণা ,আমাকে ইহুদী ছাড়া আর কিছু না বানানোর জন্য, আপনার অসীম করুণা আমাকে রমণী বানাননি, অনেক কৃতজ্ঞতা আপনি আমাকে ক্রীতদাস বানাননি’।

ধর্ম নিঃসন্দেহে একটি বিভাজন সৃষ্টিকারী শক্তি, এবং এর বিরুদ্ধে এটি অন্যতম প্রধান একটি অভিযোগ। কিন্তু প্রায়শই এবং সঠিকভাবে বলা হয়ে থাকে যে, ধর্মীয় গোষ্ঠী কিংবা উপগোষ্ঠীগুলো পারস্পরিক যুদ্ধ, এবং দ্বন্দ্ব আসলেই কদাচিৎ ধর্মতাত্ত্বিক মতানৈক্য থেকে সৃষ্টি হয়। যখন উত্তর আয়ারল্যান্ডে একজন উলস্টার প্রোটেস্টান্ট আধাসামরিক মিলিশিয়া সদস্য কোনো ক্যাথলিককে হত্যা করে, তিনি কিন্তু তখন স্বগোতক্তি করেন না, ‘এটাই তোমার প্রাপ্য, ট্রান্সসাবস্টানশিয়ালিস্ট (ক্যাথলিক মাসের সময় রুটি এবং মদ যীশুর শরীর ও রক্তে রূপান্তর হয় এমন মতবাদ বিশ্বাসী), মারিওল্যাটরাস (যীশু খ্রিস্টের কুমারী মা মেরি প্রতি অতি ভক্তি প্রকাশ বা পূজা করা), ধূপের দুর্গন্ধ ছড়ানো বেজন্মা!’ বরং অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে যে, সে হয়তো প্রজন্মান্তরে টিকে থাকা সহিংস জীঘাংসায় সে কোনো ক্যাথলিকের হাতে নিহত হওয়া প্রটেস্টান্ট কারো খুনের বদলা নিচ্ছে। ধর্ম শুধু অন্তঃগোত্র/বহিঃগোত্রের মধ্যকার শত্রুতা ও বংশানুক্রমিক প্রতিহিংসার একটি ‘লেবেল’, যদিও এটি ত্বকের রং, ভাষা কিংবা পছন্দের ফুটবল দল ইত্যাদি লেবেলের চেয়ে আবশ্যিকভাবে খারাপ নয়, কিন্তু যখন অন্য কোনো লেবেল থাকে না, প্রায়শইন ধর্ম সেই শূন্যস্থানটি পূরণ করে।

অবশ্যই উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যা রাজনৈতিক, বহু শতাব্দী ধরেই সেখানে একটি গোষ্ঠীর দ্বারা অপর একটি গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শোষণ সেখানে সত্যিকারের বাস্তবতা। যেখানে দীর্ঘদিনের অবিচারের প্রতি সত্যিকারের ক্ষোভের অস্তিত্ব আছে, যা মনে হয় ধর্মের সাথে খুব সামান্যই সম্পর্কযুক্ত। শুধুমাত্র এটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বস্তরে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে - কারণ ধর্ম ছাড়া সেখানে আর কোনো ‘লেবেল’ থাকতো না, যা ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয়া যেত কাকে নিপীড়ন করতে হবে এবং কার জন্য প্রতিশোধ নিতে হবে। এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডে সত্যিকারের সমস্যা হচ্ছে এই লেবেলটি বহু প্রজন্মে বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। ক্যাথলিকরা, যাদের পিতামাতা, প্রপিতামহ এবং প্র-প্রপিতামহ ক্যাথলিক স্কুলে যাতায়াত করেছেন, তারা তাদের সন্তানদেরও ক্যাথলিক স্কুলে পাঠিয়েছেন; প্রটেস্টান্টরা, যাদের পিতামাতা, প্রপিতামহ এবং প্র-প্রপিতামহ যেমন গিয়েছিলেন প্রটেস্টান্ট স্কুলে, তাদের অনুসরণ করে তাদের সন্তানরাও প্রটেস্টান্ট স্কুলে যাতায়াত করেছে; এই দুই গোষ্ঠী, যাদের চামড়ার রং, ভাষা এবং আগ্রহের মূল বিষয়গুলো একই হওয়া সত্ত্বেও যেন তারা আসলেই ভিন্ন দুইটি প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। এতটাই গভীর তাদের ঐতিহাসিক বিভাজন; এবং ধর্ম, বা ধর্মীয়ভাবে

পৃথকীকৃত শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়া সেখানে এই পার্থক্য থাকারই কথা না। কসোভো থেকে প্যালেস্টাইন, ইরাক থেকে সুদান, উলস্টার থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ, মনোযোগ দিয়ে যে-কোনো এলাকাই খেয়াল করুন, আপনি দেখতে পাবেন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অমিমাংসাযোগ্য শত্রুতা এবং হিংস্র আক্রমণাত্মক সংঘর্ষ। যদিও আমি গ্যারান্টি দিতে পারবো না যে, সেখানে স্বগোত্রীয় ও ভিন্ন গোত্রীয়দের মধ্যে পার্থক্যসূচক প্রধান লেবেল হিসেবে ধর্মকে সেখানে আপনি আবিষ্কার করবেন, তবে আত্মবিশ্বাসের সাথে বাজি রাখার মতো সেটি প্রায় নিশ্চিৎভাবেই বলা সম্ভব।

ভারতে, দেশভাগের সময়, হিন্দু-মসুলমান ধর্মীয় দাঙ্গায় এক মিলিয়নেরও বেশি সংখ্যক মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন (এবং প্রায় ১৫ মিলিয়ন মানুষ গৃহচ্যুত হয়েছিলেন)। ধর্ম ছাড়া আর কোনো লেবেলেরই অস্তিত্ব ছিল না, যা দিয়ে কাকে হত্যা করতে হবে তা চিহ্নিত করা যায়। অবশেষে ধর্ম ছাড়া পার্থক্য করার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি; সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এমন একটি ধর্মীয় গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত হয়ে সালমান রুশদী(৬৬) 'রেলিজিয়ন, অ্যান এভার, ইস দ্য পয়জন ইন ইন্ডিয়াস ব্লাড' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এর শেষ অনুচ্ছেদটি এখানে উল্লেখ করছি (৬৭):

> এই সব কিছু বা এই সব অপরাধ যা সারা পৃথিবীতে ধর্মের ভয়ঙ্কর নামে প্রতি দিন সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলোকে শ্রদ্ধা করার মত কি আছে? কত অনায়াসে, এবং কত ভয়াবহ পরিণতিসহ ধর্ম তাদের গোত্রীয় বিশ্বাসকে স্থাপন করে, এবং আমরাও সেই মতবাদের জন্য মানব হত্যা করতে কত বেশি উদগ্রীব হয়ে থাকি, এবং আমরা যখন সেই কাজটি যথেষ্ট পরিমাণে নিয়মিত করতে থাকি, সেগুলো ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর হতে থাকা প্রভাবগুলো সেই সব কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি আরো সহজ করে দেয়। সুতরাং ভারতে সমস্যা পরিণত হয়েছে পৃথিবীর সমস্যায়, ভারতে যা ঘটেছে তা ঈশ্বরের নামে ঘটেছে। এই সমস্যার নামই ঈশ্বর।

আমি অস্বীকার করছি না যে, কোনো অন্তঃগোষ্ঠী বা গোষ্ঠী অভ্যন্তরের আনুগত্য এবং গোষ্ঠী বহির্ভূতদের প্রতি সহিংসতা প্রদর্শনে মানব জাতির শক্তিশালী প্রবণতা এমনকি ধর্ম ছাড়াও টিকে থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল টীমের সমর্থকরা এই বিষয়টির একটি জলজ্ব্যান্ত প্রমাণ হতে পারেন। এমনকি ফুটবল সমর্থকরাও ধর্মীয় ধারায় কখনো কখনো বিভক্ত হয়, যেমন গ্লাসগো রেন্জারস এবং গ্লাসগো সেল্টিক। ভাষা (যেমন বেলজিয়ামে), বর্ণ এবং গোত্র (বিশেষ করে আফ্রিকায়) বিভাজনের গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হতে পারে, কিন্তু ধর্ম কমপক্ষে তিনটি উপায়ে তার সৃষ্ট সমস্যাগুলো আরো ক্ষতিকর করে তোলে সেগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব আরো বৃদ্ধি করার মাধ্যমে:

- শিশুদের 'লেবেল' বা চিহ্নিত করার মাধ্যমে: শিশুদের বর্ণনা করা হয়, ক্যাথলিক শিশু বা প্রটেস্টান্ট শিশু ইত্যাদি, খুব অল্প বয়স থেকে, এবং অবশ্য যথেষ্ট কম বয়সে, যখন ধর্ম সম্বন্ধে নিজেদের মনস্থির করার মত কোনো ক্ষমতাই তাদের থাকে না (আমি এই শিশু নির্যাতনের বিষয়টি আলোচনা করবো নবম অধ্যায়ে।)
- বিভাজিত স্কুল বা শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহ দেবার মাধ্যমে: শিশুদের শিক্ষা দেয়া শুরু হয় সাধারণত খুবই অল্প বয়স থেকে, ধর্মীয় গোষ্ঠী অভ্যন্তরে সদস্যদের দিয়, এবং অন্য শিশুদের থেকে পৃথকভাবে, যাদের পরিবার হয়তো অন্য ধর্মের অনুসারী। মোটেও বাড়াবাড়ি হবে না যদি বলা হয়, উত্তর আয়ারল্যান্ডের সমস্যা একটি প্রজন্মেই শেষ হয়ে যেতে পারতো, পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা যদি বিলুপ্ত করা যেত।
- 'গোষ্ঠী বহির্ভুত' বিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা: বংশানুক্রমিকভাবেই এটি সংঘর্ষ এবং প্রতিহিংসাকে টিকিয়ে রাখে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলোর আন্তঃমিশ্রণে বাঁধা দিয়ে। অসবর্ণ বিবাহ, যদি অনুমিত হতো, স্বাভাবিকভাবে এটি বিদ্যমান শত্রুতাকে কমিয়ে দিত।

উত্তর আয়ারল্যান্ডে গ্লেনার্ম গ্রামটি আনট্রিম আর্লদের মূল জমিদারী বা ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। আমাদের স্মরণকালের অতীতে একবার তৎকালীন আর্ল একটি অভাবনীয় কাজ করে বসেন: তিনি একজন ক্যাথলিক রমণীকে বিয়ে করেছিলেন, সাথে সাথে গ্লেনার্মের ঘরে ঘরে শোকের চিহ্ন হিসাবে পর্দা নামিয়ে দেয়া হয়েছিল। অন্য ধর্মে বিয়ে করার ভয় ধার্মিক ইহুদীদের মধ্যেও বেশ প্রবল। তামারিনের ইতোমধ্যে উল্লেখিত জরিপটি (উপরের উল্লেখ করা হয়েছে)বেশ কিছু ইজরায়েলি শিশু জশুয়ার জেরিকো যুদ্ধের প্রতি তাদের সমর্থনে, প্রথমেই ভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী-ধর্মের মিশ্রণের সমস্যা উল্লেখ করে মন্তব্য করেছিল। যখন ভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, উভয় দিক থেকে এই 'মিশ্র বিয়ে' সম্বন্ধে আশঙ্কার প্রকাশ করা হয় এবং কখনো বিয়ের সন্তানরা কিভাবে প্রতিপালিত হবেন সেই বিষয়ে দীর্ঘ বিতর্ক হয়। শৈশবে যখন আমি অ্যাঙলিকান চার্চের আলো বহন করে বেড়াচ্ছি, আমার মনে আছে আমি হতবাক হয়েছিলাম, একটি নিয়মের কথা শুনে: যখন রোমান ক্যাথলিক কেউ একজন অ্যাংলিকানকে বিয়ে করেন, তাদের সন্তানদের সবসময় ক্যাথলিক হিসাবে প্রতিপালন করতে হবে। আমি সহজে বুঝতে পারি কেন একজন যাজক, তিনি যে গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন, এই শর্তটি পূরণের জন্য চাপ দেবেন। তবে আমি বুঝতে পারি না (এখনো না) এই অসাম্যতাটা কেন? অ্যাংলিকান (৬৮) যাজকরাই বা কেন এর বিরুদ্ধে তাদের সমরূপ শর্ত জুড়ে দিয়ে পাল্টা জবাব দেন না? খানিকটা কম নিষ্ঠুর, আমার যা মনে হয়, আমার পুরোনো

চ্যাপলেইন এবং বেতচামেনের (৬৯) ‘আওয়ার পাদ্রে’ তুলনামূলকভাবে আসলে অনেক নিরীহ প্রকৃতির।

সমাজবিজ্ঞানীরা ধর্মীয় হোমোগ্যামি (এই ধর্মের কাউকে বিয়ে করা) এবং হেটেরোগ্যামি (অন্য ধর্মের কাউকে বিয়ে করা) দুটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়েরগবেষক নরভাল ডি. গ্লেন ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু গবেষণা সংগ্রহ করে নতুন করে পর্যালোচনা করেছিলেন (৭০)। এবং তার বিশ্লেষণের উপসংহার ছিল, খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মীয় হোমোগ্যামির একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা আছে (প্রটেস্টান্টরা প্রটেস্টান্টদের এবং ক্যাথলিকরা কাথলিকদের সাধারণত বিয়ে করে থাকেন, যা বিশ্লেষণের ফলাফলে প্রত্যাশিত ‘বয় নেক্সট ডোর’ প্রভাবের পরিসংখ্যানগত দিক থেকেও অনেক বাড়তি) তবে ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে হোমোগ্যামির হার সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা হয়েছিল। জরিপটির বিবাহিত ৬২০১ জন উত্তরদাতাদের মধ্যে, ১৪০ জন ছিলেন যারা নিজেদের ইহুদী বলে পরিচয় দেন, তাদের ৮৫.৭ শতাংশই ইহুদী ধর্মাবলম্বী অন্য কাউকে বিয়ে করেছেন। পরিসংখ্যানগত সম্ভাবনা যতটা প্রত্যাশা করে, এমন স্বধর্মে বিয়ের হার থেকেও যা অনেক বেশি। অবশ্য বিষয়টি কারো কাছেই সেই অর্থে বিস্ময়কর কিছু মনে হয়নি। কারণ ধার্মিক ইহুদীদের অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিয়ে করতে বিশেষভাবেই নিরুৎসাহিত করা হয়। ইহুদীদের কৌতুকেও এই সামাজিক নিষেধাজ্ঞাটি লক্ষ করা যায়। যেখানে মায়ের তাদের ছেলেদের সাবধান করে দিচ্ছেন, সোনালী চুলের সুন্দরী নারীরা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে তাদের ধরতে, যুক্তরাষ্টের তিনজন রাবাই বা ইহুদী যাজকদের বৈশিষ্ট্যমূলক মন্তব্য:

- আমি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ পরিচালনা করতে অস্বীকৃতি জানাই।
- যদি দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের সন্তানকে ইহুদী হিসাবে প্রতিপালন করবেন, সেই ক্ষেত্রে আমি বিবাহ পরিচালনা করি।
- যদি সেই দম্পতি বিবাহ পূর্ব পরামর্শ গ্রহন করতে রাজি হয়, কেবল তখনই আমি সেই বিবাহ পরিচালনা করতে রাজি হই।

একজন খ্রিস্টীয় যাজকের সাথে একত্রে কোনো বিয়ে পরিচালনা করার মত রাবাই খুবই দুষ্প্রাপ্য, এবং তার চাহিদাও অনেক বেশি।

এমনকি যদি ধর্ম নিজে আর ক্ষতি নাও করে, এর স্বেচ্ছাচারী আর সুকৌশলে প্রতিপালিত বিভেদসৃষ্টিকর বৈশিষ্ট্যটি - অন্তঃগোত্রীয়দের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আর বহিঃগোত্রীয়দের পরিহার করার মানবজাতির স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে এর পরিকল্পিত

আর চর্চিত উৎসাহ প্রদান - পৃথিবীতে এটিকে উল্লেখযোগ্য একটি অশুভ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট।

মোরাল ‘জাইটগাইস্ট’ : নৈতিকতার যুগধর্ম

যে বিষয়টি প্রদর্শন করে এই অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তা হলো, নৈতিকতার ভিত্তি - এমনকি আমাদের মধ্যে যারা ধার্মিক – হিসেবে আমরা কোনো পবিত্র গ্রন্থের উপর নির্ভরশীল নই, আমরা যতই সেটা কল্পনা করতে ভালোবাসি না কেন। তাহলে, কিভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই, কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল? আমরা যেভাবেই এই প্রশ্নটির উত্তর দেই না কেন, ভালো বা মন্দ বিবেচনা করে আমরা আসলে যা কিছু করছি সেই বিষয়ে অন্তত একটি ঐক্যমত আছে। যে ঐক্যমতটি বিস্ময়করভাবে সর্বজনীন,এবং ধর্মের সাথে এই ঐক্যমতের সুস্পষ্ট কোনো সম্পর্ক নেই। যদিও ধার্মিকদের ক্ষেত্রেও এটি সম্প্রসারিত করা সম্ভব, তাদের নৈতিকতা ধর্ম থেকে এসেছে কিংবা আসেনি, সেই বিষয়ে তারা যা-ই ভাবুন না কেন। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম অবশ্য যেমন, আফগান তালিবান এবং তাদের সমতূল্য যুক্তরাষ্ট্রের উগ্রবাদী খিস্টানরা ছাড়া, অধিকাংশই উদার নৈতিকতার মূলনীতিগুলোর সাথে অন্ততপক্ষে মৌখিকভাবে তাদের সমর্থন প্রদান করেন। আমরা অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় কোনো দুর্ভোগের কারণ নই, স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকারে আমরা দ্বিমত পোষণ করি না, এবং সেই অধিকারটিকে রক্ষা করাকে জরুরী মনে করি, এমনকি যখন সেই বিষয়ে আমাদের মতভেদ আছে। আমরা রাষ্ট্রীয় কর প্রদান করি, প্রতারণা করি না, হত্যা করি না, অজাচারে লিপ্ত নই, এমন কিছু অন্য কারো সাথেই করি না, আমরা চাই না অন্যরাও আমাদের সাথে তা করুক। এই ভালো নৈতিক মূলনীতি পবিত্র গ্রন্থেও পাওয়া যাবে, তবে সেগুলো লুকিয়ে আছে আরো অনেক কিছুর সাথে, যা কোনো ভদ্র সুশীল মানুষের পক্ষে মেনে নেয়া অসম্ভব। পবিত্র কোনো গ্রন্থই আমাদের এমন কোনো নিয়ম নীতি বাতলে দেয় না, যা দিয়ে আমরা খারাপ কোনো নীতির সাথে ভালো নীতির পার্থক্য করতে পারি।

আমাদের ঐক্যমতের মূলনীতিগুলো প্রকাশ করার একটি উপায় হচ্ছে নুতন বা নিউ টেন কম্যান্ডমেন্টস; বেশ কিছু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এটি করার প্রচেষ্টা করেছেন। আর উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হচ্ছে প্রায় সবাই মোটামুটি একই রকম ফলাফলে পৌঁছেছিলেন। তারা যা তৈরি করেছিলেন, সেটি তাদের সময়ের নৈতিকতার প্রতিচ্ছবি, তারা যে যুগে বেঁচে ছিলেন সেই সময়ের জন্য বৈশিষ্ট্যসূচক। নীচে আমি এই যুগের টেন কম্যান্ডমেন্টের (বা দশ নির্দেশনা) এর একটি সেট উল্লেখ করলাম, যা একটি নিরীশ্বরবাদীদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে:

- অন্য কারো সাথে এমন কোনো আচরণ করা থেকে বিরত থাকুন, যে আচরণ আপনি অন্য কারো কাছে প্রত্যাশা করেন না।
- যে-কোনো কাজে, আন্তরিকভাবে সবসময় চেষ্টা করুন কোনো ক্ষতি না করতে।
- সকল মানুষ, জীবিত প্রাণী এবং সাধারণভাবেই পুরো পৃথিবীর সবকিছুর সাথেই ভালোবাসা, সততা, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করুন।
- কখনো অন্যায় কিছু দেখলে উপেক্ষা করবেন না, বা ন্যায়বিচার করা থেকে কখনো পিছিয়ে আসবেন না, কিন্তু কোনো খারাপ কাজের জন্য অবলীলায় আন্তরিকভাবে দোষ স্বীকার এবং সততার সাথে করা কোনো অনুশোচনা ক্ষমা করে দেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকবেন ।
- জীবনে বাঁচুন আনন্দ আর অসীম বিস্ময়ের অনুভূতি নিয়ে।
- সবসময় চেষ্টা করুন নতুন কিছু শেখার জন্য।
- সবকিছু যাচাই করুন, বাস্তব সত্যের সাথে সব সময় আপনার নিজস্ব ধারণাগুলোকে যাচাই করে দেখুন, দীর্ঘদিন ধরে লালন করা কোনো বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকুন, যদি বাস্তব সত্য ও প্রমাণের সাথে তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- কখনোই কাউকে বাঁধা দেবার চেষ্টা বা ভিন্ন মত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেবেন না, সবসময় অন্যদের আপনার সাথে একমত না হবার অধিকারকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন।
- আপনার নিজস্ব যুক্তি এবং অভিজ্ঞতাগুলোকে ভিত্তি করে আপনার নিজস্ব মতামত গড়ে তুলুন, অন্যদের অন্ধভাবে অনুসরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
- সবকিছুকেই প্রশ্ন করুন।

এই ক্ষুদ্র তালিকাটি কোনো মহান জ্ঞানী সাধু বা নবী বা পেশাজীবী কোনো নৈতিকতা বিশেষজ্ঞের লেখা নয়। খুব সাধারণ একজন ওয়েব ব্লগার হচ্ছেন এর রচয়িতা, বর্তমান যুগে একটি সুন্দর নৈতিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলনীতিগুলোকে সার সংক্ষেপ করে প্রকাশ করা আন্তরিক প্রচেষ্টা। একটি সার্চ ইঞ্জিনে নিউ টেন কমাণ্ডমেন্ট টাইপ করে আমি এটাই খুঁজে পেয়েছিলাম প্রথম, এবং ইচ্ছা করেই আমিও আর খুঁজিনি। মূল বিষয়টি হলো, এই ধরনের কোনো তালিকা যে-কোনো সাধারণ, ভদ্র মানুষই তৈরি করবেন, সবাই যদিও ঠিক একই দশটির তালিকা করবেন না। দার্শনিক জন রলস(৭১) হয়তো এমন কিছু যোগ করতে পারেন এই তালিকায়: 'সবসময় নিজের নিয়ম এমনভাবে তৈরি করে নিন যেন আপনার জানা নেই, সামাজিক প্রাধান্যপরম্পরার স্তর বিন্যাসে আপনার অবস্থান কোথায়'। ইনুইটদের (৭২) একটি সামাজিক প্রথা, খাদ্য ভাগাভাগি করে নেবার একটি পদ্ধতি আছে যা রলজের এই নীতিটির বাস্তবসম্মত একটি

উদাহরণ হতে পারে: যে ব্যক্তিট খাদ্য কেটে ভাগাভাগি করে, সে সবচেয়ে শেষে তার অংশটি পছন্দ করার সুযোগ পায়।

আমার নিজের সংশোধিত টেন কম্যান্ডমেন্টসে উপরের তালিকা থেকে বেশ কয়টি নির্বাচন করবো এবং আরো কয়েকটি যোগ করার চেষ্টা করবো:

- আপনার যৌন জীবন উপভোগ করার চেষ্টা করুন (যতক্ষণ এটি অন্য কারো ক্ষতি করছে না) এবং অন্যদের তাদের জীবন উপভোগ করতে দিন, ব্যক্তিগতভাবে তাদের যে ধরনের পছন্দ থাকুক না কেন - যা আপনার চিন্তার কোনো বিষয় নয়।
- লিঙ্গ, বর্ণ (এবং যতটুকু সম্ভব) প্রজাতির উপর ভিত্তি করে কাউকে নির্যাতন বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা থেকে বিরত থাকুন।
- আপনার শিশুদের কোনো মতবাদে দীক্ষিত করার থেকে বিরত থাকুন, তাদেরকে শেখান, কিভাবে নিজে থেকে চিন্তা করতে হবে, উপস্থিত সব প্রমাণগুলোকে কিভাবে মুল্যায়ন করতে হবে, এবং তাদের শেখান কিভাবে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে হবে।
- ভবিষ্যতকে মূল্য দিন, আপনার নিজের জীবনের সময়কালের চেয়ে বেশি।

কোনোটি অগ্রাধিকার পাচ্ছে সেই ছোটোখাটো বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, মূল কথা হলো আমরা সবাই প্রায় সামনের দিকে এগিয়ে গেছি এবং বাইবেলে বর্ণিত সেই সময় থেকে এই অগ্রসর হবার পরিমাণও অনেক বিশাল। দাসত্ব, যা বাইবেলে এবং ইতিহাসের প্রায় পুরো সময় ধরেই স্বাভাবিক একটি বিষয় হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে, সভ্য সব দেশ থেকেই তা বিলুপ্ত করা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। প্রায় সব সভ্য দেশই স্বীকার করে নিয়েছে যা কিনা ১৯২০ সাল পর্যন্ত সর্বজনীনভাবে অস্বীকৃত ছিল.. ভোটাধিকার বা জুরি হিসাবে দ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নারীদেরও পুরুষের সমান অধিকার আছে। আজকের যুগে অগ্রসর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত সমাজে বা কোনো সভ্য দেশেই (যে শ্রেণীতে অবশ্যই কিছু দেশ, যেমন সৌদি আরব অন্তর্ভুক্ত নয়) নারীদের আর সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করা হয় না, বাইবেলে বর্ণিত সময়ে স্পষ্টতই যেভাবে তাদের বিবেচনা করা হতো। যে-কোনো আধুনিক আইন ও আদালত শিশু নির্যাতনের জন্য আব্রাহামকে বিচারের কাঠগড়ায় দাড় করাতো এবং যদি সে আসলেই আইজাককে উৎসর্গ করার পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত কার্যকর করতো, তাহলে প্রথম ডিগ্রির মানব হত্যার জন্য তার বিচার হতো। কিন্তু তার সময়ের নৈতিকতায়, তার আচরণ পুরোপুরিভাবে প্রশংসার দাবীদার, কারণ ঈশ্বরের নির্দেশ মোতাবেক তিনি সেই কাজ করেছিলেন। ধার্মিক কিংবা নিধার্মিক, যা-ই হই না কেন, আমরা সবাই কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল সে সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে বদলে

গেছি। আর এই পরিবর্তনের প্রকৃতি আসলেই কি, আর এটিকে পরিচালিত করছেই বা কি?

যে-কোনো সমাজেই খানিকটা রহস্যময় একধরনের ঐক্যমতের অস্তিত্ব আছে, যা কয়েক দশকের সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হয়, এবং যার জন্য একটি ধার করা জার্মান শব্দ ‘জাইটগাইস্ট’ ব্যবহার করা খুব একটা বাড়াবাড়ি হবে বলে মনে হয় না, শব্দটির অর্থ ‘স্পিরিট অব দ্য টাইম’ বা যুগধর্ম। আমি বলেছিলাম নারীদের ভোটাধিকার এখন পৃথিবীর যে-কোনো গণতন্ত্রে সর্বজনীন। তবে এই সংশোধনমূলক সংস্কার বেশ সাম্প্রতিক একটি অর্জন। নীচে কিছু সময়কাল দেয়া হলো বিভিন্ন দেশের নারীরা যখন তাদের ভোটাধিকার অর্জন করেছিলেন:

নিউ জিল্যান্ড (১৮৯৩), অস্ট্রেলিয়া (১৯০২), ফিনল্যান্ড (১৯০৬), নরওয়ে (১৯১৩), যুক্তরাষ্ট্র (১৯০৬), ব্রিটেইন (১৯২৮), ফ্রান্স (১৯৪৫), বেলজিয়াম (১৯৪৬), সুইজারল্যান্ড (১৯৭১), কুয়েত (২০০৬)।

বিংশ-শতাব্দী বিস্তৃত এই সময়কালগুলো ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকা যুগধর্মের একটি পরিমাপক। আরেকটি উদাহরণ হলো জাতি বা বর্ণ নিয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আজকের মানদণ্ডে বিচার করলে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ব্রিটেনের সবাইকে (এবং অন্য অনেক দেশের ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) বর্ণবাদী হিসাবে বিবেচনা করা যেত। প্রায় অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ বা সাদা চামড়ার ব্যক্তিরা বিশ্বাস করতেন যে, কালো চামড়া অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গরা (যে শ্রেণীতে তারা ভীষণ বৈচিত্র্যময় আফ্রিকাবাসী, এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন, যেমন ভারতীয়, অস্ট্রেলীয় এবং মেলানেশিয়া দ্বীপবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন) তাদের তুলনায় সবদিক থেকেই নিম্নস্তরের শুধুমাত্র নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে জাহির করার লক্ষ্যে তাদের ছন্দজ্ঞান ছাড়া। ১৯২০ সালে জেমস বন্ড সমতূল্য অনেকের শৈশবের হিরো ছিলেন কেতাদূরস্ত বুলডগ ড্রামন্ড। ‘দ্য ব্ল্যাক গ্যাং অ্যান্ড ড্রামন্ড’ উপন্যাসে তিনি ‘ইহুদী বিদেশী এবং অন্যান্য অপরিষ্কার মানুষের’ কথা উল্লেখ করেছিলেন। ‘দ্য ফিমেল অব দি স্পিসিস’ উপন্যাসটির চূড়ান্ত দৃশ্যে ড্রামন্ড খুব ধূর্ততায় প্রধান খলনায়কের কৃষ্ণাঙ্গ চাকর পেড্রো হিসাবে নিজেকে ছদ্মবেশে সাজিয়ে ছিলেন। পাঠক এবং খলনায়কের কাছে নিজের নাটকীয় আত্মপ্রকাশের সময়, অর্থাৎ পেড্রো যে আসলে ড্রামন্ড নিজেই, তিনি কিন্তু বলতে পারতেন, ‘তুমি ভেবেছো আমি পেড্রো, কিন্তু তুমি বুঝতে পারোনি, আমি তোমার প্রধান শত্রু ড্রামন্ড, কালো রং মেখেছি’। এর পরিবর্তে তিনি এই শব্দগুলো বাছাই করেছিলেন, “সব দাড়ি মিথ্যা নয়, কিন্তু সব নিগ্রোদের গায়ে গন্ধ আছে। এই দাড়ি মিথ্যা নয় আর এই নিগ্রোর গায়েও কোনো গন্ধ নেই। সুতরাং আমি ভাবছি কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই কিছু গণ্ডগোল আছে’। আমি এটি পড়েছি ১৯৫০ এর দশকে, প্রায় এটি লেখার তিন দশক পর, এবং তখনো অবধি কোনো

কিশোর (কোনোমতে) নাটকীয়তা এবং বর্ণবাদের দিকে নজর না দিয়ে এই বই পড়ে শিহরিত হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু এই যুগে তা অকল্পনীয়।

টমাস হেনরি হাক্সলি (৭৩) তার সময়ের মানদণ্ডে একজন প্রগতিশীল, উদারপন্থী মানুষ; কিন্তু তার সময় আমাদের সময় নয়; এবং ১৮৭১ সালে তিনি লিখেছিলেন (৭৪):

> কোনো যুক্তিশীল মানুষ, বাস্তব সত্য সম্বন্ধে যিনি অবগত, বিশ্বাস করেন যে, গড়পড়তা একজন কৃষ্ণাঙ্গ একজন শেতাঙ্গের সমতূল্য, কিংবা আরো অসম্ভব, তার তুলনায় উত্তম হতে পারে। এবং যদি এটি সত্য হয়, স্পষ্টতই এটি অবিশ্বাস্য যে, যখন তার সমস্ত অক্ষমতা অপসারণ করা হয় এবং আমাদের প্রোগন্যাথাস (যাদের চোয়াল সামনের দিকে বেশি বেরিয়ে থাকে) স্বজনরা যদি পক্ষপাতিত্ব ছাড়া সমপরিমান সুযোগ পায়, এবং সেই সাথে যদি কোনো নিপীড়ক না থাকে, তাহলে সফলতার সাথে সে তার চেয়ে বৃহত্তর-মস্তিষ্ক ও ক্ষুদ্রাকার চোয়াল বিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে এমন কোনো প্রতিযোগিতায়, যেখানে কামড় নয়, বরং চিন্তার লড়াই হবে। সভ্যতার প্রাধান্যপরম্পরায় সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি নিশ্চিৎভাবে আমাদের গাঢ় চামড়ার স্বজনদের নাগালের অনেক বাইরে।

সাধারণত ভালো ঐতিহাসিকরা অতীতের কোনো বক্তব্যকে তাদের নিজস্ব সময়ের মানদণ্ডে বিচার করেন না। আব্রাহাম লিঙ্কন(৭৫), হাক্সলির মতোই, তার সময়ের তুলনায় অনেক অগ্রসর ছিলেন; কিন্তু বর্ণ সংক্রান্ত বিষয়ে তার মতামত আমাদের সময়ের তুলনায় বর্ণবাদী মনে হতে পারে। ১৮৫৮ সালে স্টিফেন এ. ডগলাসের সাথে তার বিতর্কের কিছু অংশ পড়া যাক:

> আমি বলবো, আমি এখন কিংবা কখনো কোনোভাবেই শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ, এই দুটি বর্ণের মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমতা আনার লক্ষ্যে কোনো পরিবর্তনের পক্ষে ছিলাম না। এবং আমি এখন কিংবা কখনো কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার বা জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অধিকার দেবার পক্ষে ছিলাম না। এছাড়া তাদের উপর কোনো প্রতিনিধিত্বশীল দায়িত্ব ন্যস্ত করা এবং শ্বেতাঙ্গদের সাথে তাদের অসবর্ণ বিবাহেও সমর্থন করি না। এবং উপরন্তু আমি বলবো, সাদা ও কালো বর্ণের মানুষদের মধ্যে শারীরিক পার্থক্য আছে, যা আমি বিশ্বাস করি, সবসময়ই দুটি জাতিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক সমতায় বাস করা থেকে বিরত রাখবে। এবং যেহেতু তারা এভাবে বসবাস করতে পারবে না, সুতরাং যতক্ষণ তারা সহাবস্থান করবে, উর্ধতন এবং অধস্তন এই দুটি অবস্থান অবশ্যই থাকতে হবে; এবং আমি অন্য

যে কারোর মতোই এই উর্ধতন অবস্থানটি শ্বেতাঙ্গ বর্ণের ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট করার পক্ষে (৭৬)।

যদি হাক্সলি এবং লিংকন আমাদের সময়ে জন্মগ্রহন করতেন, ও শিক্ষিত হতেন, বাকি সবার সাথে আমাদের মধ্য হয়তো তারাই প্রথম নিজেদের ভিক্টোরিয় ভাবনা আর নৈতিকতায় ভারাক্রান্ত কৃত্রিম ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠ শুনে ঘৃণায় কুকড়ে উঠতেন। আমি তাদের উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম শুধু বোঝাতে যে, কিভাবে আসলে যুগে যুগে কালক্রমে নৈতিকতার যুগধর্ম বা জাইটগাইষ্ট সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। যদি হাক্সলি, যিনি তার সময়ের অন্যতম সেরা উদারপন্থী মানুষ ছিলেন এবং লিঙ্কন, যিনি দাসদের মুক্ত করেছিলেন, এই ধরনের কথা বলতে পারেন, তাহলে চিন্তা করে দেখুন গড়পড়তা ভিক্টোরিয় যুগের মানুষরা কি ভাবতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে গেলে, অবশ্যই সবার জানা যে, ওয়াশিংটন, জেফারসন এবং জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত যুগের প্রগতিশীল মানুষরা প্রত্যেকেই ক্রীতদাসের মালিক ছিলেন। ক্রমাগত বিরতিহীন জাইটগাইস্ট অগ্রসর হয়েছে, আমরা অনেক সময় বিষয়গুলোকে খুব স্বাভাবিক ধরে নেই এবং ভুলে যাই যে পরিবর্তন এর নিজের যোগ্যতায় আসলেই বিস্ময়কর একটি বাস্তব ঘটনা।

আরো অগণিত উদাহরণ আছে, যখন প্রথম নাবিকরা মরিশাস দ্বীপে পা রেখেছিলেন, এবং নিরীহ ডোডো পাখি দেখেছিলেন, শুধুমাত্র পাখিগুলোকে পিটিয়ে মারা ছাড়া তাদের কাছে আর কিছু মনে হয়নি। তারা এমনকি খাবারের জন্যেও হত্যা করেনি (খাবার অনুপোযুক্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে)। স্পষ্টতই এই নিরীহ আত্মরক্ষায় অক্ষম, সহজে পোষ মানানো যায়, উড়তে অক্ষম পাখীদের মাথায় বাড়ি দিয়ে হত্যা করা তাদের জন্য কোনো কিছু করার মত কাজ ছিল হয়তো। আজকের যুগে এমন ব্যবহার অকল্পনীয়, ডোডোর মত কোনো আধুনিক সমতূল্য প্রাণীর বিলুপ্তি, এমনকি কোনো দুর্ঘটনায় যদি তা ঘটে থাকে, বা ইচ্ছামূলকভাবে মানুষের দ্বারা হলে তো বটেই, তাকে ট্রাজেডি হিসাবে গণ্য করা হয়।

তাসমানিয়ান উলফদের বিলুপ্তি হবার ঘটনাটিকে বর্তমান সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে এরকম একটি ট্রাজেডী বলা যেতে পারে। বর্তমানে তাদের অবলুপ্তি নিয়ে বিলাপ করা হয় অথচ ১৯০৯ সাল পর্যন্ত এদের হত্যার জন্য মোটা অঙ্কের পুরষ্কারের ব্যবস্থা ছিল। আফ্রিকাকে নিয়ে ভিক্টোরিয় যুগের উপন্যাসে ‘হাতি’, ’সিংহ’ এবং ’অ্যান্টিলোপ’ (বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এখানে একবচনের ব্যবহার লক্ষ করুন) ছিল ‘গেম’ বা শিকার করার উপযুক্ত প্রাণী। এবং এদের সাথে কি করা হতো তখন? দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে গুলি করে তাদের হত্যা করা হতো।এই হত্যা খাদ্য কিংবা আত্মরক্ষার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র বন্য পশু শিকার করার রোমাঞ্চ অনুভব করতে। কিন্তু সেই যুগধর্মও এখন বদলে গেছে। স্বীকার করতে হবে, এখনো ধনবান ব্যক্তিরা, সাধারণত আসনাশ্রিত জীবনযাপনে

অভ্যস্ত শিকারীরা তাদের ল্যান্ডরোভার গাড়ির মধ্য নিরাপদে বসে থেকে এখনো হয়তো আফ্রিকার প্রাণীদের হত্যা করতে পারেন, এবং তাদের সংরক্ষণ করা মাথা নিয়ে বাড়িও ফিরতে পারেন। কিন্তু এমন কিছু করার জন্য তাদের চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়, এবং নির্বিচারে তারা সবার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, এবং পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি একই নৈতিকতার গ্রহনযোগ্য একটি অবস্থানে পরিণত হয়েছে, একসময় যেভাবে সাবাথের পবিত্রতা রক্ষা, কিংবা মূর্তি পূজা না করার কাজটিকে যেভাবে নৈতিক অবস্থান হিসাবে গণ্য করা হতো।

যদিও উত্তাল উন্মুক্ত ষাটের দশক তারুণ্য আর উদারপন্থী আধুনিকতার জন্য কিংবদন্তীসম, কিন্তু সেই দশকের শুরুতে 'লেডি চ্যাটারলিস লাভার' (৭৭) বইটির অশ্লীলতার বিরুদ্ধে করা মামলার সময় তখনো আইনজীবীরা জুরিদের জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, 'আপনারা কি আপনাদের অল্পবয়সী পুত্র, কন্যাদের এই বই পড়তে সম্মতি দেবেন, কারণ ছেলেদের মত মেয়েরাও পড়তে পারে (আপনি কি বিশ্বাস করতে পারেন, তিনি সত্যি এই কথা বলেছেন),? এমন কোনো বইকে কি আপনার ঘরে জায়গা দেবেন? এই বইটাকে এমনকি আপনি আপনার স্ত্রী কিংবা চাকরদের পড়ার অনুমতি দেবেন? ' তার শেষ প্রশ্নটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ, যা প্রদর্শন করছে কত দ্রুত যুগের ধর্মের বা জাইটগাইষ্টের পরিবর্তন হয়েছে।

ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে সাধারণ মানুষ হতাহত হবার কারণে সর্বব্যাপী নিন্দিত হয়েছে অথচ এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর সংখ্যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের সংখ্যার তুলনায় বহু গুণে কম ছিল। নৈতিকভাবে কোনটি গ্রহনযোগ্য তার মানদণ্ডটি আপাতদৃষ্টিতে ক্রমান্বয়ে স্থির একটি গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ডোন্যাল্ড রামসফেল্ডের কথা আজ এত অসহ্য আর অসংবেদশীল মনে হয়, অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তার এই বক্তব্যগুলো শুনতে অতি সংবেদনশীল, পরের দুঃখে কাতর বা 'ব্লিডিং হার্ট' উদারপন্থী বলেই মনে হোত। মধ্যবর্তী দশকগুলোয় কিছু পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের সবার মধ্যেও সেই পরিবর্তন এসেছে; এবং এই পরিবর্তনের কারণ ধর্ম নয়, ধর্ম ছাড়াই এটাই ঘটেছে, ধর্মের কারণে নয়।

আর এই পরিবর্তনে একটি স্থিতিশীল দিকও শনাক্ত করা সম্ভব, যা আমরা বেশির ভাগ মানুষই উন্নতি হিসাবে চিহ্নিত করবো। এমনকি অ্যাডলফ হিটলার, ব্যাপকভাবে মানুষের ধারণায় যে ব্যক্তিকে চূড়ান্ত অশুভ বলা হয়, এবং যিনি অজানা একটি জগতের দিকে পৃথিবীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনিও ক্যালিগুলা(৭৮) বা গেনজিস খানের (৭৯) সময়ে সংঘটিত নিষ্ঠুরতায় আদৌ উল্লেখযোগ্য কিছু হবার যোগ্য হতেন না। কোনো সন্দেহ নেই হিটলার, গেনজিস খানের চেয়ে বেশি মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিলেন, কিন্তু তার কাছে সেটি করার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি ছিল। এবং হিটলারও

একইভাবে আনন্দ পেতেন, যেভাবে গেনজিস খান স্বীকার করেছিলেন, তিনি যাদের হত্যা করেন, তাদের 'কাছের আর প্রিয় মানুষদের অশ্রুসিক্ত' দেখা তার তীব্রতম আনন্দের একটি কাজ ছিল। আমরা হিটলারের অশুভ কাজের মাত্রার পরিমাপ করি আজকের এই যুগের মানদণ্ডে, আর নৈতিকতার যুগধর্ম সেই ক্যালিগুলার সময় থেকে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, ঠিক যেমন করে প্রযুক্তিও এগিয়েছে, আমাদের সময়ের মানদণ্ডেই হিটলারকে বিশেষভাবে অশুভ একটি চরিত্র মনে হয়।

আমার জীবনকালেই, অনেকেই ভাবনা-চিন্তা না করেই অবজ্ঞা আর অপমানসূচক নাম এবং জাতীয় স্টেরিওটাইপগুলো বিনিময় করেছে: ফ্রগ, ওয়াপ, ডাগো, হান, ইড, কুন, নিপ, ওয়াগ ইত্যাদি। আমি দাবী করছি না যে এই ধরনের শব্দগুলো ভাষা থেকে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু ভদ্র সভ্য মানুষের স্তরে এই ধরনের শব্দগুলো ব্যাপকভাবে নিন্দনীয়। 'নিগ্রো' শব্দটি, যদিও ব্যবহৃত হতে শুরু হয় অপমানসূচক শব্দ হিসাবে নয়, তবে শব্দটির উপস্থিতি দিয়ে যে-কোনো ইংরেজী গদ্যের লেখার সময়কাল নির্ধারণ করা যেতে পারে। নানা ধরনের পূর্বসংস্কারের উপস্থিতি আসলেই কোনো লেখার সময়কাল সমন্ধে ধারণা দিতে পারে। তার নিজের সময় কেমব্রিজের একজন শ্রদ্ধেয় ধর্মতত্ত্ববিদ এ. সি. বুকে তার 'কমপ্যারেটিভ রেলিজিয়ন' বইটিতে ইসলামের উপর তার অধ্যায়টি এভাবে শুরু করতে পারতেন, সেমাইট বা আরব স্বাভাবিকভাবে একেশ্বরবাদী না, উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে যা ভাবা হতো, সে আসলে অ্যানিমিষ্ট বা সর্বপ্রাণ মতবাদী' (৮০)। সংস্কৃতির ব্যতিক্রম বর্ণ বা জাত নিয়ে এই বাহুল্যতা এবং সুস্পষ্টভাবে একবচনের ব্যবহার, 'সেমাইট, সে সর্বপ্রাণবাদী', যা সমগ্র জাতির বহুত্বতাকে কেবল একটি টাইপে বা বৈশিষ্ট্যসূচক প্রকারে এনে সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা হয়তো কোনো মানদণ্ডে চূড়ান্ত ঘৃণ্য নয়, তবে সেগুলো পরিবর্তিত হতে থাকা যুগধর্মের ক্ষুদ্রতর সূচক। কেমব্রিজের ধর্মতত্ত্ব বা অন্য যে কোনো বিষয়ের কোনো অধ্যাপক আজ আর এই শব্দগুলো ব্যবহার করবেন না; পরিবর্তিত হতে থাকা নৈতিকতার যুগধর্মের এই সূক্ষ্ম আভাসগুলো আমাদের বলছে তার এই লেখাটি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো সময়েরও আগে লিখেছিলেন, এবং আসলে সেই সময়কাল ছিল ১৯৪১ সাল।

আরো চার দশক পেছনে দিকে যান, এই পরিবর্তিত মানদণ্ড আরো নির্ভুলভাবে দৃশ্যমান হবে। এর আগের একটি বইয়ে আমি এইচ. জি. ওয়েলসের (৮১) ইউটোপিয়ান (৮২) 'নিউ রিপাবলিক' থেকে কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলাম; আমি আবারও তা করবো কারণ এটি আমি যা বলতে চাচ্ছি এটি তার একটি হতবাক করার মতোই দৃষ্টান্ত হতে পারে:

> এবং এই নিউ রিপাবলিক কিভাবে অধস্তন বর্ণের সদস্যদের সাথে আচরণ করবে? কেমনভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের সাথে এটি আচরণ করবে? ..কিংবা পীত বর্ণের মানুষদের সাথে? ..এবং ইহুদীদের সাথে? এই সব কালো,বাদামী, ময়লা সাদা আর পীত বর্ণের মানুষদের দঙ্গল, নতুন দায়িত্ব পালনের দক্ষতায় যারা কোনো কাজে আসবে না? বেশ, পৃথিবী হচ্ছে পৃথিবী, এটি কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয় এবং আমি ধরে নিচ্ছি তাদের সেখানে কোনো জায়গা নেই, সেখান থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে - এবং সেই সাথে নতুন রিপাবলিক থেকে এই সব মানুষদের নৈতিক পদ্ধতিগুলোকেও বিদায় নিতে হবে। বিশ্বব্যাপী যে নৈতিকতার পদ্ধতিটি প্রাধান্য বিস্তার করবে, তা গঠন করা হবে মূলত মানবতার মধ্যে যা কিছু সুন্দর, ভালো এবং কর্মক্ষম, সুগঠিত বলবান শরীর এবং স্পষ্ট ও শক্তিশালী মন সৃষ্টি করার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবার লক্ষ্যে। এবং এই পৃথিবীকে সেই রূপ দেবার লক্ষ্যে প্রকৃতি এতদিন যে প্রক্রিয়ায় কাজ করে এসেছে, যেখানে কোনো দুর্বলতা প্রতিহত করা হয় আরো দুর্বলতার জন্ম দেয়া থেকে .. তা হচ্ছে মৃত্যু। নতুন রিপাবলিকে মানুষদের এমন একটি আদর্শ থাকবে যা এই লক্ষ্যে কোনো হত্যাকে অর্থবহ করে তুলবে।

এটা লেখা হয়েছিল ১৯০২ সালে, এবং ওয়েলসকে সেই সময়ে প্রগতিশীল গণ্য করা হতো। ১৯০২ সালে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা মনোভাব, যদিও ব্যাপকভাবে সমর্থিত ছিল না, তাসত্ত্বেও রাতের ভোজসভায় তর্কের বিষয় হিসাবে তখনো সহনীয় ও গ্রহনযোগ্য ছিল। আধুনিক পাঠকরা এর ব্যতিক্রম, আক্ষরিক অর্থেই এই ধরনের কোনো লেখা পড়লে হতবাক হয়ে পড়বেন। আমরা অনুধাবন করতে বাধ্য হবো, হিটলার যদিও জঘন্য ছিলেন, তাসত্ত্বেও তিনি কিন্তু তার সময়ের জাইটগাইষ্টের বাইরে ছিলেন না পুরোপুরি, আমাদের অবস্থান থেকে তাকে এখন যেমন মনে হয়। কত দ্রুত যুগের ধর্ম বদলে যায়। প্রশস্ত একটি পরিধি নিয়ে সমান্তরালে সমস্ত শিক্ষিত পৃথিবীতে এটি সঞ্চারিত হয়।

তাহলে কোথা থেকে সামাজিক চেতনায় সম্মিলিত আর স্থির গতিতে হতে থাকা এই সব পরিবর্তনগুলোর সূচনা হতে থাকে? এর উত্তর দেবার দায়ভার আমার উপরে ন্যস্ত নয়; আমার উদ্দেশ্য পূরণে এটুকু যথেষ্ট, নিশ্চয়ই এই পরিবর্তন ধর্ম থেকে আসে না। যদি কোনো একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করতে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়, আমি বিষয়টি নিয়ে এভাবে অগ্রসর হতে চাই: আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, কেন এই পরিবর্তনশীল নৈতিক জাইটগাইষ্ট (যুগধর্ম) বিশ্বব্যাপী অগণিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সর্বজনীন একটি রূপ নিয়ে এত ব্যাপক এবং বিস্তৃত এলাকায় যুগপৎ সংঘটিত হয়। এবং এই পরিবর্তনের স্থির দিকও আমাদের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমত, এত অসংখ্য মানুষের মধ্যে কিভাবে এটি সমকালীন হয়? এটি একটি মন থেকে অন্য একটি মনে বিস্তার লাভ করে বিভিন্ন কথপোকথন (পানশালা কিংবা রাতের খাবারের সময় আলোচনায়), বই ও বই পর্যালোচনা, খবরের কাগজ বা টিভি সম্প্রচার, এবং বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। নৈতিকতার পরিবেশ পরিবর্তনের সংকেত পাওয়া যায় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে, বেতার সংলাপে, রাজনৈতিক বক্তৃতায়, কিংবা কমেডিয়ানদের কৌতুক নকশায়, সোপ অপেরার সংলাপে, পার্লামেন্টে ভোটের মাধ্যমে আইন বানানোর প্রক্রিয়ায় এবং আইন ব্যাখ্যা করে বিচারকের প্রদত্ত সিদ্ধান্তে। একভাবে এটিকে বলা যায় মিম পুলে মিমের হারের রদবদলের মাধ্যমে, কিন্তু সেই বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না এখন।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পরিবর্তিত নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্মের অগ্রসরমান ঢেউয়ের খানিকটা পেছনে পড়ে আছেন, আবার কেউ সেখানে বেশ খানিকটা এগিয়ে আছেন। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে আমরা অধিংকাংশ প্রায় একই জায়গায় দলবেধে অবস্থান করছি, যা মধ্যযুগের আমাদের মত ব্যক্তিদের তুলনায়, কিংবা আব্রাহামের সেই সময় থেকে বা এই সাম্প্রতিক ১৯২০ সালের চেয়েও অনেক অগ্রসর একটি অবস্থান। পুরো পরিবর্তনের এই ঢেউটি সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং আগের শতাব্দীর সম্মুখ সারির ভ্যানগার্ড বা পথিকৃৎরা (টি. এইচ. হাক্সলি যেমন একটি স্পষ্ট উদাহরণ) পরবর্তী শতাব্দীর বহু পেছনে থাকা মানুষগুলোরও পেছনে অবস্থান করছেন। অবশ্যই এই অগ্রসর যাত্রা কখনোই মসৃণ উত্থান নয়, বরং আঁকাবাঁকা করাতের দাঁতের মত উঁচু নীচু। এছাড়া স্থানীয় এবং সাময়িক কিছু প্রতিবন্ধকতা কিংবা ব্যর্থতাও সেখানে আছে, যেমন ২০০০ এর প্রথম দশকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সরকারের দ্বারা যেভাবে এর যাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু সময়ের বড় পরিমাপে পরিবর্তনের প্রগতিশীল প্রবণতা সুস্পষ্ট এবং যা অব্যাহত থাকবেই।

এই স্থির দিক-নির্দেশনায় মদদ জোগাচ্ছে কোনো শক্তি? একক ব্যক্তি হিসাবে কিছু নেতাদের এর চালিকা শক্তি হিসাবে ভূমিকা রাখার কথা আমাদের অবশ্যই অবহেলা করা চলবে না, যারা তাদের সময়ের অনেক অগ্রসর ছিলেন। একটি নৈতিক অবস্থান গ্রহন করে যারা তাদের সাথে সামনে এগিয়ে যেতে অন্যদের প্রণোদনা যুগিয়েছেন: যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বর্ণ, শেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে বর্ণবৈষম্যের যুগে সমতার কথা লালন করেছেন মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের (৮৩) মত যোগ্য রাজনৈতিক নেতারা এবং বিনোদন ও ক্রীড়া জগতের অনেক সদস্যরা, যেমন, পল রোবসন (৮৪), সিডনি পোয়াটিয়ের (৮৫), জেসি ওয়েন্স (৮৬) এবং জ্যাকি রবিনসন (৮৭)। ক্রীতদাস আর নারীদের মুক্তি এবং অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মূল অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করেছেন অনেক অসাধারণ দক্ষ আর সৎ নেতানেত্রীরা। এই সব নেতৃত্ব দেয়া

ব্যক্তিদের মধ্যে যেমন ধার্মিক ছিলেন তেমন আবার কেউ আবার ধার্মিক ছিলেন না। যারা ধার্মিক ছিলেন তাদের কেউ ভালো কাজ করেছিলেন কারণ তারা ধার্মিক ছিলেন, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে ধর্ম শুধু ঘটনাচক্রে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। যদিও মার্টিন লুথার কিং খ্রিস্টান ছিলেন, তিনি তার অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক প্রত্যাখ্যান বা বয়কটের আন্দোলনের শিক্ষা নিয়েছিলেন সরাসরি মহাত্মা গান্ধী থেকে, যিনি খ্রিস্টান ছিলেন না।

তারপরও, উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, বিশেষত অন্য ধর্ম, বর্ণের ও লিঙ্গের সবাইকে সাথে নিয়ে আমাদের এই বিশ্বমানবতা, এই ধারণা সম্বন্ধে আমাদের বোধের আর জানার পরিধি বাড়ার বিষয়টির - এই দুটি গভীর, অনেকটাই নাড়ীর মত - মূল ধারণার উৎস ছিল জীববিজ্ঞান, বিশেষত বিবর্তন। কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী, আর নারীরা এবং নাৎসী জার্মানিতে ইহুদী আর জিপসীরা যে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল, তার একটি কারণ ছিল, তাদের পুরোপুরি মানুষ বিবেচনা করা হয়নি। দার্শনিক পিটার সিংগার তার 'অ্যানিমল লিবারেশন' বইটিতে সবচেয়ে সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিটির সমর্থন করে যে, আমাদের স্পেসিসইজম বা প্রজাতিবাদকে (প্রজাতির উপর নির্ভর করে মানুষের বৈষম্যমূলক খারাপ আচরণ বিশেষ করে যা প্রকাশ হয় বিভিন্ন প্রাণিদের অপব্যবহার ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনের মাধ্যমে) এর পরবর্তী যুগে প্রবেশ করতে হবে যেখানে সকল প্রজাতি ভালো আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে যাদের মস্তিষ্কের ক্ষমতা আছে, তাদের সাথে মানবিক আচরণ করতে হবে (৮৮)। হয়তো এটি আভাস দিচ্ছে ভবিষ্যতের শতাব্দীতে নৈতিকতার যুগধর্ম কোনো দিকে দিক বরাবর পরিবর্তিত হবে। প্রাকৃতিকভাবেই এটি আগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংশোধনমূলক সংস্কার, যেমন ক্রীতদাস প্রথার বিলুপ্তি এবং নারীদের মুক্তির মতোই একটি অবস্থান হবে।

আমার সৌখিন মনোবিজ্ঞান বা সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণেই আমাকে মেনে নিতে হবে যে আমার পক্ষে আর ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, কেন নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট এভাবে প্রশস্ততার ব্যাপ্তি নিয়ে একই সাথে সম্মিলিতভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আমার ব্যাখ্যার জন্য আপাতত এতটুকু যথেষ্ট যে, বিষয়টি বাস্তব সত্য, এটি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এটি ধর্ম দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না, এবং অবশ্যই ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে তো নয়ই। হয়তো এটিও মাধ্যাকর্ষণের মত কোনো একক শক্তি নয়, বরং জটিল বহুমাত্রিক শক্তিগুলো অন্তর্মিলনের একটি ফলাফল, যেমন সেই শক্তির মত যা মুরের সূত্রকে পরিচালিত করে, কম্পিউটারের ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধিকে ব্যাখ্যা করতে যে সূত্রটি প্রস্তাব করা হয়েছিল। এর কারণ যা-ই হোক না কেন, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত যুগধর্মের এই প্রপঞ্চটি ক্রমশ প্রগতি অভিমূখে অগ্রসর হবার বিষয়টি কিন্তু সেই দাবীটির ভিত্তি দুর্বল করার জন্য যথেষ্ট, যা প্রস্তাব করছে ভালো হবার জন্য, বা কোনোটা ভালো সেটি নির্ধারণ করতে আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে।

কেন হিটলার (৮৯) আর স্ট্যালিন (৯০)? তারা কি নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না?

জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্ম হয়তো অগ্রসর হচ্ছে, এবং সাধারণত এটি অগ্রসর হচ্ছে প্রগতিশীল একটি দিক বরাবর, কিন্তু আমি বলেছিলাম আঁকাবাঁকা উঁচু নীচু পথে এর উত্থান পতন, এবং বেশ কিছু ভয়ঙ্কর পশ্চাদপসরণের মত বিপর্যয়ের ঘটনাও ঘটেছে; উল্লেখযোগ বিপর্যয়গুলো, ভয়ঙ্কর সেই নৈতিকতার অধঃপতনের মূল কারণ বিংশ শতাব্দীর সব স্বৈরাচারী একনায়করা। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে হিটলার আর স্ট্যালিনের মত ব্যক্তিদের অশুভ উদ্দেশ্য এবং তাদের হাতে থাকা অসীম ক্ষমতাটিকে আগে পার্থক্য করতে হবে, যা দিয়ে তারা তাদের ইচ্ছা চরিতার্থ করেছিলেন। আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ করেছিল হিটলারের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলো স্বপ্রতীয়মানভাবে রোমের সম্রাট ক্যালিগুলা বা কয়েকজন ওটোমান সুলতানদের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যের তুলনায় বেশি অশুভ ছিল না, যাদের অকল্পনীয় নৃশংস আচরণের কাহিনী নোয়েল বারবারের (৯১) 'লর্ডস অব দ্য গোল্ডেন হর্ন' বইটি (৯২) বর্ণনা করেছে। হিটলারের হাতে বিংশ-শতাব্দীর অস্ত্র আর যোগাযোগের প্রযুক্তি ছিল, তাসত্ত্বেও কোনো সন্দেহ নেই হিটলার আর স্ট্যালিন দুজনেই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অশুভ প্রকৃতির ছিলেন।

হিটলার আর স্ট্যালিনতো নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, এই বিষয়ে আপনার কি বলার আছে? ধর্ম বিষয়ক আমার প্রতিটি বক্তৃতার পরে এবং অধিকাংশ বেতার সাক্ষাৎকারে পরে এই প্রশ্নটি আমাকে করা হয়েছে। খানিকটা আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে প্রশ্নটি আমাকে করা হয়ে থাকে, এবং যা ঘৃণ্যভাবে দুটি ধারণাকে বহন করে (এক) হিটলার ও স্ট্যালিন শুধু নাস্তিকই ছিলেন তা নয়, (দুই) তারা যে জঘন্য কাজগুলো করেছিল তার কারণ হচ্ছে তারা নাস্তিক ছিলেন। ধারণা (এক) স্ট্যালিনের ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু হিটলারের ব্যপারে বিষয়টির সত্যতা নিয়ে সুস্পষ্ট সংশয় আছে। কিন্তু ধারণাটি আর যা-ই হোক অপ্রাসঙ্গিক, কারণ ধারণা (দুই) হচ্ছে ভুল, মিথ্যা, এবং অবশ্যই অযৌক্তিক যদি চিন্তাটি (এক) নং ধারণা থেকে আসে। এমনকি যদি আমরা মেনেও নেই হিটলার আর স্ট্যালিন, এই দুই ব্যক্তিই নাস্তিক ছিলেন, তাদের দুজনেরও গোফ ছিল, যেমন সাদ্দাম হুসেন এরও ছিল। তাহলেই বা কি? গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি কিন্তু এটি নয় যে, খারাপ (অথবা ভালো) কোনো মানুষ ধার্মিক অথবা নাস্তিক কিনা। খারাপ লোকদের মাথা গুনে তাদের এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপে ভাগ করে তাদের খারাপ কাজের তালিকা করার কাজ আমাদের নয়। নাৎসিদের কোমর-বন্ধনীর বাকলে খোদাই করা, 'গট মিট উন্স'(ঈশ্বর আমাদের পক্ষে) এই সত্যটির কিছুই প্রমাণ করে না, অন্ততপক্ষে আরো অনেক দীর্ঘ একটি আলোচনা ছাড়া। হিটলার আর স্ট্যালিন নাস্তিক ছিলেন কিনা সেটি বিষয় না, বরং নাস্তিকতা পদ্ধতিগতভাবে মানুষকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করে কিনা সেটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং

সামান্যতম কোনো প্রমাণই নেই যা কিনা সমর্থন করে যে, নাস্তিকতা কাউকে খারাপ কাজ করতে প্রভাবিত করে।

সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, আসলেই স্ট্যালিন একজন নাস্তিক ছিলেন। তিনি তার শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছেন অর্থোডক্স চার্চের একটি সেমিনারিতে (যেখানে খ্রিস্টীয় অর্থোডক্স যাজকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হতো), তার মা কখনো তার সেই হতাশা কাটাতে পারেননি, কেন তার ছেলে ধর্মযাজক হলো না, যেমন তিনি চেয়েছিলেন। যে বিষয়টি, অ্যালেন বুলোকের মতে স্ট্যালিনকে বেশ তৃপ্তি দিত (৯৩), হয়তো যাজক হিসাবে তার প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতাই তাকে রুশ অর্থোডক্স চার্চ, খ্রিস্ট ধর্ম এবং সামগ্রিকভাবে যে-কোনো ধর্মের কট্টর একজন বিরোধীতে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু কোনো প্রমাণ নেই তার এই নাস্তিকতা তাকে নিষ্ঠুর কাজগুলো করার জন্য প্রণোদনা যুগিয়েছে। তার আগের ধর্মীয় প্রশিক্ষণও সম্ভবত তা করেনি, যদি না, অবশ্য সেমিনারীতে চূড়ান্ত বিশ্বাসের ওপর প্রশ্নাতীত শ্রদ্ধা, কঠোর কর্তৃত্ব এবং সেই বিশ্বাস যে, কাজের পরিণতি সেই কাজ সম্পাদনের যৌক্তিতাকে প্রমাণ করে, এমন কিছু শেখানোর মাধ্যমে তা ঘটে থাকে।

আর হিটলার যে নাস্তিক এই কাহিনীটি খুবই যত্ন সহকারে পরিকল্পনা করে প্রচার করা হয়েছে, এমনভাবে যে এখন কোনো প্রশ্ন করা ছাড়াই অনেক মানুষই তা বিশ্বাস করেন। এবং মূল সত্যকে তোয়াক্কা করে নিয়মিত আর ব্যাপকভাবে বিষয়টি প্রচার করছেন ধর্মবাদীরা। কিন্তু আসল সত্য এত স্পষ্ট নয় কোনোভাবেই। হিটলারে জন্ম হয়েছিল ক্যাথলিক একটি পরিবারে, শৈশবে তিনি ক্যাথলিক স্কুলেই পড়াশুনা করেছিলেন; যদিও বিষয়টি এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ না, তিনিও খুব সহজে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারেন পরবর্তীতে, যেমন স্ট্যালিন রুশ অর্থোডক্স বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন টিফলিস থিওলজিকাল সেমিনারি ছাড়ার পরপরই। কিন্তু হিটলার কখনোই আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যাথলিসিজম পরিত্যাগ করেননি, তার সমস্ত জীবনে যথেষ্ট ইঙ্গিত আছে তিনি ধার্মিক ছিলেন, যদিও ক্যাথলিক নন, তিনি কোনো একটি স্বর্গীয় সত্তার প্রতি তার বিশ্বাস কখনোই পরিত্যাগ করেননি। যেমন তার 'মাইন কামফ' বইটিতে বলেছেন যে, তিনি যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার খবর শোনেন, 'আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম, এবং স্বর্গীয় সত্তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এরকম একটি সময়ে আমাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দিয়ে ধন্য করার জন্য' (৯৪)। কিন্তু তখন ১৯১৪, তার বয়স মাত্র ২৫, হয়তো বা তিনি বদলে গিয়েছিলেন পরে?

১৯২০ সালে যখন হিটলারের বয়স একত্রিশ, তার খুব ঘনিষ্ঠ এক সহযোগী রুডলফ হেস, পরবর্তীতে যিনি ডেপুটি ফুহরার (উপ -রাষ্ট্রপ্রধান) হয়েছিলেন, বাভারিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে হের (জনাব)

হিটলারকে খুব ভালোভাবে চিনি, এবং আমি তার বেশ ঘনিষ্ঠ একজন, তার একটি অসাধারণ মর্যাদাপূর্ণ চরিত্র আছে, যা গভীর দয়ায় পূর্ণ, ধার্মিক এবং একজন উত্তম ক্যাথলিক' (৯৫)। অবশ্যই এটার ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, যেহেতু হেস 'মর্যাদাপূর্ণ চরিত্র' বা 'গভীর দয়ায় পূর্ণ' ইত্যাদি বিশেষণগুলো ব্যবহারে এত জঘন্যভাবে ভুল করেছেন, হয়তো তিনি ভালো ক্যাথলিক অংশটাও ভুল করেছিলেন। হিটলারের কোনো কিছু ভালো বলা রীতিমত কঠিন একটি কাজ। যা আমাকে মনে করিয়ে দেয়, হাস্যকরভাবে দুঃসাহসী সেই যুক্তির কথা, যা আমি শুনেছিলাম হিটলার নিশ্চয়ই একজন নাস্তিক ছিলেন এই মতবাদের সপক্ষে নানা উৎস থেকে পুনরুল্লেখ করে, হিটলার একজন খারাপ মানুষ, খ্রিস্টধর্ম ভালো হবার শিক্ষা দেয়, সুতরাং হিটলার খ্রিস্টান হতে পারেন না কোনোভাবেই। গোয়েরিং হিটলার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,'শুধু মাত্র একজন ক্যাথলিকই পারবেন জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে'। আমার কি মনে করে নিতে হবে যে তিনি এমন কেউ যিনি প্রতিপালিত হয়েছেন ক্যাথলিক হিসাবে , তবে বিশ্বাসী ক্যাথলিক ছিলেন না তিনি কোনোদিনও।

১৯৩৩ সালে বার্লিনে একটি ভাষণ দেবার সময় হিটলার বলেছিলেন, 'আমরা সে বিশ্বাসে পৌঁছেছি যে, মানুষের জন্য এই ধর্ম বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে, সুতরাং নাস্তিক্যবাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা করেছি। এবং এটি শুধু তাত্ত্বিক কোনো ঘোষণা নয়, আমরা অবশ্যই এর নির্মুল করে ছাড়বো' (৯৬)। এটি হয়তো শুধু ইঙ্গিত দেয়, অন্য অনেকের মতোই, হিটলার কোনো বিশ্বাসকে বিশ্বাস করতেন; ১৯৪১ সালে জানা যায় তিনি তার অ্যাডজুট্যান্ট, জেনেরেল গেরহার্ড ইঙ্গেলকে বলেছিলেন, 'আমি আমৃত্যু ক্যাথলিক থাকবো'।

এমনকি যদি তিনি সত্যিকারের বিশ্বাসী খ্রিস্টান নাও হয়ে থাকেন, হিটলার অবশ্যই খুবই ভিন্ন ধরনের কেউ হবেন, যদি খ্রিস্ট হত্যাকারী হিসাবে ইহুদীদের দায়ী করার দীর্ঘদিনের খ্রিস্টান ঐতিহ্য তাকে প্রভাবিত করে না থাকে। মিউনিখে ১৯২৩ সালের এক ভাষণে হিটলার বলেছিলেন, প্রথম কাজ হবে (জার্মানিকে) ইহুদীদের হাত থেকে বাঁচানো, যারা আমাদের দেশটাকে ধ্বংস করছে, জার্মানিকে আমরা সেই কষ্ট সহ্য করা থেকে রক্ষা করতে চাই, যেমন আরেকজন করেছিলেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়ার মাধ্যমে' (৯৭)। জন টোল্যান্ড তার 'এডলফ হিটলার: দ্য ডেফিনিটিভ বায়োগ্রাফী' বইটিতে লিখেছেন হিটলারের ধর্মীয় অবস্থান কি ছিল 'ফাইনাল সল্যুশন' (বন্দী সকল ইহুদীকে হত্যা করার নাৎসী সিদ্ধান্ত) বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি নেবার সময় (৯৮):

> তখনো রোমের ক্যাথলিক চার্চের একজন ভালো সদস্য, যদিও এর প্রাধান্যকাঠামোর বিষয়টি তার পছন্দের ছিল না, তবে তিনি তার মধ্যে এর

> সেই শিক্ষাটি ধারণ করে রেখেছিলেন, ইহুদীরাই ঈশ্বরকে হত্যা করেছিল। সে কারণে ইহুদী নিধনযজ্ঞ সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছিল বিবেকের সামান্যতম দংশন ছাড়াই, কারণ সেখানে হিটলার শুধু ঈশ্বরের প্রতিশোধ নেবার হাত হিসাবে কাজ করেছেন, যতক্ষণ তা করা সম্ভব হয়েছে নৈর্ব্যাক্তিকভাবে, কোনো নিষ্ঠুরতা ছাড়াই।

ইহুদীদের প্রতি খ্রিস্টানদের ঘৃণা শুধুমাত্র ক্যাথলিকদের ঐতিহ্যই না, মার্টিন লুথার (৯৯) সমভাবে তীব্র ইহুদীবিদ্বেষী ছিলেন। তার ‘ডায়েট অব ভর্মসে’ বলেছেন, ‘সমস্ত ইহুদীকে জার্মানী থেকে বিতাড়িত করা উচিত’; এবং ‘অন দ্য জিউস অ্যান্ড দেয়ার লাইজ’ নামে তিনি পুরো একটা বইও লিখেছিলেন, যা সম্ভবত হিটলারকে প্রভাবিত করেছিল। লুথার ইহুদীদের বর্ণনা করেছিলে ‘বিষধর সাপের বংশধর’ শব্দটি ব্যবহার করে, এবং সেই একই শব্দ হিটলারও ব্যবহার করেছিলেন তার ১৯২২ সালের উল্লেখযোগ্য একটি বক্তৃতায়, যেখানে তিনি বেশ কয়েকবার উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী:

> খ্রিস্টান হিসাবে আমার অনুভূতি, একজন যোদ্ধা হিসাবে আমাকে আমার প্রভু আর ত্রাণকর্তার দিকে নির্দেশিত করে। সেই মানুষটির প্রতি এটি আমাকে নির্দেশ করে, যিনি একবার একাকীত্বে, তার অল্প কিছু অনুসারী পরিবেষ্টিত হয়ে, শনাক্ত করেছিলেন, ইহুদীরা আসলে কি, এবং এদের সাথে যুদ্ধ করতে সবাইকে আহবান করেছিলেন, এবং তারা, ঈশ্বরের সত্য, কষ্ট সহ্যকারী হিসাবে নয় বরং যোদ্ধা হিসাবে সর্বশ্রেষ্ট ছিলেন। খ্রিস্টান হিসাবে অসীম ভালোবাসায়, এবং একজন মানুষ হিসাবে আমি বাইবেলের এই অনুচ্ছেদগুলো পড়ি, যা আমাদের নির্দেশ দেয়, কিভাবে আমাদের প্রভু তার সর্বশক্তি দিয়ে অবশেষে উদ্যত প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, এবং চাবুক হাতে এইসব অভিশপ্ত শয়তানের বিষধর সাপের দঙ্গলকে বহিষ্কার করেছিলেন উপাসনালয় থেকে। কি অসাধারণ ছিল ইহুদী বিষাক্ততার বিরুদ্ধে তার সেই যুদ্ধ। আজ দুই হাজার বছর পরে, গভীর আবেগের সাথে আগের চেয়ে আরো উত্তম রূপে সেই সত্যটিকে আমি চিহ্নিত করতে পারছি, এর জন্য তাকে তার রক্ত দিতে হয়েছিল ক্রুশের উপর। খ্রিস্টান হিসাবে আমার দ্বায়িত্ব আমি যেন নিজেকে প্রতারিত হবার কোনো সুযোগ না দেই, আমার কর্তব্য হচ্ছে সত্য আর ন্যায়বিচারের জন্য যুদ্ধ করা। এবং যদি কোনো কিছু প্রদর্শন করতে পারে যে, আমরা সঠিক দায়িত্ব পালন করছি, সেটি হবে সেই কষ্ট যা প্রতিদিনই পুঞ্জীভূত হচ্ছে; কারণ খ্রিস্টান হিসোবে আমার আরো দায়িত্বে আছে আমার নিজেদের জনগনের প্রতি কর্তব্য পালন করা (১০০)।

যদিও জানা কষ্টসাধ্য যে, হিটলার এই বিষধর সাপের কুণ্ডলী শব্দবন্ধটি আসলে কোথায় পেয়েছিলেন, লুথারের লেখা থেকে নাকি সরাসরি ম্যাথিউ ৩:৭ থেকে, যেভাবে লুথার সম্ভবত পেয়েছিলেন। এছাড়া ইহুদী নিপীড়ন যে ঈশ্বরের ইচ্ছার একটি অংশ এই মূল ধারণায় হিটলার তার আত্মজীবনী 'মাইন কামফ' (১০১) বইটিতে ফিরে এসেছেন: 'যেহেতু আমি আজ বিশ্বাস করি, আমি কাজ করছি সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী: নিজেকে ইহুদীদের কাছ থেকে সুরক্ষা করে, আমি আমার প্রভুর নামেই যুদ্ধ করছি'। এটি ১৯২৫ সালের ঘটনা; এটি আবার তিনি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন ১৯৩৮ সালে রাইখস্টাগে (জার্মান পার্লামেন্ট) একটি ভাষণ দেবার সময়। এবং এই একই কথা জীবনে তিনি বহুবার বলেছেন বিভিন্ন সময়ে।

এই ধরনের তার উদ্ধৃতিগুলোর সাথে অন্য সময়ে করা তার অন্য উদ্ধৃতিগুলোর সাথে ভারসাম্য খুঁজে নিতে হবে, যেমন 'টেবল-টকে' (১০২), যেখানে হিটলার আবার তীব্রভাবে অখ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন, যা তার সেক্রেটারী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। নীচের মন্তব্যগুলো সব যেমন ১৯৪১ সালে কোন এক সময় করেছিলেন:

> যে সবচেয়ে বিশাল আঘাতটিকে মানবতাকে সহ্য করতে হয়েছিল তা হলো খ্রিস্ট ধর্মের আগমন; বলশেভিজম হচ্ছে খ্রিস্ট ধর্মেরই একটি অবৈধ সন্তান। দুটোই ইহুদীদের আবিষ্কার - ধর্মের ব্যপারে পৃথিবীতে পরিকল্পিত মিথ্যার সূচনা করেছিল খ্রিস্ট ধর্ম।
>
> প্রাচীন পৃথিবী কেন এত পবিত্র, বিশুদ্ধ, ভারহীন আর শান্তিপূর্ণ ছিল কারণ তারা দুটি বিশাল ভয়াবহ অভিশাপের সে সময় অজানা ছিলা, গুটি বসন্ত আর খ্রিস্ট ধর্ম।
>
> যখন সব বলা শেষ হয়ে যায়, আমাদের আশা করার কোনো কারণই নেই যে, ইতালীয় আর স্পেনীয়রা তাদের নিজেদের খ্রিস্ট ধর্মের মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত করবে। আসুন আমরাই শুধু একটি মাত্র জাতি হই, যারা এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকের ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের মুক্ত হতে পেরেছে।

হিটলারের 'টেবিল টক' বইটিতে এই ধরনে বহু উদ্ধৃতি আছে, যা প্রায়ই খ্রিস্টধর্মকে বলশেভিকবাদের সমতূল্য বলে উল্লেখ করেছে। কখনো তুলনামূলক সমরূপ আলোচনা এসেছে কার্ল মার্কস এবং সেন্ট পল প্রসঙ্গে। এবং কখনোই তিনি ভুলতে পারেননি যে তারা দুজনেই ইহুদী (যদিও হিটলার খুব অদ্ভুতভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করতেন যীশু নিজে ইহুদী ছিলেন না); সম্ভাবনা আছে ১৯৪১ সাল অবধি হিটলারের হয়তো কোনো এক ধরনের ধর্ম ত্যাগের বিষয়টি ঘটেছিল, বা খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তার মোহমুক্তি হয়েছিল বা

পরস্পরবিরোধী এই ধরনের বক্তব্য কি শধুমাত্র আমাদের জানাচ্ছে যে, হিটলার একজন সুযোগসন্ধানী মিথ্যাবাদী ছিলেন, যার কোনো কথা বিশ্বাস করার মত নয়,যে কোনো দিকেই সেটির অর্থ করা যেতে পারে?

তর্ক করা যেতে পারে, তার নিজের বক্তব্য বা তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দেয়া তথ্যে সত্ত্বে, হিটলার আসলে ধার্মিক ছিলেন না, কিন্তু তার শ্রোতা ও দর্শকদের ধর্মীয় মনোভাবকে দূরভিসন্ধীর সাথে তিনি অপব্যবহার করেছিলেন। তিনি হয়তো নেপোলিয়নের সাথে একমত ছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'ধর্ম হচ্ছে চমৎকার একটি জিনিস, জনগণকে যা দিয়ে শান্ত করে রাখা যায়'; বা সেনেকা দি ইয়োঙ্গারের সাথে, যিনি বলেছিলেন, 'ধর্মকে সাধারণ মানুষরা সত্য, জ্ঞানীরা মিথ্যা এবং শাসকরা শোষণের উপযোগী একটি অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেন'। কেউই অস্বীকার করবে না যে, হিটলারের পক্ষে এমন অসৎ হওয়া খুবই সম্ভব, যদি তার আসলে উদ্দেশ্য হয় ধার্মিক হবার ভান করা। আমাদের নিজেদের অবশ্যই মনে করিয়ে দেয়া প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে হিটলারের নৃশংস কর্মকাণ্ডগুলো কিন্তু সে নিজেই একা হাতে করেনি। তার নির্দেশ অনুসরণ করা সৈন্যরা ও তাদের কর্মকর্তরা সেই বর্বরোচিত ভয়াবহ ঘটনাগুলো ঘটিয়েছিল, যাদের অধিকাংশ অবশ্যই খ্রিস্টান ছিলেন।

আসলে জার্মান জনগোষ্ঠীর খ্রিস্টধর্ম, আমরা আলোচনা করছি সেই অনুকল্পের ভিত্তিতে অবস্থিত, যে অনুকল্পটি হিটলারের এই আপাতদৃষ্টিতে লোক দেখানো অনান্তরিক ধর্মীয় মনোভাবের প্রচারণার বিষয়টি ব্যাখ্যা করবে, বা হয়তো হিটলার ভেবেছিলেন, তার হয়তো খ্রিস্টধর্মের প্রতি স্মারক হিসাবে হলেও কিছু পরিমান সহমর্মিতা প্রকাশ করা উচিত, নয়তো তার দুঃশাসন চার্চ থেকে যে সমর্থন পেয়েছিল সেটি পেত না। সেই সময়ে চার্চের এই সমর্থন বহু রূপেই দেখা গেছে, যার মধ্যে আছে ক্যাথলিক পোপ দ্বাদশ পায়াসের নাৎসিদের প্রতি একটি দৃঢ় অবস্থান নেবার আহবানের প্রতি ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান করে যাওয়ার ব্যপারটি - আধুনিক চার্চের জন্য যা এখনো যথেষ্ট পরিমাণ বিব্রতকর একটি অধ্যায়।

হয় খ্রিস্ট ধর্ম নিয়ে হিটলারের সাফাই গাওয়াটা ছিল আন্তরিক ছিল, অথবা তিনি তার খ্রিস্ট ধর্ম প্রীতি নিয়ে ভান করেছিলেন তার নিজের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে - যেমন সফলভাবে জার্মান খ্রিস্টান ও ক্যাথলিক চার্চের কাছ থেকে তিনি সাহায্য আদায় করেছিলেন। যে-কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে হিটলারের দুঃশাসনের ভয়াবহ অশুভ বিষয়গুলো কোনোভাবেই নাস্তিকতার কারণে ঘটেছে বলে এমন দাবী করা যাবে না। এবং এমনকি যখন তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন, হিটলার 'প্রভিডেন্স' বা ঐশ্বরিক স্বর্গীয় সত্তা সংক্রান্ত শব্দগুলো তার ভাষায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকেননি: তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রহস্যময় একটি সত্তা জার্মানির নের্তৃত্ব দিতে তাকে

বিশেষভাবে নির্বাচন করেছে। তিনি এটিকে মাঝে মাঝে 'প্রভিডেন্স' বলতেন, এবং আর কোনো কোনো সময় 'ঈশ্বর' বলে চিহ্নিত করতেন। ১৯৩৮ সালে আনসশ্লুস (অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানীর রাজনৈতিক পুনর্মিলন) পরবর্তী ভিয়েনায় যখন হিটলার বিজয়ীর বেশ প্রত্যাবর্তন করেন, তার উচ্ছসিত বক্তৃতায় ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এসেছে এই 'প্রভিডেন্সের' ছদ্মবেশে: 'আমি বিশ্বাস করি এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, যিনি একটি বালককে এখান থেকে রাইখে প্রেরণ করেছিলেন, তাকে সেখানে বড় হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাকে জাতির নেতা হিসাবে উন্নীত করেছিলেন যেন সে তার জন্মভুমিকে আবার রাইখের সাথে যুক্ত করার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিতে পারে' (১০৩)।

১৯৩৯ সালে মিউনিখে আততায়ীর হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যাবার পর কিন্তু সেদিন কার্যতালিকায় সামান্য পরিবর্তন করে তার জীবন রক্ষা করার জন্য হিটলার স্বর্গীয় শক্তিকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন : 'এখন আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট, আমি যে বিরগারব্রাউকেলার সময়ের একটু আগেই ছেড়ে এসেছিলাম - আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করার জন্য সেটা হচ্ছে দৈব ইচ্ছার একটি ইঙ্গিত' (১০৪)। এই ব্যর্থ হত্যা প্রচেষ্টার পর মিউনিখের আর্চবিশপ কার্ডিনাল মাইকেল ফাউলহাবের নির্দেশ দেন তার ক্যাথিড্রালে ঈশ্বরের প্রশস্তি সঙ্গীত গাওয়ার বন্দোবস্ত করতে, 'আর্চডাওসিসের পক্ষ থেকে ফুহরারের সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়ার জন্যে স্বর্গীয় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে'। বেশ কিছু বিবরণ অনুসারী, যেমন, গোয়েবলস খোদ নাৎসি মতবাদকে এর নিজ যোগ্যতায় একটি ধর্মে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টায় কোনো ত্রুটি করেননি। নীচের কথাগুলো ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়নের প্রধানের, যার প্রার্থনার মত একটি রূপ আছে, ছন্দ আছে খ্রিস্টান প্রভুর প্রতি প্রার্থনার মত (আমাদের পিতা) বা ক্রিডের মতো:

> অ্যাডলফ হিটলার! আমরা শুধুমাত্র আপনার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা নবায়ন করতে চাই এই মুহূর্তে: এই পৃথিবীতে আমরা শুধু বিশ্বাস করি অ্যাডলফ হিটলারকে; আমরা বিশ্বাস করি জাতীয় সমাজতন্ত্র (নাৎসি পার্টি) আমাদের জনগনের জন্য একমাত্র রক্ষাকারী বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি স্বর্গীয় একজন প্রভু ঈশ্বর আছেন, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের পথ প্রদর্শন করেছেন, আমাদের নির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাদের দৃশ্যতই আশীর্বাদ করেছেন।এবং আমরা বিশ্বাস করি, এই প্রভু ঈশ্বর অ্যাডলফ হিটলারকে প্রেরণ করেছেন যেন জার্মানি অনন্ত কালের জন্য শক্তিশালী একটি জাতির ভিত্তি রচনা করতে পারে (১০৫) ।

স্ট্যালিন নাস্তিক ছিলেন, হিটলার সম্ভবত নাস্তিক ছিলেন না, কিন্তু এমনকি তিনি যদি নাস্তিকও হতেন, তাহলেও স্ট্যালিন/হিটলার বিতর্কের শেষ কথা খুবই সাধারণ: কোনো একজন নাস্তিক ব্যক্তি হয়তো খারাপ কাজ করতে পারেন, কিন্তু তারা নাস্তিকতার নামে

কোনো অশুভ কাজ করেন না। স্ট্যালিন এবং হিটলার অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছিলেন - যথাক্রমে গোঁড়া মতবাদ কিংবা কট্টরপন্থী মার্ক্সবাদের নামে, এবং উন্মত্ত ও অবৈজ্ঞানিক ইউজেনিকস(সুপ্রজননবাদ) তত্ত্বের কারণে - যার সাথে খানিকটা মিশ্রিত ছিল ভাগনারীয় (১০৬) পাগলামী। তবে ধর্মীয় যুদ্ধ আসলেই ধর্মের নামে লড়াই করা হয়, এবং ইতিহাসে তাদের উপস্থিতি ভয়ঙ্করভাবে নিয়মিত। আমি এমন কোনো যুদ্ধের কথা মনে করতে পারছি না যা নাস্তিক্যবাদের নামে করা হয়েছিল। আর কেনই বা তা হবে? কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য থাকতে পারে অর্থনৈতিক লালসা, রাজনৈতিক অভিলাষ, জাতি কিংবা বর্ণগত সংস্কার, গভীরভাবে লালন করা কোনো দুঃখ বা দুর্দশা বা প্রতিশোধ, কিংবা কোনো জাতির নিয়তি নির্ধারণে দেশপ্রেমজনিত বিশ্বাস। এবং যুদ্ধের আরো সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে কারো সেই ধর্মবিশ্বাস - তাদের ধর্মটি একমাত্র সত্যিকারের ধর্ম। প্রবিত্র গ্রন্থগুলো যে ধারণাটিকে আরো দৃঢ়তর করে তোলে কোনো বাছবিচার ছাড়াই সকল অবিশ্বাসী এবং বিধর্মীদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, এবং এটি স্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞা করে যে ঈশ্বরের যোদ্ধারা সরাসরি শহীদদের স্বর্গে প্রবেশ করবে। স্যাম হ্যারিস, প্রায়ই ঠিক নিশানা বরাবর যিনি আঘাত করে থাকেন, তার 'দি এন্ড অফ ফেইথ', বইয়ে লিখেছিলেন (১০৭):

> ধর্মীয় বিশ্বাসের বিপদ হচ্ছে, এটি খুব সাধারণ কোনো ব্যক্তিকে এর উন্মত্ততার সুফল ভোগ করার সুযোগ করে দেয় এবং তাদেরকে মনে করা হয় 'পবিত্র'। কারণ প্রতিটি নতুন প্রজন্মের শিশুদের শেখানো হয় ধর্মীয় মতবাদ আর প্রস্তাবনার যৌক্তিকতা প্রমাণের কোনো প্রয়োজন পড়ে না, যেভাবে আমরা অন্য সব প্রস্তাবনার জন্য আবশ্যিকভাবে যৌক্তিকতা খুঁজি। মানব সভ্যতা এখনো সম্পূর্ণ যুক্তিহীন যোদ্ধাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে আছে। প্রাচীন এক সাহিত্যের জন্য আমরা এমনকি এখনো আমাদের হত্যা করছি। কে ভেবেছিল এরকম দুঃখজনক, উদ্ভট কিছু সম্ভব হতে পারে?

আর এর ব্যতিক্রম, কেনই বা একজন যুদ্ধে যাবে অনুপস্থিত কোনো একটি বিশ্বাসের জন্য?

টীকা:

(১) সন ও' কাহাসি (১৮৮০-১৯৩৪) আইরিশ নাট্যকার।

(২) টেন কম্যান্ডমেন্টস, যা ডেকালগ নামে পরিচিত, ধর্মীয় উপাসনা ও নৈতিকতা সংক্রান্ত মূল নির্দেশাবলী, ইহুদী ও খ্রিস্টীয় ধর্মীয় বিশ্বাসের কেন্দ্রে এর অবস্থান। হিব্রু বাইবেলে এটি দুইবার আবির্ভূত হয়েছে, এক্সোডাস ও ডিউটেরোনমিতে। ধর্মীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী ঈশ্বর মাউন্ট

সাইনাই এ দুটি পাথরের ট্যাবলেটে দশটি নির্দেশ খোদাই করে মোজেস এর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

(৩) Lane Fox, R. The Unauthorized Version. London: Penguin এবং Berlinerblau, J.The Secular Bible: Why Nonbelievers Must Take Religion Seriously. Cambridge: Cambridge University Press.

(৪) জন শেলবি 'জ্যাক' স্পঙ যুক্তরাষ্ট্রের একজন এপিসকোপাল চার্চ বিশপ ও লেখক।

(৫) The Sins Of Scripture: Exposing the Bible's Texts of Hate to Reveal the God of Love: John S Spong

(৬) রিচার্ড হলোওয়ে, স্কটিশ লেখক, ও স্কটিশ এপিসকোপাল চার্চের প্রাক্তন বিশপ।

(৭) Holloway, R. (1999). Godless Morality: Keeping Religion out of Ethics. Edinburgh: Canongate.Holloway, R. (2001). Doubts and Loves: What is Left of Christianity.Edinburgh: Canongate. রিচার্ড হলোওয়ের রিকভারিং ক্রিশ্চিয়ান পংক্তিটি, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ এ গার্ডিয়ানের একটি পুস্তক পর্যালোচনা থেকে নেয়া। http://books.guardian.co.uk/reviews/scienceandnature/0,61 21,894941,00.html; স্কটিশ সাংবাদিক ম্যুরিয়েল গ্রে বিশপ হলোওয়ের সাথে আমার এডিনবরা সংলাপ নিয়ে চমৎকার একটি রিপোর্ট লিখেছিলেন (গ্লাসগো) হেরাল্ড পত্রিকায়: http:// www. sunday herald.com/44517.

(৮) ওল্ড টেস্টামেন্ট হচ্ছে খ্রিস্টীয় বাইবেলের প্রথম অংশ, এটি মূলত হিব্রু বাইবেল নির্ভর, প্রাচীন ইসরায়েলাইটসদের ধর্মীয় রচনার একটি সংকলন।

(৯) আব্রাহামীয় ধর্মীয় কাহিনীতে নোয়া (নুহ) জেনেসিসে বর্ণিত মহাপ্লাবনের পূর্বে দশম প্যাট্রিয়ার্ক বা পিতৃসুলভ চরিত্র, অন্যান্য আব্রাহামীয় ধর্ম যেমন ইসলামেও এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

(১০) উটা নাপিসটিম বা উটনাপিসটিম, মেসোপটেমিয়ার উরুকের রাজা গিলগামেশকে নিয়ে রচিত 'দি এপিক অফ গিলগামেশের' (২৮০০ থেকে ২৫০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ) একটি চরিত্র, যাকে পানির দেবতা ইয়া বা এনকি নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি জাহাজ বানাতে, যা মহাপ্লাবন থেকে জীবন রক্ষা করেছিল।

(১১) যুক্তরাষ্ট্রের যাজকদের সেই সব ধর্ম বক্তৃতাগুলো - যেগুলো হারিকেন কাতরিনার জন্য মানুষের 'পাপ' কে দায়ী করেছিল - সেগুলোর ভয়ঙ্কর একটি সংকলন দেখতে দেখুন: http:// universist. org/ neworleans.htm;

(১২) ব্যপারটা স্পষ্ট নয় সেই কাহিনীটা, যার উৎস http://datelinehollywood. com/ archives / 2005/09/05/robertson-blames-hurricane-on-choice-of-ellen-deneres-to-hostemmys/, আসলেই সত্য কিনা, তবে সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ব্যাপকভাবে এটি বিশ্বাসযোগ্যতা পেয়েছে, সন্দেহ নেই কারণ এটি ইভানজেলিকাল ধর্মযাজকদের স্বভাবজাত বক্তব্যের মত, যাদের মধ্যে রবার্টসনও আছেন, যারা নানা দুর্যোগ যেমন কাটরিনা সম্বন্ধে সাধারণত এই ধরনের মন্তব্য করেন; উদাহরণ হিসাবে দেখুন: http://www. emediawire.com/ releases/ 2005/9/emw281940.htm , যে ওয়েবসাইটটি বলছে কাটরিনা সংক্রান্ত এই গল্পটি মিথ্যা সেখানে রবার্টসনের আরো একটি উদ্ধৃতি আছে, একটি ওরলান্ডো, ফ্লোরিডায় একটি পুরোনো গে প্রাইড মার্চ সংক্রান্ত। 'আমি

হুশিয়ার করে দিতে চাই ওরল্যাণ্ডোকে, যে আপনারা সরাসরি কোনো একটি ভংঙ্কর হারিকেন এর আক্রান্ত হবার পথে আছেন, আমি মনে করিনা যদি আমি আপনাদের জায়গায় থাকতাম ঈশ্বরের মুখের সামনে ঐ সব পতাকা দেখাতাম।'

(১৩) প্যাট রবার্টসন এর খবরটি রিপোর্ট করেছিল বিবিসি : http://news.bbc.co.Uk/2/hi/ americas/4427144.stm;

(১৪) লট, বুক অব জেনেসিস এ বর্ণিত চরিত্র, যিনি আব্রাহামের ভ্রাতুষ্পূত্র ছিলেন এবং সডোম ও গমোরাহ ধ্বংসের সময় ঈশ্বরের নির্দেশে পালাতে পেরেছিলেন, খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মেও তার বর্ণনা আছে। ইসলাম ধর্মে লুত হিসাবে পরিচিত তিনি, যিনি ইব্রাহিম এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, নবী হিসাবে তাকে সডোম ও গমোরাহ শহর দুটিতে প্রেরণ করা হয় (জেনেসিসের মত কোরানে এই জায়গটি সুনির্দিষ্ট করা হয়নি) তাদের ঈশ্বরের নির্দেশ বিরোধী বিকৃত যৌনাচার বন্ধ করার জন্য আহবান জানাতে। কিন্তু তারা সে নির্দেশটি অমান্য করলে পরবর্তীতে সডোম ও গমোরাহকে ঈশ্বর নিশ্চিহ্ন করে দেন, লুত ও তার পরিবার রক্ষা পায়, তবে তার স্ত্রী ছাড়া।

(১৫) Book of Judges - হিব্রু বাইবেল এর সপ্তম বই।

(১৬) আব্রাহাম (মূল আবরাম) বাইবেলে বর্ণিত তিন প্রধান পিতৃতুল্য চরিত্রের প্রথম জন। বুক অব জেনেসিস এর অধ্যায় ১১ থেকে ২৫ অবধি তার কাহিনী বর্ণিত। তিনটি প্রধান ধর্ম, ইহুদীবাদ, খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলামেই আমরা তার উপস্থিতি দেখি। নোয়ার বংশধারা দশম প্রজন্মের তেরাহ'র তিন পুত্রের একজন ছিলেন তিনি। উর কাসদিম বলে বুক অব জেনেসিসে যে স্থানটিকে তার জন্মস্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেটিকে চিহ্নিত করা হয়ে দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ার উর শহর হিসাবে। ঈশ্বরের নির্দেশে আব্রাহাম কানানের পথে যাত্রা করেছিলেন (কানান.. বর্তমান লেবানন, ইসরায়েল,জর্দান, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ার কিছু অংশ); ইসলামে তিনি পরিচিত ইব্রাহিম নামে, এখানে খ্রিস্টান ও ইহুদী মতবাদের সাথে পার্থক্য লক্ষণীয়, ইহুদীরা যেমন মনে করে ইব্রাহিমের উত্তরসুরী হতে হবে জন্মের মাধ্যমে, খ্রিস্টানরা মনে করে সেটি হতে হবে বিশ্বাসের মাধ্যমে, ইসলামে, তিনি সব বিশ্বাসীর পিতা, নবীদের দীর্ঘ ধারাবাহিকতার একজন। ইসলামে তিনি একেশ্বরবাদী এবং মুসলিম।

(১৭) বুক অফ জেনেসিসে বর্ণিত একটি শহর, বর্তমানে দক্ষিণ মধ্য ইসরায়েল।

(১৮) ইসলাম ধর্মে ইব্রাহিম তার পুত্র ইসমাইলকে বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছিলেন।

(১৯) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের নুরেমবার্গ বিচারের সময় যুদ্ধাপরাধীদের অনেকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে যে আইনী কৌশল অবলম্বন করেছিল, তারা নিজেদের নিরাপরাধ হিসাবে দাবী করেছিলেন, কারণ তারা তাদেও উপরের কর্তৃত্ব রাখে এমন উর্ধ¦তন কোনো কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসরণ করেছিল।

(২০) আমোন রাজ্যের বাসিন্দারা, ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত, বর্তমান জর্ডানে এর অবস্থান।

(২১) উইলিয়াম শেক্সপিয়ার, ইংরেজ নাট্যকার।

(২২) এই সমৃদ্ধ কৌতুকময় ধারণাটি আমার কাছে প্রস্তাব করেছিলেন জোনাথান মিলার যিনি, বিস্ময়করভাবে এটিকে বিশেষ কখনো ব্যবহার করেননি, আমি তাকে আরো ধন্যবাদ দিতে চাই এই ধারণাটি যে বই এর উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছিল: Halbertal, M. and Margalit, A. (1992). Idolatry. Cambridge, MA:Harvard University Press.

(২৩) মোজেস (মোশে, মুসা) হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী প্রাক্তন মিসরীয় রাজকুমার পরে যিনি ধর্মীয় নেতা হয়েছিলেন। ইহুদী ধর্মের এই কেন্দ্রীয় চরিত্রকে মনে করা হয় তোরাহর সম্ভাব্য রচয়িতা। এছাড়াও খ্রিস্ট, ইসলাম ও বাহাই মতবাদেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।
(২৪) হিব্রু বাইবেল এর চতুর্থ বই।
(২৫) মিডিয়ানবাসী, ওল্ড টেস্টামেন্ট ও কোরানে বর্ণিত একটি এলাকা। ধারণা করা হয় এর অবস্থান আরব পেনিনসুলার উত্তর পশ্চিমাংশ।
(২৬) খ্রিস্টানগন, তোমরা কি তাদের দেখতে পাচ্ছো না

পবিত্র এই ভূমিতে?
কিভাবে মিডিয়ান সেনারা
চুপিসারে শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে?
খ্রিস্টানগন, ওঠো, তাদের সজোরে আঘাত করো
ক্ষতি নয়, লাভ হিসাব করে;
সজোরে তাদের আঘাত করো পবিত্র ক্রুশের আশীর্বাদে।

(২৭) বাল বা বা'হ'ল এশিয়া মাইনর এবং লেভান্ট (পূর্ব ভুমধ্যসাগরীয় এলাকা, আনাতোলিয়া থেকে মিসর অবধি) অঞ্চলের বহু এলাকার পৃষ্ঠপোষক দেবতা, উত্তর-পশ্চিম সেমিটিক ভাষায় এর অর্থ হতে পারে মনিব কিংবা প্রভু।
(২৮) ইজরায়েলাইটন (বনি ইসরায়েল) প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে বসবাস কারী সেমিটিক জনগোষ্ঠী, যাদের বাস ছিল কানান এর একটি অংশে, বাইবেল এটি লেভান্ট এর সাথে সংশ্লিষ্ট, বিশেষ করে দক্ষিণ লেভান্টে (ইসরায়েল, ফিলিস্তা ও ফিনিসিয়া) হিব্রু বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপট।
(২৯) মোয়াবাইটস, বাইবেলে বর্ণিত ঐতিহাসিক মোয়াব রাজ্যের বাসিন্দা (বর্তমান জর্ডানের একটি একটি অংশ)
(৩০) দক্ষিণ মেসোপটিমায় বসতি স্থাপন করা প্রাচীন সিরিয়া'র প্রাচীন সেমিটিক-ভাষাভাষী জাতি, যাদের অন্যতম শহর ছিল ব্যাবিলন।
(৩১) কানান, প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের একটি অংশ, বাইবেল এর বর্ণিত যে শহরটি লেভান্ট এর সামঞ্জস্যপূর্ণ (আধুনিক লেবানন,ইসরায়েল,প্যালেষ্টাইন টেরিটরী,জর্ডান এর পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ পশ্চিম সিরিয়া। হিব্রু বাইবেল অনুযায়ী কানানরা হচ্ছে হামের বংশধর (হাম ছিলেন নোয়া'র পুত্র)।
(৩২) হিটাইট'রা আনাতোলিয়ায়, (বর্তমান তুরস্কের কিছু অংশ) একটি গড়ে তুলেছিল ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।
(৩৩)পেরিজজাইটরা বাইবেলে উল্লেখিত জাতি, যারা কানানে বসবাস করতো ইহুদীদের আসার আগে।
(৩৪) হিভাইট জাতির মানুষরা বসবাস করতে কানানের পার্বত্য এলাকা, বর্তমান লেবাননের কিছু অংশ।
(৩৫) জেবুসাইট, হিব্রু বাইবেল এ বর্ণিত এই জাতি কানানেই বসবাস করতে, যারা জেরুজালেম শহরের পত্তন করেছিল, কিং ডেভিডের এই এলাকা দখল করার আগে।
(৩৬) হিব্রু বাইবেল ষষ্ঠ বই।
(৩৭) বর্তমান ইরাক,ইরান,তুরস্ক ও সিরিয়ায় বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠী।

(৩৮) টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিসে জলাভূমিতে বাস করা বহু জাতিগোষ্ঠী।

(৩৯) Lebensraum : নাৎসী জার্মানীর সেই প্রতিশ্রুত গণহত্যামূলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, যার অর্থ জার্মান জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আরো ভূখণ্ড সম্প্রাসারণ।

(৪০) আফগানিস্তানের বামিয়ানে পাহাড়ের খোদাইকৃত বিশালাকৃতির বৌদ্ধমূর্তি, ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। পরে তালিবানরা এটি ধ্বংস করে।

(৪১) প্যারিস এর নিকট শার্ত্রে শহরের ক্যাথিড্রাল, মধ্যযুগীয় গথিক স্থাপত্যর অসাধারণ উদাহরণ, নির্মিত হয়েছিল ১১৯৪ থেকে ১২৫০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

(৪২) ইংল্যান্ডের ইয়র্ক ক্যাথিড্রাল, এটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ১২২০ খ্রিষ্টাব্দে।

(৪৩) নতর দাম ক্যাথিড্রাল, প্যারিসে, ফরাসী গথিক স্থাপত্যকলায় এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছিল ১৩৪৫ খ্রিষ্টাব্দে।

(৪৪) জাপানের কিয়োটো শহরে প্রায় ১৬০০ বৌদ্ধ মন্দির আছে, যার মধ্যে ১৭ টি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে চিহ্নিত, বিভিন্ন সময়ে এগুলো নির্মিত হয়েছে।

(৪৫) R. Dawkins, 'Atheists for Jesus', Free Inquiry 25: 1, 2005, 9-10

(৪৬) জুলিয়া সুইনি সঠিক সেই বিষয়টিকে স্পর্শ করেছিলেন যখন তিনি সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। ঠিক যেমন খ্রিস্ট ধর্মকে মাঝে মাঝে মনে করা হয় ইসলামের চেয়ে ভদ্র এবং মৃদু ধর্ম। বৌদ্ধধর্মকে সবসময় সবচেয়ে ভদ্র ধর্ম হিসাবে দাবী করা হয়। কিন্তু পূর্বজন্মের পাপের জন্য পুর্নজন্মের সেই সিড়িতে অধোঃপতিত হবার মতবাদটি বেশ দুঃখজনক। জুলিয়া সুইনি: আমি থাইল্যান্ডে গিয়েছিলাম এবং সেখানে ঘটনাচক্রে একটি মহিলার সাথে দেখা হয়েছিল, তিনি ভয়ঙ্করভাবে বিকলাঙ্গ একটি শিশুর দেখাশুনা করতেন। আমি তাকে বলেছিলাম, আপনি খুবই দয়ালু এই অসহায় ছেলেটির দেখাশুনা করছে। উত্তরে সেই মহিল বলেছিলেন, একে ‘অসহায়’ ছেলে বলবেন না, আগের জন্মে সে নিশ্চয়ই খব খারাপ কিছু ঘটেছিল যার কারণে এ জন্মে এভাবেই জন্ম হলো।’

(৪৭) বিভিন্ন ধর্মীয় কাল্ট বা গোষ্ঠীগুলো কি ধরনের কৌশল ব্যবহার করে তার একটি বিশ্লেষণী পর্যালোচনার জন্য দেখুন: Barker, E. (1984). The Making of a Moonie: Brainwashing or Choice? Oxford: Blackwell, এবং আধুনিক ধর্মী কাল্টগুলোর আরো অনুসন্ধানী গ্রন্থ: Lane, B. (1996). Killer Cults. London: Headline. Ges Kilduff, M. and Javers, R. (1978). The Suicide Cult. New York:Bantam;

(৪৮) গেজা ভেরমেস, হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ ধর্মীয় ইতিহাসবিদ।

(৪৯) Geza Vermes. Changing Faces Of Jesus (2001)

(৫০) আমার জানা আছে যে, এখানে ব্যবহৃত scrumping শব্দটা যুক্তরাষ্ট্রের পাঠকদের কাছে সুপরিচিত নয়। কিন্তু আমি নিজে অপরিচিত আমেরিকান শব্দ পড়তে ভালোবাসি, এবং এগুলো খোজার মাধ্যমে আমার শব্দভাণ্ডারের পরিধিও বাড়ে, আমি ইচ্ছা করেই কিছু ধর্ম সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহার করেছি এই কারণে; scrumping নিজেই একটি বেশ ব্যাপক অর্থবহ একটি mot juste বা সঠিক শব্দ; এর অর্থ কিন্তু চুরি না; এর একমাত্র অর্থ হচ্ছে আপেল চুরি, শুধুমাত্র আপেল চুরি, কোনো একটি শব্দ এতো নির্দিষ্ট হবার উদাহরণ বিরল; স্বীকার করতেই হবে জেনেসিসের গল্প নির্দিষ্ট করে বলে দেয়নি যে ফলটি আসলে আপেল কিনা, কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা অবশ্য সেটাই।

(৫১) লিওনার্ড আলফ্রেড স্নেইডার (১৯২৫-১৯৬৬) আমেরিকার সামাজিক নানা বিষয়ে মন্তব্যকারী, কমেডিয়ান, স্যাটায়ারিষ্ট। পরিচিত ছিলেন লেনী ব্রুস নামে।
(৫২) অগাষ্টিন অফ হিপো (৩৫৪-৪৩০), খ্রিস্টান ধর্মের সূচনাপর্বের ধর্মতাত্ত্বিক, খ্রিস্টীয় ধর্ম ও পশ্চিমা দর্শনের প্রভাবশালী দার্শনিক।
(৫৩) রবার্ট গ্রেভস (১৮৯৫-১৯৮৫) ইংরেজ কবি,ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক।
(৫৪) King Jesus: A Novel. Robert Graves
(৫৫) Paul Vallely and Andrew Buncombe, 'History of Christianity: Gospel according to Judas', Independent, 7 April 2006.
(৫৬) পল দ্য আপোস্টল (৫-৬৭) (সল অব টারসাস), প্রথম শতাব্দীর খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারক
(৫৭)Vermes, G. (2000). The Changing Faces of Jesus. London: Allen Lane.
(৫৮) জন হারটাং, যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসক, নৃতত্ত্ববিদ।
(৫৯) খ্রিস্টীয় বিশ্বাস, যে যীশুর দ্বিতীয়বার যখন আসবেন, তার সেই সেকেন্ড কামিং এর সময় পৃথিবীর বিশ্বাসীরা বাতাসে ভেসে সরাসরি প্রভু যীশুর সান্নিধ্যে যাবেন, এবং তখন কিছু মানুষ এই পৃথিবীতে রয়ে যাবে।
(৬০) মোশে বেন মায়মন (১১৩৫-১২০৪), স্পেনের কর্ডোভায় জন্ম নিয়েছিলেন, মধ্যযুগের অন্যতম প্রখ্যাত ইহুদী ধর্মতাত্ত্বিক, এছাড়াও তিনি যাজক ও চিকিৎসক ছিলেন।
(৬১) জোশুয়া : মোজেস এর খুব নিকট সহকারী, পরবর্তীতে তিনি কানান জয় করেছিলেন।
(৬২) ইহুদী নয় এমন কোনো জাতি।
(৬৩) জন দি অ্যাপোস্টল (৬-১০৬) খ্রিস্টের মূল বারো অনুসারীর একজন, নিউ টেস্টামেন্টের বেশ কিছু বইয়ের রচয়িতা হিসাবে তিনি চিহ্নিত।
(৬৪) Ken's Guide to the Bible.Ken Smith
(৬৫) ঈশ্বর, আমি তোমার অনুগ্রহর কাছে ঋণী
এবং অন্যরা যা ভাগ্য বলে, আমি তা বলি না,
যে, আমি খ্রিস্টান জাতিতেই জন্ম নিয়েছি
কোনো অসভ্য বর্বর অথবা ইহুদী হিসাবে নয়।
(৬৬) সালমান রুশদী, ভারতীয় বংশোদ্ভুত ব্রিটিশ লেখক।
(৬৭) Guardian, 12 March 2002: http://books.guardian.co.uk/ depart ments / politics philosophy andsociety / story/ 0,,664342,00.html
(৬৮) ইংলিশ চার্চ
(৬৯) জন বেচামেন, ইংরেজ কবি।
(৭০) N. D. Glenn, 'Interreligious marriage in the United States: patterns and recent trends', Journal of Marriage and the Family 44: 3,1982, 555
(৭১) জন বর্ডলে রলস, আমেরিকার দার্শনিক।
(৭২) উত্তর মেরু বা আর্কটিক অঞ্চলের নৃগোষ্ঠী।
(৭৩) টমাস হেনরি হাক্সলি, ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী।
(৭৪) Huxley, T. H. (1871). Lay Sermons, Addresses and Reviews. New York: Appleton.

(৭৫) আব্রাহাম লিঙ্কন, আমেরিকার ষোলতম প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় তিনি নেতৃত্বে ছিলেন। এভাবে তিনি যুক্তরাষ্টকে রক্ষা করেন, দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত করেন।
(৭৬)http://www.classic-literature.co.uk/american-authors/19th-century / abraham-lincoln/the-writings-of-abraharnlincoln-04/.
(৭৭) ইংরেজ লেখক ডি এইচ লরেন্সের একটি উপন্যাস।
(৭৮) ক্যালিগুলা, রোমান সম্রাট।
(৭৯) গেনজিস খান, মঙ্গোল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা (মূল নাম তিমুজিন)
(৮০) A. C. Bouquet. Comparative Religion (Pelican)
(৮১) এইচ জি ওয়েলস: ইংলিশ লেখক। ১৯০১ সালে পয়ত্রিশ বছর বয়সে হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস একটি বই লিখেছিলেন Anticipations: Of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human life and Thought., এই একই থিম নিয়ে ওয়েলস পরে ১৯২৮ সালে বিস্তারিত করেন The Open Conspiracy বইটিতে, যেখানে তিনি নিউ রিপাবলিকের উত্থানের কথা বলেন, যেখানে বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণে একটি রাষ্ট্র কাঠামোর কথা প্রস্তাব করেছিলেন।
(৮২) নিখুঁত সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো সহ কোনো স্বর্গরাজ্য। ইউটোপিয়া শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক ভাষায়, ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দে স্যার টমাস মোর তার ইউটোপিয়ায় ধারণাটি প্রস্তাব করেন।
(৮৩) মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮) যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা।
(৮৪) পল রোবসন (১৮৯৮-১৯৭৬) সঙ্গীতশিল্পী, কৃষ্ণাঙ্গ মানবাধিকার আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।
(৮৫) সিডনী পোয়াটিয়ের্স, বাহামা-আমেরিকান অভিনেতা ও কুটনীতিবিদ। প্রথম অ্যাকাডেমী পুরষ্কার জেতা কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেতা।
(৮৬) জেমস ওয়েন্স (১৯১০-১৯৮০) আমেরিকার অ্যাথলেট, অলিম্পিক স্বর্ণজয়ী।
(৮৭) জ্যাকি রবিনসন, মেজর লীগ বেসবলে খেলা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড়।
(৮৮) Peter Singer. Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals(1975)
(৮৯) এডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫) অষ্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহন করা জার্মান রাজনীতিবিদ, এবং নাৎসী পার্টি প্রধান (ন্যাশনাল সোসালিষ্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ অবধি তিনি নাৎসী জার্মানীর চ্যান্সেলর এবং একনায়ক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর হলোকস্টের কেন্দ্রীয় চরিত্র।
(৯০) জোসেফ স্টালিন বা যোসিফ ভিসেরিয়োনাভিচ স্টালিন (জন্ম নাম, ইয়োসেফ বেসারিওনিস যুগাসভিলি) (১৮৭৮-১৯৫৩) জর্জিয়ায় জন্ম নেয়া স্টালিন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বময় ক্ষমতার নেতা ছিলেন মধ্য ১৯২০ এর দশক থেকে ১৯৫৩ অবধি তার মৃত্যু পর্যন্ত।
(৯১) নোয়েল বারবার (১৯০৯-১৯৮৮) ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক।
(৯২) Noel Barber Lords of the Golden Horn: From Suleiman the Magnificent to Kamal Ataturk (1973)
(৯৩) A. Bullock. Hitler and Stalin. London: HarperCollins.(1991).

(৯৪) A. Bullock. Hitler: A Study in Tyranny. London: Penguin. (2005).
(৯৫) http://www.ffrf.org/fttoday/1997/march97/holocaust.html; রিচার্ড ই. স্মিথ এর এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল ফ্রিথট টুডে এর মার্চ ১৯৯৭ সংখ্যায়, সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি আছে হিটলার এবং অন্যান্য নাৎসি, তাদের উৎস সহ। যদি না কিছু উল্লেখ করা হয় আমরা ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলো স্মিথ এর নিবন্ধ থেকে।
(৯৬) http://homepages.paradise.net.nz/mischedj/ca_hitler.htrnl
(৯৭) A. Bullock. Hitler: A Study in Tyranny. London: Penguin. (2005).
(৯৮) John Willard Toland. Adolf Hitler: The Definitive Biography, 1976
(৯৯) মার্টিন লুথার, জার্মান ধর্মযাজক,প্রোটেস্টান্ট রিফরমেশনের সূচনাকারী।
(১০০) Adolf Hitler, speech of 12 April 1922. In Baynes (1942: 19-20).
(১০১) Adolf Hitler, Mein Kampf
(১০২) Hitler's Table Talk, ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ থেকে যে বইটি হিটলারের নানা মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিল। এগুলো লিপিবদ্ধ করেছিল হাইনরিশ হাইম, মার্টিন বোরবাম, হেনরি পিকার।
(১০৩) A. Bullock. Hitler: A Study in Tyranny. London: Penguin. (2005).
(১০৪) এই উদ্ধৃতিটি এবং পরেরটির উৎস অ্যান নিকোল গেলর এর নিবন্ধ: Hitler's religion, http:// www. ffrf. org/ fttoday/back/hitler. Html
(১০৫) http://www.contra-mundum.org/schirrmacher/NS_Religion.pdf.
(১০৬) রিচার্ড ভাগনার, জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ
(১০৭) Sam Harris. The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004)

৮ অষ্টম অধ্যায় ধর্মের সমস্যাটা আসলে কি? ধর্ম কেন এত হিংস্র?

‘ধর্ম আসলেই মানুষকে বিশ্বাস করাতে পেরেছে যে, একজন অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্ব আছে - যিনি আকাশে বসবাস করেন -আপনি যা কিছু করছেন - প্রতিটি দিনের প্রতিটি মিনিটে - সব কিছুই তিনি দেখছেন। এবং এই অদৃশ্য সত্তার কাছে দশটি কর্মের একটি বিশেষ তালিকা আছে, তিনি চান আপনারা অবশ্যই যেন সেই নিষিদ্ধ কোনো কাজ না করেন। এবং যদি আপনি সেই দশটি নিষেধাজ্ঞার কোনো একটি অমান্য করেন, তাহলে তার বানানো একটি বিশেষ জায়গা আছে, উত্তপ্ত লেলিহান শিখার আগুন আর কালো ধোঁয়ায় যে জায়গাটি পরিপূর্ণ, যেটি পুড়িয়ে ও নানাভাবে যন্ত্রণা আর নির্যাতন করার একটি বিশেষ জায়গা। সেখানে তিনি আপনাকে পাঠাবেন থাকতে এবং যন্ত্রণা সহ্য করতে এবং দগ্ধ এবং শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরার উপক্রম হতে এবং আপনি সেখানে অনন্তকালের জন্য অবিশ্রান্তভাবেই দারুণ যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবেন আর কেবল কাদতে থাকবেন -কিন্তু তারপরও তিনি আপনাকে ভালোবাসেন’। - জর্জ কারলিন

নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্যগত প্রকৃতির কারণেই কোনো ধরনের সন্মুখ দ্বন্দ্বেই আমি তেমন সুবিধা করতে পারি না। আর আসলেই আমি মনে করিনা শত্রুভাবাপন্ন হয়ে সত্য অনুসন্ধান করার কোনো প্রক্রিয়া আদৌ উপযোগী কোনো উপায় হতে পারে এবং নিয়মিতভাবেই আনুষ্ঠানিক নানা বিতর্কে অংশ নেবার জন্য আমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করে থাকি। একবার আমি তৎকালীন এডিনবরার ইয়র্কের আর্চবিশপের সাথে একটি আনুষ্ঠানিক বিতর্কে অংশগ্রহন করতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এর জন্য নিজেকে বেশ সম্মানিত মনে করেছিলাম এবং আমন্ত্রণটি সাদরে গ্রহন করেছিলাম। সেই বিতর্কের পর বিশিষ্ট ধার্মিক পদার্থ বিজ্ঞানী রাসেল স্ট্যানার্ড (১) তার 'ডুইং অ্যাওয়ে উইথ গড?' বইটিতে 'অবজারভার' পত্রিকায় সেই বিতর্ক বিষয়ে তার লেখা একটি চিঠি পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন (২):

> মহাশয়, অতিমাত্রায় উৎফুল্ল আর তৃপ্তিময়, 'গড কামস এ পুওর সেকেন্ড বিফোর দ্য ম্যাজেস্টি অব সায়েন্স' শিরোনামের অধীনে, আপনার বৈজ্ঞানিক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন যে (তাও আবার ইষ্টার রোববারের মত একটি দিনে) ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বিতর্কে রিচার্ড ডকিন্স ইয়র্কের আর্চ বিশপের উপর কিভাবে 'গুরুতর বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ' পরিচালনা করেছিলেন। আমাদের জানানো হয়েছে 'কুৎসিৎ আত্মপ্রসাদের হাসি হাসা' 'নাস্তিক' এবং 'সিংহরা' ১০ এবং খ্রিস্টানরা ০।'

ধার্মিক বিজ্ঞানী স্ট্যানার্ড এভাবেই অবজারভার প্রত্রিকায় প্রকাশিত তার একটি চিঠিতে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া অব্যাহত রাখেন যে, কিভাবে সেই পত্রিকাটি রয়্যাল সোসাইটিতে তার সাথে আমার এবং বার্মিংহামের বিশপ ও বিখ্যাত বিশ্বতাত্ত্বিক স্যার হেরমান বন্ডির পরবর্তী একটি সাক্ষাৎকারের কথা উল্লেখ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যে সাক্ষাৎকারটি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিতর্ক আকারে হয়নি, এবং তার ফলাফলে সেই আলোচনা অপেক্ষাকৃত বেশি গঠনমূলক হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিতর্কের আকারে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোর প্রতি তার স্পষ্ট এবং যথার্থভাবে নিন্দা জ্ঞাপন প্রকাশের সাথে আমি অবশ্যই একমত হতে পারি । বিশেষ করে, আমার 'এ ডেভিলস চ্যাপলিন' (৩) বইয়ে যে কারণগুলো আমি উল্লেখ করেছিলাম, কিছু খুব নির্দিষ্ট কারণেই আমি সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের সাথে কোনো বিতর্কে অংশগ্রহন করতে চাই না (৪) ।

যদিও যুদ্ধংদেহী কোনো প্রতিযোগিতার প্রতি আমার সুস্পষ্ট অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও, কোনো না কোনো একভাবে ধর্মের প্রতি আমার একটি তীব্র বিতৃষ্ণা এবং আক্রমণাত্মক মনোভাব আছে, এমন ধরনের একটি কুখ্যাতি আমি অর্জন করে ফেলেছি। আমার সহকর্মীরা যারা একমত যে, ঈশ্বরের কোনো অস্তিত্বই নেই, এবং যারা একমত যে নৈতিক হবার জন্যে আমাদের ধর্মের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, এবং আমরা ধর্ম এবং

নৈতিকতার মূল শিকড়টাকে ধর্ম বহির্ভূত একটি ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারি, তারাও মৃদু বিস্ময়কর একটি ধাঁধা নিয়ে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করে থাকেন: 'তুমি কেন ধর্মের বিরুদ্ধে এত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করো বলো তো? ধর্মের আসলে সমস্যাটা কি? আসলেই কি ধর্ম এত বেশি ক্ষতি করে যে, আমাদের এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে যুদ্ধ করতে হবে? কেন আমরা আমাদের মতো থাকি না, আর অতিপ্রাকৃতিক ধর্মবিশ্বাসীদের তাদের মত করে জীবন কাটানোর জন্য ছেড়ে দিচ্ছি না, যেমন আমরা করে থাকি রাশিচক্র, যেমন বৃষ আর বৃশ্চিক রাশির সাথে, বা ক্রিষ্টালের শক্তি আর 'লেই' রেখার ক্ষেত্রে (লেই লাইন হচ্ছে আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি, ধর্মীয় এবং মানব-নির্মিত কাঠামোগুলোর মধ্যে সরলরৈখিক বিন্যাস, যার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আছে বিশ্বাসীদের একটি অংশের মধ্যে)? ধর্ম কি সেই সব উদ্ভট ধ্যানধারণারই মত আরো একটি ধারণা নয়, যা কোনো ক্ষতি করছে না আমাদের?'

আমি হয়তো এর উত্তরে বলি, এই ধরনের বৈরী আচরণ যা আমি কিংবা অন্যান্য নিরীশ্ববাদীরা মাঝে মাঝে ধর্মের বিরুদ্ধে প্রদর্শন করেন তা শুধু লিখিত বা উচ্চারিত শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর শুধুমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক মতভিন্নতার কারণে আমি কিন্তু কাউকে বোমা মেরে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করছি না, বা শিরোচ্ছেদ করতে বা আগুনে পুড়িয়ে ক্রুশে চড়িয়ে মারতেও চাইছি না বা কোনো উচু দালান বরাবর উড়োজাহাজও চালাতে চাইছি না। কিন্তু আমার প্রশ্নকর্তারা সাধারণত সেখানেই তাদের কথা থামান না, তিনি হয়তো আরো বলতে পারেন এমন কোনো কিছু: 'তোমার এই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব কি তোমাকে একজন 'মৌলবাদী নাস্তিক' হিসাবে চিহ্নিত করছে না, ঠিক তোমার মতানুযায়ী তুমিও তো একই ভাবে উগ্র আর গোঁড়া, যুক্তরাষ্ট্রে বাইবেল-বলয়ে বসবাসকারীরা যেমন তাদের মতামতে গোঁড়া আর উগ্র'? আমি প্রথমেই আমার প্রতি মৌলবাদের অভিযোগটির একটি উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করছি, কারণ এই অভিযোগ আমার প্রতি হতাশাজনকভাবে সর্বজনীন।

মৌলবাদ এবং বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক তৎপরতা

মৌলবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, তারাই সঠিক কারণ সেই সত্যটিকে তারা কোনো একটি পবিত্র গ্রন্থে পড়েছেন, এবং আগে থেকেই, তারা জানেন, কোনোকিছুই সেই ধারণকৃত লালিত বিশ্বাস থেকে তাদেরকে একচুলও নাড়াতে পারবে না। পবিত্র গ্রন্থেও সত্য হচ্ছে এক ধরনের 'এক্সিয়ম' বা কোনো প্রমাণ বা যুক্তি ছাড়াই যাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হয় বা স্বতঃসিদ্ধ একটি প্রস্তাবনা, যা কখনোই যৌক্তিক কোনো আলোচনার উপসংহার হতে পারে না। তাদের কাছে, যা-ই হোক না কেন.. পবিত্র গ্রন্থ অবশ্যই সত্যি, এমনকি যখন যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ এটির প্রস্তাবিত দাবীর বিপক্ষে উপস্থাপন করা হয়। বিরুদ্ধ সেই প্রমাণগুলোই অবশ্যই বিশ্বাসীদের ছুড়ে ফেলে দিতে হবে, কারণ পবিত্র গ্রন্থ অবশ্য

এবং চূড়ান্তভাবে মান্য। অথচ এই অবস্থানের ঠিক বিপরীত, হচ্ছি আমি, একজন বৈজ্ঞানিক হিসাবে কোনো কিছুর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করি (যেমন ধরুন বিবর্তন প্রক্রিয়া), সেটি পবিত্র গ্রন্থে পড়েছি বলে তা কিন্তু নয়, বরং আমি বিশ্বাস করি কারণ আমি এর সপক্ষে সব প্রমাণগুলো বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছি, এবং আসলেই দুটোর মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। বিবর্তন সংক্রান্ত কোনো বইয়ে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণ কিন্তু এমন নয় যে, সেই বইগুলো পবিত্র গ্রন্থের মত কোনো কিছু, বরং সেগুলো বিশ্বাস করা হয় কারণ সেই বইগুলো সাধারণত পরস্পরকে মজবুত বা দৃঢ় করে এমন অগণিত প্রমাণ উপস্থাপন করে থাকে। নীতিগতভাবে, কোনো একজন পাঠক চাইলে সেই প্রমাণগুলো পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। বিজ্ঞানের কোনো বইয়ে যখন ভুল হয়, কেউ না কেউ এক সময় সেই ভুলটি উদঘাটন করেন, এবং এর পরবর্তী সংস্করণগুলোতে সেই ভুলটি সংশোধন করা হয়। এবং কোনো ধর্মগ্রন্থের সাথে খুবই স্পষ্টভাবে আমরা এমন কিছু হতে দেখি না।

দার্শনিকরা, বিশেষ করে সৌখিন দার্শনিকরা যাদের দর্শন সম্বন্ধে অল্প কিছু লেখাপড়া আছে এবং আরো যারা বিশেষভাবে সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদ দ্বারা সংক্রমিত, তারা হয়তো বা এই পর্যায়ে ক্লান্তিকর একটি 'রেড হেরিং' যুক্তি দেখাবেন, অর্থাৎ মূল প্রসঙ্গটিকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় একটি ভ্রান্ত যুক্তি প্রস্তাবনা করতে পারেন: 'সাক্ষ্য প্রমাণের' উপর কোনো বিজ্ঞানীর বিশ্বাস তো কোনো মৌলবাদীর বিশ্বাসের মতোই একটি বিষয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমি আমার অন্য কিছু লেখায় বিশদ আলোচনা করেছি আগে, এখানে শুধু সংক্ষিপ্তভাবে তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি করবো। সৌখিন দার্শনিকের টুপি মাথায় দিয়ে আমরা যা কিছু দাবী করি না কেন, আমরা সবাই আমাদের জীবনে প্রমাণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করি। যদি আমি কোনো হত্যার জন্য অভিযুক্ত হই, বিবাদী পক্ষের আইনজীবি আমাকে জেরা করবেন, অপরাধ সংঘটিত হবার আগের রাত্রে আমি শিকাগোতে ছিলাম এই কথাটি সত্যি কিনা। আমি এখানে দর্শনের যুক্তি দিয়ে এমন কোনো উত্তর দিয়ে বিষয়টি কিন্তু পাশ কাটিয়ে যেতে পারবো না, যেমন: 'এটা নির্ভর করছে আপনি 'সত্যি' বলতে কি বোঝাচ্ছেন সেই বিষয়টার উপর, কিংবা কোনো নৃতাত্ত্বিক বা আপেক্ষিকতাবাদী আবেদন দিয়ে, যেমন, 'শুধুমাত্র আপনার পশ্চিমা বৈজ্ঞানিক 'ছিলাম' অর্থে সেদিন আমি শিকাগোতে ছিলাম। বঙ্গোলিজদের এই 'কোথাও থাকার ধারণাটি' সম্পূর্ণ ভিন্ন, সে অনুযায়ী আপনি সত্যি 'কোথাও আছেন' বলতে বোঝাবে, আপনি হচ্ছেন সুগন্ধী তেল মর্দন করা নির্বাচিত একজন বয়োবৃদ্ধ , যিনি ছাগলের শুকনো অণ্ডকোষ থেকে নস্যি নেবার যোগ্যতা রাখেন' (৫)।

হতে পারে বিজ্ঞানীরা মৌলবাদী, 'সত্য' বলতে কি বোঝায় যখন সেটি কোনো বিমূর্ত উপায়কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কিন্তু সেই অর্থে বাকিরাও কিন্তু সেই ধরনের মৌলবাদী।

আমি যখন বলছি নিউ জিল্যান্ডের অবস্থান হচ্ছে দক্ষিণ গোলার্ধে, তার চেয়ে আবার আমি যখন বলছি বিবর্তন সত্য, তা কিন্তু কোনো অংশেই আমাকে বেশি মৌলবাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করছে না। আমরা বিবর্তনে বিশ্বাস করি কারণ এর সপক্ষে অসংখ্য সাক্ষ্য প্রমাণ আছে এবং আমরা এটিকে অবশ্যই দ্রুত প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা বোধ করবো না, যদি নতুন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের হাতে আসে, যা কিনা বিবর্তনকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে। কোনো সত্যিকারের মৌলবাদী এভাবে কোনো কথা কখনোই বলবেন না।

তীব্র আবেগ আর মৌলবাদীতা, এই দুটি বিষয়কে একই মনে করে সংশয়াচ্ছন্ন হওয়া খুবই সহজ। আমাকে যথেষ্ট আবেগ তাড়িত মনে হতে পারে, আমি যখন মৌলবাদী কোনো সৃষ্টিতত্ত্ববাদীর বিরুদ্ধে বিবর্তনের পক্ষে লড়াই করি, কিন্তু এর কারণ তাদের মৌলবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এটি আমার কোনো মৌলবাদ তা কিন্তু নয়। এর কারণ বিবর্তনের সপক্ষে প্রশ্নাতীতভাবে অত্যন্ত দৃঢ় অসংখ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে এবং আমি আবেগময় একটি হতাশার শিকার হই, যখন দেখি আমার বিরোধী পক্ষ সেটি অনুধাবন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বা সাধারণত যা হয়ে থাকে, প্রমাণগুলোর দিকে তারা নজর দিতেই অস্বীকার করেন, শুধুমাত্র যার কারণ যখন এটি তাদের পবিত্র গ্রন্থের সাথে ভিন্নমত পোষণ করছে। আমার সেই আবেগ আরো জোরালো হয়, যখন আমি দেখি এই সব দুর্ভাগা মৌলবাদীরা এবং তারা যাদের প্রভাবিত করছে তারা বিবর্তনের ধারণাটি অনুধাবন না করতে পেরে ঠিক কতটুকু ‘বঞ্চিত’ হচ্ছেন। বিবর্তনের সত্যগুলো এবং সেই সাথে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো প্রত্যেকটি অত্যন্ত গভীরভাবে বিস্ময়কর এবং সুন্দর। আসলেই কতটুকু দুর্ভাগ্যজনক যদি তা না জেনেই কাউকে মরতে হয়! অবশ্যই সেই বিষয়টি আমাকে তীব্র আবেগাক্রান্ত করে ফেলে, আর কেনই বা তা করবে না? কিন্তু বিবর্তনে আমার বিশ্বাস কখনোই মৌলবাদ সমতূল্য নয় আর এটি কোনো অন্ধবিশ্বাসও না, কারণ আমি জানি আমার মন পরিবর্তন করতে কি প্রয়োজন এবং আমি আনন্দের সাথেই তা করবো যদি প্রয়োজনীয় প্রমাণ মেলে।

এবং এরকম ঘটনা বহু ঘটেছেও। আগে বেশ কয়েকবার আমি স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থী থাকাকালীন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের একজন সম্মানিত নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞের গল্প বলেছিলাম, বহু বছর ধরে তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথেই বিশ্বাস করতেন এবং পড়াতেন যে ‘গলজি অ্যাপারাটাসের’ (প্রাণী কোষের অভ্যন্তরে একটি আণুবীক্ষণিক অঙ্গাণু) আসলে বাস্তব কোনো অস্তিত্ব নেই: একটি বিভ্রম বা ভুল করে মনে করা কোনো একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র। প্রতি সোমবার বিকেলে প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের একটি প্রথা ছিল, সমস্ত বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একজন অতিথি বিজ্ঞানীর সেমিনারে অংশ নেবেন। এক সোমবারে আমাদের অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন কোষবিজ্ঞানী, যিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণসহ আমাদের

জানিয়েছিলেন, গলজি অ্যাপারাটাস বলে আসলেই কোষের অভ্যন্তরে অঙ্গাণু আছে। সেই বক্তৃতার শেষে সেই বৃদ্ধ অধ্যাপক হল ভর্তি মানুষের সামনে এসে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীর সাথে হাত মেলালেন এবং বেশ আবেগের সাথে বলেন, 'প্রিয় সহকর্মী, আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, গত পনেরো বছর ধরে আমি ভুল জানতাম'। আমরা সবাই তখন হাততালি দিয়ে উঠেছিলাম সজোরে। কোনো মৌলবাদী কখনোই তা করবে না। এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক বিজ্ঞানীও হয়তো আক্ষরিকার্থে তা করবেন না, কিন্তু এটিকে আদর্শ হিসাবে চিহ্নিত করে সব বিজ্ঞানীরাই অন্তত সায় দেবেন। যার ব্যতিক্রম রাজনীতিবিদরা কিন্তু তা করবেন না কখনোই, তারা হয়তো বলবেন এগুলো হচ্ছে মতামত একেবারে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে নেয়া বা ডিগবাজি । একটু আগেই বর্ণনা করা এই ঘটনাটির স্মৃতি এখনো আমাকে আবেগতাড়িত করে।

একজন বিজ্ঞানী হিসাবে, আমি মৌলবাদী ধর্মের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করি কারণ এটি সক্রিয়ভাবে বৈজ্ঞানিক সব উদ্যোগকে কলুষিত করছে। ধর্ম আমাদের শেখায়, আমরা যেন আমাদের মন পরিবর্তন না করি, মহাবিশ্বে যত বিস্ময়কর জিনিস জানার আছে আমরা যেন সেগুলো সম্বন্ধে জানার কোনো আগ্রহ অনুভব না করি কিংবা সক্রিয়ভাবে জানার চেষ্টা না করি। এটি বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য ব্যাহত করে, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে দুর্বল করে দেয়। আমার জানা মতে এর সবচেয়ে দুঃখজনক উদাহরণ হচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ববিদ কার্ট ওয়াইস, যিনি এখন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসির ডেটনে ব্রায়ান কলেজের 'সেন্টার ফর অরিজিনস রিসার্চের' পরিচালক। কলেজটির নাম ব্রায়ান হবার কারণ কিন্তু কোনো দুর্ঘটনা নয়, এর নামকরণ হয়েছে উইলিয়াম জেনিংস ব্রায়ানের নামানুসারে, যিনি বিজ্ঞানশিক্ষক জন স্কোপসের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, যা ১৯২৫ সালের ডেটন 'মাঙ্কি ট্রায়াল' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। ওয়াইস তার শৈশবের স্বপ্ন পূরণ করতে পারতেন কোনো একটি সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হয়ে, যার মূলমন্ত্র হয়তো হতো 'বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করতে হবে', ব্রায়ান কলেজের ওয়েবসাইটে উল্লেখিত স্ববিরোধী শব্দ দিয়ে সৃষ্ট কোনো মূলমন্ত্র না - 'বিশ্লেষণী মনোভাব এবং বাইবেলের মত চিন্তা করুন'। ওয়াইস শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূতত্ত্ববিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন এবং এরপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরো ভূতত্ত্ববিদ্যা এবং জীবাশ্মবিদ্যায় (কোনো অংশেই যা কম নয়) দুটি উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি বিখ্যাত অধ্যাপক স্টিফেন জে. গুল্ডের ছাত্র ছিলেন (আরো বিশাল একটি ব্যপার)। তিনি খুবই যোগ্য এবং মেধাবী একজন বিজ্ঞানী ছিলেন, যে-কোনো প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে অধ্যাপনা ও গবেষণা করবেন, তার জীবনের এমন একটি স্বপ্ন পূরণ করার পথেই তিনি অগ্রসর হচ্ছিলেন।

ঠিক তখনই একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এই আঘাতটি বাইরে থেকে নয়, তার নিজের ভিতর থেকেই এসেছিল, তার নিজের মন থেকে। একটি মৌলবাদী ধর্মের ছত্রছায়ায়

প্রতিপালিত হবার কারণে যে মনটি মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়েছিল। যে মৌলবাদী বিশ্বাস তাকে পৃথিবীর বয়স - শিকাগো ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজের ভূতাত্ত্বিক পড়াশুনার বিষয় - দশ হাজার বছরেরও কম, এমন একটি ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করেছিল। তবে তিনি একটি বিষয় উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন: তার ধর্মবিশ্বাস আর বিজ্ঞান পারস্পরিক সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং তার মনের ভিতরেও সেই দ্বন্দ্বটি ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছিল, এবং একদিন তিনি আর সহ্য করতে পারেননি, ব্যপারটা সমাধান করার জন্য একটি কাচি হাতে বাইবেল নিয়ে বসেছিলেন। যদি পৃথিবী সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা থেকে তার অর্জিত বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো সত্য হয়ে থাকে, তাহলে বাইবেলের যে অংশগুলোকে বাতিল করতে হবে, তিনি আক্ষরিক অর্থে সেই অংশগুলোকে কাটতে শুরু করেছিলেন। এই অতিমাত্রায় সৎ আর কষ্টকর অনুশীলনের পর, তার বাইবেলটির আসলেই খুব কম অংশ অক্ষত ছিল:

> যতই চেষ্টা করিনা কেন আমি, সারা ধর্মগ্রন্থ জুড়ে অক্ষত মার্জিন থাকার সুবিধা সত্ত্বেও বাইবেলটি দুই ভাগে বিভক্ত না হয়ে যাওয়া ছাড়া আমি কোনোভাবেই সেটি হাতে ধরতে পারছিলাম না। আমাকে সিদ্ধান্ত নিতেই হবে বিবর্তন আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কোনটিকে আমি বেছে নেব। হয় ধর্মগ্রন্থ সত্য এবং বিবর্তন ভুল, কিংবা যদি বিবর্তন সত্য হয়, তাহলে আমাকে অবশ্যই বাইবেল ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে, সেই রাতে আমি ঈশ্বরের কথা মেনে নেই এবং বাইবেল পরিপন্থী বিবর্তনসহ সবকিছুকে প্রত্যাখ্যান করি। এবং এভাবে, অনেক দুঃখের সাথে বিজ্ঞানে আমার সব স্বপ্ন আর আশাকে আগুনে ছুড়ে ফেলি (৬)।

বিষয়টি আমাকে দারুণ ব্যাথিত করে। কিন্তু অন্যদিকে ‘গলজি অ্যাপারাটাসের’ গল্পটি মুগ্ধতায় আর শ্রদ্ধায় আমাকে আন্দোলিত করে, কার্ট ওয়াইসের কাহিনী আসলে করুণারই উদ্রেক করে.. করুণা এবং বিতৃষ্ণা। তার নিজের পেশাগত জীবন আর তার জীবনের সুখের প্রতি এই আঘাত তার নিজেরই দেয়া.. যা খুব বেশি অপ্রয়োজনীয় ছিল.. সহজেই এড়ানোও সম্ভব ছিল। শুধু তাকে বাইবেলকে ছুড়ে ফেলে দিতে হতো, বা তিনি সেটাকে প্রতীকী বা রূপকভাবে ব্যাখ্যা করতেন, যেমন করে বিভিন্ন ধর্মতাত্ত্বিকরা করে থাকেন। তবে তার বদলে তিনি মৌলবাদীদের মতোই কাজটি করেছিলেন এবং বিজ্ঞানকে ছুড়ে ফেলে দেন তার জীবন থেকে..সেই সাথে প্রমাণ এবং যুক্তি, তার সব স্বপ্ন আর আশাগুলো।

হয়তো মৌলবাদীদের মধ্যে অনন্য এক উদাহরণ, কার্ট ওয়াইস ছিল সৎ, হয়তো অতিমাত্রায় সৎ একজন ব্যক্তি, যার সততা তাকে কষ্ট দিয়েছে এবং ধ্বংস করেছে। তাকেই টেম্পলটন পুরষ্কার দেয়া উচিত, তিনি হয়তো এর প্রথম সত্যিকারের যোগ্য

পুরষ্কৃত কেউ হতে পারতেন। ওয়াইস সবার সামনে যে বিষয়টি নিয়ে আসেন, সেটা সাধারণত সকল মৌলবাদীদের মনে গোপনে সবার চোখের আড়ালেই ঘটছে সবসময়ই, যখন তারা বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণের মুখোমুখি হন, যা তাদের দৃঢ়ভাবে ধারণ করা মতামতের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে। তার কাহিনী উপসংহারটি লক্ষ করুন:

> যদিও অপেক্ষাকৃত কম প্রাচীন একটি পৃথিবীকে মেনে নেয়ার প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক কারণ আছে, তবে আমি একজন 'ইয়াং আর্থ ক্রিয়েশনিস্ট' কারণ ধর্মগ্রন্থ থেকে আমি আমার এই উপলব্ধিটি পেয়েছি। বহু বছর আগে, যখন কলেজে ছিলাম, অধ্যাপকদের সাথে যেমন এই বিষয়টি নিয়ে আমি আলাপ করেছিলাম, যদি এই মহাবিশ্বের সব প্রমাণ সৃষ্টিতত্ত্ববাদের বিরুদ্ধে যায়, সেটি স্বীকার করার জন্য আমিই হবো প্রথম ব্যক্তি, কিন্তু তারপরও আমি সৃষ্টিতত্ত্ববাদী থাকবো কারণ ঈশ্বরের নিজের কথায় তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে, এবং এখানেই আমাকে অবশ্যই স্থির থাকতে হবে (৬) ।

তিনি সম্ভবত লুথারের (৭) উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন তার শেষ সিদ্ধান্তে স্থির হয়ে দাড়ানোর কথা বলতে গিয়ে, যেমন লুথার তার নিজের মূল বক্তব্যকে ভিটেনবুর্গের চার্চের দরজায় আটকে দিয়েছিলেন। কিন্তু হতভাগা কার্ট ওয়াইস আমাকে বরং অরওয়েলের (৮) 'নাইনটিন এইটি ফোর' (৯) বইটির উইনস্টোন স্মিথের (১০) কথাই বেশি মনে করিয়ে দেয়, যে কিনা বিগ ব্রাদার যদি বলেন দুই আর দুই যোগ করলে পাঁচ হবে, তাই বিশ্বাস করার প্রাণান্তরকর প্রচেষ্টা করেছিল। যদিও উইনস্টোন, নির্যাতিত হয়েছিলেন। ওয়াইসের এই ভিন্ন চিন্তার কারণ কিন্তু অবশ্যম্ভাবী শারীরিক নির্যাতনের আশঙ্কা নয়, বরং তার জন্য ভিন্ন একটি অনতিক্রম্য বাধ্যবাধকতা ছিল - আপাতদৃষ্টিতে কারো কারো কাছে যা অনস্বীকার্য ও শিরোধার্য, তা হলো ধর্মবিশ্বাস: তর্কসাপেক্ষে যা মানসিক নিপীড়নেরই আরেকটি রূপ। আমি ধর্ম সম্বন্ধে বৈরী মনোভাব পোষণ করি কারণ কার্ট ওয়াইসের সাথে এটি যা করেছে এবং ধর্ম যদি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত কোনো ভূতত্ত্ববিদের সাথে এমন করতে পারে তাহলে চিন্তা করে দেখুন অন্য যে-কোনো সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে, যাদের সেই মেধাও নেই, এবং প্রতিরোধ করার মত কোনো প্রস্তুতি নেই, তাহলে এটি কি করতে পারে।

অগণিত নিরীহ, উৎসাহী, কৌতূহলী, আর পরিষ্কার ভালো মনের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাকে ধ্বংস করতে মৌলবাদী ধর্ম বদ্ধপরিকর। আর অমৌলবাদীদের তথাকথিত 'মৃদু' আর 'কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন' ধর্ম হয়তো তা করছে না ঠিকই, তবে অবশ্যই এটি পৃথিবীকে মৌলবাদীদের জন্য নিরাপদ করে তুলছে, খুব শৈশব থেকেই শিশুদের একটি মন্ত্র শিখিয়ে, সেটি হচ্ছে: প্রশ্নাতীত অন্ধ বিশ্বাস হচ্ছে একটি মহৎ গুণ।

মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজম (১১) বা নৈতিক চূড়ান্তবাদের অন্ধকার রূপ

আগের অধ্যায়ে যখন সময়ের সাথে পরিবর্তিত হওয়া নৈতিকতার জাইটগাইষ্ট বা যুগধর্মকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিলাম, আমি উদারপন্থী, জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত, সুশীল মানুষদের সর্বজনীন ঐকমতের একটি ধারণার কথা উল্লেখ করেছিলাম। আমি একটু বেশি মাত্রায় আশাবাদী ধারণা করেছিলাম যে, 'আমরা' সবাই অন্তত মোটা দাগে সেই ঐকমতের সাথে সংহতি অনুভব করি, কেউ কেউ হয়তো অন্যদের চেয়ে বেশি এবং আমি এই 'আমরা' বলতে মনে করেছিলাম.. অধিকাংশ মানুষ যাদের এই বইটি পড়ার সম্ভাবনা আছে, ধর্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসে তাদের যে অবস্থান থাকুক না কেন। কিন্তু অবশ্যই একেবারে সবাই যে একমত হবেন, তা কিন্তু না (এবং সবাই যে আমার এই বইটি পড়ার ইচ্ছা পোষণ করবেন তাও কিন্তু না)। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে স্বৈরাচার এখনো তার মৃত্যু থেকে অনেক দূরে। আসলেই, আজ এখনো বিশ্বজুড়ে এটি বিশাল সংখ্যক মানুষের মনে রাজত্ব করছে, সবচেয়ে বিপদজ্জনকভাবে মুসলিম বিশ্বে এবং যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্কুরিত হতে থাকা ধর্মতন্ত্রে (কেভিন ফিলিপসের 'আমেরিকান থিওক্র্যাসি' বইটি দেখুন (১২)); প্রায় সবসময়ই এই ধরনের অ্যাবসোল্যুটিজম বা চূড়ান্তবাদের মূল উৎস হচ্ছে শক্তিশালী ধর্মীয় বিশ্বাস। এবং ধর্ম যে পৃথিবীতে একটি অশুভ শক্তি এমন প্রস্তাবের এটি মূলত প্রধান একটি কারণ।

ওল্ড টেস্টামেন্টে ব্লাসফেমি বা ধর্মনিন্দা (ধর্ম অবমাননা) জন্য সবচেয়ে নৃশংসতম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছিল, এবং এটি এখনো কিছু দেশে সক্রিয়। পাকিস্তানের পেনাল কোডের ২৯৫-সি সেকশনে এই 'অপরাধের' জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। ২০০১ সালে ১৮ আগস্ট, ডাঃ ইউনুস শেখ, একজন চিকিৎসক শিক্ষক ব্লাসফেমির জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। যে নির্দিষ্ট অপরাধটির জন্য এই আইনে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন সেটি হলো: তিনি তার শিক্ষার্থীদের নাকি বলেছিলেন নবী মোহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে তার নিজের ধর্ম আবিষ্কারের পূর্বে মসুলমান ছিলেন না। তার ১১ জন শিক্ষার্থী এই ধরনের বক্তব্য দেবার মত 'অপরাধ' করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে তার নামে অভিযোগ করেছিল। পাকিস্তানের ব্লাসফেমি আইনটি সাধারণত খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, যেমন, অগাস্টিন আশিক কিংরি মাসিহ, যাকে ফয়সালাবাদে ২০০০ সালে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হিসাবে মাসিহ তার মুসলিম প্রেমিকাকে বিয়ে করার কোনো অনুমতি ছিল না - অবিশ্বাস্যভাবে- পাকিস্তানী (এর ইসলামী) আইন কোনো মুসলিম রমণীকে কোনো অমুসলিমকে বিয়ে করার অনুমতি দেয় না। সুতরাং তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার চেষ্টা করেন, এবং সেটা করতে গিয়ে এই ধর্মগ্রহনের জন্য তার নিশ্চয়ই নীচ কোনো উদ্দেশ্য আছে এমন একটি অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হন । আমি যে রিপোর্ট পড়েছি সেটা থেকে স্পষ্ট নয়,

এটাই কি তার মূল অপরাধ ছিল, নাকি নবীর নিজের নৈতিকতা নিয়ে তার কোনো মন্তব্য, যা তিনি করেছিলেন বলেও তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। যা-ই হোক, অন্য যে-কোনো দেশে, যাদের আইন ধর্মীয় গোঁড়ামীমুক্ত, সেখানে এই ধরনের কোনো অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড কল্পনা করাও অসম্ভব।

২০০৬ সালে আফগানিস্থানে, আব্দুল রহমান খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করার জন্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কাউকে কি তিনি খুন করেছিলেন ? নাকি হিংস্র কোনো উপায়ে তিনি কাউকে আহত করেছিলেন, কিংবা কোনো কিছু চুরি, বা ধ্বংস করেছিলেন? নাহ, শুধুমাত্র একটি কাজই তিনি করেছিলেন: তিনি তার মন পরিবর্তন করেছিলেন, তার নিজের ভিতরে এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি তার মন পরিবর্তন করেছিলেন। তবে তিনি যে কিছু ধারণা আর চিন্তা তার মনে পোষণ করেছিলেন, সেগুলো তার দেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের পছন্দ হয়নি। এবং মনে রাখতে হবে এই আফগানিস্থান কিন্তু তালিবানদের আফগানিস্থান নয়, বরং হামিদ কারজাইয়ের (১৩) মুক্ত আফগানিস্থান, যুক্তরাষ্ট্রের নের্তৃত্বে যৌথবাহিনী যে সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল। জনাব রহমান মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিলেন, তবে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য নিজেকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাবী করে এবং প্রবল আন্তর্জাতিক চাপের মুখে। ইসলামের গোঁড়া কর্তব্য পালন করতে অতিউৎসাহী গুণ্ডাদের হাত থেকে নিজের প্রাণ বাঁচাতে বর্তমানে তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ে ইটালিতে অবস্থান করছেন । তালিবান শাসন মুক্ত করা আফগানিস্থানের সংবিধানের এটি এখনো একটি ধারা হিসাবে বিদ্যমান, ধর্মত্যাগের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। অ্যাপোস্টেসি বা ধর্মত্যাগ, মনে রাখতে হবে, কিন্তু কোনো ধরনের সত্যিকারের মানুষের ওপর ঘটানো, বা কোনো সম্পদের ক্ষতি করা নয়। জর্জ অরওয়েলের 'নাইনটিন এইটি ফোর' উপন্যাসটি থেকে যদি শব্দ ব্যবহার করে বলি, এটি হচ্ছে 'থট ক্রাইম', অর্থাৎ বিশুদ্ধভাবে চিন্তাজগতের অপরাধ বা এবং ইসলামী আইন অনুযায়ী যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। আরেকটি উদাহরণ, ১৯৯২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর, সাদিক আব্দুল কারিম মালল্লাহ-এর ক্ষেত্রে যেমন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছিল। আইনগতভাবে তাকে ধর্মনিন্দা এবং ধর্মত্যাগে দোষী সাব্যস্ত হবার পর, সৌদি আরবে জনস্বমক্ষে তাকে শিরোচ্ছেদ করা হয় (১৩) ।

আমি একবার টেলিভিশনে সম্প্রচারিত একটি বিতর্কে স্যার ইকবাল সাকরানির মুখোমুখি হয়েছিলাম। যার কথা আমি ইতোমধ্যে প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, যাকে বলা হয় ব্রিটেনের নের্তৃত্বস্থানীয় মধ্যপন্থী মুসলিম। ধর্মত্যাগের সাজা মৃত্যুদণ্ড নিয়ে তাকে আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম। তিনি খুব কসরত করে আমার প্রশ্নের পাশ কাটিয়ে যান, প্রথাটি না স্বীকার করে, বা এর বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা না জানিয়ে। তিনি বার বার মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছিলেন, বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কিছু না বলে। এই হচ্ছে সেই মানুষ

তথাকথিত আন্তঃধর্মবিশ্বাস সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্য যাকে ব্রিটিশ সরকার ‘নাইট’ উপাধি দিয়েছে।

কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মেও আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই। এই ব্রিটেইনে প্রায় সাম্প্রতিক সময়ে, ১৯২২ সালে ধর্মনিন্দার কারণে জন উইলিমার গোটকে মোট নয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল: তিনি যীশুকে একটি ভাড়ের সাথে তুলনা করেছিলেন (১৪)। প্রায় অবিশ্বাস্য যে এখনো ব্রিটেনের আইনে ধর্মনিন্দার আইনটি বিদ্যমান। ২০05 সালে একটি খ্রিস্টান গ্রুপ ‘জেরি স্প্রিংগার, দ্য অপেরা’ সম্প্রচার করার জন্য বিবিসি টেলিভশনের বিরুদ্ধে এই ব্লাসফেমি আইন ব্যবহার করে অভিযোগ আনার চেষ্টা করেছিল (১৫)।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে ‘আমেরিকান তালিবান’ শব্দটি সৃষ্টি হবার অপেক্ষায় ছিল উদগ্রীবভাবে। দ্রুত আপনি গুগল সার্চ করলে দেখবেন কমপক্ষে এক ডজন ওয়েব সাইট তা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মীয় নেতা, ধর্মবিশ্বাস নির্ভর রাজনীতিবিদদের যে পরিমাণ উদ্ধৃতি তারা সংগ্রহ করেছে তা ভয়াবহভাবে আফগান তালিবান, আয়াতোল্লাহ খোমেনী এবং সৌদি আরবের ওয়াহাবী কর্তৃপক্ষর সংকীর্ণ মানসিকতা, নির্মম নৃশংসতা আর চূড়ান্ত কুৎসিত মনোভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘দি আমেরিকান তালিবান’ নামে ওয়েবপেজটি কুৎসিৎভাবে জঘণ্য আর উন্মত্ত এই ধরনের সব উদ্ধৃতি দ্বারা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। যার শুরুতেই আছে সেরাটি - যার উৎস অ্যান কোলটার। সহকর্মীরা আমাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে এটি কোনো গাঁজাখুরী বানানো মন্তব্য নয়, এটি আবিষ্কার করেছিল ‘দি অনিয়ন’ পত্রিকা: ‘আমাদের উচিত অন্য দেশগুলোকে আক্রমণ করে তাদের সব নেতাদের হত্যা করা ও তাদের খ্রিস্ট ধর্মে রূপান্তরিত করা’ (১৬)।

এছাড়া এই ধরনের আরো কিছু অতুলনীয় মানসিকতাপূর্ণ উদ্ধৃতির নমুনা হচ্ছে, যেমন কংগ্রেস সদস্য বব ডরনান বলেছিলেন: “গে শব্দটি ব্যবহার করবেন না, যদি না সেটি ‘গট এইডস ইয়েট’ (বা এখনো এইডস হয়নি) বাক্যটির শব্দসংক্ষেপ না হয়’। এছাড়া জেনারেল উইলিয়াম জি. বয়কিনস বলেছিলেন,‘জর্জ বুশ যুক্তরাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হননি, তাকে নিয়োগ দিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর’। এছাড়াও আছে একটি পুরোনো বিখ্যাত রোন্যাল্ড রিগ্যান শাসনামলের পরিবেশনীতির বিখ্যাত সেক্রেটারীর: ‘পরিবেশকে সুরক্ষা করার আমাদের কোনো দরকার নেই, খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন আসন্ন’। আফগান তালিবান আর আমেরিকান তালিবান হচ্ছে উৎকৃষ্ট উদাহরণ, কি ঘটে যখন মানুষ তাদের ধর্মগ্রন্থকে আক্ষরিকভাবে এবং অতিরিক্ত গুরুত্বের সাথে ও প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণ করে। ওল্ড টেস্টামেন্টের ধর্মতন্ত্রের অধীনে জীবন কত ভয়াবহ হতে পারে তার একটি আধুনিক সংস্করণ আমরা এখানেদেখতে পাই। কিম্বার্লি ব্লেকার তার ‘দ্য ফাণ্ডামেন্টালস অব এক্সট্রিমিজম: দ্য ক্রিশ্চিয়ান রাইটস ইন আমেরিকা’ বইয়ে

খ্রিস্টান তালিবানদের (যদিও এই নামে নয়) বিপদজ্জনক রূপটির বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন (১৭)।

ধর্মবিশ্বাস এবং সমকামিতা

তালিবানদের অধীনে আফগানিস্থানে সমকামিতার আইনগত শাস্তির বিধান ছিল মৃত্যুদণ্ড এবং সেটি কার্যকর করার জন্য তাদের রুচি অনুযায়ী যে পদ্ধতি তারা অনুসরণ করতো তা হলো, অভিযুক্তকে কোনো একটা প্রাচীরের গোঁড়ায় মাটিতে জীবন্ত কবর দিয়ে তার উপরে ভারি প্রাচীরটিকে ঠেলে ফেলে দেয়া। এই তথাকথিত 'অপরাধটি' একান্তই ব্যক্তিগত একটি ব্যপার, যা দুজন সম্মত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ঘটে যারা অন্য কারো কোনো ক্ষতি করেনি, আমরা এখানে আবার দেখতে পাই ধর্মীয় চূড়ান্তবাদী মানসিকতার একটি বৈশিষ্ট্যসূচক উদাহরণ। আমার নিজের দেশ ইংল্যান্ডেরও এক্ষেত্রে নাক উঁচু করার কোনো অধিকার নেই। বিস্ময়করভাবে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ব্যক্তিগত জীবনে সমকামিতাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। ১৯৫৪ সালে ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ অ্যালান ট্যুরিং (১৮), জন ভন নিউমানের (১৯) সাথে যিনি কম্পিউটারের জনক হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার দাবী রাখেন, আত্মহত্যা করেছিলেন তার ব্যক্তিগত জীবনে সমকামিতার কারণে অভিযুক্ত হবার পর। অস্বীকার করছি না যে ট্যুরিংকে বর্বরভাবে কোনো প্রাচীরের গোঁড়ায় জীবন্ত কবর দিয়ে তার ওপর প্রাচীর চাপা দেয়া হয়নি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। তবে তাকে দুটো বিকল্প দেয়া হয়েছিল, দুই বছরের কারাদণ্ড (কল্পনা করা খুবই সহজ যে জেলখানায় অন্য কয়েদীরা তার সাথে কেমন ব্যবহার করতো) অথবা হরমোন ইনজেকশনের একটি কোর্স যাকে বলা যেতে পারে রাসায়নিক নপুংসকরণ। যা তার স্তনের আকারও বাড়াতো। সুতরাং তার সর্বশেষ, এবং ব্যক্তিগত পছন্দ ছিল সায়ানাইড ইনজেক্ট করা একটি আপেল (২০)।

জার্মান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত জটিল 'এনিগমা' কোডের রহস্য খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী এই বুদ্ধিজীবি, নাৎসিদের পরাজিত করার ক্ষেত্রে যিনি তর্কসাপেক্ষে আইসেনহাওয়ার এবং চার্চিলের চেয়েও বেশি অবদান রেখেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত মিত্রবাহিনীর সেনাপতিরা জার্মান সেনাপতিদের পাঠানো অতিগোপনীয় 'এনিগমা' সংকেতাবদ্ধ বার্তা ব্লেচলী পার্কে ট্যুরিং ও তার 'আল্ট্রা' সহকর্মীদের কল্যাণে মর্মোদ্ধার করার মাধ্যমে কার্যকর করার বেশ আগেই জার্মান পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছিলেন। যুদ্ধের পর, ট্যুরিং-এর দ্বায়িত্ব আর যখন অতিগোপনীয় ছিলনা, জাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে তাকে নাইটহুড দিয়ে সম্মানিত করা উচিত ছিল। কিন্তু তার পরিবর্তে একটি অপরাধের জন্য ভদ্র এবং অসাধারণ এই প্রতিভাটিকে তার জাতি ধ্বংস করেছিল, তথাকথিত যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে তার একান্ত জীবনে, কারো কোনো ক্ষতি যে অপরাধে ঘটেনি। আবারো

ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক নৈতিকতাবাদের সেই নির্ভুল বৈশিষ্ট্যমূলক চিহ্ন, যেখানে একজন ধর্মবাদী অন্য মানুষরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে কি করছে (এমনকি তারা কি চিন্তা করছে) সেগুলো নজরদারী করতে বাড়তি আগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন।

'আমেরিকার তালিবানদের' সমকামিতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় চূড়ান্তবাদের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। রেভারেন্ড জেরি ফলওয়েল এর কথা শুনুন, যিনি লিবার্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা: 'এইডস সমকামিদের জন্য শুধু ঈশ্বরের শাস্তিই কেবল না, এটি সমকামিতা সহ্য করার জন্য পুরো সমাজের ওপর ঈশ্বর প্রদত্ত একটি শাস্তি' (২১)। এই ধরনের মানুষগুলোর সম্বন্ধে আমার প্রথম যেটা নজরে আসে সেটা হলো তাদের বিস্ময়কর খ্রিস্টীয় মহানুভবতা। কোনো ধরনের একজন ভোটার আসলেই ধর্মীয় গোঁড়ামীতে পূর্ণ, কোনো কিছু সম্বন্ধে সঠিক কোনো জ্ঞান না থাকা এমন একজনকে সিনেটরকে - যেমন, নর্থ ক্যারোলাইনার রিপাবলিকান জেসি হেমস - নির্বাচিত করে যেতে পারে বছরের পর বছর? যে মানুষটা ব্যাঙ্গ করে বলেছিলেন, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস' আর 'ওয়াশিংটন পোস্ট' নিজেরাই সমকামিদের দ্বারা আক্রান্ত, সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই সমকামি' (২২)। এর উত্তর আমার মনে হয়, তার ভোটাররা আসলেই সে ধরনের মানুষ, যারা নৈতিকতাকে সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেন, এবং আর যারা তাদের মত একই চূড়ান্তবাদী বিশ্বাস ধারণ করে না, তাদের হুমকি মনে করেন।

আমি এর আগে 'ক্রিশ্চিয়ান কোয়ালিশনের' প্রতিষ্ঠাতা প্যাট রবার্টসনের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছিলাম । তিনি ১৯৮৮ সালে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পাবার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য একজন প্রার্থী ছিলেন, এবং প্রায় ৩০ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক তিনি তার প্রচারণার কাজে ব্যবহার করেছিলেন, সেই সাথে সমতূল্য পরিমাণ আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাও তার ছিল: কি পরিমাণ জনসমর্থন আছে এমন একজন মানুষের প্রতি যার স্বভাবসুলভ কিছু মন্তব্য যেমন: '(সমকামিরা) চার্চে আসতে চায় এবং চার্চ সার্ভিসকে ব্যাহত করতে চায় চারিদিকে রক্ত ছড়িয়ে এবং মানুষকে এইডসে আক্রান্ত করার মাধ্যমে এবং যাজকদের মুখে থুতু দেবার জন্য'। বা '(প্ল্যানড প্যারেন্টহুড) শিশুদের সেচ্ছাচারী যৌনকর্মে উদ্বুদ্ধ করছে, মানুষকে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন, সব ধরনের পশুকাম, সমকামিতা, ইত্যাদ নানা কাজে লিপ্ত হতে উৎসাহ দিচ্ছে, যার প্রত্যেকটি কাজ বাইবেলে নিষিদ্ধ'। নারীদের প্রতি রবার্টসনের মনোভাবও, আফগান তালিবানদের কৃষ্ণ হৃদয়কেও উষ্ণ করবে: 'আমি জানি নারীদের এই কথা শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু যদি আপনারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, তাহলে অবশ্যই পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব, আপনার স্বামীকে আপনাদের মেনে নিতে হবে। পুরো সংসারের মাথায় আছেন যীশু খ্রিস্ট, আর স্ত্রীর উপরে আছেন তার স্বামী এবং এটাই এভাবে হবে, এর উপর আর কোনো কথা নেই'।

'ক্যাথলিকস ফর ক্রিশ্চিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশেনের' সভাপতি গ্যারি পটার বলেন, "যখন খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠরা এই দেশের ক্ষমতা নেবে, তখন শয়তানের প্রার্থনা ঘর আর থাকবে না। আর কোনো অবাধ পর্ণোপ্রাফির বিতরণ হবে না, সমকামিদের অধিকার নিয়ে আর কোনো কথা নেই। খ্রিস্টীয় সংখ্যাগরিষ্ঠরা ক্ষমতা দখলের পর, বহুজাতিবাদ বা বহুসংস্কৃতিবাদকে দেখা হবে অনৈতিক এবং অশুভ হিসাবে এবং রাষ্ট্র এমন কাউকে কোনো ধরনের 'অশুভ' কাজ করার অনুমতি দেবে না"। এই উদ্ধৃতি থেকে খুব পরিষ্কার এই অশুভ কাজের অর্থ এই না যে এমন কিছু করা, যা কিনা অন্য মানুষর উপর কোনো খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে, এটি বোঝাচ্ছে "ব্যক্তিগত" চিন্তা এবং কাজ, যা তথাকথিত খ্রিস্টীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মনের মত নয়।

ওয়েষ্টবোরো ব্যাপ্টিষ্ট চার্চের যাজক ফ্রেড ফেল্পস আরেকজন, যিনি খুবই তীব্রভাবে সমকামিতাবিদ্বেষী, যখন মার্টিন লুথার কিং-এর (২৩) বিধবা পত্নী মারা যান, তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যাজক ফ্রেড একটি পৃথক সমাবেশের আয়োজন করেন, সেখানে তার ব্যানারে লেখা ছিল, 'ঈশ্বর সমকামি ও সমকামি সমর্থকদের ঘৃণা করেন, সুতরাং ঈশ্বর করেটা স্কট কিং কেও ঘৃণা করেন এবং এখন তিনি তাকে নরকের আগুনে পোড়াচ্ছেন, যেখানে আগুন কখনো নেভে না এবং তার দগ্ধ হবার যন্ত্রণার ধোয়া উপরে উঠে আসবে অনবরত অনন্তকাল ধরে' (২৪)। ফ্রেড ফেল্পকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পাত্তা না দেয়া খুব সহজ, কিন্তু তার আছে প্রচুর মানুষের সমর্থন, যারা বিত্তবান। তার নিজের ওয়েবসাইট অনুযায়ী ফেল্প ১৯৯১ সাল থেকে মোট ২০,০০০ সমকামিতা বিরোধী সমাবেশের আয়োজন করেছেন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জর্ডান এবং ইরাক (হিসাবে প্রায় গড়ে প্রতি চারদিনে একটি), যেখানে তার ছাপানো স্লোগানের মধ্যে অন্যতম - " থ্যাং গড ফর এইডস"। তার ওয়েবসাইটটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি হিসাব বা টালি, যা কোনো বিশেষ একজন সমকামি মারা গেলে কত দিন সে নরকের আগুনে পুড়ছে তার সংখ্যা প্রদর্শন করে। সমকামিতার প্রতি মানসিকতা ধর্ম অনুপ্রাণিত নৈতিকতার অনেককিছুই স্পষ্ট করে দেয়, সেই একই রকম নৈতিকতা আমরা দেখি গর্ভপাত ও মানব জীবনের পবিত্রতা সংক্রান্ত পরবর্তী কিছু উদাহরণে।

ধর্মবিশ্বাস এবং মানব জীবনের পবিত্রতা

মানব ভ্রূণ মানব জীবনেরই প্রতিনিধিত্ব করে, সুতরাং চূড়ান্তবাদী ধর্মীয় আলোকে গর্ভপাত হচ্ছে প্রশ্নাতীতভাবে গর্হিত একটি কাজ: পুরোদস্তুর একটি হত্যাকাণ্ড। আমি ঠিক নিশ্চিৎ না, বিষয়টি আমি কিভাবে ব্যাখ্যা করবো, আমার নিজস্ব এবং সংগৃহীত কিছু পর্যবেক্ষণ হচ্ছে অনেকেই যারা ভ্রূণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে থাকেন, সাধারণত দেখা যায় পূর্ণবয়স্ক কোনো মানুষ হত্যা করার ব্যপারে আবার তাদের উৎসাহের কোনো ঘাটতি নেই। নিরপেক্ষভাবে বলতে হলে নিয়মানুযায়ী এটি

রোমান ক্যাথলিকদের জন্য আবার প্রযোজ্য নয়, গর্ভপাতের বিরুদ্ধে যারা সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ ও প্রতিবাদমুখর। নব্য গোঁড়া খ্রিস্টান যেমন, জর্জ ডাবলিউ. বুশ, যদিও আজকের সময়ে ধর্মীয় প্রভাবশালী অবস্থানের এটি একটি বৈশিষ্ট্যসুচক উদাহরণ, তিনি এবং তারা, মানব জীবন রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি কোনো মানব ভ্রূণ (বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মুমূর্ষু কোনো জীবন) (২৫) । এমনকি সেটা করার প্রচেষ্টায় তারা চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণায় বাঁধা দিতেও সর্বদা প্রস্তুত, অন্যথায় যে গবেষণা নিশ্চয়ই হয়তো বহু মানুষের জীবন বাঁচাতে পারতো। মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থানের কারণ কারো কারো কাছে অবশ্যই মানব জীবনের প্রতি সম্মান। ১৯৭৬ সাল থেকে যখন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট মৃত্যুদণ্ডের উপর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়, যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৫০টি রাজ্যের প্রদত্ত মোট মৃত্যুদণ্ডের এক তৃতীয়াংশ টেক্সাস কার্যকর করেছিল। এবং সেই রাজ্যের ইতিহাসে অন্য যে-কোনো গভর্নরের চেয়ে জর্জ বুশই সর্বাপেক্ষা বেশি মৃত্যুদণ্ডের আদেশে সই করেছিলেন, গড়ে প্রায় প্রতি ৯ দিনে ১ টি। হয়তো তিনি শুধু তার দ্বায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার রাজ্যের আইন অনুযায়ী কাজ করেছিলেন (২৬)? কিন্তু সিএনএন সংবাদ নেটওয়ার্কের সাংবাদিক টাকার কার্লসনের সেই বিখ্যাত রিপোর্টটির কি অর্থ করতে পারি তাহলে আমরা?.. কার্লসন, যিনি নিজে মৃত্যুদণ্ডের সমর্থক, হতবাক হয়েছিলেন গভর্নরের কাছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত একজন নারী বন্দির প্রাণ ভিক্ষা করার বিষয়টি নিয়ে বুশের পরিহাসমূলক অনুকরণ করা দেখে (২৭) । 'দয়া করুন' বুশ নাকি সুরে কেঁদে তার ঠোঁট মিথ্যা হতাশার কষ্টে সরু করে বলেন, 'আমাকে হত্যা করবেন না..দয়া করুন'। হয়তো এই নারী খানিকটা বেশি সহমর্মিতা পেতেন যদি তিনি মনে করিয়ে দিতেন কোনো না কোনো একসময় তিনিও একটি মানব ভ্রূণ ছিলেন। ভ্রূণ নিয়ে ভাবনা আসলেই ধর্মবিশ্বাসী বহু মানুষের মনেই খুব অদ্ভুত প্রভাব ফেলে। কলকাতার মাদার তেরেসা শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার গ্রহন করার সময় তার ভাষণে মন্তব্য করেন: 'শান্তির সবচেয়ে বড় বিনাশকারী হচ্ছে 'গর্ভপাত', কি ? এরকম উদ্ভট চিন্তা করা কোনো মহিলার অন্য যে-কোনো বিষয়ে মতামত গুরুত্বের সাথে নেয়া কি আদৌ সম্ভব? শান্তিতে নোবেল প্রাইজ পাবার মত কোনো যোগ্যতা তার আছে কিনা সেটা না হয় বাদই দিলাম। যদি কারো পবিত্রভাবে ভণ্ডামীপূর্ণ মাদার তেরেসার কথায় মন গলে যাবার সম্ভাবনা থাকে, তাদের ক্রিষ্টোফার হিচেন্সের (২৮) 'দ্য মিশনারী পজিশন: মাদার তেরিজা ইন থিওরি অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস' (২৯) বইটি (এবং এর একটি প্রামাণ্যচিত্রও ইন্টারনেটে আছে) অবশ্যই পড়ে দেখা উচিত।

আমেরিকার তালিবানের প্রসঙ্গে ফিরে আসি আবার, এবার রানডাল টেরির কথা শুনুন, যিনি 'অপারেশন রেসক্যু' নামে আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। যুক্তরাষ্ট্রে যে প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের গর্ভপাতের সেবা দেয়, এই আন্দোলনের সদস্যরা তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে: 'যখন আমি বা আমার মত কেউ, এই দেশ চালাবে, তখন আপনাদের জন্যে এ

দেশ ছেড়ে পালানোই সবচেয়ে উত্তম হবে, কারণ আমরা আপনাদের খুঁজে বের করবো, বিচার করবো এবং মৃত্যুদণ্ড দেবো, আর আমি আমার প্রত্যেকটি কথা সত্য বলছি; তাদের বিচার ও মৃত্যুদণ্ড যেন নিশ্চিৎ হয়, সেটা আমি আমার লক্ষ্যের একটি অংশ করে নেব'। টেরী এখানে সেই সব চিকিৎসকদের কথা বলছেন, যারা গর্ভপাতের সেবা প্রদান করেন। এবং তার খ্রিস্টীয় মনোভাব ও অনুপ্রেরণা তার এই বক্তব্যেই সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

> 'আমি চাই আপনারা আপনাদের উপর দিয়ে অসহিষ্ণুতার স্রোত প্রবাহিত হতে দিন, হ্যা.... ঘৃণা উত্তম, আমাদের লক্ষ্য একটি খ্রিস্টীয় জাতি; আমাদের বাইবেল নির্দেশিত কিছু কর্তব্য আছে। এই দেশটি জয় করে নিতে ঈশ্বর আমাদের আহবান করেছেন। আমরা বহুজাতি আর বহুমতবাদ চাই না, আমাদের লক্ষ্য খুব সাধারণ। ঈশ্বরের আইন, টেন কম্যান্ডমেন্ট মোতাবেক আমাদের একটি খ্রিস্টান জাতি বানাতে হবে, আর কোনো ক্ষমা প্রার্থনা নয়' (৩০)।

এরকম একটি খ্রিস্টীয় ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র অর্জন করার আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরিভাবে আমেরিকান তালিবানদের বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর অন্য প্রান্তে ফ্যাসিবাদী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তীব্র কামনা করা অন্য মানুষগুলোর প্রায় হুবহু প্রতিলিপি। এখনো রানডাল টেরি ক্ষমতায় আসীন হতে পারেননি। এই লেখার সময় (২০০৬) আমেরিকার রাজনৈতিক দৃশ্যপট পর্যবেক্ষণকারী এমন কেউই ততটা আত্মবিশ্বাসী হয়ে সে কথা বলতে পারেননি।

কোনো একজন পরিণামবাদী বা উপযোগিতাবাদী সম্ভবত গর্ভপাত বিষয়টিকে খুবই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন, ফলাফল বা কাজটির পরিণাম ও এবং এর সৃষ্ট দুর্ভোগ ওজন করার মাধ্যমে। ভ্রূণ কি কোনো কষ্ট অনুভব করতে পারে? (সম্ভবত না যদি স্নায়ুতন্ত্র আবির্ভাবের আগেই এর গর্ভপাত করে ফেলা হয়, এবং এমন কি যদি ভ্রূণের বয়স এমনও হয় যে তার স্নায়ুতন্ত্র আছে, সেক্ষেত্রেও এটি নিশ্চিৎভাবে কম কষ্ট সহ্য করবে, যেমন ধরুন একটি কসাইখানায় পূর্ণবয়স্ক একটি গরু যে কষ্ট সহ্য করে)। আর গর্ভবতী রমণী বা তার পরিবার কি কষ্ট সহ্য করতে পারে, যদি সেই গর্ভপাতটি না করা হয়? খুবই সম্ভাবনা আছে সেটি হবার; এবং যা-ই হোক না কেন, যেহেতু ভ্রূণের কোনো স্নায়ুতন্ত্র থাকে না, সেক্ষেত্রে মায়ের পূর্ণগঠিত স্নায়ুতন্ত্রকে কি এখানে আমাদের আরো বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত নয়?

এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে না যে, গর্ভপাতের বিরোধিতা করার জন্য পরিণামবাদী কারো হয়তো কিছু কারণ থাকতে পারে। পরিণামবাদীরা 'পিচ্ছিল ঢালু' যুক্তি ব্যবহার

করতে পারেন (যদিও আমি এই ক্ষেত্রে তা করতাম না)। হয়তো ভ্রূণ কোনো কষ্ট পায় না, কিন্তু যে সংস্কৃতি মানুষের জীবন কেড়ে নেয়ার বিষয়টি সহ্য করে, সেটি আরো ভয়ঙ্কর পরিণতির মুখোমুখি হবার ঝুঁকি থাকে: যেমন, কোথায় সেটি শেষ হবে? শিশু হত্যায়? এই নিয়মগুলোকে সংজ্ঞায়িত করতে জন্মাবার মুহূর্ত যদি একটি প্রাকৃতিক 'রুবিকন' বা চূড়ান্ত সীমারেখা নির্দেশ করে থাকে, এবং যুক্তি দেয়া যেতে পারে ভ্রূণ ক্রমবিকাশের শুরুর দিকে ঠিক এই সীমানার মত আগের কোনো সীমারেখা নির্দেশ করা কোনো পর্যায় খুঁজে বের করা কঠিন। এই 'পিচ্ছিল ঢালু' যুক্তি তাই আমাদের সংকীর্ণভাবে ব্যাখ্যা দেয়া উপযোগিতাবাদের চেয়ে হয়তো জন্মের মুহূর্তকে নির্দিষ্ট করে দেয় অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্ব দেয়ার জন্য।

ইউথানাসিয়া বা ইচ্ছামৃত্যুর বিরুদ্ধে যুক্তিও এই ধরনের পিচ্ছিল বক্তব্যের উপর দাড়িয়ে আছে। আমরা একটি কাল্পনিক উদ্ধৃতি আবিষ্কার করি নীতিশাস্ত্রের কোনো একজন দার্শনিকের কাছ থেকে: 'জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত এমন রোগীদের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবার জন্য আপনি যদি ডাক্তারদের অনুমতি দেন, তাহলে দেখা যাবে আর্থিক কারণে প্রত্যেকেই তাদের মাতামহদের হত্যা করার ফন্দি আটবে। আমরা দার্শনিকরা হয়তো চরমপন্থা থেকে মুক্ত হতে পেরেছি, কিন্তু শৃঙ্খলার প্রয়োজনেই সমাজের কিছু চূড়ান্ত নীতি দরকার, যেমন 'তোমরা হত্যা করবে না,' নতুবা আমরা কোথায় থামবো তার কোনো নিশানা থাকবে না। কিছু পরিস্থিতিতে চূড়ান্তবাদ হয়তো, অপেক্ষাকৃত কম আদর্শ পৃথিবীতে অবশ্যই সব ভুল কারণগুলোর জন্যই একেবারে অবুঝ নিরীহ পরিণামবাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো পরিণতি প্রদান করে'! আমাদের দার্শনিকদের হয়তো বেশ ভোগান্তি পোহাতে হতো, বেওয়ারিশ মৃত কোনো ব্যক্তিকে, যেমন, যাদের জন্য কেউ শোক করার নেই, রাস্তায় মরে পড়ে থাকা এমন কোনো নরমাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করার জন্য। কিন্তু 'পিচ্ছিল ঢালু'র সেই যুক্তি অনুযায়ী নরমাংস ভোজনের প্রতি নৈতিকতাবাদী চূড়ান্তবাদী নিষেধাজ্ঞাটি অত্যন্ত মূল্যবান, যা আমাদের হারানো ঠিক হবে না'।

'পিচ্ছিল ঢালু' যুক্তিটি হয়তো দেখা যেতে পারে যেখানে পরিণতিবাদীরা একধরনের পরোক্ষ চূড়ান্তবাদ পুনরায় আমদানী করেছেন, কিন্তু গর্ভপাতের বিরুদ্ধে ধর্মীয় শত্রুরা এই সব 'পিচ্ছিল ঢালু' যুক্তির কোনো তোয়াক্কা করেন না। তাদের জন্য বিষয়টা আরো সরল। যে-কোনো ভ্রূণ হচ্ছে একটি শিশু, একে মারা মানেই হত্যা, ব্যস আর কোনো কথা নেই, আলোচনা খতম। কিন্তু চরমপন্থী এই অবস্থান পরবর্তী অনেক কিছুর উৎস। তাদের দাবী, শুরুতেই বলা যায়. যেমন এমব্রায়োনিক (ভ্রূণতাত্ত্বিক) স্টেম সেল গবেষণা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে, কারণ এটি ভ্রূণ কোষের মৃত্যু সম্পর্কিত, যদিও চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর ভূমিকা অপরিসীম হবারই সম্ভাবনা। অসঙ্গতিটা স্পষ্ট হয়, যখন আপনি চিন্তা করবেন, যে সমাজ ইতোমধ্যেই শরীরের বাইরে পরীক্ষাগারে ডিম্বাণু

নিষিক্তকরণ (বা আইভিএফ - ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন) মেনে নিয়েছে, যেখানে বাড়তি ডিম্বাণু তৈরি করতে ডাক্তাররা নিয়মিতভাবে নারীদের ডিম্বাশয় হরমোনের মাধ্যমে উত্তেজিত করছেন, যেগুলো শরীরের বাইরে নিষিক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় এমনকি এক ডজন কার্যকর 'জাইগোট' তৈরি করা সম্ভব। যার মধ্যে দুটি বা তিনটিকে হয়তো জরায়ুতে স্থাপন করা হয়। আশা করা হয় এখান থেকে একটি অথবা সম্ভবত দুটি বেঁচে যাবে। সুতরাং আইভিএফ সম্ভাব্য ভ্রূণকে এই প্রক্রিয়ার দুটি ধাপে হত্যা করে এবং স্বাভাবিকভাবেই সমাজে কিন্তু এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। পচিশ বছর ধরে, 'আইভিএফ' একটি মানসম্পন্ন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অনেক নিঃসন্তান দম্পতি তাদের জীবনে আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন।

যদিও ধর্মীয় চরমপন্থীদের আইভিএফ নিয়েও সমস্যা থাকতে পারে। ২০০৫ এ গার্ডিয়ান পত্রিকার ৩ জুন সংখ্যায়, 'ক্রিশ্চিয়ান কাপলস অ্যানসারস কল টু সেভ এমব্রায়ো লেফট বাই আইভিএফ' শিরোনামে একটা অদ্ভুত গল্প ছিল। গল্পটি একটি সংস্থাকে নিয়ে, যার নাম 'স্নোফ্লেকস', যারা আইভিএফ ক্লিনিক থেকে বাড়তি ডিম্বাণুগুলো রক্ষা করার চেষ্টা করছে বলে দাবী করে: ওয়াশিংটন রাজ্যের একজন নারী মন্তব্য করেছিলেন, 'আমরা সত্যি অনুভব করেছি, ঈশ্বর আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন এই সব ভ্রূণগুলোকে - এইসব জন্ম না নেয়া শিশুদের যেন আমরা বাঁচার একটি সুযোগ দেই'। যার চতুর্থ সন্তানের জন্ম হয়েছে 'গোঁড়া খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের এই টেষ্টটিউব শিশুদের জগতের সাথে অপ্রত্যাশিত যোগসূত্রতার ফসল' হিসাবে। এই সম্পর্কের ব্যাপারে চিন্তিত মহিলার স্বামী চার্চের মুরুব্বীদের সাথে কথা বললে তারা জানান, 'আপনি যদি ক্রীতদাসদের মুক্ত করতে চান, তাহলে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ীদের সাথে আপনাদের বাণিজ্য করতে হবে'। আমি ভাবছি এই মানুষগুলো কি বলতো যদি তারা জানতো যে অধিকাংশ নিষিক্ত ভ্রূণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গর্ভপাত হয়ে যায়। সম্ভবত এটাকে দেখা যেতে পারে প্রাকৃতিক 'মাননিয়ন্ত্রণ' প্রক্রিয়া হিসাবে।

শুধুমাত্র বিশেষ ধরনের ধার্মিক মনই একগুচ্ছ আণুবীক্ষণিক কোষ হত্যা করার সাথে পূর্ণবয়স্ক একজন ডাক্তারকে হত্যা করার মধ্যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। আমি এর আগেই রানডাল টেরির উদ্ধৃতি এবং 'অপারেশন রেসক্যু' আন্দোলনটির কথা উল্লেখ করেছি। মার্ক জুয়ের্গেনসমায়ার তার শিহরণ জাগানো 'টেরর ইন দ্য মাইণ্ড অব গড' বইয়ে রেভারেণ্ড মাইকেল ব্রে এবং তার বন্ধু রেভারেণ্ড পল হিলের একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করেছিলেন, সেখান তাদের হাতে ধরা ছিল একটি ব্যানার, যা বলছে, 'নিষ্পাপ শিশুদের হত্যা বন্ধ করা কি ভুল'? তাদের দুইজনকে দেখতে ভালোই লাগছিল, বেশ কেতাদূরস্ত দুই তরুণ, মুখে হাসি, পরণে সাদামাটা তবে ভালো পোষাক, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা কোনো উন্মাদের তুলনায় যা সম্পূর্ণভাবেই ব্যতিক্রম। তারপরও তারা এবং তাদের 'আর্মি অব গডের' বন্ধুরা নানা গর্ভপাত-ক্লিনিকে নিয়মিত আগুন লাগিয়ে

বেড়াতেন, এবং গর্ভপাতের সাথে জড়িত ডাক্তারদের খুন করার ইচ্ছা তারা কখনোই গোপন করেননি। ১৯৯৪ সালে ২৯ জুলাই ফ্লোরিডার পেনসাকোলায় ক্লিনিকের সামনে পল হিল শটগানের ব্যবহার করে ডাঃ জন ব্রিটন এবং তার দেহরক্ষী জেমস ব্যারেটকে হত্যা করেছিলেন, এবং এরপর তিনি আত্মসমর্পণ করেন। পুলিশকে বলেছিলেন যে, তিনি ডাক্তারকে হত্যা করেছেন ভবিষ্যতের অনাগত সব 'নিষ্পাপ শিশুদের' হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচাতে।

মাইকেল ব্রে এই ধরনের হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন করেছেন বেশ গোছানো ভাষায় যেখানে তার নৈতিক অবস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল, যা আমিও খুঁজে পেয়েছি, যখন ধর্ম নিয়ে একটি টেলিভিশন প্রামাণ্যচিত্রের জন্য কলোরাডো স্প্রিং এলাকার একটি পার্কে আমি তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম (প্রাণী মুক্তিবাদীরাও, যারা প্রাণীদের নিয়ে কাজ করা বিজ্ঞানগবেষকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের হুমকি দিয়ে থাকেন, তারাও এমন একটি সুউচ্চ নৈতিক অবস্থানে আসীন আছেন বলে দাবী করে থাকেন)। গর্ভপাতের বিষয়টিতে আসার আগে ব্রে'র বাইবেল ভিত্তিক নৈতিকতার পরিমাপটি আমি বোঝার চেষ্টা করেছিলাম কিছু প্রাথমিক প্রশ্ন করে, যেমন আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, বাইবেলের আইন অনুযায়ী পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড দেবার মাধ্যমে ব্যভিচারের শাস্তি দেয়া হয়। আমি আশা করেছিলাম যে, অগ্রহনযোগ্য বলে এই বিশেষ উদাহরণটি তিনি অস্বীকার করবেন, কিন্তু তিনি আমাকে অবাক করেছিলেন। আনন্দের সাথে একমত হয়ে বলেন, যথাযথ আইনী প্রক্রিয়ার পর ব্যভিচারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া উচিত। আমি তারপর তাকে বললাম যে পল হিল, ব্রের পূর্ণ সমর্থনসহ আইনী প্রক্রিয়া কিন্তু মেনে চলেননি এবং তার নিজের হাতেই আইন তুলে নিয়েছিলেন এবং ডাক্তারকে হত্যা করেছিলেন। ব্রে তার সহকর্মী যাজককে পূর্ণ সমর্থন দিলেন, আগেও যেমন করেছিলেন যখন জুয়েরগেনমায়ার্স তার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। তিনি উচিত শাস্তি হিসাবে একজন অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার আর এখনো কর্মরত একজন ডাক্তারকে হত্যা করার পার্থক্য ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার মতে পরের ক্ষেত্রে এটি কোনো কর্মরত ডাক্তারকে নিয়মিত শিশু হত্যা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে একটি নিশ্চিৎ উপায়। এরপর আমি তাকে বলি, যদিও কোনো সন্দেহ নেই পল হিলের বিশ্বাস আন্তরিক, কিন্তু সবাই যদি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সমাজে বিদ্যমান আইন না মেনে তাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয় তাহলে অবশ্যই সমাজে নৈরাজ্য নেমে আসবে। সেক্ষেত্রে সঠিক উপায়টি কি গণতান্ত্রিকভাবে আইনটি পরিবর্তন করার চেষ্টা করা না? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে ব্রে বলেন: 'বেশ, এটাই সমস্যা যখন আমরা যে আইন দেখছি সেগুলোতো সত্যিকারের আইন না, বিশেষ করে যখন আইন হয় মানুষের তৈরি তাৎক্ষণিকভাবে, খামখেয়ালীভাবে নিজেদের মর্জি মাফিক, যেমনটা আমরা দেখি তথাকথিত গর্ভপাত অধিকারের আইন, যা বিচারকরা জনগনের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন'। এরপর আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এবং আইন কোথা থেকে আসে তা নিয়ে বিতর্ক করেছিলাম। এসব

বিষয়ে ব্রে'র দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই জঙ্গী মুসলিমদের মতোই, যারা কিনা ব্রিটেনে বসবাস করেও সদম্ভে ঘোষণা দেয় তারা শুধু শরীয়া আইনই স্বীকার করবে, গণতান্ত্রিকভাবে সৃষ্ট আইন না, যা তারা যে দেশে বসবাস করতে এসেছে সেই দেশের আইনের মূল ভিত্তি।

ডাঃ ব্রিটন এবং তার দেহরক্ষীকে হত্যা করার জন্য ২০০৩ সালে পল হিলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়, তিনি তার মৃত্যুর আগে আবারো বলেন, অনাগত শিশুদের রক্ষা করতে তার যদি আবার জন্ম হয় তিনি একই কাজ করবেন। তার বিশ্বাসের জন্য জীবন দিতে অত্যন্ত আশবাদী হয়ে তিনি অপেক্ষা করেছেন । সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,'আমি বিশ্বাস করি আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার মাধ্যমে রাষ্ট্র আমাকে শহীদের মর্যাদা দেবে'। ডানপন্থী গর্ভপাত-বিরোধীরা তার মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ করেছিলেন। যার সাথে যোগ দেয় মৃত্যুদণ্ড বিরোধী একটি অশুভ অপবিত্র বামপন্থী জোট, যারা তৎকালীন ফ্লোরিডার গভর্নর জেব বুশকে আহবান করেন, পল হিলকে শহীদ না বানাতে। তারা তাদের যুক্তির পক্ষে প্রস্তাব করেন, বিচারিক প্রক্রিয়ায় পল হিলকে হত্যা করলে আসলে আরো বেশি হত্যাকাণ্ডকে উৎসাহ দেয়া হবে, যদি মনে করা হয় মৃত্যুদণ্ড এই ধরনের অপরাধ নিরুৎসাহিত করবে তাহলে এই ধরনের মৃত্যুদণ্ডে ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়াই ঘটবে। হিল নিজেই হাসি মুখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবার কক্ষে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, 'আমি স্বর্গে অনেক পুরষ্কার পাবো, আমার তার অপেক্ষা করছি' (৩২)। এবং তিনি প্রস্তাব করেন অন্যরা যেন তার হিংস্র কাজটি করা অব্যাহত রাখে। পল হিলের শহীদত্ব পাবার প্রেক্ষিতে প্রতিশোধমূলক আক্রমণ হতে পারে এমন শঙ্কায় পুলিশও বেশ সতর্ক ছিল, এবং এই কেসের সাথে জড়িত বেশ কয়েকজনই বুলেটসহ হুমকি বার্তা পেয়েছিলেন।

মুল বিষয়টি উপলব্ধি করার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গগত কিছু সামান্য পার্থক্য থেকে এই পুরো বীভৎস ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল। কিছু মানুষ, যারা কিনা তাদের ধর্মবিশ্বাসের জন্য মনে করেন যে, গর্ভপাত হচ্ছে হত্যা, এবং যাদের তারা 'শিশু' বলে দাবী করেন, সেই ভ্রূণের অধিকার রক্ষার্থে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এবং অন্যদিকে গর্ভপাতের সপক্ষে আন্তরিক কিছু সমর্থক আছেন, যাদের হয় ভিন্ন কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস আছে, কিংবা কোনো ধর্মই তারা মানেন না, সুস্পষ্টভাবে সুচিন্তিত পরিণতিবাদী নৈতিকতা যাদের সাথে যুক্ত হয়ে আছে। তারাও নিজেদেরকে আদর্শবাদী হিসাবে দেখেন, প্রয়োজন অসুস্থকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া, অন্যথায় যে রোগীরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিপজ্জনক হাতুড়ে ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হবেন। উভয়পক্ষই পরস্পরকে হত্যাকারী বা হত্যার মদদদাতা হিসেবে দেখছেন। উভয়পক্ষই, তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সমপরিমানে আন্তরিক।

একটি প্রজনন স্বাস্থ্য সেবাদানকারী ক্লিনিকের মুখপাত্রী বলছেন, পল হিল হচ্ছেন একজন বিপদজ্জনক সাইকোপ্যাথ, উন্মত্ত খুনী। কিন্তু পল হিলের মত মানুষরা তাদের নিজেদেরকে বিপদজ্জনক সাইকোপ্যাথ বলে মনে করেন না। তারা নিজেদেরকে ভালো এবং নীতিবান মানুষ হিসাবেই মনে করেন, যারা ঈশ্বরের নির্দেশনা মেনে চলেন। আসলেই আমি মনে করিনা পল হিল একজন 'সাইকোপ্যাথ', শুধু একজন অতি ধার্মিক। বিপদজ্জনক, হ্যাঁ, কিন্তু সাইকোপ্যাথ নয়, বিপজ্জনকভাবে ধার্মিক। তার ধর্মবিশ্বাসের ব্যাখ্যায় হিল পুরোপুরি সঠিক এবং নৈতিক অবস্থানে ছিলেন যখন তিনি ডাঃ ব্রিটনের উপর গুলি ছোড়েন। হিলের সমস্যা বা অসুখটা হলো ধর্মীয় বিশ্বাস নিজেই। আমি যখন মাইকেল ব্রের সাথে কথা বলেছিলাম, আমার তাকে সাইকোপ্যাথ মনে হয়নি। আমার আসলে তাকে বেশ পছন্দও হয়েছে, আমার মনে হয়েছে তিনি সৎ এবং আন্তরিক একটি মানুষ, মৃদুভাষী এবং চিন্তাশীল কিন্তু দুঃখজনকভাবে তার মনকে আক্রান্ত করেছে বিষাক্ত ধর্মীয় অর্থহীন সব ধারণা।

গর্ভপাত বিরোধী শক্ত সব সমর্থকরা প্রায় সবাই গভীরভাবে ধর্মবিশ্বাসী। গর্ভপাতের আন্তরিক সমর্থনকারীরা, ব্যক্তিগতভাবে তারা ধার্মিক কিংবা নিধার্মিক, যা-ই হোন না কেন, তারা ধর্মীয় গণ্ডীর বাইরে পরিণামবাদী একটি নৈতিকতাবাদী দর্শনের অনুসারী, হয়তো তারা জেরেমি বেনথামের প্রশ্নটি তাদের চিন্তা নিয়ে আসতে পেরেছেন, 'তারা কি কষ্ট অনুভব করে'? পল হিল ও মাইকেল ব্রে ভ্রূণ হত্যা আর ডাক্তার হত্যার মধ্যে কোনো নৈতিক পার্থক্য দেখতে পান না, শুধুমাত্র তাদের কাছে ভ্রূণটি হলো একটি নিষ্পাপ শিশু। পরিণামবাদীরা এখানে অনেক পার্থক্য দেখতে পান, অনেকটা ব্যাঙ্গাচীর মতো দেখতে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ভ্রূণের সামান্যই অনুভব করার ক্ষমতা আছে । অন্যদিকে একজন ডাক্তার হচ্ছেন পূর্ণবয়স্ক জীবন্ত মানুষ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা, ভ সহ তিনি মানবীয় জ্ঞানের বিশাল এক ভাণ্ডার, যার গভীরভাবে আবেগতাড়িত হবার ক্ষমতা আছে। এছাড়া খুব সম্ভবত একজন বিধ্বস্ত বিধবা ও এতিম সন্তান কিংবা বৃদ্ধ পিতামাতাও আছেন, যারা তাকে অনেক ভালোবাসেন।

পল হিল সত্যিকারের দীর্ঘমেয়াদী, কষ্ট অনুভব করতে সক্ষম এমন স্নায়ুতন্ত্র বিশিষ্ট মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন। তার আক্রান্ত ডাক্তারের শিকাররা এসব কিছু করতে পারে না। কারণ শুরুর পর্যায়ে ভ্রূণের কোনো স্নায়তন্ত্র নেই, সুতরাং তার কোনো কষ্ট অনুভব করার উপায়ও নেই নিশ্চিৎভাবে। এমন কি পরবর্তী পর্যায়ে করা গর্ভপাতের ভ্রূণ, যাদের স্নায়তন্ত্র আছে তারা কষ্ট অনুভব করবে, যদিও সব ধরনের কষ্ট দেয়াটাই বড় বেশি নিন্দনীয়, তবে তারা যে কষ্ট পায় সেটার কারণ তারা যে মানুষ তা কিন্তু নয়। কোনোভাবে সাধারণ যুক্তিতে ধারণা করা সম্ভব নয় যে, মানুষের ভ্রূণ যে-কোনো বয়সে সমবয়সী একটি গরু বা ভেড়ার ভ্রূণ অপেক্ষা বেশি কষ্ট অনুভব করে। এবং যথেষ্ট কারণ আছে মনে করা যে সব ভ্রূণ, মানুষ বা অন্য কিছু, অনেক কম কষ্ট পায় একজন

পূর্ণবয়স্ক গরু বা ভেড়া কসাইখানায় সাধারণত যে যন্ত্রণা সহ্য করে। বিশেষ করে আচার-আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ জবাই করার সময়, আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের গলা কাটার জন্য যেখানে তাদের পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে।

যন্ত্রণা বা কষ্ট সহ্য করার বিষয়টি পরিমাপ করা কঠিন (৩৩) এবং এর ব্যাখ্যা নিয়ে অবশ্যই যুক্তিতর্ক করা যেতে পারে। কিন্তু সেটি আমার আলোচনার মূল বিষয়টি পরিবর্তন করে না, যা ধর্ম নিরেপক্ষ পরিনতিবাদী এবং ধর্মীয় চূড়ান্তবাদী নৈতিকতার দার্শনিকদের মধ্যকার বিভেদটি নির্দেশ করে (এটি অবশ্য, সব সম্ভাবনা শেষ করে দেয় না, আমেরিকার খ্রিস্টানদের বেশ উল্লেখযোগ্য একটি অংশ গর্ভপাতের ব্যপারে কোনো চূড়ান্তবাদী মনোভাব পোষণ করেন না, এবং তারা এর পক্ষে, যেমন দেখুন 'রেলিজিয়াস কোয়ালিশন ফর রিপ্রোডাক্টিভ চয়েস' নামের একটি গোষ্ঠী চিন্তা করে, ভ্রূণটি কষ্ট পেতে পারে কিনা (৩৪), অন্যটি ভাবে তারা মানুষ কি না। ধর্মীয় নৈতিকতাবাদীদের দেখা যায় বিতর্ক করতে যেমন, কখন বিকাশমান ভ্রূণ একটি ব্যক্তিতে পরিণত হয় - একজন মানুষ? সেক্যুলার নৈতিকতাবাদীরা খুব সম্ভবত জিজ্ঞাসা করবেন, এটি মানুষ কিনা সেটা ভাবার দরকার নেই (একগুচ্ছ কোষের জন্য এর অর্থই বা কি?) আসলে ঠিক কোন বয়সে যে কোনো একটি বিকাশমান ভ্রূণ, সেটা যে কোনো প্রজাতিরই হোক না কেন, কষ্ট অনুভব করার ক্ষমতা অর্জন করে?

দ্য গ্রেট বিটহোভেন ফ্যালাসি

সাধারণত গর্ভপাত বিরোধীদের এই মৌখিক যুক্তিতর্কের দাবা খেলায় পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে খানিকটা এরকম: মূল বিষয়টি কিন্তু এই মুহূর্তে মানুষের ভ্রূণ কোনো কিছু অনুভব করতে পারে কি পারে না, সেটি নয়, কথা হচ্ছে এর সেটি করার সম্ভাব্য ক্ষমতাটি। গর্ভপাতের ফলে এই ভ্রূণটি ভবিষ্যতে তার সম্ভাব্য একটি পূর্ণ মানব জীবন পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে, এই ধারণাটি তাদের বাকসর্বস্ব যুক্তিকে নির্দেশিত করে যার চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা এর অসততার অভিযোগের প্রত্যুত্তরে একমাত্র অজুহাত হতে পারে। আমি সেই প্রখ্যাত 'গ্রেট বিটহোভেন' ফ্যালাসি বা ভ্রান্ত যুক্তিটির কথা বলছি। এই ভ্রান্ত যুক্তিটির বেশ কয়েকটি সংস্করণ আছে। পিটার এবং জিন মেদাওয়ার (স্যার পিটার মেদাওয়ার [৩৫] - ১৯৬০ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার জয় করেছিলেন) তাদের 'দ্য লাইফ সায়েন্স' বইয়ে এই ভ্রান্ত যুক্তিটির নিম্নোক্ত সংস্করণটির সূত্র হিসাবে নরমান সেইন্ট জন স্টেভাসের (এখন লর্ড সেইন্ট জন) নাম (৩৬) উল্লেখ করেছিলেন, যিনি একজন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য, একজন সুপরিচিত রোমান ক্যাথলিক মুখপাত্র, তিনি আবার এটি সংগ্রহ করেছিলেন মরিস বারিঙের (১৮৭৪-১৯৪৫) সংগ্রহ থেকে, একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি যিনি রোমান ক্যাথলিকবাদে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন এবং ক্যাথলিকদের অন্যতম শক্তিশালী সমর্থক জি. কে. চেষ্টারটন এবং হিলেয়ার বেলকের

নিকটতম সহযোগী ছিলেন। তিনি দুইজন চিকিৎসকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথনের মাধ্যমে যুক্তিটি গড়ে তুলেছিলেন:

> ‘একটি গর্ভপাতের বিষয়ে আমি আপনার মতামত চাইছি।
> বাবাটির সিফিলিস আছে, মায়ের আছে যক্ষা, যে চারটি সন্তান তাদের আছে ইতোমধ্যে তার প্রথমটি অন্ধ, দ্বিতীয়টি মারা গেছে, তৃতীয়টি মূক এবং বধির, চতুর্থটিরও যক্ষা আছে..
> এই অবস্থায় আপনি হলে কি করতেন?
> আমি গর্ভপাত করানোর ব্যপারে পরামর্শ দিতাম।
> তাহলে তো আপনি বিটহোভেনকে হত্যা করতেন।’

ইন্টারনেট জুড়ে অসংখ্য তথাকথিত গর্ভপাতবিরোধী ওয়েবসাইট আছে, যারা এই হাস্যকর কাহিনীটি প্রায়শই ব্যবহার করেছে এবং ঘটনাচক্রে তারা তাদের ইচ্ছামতো মূল সত্য ও বক্তব্যটিকেও বিকৃত করেছেন, আরো একটি সংস্করণ শুনুন: ‘আপনি যদি এমন কোনো রমণীকে চেনেন, যিনি ইতোমধ্যেই আটটি সন্তানের জননী এবং তিনি আবারো গর্ভবতী.. যার সন্তানদের মধ্যে তিনজন বধির, দুইজন অন্ধ এবং একজন মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ, যার কারণ তার সিফিলিস আছে, আপনি কি তাকে গর্ভপাত করার পরামর্শ দেবেন?’, এর উত্তর যদি ‘হ্যাঁ’ হয় তাহলে কিন্তু আপনি অনাগত একজন বিটহোভেনকে খুন করলেন (৩৭)। কিংবদন্তীর এই বিবরণটি বিখ্যাত সুরস্রষ্টার জন্ম ক্রম পঞ্চম থেকে নবম স্থানে নিয়ে এসেছে। বধির হিসাবে জন্ম নেয়া সন্তান সংখ্যাকে তিনে উন্নীত করেছে, অন্ধের সংখ্যা দুইয়ে, বাবার বদলে মাকে সিফিলিসে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছে। মোট তেতাল্লিশটি ওয়েবসাইট আছে, যেখানে আমি এই গল্পটির নানা রূপ খুঁজেছিলাম, সেখানে এটির উৎস হিসাবে মরিস বারিং নয় বরং লস এঞ্জেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল স্কুলের একজন অধ্যাপক এল. আর. অ্যাগনিউকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, যিনি এই গল্পটি নাকি তিনি তার ছাত্রদের উভয়সংকটের একটি উদাহরণ হিসাবে বর্ণনা করতেন, যেন তাদের তিনি বলতে পারেন, ‘শুভেচ্ছা, আপনি এই মুহূর্তে বিটহোভেনকে হত্যা করলেন’। আমরা খানিকটা দয়া পরবশ হয়ে এল. আর. অ্যাগনিউকে ছাড় দিতে পারি তার অস্তিত্বের বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ পোষণ করার জন্য - তবে বিস্ময়কর ব্যপারটি হচ্ছে কিভাবে এইসব শহুরে কিংবদন্তীগুলো গড়ে ওঠে। আমি খুঁজে পাইনি এই কিংবদন্তীর কাহিনীটির শুরুটা কোথায়, এটি বারিং শুরু করেছিলেন নাকি এর উৎপত্তি আরো আগে।

তবে কাহিনীটি যে আবিষ্কৃত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং পুরোপুরি মিথ্যা একটি কাহিনী। আসল সত্যটা হলো লুদভিগ ভান বিটহোভেন তার পিতামাতার নবম সন্তান যেমন ছিলেন না, তেমনি তিনি পঞ্চমও ছিলেন না, তিনি ছিলেন সবার বড়,

একেবারে সঠিক করে বললে দ্বিতীয় সন্তান, কারণ তার বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান শৈশবে মুত্যুবরণ করেছিল, সেই সময়ে যা খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা ছিল, এবং যতদূর জানা যায় তিনি আদৌ অন্ধ, মুক বা বধির বা মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ ছিলেন না। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে তার বাবা মা সিফিলিসে আক্রান্ত ছিলেন, তবে এটা ঠিক তার মা পরে মারা গিয়েছিলেন যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে, এবং তখন যক্ষার প্রকোপও ছিল খুব বেশি।

সুতরাং আসলে পুরো ব্যপারটি কাল্পনিক..বলা যায় আরবান লিজেন্ড, কল্পকথা, ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এটি প্রচার করেছিল, কিন্তু এটি যে মিথ্যা সেটি কিন্তু মূল বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে না - এমনকি যদি এটি মিথ্যা নাও হয়, এর থেকে দাড় করানো যুক্তিটি খুবই দুর্বল একটি যুক্তি। এই যুক্তিটি ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্য এই কাহিনীর সত্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পিটার এবং জিন মেদাওয়ারের কোনো প্রয়োজন ছিল না: ‘এই ঘৃণ্য ছোটো যুক্তিটির পেছনে বক্তব্যগুলো ভয়ঙ্করভাবে ভুল। যদি না প্রস্তাব করা হয় একজন যক্ষায় আক্রান্ত মা এবং সিফিলিস আক্রান্ত বাবার সম্পর্ক পৃথিবীর অনন্য অসাধারণ একজন সঙ্গীত প্রতিভার জন্ম নেবার সাথে কোনো না কোনোভাবে কার্যকারণজনিত যোগসূত্রতা আছে। এবং তারা একজন বিটহোভেনকে জন্ম দেয়া থেকে বঞ্চিত হবেন, যতটা না গর্ভপাতের কারণে ততটাই সঙ্গম থেকে বিরত থাকার কারণে’ (৩৬)। মেদাওয়ার দম্পতির সংক্ষিপ্ত বিরক্তি মিশ্রিত প্রত্যাখ্যানটির উত্তর দেয়া অসম্ভব (রোয়াল্ড ডালের (৩৮) একটি গল্প থেকে প্লট ধার নিয়ে বলতে পারি, গর্ভপাত না করানোর সেই একই ঘটনাক্রমে নেয়া সিদ্ধান্ত কিন্তু ১৮৮৮ সালে আমাদের অ্যাডলফ হিটলারকে উপহার দিয়েছিল), কিন্তু আপনার সামান্যতম বুদ্ধিমত্তা থাকা প্রয়োজন বা হয়তো কোনো ধরনের ধর্মীয় আবহে প্রতিপালিত না হয়ে থাকলে এই বিষয়টি বোঝা সম্ভব নয়। যে তেতাল্লিশটি বাছাই করা গর্ভপাতবিরোধী বা ‘প্রো-লাইফ’ ওয়েব সাইট বিটহোভেনের কাহিনীটির কোনো না একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছে, যা আমি এটি লেখার সময় গুগল সার্চে খুঁজে পেয়েছি, তাদের একটিও এই যুক্তিটির ভ্রান্তি বা অযৌক্তিক প্রস্তাবনাটি ধরতে পারেনি। এবং তাদের প্রত্যেকটি (সবগুলোই ধর্মীয় ওয়েবসাইট) এই ভ্রান্ত যুক্তির মোহে আকর্ষিত হয়েছে, বড়শির টোপ খেয়েছেন পুরোপুরি। তাদের একটি আবার মেদাওয়ারকে তথ্য উৎস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এই মানুষগুলো তাদের ধর্মবিশ্বাসবান্ধব যে-কোনো ভ্রান্তিকে বিশ্বাস করার জন্য এতটাই উদগ্রীব যে, তারা এমনকি খেয়াল করেননি যে শুধুমাত্র এটির ভুল ধরে নাকচ করে দেবার জন্য মেদাওয়ার এই যুক্তিটি প্রস্তাব করেছিলেন ।

এবং মেদাওয়ার সঠিকভাবে ব্যপারটা দেখিয়েছিলেন যে, মানব পোটেনশিয়াল বা সম্ভাবনা সংক্রান্ত যুক্তিটির উপসংহার হচ্ছে, আমরা যখনই যৌনসঙ্গম করার সুযোগ গ্রহন করতে ব্যর্থ হই আমরা তখনই একটি মানব সত্তাকে তার অস্তিত্ব পাবার সম্ভাবনা

থেকে বঞ্চিত করি। যে-কোনো উর্বর জুটির সঙ্গমের আহবানের প্রতিটি প্রত্যাখ্যান..এই প্রো-লাইফ বা জীবনের পক্ষে বেসামাল যুক্তিতে সম্ভাব্য একটি শিশু হত্যা। এমনকি কারো ধর্ষিত না হবার চেষ্টাও সম্ভাব্য কোনো শিশু হত্যার সমান প্রতিনিধিত্ব করে (এবং কথা প্রসঙ্গে, বহু প্রো-লাইফ সমর্থকরা এমনকি নৃশংসভাবে ধর্ষিত হয়েছে এমন নারীদেরও গর্ভপাতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান)। বিটহোভেন যুক্তি, আমরা স্পষ্ট দেখতে পারি, খুবই দুর্বল একটি যুক্তি। এর পরাবাস্তব নির্বুদ্ধিতা মোটামুটি পুরোটাই ফুটে উঠেছে, মাইকেল পালিনের গাওয়া চমৎকার সেই "এভরি স্পার্ম ইস স্যাকরেড" (অর্থাৎ প্রতিটি শুক্রাণু পবিত্র) গানটিতে, শতাধিক শিশুর কোরাসসহ এই গানটি মন্টি পাইথন সিরিজের "দ্য মিনিং অব লাইফ" চলচ্চিত্রে ছিল (আপনি যদি এখনো না দেখে থাকেন দয়া করে একবার দেখুন)। এই তথাকথিত মহান বিটহোভেন ভ্রান্ত যুক্তিটির একটি বৈশিষ্ট্যসূচক উদাহরণ হতে পারে কিভাবে যুক্তির গোলকধাঁধায় আমরা সবকিছু গোলমাল করে ফেলি যখন আমাদের মন ধর্ম অনুপ্রাণিত চূড়ান্তবাদে সংশয়াচ্ছন্ন থাকে।

ভালো করে লক্ষ করুন, 'প্রো-লাইফ' আসলে কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রো-লাইফ (বা জীবনের পক্ষে) বোঝাচ্ছে না আদৌ। এর আসল অর্থ হচ্ছে প্রো-হিউম্যান লাইফ বা শুধু মানুষের জীবনের সপক্ষে। হোমো সেপিয়েন্স প্রজাতির কিছু কোষকে বিশেষভাবে এই অধিকার প্রদান করার বিষয়টি বিবর্তনের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বীকার করতেই হবে, বিষয়টি আদৌ অধিকাংশ গর্ভপাত বিরোধীদের জন্য চিন্তার কোনো বিষয় না। তারা এমনিতেই বোঝেন না যে, বিবর্তন বাস্তব একটি সত্য! কিন্তু আমি সেই যুক্তিটি বিজ্ঞান খানিকটা বোঝেন এমন কিছু গর্ভপাতবিরোধী সক্রিয় আন্দোলনকারীদের সুবিধার্থে ব্যাখ্যা করতে চাই।

বিবর্তনীয় দৃষ্টিভঙ্গিটি খুব সরল। কোনো ভ্রূণ কোষে মানুষ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী এর উপর চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোনো নৈতিক অবস্থা আরোপ করতে পারেনা, এটি পারে না কারণ শিম্পাঞ্জি এবং আরো দূরবর্তী, পৃথিবীর সকল প্রজাতির সাথে আমাদের বিবর্তনীয় বংশধারার একটি ধারাবাহিকতা আছে। এবং এটি বোঝার জন্য.. কল্পনা করুন একটি অন্তর্বর্তী কোনো প্রজাতি, যেমন, অস্ট্রালোপিথেকাস আফারেনসিস (৩৯)। ধরুন তারা বেঁচে থাকা বা তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সুযোগ পেল এবং আফ্রিকার দূর্গম কোনো প্রান্তে তাদের খুঁজে পাওয়া গেল। বেশ, তখন কি তাদের মানুষ হিসাবে বিবেচনা করা হবে? নাকি, হবে না? আমার মত পরিণামবাদীদের কাছে এই প্রশ্নের কোনো উত্তর প্রত্যাশা করা উচিত নয়, কারণ এর উপর তাদের কিছুই নির্ভর করে না। আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যে আমরা সম্মানিত এবং বিস্মিত হবো নতুন একজন 'ল্যুসির' সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়ে। তবে অন্যদিকে চূড়ান্তবাদীরা অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। 'শুধুমাত্র মানুষ হবার' কারণে যারা মানুষের উপর তাদের

অনন্য এবং বিশেষ নৈতিকতার মূলনীতি আরোপ করে মানুষকে একটি অনন্য এবং বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। হয়তো যদি এর উত্তর দিতে তারা কোনো তীব্র চাপের মুখে পড়ে, তারাও সম্ভবত বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গদের দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কোনো আদালত প্রতিষ্ঠা করবে, শুধুমাত্র একটি সিদ্ধান্ত নিতে, এই নির্দিষ্ট জীবটি 'মানুষ' হিসাবে ছাড়পত্র পেতে পারে কিনা।

এমনকি যদিও অস্ট্রালোপিথেকাসদের জন্য স্পষ্ট একটি উত্তর হয়তো পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু ধীর ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকতা, জৈববৈজ্ঞানিক বিবর্তনের একটি অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের বলছে, অবশ্যই 'কিছু' অন্তর্বর্তীকালীন প্রজাতি আছে যারা প্রান্তসীমার যথেষ্ট কাছাকাছি কোথাও অবস্থান করে, যার ফলে তারা নৈতিকতার মূলনীতিটি অস্পষ্ট করে দিয়ে এর চূড়ান্তবাদী অবস্থানটি ভেঙ্গে দিতে পারে। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে বরং এটা বলে যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাকৃতিক সীমানার অস্তিত্ব নেই। আর এই সীমানা আছে এমন একটি বিভ্রম সৃষ্টি হবার কারণ আসলে বিবর্তনীয় অন্তর্বর্তীকালীন রূপগুলো ঘটনাক্রমে সব বিলুপ্ত হয়েছে। অবশ্যই, তর্ক করা যেতে পারে, মানুষরা অন্য যে-কোনো প্রজাতির তুলনায় অনেক বেশি কষ্ট অনুভব করতে পারে। এটি হয়তো সত্যিও হতে পারে এবং আমরা আইনসঙ্গতভাবেই মানুষকে বিশেষ মর্যাদা দেই এই কারণে। কিন্তু বিবর্তনের ধারাবাহিকতা আমাদের বলছে এরকম কোনো চূড়ান্ত পৃথককরণ বলে আসলেই কিছু নেই। চূড়ান্তবাদীদের নৈতিকতাবাদী বৈষম্যতা বিবর্তনের সত্যতাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। হয়তো এই সত্যটা নিয়ে এক ধরনের সচেতন অস্বস্তি হয়তো সত্যিই সৃষ্টিতত্ত্ববাদীদের বিবর্তন বিরোধীতার প্রধানতম কারণ হতে পারে: তারা যা ভয় পায়, সেটি হলো তাদের বিশ্বাসে নৈতিকতার একটি পরিণতি হবে। তাদের এই চিন্তাটি ভুল, তবে যাই হোক, নৈতিকভাবে পছন্দনীয় এমন বিবেচনা দ্বারা প্রকৃত পৃথিবী সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণসহ কোনো বাস্তব সত্য পরিবর্তিত হয়ে যাবে এমন চিন্তা করাটা আসলেই খুব উদ্ভট।

মধ্যপন্থী ধর্মবিশ্বাস কিভাবে ধর্মীয় উগ্রতাকে লালন করে

নৈতিক চূড়ান্তবাদের অন্ধকার রূপটির উদাহরণ দেবার সময় আমি উল্লেখ করেছিলাম, যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী যারা গর্ভপাত ক্লিনিক বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়, এবং আফগান তালিবান, যাদের নিষ্ঠুরতার বিবরণ বিশেষ করে নারীদের প্রতি, আমার পক্ষে বর্ণনা করা খুবই কঠিন, এছাড়া আয়াতোল্লাহদের হাতে ইরান কিংবা সৌদ রাজকুমারের অধীনে সৌদি আরব, যেখানে নারীরা গাড়ী চালাতে পারে না এবং পুরুষ আত্মীয় ছাড়া বাড়ির বাইরে যাওয়া মানে সমস্যায় পড়া (কর্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হয়ে এক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় দিয়েছে, শিশু পুত্রসন্তান হলেও চলবে)। জেন গুডউইন তার 'প্রাইস অফ অনার'

(৪০) বইটিতে সৌদি আরব এবং বর্তমানে ক্ষমতা থাকা অন্যান্য ধর্মনির্ভর একনায়ক রাষ্টকাঠামোয় নারীদের সাথে আচরণের ভয়াবহ চিত্র উন্মোচন করেছেন। জোহান হ্যারি, লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডন্ট পত্রিকায় অন্যতম প্রাণচঞ্চল প্রাবন্ধিক, তার একটি প্রবন্ধের শিরোনামে লিখেছিলেন, জিহাদীদের পরাস্ত করতে হলে মুসলিম নারীদের একটি অভ্যুত্থানের সূচনা করাটাই হবে সবচেয়ে উত্তম পন্থা (৪১)।

অথবা, খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষেত্রে - আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি সেই সব 'রাপচার' প্রিয় যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টানদের, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যপ্রাচীয় নীতির উপর যাদের শক্তিশালী প্রভাব সুস্পষ্ট, যা নিয়ন্ত্রণ করছে বাইবেলের উপরে তাদের বিশ্বাস যে প্যালেষ্টাইনের সব জমির উপর ইজরায়েলের ঐশ্বরিক অধিকার আছে (৪২)। রাপচার খ্রিস্টানদের কিছু অংশ আবার আরো খানিকটা এগিয়ে কামনা করছেন পারমানবিক যুদ্ধের, কারণ তাদের অভিধানে এমন এটি হবে সেই 'আর্মাগেডডন', যা তাদের অদ্ভুত 'বুক অব রিভিলেশন' বইটির অস্বস্তিকর জনপ্রিয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী খ্রিস্টের দ্বিতীয় প্রত্যাবর্তন বা সেকেন্ড কামিংকে তরান্বিত করবে। এ বিষয়ে আমার পক্ষে সাম হ্যারিসের 'লেটার টু এ ক্রিশ্চিয়ান নেশন' বইয়ে উল্লেখিত সেই রোমহর্ষক মন্তব্যটির আর কোনো পরিবর্ধন করা সম্ভব না:

> সুতরাং মোটেও অতিরঞ্জিত হবে না বলা যে, যদি নিউ ইয়র্ক নগরী হঠাৎ করে একটি আগুনের গোলকে রূপান্তরিত হয়, বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যুক্তরাষ্ট্রের জনগন সেই বিস্ফোরণ পরবর্তী সৃষ্টি হওয়া মাশরুম মেঘে রুপালী আশার রেখা দেখতে পাবেন, কারণ তাদের বলা হয়েছে, এটা সবচেয়ে উত্তম, যে জিনিসটি ঘটার কথা, সেটি প্রত্যাসন্ন: খ্রিস্টের প্রত্যাবর্তন। এই বিষয়টি খুব স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, এই ধরনের কোনো বিশ্বাস সামাজিক, অর্থনৈতিক পরিবেশগত বা ভূরাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল পৃথিবী গড়তে আমাদের কখনোই সাহায্য করবে না। কল্পনা করুন এর পরিণতি কি হতে পারে যদি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সত্যিই বিশ্বাস করে পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, এবং এই পরিসমাপ্তি হবে গৌরবময়। শুধুমাত্র ধর্মীয় মতবাদের ওপর ভিত্তি করে যুক্তরাষ্টের প্রায় অর্ধেক মানুষ আপাতদৃষ্টিতে এটা বিশ্বাস করছে এই বাস্তবতাটি বিবেচনা করা উচিত একটি নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জরুরী অবস্থা হিসাবে।

আসলেই তাহলে অনেকেই আছেন, যাদের ধর্মবিশ্বাস তাদেরকে আমার বর্ণিত সেই আলোকিত ঐক্যমতের নৈতিক যুগধর্মের পরিসীমার বাইরেই অবস্থান করার বিষয়টি নিশ্চিৎ করে। আমি যাকে বলছি ধর্মীয় চূড়ান্তবাদের অন্ধকারতম অংশ, এবং তাদের প্রায়শই বলা হয় চরম বা উগ্রপন্থী। কিন্তু এই অংশে আমার মূল বক্তব্যটি হচ্ছে, মৃদু বা

মাঝারী মাত্রার ধর্মবাদীতাও বিশ্বাসের সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে যেখানে উগ্র সংস্করণের ধর্মবাদীতা প্রাকৃতিকভাবেই অবাধে বিকশিত হয় ।

জুলাই ২০০৫, লন্ডনকে সম্মিলিতভাবে সংঘটিত হওয়া বেশ কয়েকটি আত্মঘাতী বোমা হামলার মুখোমুখি হতে হয়েছিল: সাবওয়েতে তিনটি ও বাসে একটি বিস্ফোরণ; যদিও হতাহত আর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আক্রমণের মত এত ভয়বহ ছিল না বটে তবে অবশ্যই সেটির মত অপ্রত্যাশিতও ছিল না (আসলেই লন্ডন এই ধরনের আক্রমণের আশংকা করছিল, যখন থেকেই যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার আমাদের বুশের ইরাক অভিযানে অনিচ্ছুক সহযোগী বানিয়েছিলেন)। তবে যা-ই হোক, লন্ডনের এই আক্রমণ পুরো ব্রিটেনকে সন্ত্রস্ত এবং হতবাক করেছিল। খবরের কাগজে পাতা পূর্ণ হয়েছিল বেদনাদায়ক সব বিশ্লেষণে, কিভাবে কোথা থেকে আর কেনই বা এই চার বিভ্রান্ত তরুণ নিজেদের আর নিরপরাধ মানুষগুলোকে বোমা মেরে হত্যা করার প্রেরণা পেয়েছিল ? এই খুনীরা ব্রিটিশ নাগরিক, ক্রিকেটপ্রেমী এবং আচরণে ভদ্র। ঠিক যে-ধরনের তরুণদের সান্নিধ্য যে কেউই উপভোগ করবেন।

কেন এই ক্রিকেটপ্রেমী তরুণরা এমন কাজ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেননি? তাদের সমতূল্য প্যালেস্টাইনীয় আত্মঘাতী বা জাপানের কামিকাজি আত্মঘাতী কিংবা শ্রীলংকার তামিল টাইগারদের মতো যুক্তরাজ্যের এই আত্মঘাতী মানব-বোমাবাজদের কোনো প্রত্যাশা থাকার কথা নয় যে, এই ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য কর্মের জন্য তাদের শোকাহত পরিবার শহীদের পরিবার হিসাবে সম্মানিত হবে, বা আত্মঘাতী শহীদের জন্য বরাদ্দকৃত কোনো পেনশনের মাধ্যমে তাদের দেখাশোনা করা হবে। বরং এর বিপরীতটাই ঘটেছিল, তাদের আত্মীয়স্বজনরা প্রায়শই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন। এদের একজন ইচ্ছাকৃতভাবে তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বিধবা এবং তার সন্তানকে এতিম করেছে। এই চার তরুণের কর্মটির ভয়াবহ পরিণতি, শুধু তাদের নিজেদের এবং তাদের সন্ত্রাসের শিকার যারা, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সেই ভয়াবহতার শিকার হয়েছে তাদের নিজেদের পরিবার-পরিজন এবং যুক্তরাজ্যের পুরো মুসলিম সমাজ, যারা এখনো এর প্রতিক্রিয়ার কুফলের মুখোমুখি হচ্ছেন প্রতিদিন। শুধুমাত্র ধর্মবিশ্বাসই সেই শক্তিশালী তাড়না হবার জন্য যথেষ্ট, যা কিনা এই ধরনের চূড়ান্ত উন্মত্ত কোনো পদক্ষেপ নিতে সুস্থ এবং ভদ্র মানুষকে প্ররোচিত করতে পারে। আবারো, স্যাম হ্যারিস আল-কায়েদার নেতা ওসামা বিন লাদেনের উদাহরণ ব্যবহার করে এই মানসিকতাটির বর্ণনা দিয়েছেন তার বৈশিষ্ট্যসুচক স্পষ্টবাদী উচ্চারণে (প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখার প্রয়োজন, ওসামা বিন লাদেনের অবশ্য লন্ডন বোমা হামলার সাথে কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না)। কি এমন কারণ থাকতে পারে যে কেউ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস এবং সেখানে অবস্থানরত সবাইকে হত্যা করতে চাইতে পারে? বিন লাদেনকে শয়তানের প্রতিচ্ছবি বলা মানে

এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবার জন্য আমাদের নিজেদের দ্বায়িত্বকে অস্বীকার করা:

> এই প্রশ্নের উত্তর খুবই স্পষ্ট - যদিও বমনেচ্ছা উদ্রেক করার মত একটি বক্তব্যে বিন লাদেন নিজেই তা ধৈর্য সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। এর উত্তর হচ্ছে, লাদেনের মত মানুষরা তারা যা কিছু বিশ্বাস করেন বলে দাবী করেন, সেগুলো তারা আসলেই বিশ্বাস করেন। তারা কোরানের আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত অলঙ্ঘনীয় সত্য হিসাবে বিশ্বাস করেন। কেনই বা সুশিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের উনিশ জন পুরুষ সদস্য আমাদের সহস্রাধিক প্রতিবেশীকে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার বিসর্জন দিয়েছিল? কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল, এমন কাজ করার মাধ্যমে সরাসরি তারা বেহেশতে যেতে পারবে। এভাবে মানব আচরণের এমন পূর্ণ ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যার উদাহরণ আসলেই দুর্লভ। আর এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিতে আমাদেরই এত অনীহা কেন' (৪৩)?

শ্রদ্ধেয় সাংবাদিক মরিয়েল গ্রে, গ্লাসগো হেরাল্ড পত্রিকার ২০০৫, ২৪ জুলাই, ঠিক এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করেছিলেন, লন্ডনের বোমা হামলার তথ্যসূত্রে:

> সবাইকে দায়ী করা হচ্ছে, স্পষ্টতই দুই ভিলেন জর্জ ডাবলিউ. বুশ এবং টনি ব্লেয়ার থেকে শুরু করে মুসলিম 'সমাজগুলোর' নিষ্ক্রিয়তা পর্যন্ত, কিন্তু আর কখনোই মূল বিষয়টি এর চেয়ে এত বেশি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়নি, আসলেই একটি জায়গায় এইসব অপকর্মের দায়ভারগুলো অর্পিত হয়, এবং বিষয়টি এমনই ছিল চিরকাল। এই, সব দুর্ভোগ, দুর্যোগ, সন্ত্রাস, হিংস্রতা আর অজ্ঞতার মূল কারণ অবশ্যই ধর্ম নিজেই। এবং যদি আপনার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় এই সহজ বাস্তবতাটাকে ব্যাখা করার জন্য কেনই বা বলতে হবে, তার কারণ হচ্ছে সরকার এবং এটি প্রমাণ না করার জন্যে গণমাধ্যমে বেশ ভালোই ভান করতে পেরেছে।

আমাদের পশ্চিমা রাজনীতিবিদরা ধর্ম বা রেলিজিয়ন শব্দটির 'আর' অক্ষরটিও উচ্চারণ না করার সতর্ক প্রচেষ্টা করেন, এবং এর পরিবর্তে তাদের যুদ্ধকে দাবী করেন 'সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসাবে, যেন 'সন্ত্রাস' এক ধরনের সত্তা বা শক্তি, যার একটি নিজস্ব মন কিংবা ইচ্ছাশক্তি আছে, বা সম্পূর্ণভাবে অশুভ শক্তি দ্বারা প্রভাবিত ও প্ররোচিত কোনো গোষ্ঠী হিসেবে তারা সন্ত্রাসীদের সংজ্ঞায়িত করেন। কিন্তু স্পষ্টতই তারা কোনো অশুভ শক্তির দ্বারা প্ররোচিত না। আমরা তাদের যতটাই ভ্রান্ত মতাদর্শের শিকার ভাবি না কেন, তারাও গর্ভপাত করানো ডাক্তারদের খ্রিস্টান খুনীদের মতোই

গোঁড়া মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ, যার মাধ্যমে তারা তাদের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড ঠিক করেন, গভীর বিশ্বাসের সাথে তাদের ধর্ম যা নির্দেশ দিয়েছে সেটি তারা অনুসরণ করেন। তারা উন্মাদও না, তারা ধর্মীয় আদর্শবাদী, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে যারা বিশ্বাস করেন যে, তারা একটি যুক্তিসঙ্গত অবস্থানে আছেন। তাদের কাছে তাদের কর্মকাণ্ড সঠিক, ন্যায়সঙ্গত এবং ভালো, এবং নেটি তাদের কোনো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যসূচক কোনো প্রকৃতির কারণে নয়, এবং অবশ্যই তারা শয়তান আশ্রিত বা আক্রান্ত সেই কারণেও নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে জন্ম থেকেই তারা প্রশ্নাতীতভাবে ধর্মবিশ্বাসকে পূর্ণরূপে ধারণ করার দীক্ষিত হয়ে প্রতিপালিত হয়েছেন। স্যাম হ্যারিস ব্যর্থ একজন প্যালেস্টাইনিয় আত্মঘাতী বোমাহামলাকারীকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে সেই ব্যক্তিটি ব্যাখ্যা করেছিল, কোন বিষয়টি আসলে ইসরায়েলীদের হত্যা করার জন্য তাদের প্রণোদিত করেছে : 'শহীদ হবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, আমি কোনো কিছুর জন্য প্রতিশোধ নিতে যাইনি, আমি শুধু একজন শহীদ হতে চেয়েছি'। ২০০১ সালের ১৯ নভেম্বর 'দ্য নিউ ইয়র্কার' পত্রিক‌ো নাসরা হাসানের সংগৃহীত সাতাশ বছর বয়সী শুধু 'এস' নামে পরিচিত নম্র ভদ্র একজন প্যালেস্টাইনীয় ব্যর্থ আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীর সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিল : মধ্যপন্থী ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষকদের বর্ণিত স্বর্গের লোভনীয় বিবরণে তা এত কাব্যিকভাবে পরিপূর্ণ যে, আমার মনে হয়েছে ব্যাপারটা বিস্তারিতভাবে এখানে উল্লেখ করা দরকার (৪৪):

> 'আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম "শহীদ হবার জন্য আপনার এই তীব্র আকাঙ্ক্ষা কারণ কি"?
>
> তার উত্তর ছিল: 'আত্মার শক্তি আমাদের উপরে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাবার জন্য টানে, অন্য দিকে দুনিয়ার সব বস্তুগত জিনিসের লোভ আমাদের নীচের দিকে টেনে ধরে রাখে। যারা শহীদের মর্যাদা পেতে দৃঢ়সংকল্প তারা এই দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত। আত্মঘাতী আক্রমণের পরিকল্পনাকারী আমাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি আমাদের এই অপারেশন বা পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হয় তাহলে কি হতে পারে? আমরা তাকে বলেছিলাম, যা-ই হোক না কেন, আমরা আমাদের নবীজি ও তার সাহাবীদের সাথে দেখা করা সুযোগ পাবো, ইনশাল্লাহ। আমরা ভাসছিলাম, যেন সাঁতার কাটছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যে যেন আমরা অনন্তকালের জন্য বেহেশতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি। আমাদের মনে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না । আল্লাহর উপস্থিতিতে আমরা পবিত্র কুর'আন স্পর্শ করে শপথ নিয়েছি, যে প্রতিজ্ঞা আমাদের মানতেই হবে। এই জিহাদের প্রতিজ্ঞাকে বলে 'বাইত আল রিদওয়ান', যার নামকরণ হয়েছে বেহেশতের সেই দরজার নামে, যে দরজা দিয়ে শুধুমাত্র নবী আর শহীদরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারেন। আমি জানি

জিহাদ করার অন্য আরো অনেক উপায় আছে, কিন্তু এটেই সবচেয়ে বেশি মধুরতম উপায়; শহীদত্ব বরণ করে নেবার জন্য সব কর্মকাণ্ড যদি আল্লাহর নামে করা হয়, তাহলে সামান্য একটা পোকার কামড়ের চেয়ে তা কম কষ্টের হয়'!

এরপর 'এস' আমাকে একটি ভিডিও দেখায় যেখানে আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিকল্পনার শেষ পর্যায়গুলোর বিবরণ আছে, অস্পষ্ট ভিডিও, আমি তাকে ও আরো দুজন তরুণকে দেখেছিলাম, তারা শহীদ হবার গৌরবের নানা বিষয়াদি নিয়ে সংলাপরত ছিলেন এক ধরনের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের আদলে, তরুণরা এবং পরিকল্পনাকারী এরপর হাটু মুড়ে বসে তাদের ডান হাত কুর'আনের উপর রেখেছিল, মূল পরিকল্পনাকারী তাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনারা প্রস্তত। আপনারা আগামীকাল বেহেশতে থাকবেন'।

আমি যদি 'এস' এর জায়গায় থাকতাম, আমি বোমা হামলার পরিকল্পনাকারীকে জিজ্ঞাসা করার লোভ সম্বরণ করতে পারতাম না, ‘‘বেশ তাহলে, আপনি নিজেই কেন এই কাজটি করছেন না, বেহেশতে যাবার দ্রুত এই পথ ধরে আপনি নিজেই কেন আত্মঘাতী মিশনে যাচ্ছেন না'? কিন্তু আমাদের জন্য যেটা বোঝার সবচেয়ে কঠিন, আর গুরুত্বপূর্ণ বলেই এর পুনরাবৃত্তি করছি, সেটি হচ্ছে - এই মানুষগুলো আসলেই বিশ্বাস করে, তারা যা বিশ্বাস করে বলে সাধারণত দাবী করে থাকে। আর এখান থেকে যে শিক্ষাটি আমাদের নেয়া উচিত সেটি হচ্ছে, সবার আগে ধর্মকেই আমাদের দায়ী করা উচিত, ধর্মীয় উগ্রবাদকে নয়, এমন তো নয় যে এইসব উগ্রবাদ সত্যিকারের সুশীল কোনো ধর্মের ভয়ঙ্কর বিকৃত সংস্করণ। বহুদিন আগেই ভলটেয়ার সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন: 'যারা আপনাকে অযৌক্তিক সব উদ্ভট বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাতে পারবে, তারা আপনাকে দিয়ে যে-কোনো ভয়ঙ্কর ঘৃণ্য কাজও করিয়ে নিতে পারবে'। একই ভাবে বিষয়টি বুঝেছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল, 'অনেক মানুষই চিন্তা করার বদলে, বরং দ্রুত মারা যেতে চাইবে, আর আসলেই তারা মারা যায়'।

আমরা যতক্ষণ সেই মূলনীতিটাকে মেনে নেই যে, ধর্মবিশ্বাসকে প্রশ্নাতীতভাবে শুধুমাত্র শ্রদ্ধা করতে হবে, কারণ সেটি হচ্ছে ধর্মবিশ্বাস, ততক্ষণ আসলে ওসামা বিন লাদেন এবং অন্যান্য আত্মঘাতী বোমাবাজদের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করাটি স্থগিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর বিকল্প, এত স্বচ্ছ যে, এটির জন্য কোনো তাগাদা দেবার প্রয়োজন নেই, সেটি হলো ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আমাদের এই স্বয়ংক্রিয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার মূলনীতিটাকে বিসর্জন দিতে হবে। এবং এটি হচ্ছে একটি মাত্র কারণ, যার জন্য আমি আমার সর্বশক্তি দিয় ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করতে চাই। শুধু তথাকথিত উগ্রবাদী ধর্মবিশ্বাসের প্রতি নয়, মধ্যপন্থী ধর্মের শিক্ষাগুলো যদিও

প্রত্যক্ষভাবে উগ্রবাদী নয়, তবে অবশ্যই সেগুলো উগ্রবাদের প্রতি উন্মুক্ত আমন্ত্রণ ধারণ করে।

বলা যেতে পারে ধর্মবিশ্বাসের কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। দেশের বা কোনো জাতির প্রতি ভালোবাসা তাদের নিজস্ব সংস্করণের উগ্রবাদসহ পৃথিবীকে কি নিরাপদ রাখতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে, জাপানাদের কামিকাজি আত্মঘাতী যোদ্ধারা, শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগাররা। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস যে-কোনো যৌক্তিক হিসাবনিকাশ প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী কণ্ঠরোধকারী, যা আর সবকিছুর উর্ধে তাদের প্রভাবের বলয় স্থাপন করতে পারে। এর কারণ মূলত, আমি সন্দেহ করি, এর সহজ, মন ভোলানো প্রতিশ্রুতি যে, মৃত্যুই শেষ না, এবং একজন শহীদের বেহেশত বিশেষভাবে গৌরবোজ্জ্বল। এবং আংশিকভাবে এর কারণ অবশ্যই এর বিশেষ প্রকৃতির কারণে এটি এর বিরুদ্ধে যে-কোনো প্রশ্ন নিরুৎসাহিত করে।

খ্রিস্ট ধর্ম, যেমন, ইসলামে দেখা যায় সেই রকমই, শিশুদের শেখায়, প্রশ্নাতীত ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে বিশেষ সদগুণ। আর আপনি কি বিশ্বাস করবেন তার জন্য আপনাকে কোনো যুক্তিও দিতে হবে না, কেউ যদি ঘোষণা করেন যে, এটি তার ধর্মবিশ্বাসের একটি অংশ, সমাজের বাকিরা, একই বিশ্বাসে বা অন্য যে-কোনো বিশ্বাসে বিশ্বাসী হোক না কেন, চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী এটি সবাই মেনে নেবে, এবং তাদের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করবে কোনো প্রশ্ন ছাড়াই। এবং বাকিরা সেই বিশ্বাসকে নীরবে শ্রদ্ধা করে যাবে যতদিন পর্যন্ত না ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করার মতো ভয়াবহ কোনো গণহত্যা বা লন্ডন কিংবা মাদ্রিদের মতো বোমা হামলার ঘটনা সংঘটিত হয়। আর এই সব ঘটনার পরপরই এর দায় অস্বীকার করা সমবেত কণ্ঠ আরো জোরালো হয়ে ওঠে, যখন নানা শ্রেণীর মোল্লা এবং সমাজের নেতারা (তাদের আসলে কে নির্বাচন করে, আর কি উপায়ে তাদের নির্বাচন করা হয়?) লাইন বেধে দাড়িয়ে বলতে থাকেন এটি তাদের ধর্ম না, এটি হচ্ছে তাদের সত্যিকারের ধর্মের একটি বিকৃত সংস্করণ। কিন্তু কিভাবে ধর্মবিশ্বাস বিকৃত হতে পারে, যদি ধর্মবিশ্বাসের কোনো যৌক্তিক ভিত্তি না থাকে, যার এমন কোনো প্রমাণযোগ্য মানদণ্ড থাকে না, যেখানে থেকে এর বিচ্যুতি ঘটতে পারে।

দশ বছর আগে ইবন ওয়ারাক তথ্যসমৃদ্ধ একজন ইসলাম গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গিতে তার চমৎকার ‘হোয়াই আই অ্যাম নট এ মুসলিম’ বইয়ে (৪৫) এইসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। আসলেই ‘দ্য মিথ অব মডারেট ইসলাম’ ইবন ওয়ারাকের এই বইটির একটি ভালো বিকল্প শিরোনাম হতে পারে। এটি অবশ্য লন্ডনের স্পেক্টেটর পত্রিকায় (৩০ জুলাই ২০০৫) প্রকাশিত সাম্প্রতিক একটি নিবন্ধের শিরোনাম ছিল, যার লেখক ছিলেন আরেক জন জ্ঞানী ব্যক্তি প্যাট্রিক সুখদেও, যিনি ‘ইন্সস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব ইসলাম অ্যান্ড ক্রিশ্চিয়ানিটির’ একজন পরিচালক: ‘অধিকাংশ মসুলমানই

সব ধরনের সন্ত্রাসকে বর্জন করে বর্তমানে তাদের জীবন কাটাচ্ছেন। কারণ কুর'আন হচ্ছে অনায়াসে 'পিক অ্যান্ড মিক্স' বা বাছাই ও মিশ্রণ করা সম্ভব এমন একটি সংগ্রহ, সেখান থেকে আপনি আপনার পছন্দমত বিষয়গুলো বাছাই করতে পারেবন। আপনি যদি শান্তি চান, তাহলে শান্তির বাণী সম্বলিত আয়াত আপনি সেখানে খুঁজে পাবেন, যদি আপনি যুদ্ধ চান, হিংস্র আর বিদ্বেষপূর্ণ অনুভূতি উস্কে দেবার মত আয়াতও আপনি পাবেন।

সুখদেও এরপর ব্যাখ্যা করেন কিভাবে ইসলামী পণ্ডিতরা, কুর'আনে বিদ্যমান নানা বৈপরীত্য বা বিপরীতার্থক বিষয়ের উপস্থিতিকে সামাল দিতে গিয়ে একটি রহিতকরণের মূলনীতি (প্রিন্সিপল অব অ্যাবরোগেশন) উদ্ভাবন করেছিলেন, যে সূত্রানুযায়ী পরবর্তীতে আগত কোনো আয়াত ইতোপূর্বে আসা সমধর্মী কোনো আয়াতকে বাতিল করবে। দূর্ভাগ্যজনকভাবে, কুর'আনে শান্তির কথা বলা অনুচ্ছেদগুলো মূলত বেশ আগের, মুহম্মদের মক্কায় থাকাকালীন সময়ে। কিন্তু আরো বেশি যুদ্ধ প্রিয় অনুচ্ছেদগুলো সাধারণ পরবর্তী পর্যায়ে, তার মদিনায় পলায়নের পর, এর ফলাফলে:

> ইসলাম মানে শান্তি', এই মন্ত্র প্রায় ১৪০০ হাজার বছর আগেই বাতিল হয়ে গেছে। শুধুমাত্র প্রথম দিকের প্রায় তেরো বছরের জন্য, ইসলাম মানে শান্তি এবং শান্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। সুতরাং আজকের জঙ্গী মুসলিমরা এবং সেই মধ্যযুগের জ্ঞানী পণ্ডিত ইসলামী আইনতত্ত্বের দার্শনিকরা, যারা ধ্রুপদী ইসলামকে গড়ে তুলেছিলেন তাদের জন্য বরং বেশি সত্য হবে 'ইসলাম মানে যুদ্ধ' এটা বলা। যুক্তরাজ্যের অন্যতম জঙ্গী ইসলামী গোষ্ঠী আল-ঘুরাবা লন্ডনের দুটি বোমা হামলার পর মন্তব্য করেছিল .. 'যদি কোনো মুসলিম অস্বীকার করেন যে, সন্ত্রাস ইসলামের অংশ না, তাহলে তারা কাফের'। 'কাফের' অর্থাৎ অবিশ্বাসী (যেমন, অমুসলিমরা) অত্যন্ত অপমানজনক একটি শব্দ।
>
> এমন কি হতে পারে, যে তরুণরা লন্ডন সাবওয়েতে আত্মঘাতী বোমাহামলা করেছিল, তারা যেমন আসলেই ব্রিটেনের একবারে প্রান্তিক পর্যায়ের কোনো মুসলিম সমাজের সদস্য ছিল না, তেমনি তারা তাদের ধর্মের কোনো খামখেয়ালী অদ্ভুত আর জঙ্গী ব্যাখ্যার অনুসারীও ছিল না, বরং তারা এসেছে মুসলিম সমাজের কেন্দ্র থেকে এবং ইসলামের মূলধারার ব্যাখ্যা থেকেই তারা প্রণোদনা পেয়েছিল?

আরো সাধারণভাবে (এবং ইসলামের মতোই এটি খ্রিস্ট ধর্মের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য) আসলেই যা ক্ষতিকর সেটি হচ্ছে প্রশ্নাতীত ধর্মবিশ্বাস নিজেই যে একটি সদগুণ শিশুদের সেটি শিক্ষা দেয়ার প্রবণতা । ধর্মবিশ্বাস অশুভ, কারণ নির্দিষ্টভাবে এটি কোনো যৌক্তিকতার ধার ধারে না, কোনো ধরনের তর্ক-বিতর্ক সে গ্রাহ্য করে না। শিশুদের 'কোনো প্রশ্ন করা যাবে না' এমন বিশ্বাস শেখানোর প্রক্রিয়া তাদের প্রস্তুত করে - আরো অনায়াসলভ্য নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতি আর উপাদানের উপস্থিতিতে - ভবিষ্যত জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধের সম্ভাবনাময় ভয়ঙ্কর অস্ত্র হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠতে। শহীদের বেহেশত পাবার প্রলোভনে সব ধরনের ভয় থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, সমরাস্ত্রের ইতিহাসে দীর্ঘ তীর-ধনুক আর যুদ্ধের ঘোড়া, ট্যাঙ্ক এবং গুচ্ছ-বোমার মত মারণাস্ত্রের পাশেই উচ্চ স্থানে প্রকৃত কোনো ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের জায়গা হওয়া উচিত। যদি শিশুদের তাদের বিশ্বাস নিয়ে ভাবতে, এবং সেটিকে প্রশ্নে করার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করতে শেখানো যেত, বেশ নিশ্চিত বাজি রেখে বলা সম্ভব হতো যে, আর কখনোই আত্মঘাতী বোমাবাজদের দেখা মিলবে না। আত্মঘাতীরা যে কাজটি করে সেটি করার কারণ হচ্ছে তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে ধর্মীয় স্কুলে তাদের যা শেখানো হয়েছে সেটি অলঙ্ঘনীয়ভাবে সত্য: ঈশ্বরের প্রতি কর্তব্য অন্য যে-কোনো কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার সেবায় শহীদত্ব বরণ করার পুরষ্কার হিসাবে রয়েছে বেহেশতের বাগানের প্রতিশ্রুতি। আর এই দীক্ষাটি যে তাদের আবশ্যিকভাবে উগ্রপন্থী ধর্মান্ধদের কারো কাছে থেকে পেতে হবে তা কিন্তু নয়, এছাড়াও ভদ্র, নম্র মূলধারার ধর্মীয় প্রশিক্ষকদের কাছ থেকেও তারা এই দীক্ষাটি পেতে পারে। যে প্রশিক্ষকরা তাদের মাদ্রাসাগুলোয় সারিবদ্ধ করে বসায়, যেখানে পাগল হয়ে যাওয়া কোনো টিয়া পাখির মত তারা তারা নিষ্পাপ ক্ষুদ্র মাথাগুলো ছন্দের তালে উপর নীচে দুলিয়ে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে প্রতিটি শব্দ মুখস্থ করে। ধর্মবিশ্বাস অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে, এবং সচেতন ও পরিকল্পিত উপায়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের অবুঝ মনে এটিকে গেঁথে দেয়া খুবই অন্যায় একটি কাজ। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা শৈশব, এবং ধর্মের দ্বারা শৈশবের নিপীড়ন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

টীকা:

(১) রাসেল স্ট্যানার্ড: ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী।

(২) Russell Stannard. Doing Away With God? : Creation and the New Cosmology. (1993)

(৩) A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and Love: Richard Dawkins

(৪) আমার আসলে সেই দুঃসাহস নেই সেই কারণগুলো উল্লেখ করে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করার, অন্তত একটি কারণ যা আমার সবচেয়ে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সহকর্মী ব্যবহার করেন সচরাচর, যখনই কোনো সৃষ্টিতত্ত্ববাদী তার সাথে কোনো আনুষ্ঠানিক বিতর্ক আয়োজন করার চেষ্টা করে থাকেন (আমি তার নাম বলবো না, তবে তার বাক্যটি অষ্ট্রেলীয় বাচনভঙ্গীতে পড়ত হবে): 'হয়তো এটা তোমার জীবন বৃত্তান্তে বেশ ভালো দেখাবে, তবে আমারটায় ততটা না'।

(৫) 'What is true?' Ch. 1.2 of A Devil's Chaplain: Selected Essays. Richard Dawkins, London: Weidenfeld & Nicolson
(৬) ওয়াইসের দুটি উদ্ধৃতিরই উৎস: In Six Days, an anthology of essays by young-Earth creationists (Ashton 1999)
(৭) মার্টিন লুথার, জার্মান যাজক, রিফরমেশন আন্দোলনের সূচনাকারী।
(৮) জর্জ অরওয়েল (এরিক ব্লেয়ার) ব্রিটিশ লেখক ও সাংবাদিক।
(৯) 1984 - জর্জ অরওয়েল এর একটি উপন্যাস।
(১০) উনস্টোন স্মিথ জর্জ অরওয়েল এর Nineteen Eighty-Four উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র।
(১১) মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজম বা নৈতিক চূড়ান্তবাদ একটি নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা দাবী করে, কোনো একটি কাজ হয় চূড়ান্তভাবে সঠিক অথবা চূড়ান্তভাবে ভুল, সেই কাজটির সম্পাদনের পেছনে যে উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি বা তার পরিণাম যাই হোক না কেন। যেমন, চুরি করা সবসময়ই অনৈতিক হিসাবে গণ্য করা হবে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে, এমন কি যদি সেই চুরি করা হয় কোনো ক্ষুধার্ত পরিবারের জীবন বাঁচাতে। সাধারণ নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বগুলো যেমন, পরিণতিবাদের সাথে মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজমের অবস্থানটি খুবই ভিন্ন। পরিণতিবাদ যেমন দাবী করছে মোটা দাগে কোনো কাজের নৈতিকতা নিভর করছে সেই কাজটি কোন পরিস্থিতিতে করা হয়েছিল এবং তার পরিণতি কি হয়েছিল। মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজমের সাথে মোরাল ইউনিভার্সালিজমের (যাকে মোরাল অবজেক্টিজমও বলা হয়ে থাকে) পার্থক্য আছে: মোরাল ইউনিভার্সালিজম দাবী করছে কোনো কাজটি ন্যায় এবং অন্যায় তা প্রথা বা মতামত থেকে স্বাধীন (যা ঠিক নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের বিপরীত) তবে তাদের যে পরিস্থিতি বা পরিণতি থেকে স্বাধীন হতে হবে এমন আবশ্যিকতা নেই (যা নৈতিক চরমাবাদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে)। মোরাল ইউনিভার্সালিজম আবার মোরাল অ্যাবসোল্যুটিজমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে তবে সেটি মাঝে মাঝে পরিণতিবাদের জায়গাও নিতে পারে। লুই পজম্যানের সংজ্ঞায়: অ্যাবসোল্যুটিজম হচ্ছে কমপক্ষে একটি মূলনীতি যা কখনোই লঙ্ঘন করা যাবে না, আর মোরাল অবজেক্টিজম হচ্ছে কোনো একটি কাজের নৈতিকভাবে গ্রহনযোগ্যতার ব্যপারে একটি বাস্তব সত্যের উপস্থিতি আছে: এই বাস্তব সত্যটি শুধুমাত্র সামাজিক প্রথা এবং ব্যক্তিগত গ্রহনযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। নৈতিক তত্ত্বগুলো অধিকার আর কর্তব্যর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, যেমন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের ডিওন্টোলজিকাল নীতিশাস্ত্র প্রায়শই অ্যাবসোল্যুটিজমের উদাহরণ, এছাড়াও যেমন অসংখ্য ধর্মীয় নৈতিক নির্দেশগুলো নৈতিক অ্যাবসোল্যুটিজমের উদাহরণ।
(১২) Kevin Phillips. American Theocracy: The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and Borrowed Money in the 21stC entury:
(১২) হামিদ কারজাই, আফগানিস্থানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট।
(১৩) Warraq, I. (1995). Why I Am Not a Muslim. New York: Prometheus (page 175).
(১৪) যীশুকে ভাড়ের সাথে তুলনা করা জন্য John William Gott এর শাস্তির বিবরণ আছে এখানে: The Indypedia, published by the Independent, 29 April 2006.
(১৫)The attempted prosecution of the BBC for blasphemy: BBC news, 10 Jan. 2005: http://news.bbc.co.uk/l/hi/ entertainment / tv_and_radio/ 4161109.stm.
(১৬) http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban.html.
(১৭) Kimberly Blaker.The Fundamentals of Extremism: The Christian Right in America.
(১৮) অ্যালান ম্যাথিসন ট্যুরিং (১৯১২-১৯৫৪) ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ, লজিশিয়ান,দার্শনিক, গাণিতিক জীববিজ্ঞানী,কম্পিউটার বিজ্ঞানের অগ্রপথিক। কম্পিউটার সায়েন্স এর জনক বলা হয় তাঁকে এই ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য। টিউরিং ম্যাশিনের মাধ্যমে তিনি অ্যালগরিদম আর কম্পিউটেশনের ধারণাটিকে

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাকে তাত্ত্বিক কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে গবেষণা ক্ষেত্রের জনক বলা হয়ে থাকে।

(১৯) জন ভন নিউম্যান (১৯০৩-১৯৫৪) ব্রিটিশ হাঙ্গেরীয় বংশোদ্ভুত আমেরিকার গণিতজ্ঞ, পদার্থবিজ্ঞানী, আবিষ্কারক। গণিত,কম্পিউটার,অর্থনীতি, পরিসংখ্যান সহ আরো বেশ কিছু ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে।

(২০) Hodges, A. (1983). Alan Turing: The Enigma. New York: Simon & Schuster.

(২১) এটি এবং বাকি উদ্ধৃতিগুলো আমেরিকান তালিবান সাইট থেকে সংগৃহীত: http:// adult thought. ucsd.edu/Culture_War/ The_American_Taliban. html

(২২) http://adultthought.ucsd.edu/Culture_War/The_American_Taliban. html.

(২৩) মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র (১৯২৯-১৯৬৮), আমেরিকার ধর্মযাজক, কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকার আন্দোলনের নেতা।

(২৪) From Pastor Phelps's Westboro Baptist Church official website, god hates fags. com:http://www.godhatesfags.com/ fliers/ jan2006/ 20060131_ coretta-scott-king-funeral.pdf.

(২৫) Mooney (2005): The Republican War on Science. Cambridge, MA: Basic Books; Silver, L. M. (2006). Challenging Nature: The Clash of Science and Spirituality at the New Frontiers of Life. New York: HarperCollins: এই দুটো বই দ্য গড ডিল্যুশনের প্রুফ দেখার সময় প্রকাশিত হয়েছে, তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পুরোপুরিভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি।

(২৬) http://www.pbs.org/ wgbh/pages/frontline/shows/ execution/ readings/ texas.html.

(২৭) http://en.wikipedia.org/wiki/Karla_Faye_Tucker

(২৮) ক্রিষ্টোফার হিচেন্স – ব্রিটিশ আমেরিকান লেখক, সাংবাদিক।

(২৯) Christopher Hitchens.The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice. (1995)

(৩০) র‍্যানডাল টেরির এই উদ্ধৃতিগুলোর উৎস সেই একই আমেরিকান তালিবান ওয়েবসাইট: http:// adultthought.ucsd.edu/Culture_War/ The_American_ Taliban. html

(৩১) Mark Juergensmeyer.Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence.

(৩২) Fox news:http://www.foxnews.com/story/0,2933,96286,00.html.

(৩৩) Dawkins, M. Stamp (1980). Animal Suffering. London: Chapman &Hall.

(৩৪) Religious Coalition for Reproductive Choice, (http://www. rcrc.org/.);

(৩৫) পিটার মেদাওয়ার, ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী ও ইমিউনোলজিষ্ট।

(৩৬) Peter Medawar, J.S. Medawar. The Life Science: Current Ideas in Biology.

(৩৭) http://www.warroom.com/ethical.htm.

(৩৮) রোয়াল্ড ডাল (১৯১৬-১৯৯০) ব্রিটিশ সাহিত্যিক।

(৩৯) একটি হমিনিন প্রজাতি।

(৪০) Jan Goodwin. Price of Honor: Muslim Women Lift the Veil of Silence on the Islamic World.

(৪১) Johann Hari's article, originally published in the Independent, 15 July 2005, can be found at http://www. johannhari.com/archive/ article.php? id=640

(৪২) Village Voice, 18 May 2004: http://www.villagevoice.com/ news/0420, perlstein, 53582,l. html.
(৪৩) Harris, S. (2004). The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason. New York: Norton
(৪৪) Nasra Hassan, 'An arsenal of believers', New Yorker, 19 Nov.2001. See also http://www.bintjbeil. com/articles/en/011119_hassan.html
(৪৫) Ibn Warraq.Why I Am Not a Muslim.

অধ্যায় ৯
শৈশব, নিপীড়ন এবং ধর্ম থেকে মুক্তি

প্রতিটি গ্রামেই একটি আলোর মশাল থাকে - একজন শিক্ষক, আর থাকে একজন, যে এই আলোর মশালটিকে নিভিয়ে দেয় - একজন ধর্মযাজক। - ভিক্টর মারি ইউগো

উনবিংশ শতাব্দীর ইতালীর একটি কাহিনী দিয়ে শুরু করবো। তবে আমি কিন্তু এমন কোনো ধারণা দিতে চাইছি না যে, এই ধরনের কোনো ভয়াবহ ঘটনা আজও ঘটতে পারে। তবে এই গল্পটি যে ধরনের মানসিকতা উন্মোচন করে, সেটি অত্যন্ত হতাশাজনকভাবে এখনো সাম্প্রতিক, যদিও এর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো হয়তো সাম্প্রতিক নয়। উনবিংশ শতাব্দীর এই মানবিক ট্রাজেডিটি বর্তমান সময়েরও শিশুদের প্রতি ধর্মীয় মনোভাবের স্বরূপকে নিষ্ঠুরভাবে উন্মোচন করে।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে এডগার্ডো মোরতারা (১), ইহুদী বাবা মায়ের ছয় বছর বয়সী এই শিশুটি ইটালির বোলোনিয়ায় বসবাস করতো। ইনক্যুইজিশনের (২) নির্দেশানুযায়ী পোপের পুলিশরা আইনগতভাবে তাকে তাদের হেফাজতে নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার ক্রন্দনরত মা আর বিপর্যস্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাবার সামনে থেকে জোর করে শিশু এডগার্ডোকে টেনে হিচড়ে রোমের একটি ক্যাটিকিউমেনে নিয়ে যাওয়া হয় (ক্যাটিকিউমেন হচ্ছে একটি অস্থায়ী নিবাস, যেখানে ইহুদী এবং মসুলমানদের খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর্বে রাখা হতো) এবং এরপর সেখানে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে তাকে প্রতিপালন করা হয়। মাঝে মাঝে সদা সতর্ক কোনো পাদ্রীর উপস্থিতিতে সংক্ষিপ্ত দেখা হওয়া ছাড়া তার পিতা-মাতা আর কোনোদিনও এডগার্ডোর দেখা পাননি। ডেভিড আই. কার্টজার তার ‘দ্য কিডন্যাপিং অব এডগার্ডো মোরতারা’ বইটিতে (৩) এই গল্পটি বর্ণনা করেছিলেন।

এডগার্ডোর ঘটনা ইটালিতে সেই সময় কিন্তু ব্যতিক্রমী বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না, এবং এভাবে ধর্মযাজক কর্তৃক বিভিন্ন সব অপহরণের ঘটনার কারণও সব সময়েই ছিল একটাই। প্রতিটি ক্ষেত্রে, শিশুটিকে এর আগের কোনো এক দিনে গোপনে ব্যাপটাইজ বা খ্রিস্টীয়করণ করা হতো, সাধারণত বাচ্চাটিকে দেখাশুনা করার জন্য নিযুক্ত ক্যাথলিক পরিচারিকারাই এই কাজটি করতো, এবং পরে ক্যাথলিক ইনক্যুইজিশন সেই ব্যাপটিজমের খবরটি তাদের নজরে নিয়ে আসতেন। রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসের একেবারে কেন্দ্রেই একটি বিশেষ ধারণা আছে, যদি কোনো শিশুকে একবার ব্যাপটাইজ করা হয়, আর তা যতই গোপনীয়, আর অনানুষ্ঠানিকভাবে করা হোক না কেন, শিশুটি চিরকালের জন্য ক্যাথলিক খ্রিস্টানে রূপান্তরিত হয়। আর ক্যাথলিকদের মানসিক জগতে, ইহুদী বাবা-মায়ের কাছে কোনো খ্রিস্টান শিশুকে প্রতিপালন করার সুযোগ দেয়া কোনো উপায় হতে পারে না। এবং অদ্ভুতভাবে তারা তাদের এই গোঁড়া নিষ্ঠুর অবস্থানটি দৃঢ়তা আর চরম আন্তরিকতার সাথে সারা পৃথিবীর নিন্দা উপেক্ষা করে সুরক্ষা করতেন। এই বিশ্বব্যপী নিন্দা অবশ্য ক্যাথলিক সংবাদপত্র ‘সিভিলটা ক্যাত্তোলিকা’ উড়িয়ে দেয় বিত্তশালী ইহুদীদের বিশ্বব্যাপী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে - ব্যাপারটা বেশ পরিচিত মনে হচ্ছে, তাই না ?

ঘটনাটি শুধু বাড়তি প্রচার পেয়েছিল, এছাড়া এডগার্ডো মোরতারার কাহিনীটি অন্য অনেক কাহিনীর মতো প্রায় একই রকম। কোনো একসময় তার দেখাশুনা করতো আনা মোরিসি নামের চৌদ্দ বছর বয়সী একজন অশিক্ষিত ক্যাথলিক বালিকা। একদিন হঠাৎ করে শিশু মোরতারা অসুস্থ হয়ে পড়লে আনা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। যেহেতু ক্যাথলিক আবহে প্রতিপালিত আনার অন্ধ বিশ্বাস ছিল, কোনো শিশু যদি ব্যাপটিজম ছাড়াই মারা যায়, সে নিশ্চিত সারাজীবন নরকের আগুনে পুড়বে, কি করা যায় এই ভেবে সে একজন ক্যাথলিক প্রতিবেশীর কাছে উপদেশ চেয়েছিল। সেই প্রতিবেশী আনাকে শিখিয়ে দেয় কিভাবে তাকে ব্যাপটিজম করাতে হবে। আনা বাসায় এসেই বালতি থেকে কয়েক ফোটা পানি এডগার্ডোর কপাল ছিটিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করে, 'আমি তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে ব্যাপটাইজ করলাম', ব্যাস এটুকুই এবং সেই মুহূর্ত থেকেই এডগার্ডো আইনগতভাবে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। এবং বেশ কয়েক বছর পরে যখন ইনকুইজিশনে বসা যাজকরা বিষয়টি জানতে পারলেন, তারা দ্রুত এই বিষয়ে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আরোপ করেছিল, তাদের সেই সিদ্ধান্তের কি দুঃখজনক পরিণতি হতে পারে সেটি পুরোপুরি উপেক্ষা করে।

বিস্ময়করভাবে সাধারণ যে ধর্মীয় আচারটির ফলাফল কিনা এত বিশাল গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে বিশাল সম্প্রসারিত কোনো পরিবারের জন্য, ক্যাথলিক চার্চ সেটি যে কাউকেই করার অনুমতি দিয়েছিল (এখনো তাই), ফলে যে-কোনো ব্যক্তি অন্য যে-কোনো ব্যক্তিকে ব্যাপটাইজ করাতে পারবেন, এজন্য তাকে ধর্মযাজক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। সেই অবোধ শিশুটি তো নয়ই, এমনকি তার বাবা-মাও না, কারোই প্রয়োজন নেই সেই ব্যাপটিজমে সম্মতি দেবার। কোথাও কোনো কিছুতে স্বাক্ষর করা লাগবে না, কোনো আনুষ্ঠানিক সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র এই আচারটির জন্য যা দরকার তা হলো পানির ছিটা দেয়া এবং কিছু শব্দ উচ্চারণ, এবং একটি অসহায় শিশু, এবং ধর্মীয় বিশ্বাসে অন্ধ, গোঁড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ একজন পরিচারিকা, ব্যস। আসলে প্রয়োজন শুধু শেষ ব্যক্তিটির, কারণ শিশুটির বয়স এত কম যে, সে না হতে পারে সাক্ষী, না দিতে পারে সম্মতি, তার কোনো কিছু বোঝার কি আদৌ ক্ষমতা আছে? যুক্তরাষ্ট্রে একজন সহকর্মী, যিনি ক্যাথলিক ঘরানায় প্রতিপালিত হয়েছেন, আমাকে লিখেছিলেন: 'আমরা আমাদের পুতুলকে ব্যাপটাইজ করাতাম, আমার মনে পড়ে না আমরা আমাদের কোনো ছোটো প্রটেস্ট্যান্ট বন্ধুকে কখনো ব্যাপটাইজ করেছিলাম কিনা, তবে কোনো সন্দেহ নেই সেটা ঘটেছিল এবং আজো ঘটছে। আমরা আমাদের পুতুলদের ছোটো ক্যাথলিক বানাতাম, তাদের চার্চে নিয়ে যেতাম, হলি কমিউনিয়ন দিতাম ইত্যাদি। ছোটোবেলা থেকে ভালো ক্যাথলিক মা হবার জন্য আমাদের মগজ ধোলাই করা হয়েছিল'।

আমার আধুনিক সহকর্মীর মত যদি উনবিংশ শতাব্দীর মেয়েরা কিছুটা হয়ে থকে, তাহলে বিস্ময়কর ব্যপার হলো এডগার্ডো মোরতারার মত ঘটনা যতটা বেশি হওয়া উচিত ছিল তার চেয়ে কম ঘটেছে। তাসত্ত্বেও এমন ঘটনা হতাশাজনকভাবে উনবিংশ শতাব্দীর ইটালিতে বহু ঘটেছে, আর বিষয়টি অবধারিতভাবে একটি প্রশ্নের জন্ম দেয়: কেনই বা পোপের মালিকানাধীন কোনো রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদীরা আদৌ ক্যাথলিক কাজের লোকদের নিয়োগ দিত, বিশেষ করে যখন এই ধরনের ভয়াবহ ঝুঁকির সম্ভাবনা ছিল? কেন তারা সাবধানী হয়ে ইহুদী কাজের লোক নিয়োগ করতো না? এর উত্তর আবারো সম্পূর্ণ কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত এবং তাদের ধর্মের সাথেই আবার সংশ্লিষ্ট। ইহুদীদের এমন কাজের লোক দরকার, যারা সাবাথের দিনও কাজ করবে। একজন ইহুদী কাজের মেয়ে তাদের সন্তানকে ব্যাপটাইজ করে পোপের এতিমখানায় নেবার মত ঘটনা ঘটবে না এমন নিশ্চিৎ হওয়া গেলেও, সে শনিবারে কোনো কাজই করতে পারবে না তার সাবাথের কারণে, যেমন চুলায় আগুন জ্বালানো বা ঘর পরিষ্কার, কারণ সেদিন কাজ করা ধর্মমতে নিষিদ্ধ। সে কারণে নিজেদের স্বার্থেই বোলোনিয়ার ইহুদী পরিবারগুলোর, যাদের সে সময় কাজের লোক রাখার সামর্থ ছিল, তারা মূলত ক্যাথলিক গৃহকর্মীদের নিয়োগ দিতেন।

এই বইতে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের, বা স্পেনের কনকুইস্টাডরদের (৪) বা যারা আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করতে গিয়েছিলেন বা ইনকিউজিশনের ভয়াবহতার বিবরণ দিতে চাইনি। কোনো শতাব্দীতেই নিষ্ঠুর আর অশুভ চরিত্রের ব্যক্তিদের অভাব কম ছিল না। ইটালির ইনকুইজিশনের এই কাহিনীটি, এবং বিশেষভাবে শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মীয় মানসিকতার আসল স্বরূপ, এবং বিশেষভাবে এই ধর্মীয় মানসিকতা কিভাবে ভয়ঙ্কর অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে সেটি উন্মোচন করেছিল: প্রথমত, খেয়াল করুন ধর্মবাদীদের সেই মানসিক ধারণা, পানির ছিটা দেয়া, আর সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্য আর শব্দ উচ্চারণ একটি অবুঝ শিশুর জীবন পুরোপুরি বদলে দিতে পারে, আর এই ঘটনাটির গুরুত্ব এমনকি শিশুর পিতামাতার সম্মতি গ্রাহ্য করে না, আর শিশুর সম্মতি তো ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না। এছাড়াও শিশুটির নিজের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্য অবলীলায় অগ্রাহ্য করা হয়। সামান্যতম কাণ্ডজ্ঞান এবং মানবিক অনুভূতি এই ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়, ধর্মাশ্রিত মন সেই সব কিছুই স্বেচ্ছাচারিতায় অগ্রাহ্য করে। কার্ডিনাল আন্টোনেলি সেই সময় ব্রিটেনের প্রথম ইহুদী সংসদ সদস্য লায়োনেল রথসচাইল্ডকে লেখা একটি চিঠিতে পুরো ব্যপারটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছিলেন, যখন রথসচাইল্ড শিশু এডগার্ডোর অপহরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কার্ডিনাল এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ব্যপারে অপারগতা প্রকাশ করে তিনি আরো যোগ করেন, ‘এটাই সম্ভবত পর্যবেক্ষণ করা সবচেয়ে ভালো সময়, প্রকৃতির ডাক শক্তিশালী কিনা, এমন কি

সেটি ধর্মের পবিত্র কর্তব্যর চেয়েও শক্তিশালী কিনা’। বেশ, এখানেই সব প্রশ্নের জবাব মিলছে, তাই না?

দ্বিতীয়ত, আরো বেশি অসাধারণ ব্যপারটি হচ্ছে, আপাতদৃষ্টিতে ধর্মযাজক, কার্ডিনাল এবং পোপ কেউই শিশু এডগার্ডোর সাথে যে তারা ভয়াবহ আর নিষ্ঠুর অবিচার করছেন, সেটি মূলত বুঝতেই পারছেন না। যে-কোনো ধরনের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের সীমানার মধ্যে এটি পড়ে না। কিন্তু তারপরও তারা যেন আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করেছিলেন, এডগার্ডোর জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক কাজটি তারা করছেন। বাবা-মায়ের স্নেহ থেকে শিশুটিকে বঞ্চিত করে খ্রিস্টীয় ঘরানায় প্রতিপালিত হবার সুযোগ দিয়ে তারা যেন এডগার্ডোর উপকারই করেছেন। শিশুটিকে রক্ষা করতে তারা কর্তব্য অনুভব করেছিলেন!! যুক্তরাষ্ট্রের একটি ক্যাথলিক সংবাদপত্র মোরতারা ঘটনায় পোপের এই অবস্থানকে সমর্থন করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। সেখানে প্রস্তাব করা হয়েছিল, ইহুদীদের দ্বারা প্রতিপালিত হতে একটি খ্রিস্টান শিশুকে পরিত্যাগ করার কথা কোনো খ্রিস্টান সরকারই ভাবতে পারবে না। এবং এখানে তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার ধোঁয়াও তুলেছিলেন, একটি শিশুর খ্রিস্টান হবার স্বাধীনতা আছে, তাকে ইহুদী হবার জন্য বাধ্য করার লক্ষ্যে কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি অনাকাঙ্ক্ষিত। শিশুটির উপর আরোপিত পবিত্র পিতার সুরক্ষা, সব ধরনের হিংস্র মৌলবাদ এবং অবিশ্বাস ও গোঁড়ামীর মুখোমুখি, আসলেই সবচেয়ে মহানতম একটি নৈতিক অবস্থান, যা পৃথিবী বহুদিন দেখেনি’। ‘জোরপূর্বক’, ‘বাধ্যতামূলক হিংস্র’, ‘উগ্রতা’, ‘গোঁড়ামী’ এই শব্দগুলোর এই ধরনের নগ্ন ও দৃষ্টিকটুভাবে ভিন্ন দিক বরাবর ব্যবহার করার এর চেয়ে নির্লজ্জ উদাহরণ কি আর আছে? অথচ ক্যাথলিক ধর্মবাদীরা, পোপ থেকে শুরু করে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে, তারা যা করছেন সেটাই নৈতিকভাবে চূড়ান্ত ও সঠিক, এবং শিশুটির কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্মের এটাই শক্তি (মূলধারা এবং মধ্যপন্থী), যা বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা গ্রাস করে, সাধারণ মানবিক শ্লীলতাকে বিকৃত করে। ‘ইল কাত্তোলিকো’ পত্রিকাটি সুস্পষ্টভাবে চার্চের মহানুভব এই কর্মটি - এডগার্ডো মোরতারার ক্ষেত্রে যা করা হয়েছিল, অর্থাৎ তাকে তার ইহুদী পরিবার থেকে রক্ষা করা হয়েছে - বোঝায় সর্বব্যাপী ব্যর্থতায় তাদের বিস্ময় প্রকাশ করেছিল:

> আমাদের মধ্যে যারাই বিষয়টি নিয়ে একটু গুরুত্ব সহকারে ভাববেন, তারা ইহুদীদের সাথে পরিস্থিতিটার তুলনামূলক একটি রূপ দেখতে পাবেন, কোনো সত্যিকারের চার্চ নেই, একজন রাজা নেই, আর দেশ ছাড়া নানা জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, সবসময় সেখানে তারা ভিনদেশী, উপরন্তু খ্রিস্ট হত্যার সেই কুখ্যাত কুৎসিৎ কলঙ্ক চিহ্ন তারা বহন করছে, তারা সাথে সাথেই বুঝতে পারবেন পোপের এই সময়োচিত

বিশেষ অনুগ্রহ মোরতারা বালকের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করবে তার জীবনে।

তৃতীয়ত, ধর্মের সেই অতি-অহংকারী ভাব, যার প্রভাবে ধর্মীয় ব্যক্তিরা প্রমাণ ছাড়াই জানেন যে, তাদের জন্মগত বিশ্বাসটি হচ্ছে একমাত্র সত্য বিশ্বাস, বাকি সব কিছু ভ্রান্ত এবং চূড়ান্তভাবে মিথ্যা। উপরের উদ্ধৃতিটি খ্রিস্টীয় মানসিকতার প্রকৃত রূপটি কেমন হতে পারে তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং এই ক্ষেত্রে দুই পক্ষকে একইভাবে দেখা অত্যন্ত অবিচার হবে । কিন্তু অন্য যে-কোনো পরিস্থিতির মতোই মনে রাখা উত্তম হবে, মোরতারারা কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সন্তান এডগার্ডোকে ফিরে পেতেন, যদি তারা ধর্মযাজকের উপদেশ মোতাবেক তাদের নিজেদের 'ব্যাপটাইজ' করতে রাজী হতেন। শুধুমাত্র তার গায়ে পানির ছিটা এবং এক ডজন অর্থহীন কিছু শব্দ উচ্চারণ করার জন্য। ধর্মীয় দীক্ষায় দীক্ষিত মনের এই হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা, আর এক জোড়া মানুষের উপর পানির ছিটা পড়লেই কিন্তু সব প্রক্রিয়ার বিপরীতমুখী গ্রহনযোগ্য একটি সমাধান হতে পারতো, পুরো বিচার মোরতারা পরিবারের পক্ষে বদলে যেতো। আমাদের কারো কারো কাছে, মোরতারার বাবা-মায়ের ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকৃতি জানানোর ব্যপারটা মনে হতে পারে ইচ্ছাকৃত গোয়ার্তুমি। কিন্তু অন্যদের কাছে তাদের নীতিগত অবস্থান তাদের যুগে যুগে বিশ্বব্যাপী ধর্মের কারণে আত্মত্যাগীদের দীর্ঘ তালিকায় সমপরিমান মর্যাদায় আসীন করেছিল।

'মাষ্টার রিডলী, আশ্বস্ত করুন নিজেকে, এবং আপনার দ্বায়িত্ব পালন করুন: ঈশ্বরের কৃপায় এই দিনে আমরা ইংল্যান্ডে এমন একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে যাবো, এবং আমি বিশ্বাস করি কোনোদিনও তা নিভে যাবে না' (৫) । কোনো সন্দেহ নেই প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য মহৎ উদ্দেশ্যের কোনো অভাব নেই। কিন্তু কিভাবে শহীদত্রয় রিডলী, লাটিমার, ক্র্যানমার (৬) তাদের প্রটেস্টান্ট মতবাদ অস্বীকার করে ক্যাথলিক মতবাদ গ্রহন করার বদলে আগুনে পুড়ে শহীদ হবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সিদ্ধ ডিম কোনো দিক দিয়ে ভাঙ্গা ভালো, ছোটো না বড় প্রান্ত থেকে, এর সাথে কি এই বিতর্কটির আসলেই কোনো পার্থক্য আছে। ধর্মীয় মানসিকতার এই ধরনের অন্ধ বিশ্বাস কি গোয়ার্তুমি বা প্রশংসাযোগ্য হতে পারে, যদি আপনার দৃষ্টিভঙ্গিও সেই রকম হয়ে থাকে যে, মোরতারা পরিববার কিছুতেই ব্যাপটিজমের সেই অর্থহীন ধর্মীয় আচারটির সুযোগ নেবার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তারা কি ছলনার আবরণে এই সুযোগটা নিতে পারতো না, ব্যাপটিজমের সময় তারা কি মনে মনে না বলতে পারতেন না? নিজেদের ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য এতটুকু ছলনা কি তারা কি করতে পারতেন না? কিন্তু না, তারা এমন কিছু করতে পারেননি, কারণ তারাও প্রতিপালিত হয়েছেন ধর্মীয় (মৃদুপন্থী) পরিমণ্ডলে, সুতরাং এই এসব হাস্যকর আচার তারা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বিচার করতে শিখেছেন। আমি শুধু সেই হতভাগ্য এডগার্ডোর কথা ভাবি, নিজের

অনিচ্ছায় অজান্তে তার এমন একটি পৃথিবীতে জন্ম নিতে হয়েছে, যেখানে প্রাধান্য বিস্তার করছে ধর্মাশ্রিত মানসিকতা; এই দ্বিমুখী দ্বন্দ্বে নিষ্ঠুরতম একটি প্রক্রিয়ায় অসহায় এই শিশুটি এতিমে রূপান্তরিত হয়েছিল, যদিও চার্চের চোখে সেটি ছিল তার জন্যে সবচেয়ে উপকারি সিদ্ধান্ত।

চতুর্থত, এই ভাবনাটিকে আরো খানিকটা অগ্রসর করলে, যে ধারণাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি, সেটি দাবী করছে যে, ছয় বছরের একটি বালকও কোনো ধর্মাবলম্বী হতে পারে, বা সত্যিকার অর্থে তার আদৌ কোনো ধর্ম থাকতে পারে, সেটি ইহুদীবাদ, খ্রিস্টধর্ম বা যে-কোনো ধর্মই হোক না কেন। অন্যভাবে বললে, কোনো একটি অবুঝ শিশুকে তার অজান্তেই ব্যাপটাইজ করার মাধ্যমে এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে রূপান্তরিত করাটাই আরো বেশি উদ্ভট। তবে নাবালক শিশুদেরকে কোনো একটি বিশেষ ধর্মের বলে চিহ্নিত করার চেয়ে অবশ্যই বেশি উদ্ভট নয়। এডগার্ডোর কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তা তার ধর্ম না (যথেষ্ট ভালো করে জেনে বুঝে কোনো একটি ধর্মের অনুসারী হবার জন্য তার বয়স যথেষ্ট কম) বরং তার বাবা মা ও পরিবারের ভালোবাসা এবং যত্ন এবং এসব কিছু থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে কিছু ক্যাথলিক চিরকুমার যাজকদের কারণে, যাদের কুৎসিৎ নিষ্ঠুরতাকে হার মানাতে পারে শুধু তাদের সাধারণ মানবীয় অনুভূতিগুলোর প্রতি নগ্ন স্থুল অসংবেদনশীলতা, যে অসংবেদনশীলতা ধর্ম কর্তৃক অপহৃত মানসিকতায় খুব সহজে জায়গা করে নেয়।

এমনকি শারীরিকভাবে অপহরণ ছাড়াও, শিশুদের কোনো ধর্মের অনুসারী বলে চিহ্নিত করাটা কি এক ধরনের শিশু নির্যাতন নয়? এই বিষয়ে আদৌ চিন্তাক্ষম হবার মত বয়স যখন তাদের হয় না ? তারপরও শিশুদের প্রতি এই আচরণ আজো অব্যাহত আছে, প্রায় পুরোটাই কোনো প্রশ্নর মুখোমুখি না হওয়া ছাড়াই। আর এই আচরণটিকে প্রশ্ন করাই হচ্ছে এই অধ্যায়ে আমার মূল উদ্দেশ্য।

শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন

শিশুদের উপর যাজকদের নির্যাতন বলতে এখন যৌন নির্যাতনকে বোঝায়, এবং আমি অনুভব করতে বাধ্য হচ্ছি যে শুরুতেই, এই পুরো যৌন নির্যাতনের বিষয়টি এর সঠিক মাত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। অনেকে নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন ‘পিডোফিলিয়া’ বা শিশুকাম নিয়ে একধরনের হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত সময়ে আমরা বসবাস করছি, এই গণ মনোস্তত্ব ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে সালেমের কুখ্যাত উইচ হান্ট (৭) বা ডাইনি শিকারের কথা মনে করিয়ে দেয়। ২০০০ সালে জুলাই মাসে ‘নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড’, যে পত্রিকাটিকে এই ধরনের বেশ কিছু প্রকাশনার মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে অনেকেই ব্রিটেনের সবচেয়ে জঘন্যতম পত্রিকা বলে মনে করেন, তথাকথিত একটি ‘নামকরণ এবং লজ্জা’

দেবার কর্মসূচী সূচনা করেছিল, যেখানে অভিযুক্ত পেডোফিলদের (শিশুকামী) প্রতি সরাসরি উৎসাহী জনতার আক্রমণ করা শুধু বাকি ছিল। সেখানে উৎসাহী নির্বোধরা এমনকি হাসপাতালের একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের বাড়িও আক্রমণ করেছিল, কারণ তাদের বিদ্যায় বোঝার ক্ষমতা ছিল না যে 'পেডিট্রিশিয়ান' আর পেডোফিল একই জিনিস না (৮)। এই গণ-উন্মত্ততা এমন একটি পর্যায়ে অবধি পৌঁছেছিল যে, বহু বাবা-মা তাদের শিশুদের নিয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। বর্তমান যুগের জাস্ট উইলিয়াম (৯), হাক ফিনস (১০), সোয়ালো আর আমাজনরা (১১) অতীতের মত সেই শৈশবের চিন্তামুক্ত স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা তাদের জীবনের সবচেয়ে মধুরতম অভিজ্ঞতা হতে পারতো (যখন নির্যাতিত হবার প্রকৃত ঝুঁকি, অনুমিত ঝুঁকির চেয়ে কোনো অংশে সম্ভবত কম ছিল না)।

'নিউজ অব দ্য ওয়ার্ল্ড' পত্রিকাটির প্রতি পক্ষপাতমুক্ত হয়ে একটি মন্তব্য করা যেতে পারে। তাদর এই প্রচারণার সময় মানুষের আবেগ আসলে উসকে দিয়েছিল একটি ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড । সাসেক্সে অপহরণ ও ধর্ষণের পর হত্যা আট বছরের একটি শিশুকে হত্যা করা হয়েছিল। যা-ই হোক, স্পষ্টতই সব পেডোফিলদের প্রতি একই ধরনের হিংস্র মনোভাব পোষণ খুব সঠিক নয় যখন পেডোফিলদের ছোটো একটি অংশ একই সাথে খুনী, যারা এই আচরণের সত্যিকার নিশানা হতে পারে। তিনটি বোর্ডিং স্কুলে পড়ার সময়ই আমি সেখানে কমর্রত শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসেছি, যাদের অনেকেরই ছোটো ছেলেদের প্রতি স্নেহ কারো কারো কাছে বাড়াবাড়ি মাত্রায় দৃষ্টিকটু অনুভূত হতে পারে, আসলেই যা নিন্দাযোগ্য।

তাসত্ত্বেও যদি, পঞ্চাশ বছর পরে, তারা শিশু হত্যাকারীদের চেয়ে কোনো অংশে ভালো কিছু নয় এমন দাবী আওড়ানো উকিল আর প্রতিহিংসাপরায়ন ব্যক্তিদের হাতে হয়রানির শিকার হন। আমি তাদের সমর্থনে দাড়াতে বাধ্য হবো, এমনকি তাদের একজনের শিকার হিসাবেও (যদিও বিব্রতকর তবে কোনো ক্ষতিকর অভিজ্ঞতা না)। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এই অতীত অপমানের সিংহভাগ বহন করে। অনেক কারণে আমি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে অপছন্দ করি, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব আমি আরো অপছন্দ করি। এবং আমি মনে করি সম্ভবত এই একটি প্রতিষ্ঠান আমেরিকা ও আয়ারল্যান্ডকে কুৎসিৎভাবে চিহ্নিত করেছে এই বিশেষ প্রসঙ্গে। আমি বিশ্বাস করি যে, তাদের প্রতি বাড়তি জনরোষের কারণ সব যাজকদের ভণ্ডামী, যাদের পেশাগত জীবন মূলত পাপের প্রতি অপরাধবোধ জাগানোর প্রচেষ্টায় নিবেদিত। এছাড়া ক্ষমতায় বা কর্তৃত্বে থাকা কোনো মানুষের বিশ্বাস ভঙ্গ করার বিষয়টি তো আছেই, যাদের কোনো প্রশ্ন ছাড়া সম্মান করার জন্য প্রায় দোলনা থেকে শিশুকে শেখানো হয়েছে। এই বাড়তি জনরোষ দেখেই আমাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত, যেন দ্রুত কোনো বিচার বা সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে মিথ্যা স্মৃতি তৈরি করার জন্য মনের অসাধারণ

ক্ষমতার কথা, বিশেষ করে যখন সেটি অসাবধানী মনোবিশ্লেষক এবং ভাড়ায় যুদ্ধ করতে আসা অতি উৎসাহী আইনজীবিদের উস্কানীতে বাড়তি সহায়তা পায়। মনোবিজ্ঞানী এলিজাবেথ লফটাস এই ক্ষেত্রে বিরল সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, বিশেষ করে তীব্র বৈরী স্বার্থ হাসিলের এই সংস্কৃতিকে চ্যালেঞ্জ করে তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, কত সহজেই কেউ মিথ্যা স্মৃতি তৈরি করতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু যা কোনো ভিক্টিম বা নির্যাতনের শিকারের কাছে মনে হতে পারে সত্যিকারের স্মৃতির মতোই বাস্তব (১২)। ব্যপারটা এতই প্রভাবশালী যে, কোনো বিচারের জুরিরা তাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিপরীতে গিয়ে এই ধরনের আন্তরিক মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

আয়ারল্যান্ডের বিশেষ উদাহরণে, কোনো যৌন নির্যাতন না থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় ব্রাদার যাজকদের নৃশংসতা, যারা কিনা সেই দেশের সিংহভাগ পুরুষদের শিক্ষার জন্য দায়ী, আসলেই কিংবদন্তীতুল্য (১৩)। এবং একই কথা বলা যেতে পারে ধর্ষকামী নিষ্ঠুর নানদেরও কথা, যারা আয়ারল্যান্ডের মেয়েদের স্কুলগুলো পরিচালনা করেন। কুখ্যাত ম্যাগডালেন অ্যাসাইলামস, পিটার মুলানের 'দ্য ম্যাগডালেন সিস্টারস' চলচ্চিত্রটির যা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল, টিকে ছিল ১৯৯৬ সাল অবধি (১৪)। এর ৪০ বছর পার হয়ে গেছে, বেত্রাঘাতের অপমানের যন্ত্রণার বিষয়টি নিষ্পত্তি করার চেয়ে বরং যৌন আগ্রাসনের বিষয়টি নিষ্পত্তি বেশ সহজ মনে হতে পারে, এবং নির্যাতনের শিকারদের কাছ থেকে এসব তথ্য খুঁজে বের করে বিষয়কে পয়সা বানানোর চতুর একটি উপায় হিসাবে রূপান্তর করতে আইনজীবিদেরও কোনো ঘাটতি নেই। অধিকাংশ নির্যাতনের শিকার হয়তো সেই অতীতে বিস্মৃত হয়েছেন। অনেক অভিযুক্ত হয়তো বহু আগেই মৃত, সুতরাং তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলার সুযোগ নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে ক্যাথলিক চার্চ এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে এই ধরনের মামলাগুলোয় (১৫)। আপনি হয়তো তাদের সাথে খানিকটা সমবেদনা অনুভব করতে পারেন, তবে যখন জানবেন তাদের এই বিপুল অর্থটির উৎস কোথায়, আমার মনে হয় সেই অনুভূতিটির স্থায়ী হবার সম্ভাবনা খুব কম।

ডাবলিনে একটি লেকচারের শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আয়ারল্যান্ডে বহুল প্রচারিত ক্যাথলিক যাজকদের যৌন নিপীড়নের কিছুর ঘটনার ব্যপারে আমার মতামত কি। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, যৌন নিপীড়নের মত জঘন্য কাজটি ক্ষতি করছে কোনো সন্দেহ নেই, সেটা স্বীকার করেই আমি মনে করি, তবে সেখানে ক্যাথলিক ধর্মমতে শিশুদের প্রতিপালন করার মাধ্যমে আরো বেশি পরিমানে মানসিক ক্ষতি করা হয়েছে। এটি, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মাথায় আসা, দ্রুত খুব বেশি চিন্তা না করে করা একটি মন্তব্য ছিল, এবং আমি অবাক হয়েছিলাম, আইরিশ দর্শকরা হাততালি দিয়ে সেটি সমর্থন করেছিল (যদিও স্বীকার করতে হবে, দর্শকরা মূলত

ডাবলিনের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সমাজকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং তারা তাদের পুরো দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে সেটি কোনোভাবেই বলা সম্ভব নয়)। কিন্ত এই ঘটনাটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল, যখন যুক্তরাষ্ট্র-নিবাসী চল্লিশের মাঝামাঝি বয়সের এক মহিলার পাঠানো একটি চিঠি আমি পেয়েছিলাম।পত্রলেখিকা রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তিনি চিঠিতে আমাকে জানান, তার সাত বছর বয়সে, দুইটি অপ্রীতিকর ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল। একজন যাজক তার গাড়ীতে তাকে যৌন নির্যাতন করেছিল, এবং প্রায় একই সময় তার স্কুলের একজন বন্ধুও দুর্ভাগ্যজনকভাবেই মারা গিয়েছিল, এবং তিনি মনে করতেন যে, মৃত্যুর সময় প্রোটেস্টান্ট থাকার কারণে সে বন্ধুটি নরকবাসী হয়েছিল, বা সেই রকম কিছু সেই সময় তার বাবা মায়ের ধর্মবিশ্বাস ও চার্চের আনুষ্ঠানিক অবস্থান ছিল বলে তিনি আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে রোমান ক্যাথলিকদের শিশু নির্যাতনের দুটি ঘটনার মধ্যে, একটি শারীরিক আর আরেকটি মানসিক, তার মতে দ্বিতীয়টি বা মানসিক নির্যাতনই সবচেয়ে ক্ষতিকর মনে হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন,

> ‘আমার গায়ে যাজকের হাত রাখার ব্যপারটি আমার মনে যে ছাপ ফেলেছিল (একজন সাত বছরের বালিকা হিসাবে), তা হলো বিবমীষার, অপরদিকে আমার বন্ধুটির স্মৃতি, যে কিনা শুধু প্রোটেস্টান্ট হবার কারণে নাকি অনন্তকাল নরকের আগুনের পুড়বে, সেই ভাবনাটি ছিল অত্যন্ত কষ্টকর, অকল্পনীয় ভয়ের, আমার বহু দুঃস্বপ্নের কারণ’।

যাজকের কারণে তার কখনোই ঘুম নষ্ট হয়নি, কিন্তু বহু রাত সে ভয়ের সাথে জেগে কাটিয়েছে ভেবে যে, তার ভালোবাসার অনেক মানুষই একসময় নরকে যাবে, যা তার বহু বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্নের কারণ। স্বীকার করতে হবে, তার শরীরের সংবেদনশীল অংশগুলোয় তিনি যাজকের হাতের যে আগ্রাসনের শিকার হয়েছিলেন, সেটি অপেক্ষাকৃত মৃদু, যখন এই অভিজ্ঞতাটিকে যাজকদের পায়ুকামের শিকার পুরুষ শিশুদের সেই কষ্টকর অভিজ্ঞতা আর ঘৃণার সাথে তুলনা করা হয়। ইদানিং অবশ্য ক্যাথলিক চার্চ আগের মত নির্যাতন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত । কিন্তু এই উদাহরণটি বলছে অন্ততপক্ষে সম্ভব যে শিশুদের মানসিক নির্যাতন শারীরিক নির্যাতন থেকেও ভয়াবহ হতে পারে। প্রচলিত একটি গল্প আছে, আলফ্রেড হিচকক, সেই বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, যিনি মানুষকে ভয় দেখানোর দক্ষ একজন শিল্পী ছিলেন, একবার সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চালানোর সময়, তিনি হঠাৎ করে জানালা দিয়ে আঙ্গুল উঁচিয়ে একটি দৃশ্য দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘আমার দেখা সবচেয়ে ভয়ের দৃশ্য হচ্ছে ওটা’। সেই দৃশ্যটি হচ্ছে একজন যাজক একটি বালকের কথা বলছেন, বালকের কাধে ওপর রাখা তার হাত। হিচকক গাড়ীর জানালা দিয়ে মাথা বের করে চিৎকার করে বলেছিলেন, ‘পালাও, ছোটো বাচ্চা, তোমার প্রাণ নিয়ে যত দূরে পারো পালাও’।

‘লাঠি আর পাথর আমার হাড় ভাঙতে পারে, কিন্তু কথা কোনোদিনও আমাকে কষ্ট দিতে পারবে না’। এই প্রবাদ সত্যি, যতক্ষণ আপনি আসলে কারো কথা বিশ্বাস করছেন না। কিন্তু যদি আপনার সম্পূর্ণভাবে বেড়ে ওঠা এবং আপনার বাবা মা, যাজক, শিক্ষকরা যখন যা বলেছেন, সেই সব কিছু যদি আপনি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন, সত্যিকারের বিশ্বাস, যা পুরোপুরি, শর্তহীন বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যেতে পারে, যেমন ধরুন আপনি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপীরা নরকের আগুনে পুড়বে (বা অন্য কোনো জঘন্য বর্বর মতবাদ, যেমন, একজন নারী তার স্বামীর সম্পত্তি), তাহলে পুরোপুরিভাবে সম্ভাবনা আছে এই সব কথা বা উচ্চারিত শব্দ কোনো কাজের চেয়ে আপনার মনে দীর্ঘস্থায়ী আর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। আমি অন্তত মেনে নিয়েছি যে ‘শিশু নির্যাতন’ শব্দটি কোনো বাড়াবাড়ি নয়, শিক্ষক আর যাজকদের শিশুদের সাথে করা কিছু আচরণের বর্ণনা আমি যখন দিচ্ছি। যেমন, তারা শিশুদের কোনো প্রশ্ন ছাড়াই বিশ্বাস করতে উৎসাহ দেন, যাজকের কাছে স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত না পাওয়া কোনো পাপের শাস্তি হচ্ছে অনন্তকালের জন্য নরকবাস।

‘রুট অব অল ইভিল’ (১৬) শিরোনামে একটি টেলিভিশন প্রামান্যচিত্রে, যার কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছিলাম, আমি বেশ কয়েকজন ধর্মীয় নেতার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, এবং আমাকে এর জন্য সমালোচনা করা হয়েছিল, আমি নাকি সাক্ষাৎকারের জন্য শুধু ধর্মীয় চরমপন্থীদেরকে বেছে নিয়েছি, এবং মূলধারার, যেমন কোনো সম্মানিত কোনো আর্চবিশপের সাথে কথা বলিনি (১৭)। শুনলে মনে হতে পারে সমালোচনাটি যুক্তিযুক্ত, শুধুমাত্র, একবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যা মনে করা হয় চরমপন্থী, যুক্তরাষ্ট্রে সেটি আসলে এখন মূলধারারই অংশ। আমি যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে যাকে দেখে ব্রিটিশ টিভি দর্শকরা সবচেয়ে বেশি হতবাক ও বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন কলোরাডো স্পিংসের একজন যাজক টেড হ্যাগার্ড, কিন্তু জর্জ বুশের যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু চরমপন্থী হবার বদলে এই যাজক টেড ত্রিশ মিলিয়ন সদস্যপুষ্ট ‘ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন হব ইভানজেলিকালস’ সংগঠনটির সভাপতি, এবং তার দাবীর সপক্ষে প্রতি সোমবার প্রেসিডেন্ট বুশের সাথে টেলিফোন পরামর্শ করার বিষয়টি তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন। আধুনিক এই যুক্তরাষ্ট্রের মানদণ্ডে যদি আসলেই আমি সত্যিকারের চরমপন্থীদের সাক্ষাৎকার নিতে চাইতাম তাহলে আমাকে ‘রিকনস্ট্রাকশনিষ্টদের’ কাছে যেতে হতো, যাদের ‘ডমিনিয়ন থিওলজি’ প্রকাশ্যভাবে যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টীয় ধর্মীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে উৎসুক। যুক্তরাষ্ট্রের আমার এক উৎকণ্ঠিত সহকর্মী যেমন লিখেছিলেন আমাকে:

> ‘ইউরোপবাসীদের জানা প্রয়োজন, ভ্রাম্যমান একটি ধর্মীয় উন্মত্ত আজব গোষ্ঠী আছে, যারা ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত আইনগুলো যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা

> করতে চায়, যেমন, সমকামিদের হত্যা করা ইত্যাদি। এছাড়া জনপ্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব নেবার বা ভোটের অধিকার শুধু খ্রিস্টানদের মধ্য সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এমন মতবাদের পক্ষে যারা কাজ করে যাচ্ছেন। মধ্যবিত্ত বিশাল একটি জনসংখ্যা তাদের এই বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে উল্লসিত হচ্ছে। যদি ধর্মনিরেপক্ষতাবাদীরা সতর্ক না হন, তাহলে ডমিনিয়নবাদী আর রিকনস্ট্রাকশনবাদীরা যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মতান্ত্রিকতায় একদিন মূলধারায় পরিণত হবে (১৮)।

আমার টেলিভিশন প্রামান্যচিত্রের জন্য আমি আরো একজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তিনি হচ্ছে যাজক কিনান রবার্টস, পাষ্টর টেডের মত তিনিও কলোরাডোর রাজ্যে বসবাস করেন। পাষ্টর রবার্টের বৈশিষ্ট্যসুচক পাগলামী হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান, যাকে তিনি বলেন ‘হেল হাউস’ বা নরক-বাড়ি। নরক-বাড়ি হচ্ছে এমনই একটি জায়গা যেখানে বাবা-মা বা খ্রিস্টান স্কুলগুলো মৃত্যুর পরে কি ঘটবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত ভয় দেখানোর লক্ষ্যে শিশুদের শিক্ষাভ্রমণের নিয়ে আসেন। অভিনেতারা বিশেষ কিছু পাপ কাজ, যেমন, গর্ভপাত এবং সমকামিতা সংক্রান্ত পাপ ও নরকে এই সব পাপের পাপীদের জন্যে কি ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে তা অভিনয় করে দেখান, সেখান লাল-কাপড় পড়া শয়তানকেও দেখা যায় তার অহংকারী রূপে। এগুলো হচ্ছে আসল নাটকের ভূমিকা মাত্র। আসল দৃশ্যপট হচ্ছে কৃত্রিমভাবে তৈরি করা নরক, সত্যিকারের ঝাঝালো সালফারের গন্ধ, ব্রিমস্টোন পুড়িয়ে সৃষ্টি করা হয় ধোয়া, এবং অভিশপ্তদের আর্তনাদ ইত্যাদি।

সেই নাটকের একটি মহড়া দেখার পর, যেখানে ভিক্টোরিয় যুগের কোনো মেলোড্রামার মত দৃষ্টিকটুভাবে শয়তান তার সুবিধাজনকভাবে শয়তানি করার সুযোগ পায়, আমি তার নাটকের দলের সামনে যাজক রবার্টসের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নরক-বাড়িতে বেড়াতে আসার জন্য আদর্শ বয়স হচ্ছে ১২। আমাকে খানিকটা হতবাক করেছিল তার উত্তর, আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম, একটি বারো বছরের শিশু এই ভয়ঙ্কর নাটক দেখে যদি দুঃস্বপ্নে তাড়িত হয়, সে বিষয়টি কি তাকে আদৌ বিচলিত করবে না? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আমার ধারণা বেশ সততার সাথেই:

> ’আমি বরং তাদের বোঝানোর চেষ্টা করবো যে নরক হচ্ছে এমন একটি জায়গা, সেখানে ঘুণাক্ষরেও তারা যাবার কথা ভাবা দূরের কথা, কোনোদিনও যেতে চাইবে না। আমি বারো বছর বয়সে তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে চাই, তারা যেন কোনো পাপের জীবন না কাটায়, যে জীবনে যীশু খ্রিস্টের উপস্থিতি থাকবে না, বা তাকে তারা কোনোদিনও খুঁজে পাবে না।

> এবং এর ফলাফল যদি রাতের দুঃস্বপ্ন হয়, আমি মনে করি এর ফলে আরো বড় একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল হবে, শুধুমাত্র রাতের দুঃস্বপ্ন দেখার বদলে অনেক কিছুই অর্জিত হবে'।

আমি মনে করি, পাষ্টর রবার্ট যা বিশ্বাস করেন বলে দাবী করছেন সেটি যদি আপনি আসলেই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে থাকেন, শিশুদের ভয় দেখিয়ে পোষ মানানোর এই প্রক্রিয়ায় আপনিও তাহলে সায় দেবেন।

আমরা কিছুতেই পাষ্টর রবার্টসকে ব্যতিক্রম চরমপন্থী উন্মত্ত হিসাবে চিহ্নিত করে তালিকা থেকে বাতিল করে দিতে পারি না, টেড হ্যাগার্ডের মত তিনিও বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার প্রতিনিধি। আমি অবাক হবো যদি তারা আদের সহধর্মবাদীদের কিছু কিছু আজগুবী বিশ্বাসে ভরসা করেন, যেমন, আপনি যদি আগ্নেয়গিরির ভিতরের আওয়াজ শুনতে পারেন, তাহলে অভিশপ্ত পাপীদের আর্তনাদ শুনতে পারবেন (১৯)। এবং গভীর সমুদ্রের ভেন্টে পাওয়া দানবাকৃতির টিউব ওয়ার্ম হচ্ছে বাইবেলের মার্ক ৯:৪৩-৪ এর সত্যতা প্রমাণ করে: 'আর যদি তোমার হাত তোমাকে অমান্য করে, কেটে ফেলে দাও: তোমার জন্য পঙ্গু জীবন বরণ করে নেয়াই উত্তম হবে, এই দুটি হাতকে নরকে নিয়ে যাওয়া চেয়ে, সেই আগুনে দগ্ধ হতে, যা কখনোই নেভে না: যেখানে তাদের কৃমিগুলো মরে না, আগুণের তৃষ্ণা কখনো মেটে না'। নরক আসলে কেমন তা নিয়ে তারা যা-ই ভাবুক না কেন, নরকের আগুন নিয়ে উৎসাহী এই মানুষগুলোর সবারই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অন্যদের দুর্দশা নিয়ে আত্মতৃপ্তি প্রকাশ করা, এবং সেই আত্মতুষ্টির মানসিকতায় তারা ভাবে যে, রক্ষা পেয়েছে এমন মানুষের দলে তারা আছেন। বিষয়টি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছিলেন ধর্মতাত্ত্বিকদের অগ্রদুত সেন্ট টমাস আকোয়াইনাস তার 'সুমা থিওলজিকায়': 'সাধু সন্তরাই সবচেয়ে আশীর্বাদপুষ্ট এবং ঈশ্বরের করুণা তারাই বেশি উপভোগ করেন, কারণ নরকে অভিশপ্তদের শাস্তি দেখার সুযোগ পান তারা'। বেশ দারুণ মানুষ বলতেই হবে (২০)।

নরকের আগুনের ভয় কিন্তু ভীষণ বাস্তব অনুভূত হতে পারে, এমনকি অন্যথায় যৌক্তিক সেই মানুষগুলোর মধ্যেও সেটি দেখা যায়। আমার ধর্ম বিষয়ক টেলিভিশন প্রামাণ্যচিত্রটি প্রচারিত হবার পর আমার পাওয়া অনেকগুলো চিঠির মধ্যে একটি ছিল, বুদ্ধিমান ও স্পষ্টতই একজন সৎ ভদ্রমহিলার:

> আমি পাঁচ বছর বয়স থেকেই ক্যাথলিক স্কুলে পড়েছি, এবং নানদের কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি যারা কথায় কথায় বেত, লাঠি কিংবা চাবুক ঘোরাতো আমাদের উপর। আমার কৈশোরে আমি ডারউইন পড়েছিলাম, তিনি বিবর্তন নিয়ে যা বলেছিলেন আমার মগজের যুক্তি প্রধান অংশে তা বেশি যৌক্তিক

আর বোধগম্য মনে হয়েছিল। তবে, সারাজীবন আমি দারুণ দ্বন্দ্বে কষ্ট পেয়েছি আমার মনে গভীরে গেঁথে থাকা নরকের আগুনের আতঙ্কে, যা খুব সহজেই মনের ভিতর নানা কারণেই জেগে ওঠে। আমি কিছু মানসিক চিকিৎসাও পেয়েছিলাম, যা আমার আগের সমস্যাগুলো খানিকটা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল, তবে কোনো কিছুই আমার নরকের আগুনের প্রতি সেই গভীর আতঙ্কটিকে কখনো প্রশমিত করতে পারেনি। সুতরাং আমি যে কারণে আপনাকে লিখছি সেটা হলো আপনি কি আমাকে কোনো মনোবিশ্লেষকের নাম বা ঠিকানা পাঠাতে পারবেন, যাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন আপনার এই সপ্তাহে প্রচারিত অনুষ্ঠানটিতে, যারা বিশেষ করে এই ধরনের ভয় নিয়ে কাজ করেন।

এই চিঠিটি আমাকে ভীষণ আন্দোলিত করেছিল এবং (সেই নানগুলোর শাস্তি হবার জন্যে যে আসলেই কোনো নরকের অস্তিত্ব নেই এই সাময়িক ও আমাহাত্মপূর্ণ অনুশোচনাটি চেপে রেখে) তাকে উত্তর দিয়েছিলাম, উচিত হবে তিনি যেন তার যৌক্তিক মনটাকে বিশ্বাস করেন, যা তার একটি বিশেষ সম্পদ, অনেক দুর্ভাগা মানুষই তা থেকে বঞ্চিত। আমার প্রস্তাব ছিল, নরকের সেই অতিমাত্রায় বীভৎস আর বিভীষিকাময় বর্ণনা, যা নান এবং ধর্মযাজকরা প্রচার করেন, তা আসলে এর অসারতা আর অবাস্তবতাকে ঢাকতেই একে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। যদি নরকের অস্তিত্ব আসলেই থাকতো, মানুষকে নরকে যাওয়ার মত কোনো কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য সামান্য বা মাঝারী ধরনের একটু অপ্রীতিকর হওয়াই যথেষ্ট ছিল। যেহেতু এটির সত্য হবার কোনো সম্ভাবনা নেই, এটিকে বিজ্ঞাপনের মতো ফুলিয়ে ফাপিয়ে খুবই ভয়ের একটি দৃশ্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে শুধু এর অসারতাকে ঢাকতে, এবং নিষেধাজ্ঞামূলক কর্মকাণ্ডে সফল হবার জন্য সেই ভারসাম্যটি রক্ষা করতে তারা বাধ্য হয়। আমি তাকে সেই থেরাপিষ্ট, জিল মিটনের সাথেও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলাম, চমৎকার ও আন্তরিক একজন মহিলা, যার সাক্ষাৎকারও আমি নিয়েছিলাম ক্যামেরার সামনে। জিল নিজেও একটি ধর্মগোষ্ঠীতে প্রতিপালিত হয়েছিলেন সমতূল্য অপ্রীতিকর একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এই ধর্মগোষ্ঠীটি তাদের 'এক্সক্লুসিভ ব্রেদরেন' হিসাবে পরিচয় দিয়ে থাকেন: এতই অপ্রীতিকর সেই গোষ্ঠী যে একটি পৃথক ওয়েবসাইটই আছে, যারা এই গ্রুপ থেকে পালিয়ে আসা সদস্যদের সহায়তা দেয়।

নারকীয় বিভীষিকার একটি গল্পের মধ্য দিয়ে জিল মিটন নিজেই প্রতিপালিত হয়েছিল, এরপর প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর তিনি সেই খ্রিস্টীয় গোঁড়া গোষ্ঠী থেকে পালিয়ে আসেন। শৈশবে যারা নির্যাতিত হয়েছিলেন নানাভাবে এখন তিনি মূলত তাদের পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা করেন: 'যদি আমার শৈশবের কথা চিন্তা করি, সেটি পুরোপুরি দখল করে ছিল ভয়, চোখ রাঙানী, ধমক, বর্তমান সেই সময়ে এবং অনন্তকালের

ভবিষ্যতেও। আর কোনো শিশুর জন্যে, নরকের আগুন এবং দাঁতে দাঁত পিষ্ট করার শব্দ আসলেই খুব বাস্তব সম্মত। সেখানে রূপকের কোনো বিষয় ছিল না'। এর পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কি একটু বিস্তারিতভাবে আমাদের বলবেন, শৈশবে কি ধরনের নরকের কাহিনী তিনি শুনেছিলেন, এবং অবশেষে তার মূল উত্তরটি ছিল তার বাঙময় মুখচ্ছবির মতোই হৃদয়স্পর্শী, বেশ ইতস্তত করার পর তিনি বলেন, 'খুব অদ্ভুত তাই না? এতদিন পরও, এখনো আমার উপর সেই কাহিনীগুলো প্রভাব ফেলতে সক্ষম, যখন আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেই প্রশ্নটি। 'নরক হচ্ছে ভয়ানক সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বঞ্চিত একটি জায়গা, সেখানে সব বিচার সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে, আসল আগুনের লেলিহান শিখা, সত্যিকারের নিপীড়ন আর যন্ত্রণা এবং যা চলবে অনন্তকালব্যাপী, কোনোদিনও যেখান থেকে মুক্তি মিলবে না'।

এরপর তিনি তার পরিচালিত সাপোর্ট গ্রুপটির কথা বলেন, যেখানে তার মত শৈশবের অভিজ্ঞতাসহ পালিয়ে আসা মানুষদের তিনি সহায়তা দেন। এবং তিনি ব্যাখ্যা করেন এই ধরনের শৈশবের নির্যাতন থেকে পালিয়ে আসা অনেকের জন্য কত কঠিন একটি কাজ: 'পরিত্যাগ করে আসার ব্যপারটি অস্বাভাবিকভাবেই কষ্টসাধ্য একটি কাজ, আপনি পুরো একটি সামাজিক বন্ধনের জালিকাটিকে পেছনে ফেলে আসছেন, সেই পুরো কাঠামোটি, সারা জীবন যেখানে আপনি প্রতিপালিত হয়েছেন, যে বিশ্বাসের ঘরানায় আপনি বড় হয়েছেন, নিজের বিশ্বাস বলে যা আপনি বহু বছর আগলে রেখেছেন, সেটি আপনি ছেড়ে আসছেন, প্রায়শই আপনি পরিবার আর বন্ধুদের ছেড়ে আসছেন, আপনার আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না আর তাদের কাছে'। আমাকে লেখা বিভিন্ন চিঠির আবেগের কথা যুক্ত করেছিলাম, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা সেই সব চিঠিগুলোর রচয়িতা আমার পাঠকরা, যারা বলেছেন আমার বই তারা পড়েছেন, এবং এর ফলশ্রুতিতে তারা তাদের ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পেরেছেন। খানিকটা অস্বস্তিকর অনুভূতিও জাগায় যখন তারা জানায় তাদের পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানোর সাহস পাচ্ছেন না বা পরিবারকে জানানোর ফলাফলটি সুখকর কিছু হয়নি। এই অভিজ্ঞতার একটি উদাহরণ দিতে পারি, যা বৈশিষ্ট্যসূচক হতে পারে। এই চিঠিটির তরুণ লেখক যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন ছাত্র।

> এই ইমেইলটা আপনাকে পাঠানোর তাগিদ অনুভব করছি, কারণ ধর্ম সম্বন্ধে আপনার সাথে আমি সহমত পোষণ করি। আমি নিশ্চিৎ আপনি জানেন যে দৃষ্টিভঙ্গিটি যুক্তরাষ্ট্রে যে কাউকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আমি একটি খ্রিস্টীয় পরিবারে বড় হয়েছি এবং যদিও সেই ধর্মের ধারণা কখনোই আমার মনের গভীরে রেখাপাত করেনি, তাসত্ত্বেও খুব সম্প্রতি সাহস অর্জন করে বিষয়টি আমি একজনকে জানিয়েছিলাম। সেই মানুষটি ছিল আমারই প্রেমিকা আর সে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে। আমি বুঝতে পারি, নাস্তিকতার

> কোনো ঘোষণা কি ধরনের বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এখন পরিস্থিতি এমন যে, আমি তার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মানুষ, আমাকে সে আর বিশ্বাস করে না, কারণ তার মতে আমার নীতিবোধ ঈশ্বর থেকে আসেনি। আমি জানি না এই অবস্থা থেকে কোনো মুক্তি আছে কিনা আমাদের। এই ধরনের খারাপ কোনো প্রতিক্রিয়ারই ভয়েই বিশেষ করে অবিশ্বাসের কথা কাছের মানুষদের জানানোর ব্যপারে আমি আগ্রহী ছিলাম না । এই ইমেইলের কোনো উত্তর আমি আশা করছিনা, শুধু আপনাকে লিখলাম কারণ আমার পরিস্থিতি এবং হতাশায় আপনি সহমর্মিতা অনুভব করবেন। কল্পনা করুন আপনার ভালোবাসার সেই মানুষটিকে হারানো, যে শুধুমাত্র ধর্মের উপর ভিত্তি করে আপনাকে ভালোবাসতো। তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি এখন ঈশ্বরহীন বর্বর একটি মানুষ, সেটি ছাড়া আমরা পরস্পরের জন্যে অন্য সব দিক থেকেই সঠিক ছিলাম। এটি আমাকে আপনার একটি পর্যবেক্ষণের কথা মনে করিয়ে দেয়, বিশ্বাসের নামে মানুষ উন্মত্ত আর অস্বাভাবিক সব কাজ করে। আমার কথা শোনার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এই দুর্ভাগা তরুণকে আমি উত্তর দিয়েছিলাম, তাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম , তার প্রেমিকা যেমন তার সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছেন, তেমনি তিনিও তার প্রেমিকা সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছেন: সে কি আসলেই তার উপযুক্ত? আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম।

আমি এর আগেই যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় কমেডিয়ান জুলিয়া সুইনি ও তার ধর্মের কিছু উপকারি দিক খোঁজার একান্ত প্রচেষ্টা ও বয়সকালে ক্রমবর্ধমান সন্দেহবাদীতার মধ্যে শৈশবের ঈশ্বরকে কিছুটা উদ্ধার করতে তার হৃদয়গ্রাহী কৌতুকময় আর একগুঁয়ে সংগ্রামের কথা বলেছিলাম। সেই সংগ্রামের পরিণতি তার জন্য সুখকর ছিল। আনন্দের সাথে, তিনি এখন সর্বত্র তরুণ অবিশ্বাসীদের জন্য একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । তার শেষ উপসংহারে পৌঁছানোর অংশটি মনে হয় সবচেয়ে বেশি হৃদয়স্পর্শী, তার ‘লেটিং গো অব গড’ অনুষ্ঠানটির মূল বিষয় সেটি (২১)। তিনি সবকিছুই চেষ্টা করেছেন, এবং তারপর ..

> একদিন কাজ শেষে যখন আমি বাসার পেছনের বাগানের মধ্য দিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম, আমি টের পেলাম আমার মাথার মধ্যে খুব ক্ষীণস্বরে কে যেন কিছু বলছে। আমি নিশ্চিৎ না কতক্ষণ ধরে সেই কণ্ঠস্বরটি সেখানে ছিল কিন্তু হঠাৎ করে সেটির তীক্ষ্মতার মাত্রা খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল, অস্ফুষ্ট স্বরে সেটি বলছিল, কোনো ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব নেই।

বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু এটি আরো খানিকটা তীব্র হয়ে ওঠে, 'কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কোনো ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই.. হায় ঈশ্বর.. কোনো ঈশ্বর নেই....।

এবং আমি যেন বড় একটি ধাক্কা খেলাম, কেঁপে উঠলাম, মনে হলো আমি কোনো নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে গেলাম এবং তারপর ভাবলাম, না আমি পারবো না, আমি জানি না, আমি আদৌ চাইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অবিশ্বাস করতে পারবো কিনা। আমার ঈশ্বরের প্রয়োজন আছে, মানে বলতে চাচ্ছি ..আমাদের মধ্যে তো দীর্ঘদিনের একটা সম্পর্ক আছে, তাই না?

কিন্তু আমার জানা নেই কেমন করে ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করতে হয়; আমি জানি না, আপনি কেমন করে তা করতে পেরেছেন, কেমন করে আপনার দিন শুরু হয়, কিভাবে অবিশ্বাস নিয়ে দিনটা পার করেন আপনি। নিজেকে কেমন যেন ভারসাম্যহীন মনে হলো।

আমি ভাবলাম, 'ঠিক আছে, শান্ত হও কিছুক্ষণ, চেষ্টা করে দেখা যাক ঈশ্বর-বিশ্বাস-না-করা বিষয়টি কেমন, কিছুক্ষণের জন্য। একবার ঈশ্বর নেই এমন চশমা পরে চারপাশে একটু দেখুন, তারপর চশমাটি না হয় তাৎক্ষণিকভাবে ছুড়ে ফেলে দিলে হবে', আমি সেই 'চশমা' পরে, চারিদিকে তাকালাম। খানিকটা বিব্রত লাগছে বলতে যে প্রথমে মাথা খানিকটা ঘুরে উঠেছিল, কিন্তু আসলেই যা অনুভব করেছিলাম, সেটি ছিল একটি চিন্তা, 'বেশ, আকাশের মধ্যে পৃথিবীটা আসলে ভেসে আছে কিভাবে? আপনি বলতে চাইছেন, মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে শুধু ছুটে চলছি। কিন্তু ব্যপারটা যে-কোনো সময় তো সমস্যা তৈরি করতে পারে! আমি দৌড়ে গিয়ে মহাশূন্য থেকে ছিটকে পড়া পৃথিবীটাকে দুই হাতে ধরতে চাইলাম, এবং তারপর আমার মনে পড়লো, ওহহ হ্যাঁ, মাধ্যাকর্ষণ আর কৌণিক বেগ সূর্যের চারপাশে আমাদের ঘোরাটাকে টিকিয়ে রাখবে সম্ভবত অনেক অনেক দীর্ঘ একটা সময়।'

যখন আমি লস এঞ্জেলেস থিয়েটারে প্রথমবারের মত তার 'লেটিং গো অব গড' অনুষ্ঠানটি দেখেছিলাম। এই দৃশ্যটি আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল, বিশেষ করে জুলিয়ার বর্ণনায় তার মা বাবার প্রতিক্রিয়াগুলো, যখন তারা প্রেস রিপোর্টে জুলিয়ার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন:

আমার মা ফোন করেই প্রথমে চিৎকার করেই বললেন, 'নাস্তিক? নাস্তিক???' এরপর আমার বাবা ফোন করে জানান, 'তুমি তোমার পরিবার, স্কুল এবং

শহরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো'। মনে হচ্ছিল আমি যেন রাশিয়ার কাছে কোনো গুপ্ত খবর পাচার করেছি। দুজনেই জানালেন, আমার সাথে আর কোনোদিন কথা বলবেন না, বাবা বললেন, মরার পর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানেও যেন আমি না যাই। ফোন রাখার পর, ভেবেছিলাম, দেখি তোমরা থামাতে পারো কিনা।

জুলিয়া সুইনির অসাধারণ গুণের একটি অংশ হলো একই সাথে তিনি আপনাকে কাঁদাতে আর হাসাতে পারেন:

আমি মনে করি আমার বাবা-মা খানিকটা হতাশ হয়েছিলেন, যখন বলেছিলাম আমি আর ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্তু 'নাস্তিক' হওয়ার ব্যাপারটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অন্যরকম একটি বিষয় ছিল।

ড্যান বার্কারের 'লুসিং ফেইথ ইন ফেইথ: ফ্রম প্রিচার টু অ্যাথিস্ট' (২২) বইটি একজন নিবেদিত প্রাণ মৌলবাদী এবং উৎসাহী ধর্মযাজকের ক্রমান্বয়ে বর্তমানে দৃঢ়চিত্তের একজন অবিশ্বাসী হয়ে ওঠার গল্প। গুরুত্বপূর্ণভাবে বার্কার কিন্তু অবিশ্বাসী হবার পরও অভ্যাসবশত কিছু দিন ধর্ম প্রচার করা অব্যাহত রেখেছিলেন। কারণ এটি ছাড়া আর কোনো পেশাগত দক্ষতা তার ছিল না, আর সামাজিক সেই দ্বায়িত্বের জালটা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি এখন জানেন যুক্তরাষ্ট্রের বহু যাজক ঠিক সেই পরিস্থিতির মধ্যেই আটকে আছেন, তাদের নিজেদের জগতে, শুধু হয়তো তার কাছে নিজেদের অবিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন বইটা পড়ার পর। ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হতে পারে এমন কিছু অনুমান করে নিজেদের পরিবারের কাছে অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করতে তারা সাহস পাননি। বার্কারের নিজের কাহিনীর উপসংহার সুখকর ছিল। শুরুতে, তার বাবা-মাও অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তারা তার যুক্তিগুলো মন দিয়ে শুনেছিলেন, এবং একসময় অবিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে মেনে নিয়েছিলেন তার পথ অনুসরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন অধ্যাপক তাদের বাবা-মাকে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আমাকে দুটো চিঠি লিখেছিলেন। একজন লিখেছিলেন তার মা স্থায়ীভাবে বিষণ্নতায় ভুগছেন তার ঈশ্বর অবিশ্বাসী নীতিবর্জিত আত্মার পরিণতি কি হবে সেই ভয়ে। অন্যজন লিখেছিলেন, তার বাবা হতাশ হয়েই মন্তব্য করেছিলেন, তার জন্ম হওয়াই উচিত ছিল না, কারণ তিনি নিশ্চিত যে, তার ছেলে চিরকালের জন্য নরকের আগুনে পুড়বে। দুজনই উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, যারা তাদের চিন্তার পরিপূর্ণতা আর নিজেদের জ্ঞানের উপর ভরসা রাখেন, যারা স্পষ্টতই তাদের পিতামাতাকে ছাড়িয়ে গেছেন শুধু ধর্ম না, সাধারণ বুদ্ধিমত্তার সব বিষয়েও। এবার

কল্পনা করুন কি পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয় সেই মানুষগুলোর, যারা এদের মত বা জুলিয়া সুইনির মত বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে এতটা অগ্রসর নয়, সেই শিক্ষার ঘাটতি যাদের আছে, বা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা নেই, পরিবারের গোঁড়া সদস্যদের সাথে যখন তাদের আত্মপক্ষ সমর্থন করে যুক্তি দিতে হয়। হয়তো যেমন এর আগে উল্লেখ করা মনোবিশ্লেষক জিল মিটনের অনেক রোগীদের একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

টেলিভিশনে সম্প্রচারিত আমাদের এর আগের কথোপকথনে জিল ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই ধরনের ধর্মীয় আবহে প্রতিপালন হচ্ছে একধরনের মানসিক অত্যাচারের শিকার হওয়া, এবং আমি আমার সেই প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসি এভাবে : আপনি ধর্মীয় নির্যাতন শব্দটি ব্যবহার করেন। আপনি যদি সত্যি সত্যি নরকের ভয় দেখিয়ে কোনো শিশুকে প্রতিপালন করার সাথে তার তুলনা করে দেখেন, আর সেই অত্যাচারটি যৌন নির্যাতনের আঘাতের সাথে আপনি কিভাবে তুলনা করবেন? তার উত্তর ছিল, ‘অবশ্যই উত্তর দেবার জন্য এটি কঠিন একটি প্রশ্ন, কিন্তু আমি মনে করি এই দুটোর মধ্যেই অনেক মিল আছে, কারণ এটি হচ্ছে বিশ্বাসেরই অপব্যবহার, কোনো শিশুর নিজেকে স্বাধীন ও মুক্ত ভাবা এবং স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর আর সবকিছুর সাথে তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করে, এটি একধরনের অপমানজনক অবমূল্যায়ন, নিজের সত্যিকার সত্তাকে স্বীকার করা থেকে বঞ্চিত করা, যা দুই ক্ষেত্রেই একইভাবে ঘটে’।

শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থে ..

আমার সহকর্মী মনোবিজ্ঞানী নিকোলাস হামফ্রি ‘স্টিকস অ্যান্ড স্টোন’ প্রবাদটি (২৩) ব্যবহার করেছিলেন অক্সফোর্ডে ১৯৯৭ সালে তার অ্যামনেস্টি স্মারক বক্তৃতাটি শুরু করেছিলেন (২৪)। অবশ্য হাম্পফ্রে তার বক্তৃতা শুরু করেন প্রবাদটি যে সবসময় সত্যি নয় সেই যুক্তি দিয়ে, তিনি হাইতি ভুডু বিশ্বাসীদের উদাহরণ উল্লেখ করেছিলেন, যারা কোনো ক্ষতিকর ‘জাদুটোনা’ করার কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়, আপাতদৃষ্টিতে শুধু ভয়ের শরীরমনোবৃত্তীয় প্রভাবের কারণে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বক্তৃতা ধারাবাহিকের স্বত্বভোগী অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল, যেখানে তিনিও অবদান রাখছেন, তারা কি ক্ষতিকর আর বিদ্বেষমূলক বক্তব্য বা প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনো কর্মসূচী গ্রহন করবেন? এই ধরনের কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিরুদ্ধে তার উত্তর ছিল সুস্পষ্টভাবেই না: ‘মত প্রকাশের স্বাধীনতা অনেক মূল্যবান, এটি নিয়ে কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত না’। কিন্তু এরপর তিনি তার নিজের সেই উদারনীতিবাদ সত্তাকে চমকে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যতিক্রমের প্রতি তার সমর্থনের কথা উল্লেখ

করেছিলেন: শিশুদের বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপে পক্ষে তিনি কিছু যুক্তি উপস্থানপন করেছিলেন:

> ......নৈতিক এবং ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যে শিক্ষাটি শিশুরা পায় তাদের বাড়িতে, যেখানে বিশেষ করে পিতামাতাদের অনুমতি আছে....এমনকি সেটি প্রত্যাশাও করা হয়, তারা তাদের শিশুদের হয়ে নির্ধারণ করে দেবেন কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা, কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল; শিশুদের ব্যপারে আমি যুক্তি দেবো, তাদেরও মানবাধিকার আছে, অন্য মানুষের আজে বাজে আর মূর্খ ধারণার স্পর্শে এসে তাদের মন যেন পঙ্গু না হয়ে যায়, সেই মানুষগুলো যে-ই হোক না কেন। আর সেই সাথে কোনো বাবা-মায়েরই তাদের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দগুলো সন্তানদের মাথার মধ্যে গেঁথে দেবার কোনো ঈশ্বর প্রদত্ত ছাড়পত্র নেই: সন্তানদের কৌতূহল আর জিজ্ঞাসার সীমানাকে সীমাবদ্ধ, গোঁড়া কোনো মতবাদ আর কুসংস্কারের আবহাওয়ায় তাদের প্রতিপালন কিংবা নিজেদের অন্ধবিশ্বাসের সংকীর্ণ পথে তাদের চলতে বাধ্য করার কোনো অধিকার নেই।
>
> সংক্ষেপে উদ্ভট আজগুবী ধারণা থেকে নিজেদের মন অকলুষিত রাখার ক্ষেত্রে শিশুদেরও অধিকার আছে, এবং সমাজ হিসাবে আমাদের এই ধরনের কোনো পরিবেশ থেকে তাদের রক্ষা করারও দ্বায়িত্ব আছে। সুতরাং কোনো বাবা-মাকে সেই অনুমতি দেয়া আমাদের আর উচিত হবে না যে, তারা তাদের সন্তানদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করেন, যেমন, বাইবেলের আক্ষরিক সত্যতা বা গ্রহরা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে, ঠিক যেমন করে শিশুদের শারীরিক নির্যাতন করে দাঁত ভেঙ্গে দিতে, বা কোনো অন্ধকার ঘরে আটকে রাখতে আমরা তাদের আর অনুমতি দেই না।

অবশ্যই, এমন শক্তিশালী একটি মন্তব্যের যেমন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে এবং এটি বহু ব্যাখ্যাও দাবী করে। কোনো একটি বিষয় আজগুবি আর অবিশ্বাস্য কিনা, সেটি কি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মতামত নির্ভর নয়? মূলধারার বিজ্ঞান কি তার অগ্রগতিতে বহুবার আমাদের বিচলিত করেনি এই বিষয়ে সতর্ক হবার জন্য? বিজ্ঞানীরা হয়তো ভাবতে পারেন জ্যোতিষবিদ্যা শিক্ষা দেয়ার কিংবা আক্ষরিক অর্থে বাইবেল পড়ার কোনো অর্থই হয় না। কিন্তু বহু মানুষ আছেন তারা ঠিক এর বিপরীতটাই ভাবছেন, তাদের সন্তানদের সেই শিক্ষা দেবার জন্য তারা কি অধিকার রাখেন না? শিশুদের বিজ্ঞান পড়ানো উচিত বিজ্ঞানীদের এমন ধারণার কি ঠিক একই রকম গোঁয়ার্তুমি নয়?

তাদের সন্তান কি ভাববে, আর কিভাবে ভাববে না, সেটি জোর করে না শেখানো মত দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার জন্য আমার নিজের বাবা-মাকে আমি ধন্যবাদ দেই। যদি যথেষ্ট ও সঠিকভাবে সব বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মুখোমুখি হয়ে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, এবং তারপরও যদি যারা বাইবেলকে আক্ষরিকভাবে সত্য, বা গ্রহের গতি তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে এমন ধারণায় বিশ্বাস করতে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটা আসলেই তাদের মর্জি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে তারা কি চিন্তা করবে সেই সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার শুধু তাদের, তাদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত চাপিয়ে দেয়ার কোনো অধিকার বাবা-মায়ের নেই এবং এটি অবশ্যই বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যখন আমরা ভাবি এই শিশুরাই পরবর্তী প্রজন্মের বাবা-মা হবে, এবং তারা এমন একটি অবস্থানে থাকবে, তারা যেভাবে দীক্ষা পেয়েছে সেই দীক্ষাকে একই ভাবে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত করার সম্ভাবনা বহন করবে।

হাম্পফ্রি প্রস্তাব করেন, যতদিন পর্যন্ত শিশুরা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং সহজেই বিশ্বাসপ্রবণ, ততদিন তাদের সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। আর সত্যিকারের নৈতিক অভিভাবকত্বের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সৎ ভাবনায়, যা দ্বিতীয়বার ভেবে দেখে, তারা নিজেরাই সেটি বেছে নিতেন কিনা, যদি তাদের তা করার মত যথেষ্ট বয়স হতো। তিনি বেশ আবেগের সাথে পেরুর একটি ইনকা (২৫) শিশুর উদাহরণ উল্লেখ করেছিলেন, যার ৫০০ বছর পুরোনো শরীরের অবশিষ্টাংশ ১৯৯৫ সালে পেরুর পর্বতমালায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। যে নৃতাত্ত্বিক তাকে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি লিখেছিলেন, শিশু মেয়েটি একটি ধর্মীয় আচারের শিকার। হাম্পফ্রির দেয়া বর্ণনায় আমরা জানতে পারি, এই শিশু বরফ-কন্যাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছিলো এবং সেখানে দর্শকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল :

> ইনকা পুরোহিতদের আধ্যাত্মিক দায়বদ্ধতা নিয়ে ভাবতে, এই শিশু কন্যাটির শেষ যাত্রার সেই গর্ব আর উত্তেজনার অনুভূতি ভাগাভাগি করে নিতে, যখন ধর্মীয় আচারের ‘বলি’ হিসাবে বিসর্জিত হবার সেই দুর্লভ সন্মানের জন্য তাকে একক ও বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সেই টেলিভিশন অনুষ্ঠানটির বার্তা ছিল মানব বিসর্জনের আচারটি যেন নিজ গুণেই গৌরবময় সাংস্কৃতিক একটি আবিষ্কার। বহুসংস্কৃতিবাদের মুকুটে আরেকটি রত্ন, যদি আপনি বলতে চান।

হাম্পফ্রি সেটি দেখে রীতিমত হতবাক হয়েছিলেন, আর আমারও অনুভূতি একই রকম:

> তারপরও.. কোন সাহসে আর কিভাবে এই ধরনের প্রস্তাব কেউ দিতে পারে?, ধর্মীয় একটি আচারের মাধ্যমে সিদ্ধ বর্বর কোনো হত্যাকাণ্ড দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ হতে কোন সাহসে তারা...আমাদেরই ড্রইং রুমে

টেলিভিশনে দেখতে আমাদের নিমন্ত্রণ জানায়: যেখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নির্বোধ, অজ্ঞ, অহংকারী কিছু বৃদ্ধ মানুষ তাদের উপর নির্ভরশীল অসহায় শিশুকে যখন হত্যা করেছে? কোন সাহসে কারো বিরুদ্ধে ঘটানো অনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভালো কিছু খুঁজে বের করার জন্য তারা আমাদের নিমন্ত্রণ জানায় ?

আবারো, হয়তো ভদ্র কোনো উদারমনা পাঠক হয়তো খানিকটা অস্বস্তি অনুভব করবেন। অনৈতিক, সে তো আমাদের মানদণ্ডে, অবশ্যই নির্বোধের মত একটি কাজ, তবে ইনকাদের সামাজিক মানদণ্ডে? নিশ্চয়ই ইনকাদের কাছে এই মানব শিশু বিসর্জন কোনোভাবেই নির্বোধ কোনো কর্মকাণ্ড তো নয়ই, বরং নৈতিকভাবে সমর্থনীয় একটি কাজ, যার অনুমতি তারা পেয়েছে সমষ্টিগতভাবে, সবচেয়ে পবিত্র আর অবশ্য মান্য হিসাবে তারা যা ধারণ করে? সেই ছোটো মেয়েটি, কোনো সন্দেহ নেই যে ধর্মে সে প্রতিপালিত হয়েছে সেই ধর্মের একজন অনুগত সমর্থক, হত্যা শব্দটি এখানে ব্যবহার করার আমরা কে? ইনকা পুরোহিতদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কোনো মতামত দিতে গেলে আমরা কেন তাদের নৈতিক মানদণ্ডের বদলে আমাদের মানদণ্ড ব্যবহার করবো? হতে পারে এই মেয়েটি তার নিয়তি নিয়ে তীব্র আনন্দিত ছিল, হয়তো সে সত্যিই বিশ্বাস করেছিল, সে অনন্তকালের জন্য স্বর্গে যাচ্ছে, যেখানে সে তাদের পরম আরাধ্য সূর্যদেবের সান্নিধ্যের উষ্ণতা পাবে । কিংবা হতে পারে.. যত অবিশ্বাস্য হোক না কেন, মেয়েটি তীব্র আতঙ্কে চিৎকার করেছিল।

হাম্পফ্রির বক্তব্য এবং আমারও সেটি, তা হচ্ছে, শিশুটি স্বেচ্ছায় এই পরিণতি মেনে নিয়েছিল, বা নেয়নি, যা-ই হোক না কেন, খুব শক্ত কারণ আছে আমাদের মনে করার যে, যদি মেয়েটি সব সঠিক তথ্যগুলো পেত, সে হয়তো নিজেকে অকারণে অসময়ে এভাবে বিসর্জন দিতে রাজী হতো না। যেমন ধরুন, সূর্য আসলে হাইড্রোজেনের একটি গোলক ছাড়া আর কিছুই নয়, মিলিয়ন ডিগ্রি কেলভিনের চেয়েও যার তাপমাত্রা বেশি, যা নিরন্তরভাবে নিউক্লিয়ার ফিউসন বা সংযোজনের মাধ্যমে হিলিয়াম তৈরি করে যাচ্ছে। এবং এটি একটি গ্যাসের চাকতি থেকে অতীতের কোনো এক সময় সৃষ্টি হয়েছিল, যেখান থেকে পৃথিবী ছাড়াও সৌরজগতের বাকি অংশও ঘণীভূত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল দূর অতীতে। ধরে নেয়া যেতে পারে এসব তার জানা থাকলে সে নিশ্চয়ই একে দেবতা বলে পূজা করতো না। এই ধরনের কোনো কিছুর জন্য নিজেকে বিসর্জিত করার বিরুদ্ধে এটি নিশ্চয়ই তার বোধকে সতর্ক করতো।

ইনকা পুরোহিতদের তাদের অজ্ঞতার জন্য কোনো দোষ দেয়া যায় না। হয়তো তাদের নির্বোধ আর মহাপণ্ডিত ভাবা মনে হতে পারে বেশ কঠোর একটি অবস্থান। কিন্তু তাদের শুধু সেই অর্থেই দোষী করা যেতে পারে, সেটা হলো কোনো শিশুর উপর যখন তারা তাদের নিজেদের অন্ধবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেয়, যে শিশুর বয়স এতই কম যে, সূর্য

দেবতাকে পূজা করবে কিনা সে এখনো বুঝে উঠতে শেখেনি। হাম্পফ্রির অন্য বক্তব্যটি হলো, এই ছোটো মেয়েটির মৃত্যুর মধ্যে সৌন্দর্যকে দেখা - এমন কিছু যা কিনা আমাদের সামষ্ঠিক সংস্কৃতিকে 'সমৃদ্ধ' করে - আজকের দিনের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা এবং তাদের দর্শক হিসাবে আমরাও কিছুটা দোষের দায়ভার পেতে পারি। নৃতাত্ত্বিক বা জাতিগত ধর্মীয় আচরণের মধ্যে নানা বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যার নামে নিষ্ঠুরতাকে সমর্থনীয় করে তোলা হয়য় এমন ঘটনা প্রায়শই দেখা যায়, যে প্রবণতা বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেও আমরা লক্ষ করি। আর এটি হচ্ছে ভদ্র উদারমনা মানুষের মনে গোঙ্গাতে থাকা সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ, যারা একদিকে কোনো কষ্ট, যন্ত্রণা আর নিষ্ঠুরতাকে সহ্য করতে পারে না, আবার অন্যদিকে উত্তর আধুনিকতাবাদী ও সাংস্কৃতিক আপেক্ষিকতাবাদের মন্ত্রে তারা দীক্ষিত, যা ভিন্ন সংস্কৃতিকে নিঃশর্তে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, যা কিনা নিজের সংস্কৃতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। মেয়েদের 'ফিমেল জেনিটাল মিউটিলেশন' বা যৌনাঙ্গ বিকৃতিকরণ কোনো সন্দেহ নেই জঘন্যতম প্রকৃতির কষ্টকর একটি অভিজ্ঞতা। এটি নারীর যৌনানুভূতিকে ধ্বংস করে (আসলেই সম্ভবত সেটাই হচ্ছে এর মূল উদ্দেশ্য) এবং অর্ধেকটা ভদ্র উদারপন্থী মন হয়তো এমন নিষ্ঠুর প্রথা বিলুপ্ত করতে চাইবে। অবশ্য অন্য অর্ধেক হয়তো কোনো একটি গোষ্ঠীর নিজস্ব জাতিগত সংস্কৃতির অংশ হিসাবে এটি শ্রদ্ধা করবে, এবং অনুভব করবে যে, যদি 'তারা' তাদের 'মেয়েদের' ধর্মীয় আচারের নামে অঙ্গ বিকৃত করে (২৬) সেখানে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এখানে মূল বিষয়টি হলো তাদের 'মেয়েরা' আসলে 'নিজের' মেয়ে, এখানে কারো ইচ্ছাই উপেক্ষা করা হচ্ছে না। উত্তর দেয়া আসলেই কৌশলের, যেমন ধরুন কোনো একটি মেয়ে যদি বলে সে স্বেচ্ছায় তার নিজের খৎনা করাতে চাইছে? কিন্তু সে কি ভবিষ্যতে, পূর্ণবয়ষ্ক হবার পর অতীতের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্যভাবে ভাবতে পারে, যেমন এরকম কোনো ঘটনা তার জীবনে না ঘটাই ভালো ছিল ? হাম্পফ্রি যা বলতে চাইছেন, তা হলো কোনো পূর্ণবয়ষ্ক রমণী যিনি শৈশবে স্বেচ্ছায় এরকম কোনো একটি অঙ্গহানি থেকে বেঁচে গিয়েছিল সৌভাগ্যক্রমে, তাদের কেউই কিন্তু পরবর্তীতে নিশ্চয়ই সেই অঙ্গহানি আবার করার জন্য আগ্রহী হবেন না।

আমিশদের (২৭) নিয়ে আলোচনা শেষে, বিশেষ করে তাদের 'নিজেদের' আচার সংস্কৃতি অনুযায়ী তাদের 'নিজস্ব' সন্তানদের প্রতিপালন করার অধিকার আলোচনা করার পর হাম্পফ্রি তীব্র ভাষায় সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য টিকিয়ে রাখার প্রতি সমাজ হিসাবে আমাদের অতি আগ্রহকে সমালোচনা করেন।

> ঠিক আছে, আপনি হয়তো বলতে চাইবেন, আমিশ বা হাসিডিক ইহুদী (২৮) বা জিপসী শিশুদের জন্য তাদের বাবা-মায়ের দ্বারা নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রতিপালিত হওয়া বেশ কঠিন একটি চাপ - কিন্তু এর পরিণতিতে অন্তত এইসব বিস্ময়কর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো অব্যাহত আছে। আমাদের সভ্যতা

আরো খানিকটা ম্লান ও নিঃস্ব হয়ে যাবে না, যদি এই সংস্কৃতিগুলোর আর কোনো অস্তিত্ব না থাকে? হয়তো এটি লজ্জার একটি ব্যপার, বৈচিত্র্য বাঁচাতে যখন একক সদস্যদের বিসর্জন দিতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু এখানেও যুক্তি দেয়া হয়ে থাকে: সমাজ হিসাবে আমাদের এই মূল্য পরিশোধ করতে হবে। শুধুমাত্র, আমি বাধ্য হচ্ছি আপনাদের মনে করিয়ে দিতে, আমরা এই মুল্য পরিশোধ করি না, তারা করে।

এই বিষয়টি জনতার দৃষ্টি কেড়েছিল ১৯৭২ সালে, যখন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট একটি কেসে তাদের রুল জারি করেছিল। উসকনসিন বনাম ইয়োদার, যেখানে মূল বিষয়টি ছিল ধর্মীয় কারণে শিশুদের স্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেবার ব্যপারে পিতামাতার অধিকার কতটুকু। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে। আমিশরা সাধারণত বেশ বদ্ধ একটি সমাজে একত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে। তাদের ভাষা প্রাচীন জার্মান ভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ, যার নাম পেনসিলভেনিয়া ডাচ এবং বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যুৎ, যান্ত্রিক গাড়ি, বোতাম এবং আধুনিক জীবনের চিহ্ন বহন করে এমন বেশ কিছু উপাদান তারা তাদের জীবন থেকে বর্জন করে। আসলেই সপ্তদশ শতাব্দীর মত শান্ত জীবনের এই ছবি আধুনিক মানুষের চোখে বেশ আকর্ষণীয় কিছু আছে বলেই মনে হয়। তাহলে একে কি সুরক্ষা করা প্রয়োজন নয়, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে? এবং এসব সুরক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমিশদের নিজেদের মত করে তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করার অনুমতি দেয়া, কারণ তাদের মতে সেটাই একমাত্র উপায় যেভাবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক জীবনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বাঁচাতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা জানতে চাইতে পারি, শিশুদের কি এ বিষয়ে নিজেদের কোনো মতামত থাকা উচিত না?

১৯৭২ সালে সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবার জন্য আহবান করা হয়েছিল , যখন উইনকনসিনে বেশ কিছু আমিশ বাবা-মা তাদের সন্তানদের হাইস্কুল থেকে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য আবেদন করেছিল। একটি নির্দিষ্ট বয়সের পর শিক্ষাগ্রহনের ধারণাটি আমিশদের ধর্মীয় মুল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতায় বিশেষভাবে পরিপন্থী, বিশেষত যে-কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। উইসকনসিন কর্তৃপক্ষ সেই সব পরিবারের বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা করেছিল এই অভিযোগ করে যে, শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার জন্য প্রতিটি শিশুরই সমান অধিকার আছে, এবং কোনো শিশুকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অবশ্যই একটি অপরাধ। নানা ধরনের আদালত পেরিয়ে এই মামলাটি অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নজরে এসেছিল। বিচারকরা সেখানে এই বিষয়ে একটি বিভাজিত রায় (৬ বনাম ১) শোনান, যেখানে তারা আমিশ বাবা-মায়ের অধিকার সংরক্ষণ করে তাদের পক্ষে রায় দিয়েছিল (৩০) । প্রধান বিচারপতি ওয়ারেন বার্গার লিখেছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত যে, ‘নথিপত্র যেমন নির্দেশ করছে, বাধ্যতামূলক স্কুলে উপস্থিতি

১৬ বছর পর্যন্ত কোনো আমিশ শিশুর জন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে, এবং আমিশ সমাজের সামাজিক এবং ধর্মীয় নানা আচরণ যা এখনো টিকে আছে তার উপর বিশেষ হুমকি সৃষ্টি করে। ফলাফল হচ্ছে হয় তারা তাদের বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে ও বাকি সমাজের সাথে মিশে যেতে হবে, নয়তো অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণু এলাকায় স্নানান্তরিত হবার জন্য বাধ্য হতে হবে'।

বিচারপতি উইলিয়াম ও ডগলাস এর সংখ্যালঘু মতামত ছিল, যে শিশুটিকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা উচিত। তারা কি সত্যি তাদের শিক্ষা সংক্ষিপ্ত করতে চাইছে? তারা কি, সত্যি আমিশ এলাকায় থাকতে চাইছে? নিকোলাস হাম্পফ্রি হয়তো আরো খানিকটা এগিয়ে যেতেন, এমন কি যদি শিশুদের জিজ্ঞাসাও করা হতো, এবং তারা যদি আমিশ ধর্মের প্রতি তাদের পছন্দ প্রকাশও করে, আমরা কি এটা মনে করতে পারবো যে, তারা যদি আরো শিক্ষিত হতো, এবং তাদের যদি অন্যান্য সম্ভাব্য বিকল্প বিষয়গুলো সম্বন্ধে ভালোভাবে জানা থাকতো, তারা কি এই কাজটি করতো? এটি সম্ভব হতে হলে, বাইরের জগত থেকে আসা এমন তরুণ তরুণীদের উদাহরণ কি আমাদের দেখতে পাওয়া উচিত ছিল না, যারা অতি উৎসাহের সাথে আমিশদের সাথে যোগ দিতে চাইছে? বিচারপতি ডগলাস আরো বলেন তবে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে। তিনি কোনো বিশেষ কারণ দেখেননি পিতামাতার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষ মর্যাদা দেবার জন্য যা কিনা সিদ্ধান্ত নিতে পারে কতটুকু অবধি তারা তাদের সন্তানদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবেন। যদি ধর্ম এই ধরনের ব্যতিক্রমের কারণ হয় তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাস কি এই একই ধরনের বিশেষ সুবিধা দাবী করতে পারে না?

সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠরা মোনাস্টিক বা সন্ন্যাসসদৃশ সমাজের কিছু ইতিবাচক বিষয়গুলোর সাথে এর তুলনা করেন, এবং তারা দাবী করেন এই ধরনের গোষ্ঠীর উপস্থিতি আমাদের সমাজকে তর্কসাপেক্ষে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু হাম্পফ্রি বিশেষভাবে এই দুটির মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যগুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সন্ন্যাসীরা স্বেচ্ছা তাদের সন্নাস জীবন বেছে নেন। আমিশ শিশুরা আমিশ হবার জন্য কখনো স্বেচ্ছায় রাজী হয় না, কারণ তারা সেই পরিবেশেই জন্ম নেয়, এবং তাদের বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকে না।

বিস্ময়কর মাত্রার অহংবোধ আর পৃষ্ঠপোষকতার সুর ছাড়াও এখানে অমানবিক একটি বিষয় হচ্ছে - তথাকথিত 'বৈচিত্র্য' এবং নানা ধরনের ধর্মীয় সংরক্ষণ করার পূণ্যের বেদীতে যে-কাউকে, বিশেষ করে শিশুদের বিসর্জন দেবার মানসিকতা। আমরা বাকিরা যান্ত্রিক গাড়ি আর কম্পিউটার, ভ্যাক্সিন আর অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে খুশী, কিন্তু বনেট আর ব্রিচসহ, ঘোড়ার গাড়ি, প্রাচীন ভাষা আর পিট-শৌচাগারসহ অদ্ভুত একটি গোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে আপনারা আমাদের জীবন সম্মৃদ্ধ করছেন। আপনাদের সন্তানদের

অবশ্যই সপ্তদশ-শতাব্দীর সময়ের খাঁচায় বন্দী করে রাখার জন্য আপনাদের ছাড়পত্র দেয়া উচিত, অন্যথায় আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাবে: মানব সংস্কৃতির বিস্ময়কর বৈচিত্র্যের একটি অংশ হারিয়ে যাবে। আমার ভিতরের ক্ষুদ্র একটি অংশ এই বক্তব্যের কিছু অংশ অনুভব করতে পারছে ঠিকই, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশটি আমাকে অসুস্থ করে তোলে।

শিক্ষাব্যবস্থা সক্রান্ত একটি স্ক্যান্ডাল..

আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার (৩১), বৈচিত্র্যের মন্ত্র জপেছিলেন, যখন হাউস অব কমন্সে সংসদ সদস্য জেনি টঙ্গ তাকে চ্যালেঞ্জ করে জানতে চান, উত্তর-পূর্ব ইংল্যাণ্ডের একটি স্কুলে সরকার তাদের ভর্তুকি দেয়ার বিষয়টিকে কিভাবে তিনি যুক্তিযুক্ত বলে দাবী করেন, যখন এই স্কুলটি (ব্রিটেনেরই বিশেষ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) আক্ষরিক অর্থে বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ববাদ শিক্ষা দেয়। জনাব ব্লেয়ার এর উত্তরে বলেন, অত্যন্ত দূঃখজনক হবে যদি শুধুমাত্র এই কারণে আমাদের পক্ষে যতদূর সম্ভব ততটুকু বিচিত্র বহুসাংস্কৃতিক একটি শিক্ষাব্যবস্থা পাবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় (৩২)। প্রশ্নবিদ্ধ এই স্কুলটির নাম ইম্যানুয়েল কলেজ, গেটসহেডে অবস্থিত এটি অন্যতম একটি সিটি অ্যাকাডেমি, যার গর্বিত উদ্যোক্তা ছিল টনি ব্লেয়ারের সরকার। ধনী পৃষ্ঠপোষকদের উৎসাহিত করা হয়েছিল সামান্য কিছু অর্থ (ইমানুয়েল কলেজের ক্ষেত্রে ২ মিলিয়ন পাউন্ড) বিনিয়োগ করতে, যা সরকারের আরো বড় অনুদানের সাথে যুক্ত হবে (২০ মিলিয়ন পাউন্ড স্কুলের জন্য, এছাড়া পরিচালনার খরচ, বেতনভাতা ইত্যাদি সরকার বহন করবে)। কিন্তু এই সামান্য আর্থিক অংশগ্রহন এর উদ্যেক্তাদের স্কুলের নীতিমালা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। এছাড়াও স্কুলের প্রধান কর্মকর্তাদের নিয়োগ, কোন ছাত্র ভর্তি হতে পারবে, আর কে ভর্তি হতে পারবে না সেই বিষয়ে স্কুল নীতিমালা এবং আরো অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণের একচেটিয়া অধিকারও এর সাথে যুক্ত হয়েছিল।

ইমানুয়েল কলেজের দশ শতাংশের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্যার পিটার ভার্দি, একজন ধনাঢ্য গাড়ি বিক্রেতা বর্তমান যুগের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দেবার জন্য যার প্রশংসনীয় একটি সদিচ্ছা আছে, তার নিজের জীবনে একসময় যে শিক্ষার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন, এবং আর তার নিন্দনীয় ইচ্ছাটি ছিল নিজের ধর্মীয় বিশ্বাস এই কলেজে পড়ুয়া সরল সব শিশুমনে গেঁথে দেয়ার বাসনা (৩৩)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভার্দি যুক্তরাষ্ট্র-অনুপ্রাণিত মৌলবাদী শিক্ষকদের একটি দলের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যাদের নেতৃত্বে ছিলেন নাইজেল ম্যাককুওয়াড। নাইজেল ম্যাককুয়াড ইমানুয়েল কলেজে কিছুদিন প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছিলেন, এখন যিনি ভার্দির আরো বেশ কিছু স্কুলের একটি কসসোর্টিয়ামের পরিচালক। পৃথিবী বয়স

দশ হাজার বছরের কম তার এই প্রকৃতির বিশ্বাসটি পর্যবেক্ষণ করলেই ম্যাককুওয়াডের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমত্তা যাচাই করা যেতে পারে। এছাড়া তার আরো একটি উদ্ধৃতিও এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য সহায়ক ... 'শুধু একটা বিস্ফোরণ থেকে আমরা বিবর্তিত হয়েছি এবং আমরা এক সময় বানর ছিলাম এই ভাবনাগুলো অবিশ্বাস্য মনে হবে যখন আপনি মানুষের শরীরের মত জটিল কোনো কিছুর দিকে তাকাবেন....। আপনি যদি শিশুদের বলেন তাদের জীবনের কোনো অর্থ আর উদ্দেশ্য নেই, শুধু রাসায়নিক মিউটেশন ছাড়া তারা আর কিছু না, সেটা কিছুতেই তাদের আত্মমর্যাদা গড়তে সহায়তা করবে না'(৩৪)।

কোনো বিজ্ঞানী কখনোই বলেননি শিশুরা হচ্ছে 'রাসায়নিক মিউটেশন'। এরকম একটি প্রসঙ্গে এই ধরনের কোনো বাক্য ব্যবহার করা অশিক্ষিত মানুষের অজ্ঞতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই না। যা 'বিশপ' ওয়েইন ম্যালকমের বক্তব্যের মতোই, হ্যাকনি, পূর্ব লন্ডন এলাকায় যিনি ক্রিশ্চিয়ান লাইফ সিটি চার্চের নেতা। ২০০৬ এর এপ্রিল ১৮ তারিখের গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী তিনি তর্ক করেছিলেন 'বিবর্তনের সপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণগুলো' নিয়ে। প্রমাণগুলো বোঝার ক্ষমতা সম্বন্ধে তার যোগ্যতা মাপা সম্ভব তার একটি উদ্ধৃতি দিয়ে: 'স্পষ্টতই জীবাশ্ম রেকর্ডে অন্তর্বর্তীকালীন পর্যায়ের কোনো প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায় না, যদি কোনো ব্যাঙ একটি বানর হয়, আমাদের তো তাহলে অনেক ব্যাং-বানর বা 'ফ্রংকি' দেখতে পাবার কথা না ?'

বেশ, বিজ্ঞান কিন্তু জনাব মাককুওয়াডের বিষয় নয়, সুতরাং নিরপেক্ষভাবে আমাদের বরং তার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান স্টিফেন লেফিল্ড কি বলছেন সেই বিষয়ে নজর দেয়া উচিত হবে। ইমানুয়েল কলেজে ২০০1 সালের ২১ সেপ্টেম্বর, তিনি 'দ্য টিচিং অব সায়েন্স: এ বিবলিকাল পার্সপেক্টিভ' শিরোনামে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই ভাষণটি পরবর্তীতে খ্রিস্টীয় একটি ওয়েবসাইট (৩৬) প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আপনি এখন আর সেই ভাষণটি সেখানে খুঁজে পাবেন না। কারণ 'দ্য ক্রিশ্চিয়ান ইন্সস্টিটিউট' সেই বক্তৃতাটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, যখন ২০০২ সালে ১৮ মার্চ ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি কলামে আমি বিষয়টি সবার নজরে আনি। এই বক্তৃতাটির একটি সমালোচনামূলক ব্যবচ্ছেদ করেছিলাম আমি (৩৬)। কিন্তু ইন্টারনেট, বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াই ওয়েব থেকে আসলেই আসলে কোনো কিছু সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা খুব কঠিন, কারণ সার্চ ইঞ্জিন দ্রুততার খাতিরে কিছুটা তথ্য তাদের তথ্যের 'ক্যাশে' সংরক্ষণ করে রাখে, এবং এমনকি মূল লেখাটি মুছে ফেলার পরেও সেগুলো অবধারিতভাবে টিকে থাকে। একজন সতর্ক ব্রিটিশ সাংবাদিক, অ্যান্ড্রু ব্রাউন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ধর্ম বিষয়ক সংবাদদাতা, বেশ দ্রুততার সাথে লেফিল্ডের ভাষণটি খুঁজে বের করেছিলেন। তিনি গুগল ক্যাশ থেকে সেটি ডাউনলোড করে

পুনপ্রকাশ করেন, মুছে ফেলার কোনো সুযোগ নেই এমনভাবে তার নিজস্ব ওয়েব সাইটে (৩৭)।

আপনারা লক্ষ করবেন ব্রাউনের বাছাই করা শব্দগুলো যা লিঙ্কটিতে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণে বিনোদন প্রদান করে। কিন্তু সেই বিনোদন দেবার ক্ষমতা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, যদি আমরা সেই ভাষণের মূল বিষয়বস্তুর দিকে নজর দেই। ঘটনাচক্রে যখন একজন কৌতূহলী পাঠক ইমানুয়েল কলেজের কাছে জানতে চান ওয়েবসাইট থেকে কেন এই বক্তৃতাটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এর প্রত্যুত্তরে তিনি যথারীতি আন্তরিক নয় এমন একটি বার্তা পান: যা আবারো অ্যান্ড্রু ব্রাউন তার সাইটটিতে লিপিবদ্ধ করেছেন:

> ‘ইমানুয়েল কলেজটি স্কুলে সৃষ্টিতত্ত্ববাদ পড়ানো সংক্রান্ত বিতর্কের কেন্দ্রে অবস্থান করছিল। বলাবাহুল্য ইমানুয়েল কলেজে বহু সাংবাদিক ফোন করেছেন। যার জন্য এই কলেজের অধ্যক্ষ এবং পরিচালকদের যথেষ্ট পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হয়েছে। আর এই সব ব্যক্তিদের অন্য অনেক কাজ আছে; সেই কাজে সহায়তা করার জন্য আমরা স্টিফেন লেফিল্ডের বক্তৃতাটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সরিয়ে ফেলেছি’।

অবশ্যই, সাংবাদিকদের ব্যাখ্যা করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট ব্যস্ত থাকতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্ববাদ শেখানোর পেছনে তাদের যুক্তিটি আসলে কি? কেনই বা তাদের ওয়েবসাইট থেকে ঠিক সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা কোনো বক্তৃতা সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল? তারা তো সাংবাদিকদের সেটি তথ্যসূত্র হিসেবে নির্দেশ করতে পারতেন। যা অবশ্যই তাদের অনেক সময় বাঁচাতো, তাই নয় কি? না, তাদের বিজ্ঞান প্রধানের বক্তৃতাটি সরিয়ে ফেলার কারণ তারা ঠিকই শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, তাদের লুকানোর কিছু আছে। নিচের এই অনুচ্ছেদটি সেই বক্তৃতার শুরুর দিকের একটি অংশ:

> শুরু থেকে তাহলে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমরা সেই ধারণাটিকে পরিত্যাগ করছি, যা খানিকটা নিজের অজান্তেই সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সিস বেকন জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, যা দাবী করছে আসলে দুটি গ্রন্থ বিদ্যমান (প্রকৃতির গ্রন্থ এবং ধর্মগ্রন্থ), এবং স্বতন্ত্রভাবে যাদের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। বরং আমরা সেই সুস্পষ্ট প্রস্তাবের উপর দৃঢ়ভাবে দাড়িয়ে বলছি ঈশ্বর কর্তৃত্বের সাথে তার বাণী আমাদের দিয়েছেন, এবং পবিত্র ধর্মগ্রন্থে কোনো ভুল থাকার কথা নয়। অবিশ্বাসী বা টেলিভিশন-মাতাল আধুনিক সংস্কৃতির মানুষের এই বিশ্বাসটি কাছে যতই সুস্পষ্টভাবে ভঙ্গুর আর প্রাচীন কিংবা অবুঝ

মনে হোক না কেন, আমরা নিশ্চিৎ হতে পারি এটি দৃঢ় সেই ভিত্তি, যা উপর কোনো কিছু তৈরি করা সম্ভব।

নিজেকে বার বার চিমটি দিয়ে দেখতে হবে আপনার, নাহ, সত্যিই আপনি স্বপ্ন দেখছেন না। যুক্তরাষ্ট্রের বাইবেল বলয়ের আলাবামার কোনো তাবুতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা কোনো ধর্মযাজক নয়, বরং এই কথা বলেছেন এমন একটি স্কুলের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান, যেখানে ব্রিটিশ সরকার অর্থ সহায়তা দিচ্ছে, এবং যা টনি ব্লেয়ারের আনন্দ আর গর্বের প্রতীক। একজন ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান হিসেবে জনাব ব্লেয়ার নিজেই ২০০৪ সালে ভার্দি স্কুলগুলোর মধ্যে একটি উদ্বোধন করেছিলেন (৩৮)। বৈচিত্র্য ভালো গুণ হতে পারে কিন্তু এখানে যে বৈচিত্র্যের দাবী করা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ পাগলামী।

এরপর লেফিল্ড বিজ্ঞান এবং ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পার্থক্যগুলোর একটি তালিকা উপস্থাপন করেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সমাপ্ত করেন একই উপসংহার দাবী করে: যেখানেই কোনো সংঘর্ষ এসেছে, সেখানেই ধর্মগ্রন্থ জিতছে, ধর্মগ্রন্থকে প্রাধান্য দিতে হবে এসব ক্ষেত্রে। 'আর্থ সায়েন্স' এখন জাতীয় পাঠসূচির অংশ উল্লেখ করে লেফিল্ড বলেন, এই বিষয়ের জন্য হুইটকম্ব এবং মরিসের 'ফ্লাড জিওলজি' সংক্রান্ত প্রবন্ধগুলো পাঠ করা পড়া সবার জন্য সমীচীন হবে। হ্যাঁ, ফ্লাড জিওলজীর অর্থ আপনি যা ভাবছেন সেটাই। আমরা সেই নোয়ার আর্ক বা নৌকার কথা বলছি। নোয়ার আর্ক.... ! - যখন শিশুরা এর পরিবর্তে আফ্রিকা আর দক্ষিণ আমেরিকা একসময় সংযুক্ত ছিল এই ধরনের কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য শিখতে পারতো, যে দুটি মহাদেশ হাতের নোখ যে গতিতে বৃদ্ধি পায় তেমন ধীর গতিতে বহু মিলিয়ন বছর ধরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। নোয়ার সেই মহাপ্লাবন সম্বন্ধে লেফিল্ডের (বিজ্ঞানের প্রধান) আরো কিছু বক্তব্য, তার মতে যে মহাপ্লাবন শত শত মিলিয়ন বছরের ধীর লয়ে ঘটা ঘটনাগুলোর সাম্প্রতিক এবং দ্রুততম একটি ব্যাখ্যা, যা কিনা সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক ভূতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করছে:

> ভূবিদ্যায় আমাদের মূল মডেলের মধ্যে অবশ্যই জেনেসিস ৬-১০ এ বর্ণিত বিশ্বব্যাপী মহাপ্লাবণের ঐতিহাসিক সত্যতার স্বীকৃতি দিতে হবে। যদি বাইবেল বর্ণিত বিবরণ নিশ্চিত এবং তালিকাভুক্ত উদ্ভবিজ্ঞান(যেমন, জেনেসিস ৫; ১ ক্রোনিকল ১; ম্যাথিউ ১ এবং লিউক ৩) যদি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে, আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, নিকটতম কোনো অতীতে এই বৈশ্বিক প্রলয় ঘটেছে। সর্বত্র এর প্রভাবগুলো পর্যাপ্ত পরিমানে উপস্থিত। প্রধানতম প্রমাণগুলো আবিষ্কার হয়েছে জীবাশ্মপূর্ণ পাললিক শিলায়, হাইড্রোকার্বন জ্বালানীর বিশাল ভাণ্ডারে (কয়লা, তেল এবং গ্যাস), এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর 'কিংবদন্তী' কাহিনীতে এই

> ভয়াবহ মহাপ্রলয়ের বিবরণ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এছাড়া একটি আর্ক ভর্তি সব প্রাণী প্রজাতিদের জোড়ায় জোড়ায় একটি বছর পানি স্তর যথেষ্ট পরিমাণ কমে যাওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখেছেন, অনেকের মধ্যে যেমন, জন উডমোরাপ্পে।

একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে এটি সম্পূর্ণ অজ্ঞ যেমন নাইজেল ম্যাককুওয়াড বা বিশপ ওয়েন ম্যালকমের বক্তব্যর চেয়েও আরো বেশি খারাপ। কারণ লেফিল্ড বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত। আরো একটি বিস্ময়কর অনুচ্ছেদ :

> যেমন আমরা শুরুতেই বলেছিলাম, খ্রিস্টানরা, খুব ভালো যুক্তিসহ, ওল্ড এবং নিউ টেস্টামেন্ট ধর্মশাস্ত্র দুটিকে আমরা কি বিশ্বাস করবো তার একটি উত্তম পথনির্দেশিকা হিসেবে বিবেচনা করেন। এগুলো শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, এই বইগুলো পৃথিবীর ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদেরকে সত্যিকারের একটি বিবরণ সরবরাহ করে, আমাদের ক্ষতি করেই যা শুধু উপেক্ষা করা সম্ভব।

ধর্মগ্রন্থ পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের আক্ষরিক সত্যতা বর্ণনা প্রদান করে এমন কোনো দাবী শুনলে যে-কোনো সম্মানজনক ধর্মতত্ত্ববিদও নাক সিটকাবেন। আমার বন্ধু রিচার্ড হ্যারিস, অক্সফোর্ডের বিশপ এবং আমি একটি যৌথ চিঠি লিখেছিলাম টনি ব্লেয়ারের কাছে, যেখানে আমরা আরো আটজন বিশপ এবং নয় জন সিনিয়র বিজ্ঞানীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিলাম (৩৯) । এই নয় বিজ্ঞানীর মধ্যে ছিলেন, রয়্যাল সেসাইটির সভাপতি (ইতোপূর্বে টনি ব্লেয়ার এর প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা), রয়্যাল সোসাইটি জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের সচিবদ্বয়, রাজকীয় অ্যাষ্টোনোমার (রয়াল সোসাইটির বর্তমান সভাপতি), ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামের পরিচালক, স্যার ডেভিড অ্যাটেনবরো, ইংল্যান্ডে যিনি সম্ভবত সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, বিশপদের মধ্যে ছিলেন একজন রোমান ক্যাথলিক ও সাতজন অ্যাংলিকান বিশপ - সবাই অভিজ্ঞ উর্ধতন ধর্মীয় নেতা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে আমরা এমনকি দায়সারাগোছের ভাবনাচিন্তাহীন একটি উত্তর পেয়েছিলাম, যা স্কুলটির ভালো ফলাফল এবং দাপ্তরিক অনুসন্ধানী দলের উত্তম প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেছিল (৪০)। আপাতদৃষ্টিতে ব্লেয়ারের মনে হয়নি এমন কোনো স্কুল সম্বন্ধে যদি স্কুল পরিদর্শকরা উত্তম রিপোর্ট দিয়ে থাকে, যে স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শেখাচ্ছেন, মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল, কুকুরদের গৃহপালিত প্রাণীতে রূপান্তরিত করার পরে, তাহলে এই সব পরিদর্শকদের তদারকী করার মানদণ্ডে নিশ্চয়ই কোনো গলদ আছে।

লেফিল্ডের ভাষণে হয়তো সবচেয়ে অস্বস্তিকর অংশটি হচ্ছে, ‘কি করা যেতে পারে’? শীর্ষক উপসংহারে। যেখানে তিনি সেই কৌশল ব্যবহার করতে চেয়েছেন যা বিজ্ঞানের

শ্রেণীকক্ষে মৌলবাদী খ্রিস্ট ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাতে সেই সব শিক্ষকরা ব্যবহার করে থাকেন। যেমন তিনি বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিশেষ নজর রাখতে বলেন..

> যখনই পাঠ্যপুস্তকে, পরীক্ষার প্রশ্নে কিংবা কোনো পরিদর্শকের প্রশ্নে.. বিবর্তনীয়/প্রাচীন পৃথিবীর মতবাদ (যা মিলিয়ন বা বিলিয়ন বছর পুরোনো) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে বা বোঝানো হবে, তারা যেন সৌজন্যের সাথে সেখানে উল্লেখ করেন এই মতবাদটির ভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা আছে বা আমোঘ সত্য নয়। একই উপাত্তের ক্ষেত্রে যেখানেই সম্ভব, আমাদের অবশ্যই বিকল্প (সবসময় যা উত্তম) বাইবেল নির্ভর ব্যাখ্যা দেয়া উচিত । যথাসময়ে আমরা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এবং জীববিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন বেশ কিছু উদাহরণ লক্ষ করবো ।

লেফিল্ডের বাকি বক্তৃতা মূলত প্রচারণা নির্দেশিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যার ধর্মীয় শিক্ষকরা জাতীয় পাঠ্যসূচির সীমানায় থেকে প্রমাণ নির্ভর বিজ্ঞান শিক্ষাকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে যা মূল উৎস হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, যেন তারা বাইবেল নির্ভর জ্ঞান দিয়ে সেগুলো প্রতিস্থাপিত করার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন।

২০০৬ সালে ১৫ এপ্রিল, বিবিসির সবচেয়ে অভিজ্ঞ সংবাদ উপস্থাপক জেমস নাউটি রেডিওর জন্য স্যার পিটার ভার্দির একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেই সাক্ষাৎকারের মূল বিষয় ছিল তার বিরুদ্ধে আনীত একটি অভিযোগের পুলিশী তদন্ত। ভার্দি অবশ্যই অভিযোগটি অস্বীকার করেছিলেন। অভিযোগটি ছিল ব্লেয়ার সরকার টাকার বিনিময়ে ধনী ব্যবসায়ী এবং দলীয় সমমনাদের নাইটহুড খেতাব প্রদান করেছে, যেন তারা সিটি অ্যাকাডেমিগুলোয় তাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন। নাউটি ভার্দিকে সৃষ্টিতত্ত্ববাদ নিয়েও জিজ্ঞাসা করেন, এবং ভার্দি সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন যে, ইমানুয়েল কলেজ তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'সাম্প্রতিক-পৃথিবী' সংক্রান্ত সৃষ্টিতত্ত্ববাদ মতবাদ প্রচার করছে (৪১)। ইমানুয়েলের একজন প্রাক্তন ছাত্র পিটার ফ্রেঞ্চ দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন, 'আমাদের শেখানো হয়েছিল পৃথিবীর বয়স নাকি মাত্র ৬০০০ বছর' (৪২)। কে এখানে তাহলে সত্যি কথা বলছে? বেশ, আমরা তা জানি না, কিন্তু স্টিফেন লেফিল্ডের বক্তৃতাটি সেখানে কিভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হবে, সেটি স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল। ভার্দি কি তাহলে লেফিল্ডের খুব স্পষ্ট ঘোষণাপত্রটি পড়েননি? তিনি কি আসলেই জানেন না যে, তার কলেজের বিজ্ঞানের প্রধান কি করছেন? পিটার ভার্দি পুরোনো গাড়ি বিক্রি করে ধনী হয়েছিলেন, আপনি কি তার কাছ থেকে কোনো গাড়ি কিনবেন? আর আপনি কি, টনি ব্লেয়ারের মতো ১০ শতাংশ দামে তার কাছে একটি স্কুল বিক্রি করে দেবেন, এবং সেই সাথে এটাও বলবেন এই স্কুল চালানোর সব খরচ আপনি নিজেই দেবেন। বেশ খানিকটা সদয় হওয়া যাক ব্লেয়ারের প্রতি, এবং ধরে নেয়া যাক তিনি অন্তত লেফিল্ডের

বক্তৃতা পড়েননি। আমার ধারণা তার মনোযোগ এই বিষয়টির প্রতি নিবদ্ধ হবে এমন ভাবাটাও এখন বেশি আশা করা হয়ে যাবে।

প্রধান-শিক্ষক ম্যাককোওয়াড এর সমর্থনে যা বলেছেন, তা স্পষ্টতই তার দৃষ্টিতে তার স্কুলের উন্মুক্ত মনের পরিচয়, এবং মন্তব্যটির মধ্যে অহংকারী আত্মতুষ্টির উপস্থিতি স্পষ্ট:

> এখানে কি হচ্ছে তার সবচেয়ে ভালো যে উদাহরণ আমি দিতে পারবো সেটি হচ্ছে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমি যখন দর্শন পড়াচ্ছিলাম, শাকিলও সেখানে ছিল, সে বললো, 'কুর'আন হচ্ছে সঠিক এবং সত্যি', এবং অন্যদিকে বসা ক্লেয়ার তখন বলে ওঠে, 'না বাইবেলই একমাত্র সত্য', সুতরাং আমরা দুটি ধর্মগ্রন্থ কি বলছে, তাদের সাদৃশ্যগুলো নিয়ে কথা বলি এবং কোথায় তারা মিলছে না তা নিয়ে আলোচনা করি। এবং একসময় আমি বলি, 'দুঃখিত শাকিল, তুমি ভুল, বাইবেল হচ্ছে একমাত্র সত্য'। এবং সে বলে, 'দুঃখিত জনাব ম্যাককোয়াড আপনি ভুল করেছেন, কুর'আনই ঠিক'। এবং এরপর তারা মধ্যাহ্ন ভোজ খেতে যায় এবং তাদের আলোচনা অব্যাহত রাখে। এটাই আমরা চাই, আমরা চাই শিশুরা জানুক, তারা কি বিশ্বাস করে, কেন বিশ্বাস করেছে এবং কিভাবে সেই বিশ্বাসটির জন্য যুদ্ধ করতে হয় (৪৩) ।

কি চমৎকার সেই দৃশ্য ! শাকিল এবং ক্লেয়ার দুজনে একসাথে মধ্যাহ্ন ভোজন করবে এবং দৃঢ়তার সাথে তাদের মতামত নিয়ে তর্ক বিতর্ক করবে এবং পারস্পরিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মবিশ্বাসগুলোকে পৃথকভাবে সমর্থন দিয়ে যাবে। কিন্তু আসলেই কি বিষয়টি চমৎকার? আসলেই কি এটি নিন্দনীয় একটি দৃশ্য নয়, যার বর্ণনা ম্যাককোওয়াড দিলেন এই মাত্র? সর্বোপরি কিসের উপর ভিত্তি করে আসলে শাকিল ও ক্লেয়ার তাদের যুক্তি সাজাবে? যুক্তিসঙ্গত কি প্রমাণ আছে, যা তারা তাদের সেই প্রাণবন্ত গঠনমূলক বিতর্কে যুক্ত করতে পারে? ক্লেয়ার আর শাকিল দুজনেই যা করতে পারে তা হলো শুধু দাবী করা যে, তাদের নিজ নিজ বিশ্বাসের ধর্মগ্রন্থটি ভালো এবং আপাতদৃষ্টিতে এর বেশি কিছু বলার নেই আর আসলে এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে পারার কথাও নয়, যখন কাউকে শেখানো হবে সত্যটা আসে ধর্মগ্রন্থর থেকে, বাস্তব কোনো প্রমাণ থেকে না। ক্লেয়ার, শাকিল ও তাদের সঙ্গীদের কোনো ভালো শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না, স্কুল তাদের ফাকি দিচ্ছে, স্কুল প্রিন্সিপাল তার ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, শুধু শারীরিকভাবে নয় বরং মানসিকভাবে তিনি নির্যাতন করছেন।

সচেতনতার স্তর উন্নীত করা..আবারো

এবার আমি আরেকটি চমৎকার দৃশ্যপট উল্লেখ করি: ক্রিসমাসের সময় এক বছর আমার দৈনিক পত্রিকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, একটি উৎসবের সাথে প্রাসঙ্গিক একটি ছবি খুজছিল এবং যা বেশ হৃদয় উষ্ণ করা ছবি হবে, সর্বজনীন খ্রিস্টীয় স্কুলের একটি 'নেটিভিটি' (যীশুর জন্ম সংক্রান্ত) নাটকের দৃশ্য। পূর্ব থেকে আসা তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তির সেই ভূমিকায় অভিনয় করেছিল.. ছবির ক্যাপশন যা বেশ গর্ব করে বলছে তা হলো, শাদব্রীত (একজন শিখ), মুশাররফ (একজন মসুলমান) এবং অ্যাডেল (একজন খ্রিস্টান)। সবারই বয়স মাত্র চার।

চমৎকার? ভালো লাগার মত? না, এটি তার কোনোটাই না, খুবই উদ্ভট একটি দৃশ্য। কিভাবে কোনো ভদ্রমানুষ ভাবতে পারেন যে তাদের.. চার বছর বয়সী কোনো শিশুকে তার পিতামাতার মহাজাগতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ মোতাবেক চিহ্নিত করার অধিকার কারো থাকতে পারে? আর কেনই বা সেটি ঠিক না, তা বুঝতে হলে, অন্য রকম একটি ছবি কল্পনা করুন, যার শিরোনামটি পরিবর্তিত করা হয়েছে এভাবে : শাদব্রীত (একজন কাইনেশিয়ান (৪৪)), মুশাররফ (একজন মনেটারিষ্ট (৪৫)) এবং অ্যাডেল (একজন মার্ক্সবাদী), সবার বয়স মাত্র চার। এরকম কোনো প্রকাশিত আলোকচিত্র কি তীব্র প্রতিক্রিয়াপূর্ণ ক্রুদ্ধ চিঠির জন্য যথেষ্ট নয়? অবশ্যই তা হওয়া উচিত। তারপরও ধর্মের বিস্ময়কর রকম অদ্ভুত একটি পদমর্যাদার কারণে সেটা নিয়ে কেউ টু শব্দটিও করবে না, এবং একই ধরনের অন্য কোনো ঘটনার সময়ও তা কখনোই শোনা যায়নি। কল্পনা করুন, কি পরিমাণ শোরগোল হবে যদি ক্যাপশনটা বদলে দেয়া হয় এভাবে: শাদব্রীত (নিরীশ্বরবাদী) মুশাররফ (অজ্ঞেয়বাদী) এবং অ্যাডেল (ধর্মনিরেপক্ষ মানবতাবাদী), সবার বয়স চার। সত্যি কি তাদের পিতামাতাদের পরীক্ষা করে দেখা উচিত না, তারা আসলেই তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করতে যোগ্য কিনা? ব্রিটেনে যেখানে রাষ্ট্র এবং চার্চের সাংবিধানিকভাবে বিভাজনের অভাব, সেখানে অবিশ্বাসী পিতামাতারা সাধারণত বাকিদের সাথে সমঝোতা করে নেন এবং স্কুলকে অনুমতি দেন তাদের সন্তানকে যে ধর্মটাই তাদের সংস্কৃতিতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে তা শিক্ষা দেবার জন্য। 'দ্য ব্রাইটস.নেট' (একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যারা নিরীশ্বরবাদীদের নতুন করে একত্রিত ও চিহ্নিত করতে চান 'ব্রাইটস' হিসাবে, ঠিক যেভাবে সমকামিরা তাদের নিজেদেরকে সফলতার সাথে নতুন করে ব্রান্ডিং করতে পেরেছিল 'গে' হিসাবে) খুবই সতর্ক শিশুদের সেখানে নাম লেখানোর ক্ষেত্রে : 'ব্রাইট হবার সিদ্ধান্ত শিশুদের নিজেদেরই নিতে হবে অবশ্যই, একটি শিশু যাকে কিনা নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অবশ্যই কিংবা তার উচিত হবে ব্রাইট হবার জন্য, তারা ব্রাইট হতে পারবে নি'। আপনি কি কল্পনা করতে পারবেন, কোনো একটি চার্চ বা মসজিদ এই ধরনের নিজেদের স্বার্থবিরুদ্ধ কোনো আদেশ দিচ্ছে। কিন্তু তাদেরকে সেটি করতে কি বাধ্য করা উচিত না আমাদের? ঘটনাক্রমে আমি 'ব্রাইটস.নেটে' আমার নাম যুক্ত করেছিলাম, আংশিক কারণ আমি আসলেই কৌতূহলী যে, এই ধরনের কোনো শব্দ কি মিম হিসাবে ভাষার

মধ্যে সন্নিবিষ্ট হবে কিনা। আমি জানি না, এবং জানতে চাই, এধু শব্দটির বিবর্তন কি পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল, নাকি বিষয়টি স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঘটেছে (৪৬)। ব্রাইটসদের প্রচারণা বেশ ধাক্কা খেয়েছিল শুরুতে, বেশ কিছু নাস্তিক গোষ্ঠী খুব তীব্রভাবে এর বিরোধিতা করেছিল, তারা 'অহংকারী' হিসাবে তিরষ্কার পেয়ে খানিকটা থমকে গিয়েছিল। এর ব্যতিক্রম সমকামীদের 'গে প্রাইড' আন্দোলনটিকে সৌভাগ্যক্রমে এই ধরনের কোনো কপট ভদ্রতার মুখোমুখি হতে হয়নি কখনো, হয়তো এ কারণে এটি সফল হয়েছিল।

আগের কোনো একটি অধ্যায়ে, সচেতনতা উন্নীত করার ধারণাটি আমি সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করেছিলাম, শুরুতেই নারীবাদীদের কিছু অবদান, যেমন কিছু বাক্য, "পিওপল অব গুডউইলের" বদলে "মেন অব গুডউইল" শুনে আমাদের ভ্রু কুঞ্চন। এখানেও আমি সচেতনতার সেই স্তরটি উপরে উঠাতে চাইছি, অন্য আরেকটি উপায়ে। আমি মনে করি আমাদের সবারই বিব্রত বোধ করা উচিত যখন আমরা একটি ছোটো শিশুর গায়ে বিশেষ চিহ্ন লাগিয়ে দেবো কোনো না কোনো একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি হিসেবে তাকে চিহ্নিত করে। ছোটো একটি শিশুর কি আদৌ এমন কোনো বয়স হতে পারে, যেখানে সে মহাবিশ্বের সৃষ্টি, জীবন এবং নৈতিকতা বিষয়ে কোনো নিজস্ব মতামতে পৌঁছাতে পারে। 'খ্রিস্টান' শিশু বা 'মসুলমান' শিশু এই সব বাক্যের আওয়াজ অস্বস্তিতে ফেলার মত, যেন কোনো ব্ল্যাকবোর্ডের উপর নোখের আঁচড়ের শব্দ।

এখানে একটি রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা যাক, আইরিশ রেডিও স্টেশন কেপিএফটি-এফএম-এর প্রতিবেদনটির সময়কাল ২০০১ সালে ৩ সেপ্টেম্বর:

> ক্যাথলিক স্কুল ছাত্রীরা লয়্যালিস্টদের প্রতিবাদের মুখে পড়ে, যখন তারা উত্তর বেলফাষ্টের আরডয়েন রোডে হলি ক্রস গার্লস প্রাইমারী স্কুলে ঢুকবার চেষ্টা করছিল। রয়্যাল উলস্টার কনস্টাবুলারি এবং ব্রিটিশ আর্মির সদস্যরা প্রতিবাদকারীদের সেখান সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়, যারা স্কুলের চারপাশ অবরোধ করে রাখার চেষ্টা করেছিল। এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে শিশুদের স্কুলে যাবার জন্য বিশেষ ক্রাশ ব্যারিয়ার বসিয়ে ব্যবস্থা নেয়া হয়। লয়ালিস্টরা ঠাট্টা ও চিৎকার করে সেখানে নানা সাম্প্রদায়িক মন্তব্য আর গালমন্দ করছিল, যখন শিশুরা, যাদের কারো কারো বয়স এমনকি চার, তাদের পিতামাতার সাথে স্কুলে প্রবেশ করছিল। স্কুলের প্রধান দরজা দিয়ে তারা যখন ভিতর ঢুকছিল, লয়্যালিস্টরা তখন তাদের প্রতি বোতল আর পাথর ছুড়ে মেরেছিল।

স্বভাবতই যে-কোনো ভদ্র মানুষই এই দুর্ভাগা স্কুলছাত্রীদের এই দুর্দশার কথা ভেবে শিউরে উঠবেন। আমি চেষ্টা করছি, তাদেরকে 'ক্যাথলিক স্কুল ছাত্রী' হিসাবে চিহ্নিত

করার সেই বিশেষ ধারণাটি যেন আমাদের এভাবে শিউরে উঠতে শেখায়। লয়ালিস্ট - প্রথম অধ্যায়ে আমি যেমন ইঙ্গিত করেছিলাম, উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রটেস্টান্ট পরিচয়ের একটি সুভাষণ, ঠিক যেমন ন্যাশনালিস্ট হচ্ছে ক্যাথলিক পরিচয়ের একটি সুভাষণ। যে ব্যক্তিরা এমনকি শিশুদের ক্যাথলিক বা প্রটেস্ট্যান্ট হিসাবে চিহ্নিত করতে ইতস্তত বোধ করেন না, তারা আবার সেই একই ধর্মীয় চিহ্ন নিজেদের ওপর আরোপ করতে দ্বিধাবোধ করেন, প্রাপ্তবয়স্ক সন্ত্রাসী ও উন্মত্ত গোষ্ঠীগুলোর জন্য কিনা যা আরো বেশি প্রযোজ্য।

আমাদের সমাজ, এমনকি ধর্মীয় নয় এমন অংশগুলোও, ভয়াবহ সেই ধারণাটি মেনে নিয়েছে, অপরিণত অবুঝ শিশুদের তাদের বাবা-মায়ের ধর্মে মগজ-ধোলাই বা দীক্ষা দেয়া খুব স্বাভাবিক এবং তা করার অধিকারও আছে। যদিও বিভিন্ন চিহ্ন আরোপ করা যায় তাদের উপর, যেমন ‘ক্যাথলিক’, ‘প্রটেস্টান্ট’,‘ইহুদী’ বা ‘মসুলমান’ শিশু ইত্যাদি, কিন্তু তুলনামূলক অন্য চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না, যেমন. ‘রক্ষণশীল’, ‘উদারনীতিবাদী’,‘রিপাবলিকান’বা ‘ডেমোক্র্যাট’ শিশু। দয়া করে এই বিষয়ে আপনার সচেতনা বৃদ্ধি করুন এবং সজোরে প্রতিবাদ করুন যখনই আপনি এভাবে এর ব্যবহার শুনবেন। একজন শিশু খ্রিস্টান বা মসুলমান শিশু নয় বরং সে শুধু খ্রিস্টান বা মসুলমান বাবা-মায়ের সন্তান। পরবর্তী নামকরণ, প্রসঙ্গক্রমে, কিন্তু শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধিতেও খুবই কার্যকর হতে পারে। কোনো শিশু যাকে বলা হচ্ছে যে সে মসুলমান বাবা-মায়ের সন্তান, সে সাথে সাথেই বুঝতে পারবে ধর্ম এমন কোনো কিছু যে সে নিজে বেছে নিতে বা বাদ দিতে পারে, যখন সেটি বোঝার মত সে যথেষ্ট প্রাপ্তবয়স্ক হবে।

ভিন্ন ধর্মবিশ্বাসগুলোর তুলনামূলক আলোচনা বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের শিক্ষাগত উপকারিতার পক্ষে আসলেই বেশ জোরালো যুক্তি দেয়া যেতে পারে। অবশ্য আমার নিজের সন্দেহ প্রথম জেগে উঠেছিল আমার নয় বছর বয়সে, আর যে শিক্ষাটি এর কারণ (শিক্ষাটি আমার স্কুল বা আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে আসেনি) সেটি হচ্ছে যে, পৃথিবীতে খ্রিস্ট ধর্ম - যে ধর্মীয় আবহে আমি প্রতিপালিত হয়েছি- ছাড়াও আরো বহু পারস্পরিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস-কাঠামোর অস্তিত্ব আছে। ধর্মীয় সমর্থকরা নিজেরাও তা অনুধাবন করেছেন, এবং এটি তাদের শঙ্কার অন্যতম একটি বিষয়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত ‘নেটিভিটি’ নাটকটির ছবি প্রকাশিত হবার পর, চার বছরের শিশুদের ধর্মীয় পরিচয়ে চিহ্নিত করার বিষয়ে কোনো অভিযোগ নিয়ে সম্পাদক বরাবর একটি চিঠিও আসেনি। ‘দ্য ক্যামপেইন ফর রিয়েল এডুকেশন’ সংস্থা থেকে একটি মাত্র ‘নেতিবাচক’ চিঠি এসেছিল, যার মুখপাত্র নিক সিটন, তিনি বলেছিলেন যে, বহুবিশ্বাসভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা অত্যন্ত ক্ষতিকারক কারণ, ‘ইদানিং শিশুদের শেখানো হচ্ছে যে সব ধর্ম সমমানের, যার অর্থ হচ্ছে তাদের নিজের ধর্মের বিশেষত্ব কিছুই নেই’। হ্যা, আসলেই, এর অর্থ ঠিক সেটাই। এই মুখপাত্র এভাবেই চিন্তা করতে

পারেন। অন্য একটি পরিস্থিতিতে, এই একই ব্যক্তি বলেছিলেন, ‘সব ধর্মবিশ্বাস সমানভাবে সত্য, বিষয়টিকে এভাবে উপস্থাপন করা সঠিক নয়। তার নিজের ধর্মকে অন্যদের চেয়ে সেরা ভাবা অধিকার প্রত্যেকের আছে, হতে পারে তারা হিন্দু, ইহুদী, মসুলমান বা খ্রিস্টান, তা না হলে ধর্মবিশ্বাস থাকার কি দরকার (৪৭)?

আসলেই কি তাই? কি সুস্পষ্ট উদ্ভট একটি ধারণা ! এই বিশ্বাসগুলো সব পারস্পরিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যথায় আপনার নিজের বিশ্বাসকে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাবার অর্থ কি হতে পারে? অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাস, সেকারণে, ‘অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ’ হতে পারে না। শিশুদের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে শিখতে দেয়া হোক, ধর্মগুলোর অসামঞ্জস্যতাগুলো তাদেরকে ধরতে দিন, এবং এইসব অসংগতি সংক্রান্ত নিজস্ব উপসংহারে পৌঁছাতে সহায়তা করুন। এবং এদের মধ্যে কোনটি সঠিক, সে বিষয়ে তারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে শুধুমাত্র তখনই তাদের মনস্থির করার সুযোগ দিন।

সাহিত্য সংস্কৃতির অংশ হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষা

অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, আমি বেশ অবাক হই, সাম্প্রতিক দশকে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে যখন বাইবেল সম্বন্ধে আমার চেয়েও সাধারণ জ্ঞানের অভাব দেখি। অথবা হয়তো এটি দশকের ব্যপার না, এমনকি সেই ১৯৫৪ সালেও, রবার্ট হিন্ডের (৪৮) চিন্তা জাগানিয়া ‘হোয়াই গডস পারসিস্ট’ বইয়ে উল্লেখিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি মতামত জরিপের ফলাফল বলছে, তিন-চতুর্থাংশ ক্যাথলিক এবং প্রটেস্টান্টদের একজনও ওল্ড টেস্টামেন্টে উল্লেখিত কোনো প্রফেট বা নবীর নাম বলতে পারেননি। দুই-তৃতীয়াংশ জানেনই না ‘সারমন অন দ্য মাউন্ট’ কে দিয়েছিলেন: উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ মনে করেন মোজেস যীশুর বারো জন অ্যাপোষ্টল বা অনুসারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই জরিপটি, আবারো মনে করিয়ে দিচ্ছি.. করা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে.. উন্নত পৃথিবীর যে-কোনো দেশের তুলনায় যে দেশটি নাটকীয়ভাবে ধর্মপ্রিয় (৪৯)।

১৬১১ সালে কিং জেমস বাইবেলের (৫০) স্বীকৃত সংস্করণে বেশ কিছু অনুচ্ছেদ আছে যেগুলোর দারুণ সাহিত্যগুণকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যেমন, ‘সং অব সংস’ এবং অনন্য ‘একলিসিয়াসটেস’ (আমি শুনেছি যা মূল হিব্রুতেও নাকি অসাধারণ)। ইংরেজী বাইবেল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হওয়া উচিত, আর তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমাদের সাহিত্য সংস্কৃতিতে এটি অন্যতম একটি উৎস গ্রন্থ। বিষয়টি গ্রিক ও রোমান দেবদেবীদের পুরাণ কাহিনীর ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য। বিশ্বাস স্থাপন করার কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াও আমরা সেখান থেকে বেশ কিছু বিষয় সম্বন্ধে শিখতে পারি। এখানে আমি একটি তালিকা প্রস্তুত করেছি, যে বাক্যগুলো বাইবেল থেক নেয়া বা বাইবেল অনুপ্রাণিত, এবং ইংরেজী সাহিত্য বা কথোপকথনে যে শব্দগুলো সচরাচরই

আমরা খুঁজে পাই... মহান কবিতা থেকে আটপৌরে বহুব্যবহৃত নানা বাক্যে.. প্রবাদ থেকে শুরু করে গালপপ্পে, যেমন:

Be fruitful and multiply • East of Eden • Adam's Rib • Am I my brother's keeper?• The mark of Cain • As old as Methuselah • A mess of potage • Sold his birthright •Jacob's ladder • Coat of many colours • Amid the alien corn • Eyeless in Gaza • The fat of the land • The fatted calf • Stranger in a strange land • Burning bush • A landflowing with milk and honey • Let my people go • Flesh pots • An eye for an eye and a tooth for a tooth • Be sure your sin will find you out • The apple of his eye • The stars in their courses • Butter in a lordly dish • The hosts of Midian • Shibboleth • Out of the strong came forth sweetness • He smote them hip and thigh • Philistine • A man after his own heart • Like David and Jonathan • Passing the love of women • How are the mighty fallen? • Ewe lamb • Man of Belial • Jezebel • Queen of Sheba • Wisdom of Solomon • The half was not told me • Girded up his loins • Drew a bow at a venture • Job's comforters • The patience of Job • I am escaped with the skin of my teeth • The price of wisdom is above rubies • Leviathan • Go to the ant thou sluggard; consider her ways, and be wise • Spare the rod and spoil the child • A word in season • Vanity of vanities • To everything there is a season, and a time to every purpose • The race is not to the swift, nor the battle to the strong • Of making many books there is no end • I am the rose of Sharon • A garden inclosed • The little foxes • Many waters cannot quench love • Beat their swords into plowshares • Grind the faces of the poor • The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the kid • Let us eat and drink; for tomorrow we shall die • Set thine house in order • A voice crying in the wilderness • No peace for the wicked • See eye to eye • Cut off out of the land of the living • Balm in Gilead • Can the leopard change his spots? • The parting of the ways • A Daniel in the lions' den • They have sown the wind, and they shall reap the whirlwind • Sodom and Gomorrah • Man shall not live by bread alone • Get thee behind me Satan • The salt of the earth • Hide your light under a bushel • Turn the other cheek • Go the extra mile • Moth and rust doth corrupt • Cast your

> pearls before swine • Wolf in sheep's clothing • Weeping and gnashing of teeth • Gadarene swine • New wine in old bottles • Shake off the dust of your feet • He that is not with me is against me •Judgement of Solomon • Fell upon stony ground • A prophet is not without honour, save in his own country • The crumbs from the table • Sign of the times • Den of thieves • Pharisee • Whited sepulchre • Wars and rumours of wars • Good and faithful servant • Separate the sheep from the goats • I wash my hands of it • The sabbath was made for man, and not man for the sabbath • Suffer the little children • The widow's mite • Physician heal thyself • Good Samaritan • Passed by on the other side • Grapes of wrath • Lost sheep • Prodigal son • A great gulf fixed • Whose shoe latchet I am not worthy to unloose • Cast the first stone • Jesus wept • Greater love hath no man than this • Doubting Thomas• Road to Damascus • A law unto himself • Through a glass darkly • Death, where is thy sting? • A thorn in the flesh • Fallen from grace • Filthy lucre • The root of all evil • Fight the good fight • All flesh is as grass • The weaker vessel • I am Alpha and Omega • Armageddon • De profundis • Quo vadis • Rain on the just and on the unjust

এই প্রত্যেকটি প্রবাদ, বাক্য বা বহুব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ এসেছে কিং জেমস বাইবেলের স্বীকৃত সংস্করণ থেকে। নিঃসন্দেহে বাইবেল সম্বন্ধে কারো অজ্ঞতা ইংরেজী সাহিত্য অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে উঠবে, এবং সেটি শুধু ভারী গম্ভীর কোনো সাহিত্য ক্ষেত্রেই নয়। নীচে লর্ড জাস্টিস বোয়েনের বুদ্ধিদীপ্ত ছড়াটি লক্ষ করুন (৫১):

> The rain it raineth on the just,
> And also on the unjust fella.
> But chiefly on the just, because
> The unjust hath the just's umbrella.

কিন্তু এই কবিতাটি বোঝার সেই মজা বেশ খানিকটা কমে যায়, যদি আপনি ম্যাথিউর ৫:৪৫ এর প্রতি এর ইঙ্গিতটি বুঝতে না পারেন ('For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust')। এবং My Fair Lady র এলিজা ডুলিটলের (৫২) কল্পনার

সূক্ষ্ম বক্তব্যটি অধরা থেকেই যাবে তাদের কাছে, যারা কিনা জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের (৫৩) পরিণতির কথা জানেন না।

> 'Thanks a lot, King,' says I in a manner well bred,
> 'But all I want is 'Enry 'Iggins' 'ead.'

আমি অন্তত বাজি রেখে বলতে পারি, ইংরেজী ভাষায় হালকা হাস্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন পি. জি. উডহাউস, এবং আমি আরো বাজি রাখতে পারবো বাইবেল থেকে সংগৃহীত বাক্যের উপরের তালিকাটির অর্ধেকেরও বেশি তার লেখায় খুঁজে পাওয়া যাবে। (গুগল সার্চ সবগুলো হয়তো খুঁজে পাবে না, যেমন অবশ্য তার ছোটো গল্পের শিরোনাম 'The Aunt and the Sluggard' এর সাথে প্রোভার্বস ৬:৬ অনুচ্ছেদটির প্রতি ইঙ্গিত হয়তো গুগল খুঁজে পাবে না); উডহাউসের বইয়ে আরো বহু বাইবেলের বাক্য আছে, যা উপরের তালিকাটিতে নেই এবং বাগধারা বা প্রবাদ বাক্য হিসাবে যা এখনো আমাদের ভাষার অংশ হয়নি। যেমন বার্টি উস্টারের (৫৩) মুখে শুনুন আগের রাতে অতিরিক্ত মদ্যপানের পর সকালে খারাপ লাগার সেই অনুভূতিটি কেমন হতে পারে : ‘আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম, একজন অসভ্য মানুষ আমার মাথার মধ্য লোহার কাটা ঢুকিয়ে দিচ্ছে, সাধারণ লোহার কাটা না হেবেরে বউ জায়েল যা ব্যবহার করেছিল, তপ্ত লাল’। বার্টি নিজেও ভীষণ গর্বিত ছিলেন তার একটি অর্জন নিয়ে, ধর্মীয় গ্রন্থের জ্ঞান যাচাইয়ের পরীক্ষায় একবার তিনি পুরষ্কার জিতেছিলেন।

ইংরেজী ভাষার হাস্যরসাত্মক লেখার ক্ষেত্রে যা সত্য, গুরুগম্ভীর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সেটি অবশ্যই সত্য। শেক্সপিয়ারের সামগ্রিক কাজে প্রায় ১৩০০ বাইবেলের প্রতি ইঙ্গিতবহ বাক্যের একটি তালিকা করেছেন নাসিব শাহীন (৫৫), যা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখিত হয় ও খুবই বিশ্বাসযোগ্য (৫৬)। ফেয়ারফ্যাক্স ভার্জিনিয়া থেকে প্রকাশিত ‘দ্য বাইবেল লিটেরেসি রিপোর্টে’ (কুখ্যাত টেম্পলটন ফাউণ্ডেশনের অর্থে প্রকাশিত) আরো উদাহরণ দেখা যায়, এবং যা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইংরেজী সাহিত্যের শিক্ষকদের ঐক্যমত উল্লেখ করে জানাচ্ছে বাইবেল সম্বন্ধে জ্ঞান সাহিত্য বিষয়টি সম্পূর্ণ বোঝার জন্য আবশ্যক (৫৭)। সন্দেহ নেই ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইটালীয়, এসপানিওলসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় ভাষায় লেখা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরবী আর উপমহাদেশীয় ভাষাভাষীদের জন্য, কোরান বা ভগবৎ গীতা সম্বন্ধে ধারণা হয়তো তাদের সাহিত্যের পূর্ণ স্বাদ পেতে ঠিক এমনভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। পরিশেষে সেই তালিকা পূর্ণ করার জন্য, বলতে হচ্ছে নর্স বা স্ক্যান্ডিনেভিয় পুরাণে বর্ণিত দেবদেবীদের সম্বন্ধে না জানলে আপনি ভাগনারের (৫৮) সঙ্গীতের মূল রস আস্বাদন করতে পারবেন না (যার সঙ্গীত সম্বন্ধে বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ একটি মন্তব্য হচ্ছে এটি শুনতে যত ভালো লাগে তার চেয়েও অনেক বেশি ভালো)।

অতএব বিষয়টি নিয়ে আর কষ্ট না করি, আমি সম্ভবত যথেষ্ট বলেছি অন্ততপক্ষে আমার বয়স্ক পাঠকদের বোঝানোর জন্য যে, একটি নিরীশ্বরবাদী জীবন ও পৃথিবী ভাবনা কিন্তু বাইবেল বা অন্য কোনো পবিত্র গ্রন্থকে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে বাদ দেবার পক্ষে কোনো যুক্তি দেখে না। অবশ্যই আমরা একটি আবেগময় আনুগত্য বজায় রাখতে পারি, যেমন ধরুন জুডাইজম, অ্যাংলিকানিজম বা ইসলামের সাংস্কৃতিক বা সাহিত্যিক ঐতিহ্যর প্রতি, এমনকি আমরা অংশও নিতেও পারি নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে, যেমন, বিবাহ আর কোনো শেষকৃত্য অনুষ্ঠান, আর এই কাজটি অতিপ্রাকৃত কিছুর উপর বিশ্বাস না করেই করা সম্ভব, যা এইসব ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানের সাথে ঐতিহাসিকভাবে জড়িত। আমরা মূল্যবান একটি ঐতিহ্যের প্রতি নিজেদের সংযোগ না হারিয়েও ঈশ্বর-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করতে পারি।

টীকা:

(১) এডগার্দো লেভি মোরতারা (১৮৫১-১৯৪০) ইতালী বোলোনিয়া শহরে ইহুদী পরিবারে জন্ম নেয়া মোরতারাকে পোপের কর্মকর্তারা তার পিতামাতার নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ক্যাথলিক হিসাবে প্রতিপালন করেছিলেন, পরে তিনি যাজক হয়েছিলেন।
(২) রোমান ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠান, যাদের মূল কাজ ছিল হেরেসি বা ধর্মীয় ভিন্নমতাবম্বীদের প্রতিরোধ করা। এর সুচনা হয়ে ফ্রান্সে দ্বাদশ শতকে।
(৩) David I. Kertzer. The Kidnapping of Edgardo Mortara.1998
(৪) স্পেন ও পর্তুগীজ সেনা সদস্য ও অভিযাত্রীরা, যারা পৃথিবীর বহু অংশে উপনিবেশ সৃষ্টি করেছিল।
(৫) এই উক্তিটি ধারণা করা হয় হিউ লাটিমার, নিকোলাস রিডলীর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছিলেন, তাদের একই সাথে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে।
(৬) অক্সফোর্ডের শহীদ হিসাবে পরিচিত, অ্যাঙলিকান বিশপ হিউ লাটিমার, নিকোলাস রিডলী ও ক্যান্টারবুরীর আর্চ বিশপ টমাস ক্রানমারকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ১৫৫৫ সালে।
(৭) সালেম উইচ ট্রায়াল হিসাবে ইতিহাসে পরিচিত যুক্তারষ্ট্রের (ওখন ব্রিটিশ উপনিবেশ) ম্যাসাচুসেটস (প্রধানত সালেম নামে একটি গ্রামে) ১৬৯২/৯৩ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বেশ কিছু শুনানী যেখানে বিশ জন নারীকে ডাইনীবিদ্যা চর্চা করার অভিযোগ এনে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল।
(৮) এটি রিপোর্ট করেছিল বিবিসি নিউজ: http://news.bbc.co. Uk/l/ hi/wales/901723.stm. জাস্ট
(৯) উইলিয়াম, স্কুলের বালক উইলিয়াম ব্রাউন চরিত্রকে নিয়ে লেখা রিচমাল ক্রম্পটন ল্যাম্বাবানের লেখা প্রথম উপন্যাস (১৯২২);
(১০) মার্ক টোয়াইন এর অ্যাডভেঞ্চার অফ হাকেলবেরি ফিন চরিত্র হাকেলবেরি ফিন (১৮৮৫)।
(১১) ব্রিটিশ লেখক আর্থার রানসোমের ধারাবাহিক শিশুতোষ উপন্যাস সোয়ালোস অ্যান্ড অ্যামাজনের চরিত্ররা (১৯৩০)
(১২) Loftus, E. and Ketcham, K. (1994). The Myth of Repressed Memory:False Memories and Allegations of Sexual Abuse. New York: St Martin's.
(১৩) আইরিশ টাইমস এ জন ওয়াটারস: http://oneinfour. org/news/ news2003/ roots/.
(১৪) Peter Mullan. The Magdalene Sisters, Irish-British drama film. (2002)

(১৫) Associated Press, 10 June 2005: http:/ /www. rickross. com/ reference/ clergy/ clergy426.html
(১৬) The Root of All Evil? পরবর্তীতে নামকরণ করা হয়েছে -The God Delusion, রিচার্ড ডকিন্সের উপস্থাপনা ও গ্রন্থনায় নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র। ব্রিটিশ চ্যানেল চোর টেলিভশিন চ্যানেলে এটি সম্প্রচার করা হয় ২০০৬ এ।
(১৭) আমি সাক্ষাৎকারের জন্য ক্যান্টারবুরীর আর্চবিশপ, ওয়েষ্টমিনিষ্টারের কার্ডিনাল আর্চবিশপ ও ব্রিটেন এর প্রধান রাবাই এর কাছে আবেদন পাঠিয়েছিলাম, তারা সবাই সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সন্দেহ নেই ভালো কোনো কারণে নিশ্চয়ই। অক্সফোর্ডের বিশপ রাজী হয়েছিলেন এবং তিনি আসলেই চমৎকার একটি মানুষ, এবং চরমপন্থা থেকে তার অবস্থান বহু দূরে, যেমনটা হওয়ার কথা।
(১৮) যদি নীচের ঘটনাট সত্যি বলে মনে হচ্ছে যদিও আমি প্রথমে বিষয়টিকে ব্যঙ্গাত্মক একটি স্কেচ বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, The Onion: www. talk2action. org/story/ 2006/5/29/l 95 855/959.; এটি আসলে একটি কম্পিউটার গেম যার নাম - Left Behind: Eternal Forces। পি. জে. মায়ারস তার অসাধারণ ফ্যারিঙ্গুলা ওয়েব সাইটে ব্যপারটির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরেছিলেন: কল্পনা করুন, আপনি হচ্ছে একজন পদাতিক সৈন্য কোনো একটি আধা-সামরিক বাহিনীর, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যুক্তরাষ্টকে একটি খ্রিস্টীয় ধর্মতন্ত্রে রূপান্তরিত করা এবং জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে খ্রিস্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দেয়া; আপনি একটি মিশনের দায়িত্বে, যে মিশনের দ্বায়িত্ব ধর্মীয় এবং সামরিক ক্যাথলিক, ইহুদী, বৌদ্ধ, সমকামি এবং যারাই রাষ্ট্র থেকে চার্চের পৃথক থাকা সমর্থন করেন, তাদের হয় হত্যা করা হবে নয়তো ধর্মান্তর করাতে হবে: ‘এখানে দেখুন: http:// scienceblogs. com/ pharyngula/ 2006/05/
(১৯) http://www.avl611.org/hell.html.
(২০) অ্যান কোলটারের চমৎকার খ্রিস্টীয় দয়ার নমুনার তুলনা করতে পারেন : ‘আমি আমার যে কোনো সহ-ধর্মযোদ্ধাদের চ্যালেঞ্জ করি, তারা আমাকে বলুক, নরকের আগুনে ডকিন্সের দগ্ধ হবার কথা ভেবে তারা তৃপ্তির হাসি হাসেন না।’
(২১) Julia Anne Sweeney, যুক্তরাষ্ট্রের অভিনেত্রী,কমেডিয়ান ও লেখক, তার তৃতীয় আত্মজীবনীমূলক মনোলোগ শোটির নাম Letting Go of God;
(২২) Dan Barker. Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist.
(২৩) Sticks and Stones, ইংরেজী ভাষায় লেখা শিশুতোষ একটি ছড়া। ধারণা করা হয় ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে African Methodist Episcopal Church এর একটি প্রকাশনায় এটি প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল। মূলত এটি শিশুদের নিষেধ করে কোনো তিরষ্কারকে উপেক্ষা করতে, শারীরিক কোনো আক্রমণ এড়িয়ে শান্ত থাকতে:
Sticks and stones will break my bones/ But words will never harm me;
(২৪) N. Humphrey, 'What shall we tell the children?', Williams, W, ed. (1998). The Values of Science: Oxford Amnesty থেকে। পুনর্মূদ্রিত করা হয়েছিল: Humphrey, N. (2002). The Mind Made Flesh: Frontiers of Psychology;
(২৫) দক্ষিণ আমেরিকার আদি বাসী জাতি ইনকা, পঞ্চদশ শতকে স্প্যানিশ আগ্রাসনকারী কনকিস্টাডদের আক্রমণের পূর্বে পুরো দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলো।
(২৬) ব্রিটেনে এটি নিত্য ঘটনা এখন। একজন উর্ধ্বতন স্কুল পরিদর্শক আমাকে বলেছিল লন্ডনের একটি মেয়ে সম্বন্ধে, ২০০৬ সালে যাকে তার ব্রাডফোর্ডে আত্মীয়র বাসায় পাঠানো হয়েছি খতনা করার জন্য। কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কোনো মন্তব্য করেনি, তাদের কমিউনিটিতে সাম্প্রদায়িক চিহ্নিত হবার ভয়ে।
(২৭) আমিশ, প্রাচীনপন্থী খ্রিস্টান ধর্মগোষ্ঠী, যারা আধুনিক যুগের সব সুবিধা বর্জন করে সাধারণ জীবন ধারণ করে থাকে। আমিশদের সুচনা হয়েছিল সুইজারল্যান্ডে একটি ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে, ১৬৯৩ সালে যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জ্যাকব আম্মান। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে আমিশ এবং সম্পর্কযুক্ত তবে ভিন্ন, মেনোনাইটরা যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় বসতি গড়েন নানা কারণে। এখনো তাদের উত্তরসূরীরা

যারা সেই পুরোনো ধারা ধরে রেখেছেন, তারা পেনসিলভেনিয়া জার্মান বা পেনসিলভেনিয়া ডাচ ভাষায় কথা বলেন।

(২৮) হাসিডিক ইহুদীরা অর্থোডক্স ইহুদীদের একটি গ্রুপ, যারা ইহুদী আধ্যাত্মিকতাবাদকে তাদের ধর্মের সাথে একাত্ম করা প্রচেষ্টা করেছেন।

(২৯) জিপসী শব্দটি ইংরেজী ভাষাভাষীদের কাছে রোমানী বা রোমা জাতিগোষ্ঠীকে ইঙ্গিত করে। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা রোমা জনগোষ্ঠী বেশির ভাগ অংশের বাস ইউরোপে। ধারণা করা হয় তারা ইউরোপে এসে পৌঁছেছে প্রায় ১০০০ বছর আগে। জাতিগতভাবে তাদের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। তাদের পূর্বসূরিরা ডোম জাতিগোষ্ঠীর মতোই ষষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময় ভারত ছেড়ে এসেছিল।

(৩০) http://www.law.umkc.edu/faculty/projects/ ftrials/conlaw/ yoder.html.

(৩১) টনি ব্লেয়ার, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।

(৩২) Guardian, 15 Jan. 2005: http:// www.guardian.co.uk/ weekend/ story/ 0,,1389500,00.html.

(৩৩) এইচ এল মেনকেন (যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিক ও লেখক) এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী.. প্রতিটি ইভানজেলিষ্ট এর হৃদয়ে থাকে একজন ব্যর্থ গাড়ির সেলসম্যান।

(৩৪) Times Educational Supplement, 15 July 2005.

(৩৫) www.christian.org.uk

(৩৬) https://www.telegraph.co.uk./ weekend/storyéopinion/ main.jhtml/ xml=/ opinion/2002/03/18/do1801.xml

(৩৭) http://www.darwinwars.com/lunatic/liars/layfield.html

(৩৮) Guardian, 15 Jan. 2005: http://www.guardian.co.uk/ weekend/story/ 0,, 1389500,00.html.

(৩৯) আমাদের চিঠির বিষয়বস্তু, অক্সফোর্ডের বিশপ যা প্রস্তুত করেছিলেন, সেটি ছিল এরকম: এই চিঠিটি আমরা কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং বিশপ একত্রে লিখেছি গেটসহেডে ইমানুয়েল সিটি টেকনোলজি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যপারে আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিবর্তন শক্তিশালী ব্যাখ্যাকারী বৈজ্ঞানিক একটি তত্ত্ব, জ্ঞানের একাধিক শাখায় যা বহু ধরনের প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সাক্ষ্যপ্রমাণ নিবিড় বিশ্লেষণে এটিকে পরিশীলিত, নিশ্চিতকরণ, এবং বৈপ্লবিক মাত্রায় পরিবর্তন করা যেতে পারে। কলেজের মূখপাত্র যেমন দাবী করেছেন এটি কোনো 'বিশ্বাসভিত্তিক অবস্থান' নয়, যা কিনা সৃষ্টি সংক্রান্ত বাইবেলের ব্যাখ্যার সাথে একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, যে ব্যাখ্যার ভিন্ন কাজ ও উদ্দেশ্য আছে। বিষয়টি বর্তমানে কোনো একটি কলেজে কি পড়ানো হচ্ছে তার চেয়ে আরো ব্যাপক তাৎপর্য বহন করে। এই সব নতুন প্রজন্মের প্রস্তাবিত ধর্মবিশ্বাস নির্ভর স্কুলগুলোয় কি পড়ানো হবে এবং কিভাবে সেগুলো পড়ানো হবে সেই বিষয়ে ক্রমশ উদ্বেগ বাড়ছে। আমরা বিশ্বাস করি বিজ্ঞান এবং ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়গুলো তাদের নিজেদের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে গুরুত্ব দেবার লক্ষ্যে এই স্কুলগুলোর এবং ইমানুয়েল সিটি টেকনিকাল কলেজে পাঠ্যসূচি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন আছে।

(৪০) Office for Standards in Education, Children's Services and Skills.

(৪১) British Humanist Association News, March-April 2006

(৪২) ভুলের মাত্রাটি বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণটি ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন কেউ যদি বলেন, নিউ ইয়র্ক থেকে সান ফ্রান্সিসকো দূরত্ব মাত্র ৭০০ গজ। ভুলটা সেই মাত্রার যখন কেউ বলেন পৃথিবীর বয়স মাত্র ৬০০০ বছর।

(৪৩) Observer, 22 July 2004: http://observer.guardian.co.uk/ magazine/ story/ 0,11913,1258506,00.html.

(৪৪) কাইনেশিয়ান একটি অর্থনৈতিক মতবাদ।

(৪৫) মনেটারিষ্ট, একটি অর্থনৈতিক মতবাদ।
(৪৬) অক্সফোর্ড ডিকশনারী ‘গে’ শব্দটার উৎস হিসাবে উল্লেখ করেছে ১৯৩৫ সালে আমেরিকার জেলখানায় ব্যবহৃত একটি কটু বাক্য হিসাবে। ১৯৫৫ সালে পিটার ওয়াইল্ডব্লাড, তার বিখ্যাত বই ‘এগেনেইষ্ট দ্য ল’ এ ‘গে’ শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করতে প্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন সমকামিতার একটি আমেরিকান সুভাষণ হিসাবে।
(৪৭) http://uepengland.com/forum/index.php?showtopic= 184&mode=linear.
(৪৮) রবার্ট হিন্ড, ব্রিটিশ প্রাণীবিজ্ঞানী।
(৪৯) Robert A. Hinde. Why Gods Persist: A Scientific Approach to Religion:
(৫০) কিং জেমস বাইবেল - খ্রিস্টীয় বাইবেলের এর ইংরেজী অনুবাদ, যা করা হয়েছিল চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের জন্য (১৬০৪ থেকে ১৬১১);
(৫১) বিচারপতি চার্লস বোয়েন (১৮৩৫-১৮৯৪), ব্রিটিশ বিচারক:

বৃষ্টি সৎ মানুষের উপর পড়ে. এবং অসৎ মানুষের উপরও পড়ে
কিন্তু মূলত সৎ মানুষের উপর, কারণ অসৎ মানুষের কাছে আছে সৎ মানুষদের ছাতা।

(৫২) জর্জ বার্নাড শ’র পিগম্যালিয়ন নাটকটির উপর নির্মিত মিউজিক্যালটি, যার অন্যতম প্রধান চরিত্র ছিল এলিজা ডুলিটল।
(৫৩) সেইন্ট জন দি ব্যাপ্টিষ্ট (ইসলামে ইয়াহিয়া) খ্রিস্টান ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় চরিত্র। গসপেল এর কাহিনী অনুযায়ী গ্যালীলির রাজা হেসড জন দি ব্যাপটিষ্টকে আটক করেছিলেন, তার জন্মদিনের দিন তার দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার মেয়ে সালোম এর ইচ্ছানুযায়ী জন দি ব্যাপটিষ্ট এর গলা কাটা হয়।
(৫৪) পি জি উডহাউস এর জীভস উপন্যাসের চরিত্র।
(৫৫) নাসিব আজীজ শাহীন (১৯৩১-২০০৯) যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজী সাহিত্যের গবেষক।
(৫৬) শাহীন মোট তিনটি বই লিখেছেন, আলাদা আলাদা ভাবে কমেডি, ট্রাজেডি এবং ইতিহাসের বাইবেল তথ্যসূত্রগুলো সংকলিত করে। ১৩০০ সংখ্যাটি উল্লেখিত হয়েছে: http://www. Shakespeare fellowship. org/ virtualclassroom/ StritmatterShaheenRev.htm
(৫৭) http://www.bibleliteracy.org/Secure/Documents/Bible Literacy Report 2005
(৫৮) ভিলহেইম রিচার্ড ভাগনার (১৮১৩-১৮৮৩) জার্মান সঙ্গীতজ্ঞ।

১০ অধ্যায় দশ
একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শূন্যস্থান?

‘একশ ইঞ্চি টেলিস্কোপে চোখ রেখে বহু দূরের কোনো ছায়াপথ দেখা বা ১০০ মিলিয়ন বছরের প্রাচীন কোনো জীবাশ্ম কিংবা ৫০০,০০০ বছর পুরোনো কোনো পাথরে গড়া যন্ত্র হাতে মুঠোয় ধরা বা বিশাল সময় আর শূন্যতার সেই অতিক্রমণ যা কিনা আজ গ্রান্ড ক্যানিয়ন, তার সামনে দাড়ানো কিংবা অপলক দৃষ্টিতে মনোযোগের সাথে কোনো বিজ্ঞানীর কথা শোনা, যিনি এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্যকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, এইসব কিছুর চেয়ে আত্মাকে আমূল নাড়িয়ে দেবার মত আসলেই আর কি আছে? এটাই তো গভীর আর পবিত্র বিজ্ঞান’। - মাইকেল শেরমার

‘এই বইটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি শূন্যস্থান পূরণ করবে’। এই ঠাট্টাটি কাজ করে কারণ, আমরা যুগপৎভাবে এর দুটো ভিন্ন আর বিপরীত অর্থ বুঝতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে, আমি অন্তত মনে করি যে, এটি আসলে উদ্ভাবিত চাতুর্যপূর্ণ একটি উক্তি। কিন্তু আন্তরিকতা ও পূর্ণ মাত্রার সরলতাসহ প্রকাশকদের দ্বারা এই বাক্যটি ব্যবহৃত হতে দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। যেমন, আমাজন.কো.ইউকে সাইটে ‘দ্য টেল কেল রিডার’ বইটি দেখুন (১), বইটির প্রকাশক দাবী করেছেন যে এই বইটি “উত্তর-কাঠামোবাদী আন্দোলন সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রকাশনাসমূহে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি শূন্যস্থান করবে”। আপাতদৃষ্টিতে সঠিকভাবেই প্রযোজ্য যে সুস্পষ্টভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বইটি সম্পূর্ণভাবে মিশেল ফুকো, রোল্যাঁ বার্থ, জুলিয়া ক্রিষ্টেভা এবং ফ্রাঙ্কোফোনিজমের অন্যান্য উচ্চস্তরে দার্শনিকদের নিয়ে।

কিন্তু ধর্ম কি খুব প্রয়োজনীয় একটি শূন্যস্থান পূরণ করে? প্রায়ই বলা হয় আমাদের মস্তিষ্কে ঈশ্বর আকৃতির একটি শূন্যস্থান আছে, যা পূর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে: ঈশ্বরের জন্য আমাদের একটি মনোস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা কিংবা চাহিদা আছে - একজন কাল্পনিক বন্ধু, বাবা কিংবা বড় ভাই, আমাদের সব স্বীকারোক্তির শ্রোতা, যার কাছে আমরা মনের গোপন কথা বলতে পারি। ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকুক বা না থাকুক, এই চাহিদাটি সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা আছে এবং আমরা সেটা পূরণ করার তাগিদ অনুভব করি। কিন্তু এমনকি হতে পারে না যে, ঈশ্বর সেই স্থানটি বেদখল করে রেখেছেন, যা কিনা অন্য কিছু দিয়ে পূর্ণ করাই আমাদের জন্য উত্তম হতো? হয়তো বিজ্ঞান? শিল্পকলা? মানুষের বন্ধুত্ব? মানবতা? মৃত্যু পরবর্তী কোনো জীবনকে বিশ্বাসযোগ্যতা না দিয়ে বাস্তব পৃথিবীতে এই জীবনের জন্য ভালোবাসা? প্রকৃতির জন্য ভালোবাসা বা তেমন কোনো কিছু, বিখ্যাত কীটতত্ত্ববিদ ই. ও. উইলসন যার নাম দিয়েছিলেন বায়োফিলিয়া (২)?

কোনো না কোনো এক সময় ভাবা হতো যে, ধর্ম মানব জীবনে প্রধান চারটি দ্বায়িত্ব পালন করে থাকে: ব্যাখ্যা বা কার্যকারণ বর্ণনা, উপদেশ বা প্রণোদন, সান্ত্বনা এবং অনুপ্রেরণা। ঐতিহাসিকভাবে ধর্ম আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব বা এই মহাবিশ্ব, যেখানে আমরা বাস করছি তার প্রকৃতি ‘ব্যাখ্যা’ করার প্রচেষ্টা করেছে । আর এখন এই দ্বায়িত্ব পালনে এটিকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করে গেছে বিজ্ঞান, এবং এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে আমি বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উপদেশ (বা পরামর্শ বা প্রণোদন) বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি নৈতিক সেই সব নির্দেশাবলী, যা আমরা কিভাবে আচরণ করবো সেই বিষয়ে নির্দেশনা বা উপদেশ দেয়, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে যে বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। তবে সান্ত্বনা দেয়া আর অনুপ্রাণিত করা এই দুটি বিষয়কে আমি যথেষ্ট সময় দিতে পারিনি, সেই কারণে এই শেষ অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করবো। সান্ত্বনা বিষয়টির সূচনা পর্ব

হিসাবে আমি শৈশবের একটি প্রপঞ্চ বা খুব প্রচলিত ঘটনা, তথাকথিত ‘কাল্পনিক বন্ধু’ বিষয়টি দিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই, যা আমি বিশ্বাস করি ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বিঙ্কার

আমার ধারণা, ক্রিস্টোফার রবিন (৩) আসলেই নিজে বিশ্বাস করতেন না শূকরছানা (পিগলেট) (৪) আর উইনি-দি-পুহ (৫) আসলেই তার সাথে কথা বলতো। কিন্তু ‘বিঙ্কার’ কি এর থেকে আলাদা?

> বিঙ্কার - আমি তাকে যে নামে ডাকি - আমার একান্ত গোপন একটি বিষয়
> এবং বিঙ্কার হচ্ছে সেই কারণ, যার জন্য কখনো আমি একা নই
> নার্সারীতে খেলার সময়, সিড়িতে বসে..
> যে কাজেই ব্যস্ত থাকি না কেন, বিঙ্কার সেখানে থাকে সব সময়ই।
>
> ওহ ! বাবা বুদ্ধিমান, খুব বুদ্ধিমান একজন মানুষ
> আর মা তো পৃথিবীর শুরুর থেকেই সবার সেরা
> আর ন্যানি তো ন্যানি এবং আমি যাকে ডাকি ন্যান..
>
> কিন্তু তারা কেউ পায় না বিঙ্কারকে দেখতে।
>
> বিঙ্কার সবসময় কথা বলে, কারণ আমি শেখাচ্ছি কিভাবে কথা বলতে হয়
> মাঝে মাঝে সে এই কাজটি করে মজার এক ধরনের শব্দ করে
> এবং মাঝে মাঝে সে এই কাজটি করতে চায় এক ধরনের গর্জন করে..
> আর তার জন্য সেই কাজটা আমার করতে হয় কারণ তার গলায় ব্যাথা।
>
> ওহ ! বাবা বুদ্ধিমান, খুব বুদ্ধিমান একজন মানুষ
> আর মা তো সব জানেন যা কিছু জানা সম্ভব,
> আর ন্যানি তো ন্যানি, আমি তাকে ন্যান বলেই ডাকি
>
> কিন্তু তারা বিঙ্কারকে চেনেন না।
>
> বিঙ্কার সাহসী সিংহের মত যখন আমরা পার্কে দৌড়াই
> বিঙ্কার বাঘের মত সাহসী যখন আমরা অন্ধকারে শুয়ে থাকি
> বিঙ্কার হাতির মত সাহসী, সে কখনোই.. কখনোই কাঁদেনা,

শুধুমাত্র (অন্য মানুষদের মতো) যখন তার চোখে সাবান যায়।

ওহ বাবা তো বাবা, সে বাবার মত একজন মানুষ।
আর মা তো মা, যতটুকু কেউ মায়ের মত হতে পারে।
আর ন্যানী তো ন্যানী, আমি তাকে ন্যান বলেই ডাকি

কিন্তু তারা বিঙ্কারের মত না,

বিঙ্কার লোভী না, কিন্তু নানা কিছু খেতে সে ভালোবাসে
তাই কেউ যখন আমাকে চকলেট দেয়, তাদেরকে বলতে হয়
'ওহ, বিঙ্কার একটা চকলেট চায়, তাই আমাকে কি দুটো দেয়া যাবে?
আর তারপর আমি তার হয়ে খাই, কারণ তার দাঁতগুলো নতুন

বেশ আমি বাবাকে খুব ভালোবাসি, কিন্তু আমার সাথে খেলার সময় নেই তার;
আর মাকেও আমি খুব ভালোবাসি, কিন্তু মাঝেমাঝে তাকেও চলে যেতে হয় কাজে।
আর ন্যানির সাথে আমি রাগ করি প্রায়ই যখন সে জোর করে আমার চুল আঁচড়ে দিতে চায়...

কিন্তু বিঙ্কার সবসময় বিঙ্কার, সবসময় সে আমার সাথেই থাকে।

- এ. এ. মিল্ন, নাউ উই আর সিক্স (৬)

এই কাল্পনিক বন্ধুর বিষয়টি কি উচ্চ পর্যায়ের কোনো বিভ্রম, শৈশবের মনগড়া কল্পনা থেকে কি এটি ভিন্ন শ্রেণীর কিছু? এই বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা কোনো সহায়তা করবে না । অনেক বাবা-মায়ের মত আমার মা আমার শৈশবের নানা ছেলেমানুষি কথার বিস্তারিত রেকর্ড রাখতেন তার ডায়রীতে। সাধারণ কিছু ভান করা ছাড়াও (যেমন, এখন আমি চাঁদে বাস করা মানুষ..একজন ব্যাবিলনীয় বা একটা একসেলারেটর), আমার বিশেষ পছন্দ ছিল দ্বিতীয় স্তরের ভান করার খেলাগুলো (এখন আমি একটি প্যাঁচা, যে ওয়াটারহুইল এর রূপ ধরে বসে আছে), যা খুবই স্বতঃস্ফূর্ত (এখন আমি ছোটো একটা ছেলে, যে নিজেকে রিচার্ড বলে দাবী করছে), একবারও বিশ্বাস করিনি যে শুধুমাত্র কল্পনা করেই আমি আসলেই সেসব কিছু হয়ে গেছি। শৈশবের এই সব ভান করার সাধারণ শিশুসুলভ খেলায়, আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক সত্য, কিন্তু আমার কোনো 'বিঙ্কার' ছিল না। যাদের ছিল, এবং যদি তাদের প্রাপ্তবয়স্ক হবার পরে দেয়া স্বীকারোক্তিগুলোকে মেনে নেই, কমপক্ষে বেশ কিছু

স্বাভাবিক মানুষের দেখা মিলবে যাদের শৈশবে এই ধরনের কোনো একটি কাল্পনিক বন্ধু ছিল, যাদের অস্তিত্ব আছে বলে তারা সেই সময় সত্যি বিশ্বাস করতেন, এবং হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে চমৎকার সুখকর কোনো দৃষ্টিবিভ্রমে তারা এমনকি তাদের স্পষ্ট এবং জীবন্ত দেখতেও পেতেন । আমার সন্দেহ শৈশবের এই বিঙ্কার থাকার বিষয়টি প্রাপ্তবয়স্কদের ঈশ্বর ধারণায় বিশ্বাস বিষয়টি বোঝার জন্য একটি ভালো মডেল হতে পারে। আমার জানা নেই কোনো মনোবিজ্ঞানী সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন কিনা, কিন্তু এই বিষয়ে কোনো গবেষণা অর্থবহ হবার সম্ভাবনাই বেশি। সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত বন্ধু, সারাজীবনের জন্য বিঙ্কার: নিঃসন্দেহে ঈশ্বর এই একটি ভূমিকা পালন করছেন - একটি সম্ভাব্য শূন্যস্থানের সৃষ্টি হবে, যদি সেখান থেকে ঈশ্বরকে বাদ দিতে হয়।

অন্য একটি শিশু, একটি মেয়ে, তার ছোটো বেগুনী রঙের একজন বন্ধু ছিল, যে তার কাছে সত্যি এবং দৃশ্যমান একটি অস্তিত্ব, বাতাসে আলোকচ্ছটা ছড়িয়ে যে তার নিজেকে আবির্ভূত করতো হালকা টুং টাং একটি শব্দ তুলে। সে তার কাছে সবসময় আসে, বিশেষ করে যখন সে একা থাকে। কিন্তু তার বয়স বাড়ার সাথে এই দেখা হবার ব্যাপারটাও কমে যেতে থাকে। কিন্ডারগার্টেনে যাবার ঠিক আগে কোনো একটি নির্দিষ্ট দিনে এই ছোটো বেগুনী মানুষটি তার কাছে আসে, একই ভাবে বাতাসে হঠাৎ করে টুং টাং শব্দ করে সে দৃশ্যমান হয়, এবং ঘোষণা দেয় সে আর তার কাছে আসবে না। বিষয়টি শিশুটিকে বিষণ্ন করেছিল, কিন্তু ছোটো বেগুনী মানুষটি তাকে বলে, সে এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, আর তাকে আর তেমন প্রয়োজন নেই এখন, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হবে না। তাকে অবশ্যই ছেড়ে যেতে হবে, কারণ অন্য শিশুদের দেখাশোনা করতে হবে তাকে। তার কাছে অবশ্য সে প্রতিজ্ঞা করে যদি আসলেই কখনো তার প্রয়োজন হয় তবে সে দেখা দেবে অবশ্যই। বহু বছর পরে স্বপ্নে সত্যি সে ফিরে এসেছিল তার কাছে, যখন তার জীবনে একটি ব্যক্তিগত সমস্যা চলছিল, এবং তার জীবন নিয়ে সে কি করবে, বা কি সিদ্ধান্ত নেবে সেটি নিয়ে তাকে বেশ ভাবতে হচ্ছিল। তার শোবার ঘরের দরজা খুলে গিয়েছিল এবং এক বাক্স বই আবির্ভুত হয় সেখানে, যা ঠেলে তার ঘরে ঢুকিয়ে দেয় ছোটো বেগুনী রঙের সেই মানুষটি। সে এটার ব্যাখ্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার উপদেশ হিসাবে। যে উপদেশটা সে মেনেছিল এবং পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় কাজটি সে ঠিক করেছিল। এই গল্পটি আমাকে প্রায়ই অশ্রুসিক্ত করে এবং মানুষের জীবনে একটি কাল্পনিক ঈশ্বরের সান্ত্বনা এবং উপদেশ দেবার ভূমিকাটা বোঝার মত সবচেয়ে কাছাকাছি একটি অবস্থানে নিয়ে আসে। একটি সত্তা কেবল কল্পনায় যার অস্তিত্ব আছে, তারপরও কোনো শিশুর কাছে তা সম্পূর্ণ সত্য মনে হয়, এবং যা তাকে এখনো সান্ত্বনা আর পরামর্শ দেয়। হয়তো এমনকি আরো ভালো: যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের জন্য এই কাল্পনিক বন্ধু - কাল্পনিক ঈশ্বর - তাদের সবটুকু সময় আর ধৈর্য

নিয়ে মনোযোগ দিতে পারেন, এবং মনোবিজ্ঞানী বা পেশাজীবী কোনো পরামর্শকের তুলনায় তারা অবশ্যই যথেষ্ট সহজলভ্য।

ঈশ্বররা কি তাহলে, তাদের সান্ত্বনা আর উপদেশ প্রদানকারীর ভূমিকায় বিবর্তিত হয়েছেন কাল্পনিক বিঙ্কারদের থেকে, কোনো একধরনের মনোস্তাত্ত্বিক 'পিডোমরফোসিস' প্রক্রিয়ার মাধ্যমে? পিডো-মরফোসিস হচ্ছে প্রাপ্তবয়ষ্ক পর্বে শৈশবের কিছু বৈশিষ্ট্যের টিকে থাকা। 'পিকিনেস' কুকুরদের যেমন 'পিডোমরফিক' মুখমণ্ডল থাকে: অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক কুকুরদের মুখ শিশু কুকুরের মতো দেখতে হয়। এটি বিবর্তনের সুপরিচিত একটি বিন্যাস। ব্যাপকভাবেই মনে করা হয় যে, মানব শরীরের কিছু বৈশিষ্ট্য, যেমন, স্ফীত গোলাকার কপাল এবং ছোটো চোয়াল ইত্যাদির বিকাশের জন্য এই প্রক্রিয়াটিকে জরুরী। বিবর্তন বিশেষজ্ঞরা আমাদের জুভেনাইল এইপ বা তরুণ নরবানর হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং অবশ্যই এটি সত্য যে প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে, তরুণ শিম্পাঞ্জি আর গরিলারাই বরং মানুষের মতো সাধারণত দেখতে হয়ে থাকে। ধর্ম কি মূলত বিবর্তিত হতে পারে, প্রজন্মান্তরে, জীবনের সেই মুহূর্তগুলোর ক্রমান্বয়ে স্থগিতকরণের মাধ্যমে, যখন শিশুরা তাদের বিঙ্কার বা কাল্পনিক বন্ধুদের পরিত্যাগ করে, যেভাবে আমরা বিবর্তনের সময় আমাদের কপালের সমতলীকরণ আর চোয়ালের বহিঃসরণ প্রক্রিয়াকে মন্থর করেছিলাম।

আমার মনে হয়, পূর্ণতার খাতিরে আমাদের এর বিপরীত সম্ভাবনার কথাও ভাবা উচিত। প্রাচীন পূর্বসূরি বিঙ্কারদের থেকে ঈশ্বরদের বিবর্তিত হবার বদলে, আমাদের বরং ভাবা উচিত যে, এইসব বিঙ্কাররা কি প্রাচীন দেবতাদের থেকে বিবর্তিত হয়েছিল? আমার কাছে এটার সম্ভাবনাই কম মনে হয়। আমাকে বিষয়টি এভাবে ভাবিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী জুলিয়ান জেনেসের (৭) 'দি অরিজিন অব কনসাশনেস ইন দ্য ব্রেকডাউন অব দ্য বাইক্যামেরাল মাইন্ড' বইটি, এর নামের মতোই বইটাও অদ্ভুত। এটি সেই বইগুলোর মত, হয় এটি পুরোপুরি বাজে আর অসার একটি বই, অথবা কোনো একাগ্রচিত্তের চূড়ান্ত প্রতিভাবান কারো সৃষ্টি, এর মাঝামাঝি কিছু না, সম্ভবত এটি সারহীন কোনো বই, কিন্তু এখনো আমি আমার বাজি ধরছি না সে বিষয়ে।

জেনেস লক্ষ করেছিলেন, অনেকেই তাদের নিজেদের চিন্তার প্রক্রিয়াগুলোকে মাথার অভ্যন্তরে একজন 'প্রোটাগোনিস্ট বা মূখ্যচরিত্রের সাথে নিজেদের কথোপকথন' হিসাবে উপলব্ধি করে থাকেন। ইদানিং আমরা বুঝতে পারি এই দুই 'কণ্ঠস্বর' আসলে আমাদের নিজেদেরই, বা যদি সেটা না বুঝতে পারি তাহলে মানসিক রোগী হিসাবে আমাদের চিকিৎসা নিতে হয়। এটাই সংক্ষিপ্তভাবে হয়েছিল ইভলিন ওয়াহর (৮) ক্ষেত্রে। কখনোই চিবিয়ে চিবিয়ে কথা না বলার মানুষ ওয়াহ তার একজন বন্ধুর কাছে মন্তব্য করেছিলেন, "তোমাকে বহুদিন দেখিনি, কিন্তু আসলেই আমি খুব কম মানুষকেই

দেখেছি, কারণ কি তুমি জানো? আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম”। তার সুস্থ হবার পর, ওয়াহ ‘দি অরডিল অব গিলবার্ট পিনফোল্ড’ নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন, সেখানে তিনি সেই বিভ্রম আর তার শোনা কণ্ঠস্বরের বর্ণনা করেছিলেন।

জেনেস প্রস্তাব করেছিলেন যে, ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দের কিছু সময় আগে মানুষ সাধারণত এই দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরটির - গিলবার্ট পিনফোল্ডের কণ্ঠস্বর - ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, আসলেই তাদের কোনো ধারণাই ছিল না যে, এই কণ্ঠস্বর আসলে তাদের নিজেদের ভিতর থেকেই আসে। তারা ভেবেছিলেন এই ‘পিনফোল্ড’ কণ্ঠস্বর আসলেই কোনো দেবতা বা ঈশ্বর: যেমন, অ্যাপোলো বা আসতারটে বা ইয়াহয়ে বা খুব সম্ভবত কোনো ছোটোখাট গৃহপালিত দেবতা, নানা বিষয়ে যা তাদের উপদেশ বা নির্দেশ প্রদান করে। জেনেস এমনকি দেবতাদের এই কণ্ঠস্বরের উৎস চিহ্নিত করেছিলেন আমাদের কথা নিয়ন্ত্রণ করার মস্তিষ্ক যেখানে, তার বিপরীত অর্ধাংশে। জেনেসের প্রস্তাবনা হচ্ছে এই ‘বাইক্যামেরাল বা ‘দ্বি-প্রকোষ্ঠ’ মনের (৭) ভেঙ্গে পড়াটা’ ছিল ঐতিহাসিক একটি ক্রান্তিলগ্ন। এটি ইতিহাসের সেই মূহূর্ত যখন মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে, বাইরের যে আওয়াজটি তারা শুনছে বলে মনে করে এসেছে, সেটি আসলে তাদের ভিতরেই সৃষ্টি হচ্ছে। জেনেস এমনকি এই ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালীন মুহূর্তটিকে মানব সচেতনতা বা সজ্ঞানতার সূচনালগ্ন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন।

একটি প্রাচীন মিসরীয় অভিলিখন আছে সৃষ্টিকর্তা দেবতা পি’টাহ বা টাহ সম্বন্ধে, যেখানে অন্যান্য দেবতাদেরকে পি’টাহ’র কণ্ঠস্বর বা জিহবার নানা রূপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আধুনিক অনূবাদগুলো আক্ষরিকার্থে কণ্ঠস্বর শব্দটিকে বাদ দিয়েছে এবং অন্যান্য দেবতাদের ব্যাখ্যা দিয়েছে তার (পি’টাহ’র) মনেরই ইন্দ্রিয়গোচর সত্তা হিসাবে। জেনেস এই ধরনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করেছেন, বরং এর আক্ষরিক অর্থটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দেবতারা হচ্ছেন শব্দবিভ্রমের কারণে সৃষ্ট কণ্ঠস্বর, যা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে কথা বলে। জেনেস আরো প্রস্তাব করেছিলেন এই ধরনের দেবতারা মৃত রাজাদের স্মৃতি থেকে আসলে বিবর্তিত হয়েছে, যারা এখনো (কথার কথা) তাদের প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের মাথায় কল্পিত কণ্ঠস্বর রূপে উপস্থিত হয়ে। আপনি এই তত্ত্বটিকে বিশ্বাস করুন বা না করুন, জেনেসের বইটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক যে এটি একটি ধর্ম সংক্রান্ত বইয়ে উল্লেখিত হয়েছে।

এখন আমি জেনেস থেকে একটি সম্ভাবনা ধার করে একটি তত্ত্ব প্রস্তাব করছি, দেবতারা আর বিঙ্কাররা আমাদের ক্রমবিকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু ‘পিডোমরফোসিস’ তত্ত্বটির বিপরীত দিক বরাবর। এর অর্থ হচ্ছে সেই প্রস্তাবটি, যা বলছে যে দ্বি-প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট মনের হঠাৎ করে বিলুপ্তি ইতিহাসে ঘটেনি বরং এটি ক্রমান্বয়ে শৈশবের সেই মুহূর্তের

দিকে পশ্চাদপসরণ, যখন বিভ্রমের কণ্ঠস্বর আর অশরীরি উপস্থিতিকে ঘটা করে থামিয়ে দিয়েছিল মিথ্যা বলে। 'পিডোমরফোসিস' তত্ত্বের বিপরীতমুখী, বিভ্রান্ত মনের কল্পনায় দেবতারা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের মন থেকে প্রথমে অপসারিত হয়েছিল, এবং তারপর এটি আরো অনেক বেশি শৈশবে পশ্চাদপসরণ করেছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত আজকের বিঙ্কার বা ছোটো বেগুনী মানুষের প্রপঞ্চ হিসাবে এটি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে, এই তত্ত্বের সমস্যা হচ্ছে এটি প্রাপ্তবয়স্কদের মনে আজও দেবতাদের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করে না।

হয়তো বিঙ্কারদের পূর্বসূরি হিসাবে দেবতারা নয়, বরং বিঙ্কারদের দেবতাদের পূর্বসূরি বিবেচনা করাই উত্তম হবে। কিংবা দুটি প্রপঞ্চকেই আমাদের একই মনোস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার উপজাত হিসাবে দেখা উচিত। ঈশ্বর এবং বিঙ্কারদের যে একই গুণটি আছে, সেটি হলো সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা, আর নতুন নতুন ধারণাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য জীবন্ত একটি সাউন্ডিং বোর্ড বা আদর্শ শ্রোতা হিসাবে এর ভূমিকা। পঞ্চম অধ্যায়ের বিবর্তনের মনোস্তাত্ত্বিক উপজাত হিসাবে ধর্মের তত্ত্বটি থেকে আমরা বেশি দূর যাইনি।

সান্ত্বনা

এবার আমাদের সান্ত্বনা দেবার ক্ষেত্রে ঈশ্বর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে, এবং ঈশ্বরের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তার জায়গায় অন্য কিছু স্থাপন করার মানবতাবাদী সেই চ্যালেঞ্জটির মুখোমুখি হবার সময় এসেছে। অনেকেই যারা মেনে নিয়েছেন, ঈশ্বরের সম্ভবত কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং নৈতিকতার জন্যে আদৌ তার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই, তারাও আবার সেই একই যুক্তির কাছে প্রত্যাবর্তন করেন, তাদের ভাষায় যে যুক্তিটা হচ্ছে সবার উপরে, অর্থাৎ এটি ট্রাম্প কার্ডের মত কাজ করে: ঈশ্বরের জন্য একটি কথিত মনোস্তাত্ত্বিক ও আবেগীয় প্রয়োজনের অস্তিত্ব আছে। আপনি যদি ধর্মকে অপসারণ করেন, মানুষ এর বিরুদ্ধে প্রায়শই হিংস্রভাবে অবস্থান নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, বেশ, সেই জায়গাটি তাহলে আপনি কি দিয়ে পূরণ করবেন? মুমূর্ষু রোগী বা ক্রন্দরত শোকার্ত কিংবা নিঃসঙ্গ এলিয়ানর রিগবিদের (১০) আপনার দেবার মত কি আছে, যাদের জন্য ঈশ্বরই একমাত্র বন্ধু?

এই কথার প্রত্যুত্তরে প্রথমেই যা বলা উচিত তা আসলে বলার কোনো প্রয়োজন থাকাই উচিত নয়। ধর্মের সান্ত্বনা দেবার ক্ষমতা কিন্তু ধর্মকে সত্য বলে প্রমাণিত করছে না। এমনকি আমরা যদি বিশাল একটি ছাড় দেই, এমনকি যদি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস মানুষের মনোস্তাত্ত্বিক বা আবেগীয় সুস্থতার জন্য সম্পূর্ণভাবে জরুরী; এমনকি যদি সব নিরীশ্বরবাদী নিরন্তর মহাজাগতিক উৎকণ্ঠা আর চিন্তায়

হতাশাগ্রস্ত আর উন্মত্ত হয়ে আত্মহননের দিকে ধাবিতও হয়.. তা হলেও এর কোনোটাই ধর্মীয় বিশ্বাস যে সত্য, এমন কোনো প্রস্তাবের পক্ষে সামান্যতম প্রমাণের যোগান দেয় না। হতে পারে এটি সেই তত্ত্বের পক্ষে প্রমাণ যোগাবে, যা দাবী করছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই তা জানার পরও তার অস্তিত্ব আছে বলে নিজেকে বিশ্বাস করানোর একটি আকাঙ্ক্ষা। বিষয়টি আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, ডেনেট (১১), তার ব্রেকিং দ্য স্পেল (১২) বইয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস আর বিশ্বাসকে বিশ্বাস করার মধ্যে পার্থক্যগুলো উল্লেখ করেছিলেন: সেই বিশ্বাস, যা বিশ্বাস করার জন্য তীব্র ইচ্ছা বিরাজ করে এমনকি যদিও সেই বিশ্বাসটি নিজেই মিথ্যা হয়: 'মহাপ্রভু, আমি বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাস দূর করতে তুমি আমাকে সহায়তা করো' (মার্ক ৯:২৪)। তাদের বিশ্বাস প্রচারণা করতে বিশ্বাসীদের উৎসাহ দেয়া হয়ে থাকে, তার উপর তাদের পূর্ণ আস্থা থাকুক বা না থাকুক। হয়তো যদি আপনি কোনো কিছু যথেষ্ট সংখ্যক বার পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন, তাহলে সম্ভাবনা আছে যে, নিজেকেও সেটি সত্যি বলে আপনি বিশ্বাস করাতে পারবেন। আমি মনে করি, আমরা সবাই এমন কাউকে না কাউকে চিনি যারা ধর্মীয় বিশ্বাসের ধারণাটি বিশেষভাবে উপভোগ করে থাকেন, এবং এর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আক্রমণ অপছন্দ করেন, যদিও তারা নিজেরা অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বীকার করেন যে, তাদের নিজেদের সেই বিশ্বাসটি নেই।

ডেনেটের পার্থক্য করার বিষয়টি পড়ার পর আমি এটিকে বার বার ব্যবহার করার উপলক্ষ্য পেয়েছি। এটিকে অতিরঞ্জিত বলা ভুলই হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নিরীশ্বরবাদী, যাদের আমি চিনি, তারা তাদের অবিশ্বাসকে লুকিয়ে রাখেন ধার্মিকতার মিথ্যা একটি মুখোশের আড়ালে। তারা নিজেরা অতিপ্রাকৃত কিছুতে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু অযৌক্তিক বিশ্বাসের প্রতি তাদের অস্পষ্ট, তবে বিশেষ একটি অনুরাগ থেকেই যায়। তারা বিশ্বাসকে বিশ্বাস করেন। বিস্ময়করভাবে অসংখ্য মানুষই আপাতদৃষ্টিতে 'ক সত্য' এবং 'এটাই কাম্য যে মানুষ বিশ্বাস করবে ক সত্য' এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। বা তারা এই যুক্তির ভ্রান্তিটা আসলেই বুঝতে পারেন না কিন্তু অনায়াসেই সত্যকে অপ্রয়োজনীয় হিসাবে সরিয়ে রাখেন যখন মানুষের অনুভূতির সাথে তুলনা করা হয়। আমি মানুষের অনুভূতিকে সমালোচনা করছি না। কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট হওয়া দরকার, কোনো একটি নির্দিষ্ট কথোপকথনে, যা নিয়ে আমরা কথা বলছি: সত্য আর অনুভূতি, দুটোই হয়তো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে কিন্তু সেগুলো একই প্রকৃতির নয়।

যা-ই হোক না কেন, আমার কাল্পনিক এই আপোষটি অতিরিক্ত বিশাল মাপের এবং ভুল। আমার জানা মতে, নিরীশ্বরবাদীদের সাধারণত অসুখী, বিষণ্ন, উৎকন্ঠিত আর শঙ্কিত থাকার প্রবণতার কোনো প্রমাণ নেই। কিছু নিরীশ্বরবাদী সুখী, অন্যরা অসুখী, একই ভাবে যেমন কিছু খ্রিস্টান, ইহুদী, মসুলমান, হিন্দু, বৌদ্ধরাও যেমন অসুখী, যখন

কিনা তাদের মধ্যে অন্যরাও আছেন যারা সুখী। হয়তো পরিসংখ্যান নির্ভর প্রমাণে বিশ্বাস (বা অবিশ্বাস) এবং সুখের মধ্যে পারস্পরিক একটি সম্পর্কের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু যা-ই হোক না কেন এটি আসলেই কোনো শক্তিশালী সম্পর্ক কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার কাছে বরং সেই প্রশ্নটিকে আরো কৌতূলোদ্দীপক মনে হয়, যা আমাদের জিজ্ঞাসা করে, যদি আমরা ঈশ্বর ছাড়াই বাঁচি, সেই জন্য হতাশা অনুভব করার কি উত্তম কোনো কারণ আছে? আমি এই বই শেষ করবো সেই যুক্তি দিয়ে, যা কিনা ঠিক এর বিপরীত, বরং এমন কিছু বলা নূন্যোক্তি হবে যে, কোনো ধরনের অতিপ্রাকৃত ধর্মবিশ্বাস ছাড়াই কেউ একটি সুখী এবং পরিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারবেন। তবে প্রথমে, অবশ্যই আমাকে ধর্মের সান্ত্বনা প্রদান করার দাবীটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

সংক্ষিপ্ত অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী ‘কনসোলেশন’ (অর্থাৎ সান্ত্বনা) শব্দটির অর্থ হচ্ছে দুঃখ বা মানসিক কষ্ট বা যন্ত্রণার নিরসন। আমি সান্ত্বনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করবো:

(১) প্রত্যক্ষ শারীরিক: একজন ব্যক্তি যে কিনা এক রাতের জন্য জনমানবহীন কোনো দূর্গম পাহাড়ে আটকে আছেন, তিনি হয়তো সান্ত্বনাময় সুখ খুজে পান বিশালাকার সেন্ট বার্নার্ড কুকুরের উষ্ণ শরীরে, তবে অবশ্যই ভুলে যাবেন না, তার গলায় বাঁধা ব্র্যাণ্ডির বোতলটার কথাও। একটি ক্রন্দনরত শিশু হয়তো সান্ত্বনা পেতে পারে যদি তাকে শক্ত করে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে আশ্বাস দেয়া যায় কানে কানে।

(২) ইতোপূর্বে বোধগম্য হয়নি এমন কোনো সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে বা বিদ্যমান তথ্যের মধ্যে ইতোপূর্বের অজানা সত্যকে বোঝার জন্য কোনো উপায় আবিষ্কার করার মাধ্যমে পাওয়া সান্ত্বনা: একজন মহিলা যার স্বামী, যিনি যুদ্ধে মারা গিয়েছিলেন হয়তো সান্ত্বনা পাবেন তার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছেন এমন কিছু উদ্ভাবন করে, কিংবা ভেবে যে তার মৃত্যু হয়েছে বীরের মত। আমরা আরো সান্ত্বনা পেতে পারি কোনো পরিস্থিতি সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা করার কোনো উপায় খুঁজে পেলে। একজন দার্শনিক হয়তো দেখাতে পারবেন, যখন কোনো বৃদ্ধ মানুষ মারা যান, সেই মুহূর্তটি কিন্তু বিশেষ কোনো মুহূর্ত নয়। একসময় যে শিশু সে ছিল তা বহু আগেই ‘মারা’ গেছে। সেটি হঠাৎ করে বাঁচা বন্ধ করার জন্যে নয় বরং ক্রমেই বড় হয়ে যাবার মাধ্যমে সেটি ঘটছে। শেক্সপিয়ারে বর্ণিত মানুষের সাতটি বয়সকালের প্রত্যেকটিতে সে মারা যায় যখন নতুন পর্বে ধীরে ধীরে সে রূপান্তরিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশেষে যে মুহূর্তে যখন একজন বৃদ্ধ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন, সেটি কোনো অংশে তার সারা জীবনে সেই ধীর গতিতে বহুবার হওয়া মৃত্যুগুলোর চেয়ে পৃথক কিছু নয়

(১৩)। যারা নিজেদের মৃত্যুর বিষয়টি আদৌ উপভোগ করেন না, তাদের এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি সান্ত্বনাদায়ক মনে হতে পারে। বা হয়তো না, এটি গভীর ভাবনা চিন্তার মাধ্যমে সান্ত্বনা পাবার একটি উদাহরণ। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করা মার্ক টোয়াইন (১৪) উদ্ধৃতিটাও আরেকটি উদাহরণ হতে পারে: 'আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না, আমার জন্মের আগে, হাজার কোটি বছর ধরে আমি মৃতই ছিলাম এবং সেই জন্য সামান্যতম কোনো অসুবিধা আমার হয়নি'। এই অনুধাবনটি আমাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর মূল সত্যটিকে কোনোভাবে পরিবর্তন করে না ঠিকই, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী এই ঘটনাটিকে আমরা ভিন্নভাবে দেখার একটা সুযোগ পাই..যা আমরা সান্ত্বনা মনে করতে পারি। টমাস জেফারসনও (১৫) মৃত্যুকে কোনো ভয় করেননি, কোনো ধরনের মৃত্যু পরবর্তী জীবনে আপাতদৃষ্টিতে তার বিশ্বাস ছিল না। ক্রিষ্টোফার হিচেন্সের (১৬) ভাষায়, 'তার জীবনের শেষাংশে জেফারসন, একাধিকবার তার বন্ধুকে লিখেছিলেন তিনি কোনো শঙ্কা বা আশা ছাড়াই জীবনের শেষ দিনটির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। খুবই নির্ভুলভাবে যা যথেষ্ট ছিল বোঝানোর জন্য যে, তিনি খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন না'।

বার্ট্রান্ড রাসেলের (১৭) ঘোষণা নিয়ে বেশ জোরালো একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক হতে পারে। তার ১৯২৫ সালের 'হোয়াট আই বিলিভ' প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন:

'আমি বিশ্বাস করি, যখন আমি মারা যাবো, আমি পঁচে গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, এবং আমার অহংবোধের কিছুই আর টিকে থাকবে না। আমি তরুণ নই এবং আমি জীবন ভালোবাসি। কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উৎকণ্ঠিত আতঙ্ক আমার তীব্রভাবেই ঘৃণা করা উচিত। সুখ তাসত্ত্বেও সত্যিকারের সুখ কারণ এটি অবশ্যই একদিন শেষ হয়ে যাবে। আর চিরস্থায়ী নয় বলে চিন্তা আর ভালোবাসা কখনো মূল্যহীন হয়ে যায় না। অনেকেই গবের্র সাথে মৃত্যুর সেই চৌকাঠ অতিক্রম করেছেন, নিশ্চয়ই সেই গর্বের এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে শেখানো উচিত। এমনকি যদিও বিজ্ঞানের খোলা জানালা প্রথাগত মনুষ্যোচিত পুরাণের আরামদায়ক অভ্যন্তরীণ উষ্ণতার পরে প্রথমে আমাদের কম্পমান করে, কিন্তু পরিশেষে এই মুক্ত বাতাসই নিয়ে প্রাণশক্তি, এবং সুবিশাল দিগন্ত, যেগুলোর নিজস্ব একটি ঐশ্বর্য আছে।

ষোলো বছর বয়সে আমি যখন স্কুলের লাইব্রেরীতে রাসেলের এই প্রবন্ধটি প্রথম পড়েছিলাম, এটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম। খুব

সম্ভবত আমি এই লেখাটির প্রতি অবচেতন মনে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলাম যখন ২০০৩ সালে 'এ ডেভিলস চ্যাপলিন' লিখেছিলাম (১৯):

> জীবনকে এভাবে দেখার মধ্যে আসলেই শুধু মাহাত্ম্যের চেয়েও বেশি আরো কিছু আছে, অজ্ঞতার নিরাপদ চাদরের তলদেশের তুলনায় যা খুবই বিষণ্ন হতাশ কিংবা শীতল মনে হতে পারে, কিন্তু ইয়েটসের "নক্ষত্রখচিত পথে প্রবাহিত বায়ুর মতো" উপলব্ধি করার সেই শক্তিশালী তীব্র ঝড়ো বাতাসের মুখোমুখি দাড়িয়ে আরো গভীর আত্মতৃপ্তি অনুভব করা সম্ভব।

ধর্ম কিভাবে নিজেকে তুলনা করে, যেমন ধরুন বিজ্ঞানের সাথে, যখন বিজ্ঞান এই দুই ধরনেরই সান্ত্বনা সরবরাহ করে? প্রথম প্রকারের (১) সান্ত্বনার দিকে প্রথম নজর দেই, খুবই সম্ভব যে ঈশ্বরের শক্তিশালী বাহু, এমনকি খুব বিশুদ্ধভাবে শুধু যা কল্পনারই হোক না কেন, সেটি আসলেই সত্যিকারের বন্ধুর আলিঙ্গনের মতো একইভাবে কাউকে প্রবোধ দিতে পারে, যেভাবে গলায় ব্রান্ডির বোতল ঝোলানো সেন্ট বার্নার্ড কুকুর দিতে পারে তুষারে আটকে পড়া কোনো পর্বতারোহীকে। কিন্তু অবশ্যই বৈজ্ঞানিক ঔষধও আমাদের স্বস্তি দিতে পারে, যা ব্র্যাণ্ডির চেয়ে এমনকি আরো কার্যকর।

এবার দ্বিতীয় প্রকারের (২) সান্ত্বনার দিকে নজর দেই: ধর্ম যে খুবই প্রভাবশালী বা কার্যকর হতে পারে, এটি বিশ্বাস করা কিন্তু খুবই সহজ। ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের মুখে যেমন, ভুমিকম্পের সময়, অনেকেই সাধারণত স্মরণ করেন যে, তারা প্রায়শই সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন এটা ভেবে যে, যা হচ্ছে তা সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটছে, সবই তার নির্ভুল পরিকল্পনার একটি অংশ। কোনো সন্দেহ নেই সময় হলে এর ফলাফল শুভ হবে। যদি কেউ মৃত্যুকে ভয় পায়, আত্মার অমরতা নিয়ে তার আন্তরিক বিশ্বাস প্রগাঢ় একটি সান্ত্বনা হতে পারে, যদি না অবশ্য তিনি মনে করেন যে, মৃত্যুর পর তার জায়গা হবে নরকে, বা নরকে যাবার আগে পারগেটিরতে (রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতে পারগেটরি হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে সংক্ষিপ্ত যাত্রা বিরতি নিতে হয় আত্মাকে বিশুদ্ধ হয়ে স্বর্গে প্রবেশ করার জন্য)। মিথ্যা বিশ্বাস কিন্তু সত্য বিশ্বাসের মতোই সান্ত্বনা দিতে পারে, ঠিক বিভ্রম ভাঙ্গার সেই মুহূর্ত অবধি। এটি ধর্মীয় নয় এমন বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ক্যানসারে মৃত্যু পথযাত্রী কোনো রোগীকে ডাক্তার যেমন সান্ত্বনা দিতে পারেন, তিনি আসলে সুস্থ হয়ে গেছেন এমন কোনো মিথ্যা কথা বলে, সেটাও কাজের হবে, ঠিক অন্য কোনো রোগীর ক্ষেত্রে যা ঘটে, যাকে কিনা সত্য বলা হয়েছে তার অসুখ ভালো হয়ে গেছে। ডাক্তারের মিথ্যা সান্ত্বনা বিশ্বাসের চেয়ে মৃত্যুর পর জীবন আছে এমন কোনো আন্তরিক আর অকুণ্ঠ বিশ্বাসের ভ্রম সব মোহমুক্তি থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত। ডাক্তারের মিথ্যা কাজ করে যতক্ষণ না পর্যন্ত রোগের উপসর্গ সুস্পষ্ট না হয়। মৃত্যুর পরবর্তী কোনো জীবনে বিশ্বাসী কেউ কোনোদিনও আসলে বিভ্রান্তি মুক্ত হয় না।

জরিপ জানাচ্ছে প্রায় ৯৫ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রবাসী বিশ্বাস করেন, তাদের মৃত্যুর পরও তারা বেঁচে থাকবেন পরজন্মে। কিন্তু যে ভাবনাটা আমার মনে উঁকি দিচ্ছে তাহলো,আসলেই ঠিক কত জন মানুষ যারা এমন কোনো বিশ্বাসে বিশ্বাসী বলে দাবী করেন? আসলেই কি তারা অন্তরের অন্তস্থল থেকে সেই বিশ্বাসকে ধারণ করেন? যদি সত্যি তারা আন্তরিক হয়ে থাকেন, তাদের কি সবারই সেই 'অ্যামপলফোর্থ' মঠ প্রধান বা অ্যাবটের মত আচরণ করা উচিত নয়? যখন কার্ডিনাল বাসিল হিউম তাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি মারা যাচ্ছেন, অ্যাবট সংবাদটি শুনে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলেন: 'অনেক শুভেচ্ছা, দারুণ ভালো খবর, আমি যদি আপনার সঙ্গী হতে পারতাম'। অ্যাবটের ক্ষেত্রে মনে হয় তিনি সত্যি আন্তরিকভাবেই তা বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এটি ঠিক সেই কারণেই এতই দুর্লভ এবং অপ্রত্যাশিত যে তার গল্পটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমাদের মজার খোরাক জোগায় প্রায় অনেকটা সেই মজার কার্টুনের মত যেখানে একজন তরুণী পুরো নগ্ন হয়ে একটা ব্যানার নিয়ে দাড়িয়ে আছেন, ব্যানারে লেখা "ভালোবাসো, যুদ্ধ নয়", যা দেখে একজন দর্শক মন্তব্য করছেন, "আমি এটাকে বলবো আন্তরিকতা"! কেন সব খ্রিস্টান বা মুললমানরা একই রকম কিছু বলেন না, যেমন, মঠ প্রধান তার বন্ধু মারা যাচ্ছেন এমন খবর শুনে মন্তব্য করেছিলেন? যখন কোনো ধর্মপ্রাণ মহিলাকে ডাক্তার জানান যে, তার জীবনের আর মাত্র কয়েক মাস অবশিষ্ট আছে, কেন তিনি তার বিশ্বাস করা সেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য অধীর আগ্রহ বোধ করেন না, যেভাবে লটারীতে সেশেলেস দ্বীপে অবকাশ যাপনের একটি সুযোগ জেতার খবর পেলে অনুভব করতেন? 'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না'! কেনই বা তাকে দেখতে আসা সব ধর্মবিশ্বাসীরা, আগে চলে গেছেন এমন সব মানুষদের পৌছানোর জন্য নানা বার্তা দিয়ে ভারাক্রান্ত করে ফেলে না? যেমন,'আমার চাচা রবার্টকে দেখলে তাকে আমাদের ভালোবাসা জানিও..'।

মারা যাচ্ছেন এমন কারো উপস্থিতিতে ধর্মপ্রাণ মানুষরা কেন এভাবে কথা বলেন না? হতে কি পারে না যে, আসলে তারা যা বিশ্বাস করেন তা আসলে ভান করে বিশ্বাস করেন, আদৌ সত্যিকারের কোনো বিশ্বাস তাদের নেই? অথবা তারা বিশ্বাস করেন, কিন্তু মারা যাবার প্রক্রিয়াটা নিয়ে আতঙ্কিত, আর সেটি সঙ্গত কারণেই, যেহেতু আমাদের প্রজাতি হচ্ছে একমাত্র প্রাণী প্রজাতি যাদের প্রাণী চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে যন্ত্রণামুক্ত হয়ে মরবারও অনুমতি নেই। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে ইউথানাসিয়া বা চিকিৎসক, কিংবা অন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় মৃত্যুর বিরুদ্ধে সবচেয়ে সরব প্রতিবাদটা কেন আসে ধর্মপ্রাণ বিশ্বাসীদের কাছ থেকে? 'অ্যাবট অব অ্যামপলফোর্থ' বা 'সেশেলেস দীপপূঞ্জে ছুটি কাটানোর' মৃত্যুর মডেলের ক্ষেত্রে আপনি কি আশা করবেন না যে, ধর্মীয় মানুষরাই এই পৃথিবীর অসুন্দর জীবনে প্রতি সবচেয়ে কম মোহাচ্ছন্ন হবেন? তারপরও একটি বিস্ময়কর সত্য হচ্ছে, আপনার যদি এমন কারো

সাথে দেখা হয় যিনি দুরারোগ্য ব্যধিতে মুমূর্ষ যন্ত্রণাকাতর কারো মৃত্যু ভিক্ষা করা বা 'মার্সি কিলিং' বা চিকিৎসকের সহায়তায় মৃত্যু করার প্রতিবাদ করেন, আপনি বড় অঙ্কের টাকা বাজি রেখে বলতে পারেন, তাদের ধার্মিক হবার সম্ভাবনাই বেশি। আর এর আনুষ্ঠানিক কারণ হচ্ছে যে, তারা বিশ্বাস করেন সব ধরনের হত্যাই পাপ। কিন্তু কেন এটাকে তাদের পাপ মনে হয়, যদি আপনি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে কারো স্বর্গ অভিমুখে যাত্রাকে আপনি তরান্বিত করছেন?

আত্মহত্যায় সহায়তার করা ব্যপারে আমার দৃষ্টিভঙ্গি এর বিপরীত, তা এসেছে মার্ক টোয়াইনের কিছু পর্যবেক্ষণের ওপরে ভিত্তি করে। আগেই উল্লেখ করেছি, মরে যাবার বিষয়টি না জন্মানোর মতো - কোনো পার্থক্য নেই। আমি ঠিক তেমনই থাকবো, যেমন আমি ছিলাম, উইলিয়াম দ্য কনকরার বা ডায়নোসর বা ট্রাইলোবাইটদের সময়। সেখানে কোনো ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু মারা যাবার প্রক্রিয়াটি ভীতিকর হতে পারে, যা নির্ভর করে আমাদের ভাগ্যের উপর, হতে পারে তা যন্ত্রণাময়, আর অস্বস্থিকর, সাধারণত যে ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সাধারণ চেতনানাশক ওষুধ দিয়ে নিজেদের সুরক্ষা করতে অভ্যস্ত হয়েছি, যেমন ধরুন, অ্যাপেনডিক্স অপসারণ করার অস্ত্রোপচার। আপনার পোষা প্রাণীটি যদি যন্ত্রণায় সহ্য করে মারা যেতে থাকে, আপনাকে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে, যদি না আপনি পশু-চিকিৎসকের সহায়তায় চেতনানাশক ওষুধ দিয়ে সহজে তার মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু যখন আপনার ডাক্তার এই দয়াশীল কাজটি করবেন, যখন আপনি নিদারুণ যন্ত্রণায় মৃত্যুর দিন গুনছেন, সেই চিকিৎসকের খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হবার সম্ভাবনা আছে। আমি যখন মৃত্যুশয্যায়, আমি চাইবো আমার জীবন শেষ হোক কোনো চেতনানাশক ঔষধের প্রভাবে, ঠিক যেন এটা কোনো অসুস্থ অ্যাপেনডিক্স, কিন্তু আমাকে সেই সুযোগ নেবার অনুমতি দেয়া হবে না, কারণ হোমো সেপিয়েন্স (২০) প্রজাতি সদস্য হয়ে আমার জন্ম নেবার দুর্ভাগ্য হয়েছে, বিষয়টি ভিন্ন হতো, যেমন আমি যদি ক্যানিস ফ্যামিলিয়ারিস (২১) কিংবা ফেলিস ক্যাটাস (২২) প্রজাতির সদস্য হতাম, এই সুযোগ নিতে আমার কোনো অসুবিধা হতো না। অন্ততপক্ষে এটাই বর্তমান পরিস্থিতি, যদি না আমি আরো উন্মুক্ত চিন্তায় অগ্রসর কোনো দেশ, যেমন সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড বা ওরেগন না যাই। এই ধরনের আলোকিত জায়গা কেন এত দুর্লভ - মূলত ধর্মের প্রভাবই এর মূল কারণ।

কিন্তু হয়তো বলা যেতে পারে, আপনার অ্যাপেনডিক্স (২৩) ফেলে দেয়া, আর পুরো জীবনটাই নিয়ে নেয়ার মধ্যে কি কোনো গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই? আসলেই না, বিশেষ করে যখন আপনি নিশ্চিৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে, এবং আপনার যদি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের উপর আন্তরিক ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে থাকে। আপনার যদি সেই বিশ্বাস থাকে যে, মৃত্যু শুধু একটি জীবন থেকে অন্য জীবনে অতিক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি

এই উত্তরণ বা পরিবর্তনের ক্রান্তিকাল যন্ত্রণাময় হয়, তাহলে আপনি ঠিক যেমন কোনো চেতনানাশক ছাড়া আপনি শরীর থেকে অ্যাপেনডিক্স সরাতে চাইবেন না, তেমনি চেতনানাশক ছাড়া এই যন্ত্রণাময় ক্রান্তিকালও অতিক্রম করতে চাইবেন না। শুধুমাত্র আমরা যারা মৃত্যুকে একটি সমাপ্তি হিসাবে দেখি, নতুন কোনো জীবনের উত্তরণ হিসাবে না, সরল মনে ভাবতে পারা যেতে পারে যে শুধুমাত্র তারাই তো এই স্বেচ্ছামৃত্যু বা সহায়তার মাধ্যমে মৃত্যুর প্রতিবাদ করার কথা। তারপরও আমরাই এটি সমর্থন করছি (২৪)।

এই সূত্রে, একজন পরিচিত সিনিয়র নার্সের একটি পর্যবেক্ষণকে আমরা কিভাবে দেখতে পারি, যিনি তার সারাজীবন একটি বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা করেছেন, যেখানে মৃত্যু নিত্যদিনের ঘটনা। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে মানুষগুলো মৃত্যুর সময় সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তারা অধিকাংশই ধর্মবিশ্বাসী। তার এই পর্যবেক্ষণটিকে পরিসংখ্যানের ছাকুনী দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়তো আছে, কিন্তু বিষয়টিকে যদি সত্যি ধরে নেই, তাহলে সেখানে ব্যপারটা কি ঘটছে ? সেটি আর যা-ই হোক না কেন, সরাসরি মৃত্যু পথযাত্রীদের জন্য ধর্মের সান্ত্বনা দেবার শক্তির পক্ষে জোরালো কোনো যুক্তি দিচ্ছে না (২৫)। ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রে, হয়তো তারা পারগেটরি ভয় পায়? সাধুসদৃশ কার্ডিনাল হিউম তার এক বন্ধুকে বিদায় চিঠিতে লিখেছিলেন:‘বেশ বিদায়, তোমার সাথে পারগেটরিতে দেখা হবে মনে হয়...’, কি, ‘মনে হয়’, হিউমের ঐ দয়ালু চোখে কি সন্দেহবাদের ঝলক ছিল?

পারগেটরির মতবাদ, ধর্মীয় মন কিভাবে কাজ করে সেই অযৌক্তিকতার একটি দারুণ উদাহরণ। পারগেটরিকে বলা যায় স্বর্গীয় এলিস দীপপুঞ্জের মত, নরক সদৃশ্য একটি অপেক্ষার করার এলাকা, যেখানে মৃত আত্মারা যায়, যাদের পাপ ততটা খারাপ নয়, যে তাদের নরকে পাঠাতে হবে; তবে স্বর্গের পাপমুক্ত বিশুদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করা যোগ্যতা অর্জনে তাদের এখনো কিছুটা শাস্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন আছে, যা তাদের বিশুদ্ধ করবে। মধ্যযুগে চার্চ অর্থের বিনিময়ে ‘ইনডালজেনস’ বা ক্ষমা বিক্রি করতো। এর মানে হচ্ছে এই নরক সদৃশ পারগেটরিতে আপনি কত দিন কম থাকতে পারেন সেই দিনগুলির মূল্য হিসাবে চার্চ অর্থ সংগ্রহ করতো। অর্থের পরিমান বিচার করে চার্চ আক্ষরিকার্থেই সনদ প্রদান করতো (কি বিস্ময়কর আত্মম্ভরিতা), পারগেটরি থেকে কয়দিন তাদের মুক্তি মিলেছে, অর্থাৎ কয়টা দিন তারা কিনেছেন সেটি উল্লেখ করে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার অর্থ সম্পত্তি জড়ো করার কথা বর্ণনা করতে গেলে ‘অসৎ উপায়ে সংগৃহীত’ কথাটি হয়তো নতুন করে বিশেষায়িত একটি রূপে আবিষ্কার করতে হবে। এই অর্থ উপার্জন করার ছল চাতুরী, নরক থেকে মুক্তি বিক্রয় সম্ভবত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতারণা। নাইজেরিয় ইন্টারনেট প্রতারণার মধ্যযুগীয়

সমতূল্য, তবে ক্যাথলিক চার্চ অবশ্যই এই কুকর্মে অনেক বেশি সফলতা অর্জন করেছিল।

১৯০৩ সালেও পোপ দশম পায়াস রীতিমত হিসাব-নিকাশ করে সংখ্যা গণনা করতেন, আধিপত্যের ক্রমবিন্যাসে প্রতিটি স্তরের কে কতদিন এই পারগেটরি থেকে মুক্তি পাবার উপযুক্ত: যেমন কার্ডিনালরা ২০০ দিন, আর্চ বিশপরা ১০০ দিন, বিশপরা মাত্র ৫০ দিন; তার সময়ে, যদিও এই সব 'ইনডালজেন্স' সরাসরি টাকার বিনিময়ে বিক্রি হতো না। এমনকি মধ্যযুগেও পারগেটরি থেকে 'মুক্ত দিন' ক্রয়বিক্রয়ের জন্য টাকাই একমাত্র মাধ্যম ছিল না। আপনি পার্থনা করেও এর মুল্য পরিশোধ করতে পারতেন, হয়তো মৃত্যুর আগে আপনি নিজে, বা মৃত্যুর পর আপনার পক্ষ থেকে অন্য কারো প্রার্থনা কেনা যেত টাকা দিয়ে। আপনি যদি ধনী হতেন, আপনার আত্মার পরিত্রাণে অনন্তকালের জন্য আপনি সব কিছুরই সংস্থান করে যেতে পারতেন। আমার নিজের অক্সফোর্ড কলেজ, নিউ কলেজ, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৭৯ সালে (এটি তখন নতুন) সেই শতাব্দীর অন্যতম সেরা একজন ধনবান জনহিতকারী ব্যক্তির অর্থ সাহায্যে। তিনি হলেন উইলিয়াম অফ উইকাম, উনচেষ্টারের বিশপ ছিলেন তিনি। একজন মধ্যযুগীয় বিশপ সেই সময়ের এক একজন বিল গেটস হতে পারতেন তথ্যপ্রবাহের সেই পথ (ঈশ্বর বরাবর) নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে, এবং বিপুল ধন সম্পদ জড়ো করতে পারতেন ।
তার নিয়ন্ত্রণাধীন চার্চ বেশ অস্বাভাবিক মাত্রায় বড় ছিল, উইকাম তার সম্পদ আর প্রভাব ব্যবহার করে দুটি অসাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি উইনচেষ্টারে, অন্যটি অক্সফোর্ডে। উইকামের কাছে শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল। কিন্তু নিউ কলেজের ইতিহাসের আনুষ্ঠানিক দলিল যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে এর ছয় শতক পুর্তিতে, সেখানে বলা হয়েছে, এই কলেজ তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিশেষ চান্ট্রি (২৬) বা তার বিদেহী আত্মার শান্তির জন্য নিয়মিত প্রার্থনা নিশ্চিত করা। এজন্যে কলেজের চার্চে বিশেষ সেবা দেবার জন্য তিনি দশজন চ্যাপলেইন, তিন জন কেরানী ও ষোল জন কোরাস শিল্পীর সব ধরনের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন কলেজের অর্থনৈতিক অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, কোনো অবস্থাতে এদের যেন ছাটাই না করা হয়। উইকাম তার নিউ কলেজের সব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন ফেলোশিপের উপর, একটি স্বনির্বাচিত গ্রুপ, যা গত ৬০০ বছর ধরে একটি প্রাণীর মত তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। স্পষ্টতই তিনি আমাদের উপর ভরসা করেছিলেন যে শতাব্দীর পর শতাব্দী আমরা তার আত্মার পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করবো।

বর্তমানে কলেজের একজনই চ্যাপলেইন আছেন (২৭) এবং কোনো ক্লার্ক নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী পারগেটরিতে থাকা উইকামের জন্য প্রার্থনার স্রোতধারা বর্তমানে ক্ষীণ একটি ধারা হয়ে বছরে মাত্র দুবারে এসে টিকেছে। শুধু কোরাস গায়করা একা

একাই নানা স্বরে তাদের প্রার্থনা সঙ্গীত গেয়ে চলছেন, আর তাদের সেই সমবেত সঙ্গীত সত্যি এর যাদুকরী মোহময়তায় বিস্ময়কর। এমনকি আমারও সেই ফেলোশিপের একজন সদস্য হয়ে একটি বিশ্বাস ভাঙ্গার জন্য খানিকটা অপরাধবোধ অনুভূত হয়। তার নিজের সময়ের ধারণা অনুযায়ী উইকাম বর্তমান যুগের কোনো ধনী ব্যক্তি যা করতেন তার সমতূল্য কাজটি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের কোনো ধনী ব্যক্তি হয়তো কোনো 'ক্রায়োজেনিক' কোম্পানিতে মোটা অঙ্কের টাকা জমা করতেন, যারা তার শরীরকে হিমায়িত করে ভূমিকম্প, সামাজিক অসন্তোষ, পারমানবিক যুদ্ধ এবং অন্যান্য যে-কোনো বিপর্যয় থেকে আপনার শরীরকে সংরক্ষণ করার প্রতিজ্ঞা করবে যত দিন না পর্যন্ত ভবিষ্যৎ কোনো সময়ে চিকিৎবিজ্ঞানে যথেষ্ট পরিমানে অগ্রগতি হয়, এবং সেই প্রযুক্তির উদ্ভাবন হয়, যে প্রযুক্তি জানবে কিভাবে আপনাকে হিমায়িত এই অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, এবং যে অসুখের কারণে আপনি মৃত্যুপথযাত্রী, সেই অসুখটি নিরাময় করা যায়। আমরা নিউ কলেজের পরবর্তী ফেলোরা কি এর প্রতিষ্ঠাতা পিতাকে দেয়া প্রতিজ্ঞাটি অস্বীকার করেছি। যদি তাই হয়, তাহলে আমরা সঠিক সঙ্গেই আছি। শত শত মধ্যযুগীয় পৃষ্ঠপোষক তাদের উত্তরসূরিদের বিশ্বাস করেই মারা গেছেন। যারা যথেষ্ট পরিমানে সম্পদ দান করে গেছেন, পারগেটরিতে যখন থাকবেন তাদের পরিত্রাণ কামনা করে প্রার্থনা করা হবে এই ধারণা নিয়ে। আমি বাধ্য হচ্ছি চিন্তা করতে যে, ইউরোপের শিল্প ও স্থাপত্যের মধ্যযুগীয় সম্পদের কি পরিমাণ অংশ আসলে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য 'ডাউন পেমেন্ট' হিসাবে করা হয়েছে, যে বিশ্বাস এখন ভঙ্গ করা হয়েছে।

কিন্তু পারগেটরির এই উদ্ভট মতবাদের বিরুদ্ধে আমাকে যে বিষয়টা সত্যি বিস্মিত করে, তাহলো এর সপক্ষে ধর্মতত্ত্ববিদদের দাবী করা প্রমাণগুলো: যে প্রমাণগুলো এত চরমভাবে দুর্বল যে, সেগুলো এর দাবী করা অবস্থান তো দিচ্ছেই না বরং বিষয়টিকে হাস্যকর করে তুলেছে। ক্যাথলিক বিশ্বকোষে পারগেটরি বিষয়টি লক্ষ করলে দেখা যায় সেখানে প্রমাণসমূহ নামে একটি অনুচ্ছেদ আছে, যা পারগেটরির অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে ধরা হচ্ছে। যদি খুব সরলভাবে মৃতরা স্বর্গ কিংবা নরকে যায় এই পৃথিবীতে তাদের করা পাপের জন্য, তাহলে তো তাদের জন্য প্রার্থনা করার কোনো অর্থই নেই। কেন মৃত মানুষের জন্য আমরা প্রার্থনা করবো, যদি সেই বিশ্বাসটি না থাকে যে, যারা ঈশ্বরের দয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, প্রার্থনার তাদের জন্যে শান্তি এনে দেবার মত ক্ষমতা আছে । এবং তারপরও মৃতদের জন্য আমরা দোয়া করি, তাই না? সেই কারণে পারগেটরীর নিশ্চয়ই কোনো অস্তিত্ব আছে। নাহলে আমাদের এই দোয়া অর্থহীন। সুতরাং এটি প্রমাণিত, কিউ.ই.ডি (২৮)। এটি সত্যিই একটি বড় উদাহরণ, যার মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করতে পারি ধর্মতত্ত্ববিদদের মনে সাধারণত যুক্তি হিসাবে কি গণ্য হতে পারে।

এই লক্ষণীয় "নন সেকিটার"(২৯) যুক্তিদোষ অপেক্ষাকৃত আরো বড় মাত্রায়, সান্ত্বনা থেকে নেয়া যুক্তির অন্য একটি সাধারণ ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্যই একজন ঈশ্বর আছেন, এই যুক্তি প্রস্তাব করে, কারণ যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকতো, জীবন হতো শূন্য, লক্ষ্যহীন, অসার, অর্থহীনতা আর গুরুত্বহীনতার একটি মিশ্রণ। শুরুতেই যে এই যুক্তিটি পরাজিত হয়েছে সেটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানো কিভাবে প্রয়োজনীয় হতে পারে? হতে পারে জীবন শূন্য, হতে পারে মৃতদের জন্য আমাদের দোয়া অর্থহীন, এর বিপরীত কিছু মনে করা এই উপসংহারের সত্যতা, যা আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি, সেটি মেনে নেয়া। প্রস্তাবিত সিলোজিজম (বা দুটি প্রস্তাবনা থেকে নেয়া সিদ্ধান্ত-অনুমান) (৩০) স্পষ্টভাবেই সারকুলার বা আবদ্ধ যুক্তি। আপনার স্ত্রীকে ছাড়া আপনার জীবন হয়তো অসহ্য, শূন্য আর হাহাকারময় মনে হতে পারে, কিন্তু তা দুঃখজনকভাবে সেটি তার মৃত অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটায় না। এই পূর্বধারণার মধ্যে শিশুসুলভ কিছু বিষয় আছে, যেমন, আপনার জীবনের লক্ষ্য, এবং এটিকে অর্থপূর্ণ করে তোলার দায়িত্ব অন্য কারোর (শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের পিতামাতা, পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে ঈশ্বর) ওপর ন্যস্ত আছে, এটি সেই সব মানুষের ছেলেমানুষী যারা কিনা যখনই গোড়ালী মচকায়, চারপাশে তাকিয়ে খুঁজে বের করা চেষ্টা করেন, কার বিরুদ্ধে আইনী মামলা করা যায়। আমার ভালো থাকার জন্য কাউকে না কাউকে অবশ্যই দায়ী হতে হবে, এবং আমি যখন আঘাত পাবো তার জন্য কাউকে না কাউকে অবশ্যই এর দায় নিতে হবে। এই একই ধরনের বালখিল্যতা কি সত্যি সত্যি ঈশ্বরের 'প্রয়োজনীয়তার' কারণ নয়? আমরা কি আবারও সেই বিঙ্কারে ফেরত যাচ্ছি?

এর বিপরীত, সত্যিকারের প্রাপ্তবয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমাদের জীবন ততটুকুই পূর্ণ, অর্থবহ আর চমৎকার হবে যতটুকু আমরা তা করতে চাই। এবং আসলেই আমরা আমাদের জীবনকে খুবই চমৎকার করে গড়ে তুলতে পারি। বিজ্ঞান যদি জাগতিক বস্তুবাদী প্রকারের নয় এমন কোনো সান্ত্বনা দেয়, সেটি আমার আলোচনার শেষ বিষয়টির সাথেই মিশে যায়...অনুপ্রেরণা।

অনুপ্রেরণা

এটি রুচি কিংবা ব্যক্তিগত বিবেচনার একটি বিষয়, যারা খানিকটা দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব আছে যে যুক্তির প্রক্রিয়াটি মূলত আমি ব্যবহার করবো, সেটি যুক্তি অপেক্ষা বরং ভাষার আলঙ্কারিক ব্যবহারই বেশি মনে হতে পারে। এর আগেও আমি তা ব্যবহার করেছি, এর আগে আরো অনেকেই যেমন করেছেন সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন কার্ল সেগান তার 'পেল ব্লু ডট' (৩১), ই. ও. উইলসন তার 'বায়োফিলিয়া' (৩২), মাইকেল শেরমার তার 'দ্য সোল অফ সায়েন্স' (৩৩) এবং পল কার্টজ তার 'অ্যাফারমেশন' (৩৪) বইয়ে আর আমার 'আনউইভিং দ্য রেইনবো'(৩৫) বইয়ে আমি

সেই বার্তাটিকেই ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলাম, বিস্ময়করভাবে ঠিক কতটা বেশি ভাগ্যবান যে আমরা বেঁচে আছি, যখন ডিএনএ অণুর সেই বিন্যাস-সমাবেশ প্রক্রিয়ার লটারীতে অগণিত সংখ্যক মানুষের হয়তো কোনোদিন জন্মই হবে না। আমরা যারা কেবল যথেষ্ট ভাগ্যবান হিসাবে বেঁচে আছি তাদের জন্য আমি জীবনের আপেক্ষিক সংক্ষিপ্ততাকে কল্পনা করি সময়ের সুবিশাল মাপকাঠি ধরে এগুতে থাকা খুব সরু লেজারের একটি স্পটলাইট। সেই স্পটলাইটের আগে ও পেছনে ঢেকে আছে মৃত অতীতের গভীর অন্ধকার অথবা অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকার। আমরা বিস্ময়করভাবে ভাগ্যবান যে, এই স্পটলাইটে নিজেদের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছি, এই সূর্যের নীচে আমাদের সময় যতই সংক্ষিপ্ত হোক না কেন। যদি আমরা এর একটি সেকেন্ডও অপচয় করি বা আক্ষেপ করি যে এটি নিরস বা শূন্য বা (কোনো শিশুর মতো) যদি বলি বোরিং বা বিরক্তিকর, সেটি কি খুব বেশি মাত্রায় অসংবেদনশীল অবমাননা হবে না.. সেই জন্ম না নেওয়া অসংখ্য হাজার কোটি ব্যক্তির জন্য, যারা জীবনের কোনো স্পর্শ পায়নি? অনেক নিরীশ্বরবাদী আমার চেয়ে আরো বেশি ভালোভাবে বলেছেন, জীবন মাত্র একটি, এই জ্ঞানটি আমাদের জীবনকে আরো মহামূল্যবান করেছে। জীবনকে ভালোবাসতে এবং আরো সুন্দর করে তোলার প্রেরণা দেয় নিরীশ্বরবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি, একই সাথে এটি সেই সব মানুষদের আত্মবিভ্রম আর খামখেয়ালী চিন্তা আর বিরক্তিকর আত্মকরুণা দিয়ে কখনোও কলুষিত হয়নি, যারা মনে করেন তাদের কাছে জীবন ঋণী। এমিলি ডিকিনসন (৩৫) যেমন বলেছিলেন, যেহেতু আর কখনোই পুনরাবৃত্তি হবে না, একারণেই জীবন এত মধুর (৩৬):

> That it will never come again
> Is what makes life so sweet.

যদি ঈশ্বরের মৃত্যু একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি করে যায়, বিভিন্ন মানুষ এটি পূর্ণ করবে ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে, আর আমার উপায় হচ্ছে ভালো মাত্রায় বিজ্ঞান, সৎ আর পদ্ধতিগত সেই প্রচেষ্টা, যা বাস্তব পৃথিবী সংক্রান্ত সত্যের অন্বেষণ করে। আমি মহাবিশ্বকে বোঝার মানবিক প্রচেষ্টাকে দেখি মডেল তৈরি করার একটি উদ্যোগ হিসাবে। প্রত্যেকেই তাদের মাথার ভিতরে এই পৃথিবীর একটি মডেল তৈরি করার চেষ্টা করেন, যেখানে আমাদের বসবাস। ন্যুনতম মডেলটি ছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের, এই পৃথিবীতে যার শুধু নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই মূল লক্ষ্য ছিল। প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা এই ‘সিমুলেশন সফটওয়্যারটি’ তৈরি এবং বাগ বা ত্রুটিমুক্ত হয়েছে, এবং আফ্রিকার সাভানায় আমাদের পূর্বপুরুষদের পরিচিত পৃথিবীতে এটি সবচেয়ে দক্ষ ছিল: একটি ত্রিমাত্রিক বিশ্ব, মধ্যম আকৃতির নানা বস্তুর উপস্থিতি সেখানে, তারা মধ্যম গতিতে পরস্পর সাপেক্ষে গতিময়। অপ্রত্যাশিত বোনাস হিসাবে আমাদের মস্তিষ্ক ঘটনাচক্রে যথেষ্ট শক্তিশালী আরো সমৃদ্ধ বিশ্ব মডেল তৈরি করেছিল, যা উপযোগিতাবাদের

মাঝারী মডেল থেকে ভিন্ন, যে মডেলটি একসময় আমাদের পূর্বপুরুষদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যক ছিল। শিল্প আর বিজ্ঞান এই বোনাসের একটি অন্যতম প্রকাশ। একটি শেষ দৃশ্যকল্প রচনা করার সুযোগ দিন, মনকে উন্মুক্ত ও সাইকিকে সন্তুষ্ট করতে বিজ্ঞানের শক্তিকে যা প্রকাশ করবে।

সব অবগুন্ঠন বোরকার জননী

অত্যন্ত দুঃখজনক যে দৃশ্যটি এখন আমাদের রাস্তায় ইদানিং রাস্তায় দেখা যায়, তা হলো সেই সব রমণীদের দৃশ্য, যারা আপাদমস্তক অবয়ব কিংবা আকারহীন কালো কাপড়ে আবৃত, চোখের সামনে সামান্য একটু ছিদ্র দিয়ে যারা উকি দিয়ে সারা পৃথিবীকে দেখছেন। এই বোরকা নারীদের শোষণ করার অস্ত্রই শুধু নয়, এটি তাদের স্বাধীনতা আর সৌন্দর্যের নির্মম নিপীড়ন, শুধুমাত্র সুস্পষ্ট পরুষতান্ত্রিক নিষ্ঠুরতা আর দুঃখজনকভাবে নতি স্বীকার করা নারীর আত্মসমর্পনের চিহ্নই শুধু নয়। আমি এই বোরকার সেই সরু ছিদ্রকে ব্যবহার করতে চাই অন্য আরেকটি জিনিসের প্রতীক হিসাবে।

আমাদের চোখ তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ বর্ণালীর খুব সংকীর্ণ একটি অংশ অনুভব করতে পারে। দৃশ্যমান আলো আমাদের জন্য সুবিশাল অন্ধকার বা আলোহীন তরঙ্গ বর্ণালীর সামান্য একটি উজ্জ্বল অংশ, যা বিস্তৃত বেতার (রেডিও) তরঙ্গের দীর্ঘ তরঙ্গের প্রান্ত থেকে হ্রস্ব দৈর্ঘের গামা রে প্রান্ত অবধি বিস্তৃত হয়ে আছে। এবং এই দেখার সীমানাটা যে কত সংকীর্ণ সেটি অনুধাবন করা আসলেই বেশ কঠিন একটি কাজ, এবং আর সেটি কাউকে বোঝানোও একটি চ্যালেঞ্জের মতো। সেই কারণে সুবিশাল একটি বোরকার কথা কল্পনা করুন, যার সামনের দিকে ছিদ্রটি এর প্রশস্ততায় এক ইঞ্চির সমান। কাল্পনিক সেই বোরকার ভিতর থেকে বাইরে দেখার ছিদ্রের উপরে কালো কাপড়ের দৈর্ঘ্য যদি অদৃশ্য বর্ণালী বা স্পেকট্রামের হ্রস্ব দৈর্ঘ তরঙ্গ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে এবং ছিদ্রের নীচের অংশের কাপড় যদি দৃশ্যমান তরঙ্গের চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গ অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে সেই বোরকাটিকে ঠিক কত বড় হতে হবে সেই একই মাত্রায় এক ইঞ্চি ছিদ্রের জায়গা দিতে? লগারিদম স্কেলের অবতারণা না করে বোধগম্যভাবে এটা উপস্থাপন করা খুবই কঠিন কারণ সেটি বোঝানোর জন্য একটি বিশাল দৈর্ঘ্যের কথা আমরা ভাবছি। আর কোনো বইয়ের সর্বশেষ অধ্যায় অবশ্যই লগারিদম নিয়ে আলোচনা শুরু করার উপযুক্ত জায়গা নয়। তবে আমার কথা মেনে নিতে পারেন, আমাদের কল্পিত রূপকের সেই মাত্রায় এটি সব বোরকার মহাজননীর আকারের হবার কথা। দৃশ্যমান আলোর এক ইঞ্চি জানালা হাস্যকরভাবে ক্ষুদ্র একটি অংশ মাইলের পর মাইল সেই কালো কাপড়ের তুলনায়, যা কিনা আমাদের দৃষ্টিশক্তির সীমানার বাইরে অদৃশ্য বর্ণালী বিস্তারের প্রতিনিধিত্ব করছে। বোরকার নীচ প্রান্তের বেতার তরঙ্গ থেকে

মাথার উপরের প্রান্তে গামা রে অবধি। বিজ্ঞান আমাদের জন্য যা করে, তা হচ্ছে এটি আমাদের উপলব্ধির দিগন্তটিকে সম্প্রসারিত করে, আরো প্রশস্তভাবে জানালাটিকে খুলে দেয়, তীব্র আনন্দময় বন্ধনহীন মুক্ত স্বাধীনতায় এটি আমাদের অনুভূতিগুলোকে উন্মুক্ত করে দেয়।

মহাকাশ স্ক্যান বা পদ্ধতিগতভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য অপটিক্যাল টেলিস্কোপগুলো কাঁচের লেন্স আর আয়না ব্যবহার করে, তারা যা দেখে তা হলো কিছু নক্ষত্র, যা ঘটনাচক্রে সংকীর্ণ একটি সীমানার আলোকতরঙ্গ বিকরণ করে, যাকে আমরা দৃশ্যমান আলো বলি। কিন্তু এমন টেলিস্কোপও আমাদের আছে, যারা এক্স-রশ্মি অথবা বেতার তরঙ্গ 'দেখতে', অর্থাৎ বিশেষভাবে শনাক্ত করতে পারে। যা আমাদের অন্য এক রাতের আকাশে নক্ষত্রের সম্ভার উপহার দেয়। ক্ষুদ্র মাপকাঠিতে সঠিক ছাকুনীসহ ক্যামেরা অতিবেগুনী রশ্মি দেখতে পারে, এবং আমরা ফুলের ছবি তুললে দেখতে পাই ফুলের মধ্যে অপার্থিব নানা দাগ বা চিহ্ন, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না, আপাতদৃষ্টিতে যেগুলো পরাগায়নে সহায়ক কীটপতঙ্গের চোখের জন্য বিশেষভাবে 'পরিকল্পিত'। পতঙ্গদের চোখে দেখার দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের বর্ণালী আমাদের মতোই, শুধু তা খানিকটা সেই কাল্পনিক বোরকার উপরের দিকে সরে গেছে, তারা লাল রঙ দেখতে পায় না, তবে অতিবেগুনী রশ্মির (অতিবেগুনী রশ্মির বাগান) বর্ণালীর অনেকটুকই দেখতে পায়, যা আমাদের চোখ দেখতে পায় না (৩৭)।

দৃশ্যমান আলোর সংকীর্ণ জানালার এই রূপকটি আরো প্রশস্ত হয় বিস্ময়কর বিশাল একটি বর্ণালী বিস্তারে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও যা আমাদের সাহায্য করে। বিশালাকার গহ্বরময় একটি জাদুঘরের কেন্দ্রে আমরা বাস করি, বিশ্বটাকে দেখি সেই সব ইন্দ্রিয় আর স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে, যার ক্ষমতা আছে ক্ষুদ্র মাঝারী আকারে বস্তুগুলো প্রত্যক্ষকরণ আর বোঝার, যেগুলো মাঝারি মাত্রার গতিতে চলাফেরা করে। আমরা অভ্যস্ত সেই সব বস্তু নিয়ে, যেগুলো আকারে কয়েক কিলোমিটার থেকে (পাহাড়ের চুড়া) এক মিলি মিটারের এক দশমাংশ (একটি আলপিনের অগ্রভাগ)। এর বাইরে এমন কি আমাদের কল্পনাও প্রতিবন্ধী, আমাদের দরকার গণিত আর নানা যান্ত্রিক উপকরণের, সৌভাগ্যক্রমে যেগুলো আমরা ব্যবহার করেতে শিখেছি। আকার, দূরত্ব বা গতির সীমানার বিস্তার, যার সাথে আমাদের কল্পনা স্বচ্ছন্দবোধ করে, সেগুলো আসলেই খুব সীমিত আর সংকীর্ণ সীমার প্রতিনিধিত্ব করে। সম্ভাবনার সুবিশাল একটি সীমানার বিস্তারের মধ্যে যার অবস্থান, ক্ষুদ্রতম প্রান্তের কোয়ান্টার বিস্ময় থেকে আরো সুবিলাশ প্রান্তের আইনেস্টাইনের বিশ্বতত্ত্বের মাত্রা অবধি যা বিস্তৃত হয়ে আছে।

ঐতিহাসিকভাবে পরিচিত মধ্যবর্তী এই সংকীর্ণ অংশের বাইরে কোনো দূরত্বের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে আমাদের কল্পনা হতাশাজনকভাবে অনুপযুক্ত। আমরা

ক্ষুদ্রাকার গোলক হিসাবে ইলেকট্রন কল্পনা করি, যা কেন্দ্রের একগুচ্ছ গোলককে ঘিরে প্রদক্ষিণ করছে, যেগুলো প্রোটন আর নিউট্রনকে প্রতিনিধিত্ব করছে । কিন্তু সেটা আদৌ এর সত্যিকারের চেহারা না, ইলেকট্রন ছোটো কোনো গোলাকৃতির বলের মত দেখতে নয়, সেগুলো আমাদের পরিচিত এমন কোনো কিছুর মতোই না। আর বিষয়টা স্পষ্টও না যে এই সদৃশ্যতা মানে এমন কিছু যখন আমরা বাস্তবতার খুব কাছাকাছি থেকে তা ভাবার চেষ্টা করবো, আমাদের কল্পনা এখনো কোয়ান্টাম জগতের সেই এলাকার নিকটে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়নি। সেই মাত্রায় কোনো বস্তু তাদের যেমন আচরণ করা উচিত, যেমনটা ভাবতে আমরা বিবর্তিত হয়েছি, সেভাবে আচরণ করে না। এছাড়া আলোর গতির প্রায় নিকটবর্তীর গতিতে কোনো বস্তু কিভাবে আচরণ করবে সেটার সাথে আমরা খাপ খাইয়ে নিতে পারি নি। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আমাদের ব্যর্থ করে। কারণ আমাদের সেই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান এমন একটি পৃথিবীতে বিবর্তিত হয়েছে যেখানে কোনো কিছু দ্রুত নাড়াচড়া করে না বা কোনো কিছুই খুব ছোটো বা খুব বড় নয়।

বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জে. বি এস. হলডেন (৩৮) ‘পসিবল ওয়ার্ল্ডস’শিরোনামে তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের উপসংহারে মন্তব্য করেছিলেন, ‘বেশ, আমার নিজস্ব সংশয় হচ্ছে, আমরা যা ধারণা করে থাকি, এই মহাবিশ্ব শুধু তার চেয়ে আরো বেশি অদ্ভুত নয়, আমরা যতটা ধারণা করতে পারি, তার চেয়েও আরো বেশি অদ্ভুত.... আমরা ধারণা যে-কোনো দর্শনে আমরা যা কল্পনা করতে পারি, কিংবা কল্পনা করা সম্ভব হতে পারে, এই মহাবিশ্বে তার চেয়েও আরো অনেক বেশি কিছু আছে’। প্রসঙ্গক্রমে হলডেনের উল্লেখ করা হ্যামলেটের বিখ্যাত যে সংলাপটি আমাকে কৌতূহলী করে তোলে করে, যা সাধারণত প্রায়শই এর সঠিক অর্থে উপস্থাপন করা হয় না। সাধারণত গুরুত্বটা দেয়া হয় ‘ইয়োর’ বা তোমার শব্দটির উপর:

> There are more things in heaven and earth, Horatio
> Than are dreamt in ‘your’ philosophy.

আসলেই, এই পংক্তিটি প্রায়ই খেয়ালখুশী মত ব্যবহৃত হয় সেই ইঙ্গিতসহ যে, হোরেশিও সকল অগভীর, যুক্তিবাদী আর সংশয়বাদী সব চরিত্রদের প্রতিনিধিত্ব করছে। কিন্তু কিছু গবেষক ‘ফিলোসফি’ (বা দর্শন) শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে যেখানে ‘তোমার’ শব্দটি অপসারিত হয়েছে: ‘... দর্শন যা কল্পনা করেছে তার চেয়ে’। বর্তমান আলোচনার জন্য এই পার্থক্যটি আসলে গুরুত্বপূর্ণ নয়, শুধু দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ইতোমধ্যে হলডেনের ‘যে-কোনো’ দর্শনটি অন্তর্ভুক্ত করেছে।

এই বইটি যাকে উৎসর্গ করা হয়েছে তিনি বিজ্ঞানের বিস্ময়ের মাঝে তার জীবিকা খুঁজে

পেয়েছিলেন। যাকে তিনি পৌঁছে দিয়েছিলেন কমেডির নতুন দিগন্তে। ১৯৯৮ সালে কেমব্রিজে তার একটি তাৎক্ষণিক বক্তৃতা থেকে কিছু অংশ, যা আগেও উল্লেখ করেছিলাম আমি : 'বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা গ্যাস দিয়ে ঢাকা একটি গ্রহের পৃষ্ঠে গভীর কুয়ার মত মাধ্যাকর্ষণের একটি গর্তে বসবাস করছি, যে গ্রহটি ৯০ মিলিয়ন মাইল দূরে একটি পারমানবিক আগুনের গোলকের চারপাশে ঘুরছে, এবং এটাকে আমরা ভাবছি স্বাভাবিক, অবশ্যই বিষয়টি ইঙ্গিত করে আমাদের বোঝার ক্ষমতা কি পরিমাণ একপেশে হয়ে আছে'। অন্য কল্প-বিজ্ঞানের লেখকরা যখন বিজ্ঞানের অদ্ভুত বিষয়গুলো ব্যবহার করেন, তারা আমাদের রহস্যময়তা অনুভব করার শক্তি জাগিয়ে তোলেন, আর ডগলাস অ্যাডামস আমাদেরকে হাসানোর জন্য সেই একই বিষয়গুলো ব্যবহার করেছিলেন। (যারা তার 'দ্য হিচ হাইকারস গাইড টু গ্যালাক্সি' পড়েছেন তারা হয়তো সেই 'ইনফিনিট ইমপ্রোবালিটি ড্রাইভের' উদাহরণটা এখানে মনে করতে পারেন।) হাস্যরস আর কৌতুক হয়তো তর্কসাপেক্ষে সবচেয়ে সেরা প্রতিক্রিয়া হতে পারে আধুনিক পদার্থবিদ্যার নানা আপাতবৈপরীত বিষয়গুলোর প্রতি, কারণ এর বিকল্প, আমি মাঝে মাঝে ভাবি, হতে পারে চোখের পানি ফেলা।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স, বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অর্জনের সেই সূক্ষ্মতম সর্বোচ্চ শিখর, বাস্তব পৃথিবী সম্বন্ধে বুদ্ধিদীপ্ততার সাথে সফলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। রিচার্ড ফাইনমান (৩৯) উত্তর-আমেরিকার মত বিশাল ভূখণ্ডের প্রশস্ততা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে করা কোনো ভবিষ্যদ্বাণীর একটি চুলের প্রশস্ততা পরিমাণ অবধি নির্ভুলতা অর্জন করতে সফল হওয়ার সাথে এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তুলনা করেছিলেন। আর এই পূর্বধারণা করার ক্ষমতাই বলছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কিছু না কিছু আছে যা কোনো না কোনোভাবে সত্য। আমাদের জানা আর আর সবকিছুর মতো যা সত্যি, এমনকি আমাদের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সংক্রান্ত বাস্তব সত্যগুলোর বাইরে যার অবস্থান নয়। কিন্তু সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী করার করতে প্রাকশর্তগুলো কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োজন, সেগুলো এতই রহস্যময় যে এমনকি মহান ফাইনম্যান নিজেই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন (এই উদ্ধৃতির বেশ কয়েকটি সংস্করণ আছে, যাদের মধ্যে এটি সবচেয়ে নিকটতম): 'যদি ভাবেন যে আপনি কোয়ান্টাম তত্ত্ব বুঝতে পেরেছেন... আপনি তাহলে কোয়ান্টাম তত্ত্বটি বোঝেননি' (৪০)।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব এত বেশি অদ্ভুত যে, পদার্থবিজ্ঞানীদেরও আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী কোনো না কোনো একটির 'ব্যাখ্যার' সাহায্য নিতে হয়। সঠিক শব্দ হয়তো হবে আশ্রয় নিতে হয়। ডেভিড ডয়েশ তার 'দ্য ফ্যাব্রিক অব রিয়েলিটি'(৪১) বইটিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের 'মেনি ওয়ার্ল্ড' বা বহু বিশ্ব ব্যাখ্যাটি মেনে নিয়েছেন, এটির সম্বন্ধে সবচেয়ে খারাপ যা আপনি বলতে পারবেন তা হলো এটি অস্বাভাবিক মাত্রায় অপচয়মূলক। এটি বিশাল দ্রুত বাড়তে থাকা বহু মহাবিশ্ব প্রস্তাব করেছে, একই সমান্তরালে যাদের অস্তিত্ব,

এবং শুধুমাত্র খুবই সংকীর্ণ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের পরীক্ষার পোর্টহোল বা ঘুলঘুলি ছাড়া পরস্পরকে শনাক্ত করতে পারে না, এরকম বেশ কয়েকটি মহাবিশ্বে আমি ইতোমধ্যেই মৃত। এর অল্প কয়েকটিতে আপনার হয়তো সবুজ রঙের গোফ আছে। এবং আরো অনেক কিছু।

এর বিকল্প কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা একই রকম উদ্ভট - তবে এত অপচয়মূলক না, শুধু বিস্ময়কর মাত্রায় আপার্তবৈপরীত। এরউইন শ্রোডিঙ্গার (৪২) এটি ব্যঙ্গ করেছিলেন তার বিড়ালের বিখ্যাত উদাহরণ ব্যবহার করে। শ্রোডিঙ্গারের বিড়াল একটি বাক্সে বন্দী, যেখানে বিড়ালটিকে হত্যা করার একটি পদ্ধতি আছে যা সক্রিয় হয় একটি 'কোয়ান্টাম মেকানিকাল' ঘটনায়। সেই বাক্সের ঢাকনী খোলার আগে, আমরা জানি না বিড়ালটি কি মরে গেছে না বেঁচে আছে। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলছে, যা-ই হোক না কেন বিড়ালটি অবশ্যই হয় জীবিত, না হয় মৃত এই বাক্সের মধ্যে। কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধীতা করছে। এই বাক্সটি আমাদের খোলার আগে যা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সেটি হচ্ছে সম্ভাবনা। যখনই আমরা বাক্সটি খুলছি, তখনই 'ওয়েভ ফাংশন' ব্যর্থ হচ্ছে আমাদের হাতে থাকছে শুধু একটি ঘটনা: বিড়ালটি মারা গেছে বা বিড়ালটি বেঁচে আছে। যতক্ষণ না আমরা বাক্সটি খুলছি, এটি যেমন মরে নি আবার তেমনি বেঁচেও নেই।

আর 'বহু বিশ্ব' ব্যাখ্যা এই একটি ঘটনাটিকে দেখছে অন্যভাবে, কিছু মহাবিশ্বে এই বিড়ালটি মৃত, কিছু অন্য মহাবিশ্বে বিড়ালটি বেঁচে আছে। কোনো ব্যাখ্যাই মানুষের সাধারণ অন্তর্গত বোধকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কিন্তু আরো জাদরেল পদার্থবিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে গাণিতিক, পরীক্ষামূলকভাবে নানা ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। সেগুলো বোঝার জন্য আমরা অধিকাংশই খুবই দুর্বল । আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আসলে কি ঘটছে সেটি বোঝার লক্ষ্যে এক ধরনের দৃশ্যপট কল্পনা করে নেয়া। প্রসঙ্গক্রমে, আমি বুঝতে পেরেছি, শ্রোডিঙ্গার মূলত বিড়ালের এই চিন্তা-পরীক্ষাটি প্রস্তাব করেছিলেন তার দৃষ্টিতে কোপেনহেগেন ব্যাখ্যার অসারতা চিহ্নিত করতে।

জীববিজ্ঞানী লুইস ওলপার্ট মনে করেন, আধুনিক পদার্থবিদ্যার অদ্ভুত বিষয়গুলো শুধু হিমশৈলের উপরিভাগের প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রযুক্তির ব্যতিক্রম, বিজ্ঞান সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের প্রতি সহিংস (৪৩)। একটি পরিচিত উদাহরণ যেমন, আপনি যখনই এক গ্লাস পানি খাচ্ছেন, বেশ ভালো সম্ভাবনা আছে যে আপনি সেখানে অন্তত একটা অণু শোষণ করে নেবেন, যা কোনো একসময় অলিভার ক্রমওয়েলের মূত্রনালী দিয়ে বের হয়েছিল, এটি খুবই মৌলিক একটি সম্ভাবনা তত্ত্ব। একটি পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে যে পরিমাণ অণু আছে তার সংখ্যা, সারা পৃথিবীতে পূর্ণ গ্লাসের সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি।

সুতরাং যখনই আমরা পুরো এক গ্লাস পানি পান করছি আমরা পৃথিবীতে অস্তিত্ব আছে এমন পানির অণুর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আমাদের ভেতরে নিচ্ছি। অবশই ক্রমওয়েল বা মূত্রথলীর কোনোটারই কোনো বিশেষত্ব নেই। আপনি কি এই মাত্র সেই নাইট্রোজেন অণুটা নিশ্বাসের সাথে গ্রহন করলেন যা কিনা কোনো এক সময় লম্বা সাইকাড (৪৪) গাছের বা দিকে দাড়ানো তৃতীয় ইগুয়ানোডনটা (৪৫) তার প্রশ্বাসের সাথে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছিল? আপনি কি খুশী না, এমন একটা পৃথিবীতে বেঁচে থেকে, যেখানে শুধু এই ধরনের কল্পনা বা ধারণাই সম্ভব না, আপনি সৌভাগ্যবানও যে এটি কেন হতে পারে সেটি বুঝতেও সক্ষম? এবং অন্য কাউকে সেটি প্রত্যক্ষভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারেন, আপনার নিজস্ব মতামত বা বিশ্বাস হিসাবে নয়, বরং এমন একটি রূপে, তারা আপনার যুক্তিটি বুঝতে পারবে, বিষয়টি মেনে নিতে বাধ্য হবে? হয়তো এই বিষয়টি কার্ল সেগান বোঝাতে চেয়েছেন তার ‘দ্য ডিমন হান্টেড ওয়ার্ল্ড’ (৪৬) বইটি লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সময়: ‘বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা না করা আমার পক্ষে অসম্ভব, যখন আপনি প্রেমে পড়েন, আপনি সারা পৃথিবীকে সেটি জানাতে চান। এই বইটা একটি ব্যক্তিগত জবানবন্দী, যা বিজ্ঞানের সাথে আমার আজীবন প্রেমকাহিনীরই প্রতিফলন’।

জটিলতর জীবনের বিবর্তন, এবং সত্যিকারভাবেই এমন মহাবিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব, যে মহাবিশ্ব পদার্থবিদ্যার সব আইন মেনে চলে - বিষয়টা অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিস্ময়কর - বা বিস্ময়করই হতো, কারণ হচ্ছে সেই সত্যটা, বিস্ময় বা অবাক হওয়া এমন একটি আবেগ, এর অস্তিত্ব শুধু সেই মস্তিষ্কে যা কিনা আবার সেই একই বিস্ময়কর প্রক্রিয়ারই ফসল। একটি অ্যানথ্রোপিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহলে, আমাদের অস্তিত্ব বিস্ময়ের কোনো কারণ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমি ভাবতে চাই, আমি আমার অন্য মানব সমগোত্রীয়দের হয়ে বলছি, দাবী করছি, যা-ই হোক না কেন এটি আসলেই চূড়ান্তভাবে বিস্ময়কর।

ব্যপারটা ভেবে দেখুন। একটি গ্রহে, সম্ভবত সমস্ত মহাবিশ্বে একটি মাত্র গ্রহে, যে অণুগুলো, যেগুলো কিনা সাধারণত পাথরের টুকরা ছাড়া জটিলতর আর কিছু তৈরি করে না, সেগুলো নিজেদের একত্র করেছে, পাথরের তুল্য আকারের কোনো টুকরো থেকে অস্বাভাবিক মাত্রায় জটিলতা সৃষ্টি করেছে, যারা কিনা দৌড়াতে লাফাতে, সাঁতার কাটতে, উড়তে, দেখতে ও শুনতে এবং অন্যান্য জীবন্ত জটিল টুকরোগুলোকেশিকার করে খেতে পারে। এছাড়াও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা চিন্তা আর অনুভব করতেও সক্ষম, কখনো অন্য জটিল পদার্থের টুকরার প্রেমেও পড়ে। আমরা এখন জানি মূলত কিভাবে এই কৌশলটি কাজ করে, কিন্তু শুধুমাত্র ১৮৫৯ সালে থেকে। ১৮৫৯ সালের আগে এমন ধারণা খুবই অদ্ভুত ছিল। ডারউইনের কল্যাণে এটি আসলেই খুব অদ্ভুত। ডারউইন বোরকার সেই সরু জানালাটা টেনে ধরে আরো প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। যা

আমাদের বোঝার ক্ষমতার বিস্ময়কর পরিবর্ধনের সুযোগ করে দিয়েছিল, এর চোখ ধাঁধানো নতুনত্ব এবং মানুষের আত্মিক অনুভবকে নতুন একটি উচ্চতায় পৌঁছে দেবার ক্ষমতার হয়তো পূর্ববর্তী কোনো উদাহরণ নেই....হয়তো কোপার্নিকাসের সেই অনুধ্যানটি ছাড়া, 'মহাবিশ্বের কেন্দ্র পৃথিবী নয়'।

বিংশ শতাব্দীর সেরা একজন দার্শনিক ল্যুডভিগ ভিটগেনস্টাইন (৪৭) একবার তার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বলো তো, সবাই সবসময় কেন বলে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ভাবার পরিবর্তে বরং সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে বলে ভাবাটাই মানুষের জন্য স্বাভাবিক'। তার বন্ধু উত্তর দিয়েছিলেন, 'বেশ স্পষ্টতই এর কারণ হচ্ছে, দেখলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সূর্যই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে'। এর উত্তরে ভিটগেনস্টাইন বলেছিলেন, 'বেশ, আপাতদৃষ্টিতে 'দেখে' যদি মনে হতো পৃথিবীটা ঘুরছে, তাহলে এটি কেমন দেখতে হতো'? আমি মাঝে মাঝে ভিটগেনস্টাইনের এই মন্তব্যটি উল্লেখ করি আমার বক্তৃতা দেবার সময়, আশা করি দর্শকরা হাসবেন। বরং, মনে হয় তারা খানিকটা অবাক হয়ে চুপ হয়ে যান।

সীমিত যে পৃথিবীতে আমাদের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়েছে, বড় আকারের কোনো বস্তুর তুলনায় ক্ষুদ্র কোনো বস্তুকে গতিশীল দেখার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বড় আকারের বস্তুগুলোকে যেন মনে হয় শুধু এই গতিময়তার প্রেক্ষাপট তৈরি করছে। পৃথিবী যখন আবর্তিত হচ্ছে, বস্তুদের আকারে বড় মনে হয় কারণ তারা নিকটে - পর্বত, বৃক্ষ, দালান, এমনকি মাটিও - সবই আবর্তিত হচ্ছে পরস্পরের সাথে এবং পর্যবেক্ষকের সাথে ঠিক একই সময়ে, মহাজাগতিক বস্তু যেমন, সূর্য আর নক্ষত্রদের সাথে আপেক্ষিকভাবে। আমাদের বিবর্তিত মস্তিষ্ক নিকটে বা পুরোভূমিতে থাকা পর্বত আর বৃক্ষদের ওপর নয়, বরং দূরবর্তী এই মহাজাগতিক বস্তুগুলোর ওপর গতিময়তার একটি বিভ্রম প্রক্ষেপ করে।

উপরে বর্ণিত বিষয়টি নিয়ে আমি আরো খানিকটা আলোচনা করবো। যে ভাবে আমরা পৃথিবীটাকে দেখি, যে কারণে আমরা কিছু জিনিস অনায়াসে সহজাতভাবে বুঝতে পারি এবং কিছু বিষয় বোঝা বেশ কষ্টসাধ্য অনুভূত হয়, তার কারণ হচ্ছে যে, 'মস্তিষ্ক নিজেই একটি বিবর্তিত অঙ্গ', মাথায় থাকা কম্পিউটার, যা এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে আমাদের সাহায্য করে। আমি যে পৃথিবীর নাম দেবো 'মিডল ওয়ার্ল্ড' বা মাঝারী পৃথিবী, যেখানে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য জরুরী বস্তুগুলো আকারে খুব বড় নয়, আবার খুব ছোটো নয়। যে বিশ্বে হয় কোনো কিছু স্থির দাড়িয়ে আছে, অথবা আলোর গতির তুলনায় কম গতিতে গতিশীল, যেখানে খুব অসম্ভাব্য কোনো কিছুকে নিরাপদে অসম্ভব মনে করা যেতে পারে। আমাদের মনের বোরকার জানালা সংকীর্ণ কারণ

আমাদের পূর্বপুরুষদের বেঁচে থাকায় সহায়তা করতে এটির আরো প্রশস্ত হবার কোনো ‘প্রয়োজন’ ছিল না।

বিবর্তিত সব সহজাত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে, আপাতদৃষ্টিতে ঘন বস্তু যেমন, স্ফটিক এবং পাথর মূলত শূন্যস্থান দিয়ে তৈরি। খুব পরিচিত একটি উদাহরণে একটি পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে বড় একটি স্টেডিয়ামের মাঝে বসা একটি মাছির সাথে তুলনা করা হয়, এর পাশের অণুর অবস্থানটি ঠিক স্টেডিয়ামের বাইরে। সবচেয়ে শক্ত ঘণ পাথর তাহলে আসলে প্রায় পুরোটাই শূন্যস্থান, যে শূন্যতাকে ভাঙ্গছে কেবল কিছু ক্ষুদ্র কণা তারা এত বেশি দূরে ও বিচ্ছন্ন যে তাদের গণনায় ধরা যায় না। তাহলে পাথর দেখতে এবং অনুভব করতে কেন এমন শক্ত মনে হয়, যা ভেদ করা যায় না?

ভিটগেনস্টাইন এই প্রশ্নটির কিভাবে উত্তর দিতেন আমি সেটি কল্পনা করার চেষ্টা করবো না। তবে একজন বিবর্তন-জীববিজ্ঞানী হিসাবে, আমি এর উত্তর দেবার চেষ্টা করবো এভাবে:

আমাদের মস্তিষ্ক বিবর্তিত হয়েছে এই পৃথিবীতে আমাদের শরীরকে টিকে থাকতে সহায়তা করার জন্য, আর সেটি এমন একটি মাত্রায়, যে মাত্রায় আমাদের শরীর কাজ করে। অণুদের ক্ষুদ্র পৃথিবীতে বিচরণ করার জন্য আমরা বিবর্তিত হয়নি। যদি আমরা সেভাবে বিবর্তিত হতাম আমাদের মস্তিষ্ক তাহলে মূলত একটি শূন্যস্থান হিসাবে পাথরকে অনুভব করতে পারতো। পাথর অনুভূত হয় শক্ত, অভেদ্য কারণ আমাদের হাত সেগুলো ভেদ করতে পারে না। এবং তাদের ভেদ করতে না পারার কারণ কিন্তু এটিকে গঠন করা কণাগুলোর আন্তঃসংযোগ আর আকারের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এর কারণ হচ্ছে, শক্তি ক্ষেত্র বা ফোর্স ফিল্ড, যা বহু দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কণাগুলোর সাথে যুক্ত থাকে ‘কঠিন’ অবস্থায়। আমাদের মস্তিষ্কের জন্য উপকারি ঘন শক্ত এবং অভেদ্য ধারণাটি “নির্মাণ” করা, কারণ এই ধরনের ধারণাগুলো এমন একটি পৃথিবীতে আমাদের শরীর পরিচালনা করতে সহায়তা করে যেখানে সেই বস্তুগুলো - যাদের আমরা ঘন আর শক্ত বলছি - তারা এই সাথে একই জায়গা দখল করে থাকতে পারে না।

এখানে খানিকটা কৌতুকের অবতারণা করা যেতে পারে, জন রনসনের (৪৮) ‘দ্য মেন হু স্টেয়ার অ্যাট গোটস’ থেকে:

> এটি একটি সত্য গল্প। ১৯৮৩ সালের গ্রীষ্মকাল, মেজর জেনারেল আলবার্ট স্টাবলবাইন (তৃতীয়) ভার্জিনিয়ার আর্লিংটনে একটি দেরাজের পেছনে বসে আছেন, তার চোখ দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ, যেখানে তার অর্জিত বহু সামরিক

পুরস্কার শোভা পাচ্ছে। তার দীর্ঘ পেশাগত জীবনের সফলতার প্রামাণ্য স্মারক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর আর্মি অব ইন্টেলিজেন্সের প্রধান, যার অধীনে ষোল হাজার সেনা সদস্য আছেন। তিনি তার পুরস্কারগুলোর পেছনে থাকা দেয়ালের দিকে মনোনিবেশ করলেন, এবং কিছু একটা করার জন্য তিনি বিশেষ তাগিদ অনুভব করলেন, তাকে অবশ্যই সেটি করতে হবে, যদিও সেটি করার ভাবনা এমনকি তাকে শঙ্কিত করে তোলে। যা করার সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন, সেটি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। তিনি তার অফিসেই থাকতে পারেন অথবা পার্শ্ববর্তী অফিসেও যেতে পারেন, এটা তার নিজের পছন্দের উপর নির্ভর করছে, এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তিনি পার্শ্ববর্তী অফিসে যাবেন। তিনি উঠে দাড়ান, তার প্রশস্ত দেরাজের পেছন থেকে বেরিয়ে আসেন এবং হাঁটতে শুরু করেন। আমি বোঝাতে চাইছি, তিনি ভাবছেন পরমাণু মূলত দিয়ে তৈরি? শূন্যস্থান, তিনি তার গতি দ্রুত করলেন, ভাবলেন তিনি, আমি মূলত কি দিয়ে তৈরি? পরমাণু!! হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে তিনি প্রায় দৌড়াতে শুরু করলেন... দেয়ালটি আসলে কি দিয়ে তৈরি? তিনি ভাবলেন.. পরমাণু! আমাকে শুধু শূন্যস্থানগুলো মিলিয়ে ফেলতে হবে। এরপর জেনারেল স্টাবলবাইন তার অফিসের দেয়ালের সাথে সজোরে ধাক্কা খেলেন, ধুর.. তিনি ভাবলেন। জেনারেল স্টাবলবাইন দেয়ালের মধ্য দিয়ে বারবার তার এই হাটার ব্যর্থ চেষ্টায় হতভম্ব হয়ে পড়েন।

তাদের প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে জেনারেল স্টাবলবাইনকে সঠিক কারণেই, 'আউট অব দ্য বক্স থিঙ্কার' বা অপ্রচলিত চিন্তার একজন মানুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেবার পর তিনি তার স্ত্রীর সাথে পরিচালনা করছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম হচ্ছে 'হেলথফ্রিডমইউএসএ', এবং এই প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরিভাবে 'বাড়তি খাদ্যপুষ্টি (ভিটামিন, খনিজ, অ্যামাইনো অ্যাসিড ইত্যাদি), ভেষজ, হোমিওপ্যাথি, পুষ্টিদানকারী ওষুধ এবং পরিষ্কার বিশুদ্ধ খাবারের (কোনো কীটনাশক, আগাছানাশক এবং অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা দুষিত নয়) প্রতি নিবেদিত, কোনো কর্পোরেশন ছাড়াই (সরকারী জোর খাঁটিয়ে) যারা আপনাকে নির্দেশনা দেয়, ঠিক কি মাত্রায় আর কোন চিকিৎসায় এসব ব্যবহার করার আপনার অনুমতি আছে'। অবশ্য মূল্যবান শারীরিক তরলের ব্যপারে কোনো নির্দেশ নেই (৫০)।

মধ্যম পৃথিবীতে বিবর্তিত হবার কারণে আমরা সহজাতভাবে কিছু ধারণা সহজেই বুঝতে পারি, যেমন :'যখন কোনো মেজর জেনারেল মাঝারী গতিতে নড়তে শুরু করেন, যে গতিতে মেজর জেনারেল ও মধ্যম পৃথিবীর অন্যান্য বস্তুরাও নড়াচড়া করে থাকেন, এবং অন্য একটি মধ্যম পৃথিবীর বস্তু, যেমন শক্ত একটি দেয়ালে গিয়ে আঘাত করেন, তখন তার এই গতিশীল পরিস্থিতির যন্ত্রণাদায়ক একটি পরিসমাপ্তি হয়'। আমাদের

মস্তিষ্কের সেই ক্ষমতা নেই যে সে কল্পনা করতে পারে, দেয়ালের মধ্যে দিয়ে কোনো নিউট্রিনোর মত অতিক্রম করে যেতে কেমন লাগতে পারে, সেই বিশাল শূন্যস্থান দিয়ে, যা আসলেই এটি সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনভাবে আমাদের বোধগম্যতা সামাল দিতে পারে না, কি হতে পারে যখন কোনো বস্তুর গতি আলোর গতির নিকটবর্তী হয়।

মধ্যম পৃথিবীতে বিবর্তিত আর প্রশিক্ষিত হওয়া মানুষের অন্তর্জ্ঞান, কোনো সাহায্য ছাড়া এমনকি গ্যালিলেওর ওপর ভরসা করতেও সংগ্রাম করে, যখন তিনি আমাদের বলেন যে, যদি বাতাসের ঘর্ষণ না থাকে, কামানের একটি গোলা আর একটি পালক একই সাথে মাটি স্পর্শ করবে, হেলানো টাওয়ারের উপর থেকে যখন সেগুলো এক সাথে নীচে ফেলা হবে।আর কারণ হচ্ছে মধ্যম পৃথিবীতে, বায়ুর ঘর্ষণ সর্বক্ষণ উপস্থিত। আমরা যদি কোনো 'শূন্যস্থানে' বিবর্তিত হতাম, আমরা কিন্তু পালক আর কামানের গোলার একই সাথে মাটিতে পড়বে এমনই প্রত্যাশা করতাম। আমরা মধ্যম পৃথিবীর বিবর্তিত বাসিন্দা, আর সেটাই আমরা কতটুকু কল্পনা করতে পারি তার সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। আমাদের আবৃত করে রাখা বোরকার সংকীর্ণ জানালাটি শুধুমাত্র মধ্যম পৃথিবীটিকে দেখার সুযোগ করে দেয়, যদি না আমরা বিশেষভাবে প্রতিভাবান কিংবা সুনির্দিষ্টভাবে প্রশিক্ষিত না হয়ে থাকি।

একটি অর্থে, প্রাণীদের শুধু একটি মধ্যম পৃথিবীতেই নয়, পরমাণু আর ইলেক্ট্রনদের একটি আণুবিক্ষণিক জগতেও বেঁচে থাকতে হয়। সেই বিশেষ স্নায়বিক সংকেতগুলো, যা ব্যবহার করে আমরা আমাদের চিন্তাগুলো করি, আর আমাদের কল্পনা করার বিষয়টি আণুবীক্ষণিক জগতে কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের বন্য পূর্বসূরিদের কখনো করতে হয়েছে এমন কোনো কাজ, বা তাদের নিতে হয়েছে এমন কোনো সিদ্ধান্তের জন্য আণবিক জগত থেকে নেয়া কোনো বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করতে হয়নি। কিন্তু আমরা যদি ব্যাকটেরিয়া হতাম, যাদের সারাক্ষণ তাপমাত্রায় তাড়িত অণুদের দ্বারা ধাক্কা খেতে হয় নিরন্তর, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হতো। কিন্তু অণুদের এই 'ব্রাউনিয়ান মুভমেন্ট' (৫১) লক্ষ করার জন্যে আমরা এই মধ্যম পৃথিবীর মানুষরা খুব বেঢপ আকারে বড়। একই ভাবে, আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, কিন্তু এটি পৃষ্ঠটানের সূক্ষ্ম শক্তির প্রতি প্রায় অচেতন। একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ এই অগ্রাধিকারটি উল্টে নেয় এবং পৃষ্ঠটানের শক্তি তার কাছে সূক্ষ্ম নয় বরং প্রধান হয়ে ওঠে।

স্টিভ গ্রান্ড (৫২) তার 'ক্রিয়েশন: লাইফ অ্যান্ড হাউ টু মেক ইট' বইটিতে পদার্থ নিয়ে আমাদের মোহাবিষ্ট ভাবনার প্রায় কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। আমাদের চিন্তা করার একটি প্রবণতা আছে যে, শুধুমাত্র শক্ত, ঘন কোনো 'বস্তুই' হচ্ছে 'আসল' বস্তু। তড়িৎচৌম্বকীয় তারতাম্যের 'তরঙ্গগুলো' কোনো শূন্যস্থানে 'অবাস্তব' মনে হতে পারে।

ভিক্টোরিয় যুগে বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন এইসব তরঙ্গকে অবশ্যই কোনো বাস্তব মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ বা ঢেউয়ের মত হতে হবে। কিন্তু এই ধরনের কোনো মাধ্যম কারো জানা ছিল না, সুতরাং তারা সেই মাধ্যমটি উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন, এবং এটির নাম দিয়েছিলেন লুমিনিফেরাস ইথার। কিন্তু 'আসল' পদার্থকে বোঝা বিষয়টিকে আমরা অনেক বেশি স্বস্তিদায়ক মনে করি, শুধুমাত্র যার কারণ আমাদের পূর্বপরুষরা বিবর্তিত হয়েছে একটি মধ্যম পৃথিবীতে, যেখানে পদার্থের ধারণা উপযোগী একটি ধারণা।

অন্য দিকে এমনকি আমরা মধ্যম পৃথিবীর বাসিন্দারাও বুঝতে পারি জলের ঘূর্ণি বাস্তব একটি 'জিনিস' ঠিক যেমন পাথরের অস্তিত্ব বাস্তব, এমনকি যদিও ঘূর্ণি তৈরি করা পদার্থ ক্রমাগতভাবে পরিবর্তনশীল। তানজানিয়ার মরুভুমির সমতলে মাসাই আদিবাসীদের কাছে পবিত্র ওল দনইয়ো লেনগাই আগ্নেয়গিরির পাদদেশে একটি বিশাল বালিয়াড়ি আছে যা ১৯৬৯ সালে অগ্ন্যুৎপাতের সময় সৃষ্ট ভশ্ম দিয়ে তৈরি হয়েছিল। বাতাস এটির এই বিশেষ রূপ দিয়েছে। কিন্তু সুন্দর বিষয়টি হলো এটি পুরো 'শরীর' নিয়ে নড়াচড়া করে। কারগরী ভাষায় এটি একটি 'বাহকান'। সম্পূর্ণ বালিয়াড়িটি মরুভূমির মধ্য দিয়ে পশ্চিম দিক বরাবর প্রতি বছর প্রায় ১৭ মিটার করে সরে যাচ্ছে। এটি এর বাঁকা চাঁদের মত আকারটি অক্ষুন্ন রেখেছে এবং সুঁচালো প্রান্ত দিয়ে এটি ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। বাতাস অপেক্ষাকৃত কম ঢাল থেকে বালি উপরের দিকে সরিয়ে দেয়, যখনই বালু কণাগুলো এর খাড়া খাজের চুড়ায় পৌঁছায় এটি ক্রমান্বয়ে বেশি খাড়া ঢাল বরাবর বালিয়াড়ির ভিতর দিকে গড়িয়ে পড়ে।

আসলেই, এমনকি একটি বাহকান তরঙ্গের তুলনায় আরো বেশি একটি 'বস্তু'। একটি তরঙ্গ যেন মনে হয় খোলা সাগর তলের ওপর আনুভূমিক একটি তলে সামনে অগ্রসর হচ্ছে, কিন্তু পানির অণুগুলো নড়াচড়া করছে উল্লম্ব বা উপর নীচে। অনুরূপভাবে শব্দ তরঙ্গ বক্তা থেকে শ্রোতা অবধি যাতায়াত করে, কিন্তু বাতাসের অণুগুলো কিন্তু যাচ্ছে না: কারণ সেটি হবে বাতাস, শব্দ নয়। স্টিভ গ্রান্ড ইঙ্গিত করেছিলেন যে, আমি ও আপনি স্থায়ী 'কিছু' চেয়ে বরং তরঙ্গের মতো। তিনি পাঠকদের আমন্ত্রণ জানান..

> ...আপনার শৈশবের কোনো অভিজ্ঞতা মনে করুন। যা আপনি খুব স্পষ্টভাবে মনে করতে পারবেন, এমন কিছু যা আপনি দেখতে পারবেন, অনুভব করতে পারবেন, হয়তো এমনকি ঘ্রাণ নিতে পারবেন, যেন আসলেই আপনি সেখানে অবস্থান করছেন। আর যা-ই হোক না কেন, আপনি তো আসলেই সেই সময়ে সেখানে ছিলেন, তাই নয় কি? এছাড়া আপনি কিভাবেই বা সেটি মনে করতে পারবেন? কিন্তু আসল বিস্ময়কর বিষয়টি হচ্ছে: আপনি সেখানে ছিলেন না। আপনার শরীরে এখন আছে এমন একটি পরমাণুও সেই সময় সেখানে ছিল না, যখন সেই ঘটনাটি ঘটেছিল।..... পদার্থ এক জায়গা থেকে আরেক

জায়গায় প্রবাহিত হয় এবং ক্ষণিকের জন্য সেগুলো এক জায়গা একত্রিত হয়ে আপনাকে তৈরি করেছিল। সুতরাং, আপনি যে-ই হোন না কেন, আপনি যে পদার্থ দিয়ে তৈরি সেই পদার্থটি আপনি না। আর এই বিষয়টি যদি আপনাকে শিহরিত না করতে পারে, আপনি উপরের লেখাঁটি আবার পড়ে দেখুন, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কোনো শিহরণ অনুভব করেন, কারণ এটি খুব জরুরী (৫৪)।

'আসলেই' এমন কোনো শব্দ নয় যা আমাদের সরল আত্মবিশ্বাসের সাথে ব্যবহার করা উচিত। যদি নিউট্রিনোর একটি মস্তিষ্ক থাকতো, যা নিউট্রিনো-আকারের কোনো পূর্বসূরির মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিল, এটি হয়তো বলতো, পাথর 'আসলেই' প্রায় সম্পূর্ণভাবেই শূন্যস্থান দিয়ে তৈরি। আমাদের যে মস্তিষ্ক আছে সেটি মধ্যম আকারের পূর্বসূরীদের থেকে বিবর্তিত হয়েছে, যারা পাথর ভেদ করে এর মধ্য দিয়ে হাঁটতে পারতো না, সেখানে আমাদের 'আসলেই' হচ্ছে সেই'আসলেই' যেখানে পাথর কঠিন ও অভেদ্য। কোনো একটি প্রাণীর জন্য 'আসলেই' হচ্ছে যা কিছু এর মস্তিষ্কের যা কিছু এর হওয়া প্রয়োজন, যে এটি সেই প্রাণীকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করতে পারে। আর, যেহেতু বিভিন্ন প্রজাতির বেঁচে থাকার জগত এতই ভিন্ন, বহু প্রকারেরই "আসলেই" আমরা খুঁজে পাবো।

আমরা বাস্তব পৃথিবীকে যেভাবে দেখি সেটি নিরাভরণ বাস্তব পৃথিবী নয়, বরং বাস্তব পৃথিবীর একটি 'মডেল', যা নিয়ন্ত্রণ আর সমন্বয় করে আমাদের অনুভূতি বা ইন্দ্রিয়গুলোর বহন করে আনা নানা উপাত্ত - একটি মডেল যা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যা আমাদের বাস্তব পৃথিবীকে মোকাবেলা করার জন্য উপযোগী। আর আমরা কোন ধরনের প্রাণী সেটির ওপর এই মডেলের প্রকৃতি নির্ভর করে। যে প্রাণী উড়তে পারে, তার গাছ বেয়ে ওঠা, বা সাঁতার কাটা কোনো প্রাণীর চেয়ে ভিন্ন ধরনের একটি পৃথিবীর মডেল প্রয়োজন। শিকারী প্রাণীদের তাদের শিকার প্রাণী থেকে ভিন্ন একটি মডেল প্রয়োজন, এমনকি যদিও তাদের পৃথিবী পরস্পরকে অবশ্যই অধিক্রমণ করে। একটি বানরের মস্তিষ্কে অবশ্যই সেই 'সফটওয়্যার' থাকতে হবে, যা গাছের ডাল আর কাণ্ডের ত্রিমাত্রিক দৃশ্য তৈরি করতে সক্ষম। কোনো একটি ওয়াটার বোটমানের (৫৫) মস্তিষ্কে এই ত্রিমাত্রিক 'সফটওয়্যারের' দরকার নেই, কারণ এটি পুকুরে পানির উপরি পৃষ্ঠে বসবাস যেন সেটি এডউইন অ্যাবটের ফ্ল্যাটল্যান্ড (৫৬)। কোনো মোলের (৫৭) পৃথিবীর মডেল তৈরি করার সফটওয়্যারটি তার প্রয়োজন মাফিক মাটির তলদেশে কাজ করার উপযোগী হতে হবে। কোনো ন্যাকেড মোল ইদুরের সম্ভবত মোলদের মত প্রায় একই ধরনের পৃথিবীর মডেল প্রদর্শনকারী সফটওয়্যার আছে। কিন্তু কাঠবিড়ালী, যদিও তারা মোল ইদুরদের মত একটি রোডেন্ট, তবে তাদের পৃথিবীর মডেল তৈরি করার সফটওয়্যারটি সম্ভবত অনেক বেশি বানরদের মতোই হবার কথা।

দ্য ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার (৫৮) এবং অন্যান্য বইগুলোতে আমি একটি প্রস্তাব করেছিলাম, বাদুড়রা হয়তো তাদের কান দিয়ে রং 'দেখতে' পারে। ত্রিমাত্রিক একটি পৃথিবীতে ওড়া এবং কীটপতঙ্গ শিকার করতে বাদুড়ের যে ধরনের মডেল প্রয়োজন, সেটি নিশ্চিতভাবে সোয়ালো পাখির মডেলের মত, যারা সেই একই কাজ করে। বাদুড় প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে তার পৃথিবীল মডেলটিকে নিরন্তর নবায়ন করে, আর অন্যদিকে সোয়ালো পাখি আলো ব্যবহার করে, ব্যপারটা ঘটনাক্রমেই ঘটেছে। আমি প্রস্তাব করছিলাম, বাদুড়রা হয়তো অনুভূত রঙের উজ্জ্বলতা, যেমন লাল বা নীলকে প্রতিধ্বনির কোনো উপযোগী অংশের সাথে অন্তর্গতভাবে চিহ্নিত করে কোনো পৃষ্ঠের গঠন আর এর আকারগত বৈশিষ্ঠানুযায়ী অনুভব করে। হয়তো কোনো পৃষ্ঠ থেকে ফিরে আসা শব্দের বৈশিষ্ট্য, ঠিক যেমন করে সোয়ালো পাখিরা উজ্জ্বলতার একই অনুভূতিকে ব্যবহার করে আলোর দীর্ঘ আর হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলোকে চিহ্নিত করতে। মূল বিষয়টি হচ্ছে মডেলটির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত হয় কিভাবে এটি ব্যবহৃত হবে, সেখানে কোন ধরনের ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রক্রিয়া ব্যবহার হচ্ছে সেটি মূখ্য না। বাদুড় থেকে শিক্ষার বিষয় হচ্ছে এটি। মনের মডেলের একটি সাধারণ রূপ হচ্ছে - অনুভূতিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে ক্রমাগত আসতে থাকা নানা তথ্য উপাত্ত যা নিরন্তর পরিবর্তিত হচ্ছে তার বিপরীত - এক ধরনের অভিযোজন, প্রাণীর জীবন যাপনের একটি উপায়, যা কোনো অংশেই তার শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যেমন, তার ডানা, পা কিংবা লেজের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জে. বি. এস. হলডেন তার 'পসিবল ওয়ার্ল্ডস' প্রবন্ধটিতে, যেখানে থেকে একটি উদ্ধৃতি আমি উপরে উল্লেখ করেছি, কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে সেই সব প্রাণীদের সম্বন্ধে, যাদের পৃথিবী মূলত পরিচালিত হয় ঘ্রাণশক্তি দিয়ে। তিনি লক্ষ করেছিলেন, কুকুররা তাদের ঘ্রাণশক্তি দিয়ে একই ধরনের দুটি উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে, যেমন, ক্যাপ্রিলিক এসিড আর ক্যাপ্রোয়িক এসিড, এমন কি যখন এক মিলিয়ন অংশে একটি অণু এমন লঘু ঘণত্বে মেশানো হয়। ফ্যাটি অ্যাসিড দুটির মধ্যে পার্থক্য শুধু ক্যাপ্রিলিক এসিডের মূল আণবিক শিকলটি ক্যাপ্রোয়িক এসিডের মূল কাঠামো শিকলটির চেয়ে দুই কার্বন পরমাণু দীর্ঘতর। হলডেন অনুমান করেছিলেন, "ঘ্রাণ অনুযায়ী আণবিক ওজনের ক্রমানুসারে এদের স্থাপন করার মাধ্যমে কুকুররা খুব সম্ভবত ফ্যাটি এসিড দুটিকে পৃথক করতে পারে, ঠিক যেমন করে কোনো ব্যক্তি পিয়ানোর তারগুলোকে তাদের দৈর্ঘ্য ক্রমানুযায়ী সাজাতে পারে সেগুলো যে ধ্বনি তৈরি করে সেটি শুনে"।

অন্য আরো একটি ফ্যাটি অ্যাসিড আছে, ক্যাপরিক এসিড, যা প্রায় ঠিক আগের দুটোর মতোই, শুধু এর মূল কাঠামো শিকলটিতে আরো বাড়তি দুটি কার্বন পরমাণু আছে। কোনো কুকুর যে কিনা কখনো ক্যাপরিক এসিডের ঘ্রাণ নেয়নি, তার কিন্তু এর গন্ধ কল্পনা করা খুব কঠিন হবে না, যেমন আমাদেরও কল্পনা করতে অসুবিধা হয় না, যখন

কোনো ট্রাম্পে, যে সুরে এটি কিছুক্ষণ আগে বাজছিল তার থেকে খানিকটা উঁচু সুরে বাজতে শুরু করে। এমন কিছু অনুমান করা আমার কাছে সম্পূর্ণভাবেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় যে, একটি কুকুর বা একটি গণ্ডার হয়তো বিভিন্ন গন্ধের মিশ্রণকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ‘কর্ড’ বা বাদ্যযন্ত্রের তাদের মত ব্যবহার করে। হয়তো সেখানে অসামঞ্জস্যতা আছে। সম্ভবত মেলোডি না, করাণ মেলোডিগুলো তৈরি করে সেই সব নোট বা স্বরগুলো যা গন্ধের ব্যতিক্রম সুনির্দিষ্ট কোনো মুহূর্তে হঠাৎ করেই শুরু হয় কিংবা থেমে যায়। অথবা হয়তো কুকুর এবং গণ্ডাররা রং দিয়ে ঘ্রাণ অনুভব করে। এই যুক্তিটি বাদুড়দের সেই যুক্তির মত একই।

আরো একবার, যে অনুভূতিবোধকে যাকে আমরা বলছি র‌ং সেগুলো আসলে উপকরণ বা কৌশল যা আমাদের মস্তিষ্ক আমাদের চারপাশের পৃথিবীটির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে ব্যবহার করে। অনুভূত রং, দার্শনিকরা যাকে বলেন ‘কোয়ালিয়া’, সেগুলোর আসলে সুনির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোর সাথে অন্তর্নিহিত কোনো সম্পর্ক নেই। এগুলো হচ্ছে অন্তর্গত ‘লেবেল’, যা আমাদের মস্তিষ্কের কাছে লভ্য, যখন এটি বাইরের বাস্তবতা সম্বন্ধে তার মডেলটি তৈরি করে। সেই প্রাণীর প্রয়োজানুসারে সে বিশেষ জায়গাগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আমাদের ক্ষেত্রে বা কোনো একটি পাখির ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো। বাদুড়ের ক্ষেত্রে আমি অনুমান করেছিলাম এটি হতে পারে বিভিন্ন পৃষ্ঠ থেকে ফিরে আসা শব্দ প্রতিধ্বনির বৈশিষ্ট্য বা গঠন, হয়তো চকচকে উজ্জ্বল কোনো কিছুর জন্য লাল, নীল হচ্ছে মখমলের মত, সবুজ হচ্ছে খসখসে ধারালো ইত্যাদি। এবং কোনো কুকুর আর গণ্ডারের ক্ষেত্রে, এটা কেনই বা তাদের ঘ্রাণশক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না? কোনো বাদুড় বা গণ্ডারের, বা স্কেটার বা একটি মোল বা ব্যাকটেরিয়া বা ডার্ক বিটলদের আমাদের থেকে ভিন্ন, অপার্থিব একটি জগত কল্পনা করতে পারার সেই শক্তি আর সুযোগ করে দিয়েছে বিজ্ঞান , যখন এটি আমাদের বোরকার কালো কাপড় টেনে ধরে আরো প্রশস্ত করে আমাদের দেখায়, বিস্মিত হবার আরো কত বেশি কিছু আছে।

অন্তর্বর্তী পর্যায়ের নানা পর্যবেক্ষণযোগ্য ঘটনার মধ্যম পৃথিবীর রূপকগুলো, যা আমাদের বোরকার সংকীর্ণ জানালাটি দেখার অনুমতি দেয়, সেটি এমনকি আরো ভিন্ন ধরনের মাত্রা বা বর্ণালীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমরা অসম্ভাব্যতার একটি মাপকাঠি নির্মাণ করতে পারি, অনুরূপভাবে সংকীর্ণ একটি জানালাসহ, যার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তর্জ্ঞান আর কল্পনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হতে পারে। এই অসম্ভাব্যতার ‘বর্ণালীর’ এক চূড়ান্ত প্রান্তে আছে সেই সব তথাকথিত ‘হতে পারে’ এমন সব ঘটনা, যেগুলো আমরা বলি অসম্ভব। ‘অলৌকিক’ ঘটনা হচ্ছে সেই ঘটনা যা চূড়ান্তভাবে অসম্ভাব্য। মা মেরির একটি মুর্তি আমাদের ইঙ্গিত করে তার হাত নাড়াতে পারে। যে অণুগুলো এর স্ফটিকাকার কাঠামো তৈরি করে সেগুলো সব সামনে পেছনে কম্পমান । আর যেহেতু

সংখ্যায় অগণিত এগুলো কোন দিক বরাবর নড়বে সেই বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট পছন্দ নেই, সে কারণে 'মধ্যম' পৃথিবীতে আমরা যেমন দেখি, হাত পাথরের মতোই অনড়। কিন্তু হতে পারে যে হাতের কম্পমান পরমাণুগুলো, 'ঘটনাক্রমে' সব একত্রে একই সময়ে একই দিক বরাবর কেপে উঠতে 'পারে', একবার, দুইবার এবং আবারো....এই ক্ষেত্রে হাত নড়ে উঠবে আমরাও দেখবো আমাদের দিকে ইঙ্গিত করেই এটি হাত নাড়াচ্ছে, কিন্তু এরকম কিছু না হবার সম্ভাবনা এত বেশি যে, আপনি যদি মহাবিশ্বের সূচনা থেকে সংখ্যা লিখতে শুরু করেন, তারপরও আজ অবধি সব শূন্য লিখে শেষ করতে পারবে না শেষ হবে না। হতাশায় হাত উপরে তুলে হাল ছেড়ে না দিয়ে বরং এমন অসম্ভাব্যতার সম্ভাবনাকে গণনা করার শক্তি বা প্রায় অসম্ভব কোনো কিছুকে পরিমাপ করার শক্তি, মানুষের প্রাণশক্তির প্রতি বিজ্ঞানের মুক্তিদানকারী আশীর্বাদের আরেকটি উদাহরণ ।

মধ্যম পৃথিবীতে বিবর্তন খুব বেশি অসম্ভাব্য ঘটনা সামাল দেবার মত যথেষ্ট পরিমান দক্ষতা দিয়ে আমাদের তৈরি করেনি। কিন্তু মধ্যম বিশ্বে যে ঘটনাগুলো অসম্ভাব্য মনে হয়, এই অকল্পনীয় বিশাল মহাশূন্য কিংবা ভূতাত্ত্বিক সময়ে সেই ঘটনাগুলো অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। বিজ্ঞান সজোরে সেই সংকীর্ণ জানালাটি আরো প্রশস্ত করে উন্মুক্ত করে দেয়, যার মধ্য দিয়ে আমরা সম্ভাবনার 'বর্ণালীর' সেই বিস্তার দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। গণনা আর যুক্তির দ্বারা আমরা মুক্ত হই সম্ভাবনা সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ করার জন্য, যা একসময় আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনে হতো, কিংবা যেখানে বসবাস করতো ড্রাগনরা। আমরা ইতোমধ্যেই এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে এই জানালাটির প্রশস্তকরণের সুবিধাটি ব্যবহার করেছিলাম, যখন জীবনের উৎপত্তির অসম্ভাব্যতা এবং যথেষ্ট পরিমাণ সময় যখন হাতে থাকে, তখন কিভাবে প্রায়-অসম্ভব একটি রাসায়নিক ঘটনা অবশ্যই ঘটতে পারে সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এবং সেখানে আমরা নিজস্ব প্রাকৃতিক নিয়ম ও ধ্রুবসহ একগুচ্ছ সম্ভাব্য মহাবিশ্বের সম্ভাবনা এবং সংখ্যালঘু জীবনবান্ধব এলাকাগুলোর একটিতে আমাদের নিজেদের খুঁজে পাওয়ার অ্যানথ্রোপিক আবিশ্যকতার বিষয়টি বিবেচনা করেছিলাম।

'আমাদের যতটুক ধারণা করতে পারি তার চেয়ে অদ্ভুত'? নীতিগতভাবে, যতটুকু ধারণা করা সম্ভব তার চেয়েও কি আরো অদ্ভুত? অথবা শুধু আমরা যা ধারণা করতে পারি তার চেয়ে অদ্ভুত, হলডেনের এই মন্তব্যটিকে আমাদের কিভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত, যদি মধ্যম আকারের একটি পৃথিবীতে আমাদের মস্তিষ্কের বিবর্তনীয় শিক্ষানবিশির সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনায় রাখি? প্রশিক্ষণ আর অনুশীলনের দ্বারা এই মধ্যম পৃথিবী থেকে আমরা কি নিজেদের মুক্ত করতে পারবো, আমাদের আবৃত করে রাখা কালো বোরখাটি কি ছিড়ে ফেলতে পারবো, এবং খুবই ক্ষুদ্র, খুবই বিশাল এবং খুবই দ্রুত গতিসংক্রান্ত এক ধরনের অন্তর্জ্ঞান এবং একই সাথে গাণিতিক একটি

উপলব্ধি অর্জন করতে পারবো? আমি আসলেই এর উত্তর জানি না, তবে এমন একটি সময়ে আমি বেঁচে থাকার জন্য দারুণ উত্তেজিত, যখন মানবতা উপলব্ধি আর বোধের সীমানাকে প্রতিনিয়ত আরো প্রসারিত করে তুলছে। এমনকি আরো উত্তম, আমরা হয়তো অবশেষে একদিন আবিষ্কার করবো যে, আসলেই কোনো সীমানা নেই ।

টীকা:

(১) https://www.amazon.co.uk/tel-quel-reader-patric-french/dp/0415157145

(২) বায়োফিলিয়ার ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন ই. ও. উইলসন তার বায়োফিলিয়া (১৯৮৪) বইটিতে; হাইপোথিসিসটির মূল দাবীটি হচ্ছে পৃথিবীর সব জীব সহজাতভাবে পারস্পরিক একটি সম্পর্ক অনুভব করে। এডওয়ার্ড ওসবোর্ন উইলসন (জন্ম ১৯২৯) যুক্তরাষ্ট্রের জীববিজ্ঞানী, কীটতত্ত্ববিদ, তাত্ত্বিক, পরিবেশবাদী ও সোসিওবায়োলজীর প্রবক্তা, লেখক।

(৩) ক্রিষ্টোফার রবিন - একটি চরিত্র যা সৃষ্টি করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক এ. এ. মিল্ন । তাকে আমরা দেখি মিল্ন এর জনপ্রিয় কবিতার বই এবং উইনি-দি-পুহ গল্পগুলোয় এবং চরিত্রটি মূলত লেখকের নিজের ছেলে ক্রিষ্টোফার রবিন মিলনে। চরিত্রটি পরবর্তীতে ডিজনী কার্টুনেও আমরা আবির্ভুত হতে দেখি।

(৪) পিগলেট, লেখক এ. এ. মিল্ন এর সৃষ্ট জনপ্রিয় একটি কাল্পরিক চরিত্র, উইনি দি পুহ'র সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।

(৫) উইনি দি পুহ বা পুহ বিয়ার, লেখক এ. এ. মিল্ন এর সৃষ্ট জনপ্রিয় একটি কাল্পরিক চরিত্র, একটি অ্যানথ্রোপোমর্ফিক বা নরাত্বরোপিত টেডি বিয়ার, ১৯২৬ সালে তার উইনি-দি-পুহ বইটিতে আবির্ভূত হতে দেখি।

(৬) অ্যালান আলেক্সজাণ্ডার মিল্ন (মিল্ন) (১৮ জানুয়ারী ১৮৮২ -৩১ জানুয়ারী ১৯৫৬) -ইংরেজ লেখক, যিনি পরিচিত টেডি বিয়ারকে নিয়ে লিখিত তার বই উইনি দি পুহ এবং শিশুদের জন্য লেখা তার কবিতা সংকলনের জন্য। মিল্ন খুব দক্ষ ছিলেন একজন নাট্যকার হিসাবে, তবে উইনি দি পুহ বইয়ের ব্যাপক সফলতা তার আগের সব সেরা কাজকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত হবার সুযোগ দেয়নি।

(৭) জুলিয়ান জেনেস (Julian Jaynes) (১৯২০-১৯৯৭) যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানী। তার The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. বইটিতে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন প্রাচীন মানুষ সচেতন ছিল না, উনার প্রস্তাবে সচেতনা হচ্ছে দার্শনিকরা যাকে বলেন মেটা-কনসাসনেস বা মেটা-অ্যাওয়ারনেস। যা সাধারণ চেতনার স্তর থেকে উপরে। এখানে দি বাইক্যামেরাল মাইণ্ড এর প্রস্তাব করেছিলেন। বাইক্যামেরালিজম (দ্বি- প্রকোষ্ঠতার দর্শন) মনোবিজ্ঞানের একটি হাইপোথিসিস,যা প্রস্তাব করে মানুষের মন একসময় একটি পরিস্থিতি ছিল যখন কগনিটিভ কর্মকাণ্ডগুলো মস্তিষ্কের মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত ছিল, যখন মস্তিষ্কের একটি অংশ মনে হতো কথা বলতো আর দ্বিতীয় অংশটিকে সেই শুনতো এবং মাণ্য করতো – একটি দ্বিপ্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট বা বাইকামেরাল মাইণ্ড। মনোবিজ্ঞানী জুলিয়ান জেনেস এটি প্রস্তাব করেছিলেন ১৯৭৬ সালে তার The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind বইটিতে। সেখানে তিনি আরো প্রস্তাব করেন এই বাইক্যামেরাল মানসিকতা মানব মনের খুবই স্বাভাবিক ও সর্বজনীন পরিস্থিতি ছিল এমনকি ৩০০০ বছর আগের মত সাম্প্রতিক কোনো সময়েও।

(৮) ইভলিন ওয়াহ, ব্রিটিশ লেখক।

(৯) Evelyn Waugh. The Ordeal of Gilbert Pinfold (1957)

(১০) এলিয়ানর রিজবী, প্রখ্যাত সঙ্গীত গ্রুপ বিটলস-এর একটি গান, এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে তাদের রিভলভার অ্যালবামের একটি গান হিসাবে। গানটির মূল রচয়িতা যদিও পল ম্যাকার্টনী তবে গানটির লেখক হিসাবে লেনন-ম্যাকার্টনী দুজনের নাম চিহ্নিত করা হয়েছে। গানটিকে প্রায়ই বর্ণনা করা হয়

নিঃসঙ্গ মানুষদের বিলাপ সঙ্গীত হিসাবে (এলিয়ানর রিজবী); এটি একই সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু বিষয়কে ইঙ্গিত করে যখন অনেক নারী যুদ্ধের পর নিঃসঙ্গ হয়েছিল।

(১১) ড্যানিয়েল ডেনেট, দার্শনিক।

(১২) Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon: Daniel C. Dennett

(১৩) আমার স্মরণশক্তির উপর নির্ভরশীল হয়ে আমি এই বিতর্কটি সূত্র হিসাবে অক্সফোর্ড এর দার্শনিক ডেরেক পারফিটকে উল্লেখ করছি। যদিও আমি এর উৎস সম্বন্ধে বিস্তারিত গবেষণা করিনি কারণ আমি এটি ব্যবহার করছি শুধুমাত্র দার্শনিক সান্ত্বনার একটি উদাহরণ হিসাবে।

(১৪) মার্ক টোয়াইন – স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স যার মূল নাম, যুক্তরাষ্ট্রের লেখক।

(১৫) টমাস জেফারসন, আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা পিতাদের একজন, স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের প্রধান রচয়িতা, এবং তৃতীয় প্রেসিডেন্ট।

(১৬) ক্রিস্টোফার হিচেন্স, ব্রিটিশ-আমেরিকরান লেখক, সাংবাদিক।

(১৭) বার্ট্রান্ড রাসেল, ব্রিটিশ দার্শনিক।

(১৮) মার্ক টোয়াইন (স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লেমেন্স) (১৮৩৫-১৯১০) যুক্তরাষ্ট্রের লেখক।

(১৯) Richard Dawkins. A Devil's Chaplain,

(২০) Homo sapiens: মানুষের প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম।

(২১) Canis familiaris গৃহপালিত কুকুর এর বৈজ্ঞানিক নাম (Canis lupus familiaris)

(২২) Felis catus: গৃহপালিত বিড়ালের বৈজ্ঞানিক নাম (Felis silvestris catus)

(২৩) অন্ত্রনালীর একটি অংশ।

(২৪) যুক্তরাষ্ট্রের নাস্তিকদের মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সে সংক্রান্ত একটি গবেষণা বলছে ৫০ শতাংশ চায় তাদের জীবন নিয়ে একটি স্মৃতিচারণমূলক কোনো অনুষ্ঠান হোক, ৯৯ শতাংশ কোনো চিকিৎসকের সহায়তা আত্মহত্যার সমর্থক, যারা সেটা চান এবং ৭৫ শতাংশ নিজেদের জন্যও সেটাই চায় আর পুরো ১০০ শতাংশ উত্তরাদাতা এমন কোনো হাসপাতালের কর্মীর সংস্পর্শে আসতে চান না যারা ধর্ম প্রচার করেন: http:// nursestoner. com/ myresearch.html

(২৫) অস্ট্রেলীয় এক বন্ধু বয়সের সাথে বাড়তে থাকা ধর্মপ্রিয়তা বিষয়টি একটা চমৎকার নামকরণ করেছেন, অস্ট্রেলিয় বাচনভঙ্গিতে এটি বলুন, প্রশ্নের শেষে খানিকটা উচু গলা করে, প্রশ্নবোধক হিসাবে প্রকাশ করে, Cramming for the final?;

(২৬) চান্ট্রি (অবিট বলেও পরিচিত) এক ধরনের ট্রাষ্ট ফান্ড বা অর্থ তহবিল প্রতিষ্ঠিত করা হয় যার মাধ্যমে এক বা একাধিক যাজককে নিয়োগ করা হয় পূর্ব নির্ধারিত সংখ্যক পূর্বনির্ধারিত পর্বে প্রার্থণা সভার আয়োজন করা কোনো একজন মৃত মানুষের বিদেহী আত্মার কল্যানে, বিশেষ করে যিনি এই আর্থিক তহবিলের দাতা, যেন তার আত্মা দ্রুত স্বর্গ লাভ করে।

(২৭) তাও একজন রমণী, বিশপ উইলিয়াম শুনলে কি বলতেন..

(২৮) quod erat demonstrandum এর সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ যা প্রমাণ করার দরকার ছিল। সাধারণত গাণিতিক কিংবা দার্শনিক যুক্তি প্রস্তাবনার শেষে থাকে।

(২৯) non sequitur ল্যাটিন ভাষায় এর অর্থ এটি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি না। যুক্তিবিদ্যার ভাষা এটি হচ্ছে একটি যুক্তি, যেখানে এর মূল প্রস্তাবনা থেকে কোনো নির্দিষ্ট উপসংহারে পৌছানো যায় না। *non sequitur* কোনো যুক্তিতে এর উপসংহার হয় সত্যি নয়তো মিথ্যা, কিন্তু যুক্তি তর্কটি ভ্রান্ত, কারণ মূল প্রস্তাবনা আর উপসংহারের মধ্যে একটা অসংযোগ আছে।

(৩০) একটি সিলোগিজম (syllogism) হচ্ছে একধরনের যুক্তি যেখানে একটি প্রস্তাব (উপসংহার) সম্বন্ধে আমরা ধারণা পেতে পারি দুই বা ততোধিক অন্যান্য প্রস্তাব থেকে।

(৩১) Carl Sagan, Ann Druyan. Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space.

(৩২) Biophilia. Edward O. Wilson (1986)

(৩৩) Michael Shermer. The Soul of Science. (http://www.americanscientist.org/issues/id.3447,y.0,no.,content.true,page.1,css.print/issue.aspx)
(৩৪) Paul Kurtz. Affirmations: Joyful And Creative Exuberance.
(৩৫) Richard Dawkins. Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder.
(৩৫) এমিলি ডিকিনসন, যুক্তরাষ্ট্রের কবি।
(৩৬) আর (জীবন) কখনোই ফিরে আসবে না, সেটাই জীবনকে এত মধুর করেছে।
(৩৭) দি আল্ট্রাভায়োলেট গার্ডেন রয়াল ইনস্টিটিউশনে আমার পাঁচটি ক্রিসমাস লেকচারের একটির শিরোনাম। যা বিবিসি Growing Up in the Universe শিরোনামে প্রচার করেছিল। পুরো পাঁচটি লেকচারের সিরিজই Richard Dawkins Foundation এর ওয়েবসাইট www.richarddawkins.net এ পাওয়া যাবে।
(৩৮) জে. বি. এস. হলডেন – ব্রিটিশ জিনতাত্ত্বিক ও বিবর্তন জীববিজ্ঞানী, ১৯৬১ সালে তিনি ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহন করেছিলেন।
(৩৯) রিচার্ড ফাইনম্যান, আমেরিকার পদার্থবিজ্ঞানী, লেখক।
(৪০) একই ধরনের মন্তব্য মনে করা হয় নীলস বোরও করেছিলেন, যে কোনো কেউ যে কোয়ান্টাম তত্ত্বে হতবাক হবে না তারা এটি বুঝতে পারেননি।
(৪১) David Deutsch.The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes--and Its Implications
(৪২) এরউইন শ্রোডিঙ্গার, অষ্ট্রীয় পদার্থবিজ্ঞানী, ওয়েভ ফাংশানের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন।
(৪৩) Wolpert, L. The Unnatural Nature of Science. London: Faber & Faber. (1992).
(৪৪) সাইকাড রা নগ্নবীজি উদ্ভিদ, পৃথিবীর স্থলভূমিতে প্রথম প্রাধান্যকারী অন্যতম বৃক্ষ, সবচেয়ে পুরোনো জীবাশ্ম পার্মিয়ান পর্বের (২৮০ মিলিয়ন বছর আগে)
(৪৫) ইগুয়ানোডন, ক্রিটাশিয়াস পর্বের শুরুর দিকে (১২৫-১১৩ মিলিয়ন বছর আগে) একটি ডায়নোসর প্রজাতি (I. bernissartensis)
(৪৬) *I.* bernissartensis
(৪৭) ল্যুডভিগ ইয়োসেফ ইয়োহান ভিটগেনস্টাইন (১৮৮৮-১৯৫২) অষ্ট্রিয়- ব্রিটিশ দার্শনিক।
(৪৮) জন রনসন (জন্ম ১৯৬৭) ওয়েলশ সাংবাদিক, লেখক।
(৪৯) Jon Ronson. The Men Who Stare at Goats (2004)
(৫০) www.healthfreedomusa.org/aboutus/president. shtml -জেনারেল স্টাবলবাইনের একটি বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিকৃতি দেখতে চাইলে দেখুন: www.mindcontrolforums.com / images/ Mind94.jpg
(৫১) ব্রাউনিয়ান মোশন/মুভমেন্ট - কোনো তরল বা গ্যাসে অণুদের এলোমেলো গতি
(৫২) স্টিভ গ্রাণ্ড (জন্ম ১৯৫৮) ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী ও রোবোটিষ্ট।
(৫৩) Creation: Life and How to Make It. Steve Grand
(৫৪) গ্রাণ্ডের এই বক্তব্যটির আক্ষরিক সত্যতা নিয়ে অনেকে দ্বিমত থাকতে পারে। যেমন আমাদের হাড়ের অণুদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি যা মূল ভাবটি বোঝাতে চাইছেন সেটির সত্যতা আছে। আপনি কোনো স্থির বস্তু না হয়ে বরং অনেকটা তরঙ্গের মত।
(৫৫) ওয়াটার বোটম্যান - Corixidae পরিবারের পানিবাসী পতঙ্গ।
(৫৬) ফ্ল্যাটল্যান্ড.. বহুমাত্রিক এই রোমান্স উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে প্রহসনমূলক উপন্যাসিকা হিসাবে, এর লেখক ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এডউইন এবোট । যিনি স্কোয়ার ছদ্মনামে লিখতেন। অ্যাবোট একটি কাল্পনিক দ্বি-মাত্রিক জগত ফ্ল্যাটল্যান্ডের প্রস্তাব করেছিলেন ভিক্টোরিয়

ইংল্যান্ডের সংস্কৃতিতে নানা পর্যবেক্ষণগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য। তবে এই উপন্যাসিকার সবচেয়ে স্থায়ী অবদান ছিলো, বিভিন্ন ডাইমেনশন বা মাত্রা নিরীক্ষা করা।

(৫৭) মোল: মাটির নীচে বাস করতে অভিযোজিত ছোটো স্তন্যপায়ী প্রাণী।

(৫৮) Richard Dawkins.The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design (1986)

তথ্যসূত্র এবং যে বইগুলো পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে:

Adams, D. (2003). The Salmon of Doubt. London: Pan.
Alexander, R. D. and Tinkle, D. W., eds (1981). Natural Selection and Social Behavior. New York:
Anon. (1985). Life - How Did It Get Here? By Evolution or byCreation? New York: Watchtower Bible and Tract Society.
Ashton, J. E, ed. (1999). In Six Days: Why 50 Scientists Choose to Believe in Creation. Sydney:
Atkins, P. W. (1992). Creation Revisited. Oxford: W. H. Freeman.
Atran, S. (2002). In Gods We Trust. Oxford: Oxford UniversityPress.
Attenborough, D. (1960). Quest in Paradise. London: Lutterworth.
Aunger, R. (2002). The Electric Meme: A New Theory of How We Think. New York: Free Press.
Baggini, J. (2003). Atheism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
Barber, N. (1988). Lords of the Golden Horn. London: Arrow.
Barker, D. (1992). Losing Faith in Faith. Madison, WI: Freedom From Religion Foundation.
Barker, E. (1984). The Making of a Moonie: Brainwashing or Choice? Oxford: Blackwell.
Barrow, J. D. and Tipler, F. J. (1988). The Anthropic Cosmological Principle. New York:
Baynes, N. H., ed. (1942). The Speeches of Adolf Hitler, vol. 1.Oxford: Oxford University Press.
Behe, M. J. (1996). Darwin's Black Box. New York: Simon &Schuster.
Beit-Hallahmi, B. and Argyle, M. (1997). The Psychology of Religious Behaviour, Belief and Experience. London: Routledge.
Berlinerblau, J. (2005). The Secular Bible: Why Nonbelievers Must Take Religion Seriously.
Blackmore, S. (1999). The Meme Machine. Oxford: Oxford University Press.
Blaker, K., ed. (2003). The Fundamentals of Extremism: The Christian
Right in America. Plymouth, MI: New Boston.
Bouquet, A. C. (1956). Comparative Religion. Harmondsworth: Penguin.
Boyd, R. and Richerson, P. J. (1985). Culture and the Evolutionary Process. Chicago:
Boyer, P. (2001). Religion Explained. London: Heinemann.
Brodie, R. (1996). Virus of the Mind: The New Science of the Meme.Seattle: Integral Press.
Buckman, R. (2000). Can We Be Good without God? Toronto: Viking.
Bullock, A. (1991). Hitler and Stalin. London: HarperCollins.
Bullock, A. (2005). Hitler: A Study in Tyranny. London: Penguin.
Buss, D. M., ed. (2005). The Handbook of Evolutionary Psychology.Hoboken, NJ: Wiley.
Cairns-Smith, A. G. (1985). Seven Clues to the Origin of Life.Cambridge: Cambridge University Press.
Comins, N. F. (1993). What if the Moon Didn't Exist? New York: HarperCollins.
Coulter, A. (2006). Godless: The Church of Liberation. New York: Crown Forum.
Darwin, C. (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection. London: John Murray.
Dawkins, M. Stamp (1980). Animal Suffering. London: Chapman &Hall.
Dawkins, R. (1976). The Selfish Gene. Oxford: Oxford UniversityPress.
Dawkins, R. (1982). The Extended Phenotype. Oxford: W. H.Freeman.
Dawkins, R. (1986). The Blind Watchmaker. Harlow: Longman.
Dawkins, R. (1995). River Out of Eden. London: Weidenfeld &Nicolson.
Dawkins, R. (1996). Climbing Mount Improbable. New York: Norton.
Dawkins, R. (1998). Unweaving the Rainbow. London: Penguin.
Dawkins, R. (2003). A Devil's Chaplain: Selected Essays. London: Weidenfeld & Nicolson.
Dennett, D. (1995). Darwin's Dangerous Idea. New York: Simon &Schuster.
Dennett, D. C. (1987). The Intentional Stance. Cambridge, MA: MITPress.
Dennett, D. C. (2003). Freedom Evolves. London: Viking.
Dennett, D. C. (2006). Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon. London: Viking.
Deutsch, D. (1997). The Fabric of Reality. London: Allen Lane.
Distin, K. (2005). The Selfish Meme: A Critical Reassessment.Cambridge: Cambridge University Press.

Dostoevsky, F. (1994). The Karamazov Brothers. Oxford: OxfordUniversity Press.
Ehrman, B. D. (2003a). Lost Christianities: The Battles for Scripture and the Faiths We Never Knew.
Ehrman, B. D. (2003b). Lost Scriptures: Books that Did Not Make It into the New Testament.
Ehrman, B. D. (2006). Whose Word Is It? London: Continuum.
Fisher, H. (2004). Why We Love: The Nature and Chemistry ofRomantic Love. New York: Holt.
Forrest, B. and Gross, P. R. (2004). Creationism's Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design.
Frazer, J. G. (1994). The Golden Bough. London: Chancellor Press.
Freeman, C. (2002). The Closing of the Western Mind. London:Heinemann.
Galouye, D. F. (1964). Counterfeit World. London: Gollancz.
Glover, J. (2006). Choosing Children. Oxford: Oxford University Press.
Goodenough, U. (1998). The Sacred Depths of Nature. New York:Oxford University Press.
Goodwin, J. (1994). Price of Honour: Muslim Women Lift the Veil of Silence on the Islamic World. wn.
Gould, S. J. (1999). Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life. New York: Ballantine.
Grafen, A. and Ridley, M., eds (2006). Richard Dawkins: How a Scientist Changed the Way We Think.
Grand, S. (2000). Creation: Life and How to Make It. London:Weidenfeld & Nicolson.
Grayling, A. C. (2003). What Is Good? The Search for the Best Way to Live. London:
Gregory, R. L. (1997). Eye and Brain. Princeton: Princeton University Press.
Halbertal, M. and Margalit, A. (1992). Idolatry. Cambridge, MA:Harvard University Press.
Harris, S. (2004). The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason. New York: Norton.
Harris, S. (2006). Letter to a Christian Nation. New York: Knopf.
Haught, J. A. (1996). 2000 Years of Disbelief: Famous People with the Courage to Doubt. Buffalo, NY:
Hauser, M. (2006). Moral Minds: How Nature Designed our Universal Sense of Right and Wrong.
Hawking, S. (1988). A Brief History of Time. London: Bantam.
Henderson, B. (2006). The Gospel of the Flying Spaghetti Monster.New York: Villard.
Hinde, R. A. (1999). Why Gods Persist: A Scientific Approach to Religion. London: Routledge.
Hinde, R. A. (2002). Why Good Is Good: The Sources of Morality.London: Routledge.
Hitchens, C. (1995). The Missionary Position: Mother Teresa in Theory and Practice. London: Verso.
Hitchens, C. (2005). Thomas Jefferson: Author of America. New York: HarperCollins.
Hodges, A. (1983). Alan Turing: The Enigma. New York: Simon &Schuster.
Holloway, R. (1999). Godless Morality: Keeping Religion out of Ethics. Edinburgh: Canongate.
Holloway, R. (2001). Doubts and Loves: What is Left of Christianity?
Humphrey, N. (2002). The Mind Made Flesh: Frontiers of Psychology
Huxley, A. (2003). The Perennial Philosophy. New York: Harper.
Huxley, A. (2004). Point Counter Point. London: Vintage.
Huxley, T. H. (1871). Lay Sermons, Addresses and Reviews. New York: Appleton.
Huxley, T. H. (1931). Lectures and Essays. London: Watts.
Jacoby, S. (2004). Freethinkers: A History of American Secularism.New York: Holt.
Jammer, M. (2002). Einstein and Religion. Princeton: Princeton University Press.
Jaynes, J. (1976). The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Boston:
Juergensmeyer, M. (2000). Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence. Berkeley:
Kennedy, L. (1999). All in the Mind: A Farewell to God. London:Hodder &c Stoughton.
Kertzer, D. I. (1998). The Kidnapping ofEdgardo Mortara. New York:Vintage.
Kilduff, M. and Javers, R. (1978). The Suicide Cult. New York:Bantam.
Kurtz, P., ed. (2003). Science and Religion: Are They Compatible?Amherst, NY: Prometheus.
Kurtz, P. (2004). Affirmations: Joyful and Creative Exuberance.Amherst, NY: Prometheus.
Kurtz, P. and Madigan, T. J., eds (1994). Challenges to the Enlightenment: In Defense of Reason and Science. Amherst, NY: Prometheus.
Lane, B. (1996). Killer Cults. London: Headline.
Lane Fox, R. (1992). The Unauthorized Version. London: Penguin.

Levitt, N. (1999) Prometheus Bedeviled. New Brunswick, NJ: Rutgers
Loftus, E. and Ketcham, K. (1994). The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse. New York: StMartin's.
McGrath, A. (2004). Dawkins' God: Genes, Memes and the Meaning of Life. Oxford: Blackwell.
Mackie, J. L. (1985). The Miracle of Theism. Oxford: Clarendon Press.
Medawar, P. B. (1982). Pluto's Republic. Oxford: Oxford University Press.
Medawar, P. B. and Medawar, J. S. (1977). The Life Science: Current
Ideas of Biology. London: Wildwood House.
Miller, Kenneth (1999). Finding Darwin's God. New York: HarperCollins.
Mills, D. (2006). Atheist Universe: The Thinking Person's Answer to Christian Fundamentalism. Berkeley: Ulysses Books.
Mitford, N. and Waugh, E. (2001). The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh. New York:
Mooney, C. (2005). The Republican War on Science. Cambridge, MA:Basic Books.
Perica, V. (2002). Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. New York: Oxford University Press.
Phillips, K. (2006). American Theocracy. New York: Viking.
Pinker, S. (1997). How the Mind Works. London: Allen Lane.
Pinker, S. (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature. London: Allen Lane.
Plimer, I. (1994). Telling Lies for God: Reason vs Creationism.Milsons Point, NSW: Random House.
Polkinghorne, J. (1994). Science and Christian Belief: Theological Reflections of a Bottom-Up Thinker.
Rees, M. (1999). Just Six Numbers. London: WeidenfeJd & NicoJson.
Rees, M. (2001). Our Cosmic Habitat. London: Weidenfeld & NicoJson.
Reeves, T. C. (1996). The Empty Church: The Suicide of Liberal Christianity. New York:
Richerson, P. J. and Boyd, R. (2005). Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. Chicago: University ofChicago Press.
Ridley, Mark (2000). Mendel's Demon: Gene Justice and the Complexity of Life.
Ridley, Matt (1997). The Origins of Virtue. London: Penguin.
Ronson, J. (2005). The Men Who Stare at Goats. New York: Simon & Schuster.
Ruse, M. (1982). Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies.
Russell, B. (1957). Why I Am Not a Christian. London: Routledge.
Russell, B. (1993). The Quotable Bertrand Russell. Amherst, NY: Prometheus.
Russell, B. (1997a). The Collected Papers of Bertrand Russell, vol. 2: Last Philosophical Testament, 1943-1968. London: Routledge.
Russell, B. (1997b). Collected Papers, vol. 11, ed. J. C. Slater and P. Köllner. London: Routledge.
Russell, B. (1997c). Religion and Science. Oxford: Oxford University Press.
Ruthven, M. (1989). The Divine Supermarket: Travels in Search of the
Soul of America. London: Chatto & Windus.
Sagan, C. (1995). Pale Blue Dot. London: Headline.
Sagan, C. (1996). The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark. London: Headline.
Scott, E. C. (2004). Evolution vs. Creationism: An Introduction.Westport, CT: Greenwood.
Shennan, S. (2002). Genes, Memes and Human History. London: Thames & Hudson.
Shermer, M. (1997). Why People Believe Weird Things: Pseudoscience, Superstition and Other Confusions of Our Time. New York: W. H.Freeman.
Shermer, M. (1999). How We Believe: The Search for God in an Age of Science.
Shermer, M. (2004). The Science of Good and Evil: Why PeopleCheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule. NewYork: Holt.
Shermer, M. (2005). Science Friction: Where the Known Meets theUnknown. New York: Holt.
Shermer, M. (2006). The Soul of Science. Los Angeles: Skeptics Society.
Silver, L. M. (2006). Challenging Nature: The Clash of Science and Spirituality at the New Frontiers of Life. New York: HarperCollins.
Singer, P. (1990). Animal Liberation. London: Jonathan Cape.

Singer, P. (1994). Ethics. Oxford: Oxford University Press.
Smith, K. (1995). Ken's Guide to the Bible. New York: Blast Books.
Smolin, L. (1997). The Life of the Cosmos. London: Weidenfeld &Nicolson.
Smythies, J. (2006). Bitter Fruit. Charleston, SC: Booksurge.
Spong, J. S. (2005). The Sins of Scripture. San Francisco: Harper.
Stannard, R. (1993). Doing Away with God? Creation and the Big Bang. London: Pickering.
Steer, R. (2003). Letter to an Influential Atheist. Carlisle: Authentic Lifestyle Press.
Stenger, V. J. (2003). Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe. New York: Prometheus.
Susskind, L. (2006). The Cosmic Landscape: String Theory and the Illusion of Intelligent Design
Swinburne, R. (1996). Is There a God? Oxford: Oxford University Press.
Swinburne, R. (2004). The Existence of God. Oxford: Oxford University Press.
Taverne, R. (2005). The March of Unreason: Science, Democracy and the New Fundamentalism.
Tiger, L. (1979). Optimism: The Biology of Hope. New York: Simon & Schuster.
Toland, J. (1991). Adolf Hitler: The Definitive Biography, New York: Anchor.
Trivers, R. L. (1985). Social Evolution. Menlo Park, CA: Benjamin/Cummings.
Unwin, S. (2003). The Probability of God: A Simple Calculation thatProves the Ultimate Truth.
Vermes, G. (2000). The Changing Faces of Jesus. London: Allen Lane.
Ward, K. (1996). God, Chance and Necessity. Oxford: Oneworld.
Warraq, I. (1995). Why I Am Not a Muslim. New York: Prometheus.
Weinberg, S. (1993). Dreams of a Final Theory. London: Vintage.
Wells, G. A. (1986). Did Jesus Exist? London: Pemberton.
Wheen, F. (2004). How Mumbo-Jumbo Conquered the World: A Short History of Modern Delusions.
Williams, W, ed. (1998). The Values of Science: Oxford Amnesty
Lectures 1997. Boulder, CO: Westview.
Wilson, A. N. (1993). Jesus. London: Flamingo.
Wilson, A. N. (1999). God's Funeral. London: John Murray.
Wilson, D. S. (2002). Darwin's Cathedral: Evolution, Religion and the Nature of Society. Chicago:
Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Cambridge, MA: Harvard UniversityPress.
Winston, R. (2005). The Story of God. London: Transworld/BBC.
Wolpert, L. (1992). The Unnatural Nature of Science. Faber& Faber.
Wolpert, L. (2006). Six Impossible Things Before Breakfast: The
Evolutionary Origins of Belief. London: Faber & Faber.
Young, M. and Edis, T., eds (2006). Why Intelligent Design Fails: A Scientific Critique of the New Creationism. New Brunswick: Rutgers University Press.

সুপ্রজ্ঞা
অনুবাদ উদ্যোগ